KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No : KLMLGK [illegible]	Place of Publication : ২৫/২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : মৌরীন্দ্রনাথ দাস
Title : শনিবারের চিঠি	Size : 4.5" x 6.75" 11.43 x 17.14 c.m.
Vol. & Number : ১৪/৮-১২	Year of Publication : বৈশাখ-আশ্বিন, ১৩৪৭
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : সজনীকান্ত দাস, অমূল্যকুমার দাশগুপ্ত	Remarks :

CD Roll No. KLMLGK

শনিবারের চিঠি

সজনীকান্ত দাস

A. B. T. A.

MADHYAMIK TEST PAPERS

MADE EASY SERIES

In Collaboration with Teachers' Association

By EXPERIENCED PROFESSORS

English (2nd Language)
Bengali (1st Language) I & II Papers
Mathematics (Comp.)
•4. History
•5. Physical Science
•6. Life Science
•7. Geography

•With Questions & Answers,

নূতন সিলেবাসে সেকেণ্ডারী পরীক্ষার্থীদের জন্য
সদ্য প্রকাশিত সাহায্য-পুস্তক

[বিষয়মুখী মডেল প্রশ্ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের
প্রশ্ন ও উত্তর এবং বহু সমাধান সমেত]

শ্রীকেশব চন্দ্র নাগ প্রণীত

আবশ্যিক

★ সেকেণ্ডারী ম্যাথামেটিক্স
[সহায়িকা]

★ ঐচ্ছিক গণিত
For Classes IX & X

Pranabes Jana & Amitava Mitra

★ SECONDARY ELECTIVE MATH.
For Classes IX & X

✱ OBJECTIVE & SHORT ANSWER TYPE QUES. IN SECONDARY MATH. (IX & X) [Eng. & Beng.]

পাটীগণিত • বীজগণিত • জ্যামিতি • পরিমিতি

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন পাঠাগার ও গবেষণা কেন্দ্র
স্থাপিত-১৯৭১

শনিবারের চিঠি

ষাণ্মাসিক সূচী

বৈশাখ—আশ্বিন ১৩৪৯

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

বিষয়	পৃষ্ঠা
মনুচ্চারিত—শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য	৪১৩
...কার—শ্রীউমা দেবী	১৪৪
...ঙ্কর—"চন্দ্রহাস"	৭১৩
...যুনিকা—"বনফুল"	৩০৮
আমরা	৩০৭
আমার ট্রেঞ্চ—"শ্রীমতী"	১৮৫
আমি	৭১৪
ইতিহাস—"বনফুল"	৫৪৫
উদ্যোগ-পর্ব্বের কাব্য	১৬
উনপঞ্চাশ নম্বর মেস—শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র	২২
এবারের শারদীয়-সম্ভাষণ	৫৬১
ওঠো, জাগো, নাচো	৩২২
কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত —শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	৪৪৯
...ন্ত-বিজ্ঞান—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	৫৯৩
—শ্রীবটুক সান্যাল	৩৯১
...মের মেয়ে—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৬৯
...চক্রগুপ্ত	৫৭৩
...ছাত্র—"বনফুল"	৪২৫
ছিন্নমস্তা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী	৫৭৪
ছোট গল্প—"বনফুল"	১৭
ছোটলোক—"বনফুল"	২৫৫
...চকিত পুকী—শ্রীঅ...কৃষ্ণ রায়	৩০৭
...ত্রের দর্শনবা...—শ্রীযামিনীকান্ত সেন	৩১৭
...তরবারি—শ্রীরাজেন্দ্রনাথ আচার্য্য	৮৩
...ত্রি—"বনফুল"	৪৬
দুর্য্যোগের দিনে—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	১
দেহবাদ	৩৮৬
দৈনিক—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৬৮
নারায়ণী সেনা	২৪৪
নারী—"কলেজ বয়"	১৬৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিরঙ্কুশ—শ্রীমৃণালকান্তি দাশ	৩৮
নো তে দিবসাঃ গতা —শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক	৬৯
পলাতক—শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	২৮
পাকিস্থানী ফিল্ম—"কুমারভট্ট"	৩০৫
পিতা-পুত্র —শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯, ১৫
পিশাচ—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী	৪৮৫, ৬৭৩
পুস্তক-পরিচয়	১১১, ২২২, ৭৩০
প্রসঙ্গ কথা	২১১, ৬৯৩
বাইশে শ্রাবণ—আহসান হাবীব	৩১
ভয়—শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ	১৯
ভাবী কাল—শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী	৫২২
মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ —শ্রীমোহিতলাল মজুমদার	১১৩, ২২৫, ৩৩৭
মনে রাখা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত	৫২৫
মৃত্যুভয়—শ্রীউমা দেবী	৬৬৪
যাত্রী—শ্রীসত্যব্রত মজুমদার	২১০
রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী —শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪১, ২৪৭
লাল বনাত—"বনফুল"	২০৯
লিমারিক—একেরায়	৪২৬
শিল্প ও তাহার ক্রমবিবর্ত্তন —"পিসিয়েল"	৪১৭
শ্যামাদাসের মৃত্যু —শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৭৫
সংবাদ-সহিতা	৯৮, ২১৪, ৩২৮, ৪২৭, ৫৪৮, ৭১৫
সন্দেহ	৩০৬
সন্ধ্যামণি—শ্রীঅমলা দেবী	৮৪, ১৯৯, ২৬৬, ৩৬৩, ৪৯৭, ৬২৫
সেমেলি—শ্রীবাণী রায়	৫২৬
সোফী—শ্রীসত্যনারায়ণ	৫৩৮

শনিবারের চিঠি

১৪ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র

১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০

দুর্য্যোগের দিনে

বাংলা দেশের উপরে যে দুর্য্যোগ ঘনাইয়া উঠিল তাহাতে বাঙালীর প্রাণ ও বাঙালীর জাতিধর্ম্ম—দুইয়েরই সম্বন্ধে নিদারুণ আশঙ্কা নানা আকারে মনকে অভিভূত করিতেছে। প্রাণরক্ষার ভাবনাই উপস্থিত একমাত্র ভাবনা হইলেও, এবং সেজন্য আর সকল চিন্তা লোপ পাইলেও, আমরা এতদিন ধরিয়া বাঙালী-জীবনের যে দিকটির ভাবনা ভাবিয়াছি—জাতি-হিসাবে তাহার বৈশিষ্ট্য, আধুনিক ভারতের ইতিহাসে তাহার দান, অতিশয়-বর্ত্তমানে তাহার আত্মভ্রষ্টতার যে সংস্কৃতি-সংকট—সেই সকলের ভাবনাও আজ এমন দিনেও সম্পূর্ণ দূর করিতে পারিতেছি না; কারণ, যদিও জানি এবং বিশ্বাস করি যে, সমগ্র ভারতের ভাগ্য শেষ পর্য্যন্ত শুভই হইবে—এই পৃথিবীব্যাপী মহামারীর শেষে মানুষের সমাজে যে ধর্ম্মবিধির উদ্ভব হইবে অর্থাৎ "যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ", সেই পক্ষের জয়লাভে যে শান্তি ফিরিয়া আসিবে ভারতবাসী তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে না। তথাপি, বাংলা দেশ ও বাঙালীর ভিতর-বাহিরের যে অবস্থা তাহাতে বাঙালীর নিজ ভাগ্য সম্বন্ধে একটু পৃথক চিন্তার কারণ আছে। ভারতবাসীর মধ্যে বাঙালী ও অ-বাঙালী ভেদ যতই অবাঞ্ছনীয় হউক এবং সেজন্য বাঙালীই যে পরিমাণ অপরাধী হউক—ঐ ভেদটা যে সত্য তাহা অস্বীকার করিলে মিথ্যাচরণ হয়। বাঙালীর বোধ-বুদ্ধি, তাহার আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাহার সাধন-পন্থা বা আত্মবিকাশের ধারা যে স্বতন্ত্র, তাহা গত একশত বৎসরের বাংলার ইতিহাসে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে; এবং গত বিশ বৎসর রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে বাঙালী যে তাহার প্রাণের উৎসাহ হারাইয়া নির্জ্জীব ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলেও বুঝিতে পারা যাইবে যে, ভারতের ভাগ্যের সহিত বাঙালীর ভাগ্য যে ভাবেই জড়িত থাকুক, সে যেন ভারতের পক্ষে একটা বোঝা বা উপসর্গ হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের আর সকল জাতি পরস্পরকে সহজেই বোঝে, বাঙালীকে কেহ বোঝে না; বোঝে না বলিয়া তাহাকে দোষী করে—যদিও আমরা সেজন্য তাহাদিগকে দোষী করিব না। ভারতে

এই [illegible] ভৌগোলিক প্রকৃতি অথবা জাতি-বর্ণের এক অভিনব [illegible] যে কারণেই হউক, আমাদের ভাবনা-কামনা, আমাদের আচার ও বিচার, আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ও কর্ম্মপদ্ধতিতে এমন একটা বিভিন্নতা আছে যাহা লক্ষ্য না করিবার উপায় নাই। এইজন্যই আশঙ্কা হয়, আজিকার দিনে সমাজে বা রাষ্ট্রে বাঙালীকে তাহার স্বধর্ম্মপথে প্রবর্ত্তিত করিবার একটিমাত্রও নেতা যখন নাই, তখন এই মন্বন্তরের সময়ে হাল ধরিবে কে? পাছে আমরা একেবারে ডুবি বা ভাসিয়া যাই সেই ভয়ও অল্প নহে। আজ আর কিছুতেই আশ্বাস পাইতেছি না, তাই মনে মনে সেই সকল মহাপুরুষের নাম জপ করিতেছি, যাঁহারা একদিন এই জাতির প্রাণসমুদ্র মন্থন করিয়া নবযুগের ধন্বন্তরীরূপে অমৃত-ভাণ্ড তুলিয়া ধরিয়াছিলেন; সে অমৃত আমরা পূর্ণমাত্রায় পান করিবার অবসর না পাইলেও সেই ঘটনাতেও মৃত্যুঞ্জয়ের আশ্বাস আছে। আর কিছু না হউক, এইটুকু আশা করিতে পারি যে, আসন্ন ভবিষ্যৎ যতই অনিশ্চিত হউক—জাতি-হিসাবে আমরা যাহা যেটুকু অর্জ্জন করিয়াছি—যে পথে যতটুকু অগ্রসর হইয়াছি—তাহার সমাপ্তি এত শীঘ্র ঘটিবে না। কে বলিবে, আগামীকালেও এই বাঙালীর দেহভস্ম হইতেই সেই স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইবে না, যাহা দ্বারা সমগ্র ভারতের নবজীবন-যজ্ঞে অগ্ন্যাধান-কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে।

২

আজ যে ক্ষণে লিখিতে বসিয়াছি, সেই ক্ষণ কল্পনা করিয়াই বোধ হয় একদিন আমাদের কবি গাহিয়াছিলেন—

মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন-মন্তরে,
দিক দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা
তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।.....
এখনো সমুখে রহেছে সুচির শর্ব্বরী
ঘুমায় অরুণ সুদূর অস্ত অচলে,
বিশ্বজগৎ নিঃশ্বাস বায়ু সম্বরি
স্তব্ধ আসনে প্রহর গনিছে বিরলে।

যেন এমন দিনের নিদারুণ নৈরাশ্যই প্রাণকে আরও দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তোলে,

ঘোরতর অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রাণ-বিহঙ্গ ঊর্দ্ধতম গগনে পক্ষ বিস্তার করিতে চায়, মৃত্যুর পাত্রেই অমৃত আস্বাদন করে—

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহ-মোহবন্ধন,
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।
ওরে ভাষা নাই, নাই বৃথা এসে' ক্রন্দন,
ওরে গৃহ নাই, নাই ফুলশেজ রচনা।
আছে শুধু পাখা, আছে মহানভ-অঙ্গন
উষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির থাকা,
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর
এখনি অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা।

ইহারই সঙ্গে কবি-কণ্ঠোচ্চারিত আর এক মন্ত্রবাণী আজিকার দিনেই জপ করিতে হয়—

হেন সম অকস্মাৎ ছিন্ন করে' ঊর্দ্ধে লয়ে যাও
পঙ্কও হতে
মহান মৃত্যুর সাথে মুখামুখি করে' দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

কিন্তু আজ সে বাণীর সেই বজ্রদীপ্তি সহ্য করিবার সামর্থ্য আমরা হারাইয়াছি; বাঙালীর দেহ-মনের আর সে শক্তি নাই, আজ আমরা ধর্ম্মভ্রষ্ট, আত্মভ্রষ্ট; আমাদের মধ্যে আজ এমন কেহ নাই, যে এই মৃত্যুভয়ভীত জনগণের শৃগালিকাবৃত্তি নিরস্ত করিতে পারে। তবুও এমন অবস্থাতেও আশা করি—আমরা নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া যাইব না; তাহার কারণ, এমন সকল বাণী আমাদের রসনায় আবির্ভূত হইয়াছিল, যাহার ছন্দে অমৃতের প্রেরণা আছে, আমাদের বংশে এমন সব কবি ঋষি ও মনীষী জন্মিয়াছেন, যাঁহাদের জন্ম মৃত্যুতেই শেষ হইতে পারে না। আমরা তাঁহাদিগকে ভুলিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু কাল তাঁহাদিগকে ভোলে নাই, ভুলিতে পারে না।

৩

আমরা সাহিত্য-ব্যবসায়ী সাহিত্যজীবী; বাঙালীর যাহা শ্রেষ্ঠ সাধনা, আমরা তাহারই গৌরব করিয়া থাকি। তাই যখন সকলই নষ্ট হইতে বসিয়াছে, তখনও আর সব ছাড়িয়া কেবল ঐটুকু হারাইবার ভয়ে আমরা

আকুল হইতেছি। যে যুগকে আমরা ব্রিটিশ যুগ বলিয়া থাকি, সেই যুগে আমরা, যে প্রকারে যে উপায়ে হউক, আমাদের শক্তি ও অশক্তি দুইয়েরই একটা সুস্পষ্ট পরিচয় পাইয়াছিলাম, আমাদের জাতিগত স্বরূপ দর্শনে ভয় ও অভয় দুই-ই অনুভব করিয়াছিলাম। আমাদের সমাজে এই কালে পুরুষপরম্পরায় যে মনীষা ও প্রাণশক্তি—জ্ঞান ও কর্ম্মের যে জীবনাদর্শ বিকাশ হইতে দেখিয়াছিলাম, তাহাতে বিশ্বাস না করিয়া পারি নাই যে, অতঃপর বাঙালী জাতির দ্বারাই আধুনিক ভারতের পুনরুজ্জীবন হইবে—বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, এবং আরও কত ভাবুক ও কর্ম্মী একদা যে সমাজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সমাজের দ্বারা যুগবিধাতার একটা অভিপ্রায় নিশ্চয় সাধিত হইবে; জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিনেরই একটা যুগোচিত আদর্শ আমাদেরই জীবনেই নবরূপ পরিগ্রহ করিবে।

বাংলা সন হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই যে শতাব্দী শেষ হইয়াছে, তাহাতে যে নবজীবন-সাধনার উপক্রম আমরা দেখিয়াছিলাম, তাহার সম্বন্ধে নিষ্ফলতার সম্ভাবনা কুত্রাপি থাকিবার নয়; তাহার পর আজ এই অর্দ্ধশতাব্দী শেষ না হইতেই সে সম্বন্ধে যে অবিশ্বাস ও অবজ্ঞা আধুনিক শিক্ষিত-সমাজে প্রবল হইতে দেখি, তাহাতেও আমরা নিরাশ্বাস হই নাই; তাহার কারণ, সত্য এবং শক্তি এই দুই একাত্মক শক্তি—যদি প্রকৃত শক্তি হয়, তবে তাহার সহিত সত্য যুক্ত থাকিবেই; অপর পক্ষে, যেখানে ও যে কালে জীবনের সকল ক্ষেত্রে শক্তির ও আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব প্রকট হইয়া উঠিতেছে, সেখানে কোন চিন্তাতেই যে সত্য নাই ইহা নিশ্চিত। অনেকে এমনও প্রশ্ন করিতে পারেন, যদি এত শীঘ্র এতখানি অধঃপতনই ঘটিল, তবে সেকালের সেই মনীষা ও প্রতিভা এ জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে একটা সত্যের ইঙ্গিত করিয়াছিল, এমন কথা বলা যায় কেমন করিয়া? এই যে দারুণ দুর্গতির অবস্থা, ইহা হইতেই প্রমাণ হয় যে, সেই সকল পুরুষের দৃষ্টি ও সৃষ্টি নিতান্তই ভ্রান্ত; তাঁহারা এই মন্বন্তরের আভাসমাত্র অবগত হইতে পারেন নাই। তাঁহাদের দৃষ্টি অতিশয় সংকীর্ণ ছিল; মানব-কল্যাণের নবযুগ-প্রয়োজনকে তাঁহারা ধারণা করিতেই পারেন নাই। সে যুগের ভাবনা-চিন্তায় একটা নিশ্চিন্ত আত্মপ্রসাদ, বাস্তববিমুখ

কল্পনাবিলাস, অপ্রকৃত আদর্শবাদ এবং মরণোন্মুখ য়ুরোপীয় সভ্যতার সহিত আপস করিয়া এক অতিশয় জীর্ণ গলিত সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থনমূলক যুক্তিশীলতাই ছিল। গত বিশ বৎসর ধরিয়া দেশে যাহা ঘটিতে দেখিয়াছি, তাহাতে মন মাঝে মাঝে সংশয়াচ্ছন্ন হইয়াছে, উপরি-উক্ত মতবাদের যেন সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি! কিন্তু তথাপি অন্তরের আস্তিক্যবুদ্ধি কিছুতেই তাহা স্বীকার করিতে দেয় নাই, প্রত্যক্ষকে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই। প্রত্যক্ষ যে কত মিথ্যা, তাহা এই দুই-তিন বৎসরের নিরবচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রমাণে বুঝিতেছি; যাহা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, তাহাই বাস্তবে মূর্ত্তি ধরিতেছে; যে কল্পনাকে নিতান্তই পৌরাণিক বা অতিচারী বলিয়া মনে করিতাম, তাহাই মানুষের অদৃষ্ট-রহস্য ভেদ করিয়া সেই অতি পুরাতন শাশ্বত সত্যকেই যেন প্রকাশ করিয়া তুলিতেছে! দিকে দিকে মনুষ্যসমাজের বুদ্ধিভ্রংশ এবং সেই বুদ্ধিভ্রংশ হইতেই যে নানাপন্থী মতবাদের তুমুল কোলাহল পৃথিবীব্যাপী রণক্ষেত্রের ঝড়ঝঞ্ঝাকেও অগ্রাহ্য করিয়া বিনাশকেই ধ্রুবতর করিয়া তুলিতেছে, তাহাতে মন স্বভাবতই এমন একটি স্থানে দৃঢ়াসন করিয়া বসিতে চায়, যেখানে এই মৃত্যুপাগল জনতার—এই 'নিহতা পূর্ব্বমেব'—বলির পশুগণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, যাহা চিরজীবী, যাহা সকল ধ্বংসের শেষেও ধ্বংস হইবে না, সেই মানুষ এবং মানুষের সত্যকে উপলব্ধি করিয়া আশ্বস্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহা কি সম্ভব? সেইরূপ নির্ম্মম ও নিরাসক্ত ভাবে আত্মসাক্ষাৎকার করিবার শক্তি কি আমাদের আছে? আজ আমরা সকলেই মহাকালের যজ্ঞভূমিতে বলির যূপে বদ্ধ রহিয়াছি। এক দিকে ভীত-চীৎকার ও আর্ত্ত-কোলাহল এবং অপর দিকে অতিশয় আধিভৌতিক দেহসুখ-সাধনের যে সমানাধিকার-ঘোষণা এই উভয়ের দিকে চিত্তনিরোধ করিয়া আজ কেবল সেই সব মহাপুরুষের বাণী শ্রদ্ধাসহকারে পুনর্ব্বার শ্রবণ ও মনন করিতে পারি, যাঁহারা যুগের সহিত সনাতনকে, মানবধর্ম্মের সহিত জাতির ধর্ম্মকে, বিদ্যার সহিত অবিদ্যাকে, আত্মার স্বাতন্ত্র্যের সহিত বশ্যতাকে, একই সত্যের আলোকে বুঝিয়া লইয়া আমাদিগকেও তাহা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। এই বাংলা দেশের জল-মাটিতেই দেহ-ধারণ করিয়া সেই বাঙালী কবি ও মনীষীগণ জাতির অতীত-বর্ত্তমানকে

যেরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহা যদি ভ্রমাত্মক না হয়, তবে ভবিষ্যতের সম্বন্ধে যে আশা তাহাতে সূচিত হইয়াছিল তাহাও মিথ্যা হইতে পারে না। ইতিমধ্যে আমরা স্বধর্মভ্রষ্ট হইয়া এই যে পথে বিপথে ছুটাছুটি করিয়াছি, যেন অন্তরেরই কোন এক অসহনীয় উৎপাতের বশে অস্থির হইয়া নৈরাশ্য ও লাঞ্ছনার সর্ব্ববিধ দুর্গতি ভোগ করিয়াছি, তাহাও একেবারে নিষ্ফল হইতে পারে না। তৎপূর্ব্বে বাঙালী-জাতির গভীরতম চেতনা যাহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নিঃশ্রেয়স লাভের জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল, তাঁহাদের সেই তপস্যা কি একেবারেই ব্যর্থ হইবে? আমি এখানে জাতিসাধারণের কথা বলিতেছি না; বৃক্ষের প্রতি শাখায় ফুল বা ফল হয় না, তথাপি, বৃক্ষকে যে অর্থে ফলবান বলা যায়, অতিশয় অল্পসংখ্যক মহাত্মার আবির্ভাবেই জাতির জীবন তাহা অপেক্ষা আরও সত্য অর্থে ফলবান হইয়া থাকে। কেবল মন নয় বা বুদ্ধি নয়—আত্মার অসংশয় প্রকাশ যে সমাজে দিব্য দীপ-শিখার মত জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, যে সমাজে অত্যল্পকালের জন্যও জীবন্মুক্ত পুরুষেরা বিচরণ করিয়াছে, সে সমাজ বা সে জাতির জীবন-পুষ্পে অমৃতের রেণু কোন না কোন ক্রমে সঞ্চারিত হইবেই—এ যজ্ঞের ন্যূনতম অনুষ্ঠানও ব্যর্থ হয় না, কারণ, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"। সত্যের কোন নির্দ্দেশক লক্ষণ নাই, তর্কবুদ্ধির দ্বারা মিথ্যাকেই প্রতিষ্ঠিত করা যায়, কিন্তু সত্যকে কেবল প্রকাশের দ্বারাই জানা যায়; এবং সেই জানা বা জ্ঞান কেবল সংশয়চ্ছেদ করে না, তাহা একটি অপূর্ব্ব মহিমাবোধের দ্বারা, জীবনের যত গাণিতিক লাভ-ক্ষতির ভাবনা, চিত্তের কার্পণ্য দূর করিয়া মৃত্যুভয় নিবারণ করে। আত্মারই এইরূপ প্রকাশ আধুনিক কালে আমাদের দেশে এই বাঙালী-সমাজের একাংশে দেখা গিয়াছিল, এমন আর কোথাও দেখা যায় নাই। "Deep calls unto deep"—জন্ম-মৃত্যু, ইহকাল-পরকাল, পাপ-পুণ্যকেও বিদারণ করিয়া, ঊর্দ্ধের অসীমাকাশ হইতে নিম্নের এই অগাধ-সিন্ধু পর্য্যন্ত যে বিদ্যুৎময় আহ্বান ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, একটি পুরা শতাব্দী ধরিয়া তাহার জন্য এ জাতির চিত্তে যে কর্ষণ ও মন্থন চলিয়াছিল, তাহা আজ এই চরম ক্ষণেও বিস্মৃত হইতে পারি না। যাহাদের আত্মা আছে তাহারা যেমন আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না;

তেমনই যাহাদের এতটুকু জাতীয়তাবোধ আছে তাহারা জাতির সেই পরিচয় বিস্মৃত হইতে পারে না। বঙ্কিম-বিবেকানন্দের তিরোধানের পর এই কালের মধ্যেই আমাদের অনেকবার স্বপ্নভঙ্গ হইয়াছে, তাহাতে জাতির শক্তি ও অশক্তি সম্বন্ধে আমরা যেমন দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছি, তেমনই শক্তি অপেক্ষা অশক্তির পুঞ্জীভূত প্রমাণে মুহ্যমান হইয়াছি। তথাপি এই বর্ত্তমানেরই ইতিহাসে যাঁহারা জাতির আত্মচৈতন্য প্রবুদ্ধ করিয়া তাহা হইতেই মৃত্যুভয়নাশক মহৌষধি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সাধনা কখনও ব্যর্থ হইতে পারে না।

৪

তাই আজ জাতির জীবন-মৃত্যুর এই মহাসন্ধিক্ষণে—১৩৪৯ সালের বৈশাখেও বাঙালী আমি বাঁচিবার আশা রাখি। এই যুগে বিধাতা আমাদিগের উপরে অশেষ-যন্ত্রণার যে ক্রুশ-ভার চাপাইয়াছেন—পলে পলে, রক্ত মাংস মেদ মজ্জা ও শেষে অস্থি পর্য্যন্ত আহুতি করিয়া আমরা যাহার জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি, তাহা কি একেবারে মিথ্যা হইবে? আমাদের জাতির যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহারা বণিক-ধনিকের পুরুষার্থকেই বরণ করিতে পারেন নাই—ইহা সত্য। যে আধিভৌতিক সুখবাদের সভ্যতা আজ জলে স্থলে আকাশে বহ্নিবিস্ফোরণ-হাহাকারে দশদিক বিদীর্ণ করিতেছে, তাহার জ্বালা আমাদের দেহেও সঞ্চারিত হইয়াছিল; তথাপি তাহার তপ্তিটুকু মাত্র আমাদের হিমশীতল দেহে জীবন-সঞ্চার করিয়াছে—প্রাণকে স্পর্শ করে নাই। তাই বাঙালী আজিও 'বানিয়া' হইতে পারিল না। বরং সেই পরধর্ম্মের অনুশীলনে অর্জ্জন অপেক্ষা তাহার ক্ষতিই অধিক হইয়াছে; সে অর্থের সহিত ধর্ম্মের সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া অর্থলোভে মনুষ্যত্ব হারাইতে বসিয়াছে। তাই ভারতের আর সকল জাতি হইতে সে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে—একটি স্পষ্ট ভেদরেখায় তাহার যাত্রাপথ চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। আজ আর সর্ব্বভারতীয় নেতৃসভায় তাহার স্থান নাই—তাহার শুভাশুভ চিন্তায় কাহারও প্রয়োজন নাই—ভারতের রাষ্ট্রনীতি তাহাকে একরূপ বর্জ্জন করিয়াই চলে। বাহিরের দিক দিয়া এ অবস্থাও কম আশঙ্কাজনক নয়।

আমরা কখনও রাজনীতির চর্চ্চা করি নাই; তাই জাতির যে জীবনচরিত তাহার নানা আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার কাহিনীরূপে সাহিত্যে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে, তাহারই সাহায্যে আমরা আমাদের অদৃষ্ট গণনা করিয়া থাকি। যাহার কেহ নাই, আত্মাই তাহার একমাত্র সহায়। কেমন করিয়া কি হইবে জানি না, কেবল ইহাই জানি যে আমরা যেমন তপস্যা করিয়াছি তেমন তপস্যা এ যুগে অন্য কোন ভারতবাসী করে নাই—সে তপস্যার মধ্যে আত্মার সত্যকার আকূতি ছিল, এজন্য তাহা মিথ্যা বা নিষ্ফল নহে। জাতির হইয়া যাঁহারা সে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেই রাজনৈতিক আলেয়ার আলোকে দিক্‌ভ্রান্ত হন নাই—মানুষ, তথা জাতির জীবনে যাহা সত্য ও শাশ্বত তাহার আরাধনায় তাঁহারা দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। পরে যত ভুল আমরা করিয়াছি—আত্মবিসর্জ্জনের মোহে যে সকল আত্মঘাতী অতিচার বা অনাচার করিয়াছি—এমন কি যদি আমরা 'পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কূপ খনন'ও করিয়া থাকি, তাহাতেও আমরা ডুবিব না, কারণ সর্ব্বজ্ঞ কাল পূর্ব্ব-পর সেই সকলেরই হিসাব রাখিয়াছে। স্বধর্ম্ম যতই ভয়াবহ হউক, স্বানুষ্ঠিত পরধর্ম্ম আমাদিগকে মুগ্ধ করিতে পারিবে না; বাংলার জল-মাটির গুণ ও খাঁটি বাঙালী-প্রাণের প্রবৃত্তিকেই আমরা বাঙালীর অদৃষ্টনিয়ামক বলিয়া বিশ্বাস করি। কোনও সার্ব্বভৌমিক মতবাদ—কোনও বিশ্বমানবীয় আদর্শ যতই সুবিচারিত বা ভাবসমৃদ্ধ হউক, তাহাতে আমাদের জাগরণ বা উজ্জীবন হইবে না, কারণ, বাঙালী শেষ পর্য্যন্ত বুদ্ধিব্যবসায়ী নয়, সে ভাবের পূজারী; এবং সে ভাবও নির্ব্বিশেষের নয়—বিশেষের, অর্থাৎ, তাহার একটা স্পষ্ট রূপ চাই। সকল চিন্তা, সকল ভাব, সকল উৎকৃষ্ট নীতিও আমাদের পক্ষে নিষ্ফল—যতদিন না তাহাকে আমরা পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্পর্শযোগ্য করিয়া তুলিতে পারি। এমন একটা কিছু আমরা দুই বাহুর অতি সন্নিকটে চাই, যাহাকে সারা প্রাণ ঢালিয়া আলিঙ্গন করিতে পারি; অর্থাৎ যাহার মধ্যে অসম্ভবকে সম্ভব, স্বপ্নকে বাস্তব করিয়া তুলিবার সদ্য আশ্বাস আছে।

৫

বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ এই তিন বাঙালীকেই আজ আমি বিশেষ করিয়া স্মরণ করিতেছি। দেশের যে সমাজ ও বিদেশের

যে সাধনা তাঁহাদের ভয় বা ভরসার কারণ হইয়াছিল—এই অর্দ্ধশতাব্দী-কালের মধ্যে তাহার প্রায় আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাদের সেই দৃষ্টি মিথ্যা হইয়া যায় নাই। আমি এক্ষণে তাঁহাদের সেই বাণীর বহিরঙ্গের কথাই ভাবিতেছি না, তাহার অন্তরালে প্রাণের যে প্রত্যভিজ্ঞা ছিল—জাতির প্রতিনিধিরূপেই যে আত্মসাক্ষাৎকার ছিল, তাহাই চিন্তা করিয়া, এখনও আশান্বিত হইতে পারি। নূতনের প্রতি আমাদের যেমন লোভ, তেমনই প্রাচীনের যাহা পরম সম্পদ তাহাকেও উদ্ধার করিয়া আমরা তাহাকে আধুনিকের জীবনের উপযোগী করিয়াছি; আমরাই প্রাচীনের সাহিত্য ও প্রাচীনের অধ্যাত্মবিদ্যাকে যে ভাবে আমাদের ভাষার ও আমাদের ধ্যানধারণার অঙ্গীভূত করিয়াছি, তাহাতেই ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন হইয়াছে। সেই আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক তত্ত্বকেই আশ্রয় করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র একালের আধিভৌতিক আদর্শকে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন—মনুষ্যচরিত্র ও মনুষ্যভাগ্যের কয়েকটি মূল সমস্যাকে তিনিই, সেই সংস্কৃতির কিছুমাত্র গৌরবহানি না করিয়া, মানুষের হৃদয়শোণিত ও নয়নাশ্রুপ্রবাহে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও—মানবজীবনঘটিত সমস্যার সেই কাব্যকল্পনাতেও—তিনি বাঙালীর চরিত্রই বিশেষ করিয়া ভাবনা করিয়াছিলেন, তাহারই প্রকৃতিগত শক্তি ও অশক্তির বীজকে অঙ্কুরিত ও পূর্ণবিকশিতরূপে দেখিয়া, তাহার মনুষ্যত্বের সীমা নির্ণয় করিয়াছিলেন। সত্য বটে, যে সমাজ ও সংস্কার-বন্ধনের মধ্যে তিনি জীবনকে গণ্ডিবদ্ধ করিয়া দেখিয়াছিলেন, সে গণ্ডি তখনই অপসৃত হইতেছিল, তথাপি তাঁহার পশুপতি-সীতারাম, ভবানন্দ-গোবিন্দলাল, দেবেন্দ্র-অমরনাথ মূলে একই পুরুষের বিভিন্ন আত্মবিড়ম্বনার প্রতীক,—তাহাদের মধ্যে তিনি সর্ব্বকালের বাঙালী-চরিত্রের নিগূঢ় তত্ত্বটিকে, যেন নিজের চেতনাগহনে, উৎকৃষ্ট কবি-দৃষ্টির বলে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই দৃষ্টির শেষ সৃষ্টি সীতারাম; ইহার পরে তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই; তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, শেষে তিনি আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিকের দ্বন্দ্বে, কেবল বাঙালীর নয়—মানুষের শক্তির সীমাকেও স্বীকার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচরিত্র-রচনা-কালেও তিনি পুরুষের চরিত্রকে যে মহিমায় মণ্ডিত দেখিয়াছিলেন,

অথবা 'দেবী চৌধুরাণী'তে তিনি যে তত্ত্বের আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়াছিলেন—শেষে ভগবদ্গীতার গূঢ় মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া—তিনি আর জীবনকে ঠিক সেই পূর্ব্বের দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই। তাই এই উপন্যাসে বাঙালী গঙ্গারাম বুদ্ধিমান ও শক্তিমান হইয়াও প্রবৃত্তির অনলে নিমেষে ভস্মীভূত হইয়া গেল। বীর সীতারামও তেমনই আরও গভীরতর দ্বন্দ্বে, উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া পূর্ণ-পরাজিত হইয়াছে; এবং 'শ্রী'র ভূমিকায় শক্তিরূপিণী নারীও আত্মজয় করিতে গিয়া—যে দাম্পত্য-প্রীতিকে বঙ্কিমচন্দ্র এত উচ্চে স্থান দিয়াছেন—তাহাকেও ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্য্যন্ত নিজেই যেন পরাজয় স্বীকার করিয়াছেন, অথবা জীবনের আদি-অন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রাণের প্রবলতম প্রবৃত্তির উপরে, কোন দিক দিয়াই আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই, তাই পূর্ব্ববর্ত্তী নায়কদিগের মত সীতারামের পুরুষ-প্রবৃত্তি পরাজয়েও জয়লাভ করে নাই—অগৌরবের ধূলিশয্যায় বিলীন হইয়াছে। সীতারাম পশুপতিরই আর এক দিক; বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী-চরিত্রের এই দিকটিকে কখনও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই; শেষে বুঝিয়াছিলেন, প্রকৃতিই সর্ব্বত্র প্রবল, এবং জাতির প্রকৃতিকে ব্যক্তিও অতিক্রম করিতে পারে না। এক দিকে যেমন শ্রীভগবানের সেই উক্তি—

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ। (২।৬০)

তেমনই, গীতাকার ও সোপেনহায়রের উক্তি মিলাইয়া তিনি নিঃসংশয় হইয়াছিলেন যে—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি। (৩।৩৩)

বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই বিবেকানন্দ—বাঙালী-চরিত্রের আর এক অভিনব বিকাশ! এ বাঙালী ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্যকে মানিবে না—আত্মার বন্ধন-ভয় একটা কুসংস্কার মাত্র। ভোগ ও ত্যাগ, কোনটারই পৃথক মূল্য নাই, সেই ভোগ ও ত্যাগ যাহার সেই পুরুষের আত্মমর্য্যাদাবোধ ভিন্ন আর কিছুরই কোন মূল্য নাই। পুরুষের সেই পৌরুষই প্রকৃতিকে অগ্নিশুদ্ধ করিয়া তাহার সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তিনী করিয়া রাখে। যে ভাবাতিরেক বা ইন্দ্রিয়মোহ বাঙালী-চরিত্রের একটি শোচনীয় বৈশিষ্ট্য, যাহা

বঙ্কিমচন্দ্রের অত্যুচ্চ ভাবদৃষ্টিকেও কখনও নিশ্চিন্ত হইতে দেয় নাই, বিবেকানন্দের জীবনে সেই ভাবাতিরেকের সঙ্গে জ্ঞানের দুর্জ্জয় সাহস যুক্ত হইয়াছিল, তাঁহার হৃদয়বৃত্তি যেমন প্রবল—আত্মজয়ের আগ্রহও তেমনই দুর্দ্ধর্ষ ছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া, হৃদয়দৌর্ব্বল্যকে পদাঘাত করিয়া, এই বাঙালী সন্ন্যাসী হৃদয়াবেগকে আত্মিক শক্তির পর্য্যায়ে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন, এবং বীরের মত ভোগ করিবার নীতিকে, সমুদ্র-শোষণ-পিপাসার শক্তিকেই আত্মার মুক্তি-সাধনার প্রথম সোপান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ইহাও বাঙালীর স্বধর্ম্ম-সম্মত সাধনা—শাক্ত ও বৈষ্ণবতন্ত্রের অপূর্ব্ব সমন্বয়!

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, যেমন বিবেকানন্দের আবির্ভাব, তেমনই ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দের তিরোভাবের প্রায় অব্যবহিত কালে ১৯০৪ হইতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত উদয় আরম্ভ হইয়াছিল। তখন দেশের আকাশে বাতাসে কালবৈশাখীর ছায়া ঘনাইতে শুরু করিয়াছে, রাজনীতির আগুন-খেলা আরম্ভ হইয়াছে। সেই আগুনে রবীন্দ্রনাথ ক্ষণিকের জন্য যে আলোক যুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই, আগুনই বাড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহার তাপে বঙ্কিম-বিবেকানন্দের মন্ত্র কেবল বাষ্প-বেগের সৃষ্টি করিতেছিল, রবীন্দ্রনাথের অতিশয় সাত্ত্বিক শুভ ও সত্যের আদর্শ সেই অবশ আত্মহারা ভাবের আবেগ দমন করিতে পারে নাই। শেষে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তার মোহ ত্যাগ করিয়া যখন বিশ্বাত্মীয়তার ভাব-সাধনায় মগ্ন হইলেন, তখন বাঙালীর স্বধর্ম্মকে সৎপথে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য আর কোন কর্ম্মযোগী নেতার আবির্ভাব হইল না। সেই কালের যজ্ঞক্ষেত্রে যে আর এক পুরুষের আকস্মিক আবির্ভাব হইয়াছিল, তিনিও অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া পর্ব্বতগুহায় অদর্শন হইলেন। কেবল রবীন্দ্রনাথই শেষ পর্য্যন্ত সম্মুখে বিদ্যমান রহিলেন, কিন্তু তাঁহার সাধন-মন্ত্র এ যজ্ঞের উপযোগী না হইয়া বরং তাহার প্রতিবাদী হইয়া উঠিল, যজ্ঞও ক্রমে দক্ষযজ্ঞে পরিণত হইল। অবশেষে বাহির হইতে এমন এক ব্যক্তির ডাক আসিল যাহার সহিত বাঙালীর আত্মার সগোত্রতা নাই; সে বাণী একপ্রকার সন্ন্যাসের বাণী, সে বাণী—আত্মপ্রতিষ্ঠার নয়, আত্মনিগ্রহের বাণী। কিন্তু তখন বাঙালীর সেই পোলিটিক্যাল আগুন-

খেলার নিষ্ফল পরিণাম প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, অতএব সেই নৈরাশ্য হইতে মুক্তিলাভের আশায় এবং এক অভিনব আধ্যাত্মিক সংগ্রামের দুর্দ্দমনীয় কৌতূহলে, সে আবার আর এক বিপথে যাত্রা করিল, এবং প্রায় বিশ বৎসর ধরিয়া স্বধর্ম্মের প্রতিকূলে দেহ-মন নিয়োগ করিয়া অবশেষে যখন জড়তাগ্রস্ত হইয়া পড়িল, যখন জাতি-হিসাবে আত্মজ্ঞান আর এতটুকুও অবশিষ্ট রহিল না, তখন সে এক দৃঢ়তর পরধর্ম্মকেই একমাত্র মুক্তি-পন্থা মনে করিয়া, পূর্ণ নির্ব্বাণের মোক্ষলাভ করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে; শুধুই হিন্দুত্ব নয়, বাঙালীত্ব বর্জ্জনের জন্যও সে অধীর হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে স্রোতের আবিলতা পরিহার করিতে গিয়া স্রোতকেই অস্বীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে স্রোতও আর নাই, সামান্যতম প্লাবনেও নিম্নভূমির মত সমগ্র বাঙালী-জীবন যেন একাকার হইতে চলিয়াছে।

তথাপি আশা করি এই আত্মঘাতের প্রবৃত্তি স্থায়ী হইবে না। সত্য বটে, এ যুগের শেষ বাঙালী ঋষি-কবি জাতির পরিবর্ত্তে বিশ্বমানবের বন্দনাগান গাহিয়াছেন, কিন্তু তাহাতেও যে ভাবতান্ত্রিক আদর্শবাদ রহিয়াছে তাহা বাঙালী ভিন্ন আর কাহারও কণ্ঠে এমন অধ্যাত্ম-গভীর উদাত্ত স্বরে উদ্গীত হইতে পারিত না। রবীন্দ্রনাথ যজ্ঞকালের নয়, যজ্ঞ-শেষের স্নান-মন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। সেদিন এখনও আসে নাই; বঙ্কিমচন্দ্র এ স্নান-মন্ত্র কখনও বিস্মৃত হন নাই, বিবেকানন্দ এই মন্ত্রকেই হোমমন্ত্র করিয়াছিলেন; অতএব ইহা বাঙালীর স্বধর্ম্মের পরিপন্থী নয়। তথাপি রবীন্দ্রনাথ কোনরূপ তান্ত্রিক-সাধনার পক্ষপাতী না হইয়া এই যে বৈদান্তিক যোগসাধনাকেই একমাত্র মুক্তিপন্থা বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি তাঁহার জন্মগত বাঙালী-সংস্কার বর্জ্জন করিতে পারেন নাই। বৈদান্তিক হইলেও তিনি বৈষ্ণব, তাই তাঁহার ব্যক্তিগত সাধনার ফল যেমনই হউক, তিনি বাঙালীর জন্য বাংলা ভাষায় ভাবের যে রূপ-বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন তাহাতেও এ জাতির সম্যক আত্মবিস্মৃতি কখনও ঘটিবে না, কারণ, সে ভাষা শীঘ্র মরিবে না। এই ভাষাই প্রাণের নিশ্বাস-বায়ুকে সঞ্জীবিত রাখিয়া বাঙালীর আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রকাশের উপায় হইয়া থাকিবে। যে জাতি এহেন ভাষার অধিকারী হইয়াছে, জীবিত জগজ্জন-সভায় তাহার আসন কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

উদ্যোগ-পর্ব্বের কাব্য

১। বন্দনা। মরণ যখন ঘনিয়ে এল মনের মানুষ কইছে তখন কথা,
রহস্যময়, এ বিচিত্র লীলা তোমার বুঝতে পারি না কো।
ভয়ে যখন ভাঙছে স্বপন তখন কেন স্বপ্ন-ব্যাকুলতা,
শ্মশান-ভূমির ধূসরতা শ্যামল-শোভায় মিথ্যা কেন ঢাকো?
আজো দেখি কল্পলোকের দূতেরা সব করছে আনাগোনা,
আকাশ-পথে ছিপ ফেলে কি আজকে তারা-ধরার সময় হ'ল—
ছিঁড়েছে জাল এখন কেন নতুন ক'রে চলেছে জাল বোনা?
নয় যাহা সত্য যাহা দেখাও তাহা, মোহাবরণ তোল।
অপরূপকে দেখেছি শস্যসবুজ ধানে, নীলের গভীরতায়,
দেখেছি তায় তুষারধবল আকাশ-ছোঁওয়া হিমাচলের চূড়ে,
দেখেছি তায় নিশীথরাতে বধূর যখন ঘোমটা খ'সে যায়,
সদ্যমুকুল-আমের ডালে কোকিল ডাকে ব্যাকুল-করা সুরে।
দেখেছি তায় মেঘলা দিনে পেখম-মেলা অধীর শিখীর নাচে,
মধ্যদিনের প্রখর দাহে আলিসাতে কপোত-কূজন মাঝে,
মায়ের স্তনে মুখটি রেখে দেখেছি তায় শিশু যেথায় বাঁচে,
দেখেছি তায় পাখীরা সব ফেরে যখন ক্লান্ত পাখায় সাঁঝে।

বজ্রানলে পৃথ্বী জ্বলে, বহ্নিজ্বালা ছড়ায় দিকে দিকে,
এমন দিনেও মনের মানুষ কইছে কথা সেই পুরাতন ভাষে?
রহস্যময়, বাণী তোমার রক্তধারায় যেতেছ আজ লিখে,
শূন্যপথে তানে আমার সেই বাণীরই আভাস যেন আসে।
ভাঙাগড়ার লীলায় তোমার রুদ্রবীণা শুনতে আমায় দাও,
তোমার শান্ত মধুর লীলা জীবন ভ'রে অনেক দেখিলাম—
আজকে প্রভু, সেই আবরণ কঠিন হাতে তুমিই তুলে নাও,
নয়ন ভ'রে দেখি এবার সেই মধুরের ভীষণ পরিণাম।

২। "পরিস্থিতি"। এমনই করিয়া দিন যাবে কি?
ফাঁকা ফাঁকা খালি খালি ভয়ে ভয়ে চালাচালি,
চলিছে না কোনো চাল সাবেকী।
থমথম করিতেছে গমগমে রাস্তা,
কাঁপিছে সমান ভয়ে শাসিত ও শাস্তা,
তেছরা কাটিয়া মাটি কত আগলাবে ঘাঁটি,
বালিতে হালেতে পানি পাবে কি?

এই হাল কত কাল থাকবে ?
এল এল, ওই ওই, হেপা ঘুই, হোপা রই—
শাক দিয়ে কত মাছ ঢাকবে ?
শাশ্বত কিছু নয়, দৃশ্যত বুঝেও,
ঢাকছ ও পোড়ামুখ পাইডার রুজেও,
মুছবে চোখের জলে তার আয়োজন চলে,
বার বার কত আর মাখবে ?

দৈন্য স্বীকারে নাই লজ্জা,
সোজাসুজি দাও ব'লে, "কোল টানি নিজ কোলে,
রাখিতে আপন মেরু মজ্জা।"
আমরা বৃথাই থাকি তোমাদের ভরসায়,
না মেলে ছাতাই যদি রৌদ্রে ও বরষায়
ভাল আর নাহি লাগে পুরাতন অনুরাগে
প্রিয়-রুচি-অনুযায়ী সজ্জা।

মিথ্যা তোমায় বঁধু দুষছি,
মাংস খাইতে চাই, সুতরাং আমরাই
জোড়া জোড়া পাঁঠা কিনে পুষছি।
প্রয়োজন হ'লে ধ'রে বলি দিই খড়্গে,
পাঁঠারে শুনিয়ে বাল, "চলিয়াছ স্বর্গে"—
কভু কি বলেছি কেহ দুর্বত মোদের স্নেহ,
ছলে বলে নিজেদেরি তুষছি ?

অসময়ে বৃথা অনুশোচনা,
আজো প্রিয় তোমরাই, তোমাদেরই মুখ চাই—
মোদের নয়ন-জল মোছ না।
তাই দাও যা এনেছ আমাদের ভোলাতে,
দাঁড়ে বাঁধা কাকাতুয়া তুষ্ট যে ছোলাতে
যাই তার দাও নাম, পারি না হইতে বাম—
রৌদ্র না হয় কভু জ্যোছনা।

৩। আবগারি। এস নেশা করি, বুঁদ হয়ে যাই, হাত-পা-মাথার যা খুশি হোক,
আসছে মুক্তি, এই তো সময়—হয়ে নাও আগে বিগতশোক।
ব্র্যাণ্ডি হুইস্কি নাই যদি মেলে, যোগাড় হবেই পচুই তাড়ি
ধেনো খাঁটি আর সিদ্ধি মোদক—ত্বরিতানন্দে পেলে কি ছাড়ি ?

এ "পরিস্থিতি"তে মোদের মাত্র এক পথ অতি সরল সোজা—
রূঢ় বাস্তব শক্তের হাতে ন্যস্ত করিয়া চক্ষু বোজা।
আমরা দেখিব স্বপ্ন রঙিন নেশার রাজ্যে ভ্রমণ করি,
কালাচাঁদ যদি হ'য়েন সদয় পলকে বাঁচি কি পলকে মরি।
অথবা কোকেন যদি বা রাখেন, অধমতারণ তিনিই ভবে,
দুর্যোধনের ভাঙলেও উরু, এঁদের কৃপায় রাজাই রবে।
শাস্ত্রে কোথাও নাই মানা, দেখ নার্ভাস হ'লে ব্র্যাণ্ডি খেতে
ডাক্তারে দেয়, মৃত্যুশীতল বক্ষ চকিতে ওঠে যে তেতে।
এমন সুযোগ পাব কি কখনো, না যদি অদ্য সদ্য করি
সাদা চোখে দাবা কাবায় টেঁক্কে কেমনে বা শোর্য বক্ষ ধরি ?
ভেঙেচুরে ছ'ড়ে যাবেই অঙ্গ, বাঙ্গ করিব তাহারে কিসে—
তেলের সঙ্গে জল তবু মেশে, নেশার সঙ্গে ভয় না মিশে।
অতএব এস, বুঁদ হয়ে যাই, এ সুযোগে কেন পস্তে মরি,
রেস্ত নেই কো ? রোস তো বন্ধু, গুলি-গুলাদের স্মরণ করি।
দম দিয়ে নাও ভ্রম হবে তুমি তুখ্‌ত-তাউস জাহাঙ্গীর,
এই তো অসার খলু সংসার, নেশা আশ্রয়, নেশাই থির।

৪। সমাধান। মাগো, আমরা পালিয়ে এলাম চ'লে,
বাবা কেন রইল কলকাতায়।
কখন দেখ নিলে আমায় কোলে,
এল না ঘুম চোখের দুই পাতায়।
কাপসা চোখে ঘুমই কেমন ক'রে,
যতই কেন দোলাও মাগো জোরে,
মিথ্যেমিথ্যে বকছ তুমি মোরে
বুদ্ধি তোমার একটুও নাই মাথায়,
নইলে তুমি আসবে কেন চ'লে,
বাবা যখন রইল কলকাতায়।

বলছ, মোদের মাথায় পড়ত বোমা,
বোমারা সব পোষা কি মা খাবার ?
আমরাই কি দোষ করেছি ওমা,
বোমা কি ছাই আমাদেরই খাবার !
ওরা কি মা শুধুই ছেলেধরা,
ওদের নামে বেঁধেছে কেউ ছড়া ?
তুমি কেন পালিয়ে এলে ত্বরা
নেই কো তাড়া আজো ফিরে যাবার।

তেমন যদি ভীষণ হয় মা বোমা,
বোমারা সব পোষা নয় তো বাবার।

এসেছি মা, কতদিন যে হ'ল,
প্রথম প্রথম লেগেছিল ভালো,
এখন কেবল দুচোখ ছলোছলো
চোখের জলে ভিজছে মীরার গালও।
সকাল-সন্ধ্যা ব'সে ঘরের কোণে
বাবার কথাই পড়ছে খালি মনে,
ডাকছি তাঁকে সমানে দুই বোনে,
টেলিফোনে বলছি, হ্যালো হ্যালো।
পাই নে জবাব, দুচোখ ছলোছলো
চোখের জলে ভিজছে মীরার গালও।

দাদা দিদি—ওরাই আছে বেশ,
বই পড়ছে, করছে কেবল সাজ,
আমি ভাবছি, কবে হয় মা শেষ,
জ্ব'লে পুড়ে সর্ব্বনেশে বাজ।
দিন রাত্তির মন যে কেমন করে,
চল মা যাই আবার ফিরে ঘরে—
তুমি দেখো বাবায় পেলে পরে
নষ্ট একটু করব না তাঁর কাজ—
দাদা দিদি—ওরাই আছে বেশ,
বই পড়ছে, করছে কেবল সাজ।

হ্যাঁ মা, ওদের নেই কি মীরা রমা,
তাদের ছেড়ে আসছে কেমন ক'রে?
দেখলে মোদের তাদের ভাববে তো মা
দেখব তখন বোমা কেমন ছোঁড়ে।
ফিরে চল কলকাতাতে যাই,
আমরা থাকলে একটুও ভয় নাই,
রেখেই দেখ আমার কথাটাই
রওনা হয়ে চলই না কাল ভোরে।
অবাক হয়ে বাবা বলবে, রমা,
কলকাতাতে এলে কেমন ক'রে।

ছোট গল্প

১

চৈত্র মাস। রৌদ্রের তেজ বেশ বাড়িয়াছে। দ্বিপ্রহরে উত্তর দিকের বারান্দার কোণটা শীতল। ভূরিভোজনান্তে একটি কেদারায় অঙ্গ প্রসারিত করিয়া সেই কোণটি আশ্রয় করিয়াছি। হস্তে খবরের কাগজ আছে, তন্দ্রাবিষ্ট-নয়নে মনুষ্যজাতির পাশবিকতার কথা পাঠ করিয়া বর্ত্তমান সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া উঠিতেছি, মনে হইতেছে, আমরা ভারতবাসীরা কোন কারণেই বোধ হয় এমন নৃশংস বর্ব্বর হইয়া উঠিতে পারিব না, যে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি আমাদের শোণিতধারায়—। হঠাৎ কাগজটা হাত হইতে পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিলাম। ঢুল ধরিয়াছিল। উঠিয়া বসিতেই নজরে পড়িল, সম্মুখের তপ্ত পথ দিয়া জীর্ণ মলিন বসন পরিহিত একজন পথিক একটা প্রকাণ্ড বস্তা মাথায় করিয়া পথ অতিবাহন করিতেছে। দুঃখ হইল। এই দারুণ রৌদ্র, মাথায় অতবড় বস্তা! নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলাম। লোকটি আমার বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া আর পারিল না, বস্তাটা মাথা হইতে নামাইয়া রাখিয়া হাঁপাইতে লাগিল। অদ্ভুত চেহারা! মাথায় রুক্ষ চুল, মুখময় কাঁচা-পাকা গোঁফ-দাড়ি, চোখে নিকেলের চশমা, মাথায় পাগড়ি, গায়ে জামা নাই, খালি পা।

হঠাৎ এ কি! খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিলাম। শেষটা উঠিয়া দাঁড়াইতে হইল। বস্তাটা নড়িতেছে! বেশ, নড়িতেছে। গেট খুলিয়া বাহির হইয়া গেলাম। কাছে গিয়াও দেখিলাম, সত্যই নড়িতেছে। বস্তার মুখ কষিয়া বাঁধা, ভিতরে কি আছে দেখা যায় না।

কি আছে ওর ভেতর?

কুকুরবাচ্চা।

কুকুরবাচ্চা ?

হ্যাঁ। কুড়িটা কুকুরবাচ্চা।

বেশ নির্ব্বিকারভাবে উত্তর দিল।

বস্তায় কুকুরবাচ্চা পুরেছ কেন ?

রাত্রে ঘুমুতে দেয় না, বড় বিরক্ত করে। গঙ্গায় ফেলে দিতে যাচ্ছি।

বল কি ?

বস্তাটা আর একবার নড়িয়া উঠিল।

পাগল নাকি তুমি ? খুলে দাও।

বড্ড বিরক্ত করে বাবু।

বস্তাটা আবার নড়িল।

দম বন্ধ হয়ে ম'রে যাবে যে এই গরমে। খুলে দাও শিগগির।

নিজেই হেঁট হইয়া বস্তার মুখটা খুলিতে লাগিলাম। লোকটা বাধা দিল না। কোমরে হাত দিয়া ঘাড়টা একটু কাত করিয়া স্মিত মুখে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। রাস্তায় লোক জমিয়া গেল। দুই-একজন বলিল, লোকটা সত্যিই পাগল। ভিন্ন গ্রামে থাকে।

২

কাঁই কাঁই কাঁই কাঁই—কেঁউ কেঁউ কেঁউ কেঁউ—

কুড়িটা কুকুরশাবকের আর্ত্তকণ্ঠ নৈশ অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিতেছে। প্রত্যেক শাবকটিই সবেগে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া সজোরে ভূমিতে নিপাতিত হইতেছে। নিপাতিত করিতেছি আমিই। শুইতে গিয়া দেখি, কুড়িটাই আমার বিছানায় কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে! কি আপদ!

"বনফুল"

ভয়

অন্ধকারের কুক্ষি চিরিয়া পন্থা চলেছ কেউ ?
শঙ্কাহীন শঙ্কাকঠিন পথ ?
ত্রাসে নীরন্ধ্র অন্ধকারেরো বক্ষ সঘনে উঠিতেছে কেঁপে কেঁপে—
চিন্তার শ্বাস আসিছে রুদ্ধ হয়ে ;
অবশ চরণ প্রতি বিক্ষেপে গতির পক্ষাঘাতে
কঠিন কাঁকর-পাথরের বুকে আছাড়ি আছাড়ি পড়িছে ছন্দহারা,
পদাহত ধূলি রুখিয়া উঠিছে বুকে মুখে মস্তকে,—
কবর ফুঁড়িয়া যেন পিশাচেরা সবেগে হানিছে মৃত্যুর পিচকারি।
ত্রস্ত পথিক চলেছে বিপদ-বন্ধুর দূর পথ।
জনবাসহীন ধুধু প্রান্তর আবরি অঙ্গ নিষ্ঠুর কালো বাসে
ত্রাসদুর্ব্বল পথিকে টানিছে—রক্তে তাহার অক্টোপাসের ক্ষুধা।
শনশন করে রাত্রি দুপুর সম্মুখে কালো পথ—
অবশ পথিক আগাইয়া চলে মরণের মুখে যেন ;
দাঁড়ায়ে ভাবিতে নাহি তার অবসর,
পশ্চাতে তার শঙ্কার দল গ্রাসিবার লাগি করিছে অনুসরণ।

সম্মুখে ঐ 'অগেয়ার সাঁকো' নয় ?
দিন দুপুরেও যার পাশে যেতে ছমছম করে দেহ।
লক্ষ প্রবাদ উঠেছে যাহার বক্ষ কেন্দ্র করি ;
খুনে 'মানুষুরে' যত
হেথায় করিয়া আত্মগোপন কত প্রাণ নিয়ে খেলিয়াছে ছিনিমিনি,
খুনে খুনে এর বুক হয়ে আছে রাঙা ;
যুগ যুগ ধ'রে ডাকাত-দলের প্রিয় এই স্থান জমায়েত-বস্তির।

পথের দুধারে জাম-অর্জ্জুন মাথায় মাথায় ঠেকায়ে দাঁড়ায়ে আছে,
তারি মাঝখানে ছোট্ট একটি সাঁকো,

সড়কের বুকে যেন তুলিতেছে মড়কের হাহাকার !
মাথার উপর জড়িত কণ্ঠে সাড়া দিল এক তন্দ্রিত দাঁড়কাক।
তারও কি কঠিন কণ্ঠ হয়েছে কুণ্ঠিত শঙ্কায় !
বুঝি আসন্ন বিপদবার্ত্তা জানাইল সঙ্কেতে !
পথের নিম্নে বনতলে ও কি খসখস করে নয় ?
খুনেরা কি তবে ?—লুপ্ত হইল সাহসের শেষ বিন্দুটি পান্থের,
পাশে চাহিবার শক্তি নাহিক তার,
চক্ষু দুটিরে মুদি
ভয়-মুমূর্ষু পথিক চলিল প্রাণপণ দ্রুতপদে ;
নিঃসাড়ে যেতে চাহে,
শঙ্কা-বেতাল চরণ তাহার অস্বাভাবিক শব্দই তুলে শুধু ;
টুঁটির পার্শ্বে স্পর্শের হাওয়া করিতেছে যেন স্পষ্ট সে অনুভব।
মাতালের গতি পথিক চলেছে পথে।

'অগেয়ার সাঁকো' পিছনে পড়েছে—ভরসায় করি ভর
নয়ন মেলিয়া দেখিল পান্থ সম্মুখে তার উদাস তেপান্তর ;
তরুগুল্মের চিহ্নও সেথা নাই,
দুটি পঞ্জর যেন প'ড়ে আছে অতিকায় কোন পুরানো কঙ্কালের,
তারি মাঝখানে সরু সে সড়ক মেরুদণ্ডেরই অস্থিখণ্ড যেন।
পিছনের দিকে চাহি একবার, সাবধানে ফেলি একটি দীর্ঘশ্বাস
লঘুতরগতি পথিক সমুখে হইল অগ্রসর।
নৈশ শৃগাল মন্থরগতি সম্মুখ দিয়া পথ হয়ে গেল পার,
থমকি পান্থ দাঁড়াইল সন্ত্রাসে ;
পথের পার্শ্বে দাঁড়ায়ে শৃগাল চাহি ক্ষণকাল রহিল তাহার পানে,
দরদরবেগে ছুটিল ঘর্ম্ম পথিকের সারা দেহে ;
শৃগাল বটে তো ?—চলিল পান্থ যন্ত্রচালিতবৎ।

চিরকুখ্যাত বটতলা ঐ সামনে 'সুঁদিপুরে'র ;
অতি পুরাতন বট—
নির্ম্মূল নিষ্কাণ্ড, কেবল ঝুরিক-স্কন্ধে শাখাপল্লবে ধরি
দাঁড়ায়ে রয়েছে তারি বক্ষের কাহিনীগুলির মত ;
পিশাচ-দানার আরামের আস্তানা।
শঙ্কার ঘাঁটি দুটিই পড়েছে পিছে ;
চলিল পথিক আরো লঘুতরগতি।
দূরে সাঁওতাল-পাড়ার কুকুর নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে হানিল সাড়া,
একটা ঝলক শীতল বাতাস ব'য়ে চ'লে গেল প্রেত-ফুৎকারবৎ,
শিবরাত্রির ব্রতদুর্ব্বল ভীতি-বিহ্বল পথিক কাঁপিল ভয়ে।

পথ বেশি দূর নাই,
রাত্রি মাত্র দণ্ড কয়েক বাকি,—
পথিক থমকি দাঁড়াল তাহার চিরপরিচিত শ্মশানের পাশে আসি ;
নগ্নবক্ষ মহাশ্মশানের গুরুগম্ভীর নিথর পড়িয়া আছে।
দূরে 'লা-ঘাটা'র ঘাটে
শিবরাত্রির যাত্রী কে যেন বলিয়া উঠিল, জয় শিবশঙ্কর !
শুষ্ক একটা অর্জ্জুন-ডালে শকুনি-মিথুন ঝটপট করে পাখা,
শ্মশান-শিবার কণ্ঠে জাগিল সাড়া,
পথিকের বুক সবেগে উঠিল কাঁপি,
সারাদেহে উঠে ঘন ঘন তার রোমাঞ্চ-শিহরণ ;
শুষ্ক কণ্ঠ চিরিয়া তাহার অস্বাভাবিক উঠিল উচ্চধ্বনি—
জয় শিবশঙ্কর !
শঙ্কা আসিল শঙ্কর-রূপ ধরি,
সঙ্কট হ'ল সঙ্কটত্রাণ শঙ্কাবারণ শিব।

শ্রীকমলাকান্ত কাব্যতীর্থ

উনপঞ্চাশ নম্বর মেস

[Mess No. 49]

—চরিত্র—

অক্ষয় হালদার—অবিবাহিত প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক। বিশুষ্ক বক্সী
ম্যানেজার—উনপঞ্চাশ নম্বর মেসের পরিচালক। কেতন নন্দী
চিদ্‌ঘনানন্দ—সন্ন্যাসী ও মেসের অধিবাসী। মদন মিস্ত্রির
গোবর্দ্ধন—মেসের চাকর। ফুলু চাটুজ্জে
বিরূপাক্ষ—পূর্ব্ববঙ্গীয় ভদ্রলোক। চপলা ঘোষ
} অতি-আধুনিক সাহিত্যিক-দল

ক্ষেমঙ্করী—পাশের বাড়ির দাসী
প্রাণায়াম, ধ্যানেশ্বর, তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি

মেসের কক্ষ—ম্যানেজারের অফিস

দুইখানি চেয়ার, একটি ভাঙা টেবিল, দেয়ালে ক্যালেণ্ডার, টেবিলের উপর রাশিকৃত পুরাতন ফাইল, একটি কোণে একটি কুঁজা ও জলের গেলাস এবং নানাপ্রকারের জিনিস-পত্র পড়িয়া আছে। ম্যানেজার কি লিখিতেছিল, সহসা লেখা বন্ধ করিয়া সম্মুখের আসনে অবস্থিত অক্ষয়বাবুর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল

ম্যানে। সেসব কোন-কিছু অসুবিধে আপনার হবে না অক্ষয়বাবু। বাড়িতে আপনি যে সুবিধে না পান, আমাদের এই ৪৯ নম্বর মেসে দিন তিনেক থেকে দেখুন, মনে হবে, যেন জমিদারি করতে করতে মহল তদারকে এসেছেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—ঘূর্ণায়মান বা অঘূর্ণায়মান রঙ্গমঞ্চে অল্পক্ষণের জন্য অভিনয় করা চলিবে। স্থিত-রঙ্গমঞ্চে পরে পরে চারিটি দৃশ্য থাকিলেই চলিবে—দৃশ্যান্তরের সময় আলো নির্ব্বাপিত করিয়া যন্ত্র-সঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকিলে ভাল হয়—রঙ্গমঞ্চের সম্মুখের পর্দ্দা ধীরে ধীরে টানিয়া অতি দ্রুত দৃশ্যের মালপত্র সরাইয়া ফেলিলে দর্শকের দেখিবার ও অভিনয়ের সৌকর্য্য-বৃদ্ধির সুবিধা হইবে। যে-কোন দল যখন তখন এই রঙ্গ-নাট্য অভিনয় করিতে পারেন। ভদ্রতার খাতিরে শঃ চিঃ সম্পাদককে একবার জানাইলে ভাল হয়।

কথাটা শুনিয়া অক্ষয়বাবু একটু দেঁতো হাসির সহিত সলজ্জভাবে বলিলেন

অক্ষয়। না না, ম্যানেজারবাবু, সেসব অসুবিধের কথা আমি ভাবছি না, আমি শুধু ভাবছি যে,—দেখুন, আমি একটু নির্জ্জনতা-প্রিয় লোক; নিজে একটু ধর্ম্মটর্ম্ম চর্চ্চা করি, তাই—সকাল বিকেল অবশ্য অফিসটাতেই কেটে যাবে,—বেশি ডিস্টার্‌বেন্স না হ'লেই আমি খুশি।

ডিষ্টার্‌বেন্স কথাটা শুনিয়া ম্যানেজার চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ফেলিল

ম্যানে। ডিস্টার্‌বেন্স! কি বলছেন? আপনার ধর্ম্মচর্চ্চার সঙ্গী আপনি এখানে যা পাবেন, কলকাতার কোন ধর্ম্মশালায় আপনি তা খুঁজে পাবেন না—এ আমি জোর গলায় আপনাকে ব'লে দিতে পারি—হ্যাঁ।

অক্ষয়। এখানে সে রকম লোকও সব আছেন নাকি?

ম্যানেজার আরও যেন বিস্মিতভাবে কহিল

ম্যানে। আছেন মানে? ঠাসা। পাটের গুদোমের মত একটা ঘরে সব ঠেসে রেখে দিয়েছি। এয়ার-রেড হ'লে সব যদি মরে, তবু ও ঘরের লোকগুলো বেঁচে থাকবে। আমি রীতিমত স্ট্রং-রুমে সবাইকে পুরে রেখে দিয়েছি। আমাদের আর কি আছে বলুন ধর্ম্মটি ছাড়া? ওইটি যদি যায়, তা হ'লে তো ভারতবর্ষই গেল!

অক্ষয়। যাক, শুনে বড় খুশি হলুম ম্যানেজার মশাই।

ম্যানে। খুশির এখন হয়েছে কি অক্ষয়বাবু! এর পরে তিন দিন যাক, আপনি আর এ জায়গা ছাড়তে চাইবেন না। কৃচ্ছ্রসাধন করতে চান তার ব্যবস্থা আছে, সাহিত্য-সাধন করতে চান তার আয়োজন প্রচুর, যেসব বই লাইব্রেরিতে আমরা রেখেছি, তার কপি আর অন্য কোথাও খুঁজে পাবেন না—দু-একখানা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ছিল, বোধ হয় এদ্দিনে সেসব উড়ে-পুড়ে গেছে।

অক্ষয়। বলেন কি?

ম্যানে। বলি যা, তা ঠিক। আপনার যে ঘরে থাকবার ইচ্ছে আপনি থাকতে পারেন। জীবনে—ওই তো বললুম আপনাকে—

ভুলতে পারবেন না মশাই, এই মেস নম্বর ফর্‌টিনাইনকে। ধর্ম্মচর্চ্চা, সাহিত্যচর্চ্চা, রাজনীতিচর্চ্চা, শরীরচর্চ্চা, মায় প্রেমচর্চ্চা সমস্ত পাশাপাশি চলছে, অথচ মনে করুন, কারুর সঙ্গে কারুর ক্ল্যাশ হচ্ছে না। শুরু হচ্ছে একসঙ্গে, শেষ হচ্ছে এক টাইমে। শুধু চাকররা গিয়ে মাঝে মাঝে দরজায় শেকল দিয়ে আসে।

অক্ষয় বিস্মিত হইলেন

অক্ষয়। শেকল কেন?

ম্যানে। ওটা ডিফেন্সের জন্যে করতে হয়েছে। কারণ মানুষের ভাবের আতিশয্য হ'লে মাঝে মাঝে সব ঘুলিয়ে যায় কিনা! এক ঘরের লোক আর এক ঘরে পট ক'রে চ'লে গেলেই বিপদ! দু-একবার তা হয়েছেও মশাই। একবার একটি ধর্ম্মের লোক সাহিত্যের ঘরে ঢুকে পড়লেন, ওঃ, সে এক বিপদ! আজকালকার সাহিত্য, সে ধর্ম্মকে মানবে কেন? সে যাচ্ছে-তাই ক'রে ব'কে যাচ্ছে, সেখানে গিয়ে ঢুকলেন দাড়িওলা ধর্ম্ম—যখন বেরিয়ে এলেন, দেখলুম, কোন রকমে ভদ্রলোকের গোঁফটা বেঁচেছে, দাড়ির একগাছিও নেই। সেই থেকে দরজা বন্ধ করবার নিয়ম হ'ল। ভাল করেছি কি না বলুন?

অক্ষয়। নিশ্চয়। গোলমালটা না হওয়াই বাঞ্ছনীয় বইকি।

ম্যানে। যাক, তা হ'লে ছ মাসের ভাড়াটা—আপনার হ'ল একুশ টাকা ক'রে একশো ছাব্বিশ, আর ধরুন ভর্ত্তি হওয়ার দরুন পনরো—একশো একচল্লিশ, তিন টাকা বাথ-রুম রিজার্ভের আর ছ টাকা স্টোর-রুমে আপনার জিনিসপত্র রাখার ভাড়া। মোট দেড়শো টাকা—দিয়ে দিন, তারপর চেপে বসুন। মনে হবে, রাজার গদিতে উঠে ব'সে আছেন।

অক্ষয়। দেখুন, বাথ-রুমের জন্যে আবার আলাদা ভাড়া ধরছেন, এটা কি রকম?

ম্যানে। মশাই, বাথ-রুমের ভাড়া না দিলে আপনার বিপদই যে সবচেয়ে বেশি। খালি পাবেন কি ক'রে? এক-একজন ঘরে ঢুকলে আর বেরুতে চান? তিনজন ধার্ম্মিক ঢুকলে জটা ভিজতেই তো লাগবে

দু ঘণ্টা, তারপর স্নান, তারপর গা মোছা, চৌবাচ্চায় অবগাহন—পুজো আহ্নিক ইত্যাদিতে হয়ে গেল আপনার অফিস যাওয়া!

অক্ষয়। তা আর দু-চারটে তো বাড়াতে পারেন?

ম্যানে। যখন আধ ডজনে পারি নি, তখন পুরো এক ডজন করলেও পারব না। বাঙালী কলঘরে ঢুকলে, মদ খেতে শিখলে, আর লোকের পেছনে লাগতে পেলে অভ্যেস ছাড়তে পারে না। এ যা ব'লে দিলুম লাখ কথার এক কথা—হ্যাঁ।

অক্ষয়। রিজার্ভ করলে কি আমি কোন স্পেশাল সুবিধে পাব?

ম্যানে। আলবৎ। আপনি আগে বেরিয়ে এলে তবে এঁরা ঘরে ঢুকতে পাবেন।

অক্ষয়। তা ওঁদেরও তো কাজ থাকতে পারে?

ম্যানে। কাজ কচু। বাড়ির সবাইকে এয়ার-রেডের ভয়ে পাঠিয়ে দিয়ে এসে এখন সব ধর্ম্ম নিয়ে পড়েছে।

অক্ষয়। তবে এই যে বললেন, বহু ভাল ভাল লোক এখানে—

ম্যানে। আহা! আপনি কথাটা বুঝছেন না। ধার্ম্মিকেরও তো শ্রেণী আছে? আমার এখানে বকধার্ম্মিকদের জন্যেও তো ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। পাঁচ রকম না রাখলে খদ্দের আসবে কেন? উপরন্তু মনে করুন, এ বাড়ি মন্ত্রপূত করা—

অক্ষয়। কি রকম?

ম্যানে। যতই বিপদ আসুক না কেন, এ বাড়ির কিছু হবে না। যদিও বা মন্ত্র কেউ কাটায়, তা হ'লে অপর ঘর উড়তে পারে, কিন্তু ধর্ম্মের ঘর ঠিক থাকবে। এ ছাড়া মনে করুন, ওপরে পাঁচ থাক বালি—চারিধারে ইয়া মোটা পাঁচিল, প্রত্যেক চৌকির তলায় পাঁচ হাত ক'রে গর্ত্ত। আধ্যাত্মিক, জাগতিক, সান্নিপাতিক সব রকমের প্রিকশান নিয়েছি মশাই। এতেও যদি মারা যান, তা হ'লে আপনার নামে যম ঠিক দিয়ে রেখেছেন বুঝতে হবে।

অক্ষয়। বোধ হয় এই সব করার জন্যেই এই মেসটায় এত ভিড়?

ম্যানে। ভিড় মানে? বায়স্কোপের নতুন ছবির ম্যাটিনী শোতেও এত ভিড় হয় না, ফুটবলের মাঠেও এত ভিড় জমে না—একদিন

তো ভিড় সরাবার জন্যে কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে হ'ল। তাই তো বলছি, আর দেরি করবেন না—এইবেলা ফর্মে সই ক'রে দিন।

অক্ষয়। দিন, যখন থাকতেই হবে, তখন ভাল জায়গায় থাকাই ভাল। বাড়ির সব বিদেশে—এখানকার বাড়িও ছেড়ে দিয়েছি, সেইজন্যে আমার মনে হয়, আমার পক্ষে বোধ হয় এই মেসটাই সুবিধের হবে।

ম্যানে। সে আর বলতে। নিন মশাই, সই করুন।

অক্ষয়বাবু সই করিলেন

থ্যাঙ্ক ইউ। টাকা?

অক্ষয়। এই যে।

ম্যানেজারের হাতে টাকা দিলেন

ম্যানে। মেনি থ্যাঙ্কস। আজ থেকেই তা হ'লে—

অক্ষয়। হ্যাঁ, আজ থেকেই।

ম্যানে। ওরে গোবর্দ্ধন, বাবুকে নিয়ে যা—একতলা ৪৬ নম্বর ঘর—ধর্ম্মমহল।

গোবর্দ্ধনের প্রবেশ

এই যে এর সঙ্গে যান, সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে। আর আপনার জিনিসপত্তর সব ঠিক জায়গায় থাকবে আমাদের ভাঁড়ারে, কিছু ভয় নেই। শুধু দরকারীগুলো পাঠিয়ে দোব 'খন।

অক্ষয়। আচ্ছা, চলি।

অক্ষয়বাবু গোবর্দ্ধনের পিছু পিছু গিয়া একটি কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইলেন

ধর্ম্মমহল

অন্ধকার কক্ষে তিনটি চৌকি পাতা, এক কোণে একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। চারজন ব্যক্তি কক্ষে আছেন—চিদ্‌ঘনানন্দ, ধ্যানেশ্বর, তুরীয়ানন্দ, প্রাণায়াম ইত্যাদি। অক্ষয়বাবু ঘরে ঢুকিয়া প্রথমে কিছু দেখিতে পাইতেছিলেন না, হাতড়াইয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন

গোবর্দ্ধন। বাবু, এই ঘরে চ'লে যান। দরকার হ'লে দরজায় টোকা দেবেন, আমি শেকল খুলে দোব।

অক্ষয়। ওহে, এ যে বড় অন্ধকার!

গোব। পিদ্দিম আছে, এখন আলো থেকে এলেন কিনা, সেইজন্যে ঝাপসা দেখছেন। ও স'য়ে যাবে। আমি বাবু, দরজা বন্ধ ক'রে দিই।

অক্ষয়। ওহে, খাব কি?

দরজায় শিকল দিতে দিতে গোবর্দ্ধন বলিতে লাগিল

গোব। সে ফোকর দিয়ে দিয়ে যাব 'খন। আপনি কোণের তক্তাপোশে এখন শুয়ে পড়ুন।

প্রস্থান

অক্ষয়বাবু হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, সহসা একটি চৌকিতে উপবিষ্ট জটাজুটধারী সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলেন। সন্ন্যাসীর নাম চিদ্‌ঘনানন্দ

চিদ্। কস্ত্বং?

অক্ষয়বাবু চমকিয়া উঠিলেন, কথা কহিলেন না

সাড়া দিচ্ছ না যে, কে তুমি?

অক্ষয়। আজ্ঞে, আমি একজন নতুন লোক, আজকে এখানে এসেছি।

চিদ্। নাম?

অক্ষয়। শ্রীঅক্ষয়কুমার হালদার।

চিদ্। সব খুইয়েছ বুঝি? রেঙ্গুন থেকে আসছ তো?

অক্ষয়। আজ্ঞে না, আমি কলকাতার লোক।

চিদ্। [উচ্চৈঃস্বরে] কভি নেই। কলকাতার লোক এতবড় আহাম্মক হতে পারে না।

অক্ষয়। কি বলছেন মশাই?

চিদ্। বলছি খাঁটি কথা। এখানে আসার চেয়ে সাইরেন বাজলে রাস্তায় বা ছাতে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে চট ক'রে গুলি খেয়ে মরতে পারতে। এখানে যে হাঁপিয়ে মরবে!

অক্ষয়। আপনি এসব কি বলছেন মশাই?

চিদ্। তোমায় এখানে আসতে কে পরামর্শ দিলে?

অক্ষয়। আমার এক বিশেষ বন্ধু বললে যে, এটা খুব ভাল জায়গা।

বাড়ির সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছি বিদেশে, তাই সে আমায় বললে, সস্তায় ভাল জায়গা এই ৪৯ নম্বর মেস—এখানে যাও। তা ছাড়া ম্যানেজার মশাই বললেন যে, এখানে বেশ ভালভাবে থাকা যাবে, কিন্তু যা দেখছি—

চিদ্। সবই মায়া, না? আরে বাপু, মায়াময় জগৎ—এ কথা বোঝাই কাকে? আজ সাত দিন ধ'রে একটা লোক পাচ্ছি না যাকে দুটো কথা বলি! ঐ দেখ না, তিনটি প্রাণী তিনটি তক্তাপোশে ব'সে আছেন, সাড়া নেই! একজন করছেন ধ্যান, একজন গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে কোণে ব'সে আছেন, আর একজন নাক টিপে প্রাণায়াম আরম্ভ করেছেন, আর আমি চিদ্‌ঘনানন্দ একবার চিতপাত হয়ে শুচ্ছি আর ইয়া বড় বড় ছারপোকার কামড়ে উঠে-উঠে বসছি।

অক্ষয়। এখানে আবার ছারপোকা আছে নাকি?

চিদ্। একবারটি শুয়ে দেখ না। যার নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা তাকেও জব্দ ক'রে রাখে। সময় সময় সেগুলো ছারপোকা কি আরসোলা বোঝা যায় না, এমনই বড়। এক প্রাণায়ম ছাড়া আমাদের সব কটাকে তক্তাপোশ থেকে নীচে নাবিয়েছে। কিন্তু তাতেই কি নিস্তার আছে হে, কম্বলের ফাঁকে ফাঁকে ঠিক ঢুকে ব'সে চার্জ ক'রে যাচ্ছে।

অক্ষয়। তা আপনি এখানে কি ক'রে এলেন?

চিদ্। কি ক'রে এলুম? ম্যানেজার ব্যাটাকে জিজ্ঞেস কর। আমি যা কিছু শিষ্যদের কাছে আদায় করেছিলুম, ঐ ব্যাটাই ধাপ্পা দিয়ে খেলে।

অক্ষয়। সে কি?

চিদ্। আর সে কি! যা বলছি আগে শোন, ব'স। [অক্ষয় বসিলেন] গোটা পঞ্চাশ টাকা ব্যাটার হাতে দিয়ে বললুম, বাবা, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, বোমার ভয়ে নির্জ্জনে একটু জপতপ করতে পারছি না, তুমি যদি ব্যবস্থা ক'রে দাও আর দুবেলা খাবারের বন্দোবস্ত ক'রে দাও, তা হ'লে আমি দিনকতক এখানে থেকে যাই। দেখ, ব্যাটা কোথায় আমায় পুরেছে, এখন প্রাণ যায়!

অক্ষয়। তা চ'লে যাচ্ছেন না কেন?

চিদ্। কোন্ চুলোয় যাব বলতে পার? চতুর্দ্দিকে অন্ধকার, চোর, ডাকাত, বোমা—এ সময় যাই কোথা? অতএব ব্যোম ব্যোম ক'রে এইখানেই ব'সে আছি।

অক্ষয়। তা হ'লে আর ম্যানেজারের দোষ দিচ্ছেন কেন?

চিদ্। দোষ দোব না, বল কি? আমার থাকবার কথা ৩৭ নম্বর ঘরে, আমায় কিনা বেটা ৪৬এ পুরে দিলে! এটা তো কৃচ্ছ্রসাধনের মহল, কিন্তু আমি তো যাব ধর্ম্মমহলে।

অক্ষয়। সে কি? এটা কৃচ্ছ্রসাধন-মহল নাকি?

চিদ্। এই মরেছে। তোমাকেও ফাঁদে ফেলেছে তা হ'লে?

অক্ষয়। ফাঁদে ফেলবে কি মশাই? আমি এখুনি একবার ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করব।

চিদ্। দেখা করলেও কিছু ফল হবে না—এক্ষুনি টাকা চেয়ে বসবে। তা ছাড়া আজ রাত্তিরে কোন উপায় নেই—হয় ছারপোকার কামড় খাও, নয় গাঁজায় দম দিয়ে দুটো যুদ্ধের কথা বল শুনি। ঐ নাও, ঘুলঘুলি দিয়ে তোমার খাবার দিয়ে গেল, নিয়ে এসে খাও।

অক্ষয়। প'ড়ে মরুকগে খাবার। আপনি তো আমায় বড় ভাবিয়ে দিলেন মশাই, আমি কি একটা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়লুম নাকি?

চিদ্। সন্দেহের কিছু নেই, তবে সান্ত্বনার কথা হচ্ছে এই যে, এ সংসারে কে জোচ্চোর নয় ভাই? তুমি আমি সকলে। তুমি বাড়ি-ভাড়া কমাবার জন্যে কলকাতার বাসা তুলেছ, কিন্তু বিদেশে যাদের বাড়ি আছে তারা দুগুণো রোজগার ক'রে নিচ্ছে, তোমারই ঘাড়ে ভর ক'রে। তুমি পুত্রপরিবারকে দূরে পাঠিয়ে হালকা থাকবার মতলবে আছ, তোমার ঘাড়ে এই মেস চেপে বসেছে। তোমার মনের মধ্যে যে জোচ্চুরি তা ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। এই ফাঁসই তো মায়া, সেই মায়াতীত ব্রহ্ম ছাড়া তোমার তো মুক্তি নেই দাদা। তুমি বোমাকে এড়াতে চেয়ে দুঃখের লাঘব করতে চাও, কিন্তু দুঃখ তোমাকে ল্যাং মেরে ফেলে দেবে প্রতি পদে। পৃথিবীতে প্রতি-নিয়ত এই সুখ-দুঃখের কিতকিত-খেলা চলছেই।

অক্ষয়। আরে থামুন মশাই, ওসব আর ভাল লাগছে না।

চিদ্। রাগ করছ? আমি সন্ন্যাসী, আমার ওপর রাগ ক'রে কোন ফল নেই বৎস। মান অপমান আমার সমান, তা না হ'লে কোন ভদ্রলোক এই গোয়ালঘরের অধম জায়গায় থাকে? তা ছাড়া সবই তো আমি ত্যাগ করেছি ভাই, এখন শরীরটাকে ত্যাগ করলেই হয়, তবে মনে হচ্ছে, আর মাসখানেক এই মেসে থাকলে তা হতে আর বেশি দেরি হবে না।

অক্ষয়। যাক মশাই, আমার আর আপনার সঙ্গে বকতে ভাল লাগছে না। আপনি বলছেন এক, আর দুঃখ করছেন অন্য। কি রকম সন্ন্যাসী আমি বুঝি না।

চিদ্। শহরের সন্ন্যাসীদের বোঝবার চেষ্টা ক'রো না বাবা। আমরা যোগীও বটে, আবার ভোগীও সত্য—ভোগ কমলেই রোগীদের পর্য্যায়ে পড়ি। আমাদের কাজ গৃহীদের ঘাড় ভেঙে ভাল ক'রে থাকা। তাতে অসুবিধে ঘটলেই তোমাদের চেয়ে বেশি মেজাজ খারাপ হয়।

অক্ষয়। নিজের মত সবাইকে মনে করেন কেন মশাই?

চিদ্। বাবা অক্ষয়, আমি অনেকদিন এই লাইনে আছি বাবা, এর কায়দা-কানুন সব জানা আছে। অধিকাংশ এই; ব্যতিক্রম যে কজনা, তা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। সন্ন্যাসী হয়েছি কেন জান? যা-কিছু পুঁজি-পাটা ছিল, গুরুদেবের উদরে সমর্পণ ক'রে মাত্র কৌপীনটি সার ক'রে ব'সে আছি। তাঁর ভাগ্য ভাল ছিল, আমার মত কয়েকটি শাঁসালা শিষ্য পেয়েছিলেন, কিন্তু আমি যে কটি পেলাম, সে কটি স্রেফ আঁটি। তারা ধর্ম্মতেও কনসেশন চায়। বুড়ো বুড়ো মন্দ হাফ-টিকিটে স্বর্গে যাবার মতলব ক'রে ব'সে আছে। আমিও তেমনই ব্যবস্থা দিচ্ছি। ধর্ম্ম অত সোজায় পাওয়া যায় না বাবাজী।

অক্ষয়। কিছু মনে করবেন না চিতপাতানন্দ স্বামী, আপনি—

চিদ্। ভুল হচ্ছে বাবাজী। আমি চিতপাত নই, চিদ্‌ঘন।

অক্ষয়। ঐ হ'ল ঘনদুধানন্দ স্বামী—

চিদ্। চিদ্‌ঘন।

অক্ষয়। হ্যাঁ, চিদ্‌ঘনানন্দ স্বামী, আমি একজন ধর্ম্মপিপাসু, কিন্তু আপনার মত বোগাস সাধু আমি দেখি নি।

চিদ্। আমার আর কতটুকু দেখেছ বাপু? আমি খাঁটি কথা বলি ব'লে আমার স্থান হয় রাঁচিতে, নয় এই উনপঞ্চাশ নম্বর মেসে। কিন্তু তোমরা কি? তুমি ধর্ম্ম করতে বেরিয়েছ কি হিসেবে শুনি? বিয়ে করেছ?

অক্ষয়। না।

চিদ্। কারণ?

অক্ষয়। বিবাহে বহু বাধা, জোর ক'রে ঘাড়ে ঝঞ্ঝাট নেওয়া।

চিদ্। ও, ঝঞ্ঝাট এড়াবার জন্যেই বিবাহ কর নি? সংসারে তবে আছ কেন? দার্জ্জিলিং পেরিয়ে চ'লে গেলে না কেন সিধে? নিশ্চয় নানারকম হাঙ্গামার ভয়ে? ধর্ম্মকে পেতে চাও ফাঁকি দিয়ে? ইয়াকি! প্রাণের ভয়টা আছে ষোল আনা, নিজের দেহের ভোগ-প্রবৃত্তি আঠারো আনা, তবু চাও ধর্ম্ম করতে? তুমি স্লিট-ট্রেঞ্চে ঢুকেও মরবে।

অক্ষয়। সে কি?

চিদ্। হ্যাঁ, এতে আর সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে এত ধ্বংস হচ্ছে কেন জান?

অক্ষয়। কেন বলুন তো?

চিদ্। সব ধর্ম্মের ঘরে ফাঁকি মারবার চেষ্টা করেছিল ব'লে। আমরা ধর্ম্ম করি তখন, যখন জীবনের সব চান্স নষ্ট হয়ে যায়, দুঃখের সাবমেরিন যখন জীবন-জাহাজকে কাত ক'রে ফেলে, তখন আমরা ধর্ম্মের লাইফ-বোটে উঠে নিজেদের বাঁচাতে চাই। যদি ধর্ম্ম চাও, আমার কাছ থেকে দীক্ষা নাও। আমি দুনিয়ার অনেক-কিছু দেখেছি, আমি তোমায় আলো দেখাব, তুমি খুশি হবে।

অক্ষয়। জীবনটাকে আপনি সত্যি দেখেছেন বুঝছি। সত্যি আপনি আমায় আলো দেখাতে পারবেন?

চিদ্। নির্ঘাত। আগে কিছু বার কর দেখি বাবা, কত আছে?

অক্ষয়। গোটা পাঁচেক।

চিদ্। ওতেই আপাতত চলবে। দাও। [টাকা লইলেন] ঠিক হ্যায়। শোন আমি যা বলি, জীবনটাকে আগে দেখে এস, নিজে বোঝ, ধর্ম্মের জন্যে কতখানি সত্যিকারের আবেগ জেগেছে মনের মধ্যে, তারপর আমি দীক্ষা দোব।

অক্ষয়। জীবনকে কোথায় দেখব?

চিদ্। বেশিদূর যেতে হবে না। আপাতত এই ধর্ম্মগুহার বাইরেটায় গিয়ে দুপাক মেরে এস, আগে ধর্ম্ম কোন্ ধাতু থেকে হয়েছে জেনে এস। ৪৮ নম্বর ঘরে বড় বড় সব আধুনিক সাহিত্যিক আছেন, ওঁদের কাছে জিজ্ঞেস ক'রে এস, জিনিস পাবে।

অক্ষয়। কি ক'রে বেরুব?

চিদ্। কাল সকালেই বেরিয়ে প'ড়ো, যখন দরজা খুলে দেবে। আর এ ঘরে চট ক'রে ঢুকো না, ম্যানেজারকে ব'লে সাহিত্যিক-মহলে জায়গা ক'রে নেবে। আপাতত খেয়ে শুয়ে পড়।

অক্ষয়। বোধ হয় ঘুম হবে না, কারণ এ তক্তাপোশে বড্ড বেশি ছারপোকা, আমি বসতেই পারছি না।

চিদ্। ছারপোকার কামড় সহ্য করতে পার না ছোকরা, তা হ'লেই ধর্ম্ম করেছ! আমি নিজের দেহটিতে রক্ত-চলাচল করাবার জন্যে খাবার খাই, আর ওদের রক্ত খাওয়াবার জন্যে রোজ পোয়াটাক ক'রে আমায় অতিরিক্ত রাবড়ি খেতে হয়। আমার টাকা কম ব'লে ব্যাটা ম্যানেজার আমায় এই কৃচ্ছ্রসাধন-ঘরে পুরে দিয়েছে। তবে মাঝে মাঝে তোমাদের মত দু-একটা লোককে পুরে দেয় এই যা রক্ষে—দু-এক পয়সা যা পাই, তাতে বাজে খরচগুলো চ'লে যায়। নাও, খেয়ে শুয়ে পড়। ঘুম না হয় 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' জপ করতে থাক, ঘুম আসবে। যাক, অনেক বকেছি, কাল আবার এর জন্যে বোধ হয় আধসেরটাক রাবড়ি যাবে।

চিদ্‌ঘনানন্দ শুইয়া পড়িলেন, অক্ষয়বাবু "উঃ-আঃ" করিতে করিতে মাটিতে বসিয়া পড়িলেন। ক্রমশ ভোর হইয়া আসিল। বেলা নয়টার ঘণ্টা বাজিল, দরজা খুলিয়া গোবর্দ্ধন ডাকিতে আসিল। বাহিরে হাস্যমুখে ম্যানেজার দাঁড়াইয়া আছে

গোব। বাবু, বেরিয়ে আসুন, ভোর হয়েছে।

অক্ষয়বাবুকে দেখিয়াই ম্যানেজার বলিল

ম্যানে। কি রকম সার্? কোন কষ্ট হয় নি? আপনি যা চেয়েছেন, পাচ্ছেন কি না?

অক্ষয়। পেয়েছি খুব বড় জিনিসই মশাই, কিন্তু আপনি তক্তাপোশে যা জমিয়ে রেখেছেন, ওঃ! একজিমা না হ'লে বাঁচি।

ম্যানে। হেঃ-হেঃ-হেঃ, ছারপোকার কথা বলছেন? আচ্ছা, ও বেচারারা যায় কোথায় বলুন তো? আপনাদের পাঁচজনের খেয়েই তো ওদের থাকতে হবে। তা ছাড়া মেরে ফেলতুম, কিন্তু ধর্ম্মের স্থানে হত্যা-কাজটা খারাপ হয়। উপরন্তু কীট-পতঙ্গ-দুঃখ-নিবারণী সমিতির প্রেসিডেন্ট মিঃ কানকাটারাম মিচির মশাই এর জন্যে প্রতি মাসে আমাদের মোটা রকম চাঁদা দিচ্ছেন। আমরা কি তা হ'লে করতে পারি বলুন?

অক্ষয়। যাক, সেসব হিসেবে আমার দরকার নেই। আমায় আপনি একটু ভাল দেখে ঘর দিন।

ম্যানে। নিশ্চয় দোব। আপনি ধর্ম্মচর্চ্চার জন্যে একটু ভাল দেখে ঘর চেয়েছিলেন, তাই আমি ঐটির ব্যবস্থা করেছিলুম। কোথায় যেতে চান বলুন? কেরানী-মহল—আর্টিস্ট-মহল—সাহিত্য-মহল সবই তো রয়েছে।

অক্ষয়। আমায় সাহিত্য-মহলেই দিন।

ম্যানে। ভেরি গুড। গোবর্দ্ধন, ৪৮ নম্বর সাহিত্য-মহলে বাবুকে ঠেল।

গোব। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

ম্যানে। যান আপাতত কলে। গোবর্দ্ধন, অক্ষয়বাবুর কলঘর।

গোব। [নেপথ্য থেকে] কলঘরে যে লোক রয়েছেন।

ম্যানেজার চটিয়া বলিয়া উঠিল

ম্যানে। লোক রয়েছেন মানে? ৪ নম্বর কলঘর অক্ষয়বাবুর জন্যে রিজার্ভ করা, সেখানে আবার কে ঢুকল?

গোব। আজ্ঞে, পাকড়াশিবাবু।

ম্যানে। তুই আলসে দিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে যে অবস্থায় বাবু আছে সেই অবস্থায় ধ'রে বার ক'রে দে।

গোব। যে আজ্ঞে।

অক্ষয়বাবু সঙ্কোচের সহিত বলিলেন

অক্ষয়। না না, থাক, আমি না হয় একটু পরে—

ম্যানে। তবে থাক। ততক্ষণ কেনেস্তারা বাজিয়ে ওয়ার্নিং দে, তা হ'লে আপনি বেরিয়ে আসবে। চলুন ততক্ষণ আমার ঘরে, একটু চা-টা খাবেন, তারপর আপনাকে আমি সাহিত্য-মহলে নিয়ে যাব।

অক্ষয়। চলুন।

ম্যানেজার অক্ষয়বাবুকে লইয়া চলিয়া গেল

সাহিত্য-মহল

চার-পাঁচজন সাহিত্যিক বসিয়া আছে—অধিকাংশ তরুণ ও ললিত-লবঙ্গ-লতা ভাব। কেহ বই পড়িতেছে, কেহ লিখিতেছে, কেহ ফাউন্টেনপেনের ডগা নাকে ঠেকাইয়া ভাবিতেছে, একজন ঈজি-চেয়ারে শুইয়া আছে। একখানি চেয়ার খালি পড়িয়া আছে। ম্যানেজার অক্ষয়বাবুকে লইয়া ঘরে ঢুকিল

ম্যানে। মশাই, এঁরই কথা আপনাদের বলছিলুম। অক্ষয়বাবু—বড় ভাল লোক, আপনাদের ভয়ানক ভক্ত, আপনাদের ঘরেই থাকবেন, আলাপ-পরিচয় ক'রে নেবেন। আমি একটু শুধু এঁদের পরিচয় দিয়ে যাই, এঁর নাম বিশুষ্ক-বক্সী, ইনি কেতন নন্দী, ফুলু চাটুজ্জে, চপলা ঘোষ, মদন মিত্তির—এঁরা সব একালের দিগ্বিজয়ী সাহিত্যিক; মস্ত বড় বড় পণ্ডিত, বাংলা দেশের অর্দ্ধেক কলেজের অধ্যাপক এঁরা, কলেজ বন্ধ হওয়াতে সব এইখানেই এসেছেন, নিন, সব আলাপ-সালাপ করুন, আমি চলি। শেকল দিয়ে যাচ্ছি তা হ'লে।

ম্যানেজার ঘরে শিকল দিয়া চলিয়া গেল। অক্ষয়বাবুর নমস্কার ও সাহিত্যিকদের প্রতি-নমস্কার শেষ হইল। বিশুষ্ক বক্সী দুই হাত প্রসারিত করিয়া অক্ষয়বাবুকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইল

বিশুষ্ক। এস হে অতিথি মোদের গৃহেতে
তোমারে বরণ করি। নেবুলার মত
জ্যোতিষ্কপথে ঘুরিতে ঘুরিতে তুমি,
বোমার মতই ব্যোমপথ বেয়ে, বোঁ বোঁ ক'রে পাক খেয়ে,
হঠাৎ যখন এসেছ মোদের ঘরে,
চুম্বনে তবে রাঙা ক'রে দেব গাল!

অক্ষয়বাবুকে বিশুষ্ক জড়াইয়া ধরিল। অক্ষয়বাবু চটিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া কহিলেন

অক্ষয়। আরে মশাই, ছাড়ুন। ও কি?

বিশুষ্ক। রাগ করছেন সার্! আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকদের রীতি সম্ভাষণ করার যা, তা পাবেন না খুঁজে কোথাও। কাননে কান্তারে বস্তিতে, বেণুবনে, ম্যালেরিয়াবিধ্বস্ত কচুরি-পানার ঝাড়ে, ব্রতচারী নৃত্যে, বসন্তের বিকশিত বিকচ পুলিনে।

চপলা। আগন্তুক—আনন্দ—চেয়ার—বসা।

অক্ষয়। আপনারা কি বলছেন, এর তো মানে বুঝতে পারছি না!

বিশু। পারবেন তবু আমাদের বুঝতে মানে, কিন্তু পারবেন না ওঁর, ভাব বিরাট প্রচ্ছন্ন, সাহিত্যের অনাগত যুগের স্টাইল আমদানি করছেন উনি।

অক্ষয়। উনি টেলিগ্রাফিক ভাষায় কথা কন নাকি?

বিশু। মাথা আপনার। বুদ্ধি থাকলে বুঝতেন, উনি আপনাকে দেখে, প্রকাশ ক'রে আনন্দ, বসতে বললেন চেয়ারে আপনাকে। বসুন।

অক্ষয়বাবু হতভম্বের মত বসিলেন

অক্ষয়। কিন্তু এ রকম কথাবার্ত্তা বেশিক্ষণ চালালে আমি তো পেরে উঠব না সার্, যদি কিছু বুঝতেই না পারলুম—

মদন। অধিশ্রয়ণের তরে অভাগা অজিনী
এনে দিতে পারে উপস্কর, কিন্তু যদি অশনায়া
না থাকে কাহারও, ব্যর্থ হয় সব আয়োজন।
ভাষার পাকাল্যা ব্যর্থ, বাঙ্গালা সাহিত্য
যদি তাহা পড়া হয় অনড়ান বব্বরের পাশে।

অক্ষয়। বাপ, এ যে সব গুলিয়ে গেল! এসবের মানে কি?

ফুলু। মানেই বুঝবেন যদি, তা হ'লে এসেছেন কেন সাহিত্যিক-ঘরের আধুনিক দরজায়? যান না কেন ফিরে বঙ্কিমের সীতার বনবাসে, বিদ্যাসাগরের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে, রবীন্দ্রনাথের মন-ভোলানো ভেদ-ভেদে মধ্যে কবিতার।

অক্ষয়। কি সর্ব্বনাশ, আপনারা সাহিত্যিক হয়ে সাহিত্যের যা পরিচয় দিচ্ছেন, এতে তো তাজ্জব হয়ে যাচ্ছি মশাই! তার ওপর এ কি কথাবার্ত্তা বলছেন, তাও তো বুঝছি না!

কেতন। বুঝবেন কি ক'রে, পড়েন অতি-আধুনিকতম সাহিত্যিকদের লেখা?

অক্ষয়। পড়তুম, মানে না বুঝতে পেরে ছেড়ে দিয়েছি।

বিশু। না পারবেন বুঝতে জীবনে আমাদের লেখা, না যদি থাকে মনে দরদ, না সহানুভূতি থাকে যদি সবুজের কচি ডাঁটাগুলির ওপর।

অক্ষয়। সহানুভূতি করি কি ক'রে, যদি বুঝতেই না পারি? আপনারা ভাষার আইনটা মানুন।

কেতন। আমরা মানি না কোন আইন ব্যাকরণের, মানি না ভাষার, আমাদের গোমুখী থেকে নিঃসৃত হয় যে ভাষা, সেই ভাষা তৈরি করে তার আইন, নিজের পথ চলার জন্যে কেটে কেটে।

অক্ষয়। মশাই, আমাদের কথা ছেড়ে দিন, আপনাদের নিজেদের কথাও তো নিজেরা বুঝবেন?

চপলা। বুঝতে হয় না—জগৎ—কাজ দেওয়া—হাততালি সবাই—আনন্দ।

অক্ষয়। ওঃ, অসহ্য! মশাই, এসবের অর্থ কি?

চপলা। অর্থ—ব্যাঙ্ক—ফাঁক—সাহিত্য।

অক্ষয়। মশাই, আজকাল বাজারে এও চলছে? কেউ কিছু বোঝে?

বিশু। বোঝবার তো দরকার নেই। বুঝতে পারছে না যত, ক্ষেপছে আনন্দে তত। বঙ্কিম শরৎ রবির যুগ উঠেছি কাটিয়ে আমরা।

অক্ষয়। রবিবাবুর যুগও শেষ হয়ে গেছে?

বিশু। রবিবাবুর যাবার আগেই। তাই তো সরালুম তাঁকে আমরা।

অক্ষয়। আপনারা সরালেন মানে?

বিশু। মানে অসুখটা উপলক্ষ্য, সরলেন তিনি ভয়ে লাঞ্ছনার আমাদের। করলে কি হচ্ছে, বেঁচে বেঁচে এদ্দিন, আর কটা দিন থেকে গিয়ে, খবরটা নিয়ে যুদ্ধের, পারতেন না যেতে মারা? আমাদের ভয়ে চ'লে গেলেন থেকে জগৎ।

অক্ষয়। মশাই, আমাকে বাঁচান। এই ভাবে যদি কথা কন, মাথা ধ'রে

উঠবে আর মিনিট খানেক পরে। আমি আপনাদের শরণাগত হচ্ছি।

ফুলু। বললেন কথাটা আপনি মত যেন নিশীথা চ্যাটার্জীর।

অক্ষয়। সে আবার কে?

কেতন। কে সে? সে এই তরুণদলের প্রেয়সী বিশ্বের। দুবেলা ভাত নিয়ে হাঁটত পথে, আমরা তাকে—

অক্ষয়। আপনারা বুঝি চাঁদা ক'রে এখন তাঁর ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন? তা হ'লে বাকি আর কিছু নেই? তিনি আবার এখানে আসবেন নাকি?

ফুলু। আসবেন, পাবেন দেখতে তাঁকে, কিন্তু সাধনা করতে হবে তাঁকে পেতে হ'লে।

অক্ষয়। গলায় দড়ি আমার—

ফুলু। যে সে মেয়ে তিনি নন। মদন—

মদন। সুন্দরী এপোলোপিকার মত বৈভীষণিক তাঁর লালসা।

কেতন। প্যারীর সেরা রাঁদেভুঁর মাখনের চেয়ে নরম তাঁর গাল।

ফুলু। কিন্তু ডিউসেলডর্ফের ইস্পাতের কাঠিন্যতার চেয়ে কঠিনতম তাঁর মন। তাঁকে গলাতে যথেষ্ট চাই উত্তাপ হৃদয়ের।

অক্ষয়। মশাইরা কি সবাই ক্ষেপে গেছেন? আমি তো মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝছি না।

মদন। আপনার মত ঠিক এই রকম ব'লে উঠেছিল বেলজিয়মের কবি ভেরহিরেনকে তাঁর ফরাসী গুপ্তপ্রণয়িনী ম্যানাজুলা। উত্তরে তাঁর বলেছিলেন তিনি "Verbum sat sapienti"।

অক্ষয়। মানে?

মদন। মানে, যথেষ্ট একটা কথাই জ্ঞানী লোকের পক্ষে।

অক্ষয়। কিন্তু আমার যে এদিকে জ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হচ্ছে মশাই।

মদন। ল্যাটিনে একটা আছে প্রবাদ "Sic transit gloria mundi" পৃথিবীর যায় গৌরব নষ্ট হয়ে এই ভাবেই।

অক্ষয়। মশাই, এর চেয়ে পুস্তকে কথা বললে বুঝতে পারতুম। এ কি বাংলা? এ যে একেবারে অবোধ্য!

বিশু। বোঝবার কিছু নেই। তাই আমরা সবুজের দল অবুঝের রাস্তা ধরেছি। আমরা একটা কেলেঙ্কারি ক'রে তবে যাব। আমরা হলুম সাহিত্যের ফ্যাসিস্ট, নবভাষা, নবসাহিত্যের সৃষ্টি করতে আমরা মাতৃগর্ভে এসেছিলাম।

অক্ষয়। আমায় তা হ'লে ছেড়ে দিন দয়া ক'রে, আমার বয়েস হয়ে গেছে, আপনাদের সঙ্গে বোধ হয় খাপ খাব না।

বিশু। কে বললে খাবেন না খাপ? বয়সের সঙ্গে আছে কি যোগ মনের? তা হ'লে থাকত না অস্তিত্ব আমাদের কারুর। আমার বয়েস একুশ, আমার প্রণয়িনীর বয়েস সাঁইত্রিশ, বয়েসের জন্য কই কিছুই তো আটকাচ্ছে না, এসব ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়।

অক্ষয়। ছিঃ ছিঃ, মেয়েটারও একটু হায়া হ'ল না আপনার সঙ্গে মিশতে!

বিশু। সে যে মোর হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাসে গড়া—
ঈথরের বিশূন্য প্রতিমা!
এ দেহের ঘর্ম্ম নিয়ে নর্ম্মসখী মোর—
চর্ম্ম ফেটে ফুটে ওঠ ফোড়ার মতন।
সাংঘাতিকা, সর্ব্বনাশী আরাধ্যা আমার।
এস সখি অনেক রাতেতে,
এস মোর নিদ্রাহীন নিমেষ-পাতেতে,
দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্যা হয়ে—
বিবসনা শশার মতন লবণাক্ত অশ্রু মেখে
আমার লোলুপ ওষ্ঠ 'পরে।

মদন। এক্সেলেণ্ট!

অক্ষয়। সাংঘাতিক!

চপলা। কচ্‌কচ—ছিটকিনি—খাওয়া—নিশ্বেস বন্ধ—স্যাঁতসেঁতে—পাণ্ডুর—অল-ক্লিয়ার!

অক্ষয়। রাম রাম রাম, এ কোথায় এলুম!

বিশু। মশাই, আপনি রামনাম করেন? বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান এখান থেকে। যারা ওসব নাম করে তাদের ঘর ধর্ম্মমহলে, একতলায়, নীচে। যান শিগগির।

দরজায় ধাক্কা দিল

গোব। কে বেরুবেন?

অক্ষয়। আমি অক্ষয়।

গোব। চট ক'রে চ'লে আসুন বাবু, এর পর আজ রাত্তিরে আর এ ঘর খোলা হবে না।

দরজা খুলিতেই অক্ষয়বাবুর দৌড়াইয়া বাহিরে প্রস্থান

বাহির

অক্ষয়। বাপ, এ কি কাণ্ড! ছিঃ ছিঃ ছিঃ! এ কোথায় এলুম? চ'লে যাব? তাই বা যাই কি ক'রে? অতগুলো টাকা আগাম নিয়েছে, এ তো মহা মুশকিলে পড়লুম দেখছি। এই যে ম্যানেজার মশাই, ওঃ, খুব জায়গায় দিয়েছিলেন মশাই!

ম্যানে। কেন?

অক্ষয়। ওঃ, আর কিছুক্ষণ থাকলে শেষে একটা খারাপ ব্যায়রাম ধরত।

ম্যানে। বলল না বুঝি? আমি জানতুম, ও আপনার সঙ্গে ওঁদের ঠিক খাপ খাবে না, ওঁরা একটু হাই-ক্লাসের; তবে আপনি বললেন, তাই তো ও মহলে আপনার জায়গা ক'রে দিলুম। ব্যস্ত হবেন না, পাঁচ জায়গায় ঘুরিয়ে আপনাকে আমি ঠিক সেট ক'রে দিচ্ছি, দেখুন না।

অক্ষয়। না মশাই, এখন আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠছে—আমায় একটু খোলা জায়গায় দিন।

ম্যানে। [ভাবিয়া] খোলা জায়গা, খোলা জায়গা, হ্যাঁ, তেতলায় যাবেন—প্রীতিমহলে? বোধ হয় জায়গাটা আপনার সুট করবে। আপনি কি আন্‌ম্যারেড—অবিবাহিত?

অক্ষয়। হ্যাঁ।

ম্যানে। ওঃ। তা হ'লে আর দেখতে হবে না, ঠিক জায়গায় পাঠাচ্ছি। চাঁদের আলো, দখিন হাওয়া প্রাণ ভ'রে খেয়ে বাঁচবেন।

অক্ষয়। কোন অসুবিধে নেই তো?

ম্যানে। বিন্দুমাত্র নয়। গোবর্দ্ধন!

গোব। [নেপথ্যে] আজ্ঞে।

ম্যানে। তেতলা ৪৯ নম্বর ঘর। খালি আছে তো?

গোব। আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই খালি, শুধু বিরূপাক্ষবাবু একটা চৌকিতে আছেন।

ম্যানে। যান মশাই, তেতলায়, একদম ফাঁকা। বিরূপাক্ষবাবু অতি সজ্জন লোক, উপরি উপরি তিনটি স্ত্রী মারা গেছেন, বেশ চুপচাপ থাকেন, আপনার সঙ্গে বনবে ভাল।

অক্ষয়। তাই যাই।

— গোবর্দ্ধন আসিয়া দাঁড়াইতে অক্ষয়বাবু তাহার সহিত চলিয়া গেলেন

প্রীতিমহল

একটি তক্তাপোশে বিরূপাক্ষ দত্ত বসিয়া আছেন, বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, গোঁফদাড়ি কামানো, বাংলা পাঁচের মত মুখখানি, মাথায় টাক, অতি ভালমানুষের মত চেহারা, কিন্তু চাহনি দেখিলে হাসি পায়। অক্ষয়বাবু ঘরে ঢুকিয়া একটি চৌকিতে বসিলেন

বিরূ। মশয় কি নবাগত? আজ আইছেন?

অক্ষয়। আজ্ঞে হ্যাঁ, এখানে আর কেউ আছেন নাকি?

বিরূ। আছিলেন, ছয়জন হাসপাতালে গেছেন, তিনজন আলিপুর জেলে, আর আমি মশয়, বর একলা পইরা গেছি। আপনি আইলেন, তবু একটা সঙ্গী পাওন গেল।

অক্ষয়। সে কি মশাই? এখানে এলে এই রকম বিপদ ঘটে নাকি?

বিরূ। সেটা নির্ভর করে আপনগোর নিজের উপর। চান্দের আলো হাওয়া বাতাস সইহ্যকরা বর কঠিন মশয়, এই গরম দেশে। ফুরফুর করল, অমনি দেহে যেন যৈবনের জোয়ার আসল। বলেন, কথাডা সইত্য কি না?

অক্ষয়। কি জানি মশাই, ওসব বুঝিটুঝি না।

বিরূ। আপনি কি বিপত্নীক?

অক্ষয়। আজ্ঞে না, আমি বিয়েই করি নি।

বিরূ। তবে তো মরছেন।

অক্ষয়। মরছি মানে?

বিরূ। এহানে দুদিন থাকেন, প্রাণ-হিরহিরাইয়া উঠব। যদি ভাবটারে ছাপ্রেস করেন থাইসিস অইব, নয় একডা এমন কিছু করবেন যে শহরে আর মুখ দেখান যাইব না।

অক্ষয়। আপনি এসব কি বলছেন, আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না।

বিরূ। বোঝবেন, বোঝবেন, দুই তিনটা দিন যাইতে দেন, বোঝবেন। মশয়, জীবনটারে আপনি একেবারে মাটি করছেন। জগতে এ জিনিস যে কি তা বোঝলেন না! বর দুঃখ লাগছে আপনার লইগ্যা।

অক্ষয়। বুঝে তো থাইসিস হবে আর জেলে যেতে হবে।

বিরূ। মশয়, তাতেও আনন্দ। আমাদের বাঙ্গালীর পেটে ভাত নাই, কিন্তু বুকে প্রেম আছে। বোমা পরুক আর যাই হোক, প্রেমের হাতে ছারান নাই। এই দেখেন, পরশ্ব দিন একটা ছবি দেইখ্যা আসছি, আইজো তার নায়িকারে শয়নে স্বপনে ভোলবার পারছি না। একবার যদি তারে কোনমতে পাইতাম, তা অইলে বোমার সামনে বুক চিতাইয়া মরতে ডরাইতাম না। দেখেন, তার কথা স্মরণ কইরা চোখে জল আসতেছে। সে যদি একবারও এই ব্যথাটা জানবার পারত।

কাঁদিয়া ফেলিলেন

অক্ষয়। এ কি মশাই, কাঁদছেন কেন? তা, তাঁকে গিয়ে দেখা ক'রে একবার ব'লে দেখতে পারতেন। হয়তো—

বিরূ। আর মশয়, সে দুঃখের কথা না কওনই ভাল। গিয়েছিলাম, কুকুর লেলাইয়া দিল। ওরা ছায়ার লগে প্রেম করতে চায়,

রক্ত-মাংসের শরীর যাগো, তাগো আর ওদের পাওনের আশা নাই। আমি তো আর সইহ্য করতে পারি না মশয়।

কাঁদ-কাঁদ হইলেন

অক্ষয়। তা আমি আর কি করতে পারি বলুন?

বিরু। আপনার কেউ নাই?

অক্ষয়। [চটিয়া] তার মানে?

বিরু। আহা, কথাডা খারাপভাবে ধরবেন না। মানে, যদি কেউ ফ্যামিলিতে বিয়া দিবার মত থাকে, তা হ'লে আমি একবার চেষ্টা কইর‍্যা দেখতাম।

অক্ষয়। [আরও চটিয়া] আজ্ঞে না, আমি চলি। [উঠিলেন]

বিরু। দারান দারান, রাগ করছেন? মরার উপর খারার ঘা দিয়া কোন লাভ নাই। আমারও তো থাইসিস অইব। দুঃখের কথা কি বলি মশয়, পাশের বারি একটি বর সুন্দরী মাইয়া আছে। কতবার যে শিস দিয়া ডাকছি, তবু সারা দেয় না। পাচিলের ফাক দিয়া একবার উকি মাইরা দেইখ্যা আসেন, আপনি আর নিজেরে সামলাইতে পারবেন না, হয়তো লাফ দিয়া খুনখারাপি হইবেন। একটা চিঠি লিইখ্যা রাখছি, জুতমত দিবার তাল পাইতেছি না।

অক্ষয়। আপনি দেখছি অতি ইতর লোক।

বিরু। ইতর সব হালাই, আমি শুধু মুখে কইয়া ফেলাই। [সহসা পাশের বাড়ির ছাতের দিকে চাহিয়া] মশয়, অয় ছাদে ওঠছে, তাকান তাকান। দেই চিঠিটা এই ফাকে ছুরে।

একটি কাগজ পাকাইয়া ছুঁড়িলেন

অক্ষয়। আপনি তো মশাই সাংঘাতিক লোক! ছি ছি ছি, পট ক'রে পাশের বাড়িতে একটা কাগজ ছুঁড়ে মেয়েটিকে মেরে দিলেন?

বিরু। আরে মশয়, ও কাগজ নয়, ও আমার হৃদ্‌পিণ্ডের তাল পাকাইয়া মারছি—ও পরলে বোঝবে।

ক্ষেমঙ্করী। [পাশের বাড়ির ছাদ হইতে] কে রে, কে রে পোড়ারমুখো, কাগজের গুলি পাকিয়ে আমায় মারলি? খেংরে বিষ ঝেড়ে দোব

না! এগিয়ে আয়, এগিয়ে আয় না হতচ্ছাড়া, দেখি মুরদ! ভেবেছিস এটা মগের রাজত্ব! যা খুশি করবি! মেরে গাল ভুবড়ে দোব না! বেরিয়ে আয় না, সাহস যদি থাকে! না হ'লে আলসে ডিঙিয়ে আমি যাব বলছি—হ্যাঁ।

অক্ষয়। ছি ছি, কি করলেন বলুন তো? আমি এখন ছাদ দিয়ে নীচেই বা নাবি কি ক'রে?

বিরু। মশয়, সইত্যই যে আইলসা পার হইয়া আইতে আছে। কারে মারতে গিয়া কারে মারলাম মশয়, আমি চলি।

দৌড়াইবার উপক্রম

অক্ষয়। আরে মশাই, আমি কি করি?

বিরু। পিছু পিছু দৌরাইয়া আসেন।

দৌড়াইয়া ছাদের দরজায় শিকল দিয়া প্রস্থান। অক্ষয়বাবু দরজায় বৃথা ধাক্কা মারিতে লাগিলেন

অক্ষয়। ও মশাই, কি সর্ব্বনাশ, ছাতে শেকল দিয়ে গেলেন কেন? ও মশাই—

ক্ষেমঙ্করীর ঝাঁটা হস্তে প্রবেশ

ক্ষেম। এই যে পোড়ারমুখো, তুই বুঝি পালাতে পারিস নি? আমার হাতে বাঁচবি? এই নে, এই নে।

ঝাঁটা প্রহার, অক্ষয়বাবু লাফাইতে লাগিলেন

অক্ষয়। ওরে বাপ রে! গেছি রে!

ক্ষেম। রোজ রোজ দিদিমণি তাই আমায় বলে—মেস-বাড়ির ছোঁড়াগুলোর জ্বালায় ছাতে ওঠবার জো নেই। কেন, তা আমি এখন বুঝছি। হ্যাঁরে, তোদের ঘরে কি মা-বোন নেই? গেরস্থর মেয়েছেলের সঙ্গে কি ভাবে ব্যাভার করতে হয় জানিস না?

ঝাঁটা প্রহার

অক্ষয়। উঃ, গিছি, গিছি, দোহাই, দোহাই, মা লক্ষ্মী, আমি তোমার সন্তানের মত, এই নাকে কানে খত, আজই মেস ছাড়ছি। আর জীবনে এখানে আমায় দেখতে পাবে না।

ক্ষেম। সত্যি বলছিস?

অক্ষয়। গুরুর দিব্যি। বাবা ঘনদুর্ব্বানন্দের নামে বলছি, আর আমায় কখনও এ বাড়িতে দেখতে পাবে না।

ক্ষেম। মনে থাকে যেন—হ্যাঁ।

অক্ষয়বাবু দরজা ভাঙিয়া দৌড়াইলেন

পথ

চিদ্। কে যায়? অক্ষয় না? তুমিও পথে বেরিয়ে পড়েছ তা হ'লে?

অক্ষয়। [হাঁপাইতে হাঁপাইতে] হ্যাঁ।

চিদ্। হাঁপাচ্ছ কেন?

অক্ষয়। ওঃ, যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে! ওঃ, ৪৯ নম্বরের মেসই বটে! বাব্বাঃ! এতগুলো বদমায়েস একসঙ্গে জুটেছে—এ আমার জ্ঞানে ছিল না গুরুদেব। শেষ পর্য্যন্ত পাশের বাড়ির এক ঝিয়ের হাতে ঝাঁটা খেতে হ'ল!

চিদ্। এমনই ক'রেই অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হয় বৎস।

অক্ষয়। কিন্তু আপনি বেরিয়ে এলেন কেন গুরুদেব?

চিদ্। সজ্ঞানে মরবার ইচ্ছে ছিল না ব'লে।

অক্ষয়। সে কি?

চিদ্। বিস্ময়ের কিছু নেই বাবাজী। সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে অনেক সহ্য করেছিলুম, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর পারলুম না।

অক্ষয়। আরও ছারপোকা বাড়ল বোধ হয়?

চিদ্। হুঁ, ছারপোকা তো তুচ্ছ এর কাছে, তোমাদের ম্যানেজারও কিছু নয়, আমায় এরা এতদিন কিছুই করতে পারে নি, আমায় তাড়ালে সেই ব্যাটা প্রাণায়াম।

অক্ষয়। প্রাণায়াম!

চিদ্। হ্যাঁ, ব্যাটা ইদানীং রাত তিনটে থেকে "অসার খলু সংসারে কর ব্রহ্মনাম সার" ব'লে পেট থেকে এমন বিটকেল আওয়াজ বার করতে লাগল যে, আমি আর সহ্য করতে পারলুম না। তৃতীয় দিন আমি হাতজোড় ক'রে বললুম, রাতটা কাটতে দিন সার্; ব্যাটা বলে, ব্রহ্মনাদ প্রাক্‌টিস করছি, ডিস্‌টার্ব করবেন না। ঠায় কম্বল গুটিয়ে জেগে ব'সে রইলুম। ভোর নাগাদ হঠাৎ ব্যাটা একটা গমক

মারলে, তার ঠেলায় ছাদ না ফেটে দরজার ছিটকিনিটা খুলে বেরিয়ে গেল। আমিও সেই তক্কে স'রে পড়লুম।

অক্ষয়। কি সর্ব্বনাশ!

চিদ্। আপসোসের কিছু নেই, সংসারে থাকলে এসব আপদ আসবেই বাবাজী। তুমি এখন কি করবে ভাবছ?

অক্ষয়। যে কোন একটা ভাল জায়গায় চ'লে যাব ভাবছি।

চিদ্। রোজগার?

অক্ষয়। কিছু ব্যাঙ্কে টাকা আছে, তাতেই চ'লে যাবে।

চিদ্। খুব সংবুদ্ধি করেছ বল। আমারও তাই মত, তোমার সঙ্গে থাকলে আমারও চ'লে যাবে এক রকম ক'রে। এখানে দেখলে তো, ধর্ম্মেতে ফাঁকি, সাহিত্যে ফাঁকি, পলিটিক্সে ফাঁকি, প্রেমেতে ফাঁকি, ব্যবহারে ফাঁকি, প্রাণায়ামে ফাঁকি, অতএব এ ফাঁকির রাজ্য ছেড়ে ফাঁকা রাস্তায় বেরিয়ে পড়াই ভাল। এদেশে যাবার কোথাও নেই, সারা দেশই আজ মেস নম্বর ফর্‌টিনাইন।

অক্ষয়। তা হ'লে কি এদেশের আর উদ্ধারের আশা নেই বলছেন?

চিদ্। আছে, তবে ঠেঙানি না খেলে জ্ঞান হবে না। আজ তুমি মার খেয়ে তবে ঐ মেস থেকে বেরিয়েছ। মার খেয়ে তবে তোমার চৈতন্য হয়েছে যে, কি সাংঘাতিক জায়গায় এতদিন তুমি ঢুকে বসেছিলে; তেমনই ঐ জিনিসটা যদি দেশের লোককে আরও দিতে পারা যায়, তবে জায়গাটা ভদ্রলোকের মত হবে। আপাতত কিছু আছে?

অক্ষয়। আজ্ঞে, বেশি নয়।

চিদ্। কত?

অক্ষয়। আনা ছয়েক।

চিদ্। যথেষ্ট। বেশ, সব সমেত আধসেরটাক রাবড়ি কিনে নিয়ে এস ততক্ষণ, তারপর তোমার দীক্ষার আয়োজন করব।

চিদ্‌ঘনানন্দ বলিলেন, অক্ষয়বাবু তাঁহার মুখখানাকে একবার ক্ষৌরকারের মত দেখিয়া ধীরে ধীরে দোকানের দিকে অগ্রসর হইলেন।

—যবনিকা—

শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

ত্রি

১

চ'লে গেল ম্লান হেসে ?
শব্দ হ'ল দ্বারদেশে,
খুলে দেখি এসেছে সে।

২

সরু গলি পচা নালা ঠিক তার পাশে
কিশোর অশথচারা পরম আশ্বাসে···
হর্ন দিয়ে মোটর কি আসে ?

৩

নীলাকাশ আছে দিগ্‌দিগন্ত জুড়ি,
হয়তো বা আছে, বলাকা চলেছে উড়ি,
আমার আকাশে উড়িছে আমার ঘুড়ি।

৪

গায়ে ছেঁড়া ময়লা সাজ
মনে ভয় হতাশা লাজ—
হলাম সুখী—দোল যে আজ !

৫

মুচকি হাসি সেলাম করি ঘৃণায় প্রেমে আত্মহারা
লৌহ-কারা !
উঠবে যারা, ফুটবে যারা, ছুটবে যারা, কোথায় তারা ?

৬

আকাশে উঠেছে চাঁদ, বাগানে ফুটেছে ফুল,
লক্ষ লহরী তুলি নদী বহে কুলুকুল···
খুঁজিছ কি ? ভুল ?

৭

খড়ি দিয়ে ছোট খোকা লেখে 'ঔ'টি
রোদে ব'সে বড়ি দেয় রাঙা বৌটি
পুকুরেতে ডোবে ওঠে পানকৌটি।

৮

আছে হিমালয় তুঙ্গ শির,
আছে সারমেয় ভক্ত বীর,
পাইলট শুধু যুধিষ্ঠির।

৯

সেই লেখা, সেই নীল খাম।
সাগ্রহে হাত বাড়ালাম,
মিলিল না, অপরের নাম।

১০

থেমো না থেমো না, কাছে সরে এস রাণী
করুণ বেহাগে কাঁদুক সেতারখানি
কই ? কোথা তুমি ? শুধুই বেতারবাণী !

১১

ব্যস্ত দিবস, শান্ত রাত্রি,
নীড়ের জননী জীবনদাত্রী
অসীম পন্থা পুরুষ যাত্রী।

১২

চর্ব্বণ করছি কিছু—মনে হচ্ছে খাওয়া,
দু হাত পেতে নিচ্ছি—মনে হচ্ছে পাওয়া,
বইছে একটা কিছু—মনে হচ্ছে হাওয়া।

১৩

অবলুণ্ঠিতা শ্যামলী আলুলায়িত কৃষ্ণকুন্তলভার,
কে তুমি অভিমানিনী ছিন্নভিন্ন করেছ মুক্তাহার,
ইতস্তত-তারা-বিক্ষিপ্ত সুন্দর অন্ধকার।

১৪

সময় নাই ?
সময় চাই।
প্রতীক্ষা তাই।

"বনফুল"

পিতা-পুত্র

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কঙ্কণার গ্রামাপথ। মধ্যরাত্রি। কিন্তু গাছের মাথায় প্রচণ্ড আলোর রক্তাভ আভা ভয়ালরূপে জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার ছটায় নীচেও অস্পষ্ট রক্তালোক ফুটিয়া উঠিয়াছে। যবনিকা অপসারিত হইবার পূর্ব্বেই মানুষের ভয়ার্ত্ত চীৎকার শোনা যাইবে—"আগুন! আগুন! আগুন!"

কতকগুলি লোক ছুটিয়া চলিয়া যাইবে। কয়েকজন প্রৌঢ় মাতব্বর ধীরগমনে চলিতেছিল। নেপথ্যে চীৎকার হইতেছিল—"জল! জল! জল!"

১ম প্রৌঢ়। কোথায় হে ? আগুন কোথায় ? অ হেরম্ব !

দ্রুতচলমান হেরম্ব। মহাভারত—মহাভারত—মহাভারতের ঘরে।

প্রস্থান

২য় প্রৌঢ়। মুকুন্দ, ফেরো।

১ম প্রৌঢ়। একবার দেখতে যাবে না ?

২য় প্রৌঢ়। না। এস, বাড়ি এস।

১ম। তবে দাঁড়াও। বেতো পায়ে, আগুন শুনে চ'লে এসেছি, কিন্তু যেতে আর পারছি না। একটুকুন দাঁড়াও।

২য়। বব্বরের নাই পেমাদের ভয় ; হাজারবার বললাম—মহাভারত, পাথরের চেয়ে মাথা শক্ত লয় ; পাথরে মাথা ঠুকিস না ; বাবুদের সঙ্গে তুই সব মিটিয়ে নে ; আগে না হয় হুটুবাবু ছিল ; এখন সেই যখন ফেরার, তখন মিটিয়ে নে ; দু'তিন বছরের মধ্যে কি অবস্থা কি হ'ল ভেবে দেখ ; পাথরে মাথা ঠুকিস না। বললে কি জান—পাথরে মাথা ঠুকলেও পাথর শক্ত, পেণাম করলেও পাথর শক্ত ; পাথর গুঁড়ো করলে তবে সে নরম হয়।—ব'লে হা-হা ক'রে হাসলে, ক্ষ্যাপার মতন।

১ম। লোকটার মাথা চিরকাল খারাপ। নইলে কি অবস্থা কি হ'ল বল দেখি! হুটু মুখুজ্জের পাঠশালা বাড়ি সব খুড়ল চোখের ওপর দেখলে। দেখে আক্কেল হওয়া দূরের কথা, জেদ ক'রে মাস্টারনী, তার মেয়ে আর মাতাল ভাইটাকে নিজের বাড়িতে ঠাঁই দিলে। তখনই আমি বুঝেছিলাম, বুঝেছ—লাল ঘোড়া ছুটল ব'লে।

অত্যন্ত দ্রুত অরুণের প্রবেশ

অরুণ। Thou art my Father, Oh Lord! Shew Thy mercy! আর্ত্তবিপন্নকে রক্ষা কর প্রভু। কে? কারা তোমরা?

১ম। এই গাঁয়েরই আমরা, খোকাবাবু। যেতে যেতে পায়ে বাত চাগিয়ে উঠল, তাই বসলাম একটুকুন।

অরুণ। মহাভারতের ঘরে আগুন না?

২য়। আজ্ঞে হ্যাঁ গো। ভারী জোর আগুন গো।

অরুণ। বাড়ির লোকজন সব রক্ষা পেয়েছে তো? তোমরা জান? মমতা, কল্যাণী-পিসীমা, এঁরা সব?

১ম। যেতেই পারি নাই আজ্ঞে, বাতের কামড়ে পথেই ব'সে পড়েছি।

অরুণ। রক্ষা কর ভগবান, রক্ষা কর।

দ্রুত প্রস্থান

১ম। হুটু মুখুজ্জের বেটা। ভারী জবর ছেলে হে। এর ছোটজনা, সেও তোমার আচ্ছা ছেলে। দুই বেটাতেই অবিকল বাপ।

২য়। তা হ'লেই কচুপোড়া খেয়েছে, লক্ষ্মী কোনকালে হবে না। এখন বাড়ি চল দিকিনি; আগুন নিবে এল লাগছে, আঁধার হয়ে এল।

১ম। একবার যাবে না? খবরটা একবার নেবে না? পাড়া-প্রতিবেশী লোক—জাত জ্ঞাত। আগুন নিবে এল, এখনও তোমার গোলমাল উঠছে, ব্যাপারটা কি দেখবে না?

২য়। রস না হ'লে বাত হয় না, এ একবারে খাঁটি কথা; বেতো পা নিয়ে রস তো তোমার খুব! যাও তুমি। কাল বাবুদের কানে

উঠবে—মুকুন্দ ঘোষ গিয়েছিল, এই বলেছে, ওই বলেছে, তা বলেছে। আমি চললাম বাড়ি।

প্রস্থান

১ম। যাও তুমি। আমি একবার ঘুরেই আসি। ঘুঁটে পুড়লে গোবরকে হাসতে নাই।

বিপরীত দিকে প্রস্থান

শূন্য রঙ্গমঞ্চে সন্তর্পিত দ্রুতপদে প্রবেশ করিল গোপী, আপাদমস্তক ঢাকা, পিছনের দিকে চাহিতে চাহিতে সে চলিয়া গেল

দৃশ্যান্তর

মহাভারতের বাড়ি

বাড়িখানা পুড়িয়া গিয়াছে—চারিপাশে ক্ষুব্ধ জনতা

মাথায় আঘাতপ্রাপ্ত রক্তশক্ত মহাভারত কালী বাগদীর বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। কল্যাণী দাঁড়াইয়া আছে। অরুণ মমতার সংজ্ঞাশূন্য দেহ মাটিতে নামাইল। সুশোভনও এক দিকে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার বগলে তাহার বেহালার বাক্স

১ম ব্যক্তি। ছেড়ে দাও মহাভারত, ছেড়ে দাও, ম'রে যাবে। ছেড়ে দাও।

মহা। ছাড়ব, ছাড়ব। যে চিতে বেটা নিজের হাতে জ্বেলেছে, সেই চিতের ওপর দিয়ে ছাড়ব।

অরুণ। (কল্যাণীর প্রতি) আপনি মমতাকে দেখুন পিসীমা। (তাড়াতাড়ি মহাভারতের কাছে আসিয়া) মহাভারত, মহাভারত!

মহা। কে? অরুণখুড়ো! হা-হা-হা, খুড়োঠাকুর, বেটা নিজের চিতে নিজের হাতে জ্বেলেছে।

অরুণ। ছেড়ে দাও মহাভারত, ওঠ বুক থেকে।

মহা। উঠব? ছেড়ে দোব?

অরুণ। (আকর্ষণ করিয়া) ওঠ, ওঠ।

মহা। তুমি বলছ?

অরুণ। হ্যাঁ, আমি বলছি, ওঠ।

মহাভারত উঠিল, উঠিয়াও একদৃষ্টে কালীর দিকে চাহিয়া রহিল

মহা। আমি বুঝেছিলাম খুড়োঠাকুর যে, এমনই কিছু হবে। কাল গোপী মিত্তির আমাকে শাসিয়ে লোক পাঠিয়েছিল। আমি জেগেই ছিলাম। আগুন দিয়ে পালাবার আগেই আমি পথ আগলে ছিলাম। বেটা গিয়ে ঢুকে পড়ল গোয়াল-ঘরে। আমি শেকল দিয়ে দিলাম। মরত বেটা পুড়ে। তুমি এসে বাঁচালে। তখনও কি ছুট, আমি না ধরলে বেটা পালিয়েছিল।

অরুণ। (কল্যাণীর প্রতি) মমতা সুস্থ হয়েছে পিসীমা ?

কল্যাণী। হ্যাঁ বাবা। মহাভারতের মাথাটা ধুয়ে বেঁধে দিতে হবে। তুমি ওকে একটু শান্ত কর।

লোকজন একে একে চলিয়া গেল

কালী। (ক্ষীণকণ্ঠে) জল !

অরুণ। পিসীমা, একটু জল।

মহাভারত। (খানিকটা পোড়া খড় লইয়া) নে, খা।

অরুণ। (খড় কাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া) ছি মহাভারত !

কল্যাণী। (কালীর মুখে জল দিল) আর খাবে ?

অরুণ। মমতা, ফার্স্ট এডের বাক্সটা দেখ দিকি পাওয়া যায় কি না ? চল, আমিও বরং সঙ্গে যাই।

মহা। ছেলম-খানেক তামাক কেউ দেবে হে ? তামাক খাই একবার।

সুশোভন। (এতক্ষণ বসিয়া সে হাঁপাইতেছিল, এবার উঠিল, পকেট হইতে সিগারেট-কেস বাহির করিয়া) নাও। You are a brave man। (নিজেও একটা সিগারেট মুখে দিল)

নেপথ্যে মমতা। মা, এখানে এস একবার।

কল্যাণীর প্রস্থান

সু। দেশলাইটা ? (পকেট খুঁজিল) এঃ, দেশলাইটা গেছে।

মহা। (হাসিয়া উঠিয়া একখানা পোড়া কাঠ আনিয়া) নাও। (সুশোভনকে ধরাইয়া দিল, নিজেও ধরাইল। তারপর বেহালার বাক্সটা দেখাইয়া প্রশ্ন করিল) ওটা কি গো ছোটদাদাঠাকুর ?

সু। বেহালার বাক্স। বহুকষ্টে বাঁচিয়েছি ওটা।

মহা। কই, বাজনা খানিকটা শোনাও দিকি দাদাঠাকুর।

সু। (বেহালা বাহির করিয়া) খুব একটা করুণ রাগিণী শোনাই শোন।

পকেট হইতে মদের শিশি বাহির করিয়া খানিকটা খাইল, তারপর বেহালা বাজাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু মধ্যখানেই মহাভারত উঠিয়া পড়িল

মহা। উঁহু। বেটাকে আগে পুলিসে দিয়ে আসি। (কালীকে ধরিয়া) উঠে আয় বেটা বাগদী।

টানিয়া লইয়া প্রস্থান

সুশোভন বেহালা বাজাইয়া চলিল

দ্বিতীয় দৃশ্য

কঙ্কণার বাবুদের বাড়ি। বড়বাবুর খাস-কামরা।

বড়বাবু আজ সোজা দাঁড়াইয়া ধীর পদক্ষেপে চিন্তিতমুখে পদচারণা করিতেছেন। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া আছে দেবনারায়ণ ও গোপী মিত্তির

দেব। কেউ কেউ বলে—নুটু কলকাতায় ওকালতি পড়তে গেছে। আমার তা বিশ্বাস হয় না। এতদিন হয়ে গেল, সে দেশে পর্য্যন্ত আসে নি। আমার মনে হয়, সে চাকরি-টাকরি পেয়েছে। ভরসার মধ্যে ওই—নুটু এখানে নেই।

শিব। নুটুর স্ত্রী আছে। দেবনারাণ, লখিন্দরকে কামড়াবার জন্যে দু পহরে এল দুই মহানাগ। তাদের নিশ্বাসের গর্জ্জনে বেহুলা সতর্ক হ'ল, দুধ দিলে, তারা মাথা নোয়াল ; বেহুলার হাতে বন্দী হয়ে তারা ভগবানকে ধন্যবাদ দিলে যে এমন নিষ্ঠুর কাজ তাদের করতে হ'ল না। তৃতীয় প্রহরে এল এক নাগিনী। বেহুলার একেই ঘুম পাচ্ছিল, তার ওপর নাগিনীর মৃদু মৃদু নিশ্বাসের বিষে সে ঘুমে ঢ'লে পড়ল। নাগিনীর নিজেরও সন্তান ছিল, কিন্তু তবু সে লখিন্দরকে কামড়ালে। মেয়ে-জাতটাকেই তোমরা চেন না,

তার ওপর হুটুর বউয়ের মত মেয়ে। ও বাঘিনী, সাপিনী—একাধারে সব।

গোপী। এবার হুজুর, বিবেচনা করুন, কেস ভারী খারাপ। হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। ঘরে আগুন লাগানো কেস। দায়রার বিচার। তবে বিবেচনা করুন, মামলা সাক্ষীর মুখে। আর বিবেচনা করুন, পৃথিবীটা কার বশ? না, পৃথিবী টাকার বশ। টাকা খরচ ক'রে দশ দিক দেওয়াল দিয়ে গেঁথে দেন, দিন রাত হয়ে যাবে; জেলে দেন বাতি লাখে লাখে, রাত দিন হয়ে যাবে।

শিব। কত টাকা খরচ করলে তুমি কালীকে বাঁচাতে পারবে?

গোপী। আজ্ঞে, তা বিবেচনা করুন, একটা এষ্টিমেটো না ক'রে কি ক'রে বলি বলুন?

শিব। দেবনারাণ, গোপী যত টাকা চাইবে দিতে না-ক'রো না? হিসেব চেও না, কৈফিয়ৎ চেও না। আর গোপী, এ মামলায় যদি কালীকে খালাস করতে পার, তবে তোমার হাতে যতগুলো ধরে মোহর আমি বকশিশ দেব।

গোপী। যে আজ্ঞে হুজুর, আমি তা হ'লে এই বেরুলাম। জয় বামন-দেব! গমনে বামনং চৈব, সর্ব্বকার্য্যেষু মাধব—সু-মাধব! সু-মাধব! আগে একবার থানা ঘুরে আসি হুজুর।

প্রস্থান

দেব। তুমি ভুল করছ বাবা। ঐ রকম খোলা হুকুম দিলে গোপী বাকি রাখবে না কিছু। পুকুর চুরি ক'রে ফেলবে।

শিব। তখন মহাভারত যেমন ক'রে কেলে বাগদীর বুকে চেপে বসেছিল, তেমনই ক'রে চেপে বসবে। এখন আর একটা কথা। অত্যন্ত সাবধানে চলতে হবে এখন। কাউকে মিষ্টি কথা ছাড়া বলবে না; একটি পয়সা কারও কাছে জোর ক'রে আদায় করবে না। যার যার নামে নালিশ চলছে, তাদের ডেকে কিস্তিবন্দী ক'রে মিটিয়ে দাও। কিন্তু ধীরে ধীরে, লোকে যেন বুঝতে না পারে।

দেব। কালী বাগদীর স্ত্রী আবার আজ এসে বলছে—খরচ নেই। এই সেদিন—

শিব। কালী গোপী মিস্তির নয় দেবনারাণ, ওদের কাছে হিসেব চেও না—খরচ দাও।

দেবনারায়ণ প্রস্থানোদ্যত

শিব। আর একটা কথা দেবু। আমীর-উল-উমরা ছোটে নবাবকে কয়েদ করো। তাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দাও।

দেব। আমি আর একটা কথা বলছিলাম বাবা।

শিব। বল।

দেব। রাগ না কর তো বলি।

শিব। (হাসিয়া) আরে হুজুর, ফরমাইয়ে পহেলে। গোসা কেঁও করেঙ্গে?

দেব। আমি বলছিলাম, হুটুর পাঠশালার যে মাস্টারনীটি রয়েছে, তার মেয়েটি বড় চমৎকার। আমি দেখেছি। ওর সঙ্গে ছোটখোকার বিয়ে দিয়ে দাও। মেয়েটি যে রকম ভাল, তাতে ছোটখোকা হয়তো শুধরে যাবে। আর মাস্টারনী, ওর ভাই, মেয়েটিও, বোধ হয় মামলায় সাক্ষী হবে—প্রধান সাক্ষী। ওদেরও মুখ বন্ধ হবে।

শিব। পার, চেষ্টা কর। কিন্তু ও মেয়ে ঘোরবার মেয়ে নয় দেবু। মিছে চেষ্টা করবে। তাকে বাদ দিয়ে বরং ওর মাতাল ভাইটাকে দেখ হাত করতে পার কি না।

গোপী মিস্তিরের ব্যস্তভাবে প্রবেশ

গোপী। হুজুর, হুটু মোক্তার—

শিব। হুটু মোক্তার?

গোপী। ফিরে এসেছে হুজুর।

শিব। হুটু ফিরে এসেছে?

গোপী। বিবেচনা করুন, উকিল হয়ে ফিরে এসেছে।

শিবনারায়ণ গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন

এসেই মহাভারতকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেল।

উকিলের প্রবেশ

উকিল। জামিন হ'ল না কর্ত্তাবাবু।

শিব। দেবনারাণ!

দেব। বাবা!

শিব। মহেন্দ্র জ্যোতিষীকে ডাক তো। আমার কোষ্ঠীখানা একবার দেখাবার প্রয়োজন হয়েছে। (চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিলেন) একটা কথা গোপী, হুটুর সঙ্গে দেখা হ'লে আমাকে যেমন সম্মান কর, তেমনই সম্মান করবে। দেবনারাণ, তোমাকেও কথাটা বলছি। আমাকে "তুমি তুমি" ব'লে কথা বল, হুটুকে বলবে "আপনি", দেখা হ'লে আগে তুমি নমস্কার করবে।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

হুটু মোক্তারের শহরের বাসা

ঘরের মধ্যে নির্গমনপথে আমের শাখা দেওয়া পূর্ণ ঘট। বিমলা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পরনে লালপেড়ে শাড়ি, হাতে একটি থালায় আশীর্ব্বাদী ফুল, সদ্য সে পূজা করাইয়া ফিরিয়াছে। চুল এলো; এলো চুলের উপর অল্প ঘোমটা। উকিলের বেশে গাউন পরিয়া হুটু বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল

হুট। (সবিস্ময়ে) আরে বাপরে! এসব কি?

বিমলা। পূজো দিয়ে এলাম ঠাকুরদের।

হুট। (হাসিয়া) ভাগ্যে তোমরা আছ বিমলা, তাই তো দেবলোক আজও বেঁচে আছেন। নইলে বেচারারা শুকিয়ে ভারতলোকের অধম অবস্থায় উপনীত হতেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। তারপর, কি কামনা করলে?

বিমলা। তোমার জয় কামনা করলাম, আর কোন্ কামনা করব?

হুট। কত টাকা মানত করলে?

বিমলা। মানত করেছি, তবে সে টাকা নয়।

হুট। বল কি?

বিমলা। আজ তোমায় আমি কটু কথা বলব না প্রতিজ্ঞা করেছি। কটু কথা বলছি না, ঠাট্টাও করছি না—সত্যি কথাই বলছি, টাকা

মানত করি নি, টাকা কামনা করি নি—এমন কি লক্ষ্মীর পুজো পর্য্যন্ত করাই নি। এতে লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদী নেই।

হুট। (অপ্রস্তুত হইয়া হাসিয়া) তবে কি মানত করলে?

বিমলা। বুকের রক্ত। মানত করেছি, বুক চিরে রক্ত দিয়ে পুজো করাব।

হুট। তোমার জয় হোক বিমলা, তোমার জয় হোক।

বিমলা। না, চিরদিন যে পরাজয় মেনেই এসেছে, হঠাৎ তার জয় সহ্য হবে না। (পরমুহূর্ত্তেই হাসিয়া) ওই দেখ, স্বভাব যায় না ম'লে; যা বলব না বললাম, তাই ব'লে ফেললাম। বেশ, আমার জয় হোক; কিন্তু তোমার জয়েই তো আমার জয়।

হুট। দাও, আশীর্ব্বাদী দাও।

মাথা নত করিল

বিমলা। কি মানুষ তুমি! আমায় কি তোমার মাথায় হাত দিতে আছে? অ ঠাকুরঝি—কল্যাণী-ঠাকুরঝি! অ ভাই!

কল্যাণীর প্রবেশ

হুট। এ কি কল্যাণী? এ কি বোন? তোমার এই ময়লা বেশ-ভূষা, জীর্ণ একখানা—

কল্যাণী। কদিন কাপড়-চোপড় ক্ষারে কাচা হয়ে ওঠে নি দাদা।

হুট। কেন? তুমি কাপড়-চোপড়—

বিমলা। দেখ, তুমি কাপড় কাচার নাম ক'রো না বলছি। শুভ কাজে যাচ্ছ। না।

হুট। যারা তোমার সঞ্চয়-করা মালিন্য পরিষ্কার ক'রে তোমার সংসার পরিচ্ছন্ন পবিত্রতায় ভ'রে দেয়, তাদের নাম কখনও অশুভ নয় বিমলা। তুমি কি কাপড়-চোপড় ধোপা-বাড়ি দাও না কল্যাণী?

কল্যাণী। নিজেই ওগুলো ক'রে নিই দাদা। কেন মিছে—

হুট। না, মিছে নয় বোন। তুমি আমার বোন, এতে যে আমার নিন্দে হবে কল্যাণী।

বিমলা। বেশ তো, মামলা জিতে একখানা কাশীর গরদ এনে দিও ঠাকুরঝিকে। অন্য কিছু না নিক ঠাকুরঝি, গরদ আমি নেওয়াব।

এখন মাথা নামাও। ও ঠাকুরঝি, আশীর্ব্বাদী দাও তো তোমার দাদার মাথায়।

কল্যাণী। ওরে বাপরে! আমি কি দাদার মাথায় হাত দিতে পারি বউদি?

বিমলা। বোনে সব পারে ঠাকুরঝি। ব্রাহ্মণের বোন, পৈতের চেয়েও বড়, পৈতে থাকে গলায়, বোনের ঠাঁই মাথায়।

সুট। (বিমলার দিকে রূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া মাথা নত করিল) দাও কল্যাণী, আশীর্ব্বাদ দাও।

কল্যাণী কুণ্ঠিতভাবেই আশীর্ব্বাদী মাথায় ঠেকাইয়া দিল

বিমলা। ও শ্যামা, ও মমতা! তোরা কি করছিস সব? অরুণ কোথায়?

নেপথ্যে শ্যামা। আসছি মা।

শ্যামা, মমতা ও অরুণের প্রবেশ, অরুণের কপালে চন্দনের ছাপ, পরনে গেঞ্জি ও নূতন কাপড়

বিমলা। অরুণের আজ জন্মদিন। তোমার তো সকাল থেকে অবসরই ছিল না। প্রণাম কর অরুণ।

শ্যামা। দাদাকে কি দেবেন বাবা?

অরুণ সুটুকে প্রণাম করিল

সুট। কি দেব? দেব শুধু আশীর্ব্বাদ। জীবনে যেন আদর্শচ্যুতি তোমার না ঘটে। আদর্শের সত্যকেই যেন সকলের চেয়ে বড় করতে পার।

অরুণ মাকে প্রণাম করিল

বিমলা। আমি আশীর্ব্বাদ করি বাবা, সংসারে তুই সুখী হ'স; তোর স্নেহে তোর স্ত্রীপুত্র যেন সুখী হয়।

সুশোভনের একটা মাছ লইয়া প্রবেশ। মাছটা ফেলিয়া দিয়া

সু। সুটুদার শুভযাত্রা অ্যাণ্ড অরুণের বার্থ-ডে ফীস্ট। Both the purposes will be served।

সুট। আজও তুমি মদ খেয়েছ সুশোভন? কোর্টে আজ তোমায় সাক্ষী দিতে হবে।

সু। অল্প একটু সুটুদা, অল্প—মাইরি বলছি। তবে ইউ সী, ভোড্‌কার গন্ধটাই খারাপ।

সুট। এ মাছ তুমি কোথায় পেলে?

সু। সে ভারী মজার কথা সুটুদা। তোমার শত্রু—ওই বাবুদের পুকুরের মাছ, তোমায় জয়যাত্রা দেখাতে নিয়ে এসেছি।

সুট। নিয়ে যাও এ মাছ।

সু। মাইরি বলছি, চুরি করি নি। আমায় দিলে, মাইরি বলছি।

সুট। দিলে? কে দিলে?

সু। বুড়ো বড়বাবু হঠাৎ বেহালা শোনাবার জন্যে ডেকেছিল। The old man is really amusing—a darling! আমায় দুটো টাকা দিলে। ঠিক সেই সময় ওদের মাছ ধ'রে নিয়ে এল; আমি বললাম, টাকা চাই না, আমায় একটা মাছ দিন। He gave me both money and fish।

সুট। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত সুশোভন, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। আরও একটা কথা। তুমি তোমার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। (হাতঘড়ি দেখিয়া)

চলিয়া যাইতে যাইতে মাছটা পায়ে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দিয়া চলিয়া গেল

কল্যাণী মমতা বিবর্ণ হইয়া গেল

সু। এটা কি হ'ল? অ্যাঁ? What is this? চুরি করি নি, ভিক্ষে নিই নি, সে আমায় দিলে। আগে বাদশারা একখানা গান শুনে কত জায়গীর দিয়ে গেছে, এ তো একটা মাছ!

বিমলা বাহিরে গিয়া মাছটা লইয়া আসিল

বিমলা। ওঁর মেজাজই ওই রকম ভাই। কিছু মনে ক'রো না।

কল্যাণী। না বউদি, সুটুদা রাগ করবেন।

বিমলা। ছেলে কি ওঁর একার ঠাকুরঝি? আমার কি কোন অধিকার নেই? এই মাছের মুড়ো দিয়েই অরুণ আজ ভাত খাবে।

সু। That's like you বউদি! মাইরি বলছি বউদি, আমাকে সম্মান ক'রে দিলে। আমিই বরং বেশ দুকথা শুনিয়ে দিয়েছি। আমায় বললে কি জান? মমতার সঙ্গে ওদের বাড়ির গাঁতাল

ছেলেটার বিয়ের কথা বললে। আমি বললাম, সে অসম্ভব। আমি নিজে মাতাল, কিন্তু আই হেট দি মাতালস্। তার ওপর আপনাদের ছেলে, আন্‌কাল্‌চার্ড মূর্খ।

স্থটুর মুহুরীর প্রবেশ

মুহুরী। সুশোভনবাবু, আপনি শিগগির চলুন। এখুনি হয়তো ডাক পড়বে। আমি ছুটতে ছুটতে আসছি। আসুন মশায়, সুশোভনবাবু।

সু। (পকেট হইতে শিশি বাহির করিয়া মদ খাইল) ওয়ান মিনিট প্লীজ; একটু সাহস সঞ্চয় ক'রে নিই। চলুন এইবার।

মুহুরী ও সুশোভনের প্রস্থান

কল্যাণী। এক এক সময় ইচ্ছে করে বউদি—

বিমলা। সে ইচ্ছে কি বউদিদিরই হয় না ভাই? কিন্তু ও ইচ্ছে দমন করতে হয়।

কল্যাণী। ছোড়দার জীবন বেশিদিন নয়, তাই আমি ওকে বলতে পারি না—তুমি যাও।

বিমলা। তা যদি বলতে ঠাকুরঝি, তবে আমি তোমাকে ঘেন্না করতাম। এস ভাই; রান্নার আজ অনেক বাকি, এস, একটু হাত দেবে এস।

বিমলা ও কল্যাণীর প্রস্থান

শ্যামা। দাদা, মমতা তোমার জন্যে কি এনেছে দেখ।

অরুণ। আগে তোরটা দেখি। তুই কি দিচ্ছিস?

শ্যামা। আমি কার্পেটের জুতো তৈরি ক'রে রেখেছি।

অরুণ। শ্রীচরণে শু—এস-এইচ-ও-ই!

শ্যামা। দাদার জুতোয় হাত দিতে আমাদের আপত্তি নেই। কিন্তু অন্য কারও বেলা বড় জোর জামা কাপড়টার ভার নিতে পারি। তাই তো মমতা এনেছে নিজের হাতে কাটা সুতোয় তৈরি কাপড়। আর—আর যা এনেছে মমতা, সে শুধু একা তোমার নয়, আমারও ভাগ আছে—গান।

মমতা। না ভাই, গান আমি গাইতে পারব না।

অরুণ। সে হয় না মমতা। গাও—গাও। না গাইলে আমি দুঃখিত হব। "সেই অগ্নিশিখা, জ্বালো—জ্বালো!"

মমতার গান

নেপথ্যে বিমলা। শ্যামা!

শ্যামা। বাবা বাবা! আসছি।

প্রস্থান

মমতা। আমার আরও কিছু দেবার আছে।

গলায় কাপড় দিয়া প্রণাম করিল

অরুণ। বিজয়িনী হও।

নেপথ্যে স্থট। বিমলা, বিমলা!

অরুণ। (দরজার দিকে অগ্রসর হইল) বাবা!

মমতা বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল

স্থটু ব্যস্তভাবে প্রবেশ করিল

স্থট। একখানা বই, আর নোট-করা কয়েকখানা কাগজ—

ব্যস্তভাবে বাড়ির ভিতরে গেল, সঙ্গে সঙ্গে অরুণও গেল। পুনরায় বিমলা ও স্থটু প্রবেশ করিল

সুশোভনের এজাহারে কোর্টের মধ্যে লজ্জায় আমার মাথাটা কাটা গেল বিমলা।

বিমলা। ছিঃ, ও কথা তোমার মুখে সাজে না। বড় বড় গাছে ফুল ফোটে, ফল ধরে; কত পাখি আশ্রয় নেয়—আবার সাপও থাকে। তাতে কি গাছের মাথা হেঁট হয়? সে চিরদিন আকাশ-মুখেই বাড়ে। ও কথা ব'লো না। কল্যাণী-ঠাকুরঝি শুনলে কি মনে করবে বল দেখি?

স্থট। কল্যাণী আমার নীলকণ্ঠের বিষ বিমলা, কল্যাণী আমার নীল-কণ্ঠের বিষ।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

আদালত-সন্নিকটবর্ত্তী শহরের চৌমাথা। খবরের কাগজের হকার হাঁকিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে কানে কলম, হাতে কাগজের তাড়া, আদালতের টাউট চলিয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে কোর্টের পিওনের হাঁক শোনা যাইতেছে—

কঙ্কণা গাঁয়ের মুকুন্দ ঘোষ—হাজির হো! মুকুন্দ ঘোষ, কঙ্কণা গাঁয়ের মুকুন্দ ঘোষ!

দুইজন টাউট কথা বলিতেছে

১ম। ওরে বাপ রে, বাপ রে! হুটুবাবু আগুন ছুটিয়ে দিলে। বাবুদের সাজানো খোলস পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

২য়। রুদ্রবাবুও ছাড়ে নাই। ওই যে মাস্টারনীর ভাইকে জেরা ক'রে বেশ একহাত নিয়েছে হুটুবাবুকে। পয়েন্টোটি ভারী ধরেছিল, বলে—তুমি হুটুবাবুর হবু-বেয়াই!

১ম। তা সে যাই হোক, মাতাল হোক আর ছ্যাচড়ই হোক—আসল মামলায় ওর সাক্ষী খারাপ হয় নাই। হুটুবাবুর সাহস বটে—দু-তিনটে সাক্ষী ছাড়া, সব সাক্ষীকে হস্টাইল ব'লে জেরায় সব ঠিক বার ক'রে নিলে! তুমি দেখো, হুটুবাবু এই মামলাতেই বড় উকিল হয়ে গেল। হিরণপুরের বাবুদের দাঙ্গার মামলা দেবার জন্যে বাবুদের লোক ঘুরছে।

নেপথ্যে কোর্ট-পিওন। হেরম্ব পাল, হেরম্ব পাল, হাজির হো! হেরম্ব পাল!

২য়। ওরে বাবা, এ যে আমার মক্কেল হে! হেরম্ব, ও হেরম্ব!

প্রস্থান

১ম। ও মশায়, ও মশায়, ও হিরণপুরের সরকার মশায়! শুনুন, শুনুন।

গোপী ও দেবনারায়ণের প্রবেশ

দেব। এ যে সব বিপরীত হয়ে গেল গোপী! সাক্ষীদের একটাও টিকল না! এক-একজনকে এক এক মুঠো টাকা, সব বরবাদ গেল! বেইমানি করলে সব!

গোপী। আজ্ঞে না, জেরায় টিকল না। বিবেচনা করুন সচক্ষে দেখলেন, জেরায় টিকল না। হুটু মোক্তার হ'ল অনর্থের মূল। সব হস্টাইল ব'লে জেরা আরম্ভ করলে! আর বিবেচনা করুন, সত্যি জিনিসটাই পাজি জিনিস, বিবেচনা করুন, পারার মতন পাজি জিনিস, কিছুতেই হজম হয় না, ফুটে বেরুবেই।

দেব। এখন উপায়?

গোপী। হাইকোর্টে আপীল করব, ভাবছেন কেন? বিবেচনা করুন, বাবারও বাবা আছে।

দেব। এই সব এজাহারের পর হাইকোর্টে কোন ফল হবে না।

গোপী। ওই কথাটি বলবেন না হুজুর। তবে বলি শুনুন, এই আপনার ১৩১৪ সালে—ইংরিজী ১৯০৮, লাট কমলপুরের দখল নিয়ে দাঙ্গা, ১৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার, বিবেচনা করুন, আমি বার বার বারণ করলাম, যদি পাই রাজ্যদেশ, তবু না যাবে বৃহস্পতির শেষ। বারণ করলাম—আজ থাক। তা সেজোবাবু—

দেব। (বাধা দিয়া) গোপী, তুমি একবার মহাভারতকে দেখ, হুটুবাবুর সঙ্গেও দেখা কর। মামলা মিটমাট কর।

গোপী। মিটমাট করবেন?

দেব। হ্যাঁ। মিটমাট করব। সায়েব-সুবোর কাছে আমাদের সুনাম একেবারে নষ্ট হবে। ওই মহাভারত যাচ্ছে। তুমি ডাক ওকে। আমি একটু স'রে যাই। ভয় নেই, তোমার পুরস্কার তুমি পাবে। ডাক মহাভারতকে। কথা বল।

প্রস্থান

গোপী। মহাভারত! ওহে মহাভারত! বলি শোন হে, শোন।

মহাভারতের প্রবেশ

মহা। মিটমাট আমি করব না হে। আর কিছু বলবে তো বল।

গোপী। আরে শোন—শোন।

মহা। (গোপীর মুখের কাছে বুড়া আঙুল নাড়িয়া) খট খট লবডঙ্কা!

খট খট লবডঙ্কা! জমি নাই, কাড়বি কি? ঘর নাই আগুন লাগাবি কিসে? খট খট লবডঙ্কা! আর আমার করবি কি?

গোপী। জমি ফিরে পাবে, ঘর তৈরি ক'রে দেব। নগদ টাকাও কিছু আদায় ক'রে দেব। (চুপিচুপি) বারো আনা তোমার, সিকি কিন্তু আমাকে দিতে হবে।

মহাভারত। (হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর নেপথ্যের দিকে চাহিয়া ডাকিল) দাদাঠাকুর! ও দাদাঠাকুর!

হুটু ও তাহার মুহুরীর প্রবেশ

হুট। কি মহাভারত? আরে, আপনি যে? মিত্তির মশাই!

গোপী। প্রণাম।

মহা। দাদাঠাকুর, মিত্তির বলছে মিটমাট করতে।

হুট। মিটমাট!

গোপী। আজ্ঞে হ্যাঁ, বিবেচনা করুন; মিটমাট।

হুট। (গোপীর দিকে চাহিয়া) দুটি শর্ত্তে মিটমাট হতে পারে মিত্তির মশাই।

গোপী। আজ্ঞে, বিবেচনা করুন, দুশো শর্ত্ত মানতে রাজি আছি। কর্ত্তাবাবু বললেন কি জানেন, বললেন—হুটুবাবু হলেন আমাদের গাঁয়ের গৌরব।

হুট। কর্ত্তাবাবু বয়স্ক লোক, আমার বাপের বয়সী, তাঁকে আমার প্রণাম জানাবেন।

গোপী। আপনার শর্ত্ত কি বলুন?

হুট। প্রথম শর্ত্ত, এই মিটমাটের কথা, বাবুদের, অবশ্য কর্ত্তাবাবুকে বাদ দিয়ে, ঢাক কাঁধে বাজিয়ে, শহরে জানাতে হবে। আর মহাভারতের পোড়া ঘর এখনও ছাওয়ানো হয় নি, সেই চালে উঠে বাবুদের ছাওয়াতে হবে।

গোপী। (হাতজোড় করিয়া) আজ্ঞে বিবেচনা করুন, হাইকোর্টের পরে সে কথা বিবেচনা করা যাবে। প্রণাম তা হ'লে।

প্রস্থান

হুট। সুশোভন কোথায় জান মহাভারত?

মহা। ছোটদাদাঠাকুর আপনার তালে আছে দাদাঠাকুর। আদালত থেকে দু টাকা খোরাকি পেয়েছে, আজ পাকী মদের দোকানে ব'সে গিয়েছে। মদ খাচ্ছে আর তালপাতা নিয়ে কি বুনছে।

হুট। একবার ডাক তো তাকে।

মহাভারতের প্রস্থান

মুহু। তিনটে মামলার কাগজ নিয়ে লোক ব'সে আছে।

হুটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে চাহিল

হুট। মামলা?

মুহু। একটা দায়রা। হিরণপুরের জমিদারদের—

হুট। জমিদারদের?

মুহু। আজ্ঞে, শরিকে শরিকে দাঙ্গা।

হুট। শরিকে শরিকে? ভাল।

মুহু। আমি ফী বলেছি চার টাকা।

হুট। ব'লে দাও, দশ টাকার কম আমি কাগজ ছোঁব না।

মুহু। আজ্ঞে, বেশি টানলে ছিঁড়ে যাবে বাবু।

হুট। ছিঁড়ে যায়, ফেলে দাও।

মুহু। আর দুটো এস. ডি. ও.-র কোর্টের মামলা। মক্কেল গরিব, তাদের তা হ'লে—

হুট। তাদের কেস আমি নিলাম। যা ফী দেবে তাই নেব আমি।

মুহু। যে আজ্ঞে।

প্রস্থান

একজন উকিল আসিয়া হুটুর করমর্দ্দন করিল

উকিল। My hearty congratulations, হুটুবাবু। ব্রিলিয়াণ্ট—ব্রিলিয়াণ্ট জেরা হয়েছে। এইবার আর্গুমেণ্ট।

হুট। থ্যাঙ্কস।

উকিল। গভর্মেণ্ট প্লীডার বলছিলেন কি জানেন?

নেপথ্যে সুশোভন। (মত্তকণ্ঠে) লং লিভ হুটুদা।

উকিল। ও লোকটাকে কেন আশ্রয় দিয়েছেন হুটুবাবু? না না, আপনার মত—

হুট। আশ্রিতের চরিত্র কি বিচার করা চলে? রাজা পরীক্ষিৎ কলিকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমাকে মার্জ্জনা করবেন পাঁচ মিনিটের জন্যে।

উকিল। ওদিকে টিফিনের সময় পার হয়ে গেল প্রায়।

প্রস্থান

সুশোভন ও মহাভারতের প্রবেশ। সুশোভনের বগলে বেহালা। হাতে তালপাতার মুকুট

সু। You are glorious, you shall be victorious, there is no doubt। আমি তোমার জন্যে ক্রাউন তৈরি ক'রে এনেছি হুটুদা, crown made of palmleaves, here it is।

তালপাতার তৈরি একটা মুকুট বাহির করিল

হুট। জান সুশোভন, আমার সন্তান যদি তোমার মত হ'ত, তবে তার মুখে আমি নিজের হাতে বিষ তুলে দিতাম।

সু। (চমকিয়া) কেন হুটুদা?

হুট। কেন, সেই কথা তুমি জিজ্ঞাসা করছ সুশোভন?

সু। (রাগ করিয়া) Of course I know my defects, আমি মাতাল। কিন্তু আমি তো কারু কোন ক্ষতি করি না হুটুদা। দু-চার পয়সা, দু-চারটে জিনিসও চুরি করি, কিন্তু তোমার আর কল্যাণীর ছাড়া অন্য কারু নয়। আপন গড, তোমার দিব্যি—

হুট। সুশোভন, তোমার মরণই মঙ্গল। তোমার আত্মহত্যা করা উচিত।

প্রস্থান

সু। মহাভারত!

মহা। দাদাঠাকুর।

সু। বেহালা বাজাব শুনবে?

মহা। এই রাস্তার ওপর দুপুর রোদে?

সু। শোন, শোন।

বেহালা বাজাইতে আরম্ভ করিল। হঠাৎ থামিয়া গেল

জান মহাভারত, পটাসিয়াম সায়ানাইড ব'লে এক রকম বিষ আছে, সে জিবে ঠেকাবামাত্র মানুষ ম'রে যায়। কোন যন্ত্রণা হয় না।

মহা। না না দাদাঠাকুর, ও কথা তুমি মনে ঠাঁইও দিও না। বড়-দাদাঠাকুরের রাগ এমনিই বটে।

সু। অনেক সময় ভাবি, এখান থেকে চ'লে যাই। কিন্তু ভয় হয় কি জান, মরবার সময় বড় কষ্ট পাব। এখানে মরবার সময় কল্যাণী সেবা করবে, কাঁদবে, তুমি কাঁদবে, মমতা কাঁদবে, অরুণ কাঁদবে, বউদিও কাঁদবে মহাভারত, সবচেয়ে বেশি কাঁদবে বউদি, তাতে আমি ম'রেও সুখ পাব।

মহা। দাদাঠাকুর, আজ থেকে তুমি আমার ঘরে থাকবে দাদাঠাকুর। বড়দাদাঠাকুর রাগ করে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ আমি চুকিয়ে দেব।

ব্যস্তভাবে গোপী মিত্তিরের প্রবেশ

গোপী। বাবু! বাবু! (চারিদিক চাহিয়া) বাবু!

প্রস্থান

দুইজন টাউটের প্রবেশ

১ম। অদ্ভুত! অদ্ভুত আর্গুমেন্ট করছে হুটুবাবু! অদ্ভুত! চোখ দুটো যেন জ্বলছে।

২য়। বলছ কি?

১ম। আগুন ছুটিয়ে দিলে। এস, শুনবে তো এস।

প্রস্থান

হুটুর মুহুরীর প্রবেশ

মু। মহাভারত, শিগগির এস।

মহা। আমি আসছি দাদাঠাকুর।

উভয়ের প্রস্থান

গোপী ও দেবনারায়ণের প্রবেশ ও ব্যস্তভাবে অন্য দিক দিয়া প্রস্থান

সু। (উঠিয়া) "আমি তো তোমারে চাহি নি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ।" কবি, তোমাকে আমি প্রণাম করি।

বলিতে বলিতে প্রস্থান

দৃশ্যান্তর

কোর্ট রুম

জজ—জুরিগণ—উকিল—আসামী—দর্শক

হুট্ আর্গুমেণ্ট করিতেছে

হুট্। ইওর অনার, সমস্তই আমি নিখুঁতভাবে প্রমাণিত করেছি ব'লে আমার বিশ্বাস। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে, এক অত্যাচারী ধনীর অপরাধে, তারই একজন অনুগ্রহপুষ্ট দুর্ব্বলের ওপর দণ্ডবিধান করা ছাড়া ধর্ম্মাধিকরণের গত্যন্তর নেই। অবশ্য সে বিচার একজন করবেন। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র বিরাজমান, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, তিনি এর বিচার করবেন। তাঁর দরবারে যে অভিযোগ-পত্র দাখিল হবে, তাতে মাত্র এই অভিযোগটুকুই থাকবে না। ভগবানের পুত্রকে ক্রুসে বিদ্ধ করার অপরাধ তাতে যোগ হবে। ভগবানের পুত্র একবারই মাত্র ক্রুসে বিদ্ধ হন নি। বার বার তিনি বিদ্ধ হচ্ছেন। মানুষ ভগবানের সন্তান, তার মনুষ্যত্ব যেখানে এই কালী বাগদীর মনুষ্যত্বের মত পিষ্ট হয়, সেখানেই ভগবানের সন্তান ক্রুসবিদ্ধ হন। এর বিচার ভগবান করবেন। সে বিচারের রায়ের সামান্য অংশ আমরা জানি, ঈশ্বরের পুত্র মহামানব যীশুখ্রীষ্ট আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেছেন—It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a richman to enter into the kingdom of God। সর্ব্বশেষে বিচারকের কাছে ঐ নির্ব্বোধ হতভাগ্য অপরাধীর জন্যে করুণা প্রার্থনা ক'রে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

উপবেশন

জজ। (জুরিদের প্রতি) জেণ্ট্‌ল্‌মেন!

জুরি। আমাদের পরামর্শ করবার প্রয়োজন নেই হুজুর, প্রত্যেকেই একমত—আসামী দোষী। We find him guilty।

জজ। I accept your verdict and condemn the accused to five years R. I.

ক্রমশ

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামের মেয়ে

বিলক্ষণ ছোটাছুটির পর ট্রেনটা ধরা গেল। বাক্স-বিছানাগুলো ঠিকঠাক গুনে নেবার পর এতক্ষণে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। রুমাল দিয়ে ঘর্ম্মাক্ত কপালটা মুছে ফেলে রঞ্জন বললে, এইজন্যেই শাস্ত্রকারেরা লিখেছেন, 'পথি-নারী বিবর্জ্জিতা'।

রেণু ফোঁস ক'রে উঠল, বা-রে, এখন সব বুঝি আমার দোষ হয়ে গেল! কেন মশাই, আর দু ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বেরোলে কি হ'ত?

গাড়ি ততক্ষণে প্ল্যাটফর্ম্মের বাইরে এসে পড়েছে। লোহায় লোহায় যান্ত্রিক শব্দ শুরু হয়েছে এবং দুজনের নিভৃত আলাপের পক্ষে প্রচুর সুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। কামরাটাকেও মোটামুটি নিরিবিলিই বলা চলে।

রঞ্জন বললে, তা হ'লে মোগলসরাই স্টেশনের মেড়ো-যাত্রীর মত লটবহর নিয়ে ব'সে থাকতে হ'ত। প্রিয়ে, যদি তুমি ইংরেজ-মহিলা হতে, কিছুতেই এতবড় কথাটা—

রেণু নিদারুণ চ'টে গেল। এক 'প্রিয়া'-সম্বোধনই তাকে ক্ষেপিয়ে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট।

হুঁ! লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটে না এলে বুঝি সোয়াস্তি হয় না?

তা কেন? তারা চলতি ট্রামে উঠতে জানে, দরকার হ'লে ট্যাক্সি, নিদেন রিক্‌শ নিয়ে স্টেশনে চ'লে আসতে পারে। তারা তো আর সচল লগেজ নয় যে, তাদের ঠেলাঠেলি ক'রে গাড়িতে তুলতে গিয়ে স্বামী-বেচারাকে গলদঘর্ম হতে হবে! নেহাতপক্ষে আধুনিক মেয়ে হ'লেও—

আগুনে আরও খানিকটা ঘৃতাহুতি পড়ল।

ওঃ, আমি বুঝি তোমার সচল লগেজ, না? তা হ'লে একটা বেরালচোখী মেমসায়েব কিংবা আধুনিক মেয়ে বিয়ে করলেই তো আপদ চুকে যেত।

রেণু জানলার বাইরে মুখ ফিরিয়ে বসল।

বিপন্ন হয়ে রঞ্জন বললে, ভুল যখন ক'রেই ফেলেছি, তখন তো আর চারা নেই। আপাতত ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম মরণং. তারপর—তারপর—

রেণু রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেললে।

না, সত্যি বড্ড বিশ্রী লাগে আমার। রাস্তায় বেরুলে লোকগুলো কি রকম করে দেখেছ? এমন হাঁ ক'রে চেয়ে থাকে!

দেখবার জিনিস পেলেই মানুষের লোভ হয়। তা ছাড়া হাঁ ক'রে থাকে, থাক না। ওই যখন ওদের স্বভাব—

বেজায় অসভ্য স্বভাব। গাড়ি-চাপাই পড়বে, না পাশের লোকের সঙ্গে ধাক্কা খাবে,—বেহায়াপনারও তো একটা সীমা আছে বাপু!

ওইজন্যেই তো ওদের সঙ্গে খানিকটা বেহায়া হওয়া দরকার। আধুনিক মেয়ে হ'লে কি করত জান? সোজা গিয়ে চ্যালেঞ্জ করত, অমন অসভ্যের মত চেয়ে আছেন কেন মশাই; নয় তো প্রশ্ন করত, আপনি কি আমার সঙ্গে আলাপ করতে চান?

রেণু শিউরে বললে, মাগো, এ আবার কোন্ দেশী অসভ্যতা! থাক মা তাকিয়ে, খালি চাউনিতেই তো আর গায়ে ফোসকা পড়ে না।

রেণুর উলটোপালটা কথায় রঞ্জন হেসে ফেললে।

ফোসকা যখন পড়েই না, তখন আর একটু স্মার্ট হবার চেষ্টা করলে ক্ষতি কি? এ হচ্ছে গতির যুগ, তোমরা এমন জবুথবু হয়ে থাক ব'লেই না দেশটার কিচ্ছু হচ্ছে না! জান না, কবি লিখে গেছেন—'না জাগিলে সব'—

রেণু বললে, থাম, থাম। কবিরা কিই বা না লেখে! এই তো একজন বিদ্রোহী কবি লিখেছে, 'ধরি বাসুকীর ফণা জাপটি'—কই, ধরুক তো একটা ঢোঁড়া সাপের ল্যাজ, বোঝা যাবে তা হ'লে!

রঞ্জন বিপন্ন হয়ে বললে, আঃ, এ কি নাবালিকার পাল্লায় পড়লাম! ওটা রূপকে, মানে রূপক, ওর আইডিয়া তুমি বুঝবে না।

থাক, বুঝেও দরকার নেই। আচ্ছা, তুমিও বেশ কবিতা লিখতে পার, কিন্তু ছাপা না কেন?

রঞ্জনের মনে এল, তোমার মত রসবোধ যদি সম্পাদকের থাকত! এবং সেইজন্যেই সে প্রসঙ্গটাকে চাপা দিয়ে ফেললে।

এমনিই, সে থাক। কিন্তু বাস্তবিক, একবার ভেবে দেখ, তোমরা গাঁয়ের মেয়েরা আজ কোথায় অন্ধকারে প'ড়ে আছ! মেয়েরা হবে পুরুষের সহধর্মিণী, কর্মী মানুষের পাশে পাশে পা ফেলে চলবে তারা। সাহস চাই, বল চাই।

রেণু ভুরু কুঁচকে বললে, আই. এ., বি. এ. পাস করলেই বুঝি মেয়েদের খুব সাহস বাড়ে?

উত্তর দিতে রঞ্জনের একটু দ্বিধা করতে হ'ল, হ্যাঁ, অনেকটা তাই বইকি।

রেণু অত্যন্ত মনোরম ভঙ্গিতে ঠোঁট দুটি বাঁকিয়ে বললে, ইঃ, তাই বইকি! আমার পুঁটিদি তো বি. এ. পড়ে, গতবার পুজোর সময় দেশে এসে সে কি কাণ্ড! রাত্তিরে ঘরের পেছনে শেয়ালের ডাক শুনেই পুঁটিদির ফিট। শেষে নাকে সেরটাক লঙ্কা আর গোলমরিচের ধোঁয়া দিতে, তবে তার জ্ঞান হয়।

তোমারই তো পুঁটিদি, তার দৌড় আর কত হবে! তা ছাড়া হয়তো তার মিরগি রোগ ছিল, ওটা উপলক্ষ্য মাত্র।

মিরগি না আরও কিছু। পুঁটিদির স্বাস্থ্য তোমার চাইতে ঢের ভাল, দারুণ বাস্কেটবল খেলতে পারে। জ্ঞান হ'লে পর কি করেছিল জান? বার পাঁচ-সাত কেবল বিড়বিড় ক'রে বলছিল, হাউও অব বাস্কারভিল, হাউও অব বাস্কারভিল! আর যে কদিন বাড়িতে ছিল, শেয়াল ডাকলেই ছুটে এসে দিদিমাকে জড়িয়ে ধরত।

ওটা ব্যতিক্রম মাত্র, একজনকে দিয়েই সমস্ত শিক্ষিতা মেয়েকে বিচার করতে নেই। এই ছবিটা দেখ, মিস ন্যান্সি বার্টন। উইম্বলডেন টেনিসে দারুণ নাম করেছে।

হাতে একটা 'ইলাস্ট্রেটেড ইয়োরোপ' পত্রিকা ছিল। রেণুকে পরাস্ত এবং বশীভূত করবার জন্যে রঞ্জন এইবার সেটা ব্যবহার করলে।

অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে রেণু ছবিটা দেখতে লাগল।

বাব্বাঃ, কি চোয়াড়ে চেহারা মেয়েটার! যেন একটা ষণ্ডা পুরুষ দাড়িগোঁফ কামিয়ে শেমিজ প'রে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সংশোধন ক'রে রঞ্জন বললে, শেমিজ নয়, ওটা ওর ফ্রক।

ও একই কথা। আচ্ছা, ও যেন কি করেছে বলছিলে?

যা করেছে, তা ভীষণ। ওদেশের সেরা টেনিস খেলার জায়গা হচ্ছে উইম্বল্‌ডেন ক্লাব। সেখানকার সব ঝানু ঝানু খেলোয়াড়কে হারিয়ে দিয়েছে।

রেণুর মনোযোগ গভীরতর হ'ল, বোধ হয় মেয়েটির কৃতিত্বে সে মুগ্ধ হয়েছিল। উৎফুল্ল হয়ে রঞ্জন জিজ্ঞেস করলে, কি দেখছ?

রেণু আরও খানিকটা অভিনিবেশসহকারে ছবিটা লক্ষ্য ক'রে বললে, দেখছি একটা জিনিস। ফোটোতে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ওর নাকটা বেশ খ্যাঁদা ব'লে মনে হচ্ছে না তোমার?

এত মনোযোগ দিয়ে সে খ্যাঁদা নাকটা পর্যবেক্ষণ করছিল?

উইম্বল্‌ডেন টেনিসের মর্ম রেণু বুঝবে না, সুতরাং রঞ্জন ক্ষুণ্ণ হয়ে বিষয়ান্তরে এল। পৃষ্ঠাটা উলটে বললে, এই দেখ জার্মান মেয়ে মিস এমিলিয়া স্মিট—নাম-করা এরোপ্লেন-পাইলট। আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকায় যাওয়ার কম্পিটিশনে ফার্স্ট হয়েছে। আর এই দেখ ডোরা প্যাংক্রিজ, ফ্রান্সের সেরা নাচিয়ে—

কিন্তু রেণু এবার লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

ছি ছি, কি অসভ্য! কোন্ লজ্জায় এমন ক'রে ছবি তুলেছে বল তো? গায়ে আর একটু কাপড় জড়ালে কি ওর মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত নাকি?

তুমি অসভ্য বলছ কাদের? জান, ওদের আদর্শ অনুসরণ ক'রেই আমরা আজ সভ্যতার পথে এগিয়ে চলেছি?

রক্ষে কর বাপু, দরকার নেই আমার অমন সভ্যতায়। জন্ম জন্ম যেন এমনই গেঁয়ো থাকতে পারি, সেই ঢের ভালো আমাদের পক্ষে।

রঞ্জন মৃদু হেসে বললে, ওইখানেই তো ভারতীয় মেয়েদের ট্র্যাজেডি।

যাত্রাপথ রীতিমত দীর্ঘ। বেলা চারটে থেকে আটটা পর্যন্ত ট্রেন, সেখান থেকে শেষরাত্রি অবধি স্টীমার। কিন্তু সেখানেও শেষ নয়।

নৌকা ক'রে আরও অন্তত পাঁচ-ছ ঘণ্টা পাড়ি জমালে গোটা বারোর মধ্যে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো যাবে।

পথ রঞ্জনের চেনা নয়, কিন্তু রেণুর কণ্ঠস্থ। প্রত্যেকটি স্টেশনে সে গলা বাড়িয়ে দেখতে লাগল, খুলনা আর কতদূরে। আমনধানের ঘন সবুজ ক্ষেতের ওপর মন্থর সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে লাগল, চতুর্দশীর উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় দূর বনান্তের ওপর স্বপ্নরোমাঞ্চ ছড়িয়ে পড়ল। রেল-লাইনের বাঁধের নীচে চাঁদ ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল এবং জ্যোৎস্নায় রেণুর আগ্রহব্যাকুল মুখখানাকে বিচিত্র দেখাতে লাগল।

কিন্তু অসুবিধের একশেষ হ'ল খুলনা ঘাটে পৌঁছোবার পরে। কুলির সঙ্গে বিস্তর দরকষাকষি ক'রে যখন স্টীমারে ওঠা গেল, তখন দেখা গেল, তিলার্ধ জায়গা নেই। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জায়গা নিয়ে অনেকেই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছেন, বিস্তর তোষামোদ এবং মহিলার ওজর দেখিয়ে কোনওক্রমে একটুখানি ঠাঁই ক'রে নেওয়া সম্ভব হ'ল। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। ঠিক নীচেই আবার স্টীমারের বয়লার। কিছুক্ষণ বাদেই সেখান থেকে এমন তাপ উঠতে লাগল যে, বিছানা ছেড়ে ট্রাঙ্কের ওপর আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় রইল না।

রেণু হেসে বললে, রাতটা কোনমতে এভাবেই কাটাতে হবে। নৌকোয় ওঠবার আগে আর ঘুমোবার জো নেই বাপু।

রঞ্জন বিরস মুখে বললে, তোমাকে নিয়েই তো আরও হাঙ্গাম। তোমার ওই পেল্লায় ট্রাঙ্কটা তুলতেই প্রায় পনরো মিনিট কেটে গেল, নইলে আগে এলে বেশ জায়গা পাওয়া যেত।

এইবা নেহাত মন্দ কি!

অগত্যা। কিন্তু মেয়েদের কেবিনে দিয়ে আসব তোমাকে? এখানে এই ভিড়ের চাইতে—

রেণু ত্রস্ত হয়ে বললে, না না, কেবিনে আমার দরকার নেই। অতটুকু ঘরের ভেতর যা ভিড়, আমার তো একেবারে দম আটকে আসে। তা ছাড়া পুরুষেরা তবু ভদ্রতা ক'রে মেয়েদের জায়গা ছেড়ে দেয়, মেয়েদের তো আর সে বালাই নেই। সামান্য খুঁটিনাটি নিয়ে এমন ঝগড়া করে যে, শুনলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।

রঞ্জন খুশি হয়ে বললে, এই তো তোমাদের কাল্‌চার! একটু স্বাধীনতা-স্পৃহা নেই, মনের জোর নেই, তোমরা আবার পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দাবি কর! এক পা পথ চলতে দিয়েও তোমাদের মত মেয়েদের বিশ্বাস করা চলে না।

রেণু স্বীকার ক'রে নিয়ে বললে, বটেই তো।

বাড়ির মাঝী জলিল ওদের নিতে এসেছিল, সুতরাং স্টীমার-ঘাটে নৌকো করবার জন্যে বিব্রত হতে হ'ল না। ছোট খালটি দিয়ে নৌকোটি যখন যাত্রা করল, আকাশ তখন প্রথম সূর্যের আরক্ত আভায় রঙিন হয়ে উঠেছে। খালের ধারে ধারে গ্রামগুলির ওপর জাগরণের ছোঁয়াচ লেগেছে, দুদিকের শিশির-ভেজা বন-জঙ্গল থেকে সোঁদা মাটি আর লতাপাতার বিচিত্র গন্ধ নাকে আসছিল। খালের ধারে কোথায় একটা শিউলি-ফুলের গাছ শরতের স্পর্শে মুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে। তারই দু-চারটি ফুল জোয়ারের স্রোতে ভেসে চলেছিল।

ভাল ক'রে হাত-পা ছড়িয়ে রেণু বললে, বাবাঃ, এতক্ষণে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম। এইবারে ঠিক দেশের আমেজ লাগছে। মামা আমাদের দেখে কি যে খুশি হবেন, তাই ভাবছি এখন।

তোমার মামারা বুঝি খুব বড়লোক?

তা মন্দ নয়, ঢের জমিদারি আছে। চর থেকে বিস্তর ধান আসে বছরে।

হঠাৎ রঞ্জন চকিত হয়ে উঠল।

আচ্ছা, এই—তোমার মামার বাড়ির দেশে ম্যালেরিয়া নেই তো?

রেণু বললে, ইস্, ম্যালেরিয়া! এদেশের জল-হাওয়া পুরী-দার্জিলিঙের চাইতে একটুও খারাপ নয়। ছ মাস তুমি কাটাও না এখানে, তোমার মাথা-ধরা কিংবা ডিস্পেপ্‌সিয়ার ধাত কেমন ভাল হয়ে যায় দেখ।

রঞ্জন বললে, দুর্ভাগ্য, সে সুযোগ হবে না। তা ছাড়া পুরো ছ মাস পাড়াগেঁয়ে নারীবৃন্দপরিবৃত হয়ে কাটাব—ওঃ, সে অসম্ভব।

রেণু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললে, আচ্ছা, পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের সম্বন্ধে তুমি সর্বদাই কেন এমন ক্ষেপে থাক বল তো? শহরের মেয়েদের চাইতে তারা কোন্ অংশে কম?

সব অংশেই। পাড়াগেঁয়ে মেয়ে পুরুষের সহধর্মিনী হতে পারে না, পাশে এসে দাঁড়াতে পারে না কোন দিন। তাদের সীমা অন্দর এবং ভাঁড়ার পর্যন্ত, তার বাইরে বাইরে তারা অনাবশ্যক বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়।

হুঁ।—ব'লে রেণু চুপ ক'রে রইল।

দু পাশের বাঁশবনের আড়াল দিয়ে সূর্যের আলো খালের জলে এসে পড়ল, সুপারির কাঠ ফেলা খালের ঘাটে ঘাটে একটি একটি ক'রে নরনারীর আবির্ভাব হতে লাগল। ঘোমটার ফাঁকে ফাঁকে কৌতূহলী চোখগুলি এই নৌকোর দিকে তাকিয়ে রইল, দু-একটা অস্পষ্ট মন্তব্য ভাল ক'রে শোনা গেল না।

গোটা কয়েক বাঁক ঘুরে খালটা যেখানে গিয়ে পড়ল, সেটাকে ছোটখাটো একটা নদী বলা চলে। সেই বড় খালের মুখে ঢোকবা-মাত্র অনুমান করা গেল, ভাঁটার প্রখর টানে খালের জল ঠিক ওদের বিপরীত দিকে নেমে চলেছে।

হাতের দাঁড়টা তুলে নিয়ে জলিল বললে, দিদিমণি, মুশকিল হ'ল।

দুজনেই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, কেন রে?

দেখছেন না, ভাঁটার টান দিয়েছে? লগি ঠেলে গেলেও তো সাঁঝের আগে পৌঁছোবার জো নেই।

রেণু বললে, নৌকোয় গুন আছে না?

তা তো আছে। গুন টেনে গেলে অবিশ্যি তাড়াতাড়িই হয়, কিন্তু হাল সামলাবে কে?

রেণু রঞ্জনের মুখের দিকে তাকালে, তুমি পারবে না? তোমার তো এসব অভ্যেস আছেই।

সেই মুহূর্তে মেয়েদের আশ্চর্য স্মরণ-শক্তি অনুধাবন ক'রে রঞ্জন মুগ্ধ হয়ে গেল। বিয়ের অনেক আগে কবে একদিন সে নিজেকে আহিরী-টোলা রোয়িং ক্লাবের মেম্বার ব'লে পরিচয় দিয়েছিল এবং তিন আনা

সত্যে তেরো আনা খাদ মিশিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিল। আজ প্রায় এক বৎসর পরেও রেণু সে কথা মনে রেখেছে।

পারব না কেন, তবে অনেক দিনের অনভ্যাস—

রেণু আশ্বাস দিয়ে বললে, অনভ্যাস তো কি হয়েছে, হাল ধ'রে বসলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর এসব এমন জিনিস, একবার শিখলে তো আর ভোলা যায় না।

মনে বিপন্ন বোধ করলেও এক্ষেত্রে সেটাকে প্রকাশ করা চলে না। রঞ্জন মনে করলে, কোন রকম একটু এদিক ওদিক নাড়াচাড়া করলেই হালটাকে সামলে রাখা যাবে, কাজটা এমন কিছু শক্ত নয়।

কিন্তু গঙ্গার স্রোতে আরও আঠারোজনের সঙ্গে বাচের নৌকোর দাঁড় টানার সঙ্গে পূর্ববঙ্গের খালে এক মাল্লাই নৌকোর হাল ধরাতে যে কত তফাত, সেটা সে তখনও অনুমান করতে পারে নি।

গুনের দড়ি-দড়া ঠিক ক'রে নিয়ে জলিল নৌকো পাড়ে ভিড়িয়ে আনলে। তারপর গুন ঘাড়ে ক'রে নেমে পড়ল। খালের ধারে ধারে কাশবন আর বেতঝোপের আশেপাশে গুন-টানা মাঝীদের পায়ে পায়ে সরু একটি পথের রেখা প'ড়ে গিয়েছে, সেই পথ ধ'রে সে এগিয়ে চলল।

রঞ্জন হাল ধ'রে বসল।

রেণু বললে, ও কি? ওভাবে বোটে ধরে নাকি কেউ?

বাঁ হাতটা ওপরে দিয়ে সংশোধন ক'রে নিয়ে রঞ্জন সপ্রতিভভাবে বললে, জানি, জানি। ঠিক ক'রেই নিচ্ছি সব, এই দেখ না।

কিন্তু স্বামীর বিদ্যার পরিমাণ যাচাই ক'রে নিতে রেণুর পাঁচটি মিনিটও সময় লাগল না। বিচিত্র নৌকোটার ব্যবহার! জলিলের কাছে তো দিব্যি ভালই চলছিল, কিন্তু হস্তান্তর ঘটবামাত্র তার মেজাজ বেঠিক হয়ে গেল। খামকা ভদ্রলোককে অপদস্থ করবার ষড়যন্ত্র ছাড়া একে আর কি বলে!

জলিল অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল, তাই পেছনের ব্যাপারটা সে বেশ ক'রে লক্ষ্য করতে পারে নি। কিন্তু নৌকোটার গতিবিধি রঞ্জনের কাছে ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠতে লাগল। খালের মাঝখানে বার দুই-তিন সে বোঁ বোঁ ক'রে পাক খাওয়ার চেষ্টা করলে। তারপর রঞ্জনের

সহস্র শাসনকে অমান্য ক'রেই এক গোঁ মেরে সোজা বেতবনের মধ্যে গিয়ে ভিড়ল।

রেণু বললে, বাঃ, এ করছ কি?

আর এ করছ কি! রেণু না হয় ছইয়ের মধ্যে ব'সে ছিল, কিন্তু রঞ্জনের অবস্থা ততক্ষণে রীতিমত করুণ হয়ে উঠেছে। বেত-কাঁটার অসংখ্য শাখা-প্রশাখা তখন তাকে নিবিড় প্রেমে আঁকড়ে ধরেছে, জামা-কাপড় এবং নাক-মুখের ওপর ছরছর ক'রে কাঁটার আচড় লাগতে লাগল।

রেণু শিউরে বললে, ইস, কাঁটায় তোমার সারা গা ছিঁড়ে গেল যে! লগি ঠেলে বেরিয়ে এস না শিগগির।

কিন্তু লগি ঠেলে বেরোনোরই কি জো আছে! বেতবনের নীচে নরম চটচটে পলিমাটি, লগি তাতে আটকেই রইল। টেনে আর তোলা যায় না।

গাছ-কোমর বেঁধে রেণু বেরিয়ে এল, হয়েছে হয়েছে, বুঝেছি তোমার দৌড়। স'রে যাও, আমি নৌকো বের ক'রে নিচ্ছি।

অপমানিত বোধ ক'রে রঞ্জন বললে, দাঁড়াও না।

প্রচণ্ড এক ধাক্কায় নৌকোটা আট দশ হাত ছিটকে বেরিয়ে এল বটে, কিন্তু লগিটাও হাত থেকে খ'সে গেল। কাদার মধ্যে সেটা আটকে রইল তো রইলই।

প্রচুর কৌতুক এবং প্রচুরতর বিদ্রূপ নিয়ে রেণু রঞ্জনের মুখের দিকে তাকালে।

এই বুঝি তোমার রোয়িং ক্লাবের বিদ্যে? দাও তুমি বোটে আমাকে, দেখ, আমি সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি।

তোমার চাইতে আমি বুঝি কম পারব?

কিন্তু বেশি পারবার পরিচয়ও সে দিতে পারলে না। নৌকো যদিবা কোনক্রমে আবার খালের মধ্যে ফিরে এল, তার স্বেচ্ছাচারের কোনও পরিবর্তন ঘটল না।

রেণু এবার এক রকম জোর ক'রেই তার হাত থেকে বোটে কেড়ে

নিলে। বললে, হুঁ, তোমার মতন মানুষ হাল ধরলেই হয় আর কি! তা হ'লে এই খালেই আজ সারা রাত্তির কেটে যাবে।

রঞ্জন বিস্মিত হয়ে বললে, কিন্তু তুমি হাল ধরতে পারবে?

রেণু মুখ টিপে হাসলে: পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তো। আমাদের স্মার্টনেস নেই বটে, কিন্তু এসব একটু আধটু জানা আছে।

রেণু সত্যি সত্যিই হাল ধরলে, এবং সবচাইতে এটাই বিস্ময়কর যে, রঞ্জনের বহু চেষ্টাতেও যে নৌকোটা কিছুতেই বাগ মানতে চাইছিল না, রেণুর হাতে সে নিতান্ত সুবোধ ছেলেটির মতো ব'য়ে চলল এবং ভাঁটার বিপরীতমুখী জল লঘু তরল কৌতুকের হাসির মত ছলাৎ ছলাৎ ক'রে নৌকোর গায়ে আঘাত করতে লাগল।

রঞ্জন বললে, ছিঃ ছিঃ, লোকে কিছু একটা মনে করবে!

রেণু তার মুখের ওপর স্নিগ্ধোজ্জ্বল চোখ রেখে বললে, মেয়েরা মোটর-এরোপ্লেন চালালে সেটা যদি গৌরবের হয়, তা হ'লে নৌকোর বেলাতেই কিছু একটা মনে করবে কেন?

কথাটার ভেতরে যে ছোট্ট একটু খোঁচা ছিল, এই মুহূর্তে সেটুকু রঞ্জনকে স্পর্শ করল না। প্রভাতের রৌদ্রে বিস্তৃত খালের জল উল্লসিত হয়ে উঠেছে, তীরে তীরে শরতের কাশবনের প্রসন্ন শুভ্রশ্রী। দুদিকে বরিশালের অকৃপণ ধানক্ষেত, একটু একটু ক'রে তাতে রঙ ধরতে শুরু হয়েছে। সজল, পরিপূর্ণতার একটা বিচিত্র বর্ণে গন্ধে বাতাস যেন মন্থর হয়ে উঠেছিল। এক পাশে জলের ওপর দিয়ে বন্যাফলের ঝোপ যেন আয়নায় মুখ দেখবার জন্যে নত হয়ে পড়েছে, তারই ডালে পাতায় কয়েকটা দোয়েল নাচানাচি করছিল। খালের এখানে ওখানে নলখুরি ফুলের লতা জলের মধ্যে নেমে এসেছে, রাশি রাশি ফুলে লতাগুলি সমৃদ্ধ।

কিন্তু এমন অপরূপ প্রকৃতির রূপজগতে রেণুকে অস্বাভাবিক সুন্দরী দেখাল। নৌকোর গলুইয়ে সে হাল ধ'রে বসেছে, খালের জলে সূর্যের যে আলোকদীপ্তি প্রতিফলিত হচ্ছিল, তারই আভাতে রেণুর গলার হার এবং হাতের আংটি চিকচিক ক'রে জ্বলতে লাগল। এতক্ষণের অসংস্কৃত ও অপেক্ষাকৃত অসংযত চুলগুলোকে সে অযত্নে

খোঁপা ক'রে জড়িয়ে রেখেছে, প্রচুর বাতাসে তারই কয়েকটি অবাধ্য চুল গালে-কপালে ছড়িয়ে পড়ল। হালটাকে এলোমেলোভাবে আলোড়ন করানোর সঙ্গে সঙ্গে হাতের চুড়িগুলো ঠুনঠুন ক'রে বাজতে লাগল, যেন জলের কল-কল্লোলের সঙ্গে চুড়ির মিষ্টি শব্দটা একতানে মিলে গিয়েছে।

রঞ্জন অনুভব করলে: মনের ওপর দিয়ে যেন একটা অভিনব মুগ্ধতা নেমে আসছে। এতদিন পরে রেণুকে যেন তার সহজ পরিমণ্ডলটির মধ্যে ঠিকমত চিনে নেওয়া গেল। মনে হ'ল, আধুনিক ড্রয়িংরুমের জাপানী ফুলদানিতে বন-গোলাপকে মানায় নি ব'লেই তার মূল্য ক'মে যায় না। তারও নিজস্ব জগতে নিজস্ব পরিচয় আছে, সেখানে সে মহীয়সী।

রঞ্জন মৃদুকণ্ঠে বললে, কিন্তু তোমাদের মাঝীটা কি ভাবছে বল তো?

রেণু বললে, জলিল? ও আবার কি ভাববে? আজ বিশ বছর এ বাড়িতে চাকরি ক'রে মাথার চুল পাকিয়ে ফেলেছে, কিছু ভাববার মত মানুষ ও নয়।

সত্যিই সে কিছু ভেবেছে বা ভাবতে পারে ব'লে মনে করা গেল না। প্রশান্ত দৃষ্টিতে একবার এদিকে তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে গুন টেনে চলল। রঞ্জনের এইটুকু সান্ত্বনা রইল যে, তার অক্ষমতাটা সে দেখতে পায় নি। নৌকো যখন বেতঝোপে ঢুকে পড়ে, সে তখন হিজলবনের আড়ালে ছিল।

রঞ্জন বললে, সত্যি, এবার সরো। আমি এখন বেশ ঠিক ক'রে নোব।

রেণু হেসে বললে, থাক, আর বীরত্ব দেখাতে হবে না তোমাকে। তুমি একটু চুপটি ক'রে ব'সে থাক তো লক্ষ্মীটি, নইলে তোমার ছবি-ওলা বিলিতী পত্রিকাটা বের ক'রে যা হয় একটা গল্প-টল্প পড়। তুমি পড়লে আমি অনেকটা বুঝতে পারি, যেটুকু না পারব, সেটুকু তুমি বাংলা ক'রে বুঝিয়ে দিও।

কিন্তু গল্প পড়া হ'ল না। বাইরের পৃথিবীকে আর কখনও এত মধুর এবং মনোরম ভাবে আস্বাদ করেছে ব'লে রঞ্জনের মনে পড়ল না।

রেণুর কাছে হার মানতে হয়েছে সত্যি, কিন্তু সেজন্যে এতটুকু পরাজয়ের বেদনা সে বোধ করলে না। বরং সমস্ত চিন্তার ওপর দিয়ে একটা কথাই বার বার ঘুরে যেতে লাগল, আজ এ না হ'লে পরস্পরের অনেকখানি পরিচয়ই পরস্পরের কাছে অজানা থেকে যেত।

ঘণ্টা-খানেকের মধ্যেই খালের আর একটা বাঁক এল। এখান থেকে নৌকো পাশের আর একটা ছোট খালে নেমে পড়ল। কিন্তু এবার আর রেণুকে হাল ধরতে হ'ল না—জল এবার ওদের গতিপথের অনুকূলেই চলেছে। গুনের দড়ি গুটিয়ে জলিল স্বস্থানে ফিরে এল।

এতক্ষণে আবার কুজনালাপের নির্বিবাদ অবকাশ এল। রঞ্জন বললে, তোমার এ বিদ্যেটার কথা আগে জানতুম না কিন্তু।

রঞ্জনের সম্পর্কে রেণুর মনে বোধ হয় এক ধরনের সহানুভূতি এসেছিল। তার ডানহাতখানা নিয়ে সে অন্যমনস্কের মত নাড়াচাড়া করতে লাগল।

যাঃ, এ আবার একটা বিদ্যে! এ তো খুব সোজা, গাঁয়ের প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েই এসব পারে। সত্যি, আর এক বছর পড়লে ঠিক ম্যাট্রিকটা পাস করতে পারতুম। আচ্ছা, তুমি আমাকে বাড়িতে পড়াবে?

রঞ্জন উত্তর দিলে না।

নৌকোর মন্থর প্রশান্ত গতি, তার ওপর দিয়েই দুপুরের অলস-রৌদ্র ম্লান হয়ে এল। প্রচুর বাতাস আর রেণুর স্নেহ-কোমল-স্পর্শ-মধুর উপস্থিতি, এর মধ্যেই কোন এক সময় রঞ্জনের চোখে ঘুম নেমে এসেছিল। যখন চমক ভাঙল, রেণু তখন আস্তে আস্তে ডাকছিল, এই, ওঠ, ওঠ, এসে গেলুম যে।

ধড়মড় ক'রে সে উঠে বসল। খালের ধারে ধারে ততক্ষণে সুপারি-বন আর তার আড়ালে আড়ালে টিনের চালা চোখে পড়ছে। বাঁড়ুজ্জেদের বাঁধা ঘাটের সামনে এসে যখন ডিঙি থামল, তখন বিকেলের রাঙা আলো খালের জলে কচুরি-পানার বেগুনী ফুলের চূড়োয় চূড়োয় ঝিকমিক করছিল।

ঘাটের ওপরেই ঠিক বাড়িটা নয়,—পরপর তিনখানা বাগান পেরিয়ে

তারপর বাঁড়ুজ্জেদের চকমিলান চণ্ডীমণ্ডপ। জলিল বললে, নামুন দিদিমণি।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে এবং চপলতায় রেণু অপরূপ হয়ে উঠেছে। রেণু বললে, তুই যা, খবর দিয়ে আয় আগে। কেউ নিতে না এলে গিয়ে উঠব, কুকুর নাকি আমরা!

জলিল সহাস্যে বললে, আচ্ছা।

কলকাতার ধূলি-ধূসরতার বাইরে এসে মুক্তির যে আনন্দে রেণুর মন পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, সে আনন্দ এই মুহূর্তে বোধ হয় একটু মাত্রাহীন হয়ে পড়েছিল। দুষ্টু কৌতুকের আলোয় রেণুর কালো চোখ জলজল ক'রে উঠল। রঞ্জন ততক্ষণে নৌকোর পেছনে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক ক'রে নিচ্ছে, এ অবস্থায় এ প্রসাধনটুকু অপরিহার্য।

রেণু বললে, দেখবে, তোমাকে একটু জব্দ করব?

রঞ্জন চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বললে, কি জব্দ করবে আবার?

প্রশ্ন করতে দেরি আছে, উত্তর দিতে নেই। ঠিক সেই মুহূর্তেই ছোট্ট ডিঙিতে প্রচণ্ড একটা দোলা লাগল এবং চুলের মধ্যে চিরুনি চালাতে চালাতেই মিষ্টি একটা খিলখিল হাসির সঙ্গে রঞ্জন জলে প'ড়ে গেল।

শরতের জোয়ারে খাল কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে, যেখানে সে পড়ল, জল সেখানে মাথার ওপর। রেণুর কাছে সুইমিং ক্লাব কিংবা রোয়িংয়ের যত গল্পই সে করুক, সাঁতারটা ভাল জানা ছিল না। দুর্ভাগ্য আবার একাও আসে না। সময় বুঝেই আটচল্লিশ বছরের কোঁচা তার পায়ে জড়িয়ে গেল এবং—

এবং পরক্ষণেই রঞ্জন টের পেলে, সে ডুবে যাচ্ছে। আঁকুপাঁকু ক'রে

ওঠবার যত চেষ্টাই করে, তীরের থেকে সে ততই আরও দূরে স'রে যায়।

তৎক্ষণাৎ ঝপাং ক'রে একটা শব্দ কানে এল এবং তারপরেই চুড়ি-ওয়ালা দুখানা কোমল হাত তাকে আঁকড়ে ধরল। গ্রামের মেয়ের হাত, তাই কেবল ললিত-লবঙ্গলতাই নয়, রীতিমত যে শক্তি রাখে তারও পরিচয় পেতে দেরি হ'ল না। জড়াজড়ি করতে করতে রেণু তাকে বুক-জলে ঘাটের সিঁড়ির ওপর এনে ফেললে।

হাঁপাতে হাঁপাতে রেণু বললে, সত্যি, ওখানে যে অত জল, তা আমি বুঝতে পারি নি। হাসতে হাসতে এখুনি কান্নার জো ক'রে নিয়েছিলুম। তা ছাড়া এই বা কেমন ক'রে জানব যে, দু বছর আহিরীটোলা রোয়িং আর সুইমিং ক্লাবের মেম্বার থেকেও তুমি ভাল ক'রে সাঁতারটা অবধি শেখ নি?

রঞ্জন সে কথার উত্তর দেবার আগেই দেখা গেল, সুপুরি-বাগানের ভেতর দিয়ে মেয়ে-পুরুষে প্রায় তিরিশজন কলকণ্ঠে তাদের অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে আসছে।

রেণু লজ্জায় লাল হয়ে বললে, এখন কি ক'রে এইভাবে ওদের সামনে জল থেকে উঠব বল তো?

রাত্রে শোওয়ার সময় রেণু বললে, তোমার সেই বিলিতী পত্রিকাটা কোথায় গেল? মেম-সায়েবদের ছবিগুলো একটু দেখাও না।

রঞ্জন তাকে কাছে টেনে এনে বললে, সেটা কোথায় হারিয়ে ফেলেছি।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

তরবারি

যায় যাক সব যাক, উড়ে পুড়ে হোক খাক
সামলিয়ে পারি নেকো চলতে—
ফাঁকা নয় শুধু ঘর, খাঁখাঁ-করা এ শহর
ফুঁ দিয়ে নেবায় মন-পলতে।
কি দোষ করেছি মোরা দেবতা,
বলি চাও, যাহা চাও দেব তা;
যাহা নেবে নাও নাও, রবে যা তা রেখে দাও,
বিচারের মোহজালে পারি না যে প্রতিদিন
মনে মহন আপনারে ছলতে।

মানুষ করেছে পাপ, দেবতার অভিশাপ
নেমে আসে মানুষের স্কন্ধে,
যাহা ছিল ফুলহার, হয় হোক তরবার,
শির পাতি লব মহানন্দে।
শোণিতে হউক পূত ধরণী,
মৃত্যুই জগতের সরণি—
তুমিই ভুলায়ে রাখো, ফুলসাজে অসি ঢাকো
যূপকাষ্ঠের বলি তাহারে শঙ্কাহীন
কর বহু ছলনা-প্রবন্ধে।

হান তরবারি তব, সে আঘাত বুকে লব,
শুধু রাখিও না দ্বিধাগ্রস্ত,
প্রলয়-পরশ লাগি কত বল আর জাগি—
কভু নির্ভয় কভু ত্রস্ত!
হে দেবতা, ক্রূর তব কুঠারে
করায়ো না বৃথা নামা-উঠা রে—
মৃত্যুর মুখামুখি পারি যেতে তাল ঠুকি
তূর্য্যের ধ্বনি কর, বাজায়ো না মৃদুবীণ
বিপদে করি আশ্বস্ত।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ আচার্য্য

সরোজিনী

৯

পরের দিন সন্ধ্যার পরে মন্থ চক্রবর্ত্তী আসিয়া হাজির হইল। হাঁকিয়া কহিল, মাস্টার আছ নাকি?

তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া কহিলাম, কি ব্যাপার? এত হাঁকাহাঁকি করছ কেন?

মণীন্দ্র কপাল কুঁচকাইয়া কহিল, কেন? কাউকে ভয় করি নাকি?

কহিলাম, তুমি হয়তো কর না, আমাকে তো করতে হয়। ঘরে এসে ব'স, যা বলবার বল এখানে।

কঠোর কণ্ঠে মণীন্দ্র কহিল, দেখ মাস্টার, দুগড়ের চ্যাং-লোকগুলোকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না; এত ভয় তো কাল রাতদুপুরে সলা-পরামর্শ করতে গিয়েছিলে কেন?

শুনুন দেখি কথা! যেন আমি আমার নিজের গরজে সাধিয়া যাচিয়া গিয়াছিলাম।

কড়া গলায় কহিলাম, দেখ মন্থদা! বোকার মত যা-তা ব'লো না।

মন্থ দমিয়া গিয়া আহত স্বরে কহিল, আমি বোকা! এতবড় জমিদারি চালাচ্ছি—

খুব চালাচ্ছ তুমি! ভাগ্যে দারোগাবাবু আর আজিজ সাহেব ব'লে-ক'য়ে দিচ্ছে।—বলিতে বলিতে ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম। মন্থ পিছুপিছু আসিয়া কাঁধে হাত দিয়া কহিল, মা কালীর দিব্যি বলছি, দারোগা-বাবুদের কিছু করতে হয় না, সব আমি একাই করি।

বসিয়া কহিলাম, ভাল কথা। দারোগাবাবুকে তাই বলব।

মন্থ ভয় পাইয়া কহিল, দারোগাবাবুকে কি আবার বলতে যাবে?

বলব, তুমি বলেছ, দারোগাবাবু কিছু করে নি, তুমি একাই সব করছ।

মন্থ ঢোঁক গিলিয়া কহিল, হ্যাঁ, তাই তো। দারোগাবাবুরা প্রথমে সবাইকে ডেকে ব'লে দিয়েছিলেন, তারপর তো যাবামাত্র সব বাকি-বকেয়া মিটিয়ে দিচ্ছে, ওঁদের তো আর কিছু বলতে হয় নি।

তা হ'লে দারোগাবাবু কিছু করে নি বলছ কেন?

মন্থ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, বাঃ রে! তা আবার কখন বললাম? আর যদি মনের ভুলে কিছু ব'লেই ফেলেছি, তা দারোগাবাবুকে বলতে যাবার কি দরকার? তুমিও দেখছি, হেরো-রেধোর জুড়ি হচ্ছ দিন দিন। চুপ করিয়া রহিলাম। আমার হাঁটুর উপর হাত দিয়া কহিল, দেখ ভায়া, গাঁয়ের মধ্যে তোমাকেই আপনার লোক ব'লে জানি; তাই মনের কথা সব খুলে বলি তোমাকে। তুমি যদি আবার তাই ঢাক পেটাতে থাক, তা হ'লে তো কথাবার্ত্তা বন্ধ ক'রে পেট ফেঁপে মরা ছাড়া উপায় থাকে না। ঢোক গিলিয়া কহিল, তার ওপর দারোগাবাবু সম্প্রতি যেন একটু খিঁচড়ে যাচ্ছে ব'লে মনে হয়।

প্রশ্ন করিলাম, কারণ?

মণীন্দ্র কহিল, কারণ একটু আছে।

প্রশ্ন করিলে মণীন্দ্রের দর বাড়িয়া যাইবে, সহজে বলিতে চাহিবে না। কাজেই অন্যমনস্কের মত বসিয়া রহিলাম। মণীন্দ্র একটু ঘেঁষিয়া আসিয়া নীচু গলায় কহিল, কারণ শুনবে তবে? আর একটু কাছে এস, কাউকে ব'ল না, মায় বউমাকে পর্য্যন্ত না। মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। মণীন্দ্র ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, যা যেখানে পাওনা ছিল, প্রায় সব আদায় হয়ে গেছে; তাই সরোজিনী বললে, দারোগা-বাবুকে পান খাবার জন্যে কিছু দেওয়া দরকার। তাই সেদিন একটা একশো টাকার নম্বরী নোট নিয়ে দারোগাবাবুকে দিতে গেলাম। দারোগাবাবু নিতে চাইলে না, বললে, পাগল হয়েছেন নাকি! কি এমন করেছি যে, এসব হাঙ্গামা করছেন। আপনার বোনের হাতে একদিন খাইয়ে দেবেন, তা হ'লেই হবে।

কহিলাম, বেশ ভাল কথাই তো বলেছেন।

মণীন্দ্র গরম হইয়া উঠিয়া কহিল, বেশ ভাল কথা বলেছেন?—বলিয়া ঘাড়টা কাত করিয়া আমার দিকে কিছুক্ষণ কটমট করিয়া তাকাইয়া

রহিল; তারপর ঘাড়টা সোজা করিয়া বার দুই লম্বভাবে নাড়িয়া কহিল, মাস্টারী বুদ্ধি কিনা! বামুনের বিধবা হয়ে একটা মেলেচ্ছকে বাড়িতে বসিয়ে খাওয়াবে? জাত-জন্ম রসাতলে যাবে না?

কহিলাম, এখন আর তাতে দোষ কি? শুভদৃষ্টি—

মণীন্দ্র খ্যাঁক করিয়া উঠিল, কি?

মানে চোখোচোখি তো হয়ে গেছে?

মণীন্দ্র কহিল, মানে?

সরোজিনী দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে থানায় গিয়েছিল না?

মণীন্দ্র ঠাণ্ডা হইয়া কহিল, গিয়েছিল তো।

তবে তাঁকে বাড়িতে এনে খাওয়াবার দোষ কি? তাতে তিনি সন্তুষ্ট হবেন, একশোটা টাকাও বেঁচে যাবে।

মণীন্দ্র কহিল, সত্যি বলছ, দোষ নেই?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, দোষ নাই।

মণীন্দ্র অনেকক্ষণ কপাল কুঁচকাইয়া, চোখ দুটা ছোট করিয়া, নাক চুলকাইতে চুলকাইতে ভাবিয়া কহিল, সরোজিনীকে একটু ব'লে দিতে পার?

কহিলাম, পাগল নাকি! আমি আবার কি বলতে যাব! তুমি বল গিয়ে।

মণীন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিল, তুমি বল গিয়ে! আমি বললে শুনবে? তা ছাড়া—। বলিয়া চুপ করিয়া গেল।

তা ছাড়া কি?

মণীন্দ্র মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, টাকাটা তো আর ফেরত দেওয়া হয় নি, সব খরচ হয়ে গেছে।

বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, দারোগাবাবু যে টাকা নেন নি, তা বলেছ ওকে?

মণীন্দ্র মুদ্রিত চক্ষে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তারপর চোখ খুলিয়া কহিল, ওদিকে দারোগাবাবু তাগাদা দিচ্ছে দেখা হ'লেই। কাল মনে হ'ল, একটু চটেছে।

কহিলাম, চটবে বইকি।

মণীন্দ্র রাগিয়া উঠিয়া কহিল, চটবে কেন? কেউ যদি তার বোনকে যার তার সামনে বার না করে, তাতে চটবার কি আছে? চুপ করিয়া রহিলাম। মণীন্দ্র কহিল, চুপ ক'রে রইলে যে, জবাব দাও?

কহিলাম, জবাব কি দোব? বরাবর সাচ্চা থাকলে তো তোমার কথাই সত্যি। তবে তখন এক রকম, এখন আর এক রকম করলেই তো গোলমাল কিনা। তা ছাড়া তোমার নিজের গলদ রয়েছে।

মণীন্দ্র অনুযোগের স্বরে কহিল, গলদ তো আমার সবটাই, তোমরা আর কখন আমার ভালটা দেখ! কিন্তু কি করা যায়, একটা পরামর্শ দিতে পার?

কহিলাম, আমার কথায় কাজ হবে না, তিনকড়িকে ধর গিয়ে।

মণীন্দ্র কহিল, ঠিক বলেছ, তিনকড়িকেই ধরিগে, ওর সঙ্গেই আজকাল খুব দহরম-মহরম, রাতদিন গুজগাজ। হ্যাঁ, মনে পড়েছে, কি পরামর্শ হ'ল কাল—অ্যাঁ?

কহিলাম, তুমি জান না?

ঘাড় নাড়িয়া মণীন্দ্র কহিল, জানি, জানি, সব জানি। আমার কি কিছু অজানা থাকে? একটু বেয়াড়া রকমের নিশ্বাস ফেললেও আমার কাছে খবর আসে।

কহিলাম, বল কি? গোয়েন্দা রেখেছ নাকি?

মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে, মণীন্দ্র ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হুঁ।

প্রশ্ন করিলাম, কে?

মণীন্দ্র নাক উঠাইয়া কহিল, বলব কেন?

চুপ করিয়া রহিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, ফুন্টি সব বলেছে আমাকে। পয়সা সস্তা হয়েছে কিনা! তা বই কেনবার টাকাটা কাকে দেওয়া হচ্ছে শুনি?

কহিলাম, তিনকড়ির হাতে। ওই বই কিনে নিয়ে আসবে। আঁতকাইয়া উঠিয়া মণীন্দ্র কহিল, পাগল হয়েছে নাকি! একসঙ্গে দশটা টাকা যে চোখে দেখে নি, তার হাতে অতগুলো টাকা! একেবারে হজম ক'রে দেবে। বলিয়া মুখ হাঁ করিয়া—হাত দিয়া খাইবার ভঙ্গি

করিয়া, চোখ ও মুখ বুজিয়া গিলিবার ভঙ্গি করিল। কহিলাম, তা ছাড়া কে আর কিনতে যাবে, আমার সময় নেই।

দুই চোখ চাড়াইয়া মণীন্দ্র কহিল, কেন, আমি?

কহিলাম, বেশ, তুমিও যেও। বই কি কি কিনতে হবে, আমি লিস্ট ক'রে দোব। দারোগাবাবুর টাকার মত যে গাফ ক'রে দেবে, তা হবে না।

মণীন্দ্র মর্ম্মাহত হইয়া কহিল, তুমিও ঐ কথা বলছ! মেলেচ্ছের নামে টাকা বামুনের বাক্সে তুলতে নেই, তাই নিয়েছি। না হ'লে সাধারণের টাকা আমি নিতে পারি? হাতে যে কুঠ হবে।—বলিয়া দুই হাতের আঙুল প্রসারিত করিয়া দুমড়াইয়া দিল।

হাসিয়া কহিলাম, তুমি কি বামুন নও নাকি, তুমি তুললে কি ক'রে?

পাগল! আমি তুলতে পারি? মেলেচ্ছের টাকা মেলেচ্ছকেই দিয়েছি—

বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, সে কি!

ঐ যে বুড়ো কাবলীওয়ালা, ওর কাছে ধার করেছিলাম আর বছর, তা বেটার চোখের চামড়া মোটেই নেই কিনা, তাগাদার চোটে একেবারে অস্থির ক'রে দিয়েছিল। সেই একশোটা টাকা বেটা কাবলী-ওয়ালার কবলেই দিলাম। কিন্তু দেখো, এসব কথা যেন সরোজিনীকে বলতে যেও না। তা হ'লে তোমার সঙ্গে মুখ-দেখাদেখি পর্য্যন্ত বন্ধ ক'রে দোব বলছি।

যেন তাহার মুখদর্শন করিবার জন্য দিবারাত্র ছটফট করিয়া মরিয়া যাইতেছি! কহিলাম, পাগল হয়েছ নাকি!

ঘাড় নাড়িয়া কড়া গলায় মণীন্দ্র কহিল, ঠাট্টা নয়, সত্যি! সাবধান ক'রে দিচ্ছি। মনু চক্রবর্ত্তীকে জান তো—এক কথা, পাহাড় টলে, তবু মনুর কথা টলে না।—বলিয়া ঘাড়টি ঘন ঘন নাড়িতে লাগিল।

১০

দিন চার পরে সন্ধ্যাবেলায় গাঙুলী মশায়ের বৈঠকখানায় গিয়া দেখিলাম, মস্তবড় এক মজলিস বসিয়া গিয়াছে। গাঙুলী মশায়, হারাণ,

রাধানাথ, দোলগোবিন্দ, আরও জনকয়েক পাড়ার লোক, এবং সকলের মাঝখানে বসিয়া আর একজন, যাহাকে ইহার পূর্ব্বে আমি সজ্ঞানে কোন দিন আমাদের গ্রামে দেখি নাই। ইহার বয়স পঞ্চাশ পার হইয়া গিয়াছে, দেহ শীর্ণ ও লম্বা, মুখে মাংস বলিতে কিছুই নাই, হাড়ের উপর কোনমতে চামড়া দিয়া ঢাকা; গাল দুইটিতে গভীর গর্ত্ত, চোখ দুইটি কোটরস্থ; নাকটি খাঁড়ার মত উঁচু ও চিলের ঠোঁটের মত বাঁকা; মাথার চুল ছোট ছোট করিয়া চারিদিকে সমানভাবে ছাঁটা; মাথার ঠিক মধ্যস্থলে কুকুরের অর্দ্ধকর্ত্তিত লেজের মত খাটো ও খাড়া টিকি। পরিধানে পাড়হীন ধুতি ও কেটের গলাবন্ধ কোট, এই ভ্যাপসা গরমেও গায়ে চাপাইয়া রাখিয়াছে। দরজার বাহিরে কর্দ্দমভারাক্রান্ত দেশী জুতা জোড়াটি যে ইহারই, তাহা বুঝিলাম; কারণ অন্য কেহ জুতা পরিয়া আসে নাই। ভদ্রলোক চাপিয়া বসিয়া আছে, হাতে হুঁকা। রাধানাথ পাশে বসিয়া একটি কলিকায় ফুঁ দিতেছে।

আমাকে দেখিয়া গাঙুলী মশায় অভ্যাসমত কহিলেন, এস ভায়া। —বলিয়া তাঁহার পাশে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন।

হারাণ মুচকি হাসিয়া কহিল, মাস্টার যে! এদিকের রাস্তাটা ভুলেই গেলে দেখছি।

রাধানাথ কলিকাটি হুঁকার মাথায় চাপাইয়া দিয়া কহিল, রাত দিন পরামর্শ দিতে দিতে সময় পায় না বেচারা।

অপরিচিত ভদ্রলোক দুই ভ্রূ নাচাইয়া প্রশ্ন করিল, কে?—

গাঙুলী মশায় কহিলেন, আমাদের গাঁয়ের এম. এ. পাস, গাঁয়ের স্কুলের হেডমাস্টার।

অপরিচিত ব্যক্তি হুঁকায় প্রাণপণে টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কহিল, এম. এ. পাসের কথা আর বলবেন না, রাস্তায় গড়াগড়ি যাচ্ছে আজকাল, আমাদের গাঁয়েই পাঁচ পাঁচ জন।—বলিয়া বাঁ হাতের পাঁচটি আঙুল প্রসারিত করিল।

চুপ করিয়া রহিলাম, আমার দিকে তাকাইয়া ভদ্রলোকটি স্বাভাবিক কর্কশ স্বরে কহিল, পাড়াগাঁয়ে প'ড়ে পচছ কেন? চাকরি-বাকরি আর জোটে নি?

বিনীতভাবে কহিলাম, আজ্ঞে না। হাত কচলাইতে কচলাইতে কহিলাম, একটা জুটিয়ে দিতে পারেন?

ভদ্রলোক কহিলেন, কি? চাকরি? ঘাড়টি কাত করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুইটি বুজিয়া কহিল, পারি।

হারাণ কহিল, ওঁকে যে-সে লোক মনে ক'রো না। ঝাকড়দা স্কুলের ফিফ্‌থ মাস্টার। কত জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ওঁর হাত দিয়ে পেরিয়ে গেছে।

ভদ্রলোক প্রসন্ন হাসি হাসিয়া কহিল, সত্যি। বিদেশে বেরোবার জো নেই, দুপাশাড়ি সব লটলট মাথা নামাচ্ছে। কেউ কেউ আবার পায়ের নীচে গড়াগড়ি। সেবার দেখুন না, কোথায় যাচ্ছিলাম, কি কাজে পানাগড় ইষ্টিশানে যেমনই নেমেছি, দেখি কোট-প্যান্ট-টুপি-পরা একজন বাঙালী সাহেব এসে পায়ের কাছে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের ওপরেই লুটিয়ে পড়ল। শশব্যস্ত হয়ে বললাম, কে, কে? উঠে দাঁড়াতেই দেখি, আমার ছাত্র গদাধর, ঐ ইষ্টিশানের মাস্টার। তারপর কি টানাটানি! একটু পায়ের ধুলো দিতেই হবে। বললাম, আরে, তা কি হয়! মোটে দু মিনিট গাড়ি দাঁড়ায়। গদাই বললে, তার জন্যে আপনার চিন্তা নেই। আমি না হুকুম দিলে গাড়ি ছাড়বার সাধ্য কি? তারপর ইষ্টিশানের ভেতরে নিয়ে গিয়ে, বসিয়ে খাবার-দাবার খাইয়ে যখন ছাড়লে, তখন প্রায় আধ ঘণ্টা দেরি হয়ে গেছে। ভ্রূ দুইটি যুক্ত করিয়া রাধানাথের দিকে চাহিয়া, ঘাড় নাড়িয়া কহিল, মনে কর, শুধু আমারই জন্যে গাড়ি আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইল। গাড়িসুদ্ধ লোক অবাক। এ লাট-সাহেবের খাতির তো!

গাঙুলী মহাশয় কহিলেন, সত্যি। স্কুল-মাস্টারদের মত খাতির কারও নেই। জজ-ম্যাজিস্ট্রেট পর্য্যন্ত মাথা নোয়ায়। আমাদের মাস্টারেরই দেখুন না; ও জুরি না হ'লে জজ-সাহেবের পছন্দই হয় না।

রাধানাথ তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া কহিল, কার সঙ্গে কি! বদন-গঞ্জ, আর ঝাকড়দা! কতবড় স্কুল ঝাকড়দার! নিজের চোখে তো দেখে এলাম।

ভদ্রলোক ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সত্যি। অতবড় স্কুল প্রায় দেখা

যায় না। আমার হাতে গড়া স্কুল তো। হেডমাস্টার পর্য্যন্ত মুখের সামনে কথা কইতে পারে না।

দোলগোবিন্দ আমাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল, ভায়া বোধ হয় ওঁকে চিনতে পারছ না? উনি প্রবোধ গাঙুলীর মামা। ওঁকে তোমরা দেখ নি। আজকাল তো আসা-যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন; আগে প্রায়ই আসতেন।

ভদ্রলোক কহিল, কতবার। দোলগোবিন্দর দিকে চোখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, কত ফুর্ত্তি করা গেছে তখন। কি সব দিনই গেছে!

সত্যি।—বলিয়া দোলগোবিন্দ সেই টানেই কাসিতে শুরু করিল।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, প্রবোধের স্ত্রী ম্লেচ্ছ নিয়ে যা কাণ্ড-কারখানা করছে, তাতে তো তার সঙ্গে জাত-জন্ম বাঁচিয়ে কোন বামুনের বিধবার বাস করা চলে না। তাই উনি ওঁর দিদিকে নিয়ে যেতে এসেছেন।

প্রশ্ন করিলাম, উনি খবর পেলেন কি ক'রে?

রাধানাথ ধমক দিয়া কহিল, তা তোমার জানবার কি দরকার?

তাহাকে উপেক্ষা করিয়া গাঙুলী মশায়ের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, রাধানাথ নিজে গিয়ে নিয়ে এসেছে।

রাধানাথ কহিল, কে খবর দিয়েছে, কে নিয়ে এসেছে, ওসব আলোচনার দরকার কি? প্রবোধ গাঙুলীর স্ত্রী যে দারোগার সঙ্গে মাখামাখি করছে, তা কি কেউ জানে না, না দেখে নি? পেটে খাবার লোভে অনেকের তা মনে পড়তে না পারে, কিন্তু যাদের সমাজের ওপর সত্যিকার দরদ আছে, দুপাতা ইংরিজী প'ড়ে যারা মেলেচ্ছ ব'নে যায় নি, তারা তা সহ্য করতে পারবে না।—বলিয়া ড্যাবডেবে চোখ দুইটার জলন্ত দৃষ্টি, কলিকাতার রাস্তায় হোস-পাইপ হইতে যেমন করিয়া জল ছড়ায়, ঠিক তেমনই ভাবে সারা মজলিসের লোকগুলার উপরে বুলাইয়া দিল।

হারাণ উচ্চকণ্ঠে কহিল, নিশ্চয়। বিষবৃক্ষ তো কেটে ফেলতেই হবে। তা ছাড়া আশেপাশে যারা আছে, তাদেরও বাদ দিলে চলবে না।—বলিয়া আমার দিকে কটাক্ষ করিল।

ইহা যে আমাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইল, তাহা বুঝিলাম। তবু না বুঝিবার ভান করিয়া কহিলাম, নিশ্চয়। তাই তো করা উচিত। কিন্তু যারা কাটতে যাবে, তারাও যেন নিজেরা একটু সাবধান থাকে, কারণ—

রাধানাথ ও হারাণ একসঙ্গে ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, কি কারণ?

গাঙুলী মশায় আমাকে থামাইয়া দিয়া কহিলেন, থাম ভায়া। হারাণকে কহিলেন, তুমি থাম দেখি। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া মারামারি ক'রো না। শুভকার্য্যের গোড়াতেই যদি এই গোলমাল হয় তো কোন কাজই হবে না। এখন সবাই মিলে পরামর্শ কর দেখি, কি ক'রে বুড়ীকে ঘর থেকে আনা যায়!

প্রবোধ গাঙুলীর মামা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ঠিক কথাই বলেছেন, বাজে কথায় সময় নষ্ট ক'রে লাভ কি? একটা সংসারে সব লোক সমান হয় না, তা এ তো একটা সমাজ, কেউ ভাল, কেউ মন্দ। যারা সমাজের মাথা, তাদের সব সামলে, সকলকে ভাল পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।—বলিয়া হুঁকায় মুখ দিয়া মৃদু মৃদু টানিতে লাগিলেন।

রাধানাথ কহিল, সত্যিই তো! কার সঙ্গে কার তুলনা! শুনছ সব, কেমন দামী দামী কথা! একেই বলে—মাস্টার। না হ'লে যত্ত সব—। বলিয়া আমার দিকে একটি দৃষ্টিশেল নিক্ষেপ করিল।

মাতুল মৃদু হাসিয়া কহিল, এ তো সাধারণ কথা। মাঝে মাঝে এক-একটা এমন কথা বলি, শুনে বড় বড় হাকিম পর্য্যন্ত হাঁ ক'রে থাকে, থই পায় না।

হারাণ কহিল, সত্যি, এই যা বলেছেন, তাই কি সবাই বুঝতে পেরেছে? ঐ মাথার চামড়া পর্য্যন্ত, ভেতরে আর ঢোকে নি।

গাঙুলী মশায় কথাটা চাপা দিবার জন্য কহিলেন, তা হ'লে কি করা যাবে? মাতুলকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, আপনি নিজে গিয়ে দেখা করবেন?

মাতুল ঘন ঘন ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে কহিল, পাগল! ও ম্লেচ্ছানীর বাড়িতে আমি পা দিই! আপনারা আমার কাছে দিদিকে পৌঁছে দিন, তারপর যা করবার আমি করব।

রাধানাথ সায় দিয়া কহিল, ঠিক তাই। আমাদের হাতে একবার পেলে, তার পরের ব্যবস্থা করবার জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না।

গাঙুলী মশায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রাধানাথের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, হাতে এনে দেবে কে? তুমিই যাও না।

রাধানাথ কহিল, আমার দ্বারা হবে না, এমনই তো আমার ওপর হাড়ে চ'টে আছে।

হারাণ কহিল, তা হ'লে মাস্টার চল, আমি বরং সঙ্গে যাচ্ছি।

সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল, সেই ভাল।

রাধানাথ ভ্রূ নাচাইয়া কহিল, তাই যাও হে। খুব তো ভাব দুজনে, বুঝিয়ে-শুঝিয়ে আনতে পারবে; তা ছাড়া একবার দেখাও হয়ে যাবে।

কহিলাম, না না। এসবের মধ্যে আমাকে টানবেন না।

রাধানাথ খ্যাঁক করিয়া উঠিল, মানে? সমাজে বাস কর না-তুমি? এম. এ. পাস ক'রে হেড-মাস্টারি কর ব'লে কেউ তোমাকে রেয়াত করবে না; না যাও তো সামাজিক শাস্তি হবে।

গাঙুলী মশায়ের দিকে তাকাইলাম, তিনি কোন প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বুঝিলাম, সরোজিনীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠতার জন্য ইঁহার মনেও আমার প্রতি বিরুদ্ধ ভাব জমিয়া উঠিতেছে; সকলে যদি আমাকে সামাজিক শাস্তি দিবার সিদ্ধান্ত করে, তাহা হইলে ইনিও সায় দিতে ইতস্তত করিবেন না। ইহাই সমাজ। সমাজের সাধারণ ব্যক্তিদের কোন নিজস্ব মত ও পথ নাই; জনকয়েক শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি জোট বাঁধিয়া যে পথ স্থির করে, বাকি সকলে ভেড়ার মত দল বাঁধিয়া সেই পথে তাহাদের পাছু পাছু চলিতে থাকে। কেহ যদি নিজের বুদ্ধি ও বিবেচনা মত ভিন্নপথে চলিবার চেষ্টা করে, সকলে টানাটানি করিয়া তাড়না করিয়া, নিজেদের পথে আনিতে চেষ্টা করে; আনিতে না পারিলে তাহাকে একেবারে সমাজ-দেহ হইতে ছাঁটিয়া বাদ দেয়।

যাইতেই হইল। কিন্তু হারাণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম। আর তো কেহ এ প্রস্তাব করে নাই! তাহারই মাথায় এই দুর্ব্বুদ্ধি জাগিয়াছে। কাজেই তাহাকে পিছনে ফেলিয়া, লম্বা চালে

চলিতে লাগিলাম। হারাণ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া, সঙ্গ লইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, মাস্টারের যে আর তর সইছে না দেখছি! চুপ করিয়া চলিতে লাগিলাম। হারাণ কহিল, চন্দ্রবদন দেখবার জন্যে যে একেবারে ঘোড়দৌড় শুরু করেছ! থমকিয়া দাঁড়াইলাম। হারাণ আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিল, কি হে, সাপ নাকি?

কহিলাম, না। কিন্তু কোন ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে যা-তা বলতে তোমার লজ্জা হয় না? তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া হারাণ কহিল, ভদ্রমহিলা! দারোগা, কনেস্টবল থেকে আরম্ভ ক'রে গাঁয়ের ছেলে-ছোকরাগুলোর সঙ্গে পর্য্যন্ত—। বাধা দিয়া কহিলাম, দেখ হারাণ, তুমি একটি আস্ত পশু। আমি যাব না।—বলিয়া ফিরিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই হারাণ খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, মাইরি আর কি! কেবল পালিয়ে যাবার মতলব! তোমাকে না নিয়ে আমি যাচ্ছি না।

রাগতস্বরে কহিলাম, ছেড়ে দাও আমাকে। তোমার সঙ্গে আমি তার কাছে যেতে পারব না। তোমার মুখের ঠিক নেই; হয়তো যা-তা ব'লে তাকে অপমান ক'রে বসবে। আর সে ভাববে, আমি তাকে অপমান করাবার জন্যে তোমাকে নিয়ে গেছি।

হারাণ মুচকি হাসিয়া কহিল, ভাবলেই বা হে! একটানা প্রেম কি ভাল? মাঝে-মাঝে রাগ-অভিমান না থাকলে প্রেমের কোন স্বাদ থাকে না। দুই বার বিবাহ করিয়া হারাণ প্রেমশাস্ত্রবিশারদ হইয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি। কঠোরকণ্ঠে কহিলাম, আবার ঐসব কথা! ছেড়ে দাও আমার হাত, ছেড়ে দাও। হারাণ আমাকে জাপটাইয়া ধরিয়া কহিল, আরে পাগল নাকি! কি আর বলেছি যে, এত রাগ! মাস্টার মানুষ কিনা, তাতেই; আমাকে বললে তো আমি সন্দেশ খাওয়াতাম।

হঠাৎ হাতকয়েক দূর হইতে টর্চের আলো গায়ে পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ হিন্দুস্থানী গলায় প্রশ্ন হইল, কে মারামারি করছ? হারাণ আমাকে ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। হিন্দুস্থানী লোকটা ডবল মার্চ করিয়া কাছে আসিয়া টর্চের আলো আমার মুখে ফেলিয়া বিস্মিতস্বরে কহিল, মাস্টারবাবু! আপনাকে মারছে এই লোকটা?—বলিয়া তাড়িয়া যাইতেই হারাণ কহিল, কনেস্টবল-সাহেব, আমি হারাণ।

অনতিবিলম্বে যিনি আসিয়া হাজির হইলেন, তিনি স্বয়ং দারোগাবাবু। লজ্জিত হইয়া উঠিলাম, হারাণও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। দারোগাবাবু কহিলেন, আরে! মাস্টারমশায় যে! কনস্টেবলটা তখন হারাণের সামনে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছে; দারোগাবাবু তাহাকে সামলাইবার জন্য কহিলেন, এই লছমন সিং, থাম। হারাণকে কহিলেন, হারাণবাবু কি মাস্টারমশায়ের সঙ্গে মারামারি করছিলেন নাকি? কি ব্যাপার? আপনারা গাঁয়ে দেখি যা-তা করতে আরম্ভ করেছেন।

হারাণ শঙ্কিতভাবে কহিল, আজ্ঞে না হুজুর। আমি মাস্টারকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিলাম।

কোথায়?

আজ্ঞে, ওর বাড়িতে।

তা, এত জাপটা-জাপটি করছিলেন কেন? মাস্টারমশায় তো আর কচি খোকা নন যে, কোলে তুলে নিয়ে যেতে হবে!

হারাণ কহিল, যেতে চাচ্ছিল না যে।

আমার দিকে তাকাইয়া দারোগাবাবু বিস্ময়ের স্বরে কহিলেন, বাড়ি যাবেন না কেন?

কহিলাম, আজ্ঞে তা নয়, তা নয়। ওর সমস্ত—

হারাণ বাধা দিয়া কহিল, বাড়িতে ঝগড়া করেছে।

কহিলাম, মিথ্যে কথা।

হারাণ আমার কথা চাপা দিয়া কহিল, ওর বউ আমাকে ডেকে পাঠিয়ে এখনই বললে, যেমন ক'রে হোক ওঁকে ধ'রে নিয়ে এস।

দারোগাবাবু সহাস্যে কহিলেন, মাস্টারমশায়ের তো কপাল ভাল। দেখছি, রাগ করলে এখনও ডাকায়। আমাদের তো ফিরেই তাকায় না।

কনস্টেবলটা হাসিতে হাসিতে বলিল, আমাদের তো হুজুর, বাপের বাড়ি চ'লে যায়। উল্টে রাগ ভাঙাতে জান হয়রান।

দারোগাবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, চলুন।

চলিতে চলিতে বিনীতভাবে প্রশ্ন করিলাম, কোথায় চলেছেন?

দারোগাবাবু কহিলেন, মণীন্দ্রবাবু নিমন্ত্রণ করেছেন। অনেকদিন থেকেই বলছিলেন, আজকাল শরীরে এসব সহ্য হয় না ব'লে রাজি

হই নি। আজ তাঁর বোন নিজের হাতে চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ করলেন; ভদ্রমহিলার অনুরোধ না রাখা তো অত্যন্ত অভদ্রতা, কি বলুন?

হারাণ কনুই দিয়া গুঁতা মারিল; সামলাইয়া লইয়া কহিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। তা ছাড়া আপনি তাদের যা উপকার করেছেন, তাতে নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়ানো শুধু নয়; আপনার পায়ের কাছে প'ড়ে থাকা উচিত। আপনি না থাকলে—

দারোগাবাবু বিনয়সহকারে কহিলেন, ছিঃ, ওসব কথা বলবেন না। কি আর আমি বেশি করেছি? গ্রামের লোকের বিপদে-আপদে সাহায্য করা আমার কর্ত্তব্য যে।

চলিতে লাগিলাম। দারোগাবাবু হঠাৎ কহিলেন, আপনাদের গ্রামটা কিন্তু ভাল নয়। আমি সাহায্য করেছি ব'লে গাঁয়ের লোক নাকি মণীন্দ্রবাবু আর তাঁর বোনকে বয়কট করেছে।

কহিলাম, আমি তো এ বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না, হারাণকে জিজ্ঞাসা করুন।

হারাণ সন্ত্রস্তভাবে কহিল, আজ্ঞে, আমিও কিছুই জানি না, আমাদের রাধানাথ—

দারোগাবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, জানেন বইকি হারাণবাবু। মীটিং করেছেন, বোনকে বাড়ি পাঠিয়ে অপমান করিয়েছেন, সম্পত্তি নেবার জন্যে এক মামা আমদানি করেছেন।

হারাণ আর্ত্তকণ্ঠে কহিল, আজ্ঞে, আমি কিছুই জানি না, মা কালীর দিব্যি বলছি।

লছমন সিং কড়া গলায় হাসিয়া উঠিয়া কহিল, হারাণবাবু সব জানেন।

প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ির কাছে আসিয়া দেখিতে পাইলাম, বাড়ির সামনে মণীন্দ্র লণ্ঠন হাতে দাঁড়াইয়া আছে, পাশে তিনকড়ি। মণীন্দ্র কতকটা আগাইয়া আসিয়া কৃতার্থম্মন্যতার হাসি হাসিয়া কহিল, আসুন আসুন। সরোজিনী অস্থির হয়ে গেছে—। হঠাৎ আমাকে দেখিতে পাইয়া কহিল, কে, মাস্টার নাকি? কোত্থেকে জুটলে হে?

কহিলাম, জুটি নি, এমনই বাড়ি চলেছি।

দারোগাবাবু কহিলেন, উনি রাগ ক'রে বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছেন, হারাণবাবু ধ'রে নিয়ে যাচ্ছেন।

হারাণের নাম শুনিয়া মণীন্দ্র গম্ভীর হইয়া কহিল, আসুন, আসুন। তিনুকে কহিল, তিনু, সরোজকে খবর দাওগে। আমাকে কহিল, মাস্টার, তুমিও এস হে।—বলিয়া আগাইয়া চলিল। বাড়ির সামনে আসিতেই দারোগাবাবুকে কহিলাম, নমস্কার, আমরা আসি তা হ'লে।

দারোগাবাবু খপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিলেন, বিলক্ষণ! যাবেন কোথায়?

হাঁকিয়া কহিলেন, মণীন্দ্রবাবু, মাস্টার মশায় পালিয়ে যাচ্ছেন।

মণীন্দ্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, মাস্টার, খবরদার বলছি। সরোজ জানতে পারলে ঘাড়ে ধ'রে টেনে নিয়ে আসবে।

হারাণের দিকে তাকাইয়া দেখিলাম, অপমানে ও, বোধ করি, হিংসায় মুখটা কালো হইয়া উঠিয়াছে। হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, দারোগাবাবু, আমি তা হ'লে আসি, নমস্কার।

দারোগাবাবু কহিলেন, ও মণীন্দ্রবাবু, হারাণবাবু অভিমান করছেন যে, ওঁকেও ডাকুন।

মণীন্দ্র কহিল, ডাকলেও ওর কি আসা চলবে? জাত যাবে যে।

সরোজিনী আসিয়া হাজির হইল। পাউডারের প্রলেপে মুখখানি অতিরিক্তভাবে সাদা দেখাইতেছে; কেশে সদ্যপ্রসাধনের চিহ্ন পরিস্ফুট; পরিধানে আজ আর গরদের থান নয়, এক ইঞ্চি কালাপাড় শান্তিপুরে ধুতি। হাতে চার গাছি করিয়া চুড়ি, আসিতেই এসেন্সের সুমিষ্ট গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইয়া উঠিল। সরোজিনী যুক্তকরে নমস্কার করিবামাত্র দারোগাবাবু বিগলিতপ্রায় হইয়া উঠিয়া কহিলেন, ভাল আছেন?

সরোজিনী মারাত্মক মুচকি হাসি হাসিয়া কহিল, আসুন।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

সংবাদ-সাহিত্য

শুভমস্তু শকাব্দাঃ ১৮৬৪, বাংলা সন ১৩৪৯, ইংরেজী ১৯৪২।৪৩, সংবৎ ১৯৯৯। ২০০৬ হিজরী ১৩৬১।৬২, ফসলী ও আমলী ১৩৪৯।৫০, মগী ১৩০৪।০৫, বগড়ী সন ১৩৫০, ত্রিপুরাব্দাঃ ১৩৫২, শ্রীচৈতন্যাব্দাঃ ৪৫৬।৫৭, কামরূপীয় শ্রীশঙ্করাব্দাঃ ৪৯৩।৯৪, বুদ্ধাব্দ ২৪৮৫।৮৬, ব্রাহ্মাব্দ ১০২।৩, রবীন্দ্রাব্দ ৮১।৮২ এবং তরুণাব্দ ১৭।

চেতাবনী এবং অন্যান্য বহু প্রাচীন ও আধুনিক মতে কলিযুগ শেষ হইতে আর মাত্র এক বৎসর চার মাস বাকি; ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট সত্য-যুগোৎপত্তি। অর্থাৎ যাঁহারা কোনও কৌশলে আর ষোলটা মাস কায়ক্লেশে টিকিয়া থাকিতে পারিবেন, তাঁহারা কেল্লা প্রায় মারিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের অন্যূন তিন শত বৎসর পরমায়ু হইবে, তাঁহারা রোগ শোক জরার কবলে পড়িবেন না; তাঁহাদিগকে ইন্‌কাম-ট্যাক্স দিতে হইবে না এবং তাঁহারা তখন কোনও জিনিস খরিদ করিলে সেল-ট্যাক্স লাগিবে না।

কিন্তু এই ষোল মাস টিকিয়া থাকাই সমস্যা—কঠিন সমস্যা। বোমা একটা অজ্ঞাত অনিশ্চিত পদার্থ; অনেকে ইহার বহু সাংঘাতিক ও ক্ষিপ্র শক্তির বর্ণনা দিয়াছেন। প্রত্যেকটি বর্ণনাই পরস্পরবিরোধী। বোমা সম্বন্ধে 'যুগান্তর' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' যাহা বলিয়াছেন, 'আনন্দবাজার পত্রিকা' ও 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' না হয় স্বভাবধর্ম্মেই তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন; কিন্তু 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' যাহা বলিতেছেন, এ. আর. পি. পুস্তিকায় তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথা থাকে কেন? রাজাগোপালাচার্য্য ও মহাত্মা গান্ধীর মতবিরোধ হয় কেন? সুতরাং অনিশ্চিত ও অজ্ঞাত বলিয়া বোমার ফলে আঘাত ও অপঘাতের প্রসঙ্গ নাই তুলিলাম। তা ছাড়া, বোমা-সমস্যা সমাধানের জন্য কলিকাতার সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা সরকারী এবং বেসরকারী তহবিল হইতে লক্ষ

লক্ষ সিন্দুক বা ব্যাঙ্কবদ্ধ মুদ্রার মুক্তি দিতেছেন; ইহাতে সকলের না হউক, কাহারও কাহারও সমস্যার সমাধান হইয়াছে। শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ মহাশয়ের সাহায্য পাইলেও বোমা-বিষয়ে কতকটা নিশ্চিত ও স্পষ্ট কথা বলা চলিত। কলিকাতার সমগ্র এরিয়া (area), কলিকাতার বর্ত্তমান জনসংখ্যা × অ্যাভারেজ মাথার পরিধি, জাপানী ও ব্রিটিশ বমারের সংখ্যা × প্রতি সেকেণ্ডে বোমাপাতন ক্যাপাসিটি ইত্যাদি ডেটা (data) লইয়া সহজেই কষিয়া বলিয়া দেওয়া যাইত, বোমায় আহত বা নিহত হইবার চান্স ও প্রব্যাব্‌লিটি কলিকাতার প্রত্যেক অধিবাসীর কতটা আছে। দুঃখের বিষয়, আধুনিক গণিত ও বিজ্ঞানের কাজ সম্প্রতি জ্যোতিষে করিতেছে। আমরা বিজ্ঞানের অত্যধিক প্রসারে বিভ্রান্ত হইয়া জরকোষ্ঠী এবং ললাট-লিখনে এমনই বিশ্বাসী হইয়া পড়িয়াছি যে, ভারতবর্ষের মকররাশি এবং জাপানের মঙ্গল তুঙ্গী গণনা করিয়া বা করাইয়া যুদ্ধের গতি নির্দ্ধারণ করিতে চাহিতেছি।

বোমার সমস্যা চুলায় যাক, অন্য সমস্যা অর্থাৎ অন্নসমস্যা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন হইয়া দেখা দিতেছে; এ দেশের জনসাধারণের পক্ষে এই ষোল মাস খাইয়া পরিয়া বাঁচিয়া থাকাই অসম্ভব হইবে। কিছুদিন হইতেই পাপচক্রের আবর্ত্তন শুরু হইয়া গিয়াছে; দোকানী ব্যবসায়ীরা স্ব স্ব ব্যবসাস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করাতে বহু লোকে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিতেছে না এবং পলায়নকারীরাও কিছুকালের মধ্যে সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষ করিয়া অনাহারে মরিতে বসিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা সাংঘাতিক আহত হইয়াছে বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়। তাঁহাদের আয় কমিয়াছে, ব্যয় বাড়িয়াছে; উপর নীচ—দুই দিকের চাপে তাহারা অচিরকালমধ্যে যে ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যে গিয়া পড়িবে, বোমার আতঙ্ক-উত্তেজনার ভিতরে তাহারা তাহা ঠাহর করিতে পারিতেছে না বলিয়া চতুর্দ্দিকে উত্থিত আর্ত্তনাদে এখনও গগন বিদীর্ণ হইতেছে না। বার্মার চাউল বন্ধ হইয়াছে, দেশরক্ষার নামে আমাদিগকে যাঁহারা ঝাঁকে ঝাঁকে ঘিরিয়া ধরিতেছেন, নিয়মিত তাঁহাদের আহার যোগাইতে গিয়া ইতিমধ্যেই আমাদের

ভাঁড়ারে টান ধরিয়াছে; ময়দা আটা দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে—আরও হইবে। মধ্যবিত্তদের অপেক্ষা তথাকথিত নিম্নশ্রেণী যাহারা, জননী ভারতবর্ষের সুজলতা, সুফলতা ও শস্যশ্যামলতার দরুন অনশন ও অর্দ্ধাশনে তাহারা অনেকটা অভ্যস্ত। তা ছাড়া, গণজাগরণ-আন্দোলনের সুযোগে তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যেন তেন প্রকারে আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিবে। মরিতে মরিব আমরা। জনতার সহিত এক হইয়া গিয়া আমরা ব্যক্তিগতভাবে বাঁচিতে পারি, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ের মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হইয়া গিয়াছে।

এই মিশ্রণের কাজে বাধার সৃষ্টি করিবেন আমাদের অর্দ্ধাঙ্গিনী-সম্প্রদায়। মিলনের প্রথম ধাপ হইল বাহুল্য ও বিলাসিতা বর্জ্জন। আমরা সিগারেট ছাড়িয়া বিড়ি, পাঞ্জাবি ছাড়িয়া ফতুয়া গেঞ্জি সহজেই ধরিতে পারিব; কিন্তু তাঁহারা গহনা-শাড়ি-সাবান-স্নোর আবর্জ্জনা বর্জ্জন করিয়া ঢেঁকিতে পাড় দিতে আর রাজি হইবেন না। অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি, যুক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে বাগে আনা যায় না; তাঁহারা সর্ব্বদাই এ-বাড়ি ও-বাড়ির নজির দিয়া যুক্তি খণ্ডন করিয়া থাকেন, সুতরাং পাপচক্রের আবর্ত্তন থামিতে পারে না। এখন কেবলমাত্র তাঁহাদের সহৃদয়তার উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা অনেকটা ব্রিটিশ রাজসরকারের মনোবৃত্তিসম্পন্ন, তাঁহাদের নিকট বাৎসরিক বা মাসিক আবেদন-নিবেদনে কোনই ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। আমাদিগকে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে; সে ব্যবস্থা যে কি, তাহা এখনও স্থির করিতে পারি নাই।

সৌভাগ্যের বিষয়, আমরা পুরুষেরা গত চার মাসের "বাধ্যতামূলক" কৃচ্ছ্র-সাধনের দ্বারা মিলনের পথ অনেকটা সরল করিয়া আনিয়াছি। প্রথমত, মানসিক অবস্থার দিক দিয়া আমরা এখন প্রায় প্রত্যেকেই শাপগ্রস্ত যক্ষের মত "রিক্তপ্রকোষ্ঠ:"—ঘরে গৃহিণীও নাই, আসবাবপত্রও নাই, বর্ষাও প্রায় আসিয়া

পড়িল। জনগণের সহিত বেমালুম মিশিয়া যাইবার এই সুবর্ণ-সুযোগ। দুই-একটি প্রকোষ্ঠে আভিজাত্য-অভ্যস্ত ঝিয়েরা এখনও নয়নানন্দ বিধান করিতেছে বটে, তবে শুনিতেছি তাহারাও নোটিশ দিয়াছে। সুতরাং—

এগারো বৎসর পূর্ব্বের বাংলার তরুণতম কবি* শ্রীবুদ্ধদেব বসু অবিরত কৃচ্ছ্র-সাধনার ফলে পথের ভিখারিণীর অদম্য যৌবনের বন্দনাগান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দেখাদেখি অন্যত্রও অনুরূপ উত্তেজনা লক্ষ্য করিতেছি। এই গেল মনের দিক। দেহের দিক দিয়াও আমরা সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ হইয়া উঠিতেছি; শহরের ধোপা-নাপিতদের এস্কেপিষ্ট-মনোবৃত্তির দরুন মার্ক্সীয় ডায়লেক্‌টিক্‌স আমাদের অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে। ময়লা জামাকাপড় অথবা খোঁচা খোঁচা দাড়ি—পূর্ব্বে যাহা বাধা ছিল, এখন তাহাই বহুবিধ সুযোগের সৃষ্টি করিতেছে। নিজের অথবা চৌকাবর্ত্তনী চাকরের হাতের রান্না যাহারা নিয়মিত খাইয়া হজম করিতেছে, তাহারা যে সাধনমার্গে কতখানি অগ্রসর হইয়াছে, তাহা আমাদের গৃহিণীরা না বুঝিলেও আমরা পরস্পর উপলব্ধি করিতেছি। যাহা ব্যক্তিগতভাবে ঘটিতেছে, ব্যষ্টিগতভাবে তাহা ঘটিলেই বাংলা দেশে পেতি-বুর্জোয়া-আশ্রিত পাপ চিরতরে ধ্বংস হইবে এবং প্রোলিটারিয়েট বাংলা দেশ লাল ঝাণ্ডা উঁচাইয়া ভারতের নবজাগরণের পথপ্রদর্শক হইতে পারিবে। সম্ভবত গণকেরা এই অবস্থাকেই সত্যযুগ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

মফস্বলের আরাম-আশ্রয়ের মধ্যে, বিলাসিতার ক্লেদ ও পঙ্কের মধ্যে আমাদের অর্দ্ধাঙ্গ সমাজ যদি ইহার পরেও বদ্ধ থাকিতে চাহেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের দায়িত্বেই তাহা করিবেন; আমাদের অগ্রগতি তাঁহারা ব্যাহত করিতে পারিবেন না। আমাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা যদি মেদাদি সকল বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া আমাদের সহায়তায় অগ্রসর হন, তাহা হইলে আমরা খুশি হইব সন্দেহ নাই; যুগপরিবর্ত্তনের কাজ তাহাতে সহজ হইবে।

* "দশ বছর আগে বাংলার তরুণতম কবি ছিলাম আমি।"—শ্রীবুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা', পৌষ, ১৩৪৭, পৃ. ২৫।

তাঁহারা না আসিলেও ক্ষতি নাই ; ভারতবর্ষের পুরুষ কখনই প্রকৃতিপরবশ নহে।

অরবিন্দের কার্য্যকলাপ দেখিয়া কেহ কেহ আমাদের উপরের উক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করিবেন ; তাঁহারা বলিবেন, পণ্ডিচারীতে গড দি ফাদার, গড দি মাদারের প্ররোচনায় সম্প্রতি ভারতীয় পলিটিক্সে মাথা গলাইয়াছেন। আমরা বলিব, তাহা হইলে অরবিন্দের সাধনা ভারতীয় সাধনা নহে ; ভারতীয় ঋষি কখনও প্রকৃতিপরবশ হইতে পারেন না, হইলে তিনি ভ্রষ্ট হন। আমাদের মনে হয়, দীর্ঘকাল নীরবতার পর অরবিন্দ প্রথম মুখ খুলিতে গিয়া অনভ্যাসের দরুন হঠাৎ বেফাঁস কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, যথাসময়ে আত্মস্থ হইলেই তিনি পুনরায় পলিটিক্স বর্জ্জন করিবার উপায় অনুসন্ধান করিবেন ; ততদিন পর্য্যন্ত আমরা দুঃখিত থাকিব।

—

যুদ্ধের সংবাদের মধ্যে দেখিতেছি, আমাদের ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ কয়েকজন জাপানী আসামীকে সুকৌশলে আন্দামানজাত করিয়াছেন ; তাহারা সেখানে যাবজ্জীবন থাকিবে কি না, জানি না ; কিন্তু এই ভাবিয়াই আমাদের আনন্দ হইতেছে যে, ইহার জন্য কর্ত্তৃপক্ষকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস সেসন্স-কোর্টে অথবা হাইকোর্টে কোনও বিচারের ভড়ং করিতে হয় নাই। এত সহজে এরূপ কাজ হাঁসিল হইবার কথা ইতিহাসে নাই।

—

এতক্ষণ বাংলা দেশের মধ্যবিত্তীয় স্বাতন্ত্র্যের বিরুদ্ধে যাহা বলিলাম, তাহা ফিরিয়া পাঠ করিয়া নিজেই আনন্দলাভ করিতেছিলাম, এমন সময় চৈত্রের 'কবিতা' হাতে আসিল। সম্পাদক মহাশয় ছন্দোবদ্ধভাবে "ছিন্ন সূত্রে"র সন্ধান দিয়াছেন। পড়িয়া মনটা আরও প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সদ্যগড়া থিওরি যখন দৃষ্টান্তের আশ্রয় পায়, তখন "ইউরেকা, ইউরেকা!" বলিতে বলিতে উলঙ্গ অবস্থায় পথে দৌড়িতেও বাধে না। এ যুগে তাহার উপায় নাই, সুতরাং উদ্ধৃত করিয়া উত্তেজনা দমন করিতে হইতেছে।

"চৈত্রমাসে দুপুর বেলায় পাতা-ঝরা গাছের তলায়" "যুবতী বেদেনী"র "পরিশ্রমে ঈষৎ হাঁপানো বুকের কাঁচুলি" দেখিয়া কবি বলিতেছেন—

"মনে-মনে বলি, আমি ঢের ভালো আছি
নিয়মিত পানাহারে, নিশ্চিন্ত আরামে
শিক্ষিতের শৌখিনতায়।
জীবনের অবরুদ্ধ ক্ষীণতায়
ওরাই কৃপার পাত্র, প্রবৃত্তির আবর্তে ওরাই
বন্দী হ'য়ে আছে ; চিন্তার চড়াই-উৎরাই
ওদের অনধিগম্য, সভ্যতার বিচিত্র রম্যতা
ওরা তার কিছুই জানে না। ওরা একান্তই দেহী।...
তবু কেন আমার হৃদয়ে
যেন কোন অতীতের স্মৃতি ব'য়ে
বাজায় মাতাল বাঁশি দক্ষিণের হাওয়া।
রক্তে বাজে গান,
জাগে ঢেউ অশান্ত উচ্ছল,
সেখানে বেদের দল
অশিক্ষিত কলোচ্ছ্বাসে উচ্চহাসে
তোলে তোলপাড়।
মনে হয় আমি কবি, আমার আসন
ওদেরই ধূলায় ছিলো, কবে হ'লো নির্বাসন
সে-সহজ, স্বাধীন জীবন থেকে
গম্ভীর, সুস্থির
ধুতি-পাঞ্জাবির
ইস্ত্রি-করা ভদ্রতায়।
আমারে যে পলে-পলে বেঁধে ক্ষুদ্রতায়
আমার স্বজাতি যারা ; কেরানি কি ইস্কুলমাষ্টার হ'য়ে

ছদ্মবেশে চলাফেরা করি, আসলে আমি যে কবি
সেই পরিচয়
প্রাণপণে লুকায়ে-লুকায়ে
জীবনের রসস্রোত ক্রমেই শুকায়।
ঐ যে বেদের দল
ওরি মধ্যে আমার আদিম বাসা।
যারা কবি যারা গান গায়,
ওরা যে তাদেরে চায়,
তরুণীর তীক্ষ্ণ চোখে আছে পুরস্কার,
শিশুর উদ্দাম নৃত্যে অজস্র উৎসাহ,
আছে নেশা ঘাঘরার রঙে,
আছে খুশি আকাশে-বাতাসে।
ওদের সমাজে
কবিত্ব লজ্জার নয়, ছদ্মবেশ কবিকে হয় না নিতে,
অলজ্জ প্রাচুর্য নিয়ে উন্মুক্ত খুশিতে
একান্তই কবি হ'তে পারে যে সে
এই তো পূর্ণতা তার।

এই যে মধ্যবিত্তীয় স্বীকারোক্তি, ইহার জন্য কবিকে ধন্যবাদ। আধুনিক সভ্যতার দোষই এই যে, আমরা এখন মনে এক মুখে আর হইয়াছি। মন্বন্তরের মুখে আমাদের মনের মুখোশ যে খসিয়া পড়িতেছে, আমরা যে নির্ভীকভাবে সত্য কথা বলিতে পারিতেছি, ইহার দ্বারাই প্রমাণ হয়, সত্যযুগ আসিতেছেন। তিনি আসুন, ইহাই আমরা চাই। শ্রেণীস্বার্থ আঁকড়াইয়া ধরিয়া আমরা নির্জীব মধ্যবিত্ত-সমাজ বাঁচিয়া থাকিব, শুধু বাঁচিয়া থাকা নয়, বুদ্ধির চমক এবং ছন্দ-মিলের গমক দেখাইয়া এতদিন বিভ্রান্ত জনগণের উপর প্রভুত্ব করিব এমনটি আর হইতে পারিবে না। ভুইং-রুমের—ভদ্রলোকের কবি-সাহিত্যিক হইয়া অনেক দেখা গেল, এবারে ভিখারী-ভিখারিণী, বেদে-বেদেনীদের লইয়া

নূতন সাহিত্য গড়িবার পালা। এই পরিবর্ত্তনের মুখে তাই 'এক পয়সায় একটি' কাব্যের প্রকাশ অতিশয় সমীচীন ও সময়োচিত হইয়াছে। আধুনিক কবিকুল যে দো-দো-পয়সা দামের ছুঁচ, মাথার কাঁটা অথবা হাতে-মাটি সাবানের চাইতেও সস্তায় কবিতা ছাড়িতে পারিতেছেন, সমাজের পক্ষে ইহা কম কল্যাণকর নয়। বুর্জোয়ামির উঁচু মাথা এই এক চালেই প্রোলিটারিয়েটের ধূলায় লুণ্ঠিত হইল; এই নামের দ্বারাই আহার-ওষুধ দুইয়েরই ব্যবস্থা হইয়া গেল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অভিজাত ব্যক্তিরাও অতি-আধুনিক সাম্যবাদের এই চালে ভূমিসাৎ হইলেন। চৈত্রের 'প্রবাসী' দ্রষ্টব্য। কাব্য ও সাহিত্যের দ্বারা এতদিন সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছিল, এই তেলেভাজাগন্ধী নামের রজ্জুতে সে ব্যবধান দূর হইল; এবার এই আদর্শে স্ত্রী-কন্যার নামের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারিলেই অন্যান্য ব্যবধান দূর হইতে পারিবে।

• • •

আমাদের দুঃখ এই যে, রবীন্দ্রনাথ বাঁচিয়া থাকিয়া বাংলা কাব্যের এই নব-চূড়াকরণকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যাইতে পারিলেন না। নাতি কামাক্ষীপ্রসাদের চালে রামানন্দবাবু মাত হইয়াছেন; লেত্তি অমিয় চক্রবর্ত্তীর নামে রবীন্দ্রনাথও মাত হইতেন। তিনি নিজে 'মহুয়া' পর্য্যন্ত নামিয়াছিলেন; 'এক পয়সায় একটি' তাঁহার কল্পনারও বহির্ভূত ছিল। যাহা হউক, এই নামের দ্বারা অতি-আধুনিক উন্নাসিক কবিকুল যে জনতাকে স্বীকার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ।

—

কবি ও সাহিত্যিকদের মুখোশ ধীরে ধীরে খসিয়া পড়িলেও সাংবাদিকরা নির্ব্বিকার; তাঁহাদের সত্য মিথ্যা ভাবনার বালাই নাই। আজ যাহা বলিতেছেন, কাল তাহা জোর গলায় খণ্ডন করিতেছেন; কাল যাহা বলিবেন, পরশু তাহা খণ্ডিত হইবে। তাঁহারা আপাত-প্রয়োজনকেই জানেন এবং মানেন; দূরদৃষ্টির ধার ধারেন না। আমাদের বিশ্বাস, এই বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের পরে যদি সত্যসত্যই সত্যযুগের আবির্ভাব হয়, তাহা হইলে এই মন্বন্তরে সংবাদপত্ররূপ

অসুর নিঃশেষে ধ্বংস হইবে ; না হইলে সত্যযুগ আসিতে পারে না। সংবাদ-পত্রে প্রতিদিন যে পরিমাণ লোকক্ষয়ের সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, তাহা একত্র করিলে যুদ্ধরত জাতিসমূহের একটি প্রাণীরও আর অবশিষ্ট থাকিবার কথা নয়। জাহাজ, এরোপ্লেন, কামান, বন্দুক সম্বন্ধেও সেই কথা ; অথচ আমরা প্রত্যহ প্রাতে নব্বই ডিভিশন, আশি ডিভিশনের হিসাব নূতন করিয়া গণনা করিতেছি এবং মিথ্যা কথা গলাধঃকরণের জন্য প্রত্যহ পয়সা হাতে উন্মুখ হইয়া আছি।

• • •

শুধু যুদ্ধ-ব্যাপারে নয়, অতি সাধারণ ঘটনা লইয়াও সংবাদপত্রে কিরূপ মিথ্যার বেসাতি হয়, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। গত ১৫ চৈত্র রবিবারের 'যুগান্তর' পত্রিকায় "আত্মপ্রচারের আতিশয্য" শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। ইহাতে অতিশয় আত্মপ্রচারলোলুপ কয়েকজন নিরীহ ব্যক্তিকে নামধামসহ নাস্তানাবুদ করিয়া সংবাদপত্রের স্থানাভাব দেখাইয়া সাধারণকে বলা হইয়াছে, তাঁহারা যেন এই সময়ে সম্পাদকীয় বিভাগকে এই জাতীয় প্রচার-মূলক সংবাদ ছাপিবার জন্য অনুরোধ না করেন। অথচ ১৭ চৈত্র তারিখের 'যুগান্তরে' দেখিতেছি, ফরিদপুর জিলার একটি গ্রামে 'যুগান্তরে'র সম্পাদক মহাশয় সুদূর বাল্যকালে নুনলঙ্কাসহযোগে কবে কোন্ গাছের কুল খাইয়াছিলেন, তাহারই একটি দীর্ঘ তিন-কলমব্যাপী মনোজ্ঞ বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই দোষে শুধু 'যুগান্তর'-সম্পাদক মহাশয়ই দোষী নন, 'আনন্দবাজার', 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র সম্পাদকমণ্ডলীর সভাসমিতি ও বক্তৃতার (প্রায়শই অসার) ঠেলায় অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারও চাপা পড়িয়া যায়। এইরূপ মিথ্যাচার ও নির্লজ্জতা এই দেশেই সম্ভব।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাতৃভাষায় শিক্ষাদীক্ষার আদর্শ যে দিন দিন উন্নততর হইতেছে, তাহা তাঁহাদের পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন হইতেই প্রতীয়মান হয়। যাঁহারা এই নির্ব্বাচন করেন, আশুতোষ মুখুজ্জে রোড ও বালীগঞ্জে

ছুটাছুটি করিতেই তাঁহাদের প্রাণান্ত হয় ; ইহার পরে তাঁহারা যদি বই পড়িবার অবকাশ না পান, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। বালীগঞ্জ বলিলাম এইজন্য যে, ইঁহাদের প্রায় প্রত্যেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মা সরস্বতীর পরীক্ষার খাতা দেখা ও প্রত্যহ কলেজে হাজিরা দেওয়া-রূপ সেবা করিয়া কায়ক্লেশে ঐ অঞ্চলে এক এক টুকরা জমি সংগ্রহ করিয়াছেন ; এ-পাড়ায় প্রাত্যহিক সেলাম দিবার পরও ও-পাড়ায় ইট-গণনা, মিস্ত্রীর রোজ-হিসাব ইত্যাদি কঠিন কঠিন কাজ তাঁহাদিগকে করিতে হয়। ইহার উপরে পাঠ্যপুস্তক লেখা অথবা লেখানো, পাব্লিশার ধরিয়া সেগুলির মুদ্রণ, নির্ব্বাচন-কমিটি নামীয় প. পি. চু. স.র সভ্যদের গাত্রকণ্ডূয়ন এবং তারপরে বখরার বন্দোবস্ত ইত্যাদি নানা হেপাজতে শীত এবং গ্রীষ্মের ছোট বড় দিনগুলি অতিবাহিত হইয়া যায়—সুতরাং ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের বি. এ.-পরীক্ষার্থী ছাত্রদের তৃতীয় পেপারের জন্য যদি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের 'পুনর্জ্জন্ম' প্রহসনখানি নির্ব্বাচিতই হয়, তাহা হইলে ইঁহাদিগকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি ?

• • •

সত্যই তো, দোষ কিছুই নাই, দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকার হিসাবে নাম আছে, এবং বইটিও ছোট। ছেলেদের অসুবিধা হইবার কথা নয়। একাক্ষরিক কতকগুলা প্রশ্নোত্তর ছাড়া ইহাতে নাই থাকিল কিছু ; কিন্তু গ্রন্থকার "ভূমিকা"য় তো লিখিয়াছেন, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহাতে নীতিকথার অভাব হইবে না। ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তক—একটু নীতিকথা থাকিলেই হইল। তা ছাড়া উহাতে "বুড়ো মরেছে" শীর্ষক কীর্ত্তন গান (দোহাই খোলদাজ !) এবং "আরে আরে সেঁইয়া" শীর্ষক বাইজী-সঙ্গীতটিও আছে, সুতরাং প্রশ্নপত্রেরও অসুবিধা হইবে না। আমাদের দুঃখ এই, ইহার চাইতেও ভাল বই দুই-একটি ছিল—সেগুলিকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। 'প্রেমের জেপলিন' অথবা 'কিসমিস' পাঠ্যপুস্তক হিসাবে 'পুনর্জ্জন্মে'র চাইতে নিন্দার হইত না। ১৯৪৫ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকিলে আমরা বোধ হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পীরিতের

কাঠপিঁপড়ে' এবং 'বেশ্যার ছেলের অন্নপ্রাশন'ও দেখিতে পাইব। পোড়া কপাল কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়-অধিষ্ঠিত বঙ্গবীণাপাণির!

—

এবারে একটু কবিতার চর্চ্চা করা যাক। মনটা ভারী হইয়া উঠিয়াছে; "লঘুমুহূর্ত্ত" মন্দ লাগিবে না—

এখন দিনের শেষে তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরীর
অত্যন্ত প্রশান্ত হ'ল মন;
ধূসর বাতাস খেয়ে এক গাল—রাস্তার পাশে
ধূসর বাতাস দিয়ে ক'রে নিল মুখ আচমন।...
...তারা রামছাগলের মত রুখু দাড়ি নেড়ে
একবার চোখ ফেলে মেয়েটির দিকে
অনুভব ক'রে নিল এইখানে চায়ের আমেজে
নামায়েছে তারা এক শাকচুন্নীকে।
এ মেয়েটি হাঁস ছিল একদিন হয় তো বা, এখন হয়েছে হাঁসহাঁস।
দেখে তারা তুড়ি দিয়ে বার ক'রে দিল তাকে আরেক গেলাস:
'আমাদের সোনা রূপো নেই তবু আমরা কে কার ক্রীতদাস?'

ইহারা কেহ কাহারও ক্রীতদাস নিশ্চয়ই নহেন, হইলে মনিবের ধূসর চাবুকে ইহাদের কাহারও পিঠের চামড়া থাকিত না। হাঁসকে হাঁসহাঁস করার ইয়ারকি বাহির হইয়া যাইত। পাঠকের সন্দেহ হইতে পারে, ইহা কোনও ব্যঙ্গকবিতা, অথবা জাল কবিতা। দোহাই আপনাদের, তাহা নয়। শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত 'নিরুক্তে'র দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যার (পৌষ ১৩৪৮) প্রথম কবিতা এইটি; যিনি লিখিয়াছেন তিনি গণ্ডারের মতই রসিক, হাসি-ঠাট্টা বরদাস্ত করিতে পারেন না, ঘরে খিল লাগাইয়া থাকেন।

প্রশ্ন করিবেন, তাহা হইলে এ কি ব্যাপার? এই ব্যাপারেরই হদিশ পাইবার জন্য জীবনের বারোটা বৎসর (এক যুগ) ব্যাকুল সাধনায় কাটাইয়া দিলাম; বহরমপুর গেলাম, রাঁচী গেলাম, সেদিনও লুম্বিনী-উদ্যান দেখিয়া আসিলাম, এ সমস্যার কোনও সমাধান করিতে পারিলাম না। গিরীন্দ্রবাবু-সুহৃৎবাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি—কেহই হদিশ দিতে পারেন নাই। মিশরের পিরামিডের পাদদেশে রহস্যময় স্ফিংক্স্-এর মত বাংলা কাব্য-সাহিত্যের পাদদেশে এগুলি চিরকাল সুড়সুড়ি দিতে থাকিবে। আমাদের প্রশ্ন এ রচনাগুলি নয়; পাগলা-গারদের অন্তরালে অনেক বিচিত্র ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা ঘটা করিয়া এই সকল বীভৎসতাকে বাহিরের আলো-বাতাসের রাজ্যে জনতার মাঝখানে প্রকাশ করিয়া আনন্দ পায়, তাহারা কি—পাগল না বদমাস, অথবা দুইই?

—

কিছুকাল যাবৎ বাংলা কবিতার ছন্দ লইয়া কয়েকজন উৎসাহী "ছান্দসিক" 'কবিতা', 'দেশ', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি পত্রিকায় মহা সোরগোল শুরু করিয়াছেন, অনধিকার-চর্চ্চাই বেশি। পত্রিকাগুলির সম্পাদকেরা ছন্দকানা বলিয়াই এই সকল অর্ব্বাচীন প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়া নিরীহ পাঠক-সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করিবার সুযোগ পাইতেছে। 'দেশ' পত্রিকায় এরূপ একজন ছন্দকানা ব্যক্তি গ্রাম্যারিচালে ছয় মাত্রা ও পাঁচ মাত্রার চাল লইয়া ওস্তাদি করিয়াছেন; কিন্তু দেখিতেছি, এখনও তাঁহার ছন্দের অক্ষর-পরিচয়ই হয় নাই। ছড়ার ছন্দ যে সাধারণ ছন্দ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন-জাতীয় বস্তু, এ ধারণাই তাঁহার নাই। গায়কের কণ্ঠে সুরের মত ছন্দও কবির সহজাত, কিন্তু ছন্দবিষয়ক জ্ঞান সঙ্গীতবিষয়ক জ্ঞানের মতই শুরু করিয়া আয়ত্ত করিতে হয়। ফুটপাথে-বসা জ্যোতিষীর মত এই সকল সাময়িক-পত্রের "ছান্দসিক"দের পরিহার করিয়া চলাই কর্ত্তব্য।

—

মেয়ে জ্যাঠা যেমন অসহ্য, কাব্য-জগতে মেয়ে সুধীন্দ্র দত্তও সেইরূপ, সম্প্রতি এই জাতীয় অসহ্য ব্যাপারও ঘটিতে শুরু হইয়াছে। যথা—

উদয় ও অস্তের পরম মিলন-ক্ষণে
ধ্বান্ত পৃথিবীতে ছিলো মনেরও অদেহী তমিস্রা।
বৈজয়ন্তর প্রকোষ্ঠে তখনো নাম না জানা সংবিম্ব
বিক্ষিপ্ত হয়েছিলো ইতস্ততঃ।
স্নাতনক্ মানুষী রক্তে ছিল না চেতনার ধ্বান্তারী···

কিন্তু শুধু সুধীন্দ্র দত্ত হইলেও রক্ষা ছিল, মেয়েরা বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) দাশ এবং সমর সেন হইবারও প্রয়াস করিতেছে, কাব্যসঙ্করের মহামারী দেখা দিয়াছে। যথা—

যুগের পর যুগ কেটে গ্যাছে
তার শুভ্র নিচুলে লাগিয়ে প্রহসনের নির্মোক্।
এক মানুষ।
রক্তে তার অনেক সূর্য্যেরা ভীড় কোরেছে
চতুরস্র তবুও হয় নি তৃপ্ত।
এখনকার সে, তবু নয় এখনের।
বুকে তার 'প্যাগোডা'র অন্ধকার,
চোখে মিশরের মমির স্বপ্ন,
রক্ত নীল,
কপিশ কামনার চুম্বনে সবুজের অজস্রতা,
মোনালিসাকে ছাখে সে স্বপ্নে।

জাপানী বোমা, তুমি কতদূর?

পুস্তক-প্রসঙ্গ

মোগল-বিদুষী—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। পৃ. ৯২, মূল্য দশ আনা। রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস।

এই পুস্তকে গুলবদন বেগম (বাবরের কন্যা) এবং বিখ্যাত জেবউন্নিসার (আওরংজীব-দুহিতার) বিস্তৃত জীবনচরিত দেওয়া হইয়াছে। সব মৌলিক আধার হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া এবং তাহা সদ্‌যুক্তির সঙ্গে বিচার করিয়া বিশ্বাসযোগ্য অথচ বেশ মনোরম কাহিনী রচনা করা হইয়াছে। সেই সঙ্গে ঐ যুগের বাদশাহী পরিবারের জীবন ও ব্যবহার বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। জেব সম্বন্ধে কল্পনাপ্রিয় আধুনিক লেখকগণ যে-সব গুজব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা সমসাময়িক ইতিহাসের সাহায্যে খণ্ডন করা হইয়াছে। মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাস এইরূপেই সত্য এবং সরস করিয়া আমাদের সম্মুখে আনিতে হয়। এই পুস্তিকাখানি এবার যে তৃতীয় সংস্করণে পৌঁছিল এটা ইতিহাস না হইয়া উপন্যাসের ভাগ্যেই আশা করা যাইতে পারিত। ইহার বহুল প্রচারে আমরা সুখী।

শ্রীযদুনাথ সরকার

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল রচিত। পৃ. ২৫২ এবং ৬ খানি চিত্র, হাফ কাপড়ে বাঁধা। মূল্য দুই টাকা। রঞ্জন-পাব্‌লিশিং হাউস।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে বাঙ্গলায় যে নব-জীবন আরম্ভ হয়, তাহার ইতিহাস রচনার পক্ষে এই পুস্তকে অনেক অমূল্য উপাদান সংগ্রহ করিয়া রাখা হইয়াছে, এজন্য ইহার চিরস্থায়ী মূল্য আছে। অনেক বৎসর ধরিয়া পুরাতন সংবাদপত্র, গ্রন্থ ও কাগজপত্রের মধ্যে একনিষ্ঠভাবে পরিশ্রম করিয়া যোগেশ-বাবু এগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব

প্রভৃতির সম্বন্ধে প্রচলিত মিথ্যা তথ্য ও তারিখ সংশোধন করা, এবং ঠিক সমসাময়িক সাক্ষীর উক্তি পাঠকের সামনে উপস্থিত করা। ইহাতে নভেলের মত কাহিনী সৃষ্টি করিতে বাধা পড়ে বটে, কিন্তু সত্যের নিক্তিতে গ্রন্থের মূল্য বাড়ে। 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' অতি ব্যাপক উপাধি, গ্রন্থখানি ঐ শতাব্দীর কিয়দংশ মাত্রে আলোকপাত করে এবং তাহাও কেবল কয়েকজন লোক লইয়া—রুস্তমজী কাওয়াসজী, রাজা রাধাকান্ত দেব, ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিও, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক এবং রাধানাথ শিকদার এই সাতজন। কিন্তু প্রতি অধ্যায়েই যাহা কিছু এখন জানিবার উপায় আছে তাহা দেওয়া হইয়াছে; নব বঙ্গের যে-সব দ্বিতীয় শ্রেণীর নেতা নামে মাত্র এত দিন পরিচিত ছিলেন তাঁহাদের এখানে আমরা ভাল করিয়া চিনিতে পারিতেছি। বিশেষতঃ রাধাকান্ত দেবের সমস্ত কীর্ত্তি যে তাঁহার দ্বারা সতীদাহ প্রথা সমর্থনের পাপে এত দিন চাপা দেওয়া ছিল, এই গ্রন্থকার তাঁহার জীবনের সেই দিকটা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। একজন "সংস্কারক" লেখক তাঁহার এক গ্রন্থে ছাপিয়াছেন, "রাজা রাধাকান্তের সতীদাহ নিবারণ বিরোধী আবেদন অগ্রাহ্য হইল।" সার্ রাধাকান্ত যে অন্য কিছুও ছিলেন তাহা পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় পর্য্যন্ত ১৮৬৭ সালে প্রকাশ্যে স্বীকার করেন।

শ্রীযদুনাথ সরকার

Poems—রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী, মূল্য আড়াই টাকা।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার অসংখ্য বাংলা কবিতা ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়াছিলেন; সাময়িক-পত্রিকার পৃষ্ঠায় এবং পাণ্ডুলিপি আকারে সেগুলি এদিক ওদিক ছড়াইয়া আছে। ম্যাকমিলান কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত কোনও পুস্তকে এই সব অনুবাদ নাই। বিশ্বভারতী-কর্ত্তৃপক্ষ এগুলিকে চমৎকারভাবে সাজাইয়া প্রকাশ করিয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যের পৃথিবীব্যাপী পাঠকদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইলেন। কবিকৃত অনুবাদ বলিয়া মূল কাব্যের দুরূহতা বহু স্থলে স্পষ্ট হইয়াছে। এ ইভাবে কবির অন্যান্য ইংরেজী রচনা প্রকাশিত হইলে আমরা খুশি হইব।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৪ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ

১

গত বৎসর প্রায় এই সময়ে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিচয় দিতে গিয়া তাহার উপক্রমণিকা হিসাবে বাংলা ছন্দের একটা সাধারণ পরিচয় লিখিতেই প্রায় চার মাস কাটিয়াছিল; পরে উপলক্ষ্যটা এ পর্য্যন্ত লক্ষ্যকে হটাইয়া রাখিয়াছে। যাহাদের পৈত্রিক বসত-বাটী দশ বৎসরেও মেরামত করা হইয়া উঠে না—হয়তো বা শুধু সামর্থ্য নয়, ইচ্ছার অভাবেও—তাহারা যেমন পুত্রকন্যার বিবাহ-উপলক্ষ্যে বাড়িটা মেরামত করিতে বাধ্য হয়, আমি তেমনই অমিত্রাক্ষর ছন্দের দায়ে পড়িয়া বাংলা ছন্দের অপরিচ্ছন্ন ইমারতটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইতে চাহিয়াছিলাম; আদৌ আমার সে সংকল্প ছিল না। কিন্তু সেই কাজে এত সময় লাগিয়া গেল যে, আসল কাজটি এখনও অনারব্ধ রহিয়াছে। আজ এতদিন পরে আবার সেই কাজ আরম্ভ করিলাম, শেষ হইবে কি না জানি না, কারণ বাহিরে যে বড় অমিত্রাক্ষরের বাজনা বাজিতেছে, তাহার যতি-তাল এতই অনিশ্চিত, এবং অক্ষরমাত্রার হিসাব এমনই নিরঙ্কুশ যে, শেষ পর্য্যন্ত আমার এই 'অমিত্রাক্ষর' হয়তো 'অমিতাক্ষর' হইয়াই থাকিবে—ইহার অক্ষর আর শেষ হইবে না, এবং অতি-আধুনিক ছন্দশাস্ত্রীর কথাই সত্য হইবে।

পূর্ব্বের আলোচনায় পয়ার-জাতীয় ছন্দকে (যাহার উপরে অমিত্রাক্ষর ছন্দের পত্তন হইয়াছে)—অর্থাৎ বাংলার বনিয়াদী ছন্দকে 'পদভূমক' বলিয়া নির্দ্দেশ ও ব্যাখ্যা করিয়াছি, এক্ষণে এই পদভূমক

পয়ারকেই পুনরায় আর এক দিক দিয়া বিচার ও বিশ্লেষণ করিতে হইবে। কারণ, মধুসূদনের ছন্দ এক হিসাবে যেমন পয়ার, তেমনই আর এক দিকে তাহা পয়ার হইতে অতিশয় বিলক্ষণ। এই পয়ার কেমন করিয়া অমিত্রাক্ষরের উপযোগী হইল—ইহার জাতিকুলশীলের মধ্যে এমন কি নিহিত ছিল, যাহার জন্য মধুসূদন ইহাকে এমন কাজে লাগাইতে পারিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার ও বুঝিবার প্রয়োজন আছে। এই পয়ারের আদি রূপ বাংলা পদ্যরচনার সঙ্গে সঙ্গেই ভূমিষ্ঠ হইয়াছে—ইহার 'পদ্-চার' বাংলা ছন্দের স্বাভাবিক পদ-চারণ। অতএব মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ এই পয়ারকে আশ্রয় করায় খাঁটি বাংলা ছন্দেরই গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে। এই পয়ারকে বাছিয়া লইতে মধুসূদনের কোনরূপ চিন্তা করিতে হয় নাই, ইহা তাঁহার হাতের কাছেই ছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, বাংলা যত বড় কাব্য সকলই এই পয়ার ছন্দে রচিত; প্রাচীন কবিগণ যখনই কোন ঢালাও বর্ণনা, কাহিনী বা পালা-গান রচনা করিতে বসিয়াছেন, তখনই পয়ারের ডাক পড়িয়াছে; আবার যখনই একটু বিশেষ করিয়া কিছু বলিতে, বা একটু লিরিক ভাবের আমদানি করিতে চাহিয়াছেন, তখনই অন্য ছন্দের শরণাপন্ন হইয়াছেন। আর একটি বড় ইঙ্গিতও তিনি পাইয়াছিলেন, এই পয়ার ছন্দেই সহজ বাচন-ভঙ্গির অবকাশ আছে, বাংলা বাক্যরীতি এই পয়ারের ভিতর দিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। তথাপি মধুসূদনকে আরও ভিতরে দৃষ্টি করিতে হইয়াছিল; এ দৃষ্টিও তিনি কানের সাহায্যে লাভ করিয়াছিলেন,—পয়ারের অন্তর্নিহিত ছন্দশক্তিকে তিনি যেন এক আশ্চর্য্য প্রতিভাবলে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; বাংলা অমিত্রাক্ষরের মূল উপাদানগুলিকে, তিনি সেই দৃষ্টির দ্বারা, ঐ পয়ারের মধ্যেই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলেন; নতুবা,

ইংরেজী অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখকের এই উক্তি বাংলার সম্বন্ধেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইত না।—

"And so was the music of the blank verse, or unrhymed five-stress lines of Marlowe and Shakespeare and Milton; and as we listened, it was easy to believe that 'stress' and 'quantity' and 'syllable' all playing together like a chime of bells are concordant and not quarrelsome in the Modern English Verse."

বাংলা পয়ারের ঐতিহাসিক বিকাশধারা একটু লক্ষ্য করিলে, তাহার জাতিকুলশীলের যে লক্ষণের কথা বলিয়াছি, তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাহাতে দেখা যাইবে, ভাষার সেই আদি রূপ হইতেই তাহার যে ছন্দপ্রবৃত্তি—শেষে যতই তাহার রূপান্তর হউক, ভাষার প্রকৃতি যতই স্বতন্ত্র হইয়া উঠুক—তাহার অঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ ঘোচে নাই; এজন্য—মাত্রা (Quantity), অক্ষর বা বর্ণ (Syllable), এবং শব্দের উচ্চারণ-ঘটিত যে স্বর-বৈষম্য (Stress), এই সকলকেই মিলাইয়া লইয়া, তাহাকে তাহার স্ব-প্রকৃতি ও কুলধর্ম্মের সমন্বয় করিতে হইয়াছে।

অতঃপর, আমি বাংলা পয়ারের সেই ইতিহাসগত প্রবৃত্তির একটু পরিচয় দিব, তাহাতে দেখা যাইবে, বাংলা ভাষাও যেমন ক্রমে একটি বিশিষ্ট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে, তেমনই তাহার ছন্দও উত্তরোত্তর স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতেছে। সে আর্টের ক্ষেত্রেও কোন শাস্ত্রশাসন মানিবে না; প্রাচীন ছন্দবিধির বাঁধা রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া সে মাঠেঘাটে ঘুরিয়া বেড়াইবে; বীণা ফেলিয়া বাঁশের বাঁশীকে আশ্রয় করিবে। ফলে, প্রায় একই স্থান হইতে যাত্রা করিয়া, সে তাহার জ্ঞাতি-ভগিনী হিন্দী হইতে এই ছন্দ-পথে কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে!

২

ভারতচন্দ্রের পয়ারকেই যদি পুরানো রীতির শেষ পরিণতি বলিয়া ধরা যায়, এবং তাহার একটি বিশিষ্ট উদাহরণ এইরূপ হয়—

লাজে মরে এয়োগণ কি হৈল আপদ।
মেনকার কাছে গিয়া কহিছে নারদ।

শুন ওগো এয়োগণ ব্যস্ত কেন হও।
কেমন জামাই পেলে বুঝে শুঝে লও।
মেনকা নারদবাক্যে হৃনা মনোদুখে।
পলাইয়া গোবিন্দের পড়িল সম্মুখে।
দশনে রসনা কাটি গুড়ি গুড়ি যায়।
আই আই কি লাজ কি লাজ হায় হায়।

তাহা হইলে কে বলিবে যে, এই ছন্দের আদি রূপের সন্ধান মিলিবে নিম্নের দুই পংক্তিতে?—

কাঁআ • তরুবর / পঞ্চ বি • ডাল।
চঞ্চল • চীএঁ / পইঠো • কাল। (চর্য্যাপদ)

দেখা যাইতেছে যে, ভঙ্গ-প্রাকৃত অবস্থার এই আদি বাংলা ভাষার ছন্দে, বংশানুক্রমিক স্বভাব-ধর্ম্মে, সংস্কৃত লঘুগুরু মাত্রার নিয়ম প্রায় সম্পূর্ণ বজায় আছে, এবং সে কারণে ছন্দস্পন্দ-বা Rhythm-সৃষ্টি অতি সহজ হইয়াছে। তথাপি, এখন হইতেই ভাষার উচ্চারণপদ্ধতি ও ছন্দ-পদ্ধতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়াছে—শব্দকে ছন্দোবদ্ধ করিবার সময়ে অনেক স্থলেই স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ যথানিয়মে রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ঐ একই কবিতার আর একটি পংক্তি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে, সেই আদিকালেই এ ভাষার ছন্দে মাত্রাবৃত্তের নিয়মনিষ্ঠা কিরূপ দুরূহ হইয়াছিল—

ভণই লুই আম্হে ঢাণে দিঠা

—এ চরণেরও মাত্রাসংখ্যা ১৬, এবং পদভাগও সমান; কিন্তু ইহাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করা কষ্টকর; চার মাত্রার পদচ্ছেদ বজায় রাখিলে পংক্তিটির ছন্দচিত্র এইরূপ দাঁড়ায়—

ভণই / লুই আম্হে / ঢাণে / দিঠা

তাহাতে দ্বিতীয় পর্ব্বটির মাত্রা বেশি হইয়া পড়ে—ঐ 'লুই'কে বাদ না দিলে ছন্দ রক্ষা হয় না। অতএব পড়িবার সময়ে, নিশ্চয়ই হ্রস্ব-দীর্ঘের

নিয়ম রীতিমত ভঙ্গ করিয়া, ভাষার কথ্য-ভঙ্গির হসন্ত, এবং তজ্জনিত ঝোঁক প্রভৃতির সাহায্যে এই গহ্বরটি উত্তীর্ণ হইতে হইবে।

উপরি-উদ্ধৃত বৌদ্ধ চর্য্যাপদটিই বাংলা ছন্দের আদ্যতম নমুনা কি না তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিবার উপায় না থাকিলেও—ছন্দের প্রকৃতি হইতেই, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিকে ইহার পরবর্ত্তী বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইতিমধ্যে বাঙালী কবির কান যে তাহার ভাষার ধ্বনিচ্ছন্দে অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেজন্য রীতিমত মাত্রাবৃত্তে পদ্যরচনা করিতে বসিয়াও তাহার নিজের ভাষার স্বাভাবিক ছন্দ-প্রবৃত্তি যে তাহাকে বার বার নিয়মভ্রষ্ট করে, তাহার প্রমাণ ইহাতে আছে।—

তিঅড্ডা চাপী জোইনি দে অঙ্কবালী।
কমলকুলিশঘাণ্ট করহঁ বিআলী।

পদটি আরম্ভ হইয়াছে এইরূপ বৃত্তগন্ধী মাত্রা-ছন্দে, ইহাতে 'গণ'ভাগের আমেজ পর্য্যন্ত রহিয়াছে! কিন্তু তাহার পরেই—

জোইনি তঁই বিনু খনহিঁ ন জীবমি।
তো মুহ চুম্বী কমলরস পীবমি।

—পড়িলে সন্দেহ থাকে না, কবির রসাবস্থা যেমন একটু ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে—ভাবের ঘোরে কবি যেই একটু বেসামাল হইয়াছেন, অমনই ছন্দে ও ভাষায় তাঁহার জাতি-কুল ধরা পড়িয়াছে; এ যেন সেই "শড়া-অন্ধা"র অবস্থা। এই দ্বিতীয় শ্লোকটির ছন্দ প্রায় সম-চতুর্মাত্রিক; আধুনিক বাংলায় অনুবাদ করিলে, ভাষা বা ছন্দের অল্পই পরিবর্ত্তন হয়, যথা—

জোইনি / তঁই বিনু / খনহিঁ ন / জীবমি।

এবং—

তোমা বিনা / যোগিনী / ক্ষণেক না / বাঁচিব।

জয়দেবের—

চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং

—ঠিক এই চার মাত্রার চাল—কেবল অক্ষরগুলি সমমাত্রার নয়। শেষের পর্ব্বটিকে খণ্ডপর্ব্ব ধরিলে, ভারতচন্দ্রের—

কি বলিলি / মালিনী / ফিরে বল্ / বল্

যে ছন্দ, ঐ প্রাচীন পংক্তিটির ছন্দ তাহার ঠিক এক ধাপ মাত্র পূর্ব্ববর্ত্তী। যথা,—জোইনি / তঁই বিনু—তোমা বিনা / যোগিনী—কি বলিলি / মালিনী।

এই যে পর্ব্বগুলি, শুধু চার মাত্রা নয়—চারিটি অক্ষরে, সমান মাত্রায়, বিস্তারিত হইতেছে, ইহার কারণ অবশ্য মাত্রার হ্রস্বদীর্ঘ-ভেদের লোপ; অতএব, ছন্দের উপরে ভাষার নিজস্ব ধ্বনি-প্রকৃতির প্রভাব যে ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্বরের দীর্ঘত্ব ঘুচিলেও প্রত্যেক বর্ণ স্বরান্ত; এজন্য এ ছন্দে মাত্রাধ্বনি অতিশয় স্পষ্ট; এবং ইহার লয় মন্থর নয়, দ্রুত। কিন্তু, আর একটি যে চর্য্যাপদের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে খাঁটি বাংলা পয়ারের ছাঁদটি যেন স্পষ্ট উঁকি দিতেছে—এজন্য এ পদটি যে কালহিসাবে বেশ একটু পরবর্ত্তী, তাহা বোধ হয় নির্ভয়ে বলা যায়।

নগর বারিহিরে ডোম্বি / তোহোরি কুড়িআ।
ছই ছোই যাইসো / বাহ্ম নাড়িয়া।

একটু সামান্য ঘষিয়া লইলেই ইহার চেহারা দাঁড়ায় এইরূপ—

নগর বাহিরে ডোম্বি (ডোমনী) / তোমার কুঁড়িয়া।
ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাও যে গো / ব্রাহ্মণ নাড়িয়া।

দেখা যাইতেছে, এই পংক্তি দুইটিকে খাঁটি পয়ারের ছাঁদে যেমন সহজেই ফেলা যায়, তেমনই একটু স্বর করিয়া পড়িলে যেখানে যেমন আবশ্যক অক্ষরের মাত্রা হরণ বা পূরণ করিয়া লওয়া যায়। অতএব খাঁটি বাংলা পয়ারের পূর্ব্বাভাস এইরূপ পংক্তিতে এখনই দেখা দিয়াছে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, খাঁটি মাত্রাবৃত্তের চারি মাত্রার পর্ব্বপ্রবাহে

যে দ্রুততর গতি থাকে (যেমন পূর্ব্বোদ্ধৃত উদাহরণগুলিতে), এখানে তাহা নাই; তাহার কারণ, এখানে মাঝের যতিটি আরও স্পষ্ট—পয়ারের ৮।৬ পদভাগের মধ্যস্থিত যতির মত; অর্থাৎ ছন্দ ক্রমে পর্ব্বভূমক হইতে পদভূমকে পরিণত হইতেছে।

ইহার পর প্রাচীন পয়ারের আর কয়েকটি উদাহরণ দিব, প্রথমটি 'শূন্যপুরাণ' এবং পরেরগুলি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' হইতে।

'শূন্যপুরাণ'—

নহি রেক নহি রূপ নহি ছিল বন্ন চিন।
রবি সসী নহি ছিল নহি রাতি দিন।
নহি ছিল জল থল নহি ছিল আকাস।
মেরু মন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাস।

—ইহার প্রথম ও তৃতীয় পংক্তির সহিত দ্বিতীয় ও চতুর্থ পংক্তির তুলনা করিলে দেখা যাইবে ছন্দ এখনও টলিতেছে, আট ও ছয়ের পদভাগ এখনও স্থির হয় নাই; অথচ, ৮।৬-এর পদভাগ অস্পষ্টও নয়। পয়ারের ক্রমপরিণতির একটা বড় চিহ্ন—মাত্রাবৃত্ত বা বর্ণবৃত্তের মধ্যে দোল খাইয়া শেষে বর্ণবৃত্তে আসিয়া স্থিতিলাভ করা।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, এই ষোল মাত্রা যখন চৌদ্দটি সমান মাত্রার অক্ষরে আসিয়া দাঁড়াইল, তখনই বাংলা পয়ার ছন্দের জন্ম হইয়াছে। আমি এ সম্বন্ধে পূর্ব্ব প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছি, এখানে তাহার কিছু সংশোধন আবশ্যক। পয়ারের চরণ-শেষে স্বরের টান থাকিলেও তাহা মাত্রালোপের জন্য নয়। যখন এই চরণ মাত্রাবৃত্ত ছিল, তখন ৮+৮ পদভাগই ছিল; এবং চরণের মাত্রাসংখ্যা কম হইলে অক্ষরকে দীর্ঘ করিয়া তাহা পূরণ করা যাইত; তাহাতে স্বরের টানের সঙ্গে মাত্রার টানও ছিল। পরে যখন ছন্দ মাত্রাবৃত্তের পরিবর্ত্তে একরূপ বর্ণবৃত্তে পরিণত হইল, তখনও স্বর অবশ্য রহিয়া গেল; কিন্তু তখনকার

শেষের পদটি সমান মাত্রার ছয়টি অক্ষর ছাড়া আর কিছু নয়; পয়ারের চরণে ঐ চৌদ্দটি বর্ণের অতিরিক্ত আর কিছু নাই। যতদিন তাহাকে ষোল মাত্রা পূরণ করিতে হইয়াছে, ততদিন তাহার জাতিই ছিল ভিন্ন; ততদিন সে খাঁটি বাংলা পয়াররূপে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। ৮+৮ শেষে ৮+৬ হইয়াছে—পয়ারের জন্মের ইতিহাস তাহাই বটে; কিন্তু ঐ ছয় যে আট নয়, ইহাই তাহার বৈশিষ্ট্য, এবং ইহার জন্যই সে পরে অনেক কাজ করিতে পারিয়াছে।

এই লক্ষণের দিক দিয়াই 'শূন্যপুরাণে'র এই পংক্তিগুলির ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে। এখানেও সেই আদিম ষোল মাত্রার ঝোঁক বিদ্যমান—প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে চার মাত্রার চারিটি পর্ব্বভাগ সহজেই হইতে পারে—স্বরমাত্রা দীর্ঘ করিয়া, অথবা এখনও সুরের সাহায্যে মাত্রাসংখ্যা পূরণ করিয়া লওয়া চলে। তথাপি দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে এরূপ পর্ব্বভাগ করিয়া ১৬ মাত্রা পূরণ করিতে একটু বেগ পাইতে হয়—একটু বেশি টানিতে হয়; কিন্তু, পয়ারের চৌদ্দ, ও ৮+৬ ধরিলে, ছন্দটি অতিশয় সহজ হইয়া উঠে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, ভাষার প্রকৃতিবশে সেই প্রাচীন ছন্দের ১৬ মাত্রার চরণ ক্রমে কি আকার ধারণ করিতেছে, এবং কেনই বা তাহা করিতেছে।

ইহার পর, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে' পয়ার যেরূপে দেখা দিয়াছে, তাহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। এতদিনে ছন্দটি বাংলা হইয়া উঠিয়াছে, না হইবে কেন? 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'ই যে বাংলা ভাষায় প্রথম কবিতার জন্ম হইয়াছে। ইহার ভাষাও যেমন সুপরিস্ফুট ভাব ও অর্থের ভাষা, ছন্দও তেমনই সেই ভাষারই অনুবর্ত্তী। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র কবি শুধুই বাংলার আদি কবি নয়, বড় কবি। তাই তাঁহার হাতে পড়িয়া ভাষা ও ছন্দ দুই-ই আপন রূপটি পাইয়াছে। রূপরসবিহ্বলতার সহিত যে

ধ্যান-গভীর ভাবুকতা বাঙালীর কাব্যসাধনা ও ধর্ম্মসাধনাকে এককালে অভিন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, সেই বিশিষ্ট প্রতিভার যুগব্যাপী বিকাশধারার এক প্রান্তে যেমন রবীন্দ্রনাথ, তেমনই তাহার অপর প্রান্তে চণ্ডীদাস। অতএব, এই প্রান্ত হইতেই বাংলা কবিতার সঙ্গে বাংলা ছন্দও যাত্রা সুরু করিয়াছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পয়ারে যে লক্ষণ দুইটি নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা এই।—প্রথম, অক্ষরের উচ্চারণে দীর্ঘ-স্বরের প্রয়োজন আর নাই বলিলেই হয়; যেখানে সেরূপ আছে বলিয়া মনে হয়, সেখানে বস্তুতঃ তাহা দীর্ঘ-স্বর নয়—গানের সুরের অবকাশ মাত্র। দ্বিতীয়, পদভাগের মধ্যে নানা আয়তনের শব্দ প্রবেশ করিয়াছে, তাহাতে, ভাষারই প্রয়োজন অনুসারে, চার ছাড়াও, দুই ও তিন মাত্রার পদচ্ছেদ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে—অর্থাৎ ছন্দের উপরে ভাষার প্রভাব দেখা যাইতেছে; ইহারও কারণ, ভাষা এতদিনে বাংলা হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দের নমুনা এইরূপ—

নিতম্ব জঘন ঘন পীন স্তন ভার।
দেহে তুলি দিল বিধি যৌবন তাহার।
* *
দধি দুধ ঘৃত ঘোল হাটে না বিকায়।
এবে গোয়ালার গেল জীবন উপায়।
* *
সুন্দর কাহ্নাই তোর শুনিয়া যুকতি।
সুদয় হৃদয় ভৈল রাধিকা যুবতী।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র পয়ারে ৬+৮ এবং ৭+৭ পদভাগও দেখা দিয়াছে।

কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র এই ছন্দে পয়ারের ছাঁদটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিলেও, ইহার পদগুলি গীতিপ্রধান বলিয়া শেষে এই ধারা ভিন্নমুখী হইয়াছে। কৃত্তিবাস হইতে পয়ার একটু ভিন্ন কাজে ভিন্ন ধারায় চলিতে সুরু করিয়াছে; 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ছন্দের গীতিসুর, তাহার কাব্য-মন্ত্রের মতই, বাংলা পদাবলী-সাহিত্যে সঞ্চারিত হইয়াছে। কিন্তু,

তথাপি বাংলা পয়ারে এখন হইতে যে একটি নূতনতর সুরের টান যুক্ত হইল, তাহার প্রভাব সে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

৩

ইহার পর, কৃত্তিবাস-কাশীদাসের যুগে, পয়ারের আর বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই যুগে ভাষার উপরে সংস্কৃতের পালিশ আরম্ভ হইয়াছে; তাহার ফলে, ছন্দের দুইটি দোষ দূর হইয়াছে। প্রথম, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র ছন্দেও খাঁটি বাংলা শব্দেরও অন্তবর্ণ স্বরান্ত হওয়ায়, ছন্দ যেমন একটু আড়ষ্ট বোধ হয়, ভাষার শ্রীও তেমনই কতকটা নষ্ট হয়; এখন ভাষার সাধু রীতির জন্য (আমি প্রচলিত পাঠের কথাই বলিতেছি) বর্ণের স্বরান্ত উচ্চারণ আর তেমন শ্রুতিকটু নয়; দ্বিতীয়তঃ, যুক্তবর্ণের বহুলতর ব্যবহারে, এবং অনুপ্রাসের গুণে, ছন্দের ধ্বনিঝঙ্কার বাড়িয়াছে। আজিও এমন সকল পংক্তি পড়িয়া মুগ্ধ হইতে হয়—

রতন রঞ্জিত তার পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংসগতি যেন, নূপুরের রব।
করে শঙ্খ-কঙ্কণ কিঙ্কিণী কটি মাঝে।
রতন নূপুর তার রুনুঝুনু বাজে।
পৃষ্ঠে লোটে স্থূলরূপে প্রবালের ঝাঁপা।
গৌর গায় গন্ধ করে গন্ধরাজ চাঁপা।
ছড়া ছড়া বাজুবন্দ অঙ্গের উপর।
যে অঙ্গে যে শোভা করে পরেছে বিস্তর।

ভাষার এই রীতিসংস্কারের ফলে, সুর কিছু সংযত এবং পয়ারের দ্বৈমাত্রিক লয় আরও বিশুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে; অর্থাৎ, পদের শব্দগত অক্ষর-সজ্জা যেমনই হউক, ছন্দের গতিভঙ্গিতে দুই মাত্রার পদক্ষেপ রহিয়াছে। এজন্য ছন্দের গতি যেমন মন্থর, তেমনই পদভাগের যতিও

দীর্ঘতর হইয়াছে, এই যতির স্থানে থামিয়া, প্রথম পদের অন্তেও সুরের টান দেওয়া চলে। এইজন্য, পদভাগ যেখানে ৭।৭, যেমন—

করে শঙ্খ কঙ্কণ / কিঙ্কিণী কটিমাঝে

—সেখানে যতি স্থানভ্রষ্ট হওয়ায়, এই সুর বাধা পায়, এবং ছন্দে বেশ একটু দোল লাগে।

ইহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর পয়ার। এই কালে ভাষা আর একটা মোড় ফিরিয়াছে—ঘনরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' তাহার প্রমাণ। এতদিনে ভাষার স্টাইলের দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে, রচনাকার্য্যে শিল্পী-মনোবৃত্তির উন্মেষ হইয়াছে। এখন হইতে কেবল শব্দ-চয়নের সাধু রীতিই নয়, আলঙ্কারিকতার দিকেও বিশেষ মনোযোগ লক্ষিত হয়। আরও এক লক্ষণ এই যে, পদমধ্যে শব্দগুলি কেবল ছন্দের ছাঁচে ঢালাই হইতেছে না, পদচ্ছেদগুলি বাঁধা চার মাত্রার দিকে না ঝুঁকিয়া শব্দের আয়তনের উপরেই অধিকতর নির্ভর করিতেছে। ইহার একটি কারণ, শব্দের অন্ত্যবর্ণ হসন্ত হইলে, তাহার স্বরান্ত উচ্চারণ আর গ্রাহ্য হইতেছে না। নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে এই সকল লক্ষণই আছে—

পরম পুরুষ বটে পিতামহ মোর।
হরিপদ-নখ-বিধু-সুধায় চকোর।

(দ্বিতীয় চরণ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের রচনা বলিয়া মনে হয়)

* *

অঙ্গের আভায় ভয় মানিল তিমির

* *

শোকে-জরা জননী সরণি-মুখ চেয়ে

* *

কিন্তু এই অসির অসীম গুণ আছে।
শঙ্কায় সবল শত্রু কাছে নাহি আসে।

এ ভাষাও মার্জ্জিতরুচি শিক্ষিত সাহিত্যিকের ভাষা। "অঙ্গের আভায় ভয় মানিল তিমির" এই উচ্চাঙ্গের কবি-ভাষা, এবং "শোকে-জরা

জননী সরণি-মুখ চেয়ে"—পংক্তিটির ৭।৭ পদভাগ, ও তাহাতে মিলযুক্ত শব্দের অনুপ্রাস—বাংলা কাব্যকলারও একটি বিশেষ স্তর নির্দ্দেশ করিতেছে। কিন্তু সবচেয়ে লক্ষণীয়, কেবল রচনার এই আলঙ্কারিকতাই নয়, সেই সঙ্গে ঘনরামের ভাষায় খাঁটি বাংলা বুলির প্রাচুর্য্য। তাঁহার ভাষায় দুই স্তরের শব্দই সমান মর্য্যাদা ও প্রয়োগ-সৌষ্ঠব লাভ করিয়াছে, তাহার কারণ, ভাষার রসবোধ থাকায়, তাঁহার রচনা স্টাইলহীন নয়। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে ভারতচন্দ্রের রচনারীতির পূর্ব্বাভাস আছে—

সমাপন-বন্ধন যখন হইল মা।
বাবা কন গোঁসাই ভোজনে তোল গা।

* *

ভ্রাতার বচনবাণে বিদরিছে বুক।
খেতে শুতে বসিতে উঠিতে নাই সুখ।

* *

মোরে আঁটকুড়া বলে তোরে বলে বন্ধ্যা।
পাপ বাড়ে বদন দেখিলে তিন সন্ধ্যা।

এই পংক্তিগুলিতে পয়ারের শেষ পরিণতির আভাসও পাওয়া যায়। ইহাতে নিয়মিত চার মাত্রার পদচ্ছেদ আর নাই, কারণ, পদের মধ্যে শব্দগুলি একটু পৃথক আসন দাবি করিতেছে, যথা—

খেতে, শুতে, বসিতে / উঠিতে, নাই সুখ

তেমনই, ছন্দমধ্যে বর্ণের হসন্ত উচ্চারণ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। এ ভাষায় বাংলা শব্দগুলি আর কেবল শব্দমাত্র নয়—সেগুলি খাঁটি বাংলা 'বুলি' হিসাবেই বিশেষ অর্থ ও বিশেষ রসের দ্যোতনা করিবার জন্য কবিকর্ত্তৃক সজ্ঞানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবি যে 'হসন্ত'কে ভয় করেন না, তাহার প্রমাণ, তিনি উপায় থাকিতেও 'কন'-এর হসন্তবর্ণ বজায় রাখিয়াছেন। আসল কথা, বাংলা ভাষা এতদিনে সাবালক হইয়া বাঙালী কবির নিকটে সকল বিষয়ে পূরা অধিকার দাবি করিতেছে।

অষ্টাদশ শতকে বাংলা ভাষা যে একটি প্রৌঢ় সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হইতে চলিয়াছে, ঘনরামের কাব্যে তাহার যেমন সূচনা, ভারতচন্দ্রের কবিতায় তেমনই তাহার পূর্ণ-পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। ভারতচন্দ্র বাংলা ভাষার প্রথম সাহিত্য-শিল্পী, এবং বৃটিশ-পূর্ব্ব যুগের শ্রেষ্ঠ কাব্যকার। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর সহিত তুলনা করিয়া অনেকে তাঁহার কবিশক্তির ন্যূনতা প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র যে বাংলা ভাষার কে, এবং ভাষা যে কাব্যের পক্ষে কি, এই জ্ঞান যাঁহাদের নাই তাঁহারাই প্রাচীন বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতচন্দ্রের স্থান কোথায় তাহা বুঝিতে ভুল করেন। ভারতচন্দ্রের কবিতার প্রধান রস তাহার বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, এবং তাহাও বাংলার ভাষারই। তিনি বাংলা ভাষা-তরুর, শুধুই ফুল নয়—পাতা-গুলি পর্য্যন্ত লইয়া, সেই তরুরই আশ্রিত গুলঞ্চলতার ডোর দিয়া সাহিত্যের যে রূপকর্ম্ম করিয়াছেন, সেকালে বাঙালীর পক্ষে তাহা এক অভাবনীয় বস্তু। ভারতচন্দ্র ভাষাকে যেন একখানি শান্তিপুরী শাড়ি মাত্র পরাইয়া—পায়ের মল কয়গাছির মাপ ঠিক করিয়া, এবং মাথার চুল একটু ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিয়া—তাহার শ্রী যেরূপ বাড়াইয়াছেন, এবং কেবল তাহারই কারণে সেই সুচতুরা স্বল্পভাষিণী যুবতীর চোখে যে কটাক্ষ, এবং অধরে যে হাসির ভঙ্গিমা ফুটিয়াছে—সে যে কত বড় প্রতিভার কাজ, তাহাতে কি কোন সন্দেহ আছে? ভারতচন্দ্রের ছন্দ এই ভাষারই একটি অন্তরঙ্গ উপাদান; বাংলা ছন্দের গীতিধ্বনিকে তিনি যে কত রূপে লীলায়িত করিয়াছেন, সে আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক; কিন্তু পয়ার ও ত্রিপদীকে তিনি যে ছন্দ-গৌরব দান করিয়াছেন, তাহাতেই বাংলা কাব্য প্রাণ পাইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, তখন বাংলা গদ্যরীতির সৃষ্টি হয় নাই; ছন্দ তখন কেবল কবিতারই অঙ্গ

ছিল না, তদ্দ্বারা বাক্যরচনারীতিও নিয়ন্ত্রিত হইত। পয়ারের ঐ স্বল্প আয়তনেই (স্বল্প হইলেও অন্য ছন্দের তুলনায় উহার চরণের গতি কিছু মুক্ত) বাক্য (sentence) গড়িয়া উঠিবার সামান্য অবকাশ মিলিত; পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের ছন্দে বাক্য বেশ স্বচ্ছন্দ নয়, এমন কি, অঙ্গহীন হইতেও দেখা যায়—যেন কোন প্রকারে ছন্দের মধ্যে একটু স্থান করিয়া লইয়াছে। ভারতচন্দ্র এই স্বল্প পরিসরকেই যেন সানন্দে স্বীকার করিয়া ভাষার যে মিতাক্ষর-গাঢ়তা, বা বাক্‌সংযমের বাক্‌পটুতা, দেখাইয়াছেন, তাহাতে অতি সরল সহজ ভাষায় একটি উৎকৃষ্ট ক্ল্যাসিক্যাল স্টাইলের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। তাঁহার রচনায় যেমন বাগ্‌বাহুল্য নাই, তেমনই, একটি শব্দও প্রয়োগ-দোষে দুষ্ট নয়—এ কথা বাংলার আর কোন কবির সম্বন্ধে খাটে না। ভারতচন্দ্রের রচনার এই বাক্‌সংযম ও বাক্‌শুদ্ধির উদাহরণস্বরূপ আমি তাঁহার গ্রন্থ হইতে যে কোন একটি স্থান উদ্ধৃত করিলাম।—

তুমি বাড়াইলে প্রীতি, মোর তাহে নাহি ভীতি,
রহে যেন রীতি নীতি—নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসো যেয়ো, আর দিকে নাহি ধেয়ো,
সদা একভাবে চেয়ো এই রাধিকায়।
তুমি হে প্রেমের বশ, তেঁই কৈনু প্রেমরস,
না লইও অপযশ ধঞ্চিয়া আমায়।
মোর সঙ্গে প্রীতি আছে না কহিও কার কাছে,
ভারত দেখিবে পাছে—না ভুলায়ো তায়।

এখানে প্রায় সর্ব্বত্র আটটি মাত্র অক্ষরে এক একটি বাক্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল তিনটি চরণে কবি পূরা চৌদ্দ অক্ষরই লইয়াছেন। বাক্যের এই ক্ষুদ্র আয়তনের প্রতি কবির যে লোভ, সেজন্য তিনি সংস্কৃত শব্দ ও সন্ধি-সমাসের শরণাপন্ন হন নাই, বাংলা ভাষাকেই, যেন চাঁচিয়া ছুলিয়া সর্ব্ববাহুল্যবর্জ্জিত করিয়াছেন; অর্থাৎ এই স্টাইল সম্ভব হইয়াছে

খাঁটি বাংলা বুলির অতিশয় সতর্ক নির্ব্বাচন ও নিপুণ যোজনায়। এখানে অতিশয় অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, আমি এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা-শিল্পীর স্টাইল ও কবিশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিয়া পারিলাম না—ছন্দের কথা পরে হইবে।

প্রথমে 'অন্নদামঙ্গলে'র "হরগৌরীর কোন্দল" হইতে কিছু উদ্ধৃত করিলাম—তাহাতে ভারতচন্দ্রের হাতে বাংলা কাব্যের ভাষা কি রূপ ধারণ করিয়াছে, এবং পয়ারকে কবি 'গীতি' হইতে 'কথা'র ছন্দে কেমন রূপান্তরিত করিয়াছেন, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলিবে।

শিবার হইল ক্রোধ শিবের বচনে।
ধক্ ধক্ জ্বলে অগ্নি ললাট-লোচনে।
শুনিলি বিজয়া জয়া বুড়াটির বোল।
আমি যদি কই তবে হবে গণ্ডগোল।
হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে প'ড়ে নাম হৈল চণ্ডী।
গুণের না দেখি সীমা রূপ ততোধিক।
বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক।
সম্পদের সীমা নাই—বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা-সিন্দুকের কুঁজি।
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্নবস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটুকথা কিসের লাগিয়া।

পড়িবার সময়ে কোন্দলকারিণী শিবগেহিনীর শুধু মুখঝামটাই নয়, মুখভঙ্গিটি পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। এইবার একটি অতিশয় পরিচিত কবিতার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব, ইহাতে কেবল ভাষা নয়, ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার প্রায় সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা সেই অপূর্ব্ব "অন্নদা-পাটনী-সংবাদ"। দেবী ছদ্মবেশে পারঘাটায় আসিয়া ঈশ্বরী পাটনীকে পার করিয়া দিতে বলিলেন, তখন—

ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী—
একা দেখি কুলবধূ, কে বট আপনি?

কথা কয়টিতে পাটনীর মুখের সন্ত্রস্ত ভাব, দেবীর চোখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিবার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত ধরা পড়িয়াছে।

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফেরফার।

দেবী যখন "বিশেষণে সবিশেষ" পরিচয় দিলেন, তখন—

পাটনী কহিছে মাগো বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।

দেবীর কথা হইতে ওইটুকু মাত্র বুঝিয়া তাহার সন্দেহ দূর হইয়াছে। কুলীনের সংসারে অমন ঘটিয়া থাকে, বড়লোকের মেয়ে বলিয়াই অসহ্য হইয়াছে; পাটনী দুঃখী মানুষ, খাটিয়া খায়; বড়লোকের দুঃখে দুঃখ করিবার সময় তাহার নাই, বরং কুলবধূর এই আচরণে সে যেন খুশি হয় নাই, তাই দেবীকে তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল—

শীঘ্র আসি নায়ে চড়, কিবা দিবা বল।
দেবী কন্ দিব, আগে পারে লয়ে চল।

এমন সহজ ভাষায় এত স্বল্পাক্ষরে আর কেহ এমন কাহিনী-রস সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে? 'কিবা দিবা বল'—ভাষার এই অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিতেই চরিত্রও জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতচন্দ্রের রচনায় শব্দার্থের এই যাদুশক্তির কারণ—তিনি যেমন বাক্‌সংক্ষেপের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তেমনই কথ্যভাষার জীবন্ত বুলিগুলির মাধুর্য্য তিনিই প্রথম পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এমন অল্প কথায় গল্পের সকল রস ফুটাইয়া তোলা এবং অতি সূক্ষ্ম হিউমার (humour) সহযোগে কেবলমাত্র নিপুণ বাক্‌ভঙ্গির দ্বারা, এই যে চিত্রাঙ্কন—ইহা একজন শ্রেষ্ঠ কবির পক্ষেই সম্ভব। তাই এই অতি ক্ষুদ্র কাহিনীটির মধ্যেই একটি সম্পূর্ণ চরিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিরক্ষর গ্রাম্য মানুষ; বয়স হইলেও প্রাণের সারল্য যায় নাই; গরিব অথচ ধর্ম্মভীরু; অতি অল্পে

সন্তুষ্ট; পারের মাঝি হিসাবে তাহার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তাই একটু বেশি সতর্ক; তাহার উপর, যে বিশেষ হিন্দু-কাল্‌চার সমাজের নিম্নস্তরেও সঞ্চারিত হইয়া এককালে বাঙালীর জাতীয় চরিত্রকে যেন—একপ্রকার ভক্তির—আত্মসমর্পণের ভাবে, শান্ত ও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, ভারতচন্দ্রের এই ঈশ্বরী পাটনী তাহারই একটি চমৎকার নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

কবিতায় ভাবোদ্রেকের ব্যাপারেও এ কবির কবিস্বভাবের সংযম বিস্ময়কর; এই কাহিনীতেও তাহার যে সুযোগ ছিল, তিনি তাহা অনায়াসে ত্যাগ করিয়াছেন; কেবল দুইটি মাত্র পংক্তিতে কবির প্রাণ সহসা উদ্দীপ্ত হইয়াছে এবং তাহাতেই তাঁহার সব কথা বলা হইয়াছে।

যাঁর নামে পার করে ভব পারাবার।
ভাল ভাগ্য পাটনী তাঁহারে করে পার।

তারপর আবার সেই পাটনী—

বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ।
পাটনী বলিছে, মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে।

—এ কথা একেবারে খাঁটি পাটনীর কথাই বটে; কিন্তু সেঁউতির উপরে সেই পা দুইখানি রাখিতে দেখিয়া কবিও আর একবার একটু ভাববিহ্বল না হইয়া পারেন নাই; কিন্তু তাহাতেও বাগ্‌বিস্তার নাই; পাটনী কিন্তু এসব কিছুই বুঝিতেছে না—এই না বুঝিবার ক্ষমতাই তাহার চরিত্রটিকে এমন বাস্তব অথচ রসপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। শেষে যখন সে দেবীর আসল পরিচয় পাইল, তখনও বর চাহিতে বলিলে, নির্ব্বোধ পাটনী আর কিছু চাহিল না, কেবল—

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

সাক্ষাৎ-আবির্ভূত দেবতার কাছে এমন ক্ষুদ্র প্রার্থনা কি আর কেহ করিয়াছে? পাটনীর কল্পনায় ইহা অপেক্ষা বড় সৌভাগ্য আর কিছু হইতে পারে না—চরিত্রের পূর্ব্বাপর সঙ্গতি কি চমৎকার! কিন্তু এই পাটনীর জবানিতেই কবি যে একটি তত্ত্বের ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহাতে অতি নির্ব্বাধ পাটনীকেও আর এক হিসাবে অতিশয় বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হয়। পাটনীর প্রার্থনায় যে ভক্তজনোচিত নৈরাকাঙ্ক্ষা আছে,

তাহা ভক্ত খ্রীষ্টানের "Give us this day our daily bread" এই প্রার্থনারই মত। ভারতচন্দ্রের ছন্দ আলোচনার পূর্ব্বে তাঁহার ভাষা ও কবিত্বশক্তির এই সামান্য পরিচয়টুকু না দিয়া পারিলাম না। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে বাংলায় গান ছিল, গানের উপযুক্ত ভাষাও ছিল; কিন্তু এমন কাব্যও ছিল না, কাব্যের উপযুক্ত ভাষাও ছিল না। কবিত্ব ভাষা ও ছন্দ—এই তিনের সমান মিলনে—বা, পরস্পরের নিখুঁত উপযোগিতায়—বাংলা কাব্যের ইতিহাসে সেই প্রথম একজন বড়দরের কবিশিল্পীর অভ্যুদয় হইয়াছিল। কেবল ভাবকল্পনার মহার্ঘতা বা কাহিনীকুশলতাই কবিশক্তির নিদর্শন নয়; ভাবকল্পনার উপযোগী ভাষা বা বাণীর প্রকাশসুষমাই যে কাব্যের প্রধান রসহেতু, বাঙালী ভারতচন্দ্রের কাব্যেই তাহা সর্ব্বপ্রথমে উপলব্ধি করিয়াছিল। ভারতচন্দ্রের পর প্রায় এক শত বৎসরের মধ্যে এমন আর একজন কবিরও আবির্ভাব হয় নাই বলিয়া সে কাব্য এতদিনেও একটু পুরাতন হয় নাই। পুরাতন না হওয়ার আরও কারণ এই যে, এ ভাষা সত্যকার কবিভাষা; কাব্য যেমন উৎকৃষ্ট হয় ভাষার গুণে, তেমনই ভাষার গুণেই কাব্য বাঁচিয়া থাকে। তাই মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ যেমন বাংলা সাহিত্যে অমর, ভারতচন্দ্রও তেমনই চিরজীবী হইয়া আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি বাঙালী কবি হিসাবে ঈশ্বর গুপ্তের বন্দনা করিয়াছেন; এবং নব্য আদর্শে উজ্জীবিত বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরতিশয় আশান্বিত হইয়া, পুরাতন কবিতার প্রতি মমতা সত্ত্বেও, তিনি তাহার সেই আদর্শের প্রসার কামনা করেন নাই। প্রাচীন কবিতার প্রসঙ্গে তিনি ভারতচন্দ্রকে স্মরণ করেন নাই; তাহার কারণ, নব্যবঙ্গের গুরুস্থানীয় সেই পুরুষ ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্যখানির অশ্লীলতা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই; এজন্য তাঁহার নামোচ্চারণ করিতেও বাধিত। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভা শ্রদ্ধার সহিত বুঝিবার ও বিচার করিবার প্রবৃত্তি যে তাঁহার হয় নাই—সে যেমন তাঁহারও দুর্ভাগ্য, আমাদেরও তেমনই।

৪

এইবার ভারতচন্দ্রের পয়ারের কথা বলিব। আমরা এতদূর পর্য্যন্ত পয়ার ছন্দের যে বিকাশধারা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহাতে ভাষার ধ্বনি-

প্রকৃতির সঙ্গে ছন্দের পূর্ণ সাযুজ্য ঘটে নাই, অর্থাৎ কাব্যচ্ছন্দের সঙ্গে ভাষার উচ্চারণপদ্ধতির যে সম্পর্ক না থাকিলে, ছন্দ একটা কৃত্রিম বস্তু হইয়া দাঁড়ায়—সেই সম্পর্ক সহজ হইয়া উঠে নাই। ছন্দ যে একটা বাহির হইতে গড়া যন্ত্রবিশেষ নয়—যাহার ছাঁচে বাক্যকে ফেলিয়া একটা বাজনা বাজাইলেই হইল—ইহা আমরা এখন যেমন বুঝি (ছন্দশাস্ত্রীরা এখনও বুঝেন না), পূর্ব্বে, কাব্যে সেই অলঙ্কারপ্রিয়তার যুগে, কেহ তেমন বুঝিত না। আদি বাংলার সেই প্রাকৃত-গোত্র হইতে যে ছন্দের উদ্ভব হইয়াছিল—ভাষার রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও যে রূপান্তর হইয়াছে, তাহা আমরা দেখিয়াছি; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ছন্দের প্রয়োজন, ভাষার প্রয়োজন অপেক্ষা বড় হইয়া থাকায়, সেই আদি ছন্দের ভূত নূতন ভাষার স্কন্ধ হইতে নামে নাই; ভাষার প্রকৃতি যেমন হউক, স্বাভাবিক উচ্চারণ যেমন হউক—বর্ণের হসন্ত উচ্চারণ নিষিদ্ধ ছিল; কারণ, তাহা হইলে, ছন্দের নিয়ম ভালমত রক্ষা হয় না। ইহারই জন্য 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র অমন চমৎকার দেশী শব্দগুলি ছন্দের চাপে জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে নাই। কবিতা পাঠ যেমন ছন্দের অনুযায়ী হইয়া থাকে, তেমনই ছন্দও পাঠভঙ্গির দ্বারাই স্পন্দিত বা তরঙ্গিত হয়, এবং তাহাতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শ্রুতিমাধুর্য্য ফুটিয়া উঠে। ভাষা ও ছন্দ—দুইই ভাবের যথার্থ প্রকাশে সাহায্য করে; ভাষার প্রত্যেক বর্ণ তাহাদের বিশিষ্ট ধ্বনিসঙ্কেতে ভাবের কণ্ঠস্বরাশ্রিত রূপকে, আমাদের শ্রুতিগোচর করে; এবং ছন্দ সেই ধ্বনির প্রবাহকে একটি সুবলয়িত সুষমা দান করে। কিন্তু ছন্দ যদি একটা পৃথক বাদ্যধ্বনি হইয়া, ভাষা, এবং ভাষা যাহার রূপ, সেই ভাবকে একটা কৃত্রিম সুরযুক্ত করে, শব্দের কণ্ঠস্বরজাত কোন ধ্বনিবৈচিত্র্য তাহাতে ফুটিয়া উঠিতে না পায়, তবে কাব্যও যেমন রসোজ্জ্বল হয় না, ছন্দও তেমনই একটা শৃঙ্খল হইয়া দাঁড়ায়। ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির সঙ্গে ছন্দের অন্তরঙ্গতা না থাকিলে এমনই ঘটিয়া থাকে। এইজন্য বাংলা পয়ার শেষে সর্ব্ববিধ শিল্পগুণ হারাইয়া একটা রচনারীতি-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ভাব যেমন হউক, ভাষা যেমন হউক—বিষয়বস্তু যতই কবিত্ববর্জ্জিত হউক—এই পয়ার হইয়াছিল তাহাকে কোন রকমে লিপিবদ্ধ করিবার একটা ঠাট মাত্র; বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাক্যের

পংক্তিগত মিল বা যতি-তালের দূরতম সম্পর্কও নাই, তথাপি ছন্দের ঐ কাঠামোটার বড় প্রয়োজন,—শব্দগুলাকে একটু সাজাইয়া দিবার উহাই একমাত্র উপায়, একটু সুর করিয়া পড়িবার মত হইলেই হইল।

ভারতচন্দ্রের ভাষার পরিচয় দিয়াছি—এই ভাষা যাঁহার কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য—এই ভাষার রস যাঁহাকে রক্ষা করিতেই হইবে—তাঁহার হাতে ছন্দ এই ভাষার ধ্বনিধর্ম্মকে অস্বীকার করিতে পারিল না—

শুনিলি, বিজয়া জয়া, বুড়াটির বোল ?
আমি যদি কই, তবে, হবে গণ্ডগোল !

কিংবা—

পরিচয় না দিলে, করিতে নারি, পার।
ভয় করি, কি জানি, কে দেবে ফেরফার।

এখানে পয়ারের বাঁধা-চালের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র নাই, ছন্দের তলে তলে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গিমা পর্য্যন্ত ফুটিয়া উঠিতেছে। ভারতচন্দ্রের ছন্দে, যথাস্থানে বর্ণের হসন্ত উচ্চারণ না মানিয়া উপায় নাই ; এতদিনে ভাষার চাপে ছন্দ দোরস্ত হইয়া আসিয়াছে। সুর এখনও আছে, কিন্তু তাহা ছন্দকে একটু দোল দেওয়ার মত, যেমন—

অন্নপূর্ণা উতরিলা—আ / গাঙ্গিনীর তীরে—এ

আমি সুরের স্থানে কেবল চিহ্নস্বরূপ—'আ' এবং 'এ' বসাইয়াছি ; এই সুর দুইটি যতি-স্থানেই আছে—প্রথমটিতে একটু কম, দ্বিতীয়টিতে একটু বেশি ; ভারতচন্দ্রের ভাষায় ইহার অধিক সুরের অবকাশ নাই। এই সুর ঈশ্বর গুপ্তের যুগে শিক্ষিত সমাজের কাব্যরচনায় আর ছিল না। ঈশ্বর গুপ্ত যমক-অনুপ্রাসের সম্মার্জ্জনী-প্রয়োগে এই সুরকে কাব্য-ছাড়া করিয়াছিলেন ; তাহার প্রমাণ—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে।
আহা তায় রোজ রোজ কত 'রোজ' ফোটে।

* *

আনা দরে আনা যায় কত আনারস।
অনায়াসে করি রসে ত্রিভুবন বশ।

অতএব, ভারতচন্দ্রের পয়ারকে—কেবল বাংলা বুলির প্রাধান্য নয়, কথ্য-ভাষার বাচন-ভঙ্গিও, চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে ; প্রত্যেক বাক্যে, ভাব

ও অর্থের অন্বয়রীতিকে আশ্রয় করিয়া শব্দগুলি স্ব স্ব মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে—ছন্দের মধ্যে কণ্ঠের স্বাভাবিক স্বরভঙ্গিও ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর পয়ারের পূর্ব্বাবস্থা।

বাংলা ছন্দের উৎপত্তি ও বিকাশের এই অতি স্থূল বিবরণ হইতেও যে একটি তত্ত্ব আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, এখানে তাহারও উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। সংস্কৃত হইতেই যে ছন্দ-প্রকৃতি আদি অপরিণত বাংলা ভাষায় সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহার কৌলীন্যও যেমন, তেমনই তাহার কলা-কৌশলও অসামান্য। এই ছন্দই প্রাচীন কাব্যরীতি-সম্মত ; অর্থাৎ, ছন্দ কবিতার একটা বহির্গত অলঙ্কার বা প্রসাধন—বাক্যকে রসাত্মক করিবার একটা অতিরিক্ত উপায়। এজন্য, বাক্যকে ছন্দোবদ্ধ করিবার সময়ে ছন্দের পৃথক মূল্যের দিকেই দৃষ্টি থাকিত, বাক্‌প্রকৃতির দিকে নয়। এই কৃত্রিমতার বিলাস বৃদ্ধি পাইয়াছিল, ক্ল্যাসিক্যাল সংস্কৃতের ছন্দপদ্ধতিতে—তাহার সেই নানা ভঙ্গিমার গণ-বৃত্ত ছন্দে। বাংলা ভাষা প্রথম হইতেই এই কৃত্রিমতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছে ; সে যে তাহার পদ্যের পদচারণায় ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য কত চেষ্টা করিয়াছে, এবং তাহা করিতে গিয়া একুল ওকুল—কোন কুল রক্ষা করিতে পারে নাই—বাংলা পয়ার ছন্দের উদ্বর্ত্তনের ইতিহাসে সেই তত্ত্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তির ফলে তাহার প্রাচীন ছন্দ-সম্পদ কিরূপ দীন ও নানাদোষদুষ্ট ছিল—হিন্দীর সহিত তুলনা করিলে তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। প্রাচীন ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শ বা কাল্‌চারকে ধরিয়া থাকার ফলে, মধ্যযুগে হিন্দী কবিতার যে উৎকর্ষ হইয়াছিল, বাংলা তাহার তুলনায় সর্ব্বাংশে গ্রাম্য বলিতে হইবে। কিন্তু বাঙালী, তাহার জাতির মত, ভাষারও স্বাতন্ত্র্য-বোধ ত্যাগ করিতে পারে নাই—রাজপ্রাসাদের পায়সান্ন-প্রসাদ অপেক্ষা আপনার পর্ণকুটীরে স্বাধীন শাকান্নের আয়োজনে সে অধিকতর তৃপ্তি অনুভব করিয়াছে। ভাষায় ও ছন্দে প্রাচীনের সেই অধীনতা-শৃঙ্খল শিথিল করিতে পারিয়াছিল বলিয়াই, সে এত সহজে সাহিত্যে আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছে। হিন্দী ভাষা বা সাহিত্যের জ্ঞান আমার নাই বলিলেও হয়, তথাপি, তাহার যে ছন্দরীতি

এখনও—ভাষার আধুনিকতা সত্ত্বেও—হিন্দী কবিতার আশ্রয় হইয়া আছে, তাহার পরিচয় পাইয়া, বিস্ময় বোধ করিয়াছি। মনে হয়, সেখানে এখনও ভাষার সঙ্গে ছন্দের সাযুজ্যবিধান হয় নাই, সেই আদি মাত্রাবৃত্ত ছন্দ এখনও সগৌরবে প্রভুত্ব করিতেছে! আমাদের পয়ারের সমস্থানীয় হিন্দী 'চৌপাই' আজিও এই চাল বজায় রাখিয়াছে—

(১) চরণ শরণ কেহি কারণ ত্যাগিহৌ।
জগ জনমত সোই মারণ ভাগিহৌ।

কিংবা—

(২) ভক্তি বিনু যুক্তনর নাহক পধারী।
শক্তি বহি ভক্তি বিনু জ্ঞান নহি ভারী।

ইহাদের ছন্দপদ্ধতি এইরূপ—

(১) চঁরঁণঁ শঁরঁণঁ কেঁহিঁ কাঁরঁণঁ ত্যাঁগিহোঁ

(২) ভঁক্তিঁ বিঁনুঁ যুঁক্তঁ নঁরঁ নাঁহঁক পঁধাঁরী

—বলা বাহুল্য, ইহার সকল বর্ণই স্বরান্ত; প্রত্যেক চরণে বাংলা পয়ারের মত চৌদ্দটি অক্ষর আছে, এবং দ্বিতীয় শ্লোকটি বাংলার মত করিয়া পড়াও যায়। কিন্তু তাহা চলিবে না; কারণ, ইহার মাত্রা কেবল লঘুগুরু নয়, তাহাদের স্থান পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে—নিয়মিত গণ-ভাগও আছে! এই অক্ষর আমাদের পয়ারের অক্ষর নয়; অক্ষর-সংখ্যা ১৪ হইলেও, ইহার মাত্রাসংখ্যা বেশি। আর একটি ষোল মাত্রার (অক্ষর নয়) হিন্দী চরণ এইরূপ—

বন্দোঁ রাম নাম রঘুবর কোঁ

ইহার প্রত্যেক দীর্ঘস্বরকে দুই মাত্রা না ধরিয়া, প্রয়োজনমত হ্রস্ব-দীর্ঘ করিয়া পাঠ করিলে, এই পংক্তিটিতেও খাঁটি চার মাত্রার চাল মিলিবে, যথা—

বন্দোঁ • রাম নাম • রঘুবর • কোঁ

এবং তাহাতে পয়ারের পদভাগও থাকিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, হিন্দী প্রাচীন বাংলার খুব দূর জ্ঞাতি না হইলেও সে তাহার সেই প্রাচীন ছন্দরীতি এখনও ছাড়ে নাই, বরং

তাহাকেই খুব পাকা করিয়া তুলিয়াছে—সে তাহার ছন্দপদ্ধতিতে এখনও নিজস্ব স্বাভাবিক বাক্‌ভঙ্গিকে আমল দেয় নাই। বাংলা যে শীঘ্রই ভিন্ন পথে চলিয়া, শেষে পয়ারের মত একটা স্বকীয় ছন্দ গড়িয়া লইয়াছে, তাহাতে বাংলা ভাষার মতই, বাঙালীর জাতিগত স্বাতন্ত্র্য-স্পৃহার পরিচয় আছে।

৫

প্রসঙ্গ শেষ করিবার পূর্ব্বে, পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমি বাংলা পয়ারের ক্রম-বিবর্ত্তনের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এইখানে সন্নিবিষ্ট করিলাম।—

প্রমথ স্তর। সংস্কৃতের মত অক্ষরমাত্রিক হ্রস্ব-দীর্ঘের প্রভাব। চরণের মাত্রা-সংখ্যা ১৬, পদভাগ—৮+৮। লয় দ্রুত—এজন্য মাঝে যতিটি ছন্দভাগের নির্দ্দেশক মাত্র। Rhythm বা ছন্দস্পন্দ প্রচুর।—

কাঁআঁ / তরুবর ॥ পঁচবি / ডাঁল (চর্য্যাপদ)

দ্বিতীয় স্তর। ঐ একই চরণের পর্ব্বগুলি প্রায় সমমাত্রার চার অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। এজন্য একটি ভিন্নতর গীতিসুরের সৃষ্টি হইয়াছে। ছন্দস্পন্দ অনেকটা আধুনিক দ্বৈমাত্রিক গীতিচ্ছন্দের মত।—

জোইনি। তঁই বিনু ॥ খনহিঁ ন / জীবমি (চর্য্যাপদ)

তৃতীয় স্তর। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' ও 'শূন্যপুরাণে'র—পয়ারের আদি রূপ। ভাষার স্বতন্ত্র রূপ ছন্দে ফুটিয়া উঠিতেছে। পদভাগের যতি আরও সুস্পষ্ট। মাত্রাবৃত্তের সুর কথার সুরে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, এবং দ্বিতীয় পদভাগের ৮ মাত্রা ৬ মাত্রার দিকে ঝুঁকিতেছে।—

নগর বাহিরিবে ডোম্বি। তোহোরি কুড়িআ (চর্য্যাপদ)

চতুর্থ স্তর। পয়ারের পূর্ণ প্রকাশ।—

(১) দধি দুধ ঘৃত ঘোল / হাটে না বিকায় (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন)
(২) মেরু মন্দার ন ছিল / ন ছিল কৈলাস (শূন্যপুরাণ)

পঞ্চম স্তর। কৃত্তিবাস হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত। ভাষা (প্রচলিত পাঠ) সাধু বা সাহিত্যিক হইয়া উঠিয়াছে। তাহার ফলে বর্ণগুলি অনায়াসে স্বরান্ত হইবার সুযোগ পাওয়ায় ছন্দধ্বনি আরও শিষ্ট ও স্বাভাবিক হইয়াছে; এবং ছন্দের দ্বৈমাত্রিক লয়ও আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। খাঁটি বাংলার উপরে সংস্কৃতের পালিশ ছন্দের ধ্বনিকে

আর এক প্রকারে সমৃদ্ধ করিয়াছে, যুক্তবর্ণের মূল্য বাড়িয়াছে। কিন্তু ছন্দের আর কোন বিশেষ উন্নতি হয় নাই—

পৃষ্ঠে লোটে • স্পষ্ট রূপে / প্রবা লের • ঝাঁপা।

* *

মহা ভার • তের কথা / অমৃ ত স • মান।

ষষ্ঠ স্তর। ভারতচন্দ্রের পয়ার। এতদিনে ছন্দের সঙ্গে সহজ বাগ্‌বিন্যাসের আপোস ঘটিয়াছে—ছন্দ ও ভাষার চারি চক্ষুর মিলন হইয়াছে। শব্দের বাক্য ও অর্থঘটিত অন্বয় এবং তজ্জন্য শব্দ সকলের পৃথক মর্য্যাদা, এই দুইয়ের প্রভাবে, পদমধ্যে বাক্যের ভাষানুযায়ী কণ্ঠস্বরভঙ্গিও ধরা পড়িতেছে।—

শুনিলি, বিজয়া জয়া, বুড়াটির বোল?
আমি যদি কই—তবে, হবে গণ্ডগোল।

ছন্দের পদভাগের যে যতি, তাহাও এখানে বাক্যের স্বাভাবিক পদচ্ছেদের অনুগত হইয়া উঠিয়াছে; এজন্য নিম্নোদ্ধৃত চরণের মধ্য-যতি আটের পর না পড়িয়া ছয়ের পরে পড়িলেও ক্ষতি নাই—

দেবী কন, দিব—আগে পারে লয়ে চল।

এই কারণেই পয়ার এক্ষণে যতদূর সম্ভব সুরমুক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পর, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর চরণের পক্ষে পয়ার যে কেন এমন উপযোগী হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

মধুসূদন তাঁহার ছন্দের অমিত্রাক্ষর চরণের জন্য পূর্ব্ববর্ত্তীগণের নিকটে কতখানি ঋণী, তাহা বুঝিবার জন্য বাংলা পয়ারের ক্রমবিকাশ ও পরিণতির এই ইতিহাসটুকুর প্রয়োজন ছিল। আমি ভাষাতত্ত্ববিদ্ নই, ধ্বনি-বিজ্ঞানও আমার পক্ষে একটি বিভীষিকা; তথাপি, কেবল সাধারণ ছন্দজ্ঞান এবং ছন্দরসপিপাসু কান, এই দুইয়ের দুঃসাহসে, আমি পণ্ডিতগণের এই অতিশয় দৃঢ়রক্ষিত এলাকায় অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি, তাহার একমাত্র কৈফিয়ৎ—গরজ বড় বালাই। আমি জানি যে, প্রাচীন কবিদের যে ভাষাকে যতখানি প্রাচীন মনে করিয়া, আমি বাংলা পয়ার ছন্দের এই কালক্রমিক স্তর ভাগ করিয়াছি, তাহা ঐতিহাসিকের অনুমোদিত হইবে না, জানি, 'শূন্যপুরাণ'কে আমি যে-কালে স্থাপন করিয়াছি, অথবা যে ভাষাকে আমি কৃত্তিবাসের ভাষা

বলিয়া, তাহা হইতেই, ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী এক স্তরের সন্ধান করিয়াছি, তাহার কোনটাই গ্রাহ্য হইবে না। আসলে, আমি ইতিহাসকে ততটা অনুসরণ করি নাই যতটা ছন্দের বিকাশধারায় তাহার পরিণতির পৌর্ব্বাপর্য্যটির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছি। প্রচলিত কৃত্তিবাসের ভাষা যদি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক, কিংবা পরবর্ত্তীও হয়, তবু তাহার ছন্দ ভারতচন্দ্রের তুলনায় অপরিণত—সেই স্তরটিকেই আমার প্রয়োজন। সকল প্রতিভাশালী কবিই তাঁহাদের যুগের বহু অগ্রবর্ত্তী, এজন্য এরূপ কবির পরবর্ত্তী কোনও লেখকের রচনার রীতি-পদ্ধতি পূর্ব্বতর যুগের জের টানিয়া চলিতে পারে, অতএব তাহাকে সেই যুগের লক্ষণযুক্ত মনে করাই যুক্তিসঙ্গত। 'শূন্যপুরাণে'র কবিও ঠিক সেই হিসাবে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র কবির পূর্ব্ববর্ত্তী। চণ্ডীদাসের মত কবির সঙ্গে পাল্লা দিবার শক্তি—'শূন্যপুরাণ'-রচয়িতার মত কবির পক্ষে তো কথাই নাই; অন্য কোন কবির পক্ষেও সম্ভব নয়। 'শূন্যপুরাণ' যত পরবর্ত্তী কালেরই হউক, কবি যে ওই ছন্দ ও ওই ভাষার উপরে উঠিতে পারেন নাই, তাহাতে আমার বড় সুবিধা হইয়াছে—আমি বাংলা পয়ারের একটা বিশিষ্ট স্তর খুঁজিয়া পাইয়াছি। খাঁটি ঐতিহাসিক কাল-নির্ণয় ভাষার বিষয়ে যে কারণে প্রয়োজন, এবং ভাষার সেই ইতিহাস ধরিয়া, ছন্দেরও রূপ-বিবর্ত্তন যেরূপ সূক্ষ্মভাবে বুঝিয়া লইতে হয়, আমার প্রয়োজন তেমন নয়; সে প্রয়োজন ইহাতেই সিদ্ধ হইবে। অতঃপর, মধুসূদনের ছন্দনির্ম্মাণে এই পয়ারের কিরূপ উপযোগিতা ছিল, এবং মধুসূদন ঐ পুরাতন ছন্দটিকে কি উপায়ে এই আধুনিকতম রূপ দিয়াছিলেন, সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

৬

আমি পয়ারের যে আদি রূপ, এবং তাহা হইতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' পর্য্যন্ত ছন্দের যে ছাঁদ, ও ভাষার যে গতি-প্রকৃতির পরিচয় দিয়াছি, মধুসূদনের সময়ে তাহার সংবাদ কেহ রাখিত না; রাখিলেও, মধুসূদনের মত পণ্ডিত ও ভাষাজ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে তাহা কতটুকু কাজে লাগিত বলা যায় না। কিন্তু সেকালের বাঙালী-সন্তান বলিয়া মধুসূদনের একটা সুবিধা হইয়াছিল—তিনি কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতির

কাব্য বাল্যকালেই পড়িয়াছিলেন, এবং সেজন্য খাঁটি বাংলাও যেমন আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তেমনই তাহার ছন্দেও তাঁহার কান অভ্যস্ত ছিল। ইহার পর, ভারতচন্দ্রের কাব্যে সেই বাংলা ভাষা ও ছন্দের যতখানি শিল্পোৎকর্ষ হইয়াছিল, তাহা তিনি নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কার্যতঃ তিনি তৎকালপ্রচলিত কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের কাব্য হইতেই তাঁহার ছন্দের চরণ আহরণ করিয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ ভারতচন্দ্র হইতে তিনি, ছন্দের মধ্যে বাংলা বাক্‌ভঙ্গির সমাবেশ সম্বন্ধে, বিশেষ ইঙ্গিতও পাইয়াছিলেন। চৌদ্দ অক্ষরের ওই চরণ, এবং ভাষার কথঞ্চিৎ মার্জ্জিত সাধুরীতি, এবং ছন্দের মধ্যে বাক্‌ভঙ্গির কিছু কিছু ইঙ্গিত—ইহার বেশি কিছু তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের নিকট হইতে পান নাই, এবং ইহাই সম্বল করিয়া তিনি বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে—'যে খেলিতে জানে সে কানাকড়িতেও খেলে', মধুসূদনকেও প্রায় সেইরূপ খেলিতে হইয়াছিল; তফাত এই যে, তিনি এই কানাকড়ির মধ্যেই স্বর্ণদ্যুতি দেখিতে পাইয়াছিলেন—যাহা সেকালে আর কেহ দেখিতে পায় নাই। মধুসূদন নিজে তাঁহার এই ছন্দের নির্ম্মাণকৌশল সম্বন্ধে বেশি কিছু বলেন নাই—যেখানে যেটুকু উল্লেখ করিয়াছেন, পরে তাহা বলিতেছি। তিনি যে মিল্‌টনের ছন্দের আদর্শেই এই বাংলা ছন্দ গড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা সম্ভব হইল কেমন করিয়া? মিল্‌টনের পূর্ব্বে যেমন—Marlowe, Shakespeare, বাঙালী কবির গুরুও তেমনই মিল্‌টন! বাংলা ছন্দের আদর্শ সন্ধান করিতে হইবে ইংরেজী কাব্যে! এমন কথা কে কবে শুনিয়াছে!

মিল্‌টনের সেই 'five-stress line'-এর মাপে বাংলা পয়ারের মাপ যে অনেকটা মেলে, তাহা বুঝি, কিন্তু তাহার সেই 'five-stress', আর এই একটানা সুরের এক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির ছন্দ—ইহাদের মধ্যে মিল কোথায়? তবু মধুসূদন তাহাতে হটিলেন না; তিনি নাকি যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আশঙ্কা নিবারণ করিয়া বলিয়াছিলেন—বাংলার পশ্চাতে তাহার জননী(বা মাতামহী)রূপে দাঁড়াইয়া আছে সংস্কৃত; অতএব ফরাসী ভাষার মত ভাষাতেও যাহা সম্ভব হয় নাই, বাংলায়

সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ অনায়াসে সম্ভব হইবে। ইহাতে, না হয় ভাষাকে সমৃদ্ধ করিবার—সুন্দর ও সুগম্ভীর শব্দরাজি আহরণ করিবার উপায় হইতে পারে; কিন্তু ইংরেজী 'five-stress line'-এর সেই rhythm কেমন করিয়া আমদানি করা যাইবে?

বাংলা ছন্দের ওই মাপটি বড়ই সুবিধাজনক হইয়াছিল এবং সম্ভবত এই মাপটিই তাঁহার সবচেয়ে বড় ভরসার কারণ হইয়াছিল। ইংরেজী blank verse-এর চরণে যে দশটি অক্ষর (syllable) আছে, তাহা বাংলা বর্ণমাত্রিক অক্ষর নয়, তাহার প্রায় প্রত্যেকটির সঙ্গে যে একটি করিয়া হসন্ত বর্ণ থাকে, তাহার জন্য, কালের হিসাবে সে চরণের মাপ আমাদের পয়ারের মাপ অপেক্ষা বরং একটু বেশিই হইবে। অতএব এই মাপটি বড়ই ভাল পাওয়া গিয়াছিল। আমার মনে হয়, ঠিক ঐ চৌদ্দ অক্ষরের ছন্দ তৈয়ারি না থাকিলে, বাংলায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ-রচনা সম্ভব হইত না। বাংলায় যে এই ছন্দ সম্ভব হইয়াছে, তাহার কারণ—ভাষার প্রকৃতিবশে পয়ার ক্রমে সেই ১৬ মাত্রার সকল উপসর্গ দূর করিয়া খাঁটি চৌদ্দবর্ণের চরণে পরিণত হইতে পারিয়াছিল। এই চরণকে লইয়া মধুসূদন তাহার ছন্দকে তরঙ্গিত, এবং সেই তরঙ্গিত ছন্দপ্রবাহকে কূলপ্লাবী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু ওই মাপ একটা বড় কথা; চৌদ্দ অক্ষরের তটসীমা লঙ্ঘন করিয়া যে স্রোত প্রবাহিয়া চলিয়াছে, তাহা ওই Rhythm বা তরঙ্গেরই স্রোতোবেগ। ছন্দ সেই তটবন্ধন স্বীকার করিয়াই এমন মুক্তগতি লাভ করে। ইহাই এ ছন্দের সবচেয়ে বড় রহস্য। ঐ মাপ যদি ঠিক না থাকে তবে, এ ছন্দের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যায়; তখন তাহা গদ্য, কিংবা অন্য কোন ছন্দ হইয়া দাঁড়ায়। মধুসূদন এসব কিছুই বলিবার আবশ্যকতা বোধ করেন নাই; তিনি কেবল মিল্‌টনের ছন্দ পড়িতে বলিয়াছেন, এবং এ ছন্দও পড়িবার সময়ে সেইমত কেবল যতিগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন। তাঁহার বিশ্বাস, তাহা হইলেই আর সব ঠিক হইয়া যাইবে। তিনি যদি জানিতেন যে, একদিন তাঁহার এই ছন্দের নামকরণ হইবে "অমিতাক্ষর", তাহা হইলে বোধ হয় শিহরিয়া উঠিতেন। অথবা তাঁহার ছন্দ লইয়া এতবড় পাণ্ডিত্য যে কেহ করিবে, তাহা তিনি

ভাবিতে পারেন নাই, তাই এ বিষয়ে দেশবাসীর মাথা ঘামাইতে চান নাই, কেবল যাহাতে তাহারা একটু তাল-মান রাখিয়া পড়িতে পারে তাহারই জন্য চিন্তিত মাত্র হইয়াছিলেন। মধুসূদনের ছন্দে যতির স্থান নির্দ্দিষ্ট নয় বলিয়া, তাঁহার ছন্দ 'অমিতাক্ষর'! অর্থাৎ তাহার অক্ষর-সংখ্যাও ঠিক নাই—সে চরণ মাপহীন! কোন ছন্দ যে অমিতাক্ষর হওয়া সত্ত্বেও গদ্য না হইয়া পদ্য হইতে পারে, এমন সিদ্ধান্ত মৌলিক বটে! কিন্তু কিছু বলিবার যো নাই, যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের বৈদিক শ্রাদ্ধ-হোম করিতে সুরু করিয়াছেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঋত্বিকগণেরই একজন এই অমূল্য তত্ত্বটি উদ্ধার করিয়াছেন। মিল্‌টনের ছন্দকে কেহ এখনও 'অমিতাক্ষর' বলিতে সাহস পায় নাই, তাহার কারণ বোধ হয়, সে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও মিল্‌টনের কাব্য পাঠ্য হয় নাই। এই নামকরণের পক্ষে, সেই দুর্দ্দান্ত ছন্দপণ্ডিত যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা হইতে কেবল ইহাই বোধগম্য হয় যে, মধুসূদন তো কেবল ছন্দটাই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু ছন্দের যে নাম রাখিয়াছিলেন, তাহা নিতান্তই ছন্দোহীন, অর্থাৎ বেশ মোলায়েম নয়; অতএব, ঐ নামটা আর একটু 'তানপ্রধান' করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। এ ছন্দে যতির কাজ যে স্বতন্ত্র, তাহার সঙ্গে চরণের অক্ষর-সংখ্যার যে কোন বিরোধ নাই, এবং যে কোন যতিস্থান পর্য্যন্ত পদচ্ছেদের মাত্রাসংখ্যা যেমনই হোক, মিল্‌টনের Iambic pentameter বা five-stress line-এর মত এই ছন্দও যে মূলে পয়ারের ৮+৬ প্রকৃতিসম্পন্ন, এবং ওই চৌদ্দ মাত্রার মাপটিই যে উহার প্রাণ—ইহা যে না বুঝিয়াছে, সে কেন হেমচন্দ্র পর্য্যন্ত দৌড় দিয়াই ক্ষান্ত হইল না? মধুসূদনের 'অমিত্রাক্ষর' ছন্দে যতির কাজ কি তাহা পরে বলিব; কিন্তু যাহার চরণগুলির ওই ৮+৬, এবং ১৪—Law of gravitation-এর মতই একটা দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম, তাহাকেও 'অমিতাক্ষর' নাম দিতে বাধিল না! ইংরেজী 'blank-verse'-এর 'blank'-এর অর্থ কি? মধুসূদন তাহার যে বাংলা করিয়াছেন, তাহা কি তদপেক্ষা সার্থক হয় নাই? যে ছন্দতত্ত্ব অনুসারে ইহারও ভুল সংশোধন করিতে হয়, তাহাকেই ধিক!

ক্রমশ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

১

রামমোহন রায় যে-সকল বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটি তালিকা সংকলন করিয়া দিলাম। এই তালিকায় প্রকাশ-কাল-সমেত প্রথম সংস্করণের পুস্তকেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশ পুস্তকেরই মূল সংস্করণ দেখিয়াছি, কিন্তু দু-একখানি ছাড়া কোনখানিরই আখ্যা-পত্র নাই; আদৌ ছিল কি না সন্দেহ। এরূপ ক্ষেত্রে প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে পুস্তকগুলির যে নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, আমি তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

রামমোহনের অধিকাংশ পুস্তকেই গ্রন্থকার-হিসাবে তাঁহার নাম ছিল না; কতকগুলি আবার অপরের নামে বা ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। তবে এগুলি যে তাঁহারই রচনা সে-বিষয়ে সমসাময়িক সাক্ষ্য আছে। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (১৮১৯-২০) দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর যে তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাঁহাতে অনেকগুলি পুস্তকের গ্রন্থকার-হিসাবে রাম-মোহনের নামের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ যে আলোচনা করিয়াছেন (pp. xvii-xviii) তাহাও দ্রষ্টব্য।

আর্বী-ফার্সী

১। **তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদিন।** ইং ১৮০৩-৪।

এই পুস্তিকার ভূমিকাটি কেবল আর্বীতে রচিত। ঢাকা গবর্মেণ্ট মাদ্রাসার সুপারিনটেণ্ডেণ্ট মৌলবী ওবেদুল্লা (Obaidullah El Obeide) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ইহা *Tuhfat-ul-Muwahhidin*, or, *A Gift to Deists* নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তাহার পর আরও কেহ কেহ করিয়াছেন।

'তুহ্‌ফাৎ' সম্পর্কে একটি কথা বলিবার আছে। রামমোহন এই পুস্তকের শেষে লেখেন:—

"এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আমি 'মনাজিরাৎ-উল্‌-আদিয়ান' বা 'নানা ধর্ম্মের বিচার' নামে আমার আর একখানি পুস্তকে করিব।"

ইহা হইতে অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে, রামমোহন এই পুস্তকখানিও প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। রামমোহন হয়ত 'তুহ্‌ফাৎ' লিখিবার সময়ে আর একটি পুস্তক লিখিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এমন কি অংশ-বিশেষ রচনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-পুস্তক কখনও প্রকাশিত হয় নাই সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত। কেহ এ-পর্য্যন্ত 'মনাজিরাৎ'-এর এক খণ্ড আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া পরজীবনে রামমোহন তাঁহার দ্বারা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আর্বী বা ফার্সী ভাষায় লিখিত একখানি মাত্র পুস্তকেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছদ্মনামে *Appeal to the Christian Public* নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন; উহাতে তিনি লেখেন :—

> "রামমোহন রায়...ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও অতি অল্পবয়সে পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করেন এবং সেই সময়ে আর্বী ও ফার্সী ভাষায় একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।"

'তুহ্‌ফাৎ' ভিন্ন তাঁহার রচিত অন্য কোন আর্বী ও ফার্সী পুস্তক থাকিলে তিনি একাধিক গ্রন্থের নাম করিতেন।

বাংলা ও সংস্কৃত

১। **বেদান্তগ্রন্থ**। ইং ১৮১৫। পৃ. ১৭+১৬৬।

The / Bengalee Translation / of the / Vedant, / or / Resolution / of all the / Veds; / the most celebrated and revered work / of / Brahminical Theology, / establishing the unity / of / the Supreme Being, / and / that He is the only object of worship. / Together with / a Preface, / By the Translator. / Calcutta: / From the Press of Ferris and Co. / 1815. /

রামমোহন 'বেদান্ত গ্রন্থ' হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন—ইহার উল্লেখ *Translation of an Abridgment of the Vedant* পুস্তকের ভূমিকায় আছে।

সম্প্রতি ব্রাহ্মসমাজ হইতে *Rammohun Roy and America* নামে Adrienne Moore-লিখিত একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তকখানির বিশেষত্ব—রামমোহন রায়ের গ্রন্থপঞ্জী এবং রামমোহন-সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি যাহা দেশী বিদেশী সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার তালিকা। শ্রীমতী মূরের পুস্তকে কতকগুলি মারাত্মক ভুল আছে। রামমোহনের বেদান্ত

গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি যে-ভুলটি করিয়াছেন, এখানে কেবল তাহারই উল্লেখ করিতেছি। তিনি তাঁহার পুস্তকের ৩৮ পৃষ্ঠায় ভারতবর্ষে প্রকাশিত রামমোহনের "ইংরেজী" পুস্তকের তালিকায় প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছেন :—

C. *In English*:
(1815) 1. The Bengalee Translation of the Vedant [or rather, an English version by Rammohuna Raya of his Bengali essay, founded upon select passages cited from the Vedanta-Sutras of Badarayana], or Resolution of all the Veds; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology, with a preface by the translator. Calcutta, Ferris and Company, 1815.

ইহা যে রামমোহন রায়ের বাংলা বেদান্ত গ্রন্থের আখ্যা-পত্রের নকল তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। শ্রীমতী মূর বেদান্ত গ্রন্থখানি উল্টাইয়া উহা বাংলা কি ইংরেজী তাহা দেখিবার কষ্ট স্বীকার করেন নাই; তিনি কেবলমাত্র উহার ইংরেজী আখ্যা-পত্রটি দেখিয়াই উহাকে ইংরেজী পুস্তক বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন; নতুবা উপরি-উদ্ধৃত আখ্যা-পত্রে বন্ধনীমধ্যস্থ অংশটি যোগ করিতে গেলেন কেন, এবং "In English"—এই পর্য্যায়ের মধ্যেই বা উহার নামোল্লেখ করিলেন কেন?

২। **বেদান্তসার**। ইং ১৮১৫ *। পৃ. ২২।

'বেদান্ত গ্রন্থে'র ন্যায় 'বেদান্তসারে'র হিন্দুস্থানী অনুবাদও রামমোহন প্রচার করিয়াছিলেন।

৩। **তলবকার উপনিষৎ** (কেনোপনিষৎ)। ইং জুন ১৮১৬। পৃ. ১৭।

৪। **ঈশোপনিষৎ**। ইং জুলাই ১৮১৬। পৃ. ২০+৪+১৩।

৫। **মহামহোপাধ্যায় উৎসরানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার**। ইং ১৮১৬।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (১৮১৯-২০) ২য় পরিশিষ্টে দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর যে তালিকা আছে, তাহাতে

* সকলেই ইহার প্রকাশকাল "১৮১৬" খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া আসিতেছেন। রামমোহনের *Translation of an Abridgment of the Vedant* ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় (৯ ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখে *The Government Gazette* পত্রে ইহার সমালোচনা দ্রষ্টব্য)। 'বেদান্তসার' যে ইহার পূর্ব্বেই বাংলায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ এই ইংরেজী পুস্তিকার ভূমিকায় আছে। সুতরাং 'বেদান্তসারে'র প্রকাশকাল "১৮১৫" ধরাই সঙ্গত হইবে।

উৎসবানন্দ ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার-সম্পর্কীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই তিনখানি পুস্তিকার উল্লেখ পাওয়া যায় :—

SANSKRIT

Reply to the observations of
Ootsobanund Bhuttacharjya...Rammohun Roy...Lulloo Jee
[Sunscrit Press]

Answer of the said Ootsobanund
to the above...Ootsobanund Bhuttacharjya Ditto

Rejoinder to the above answer of
the said Bhuttacharjya...Rammohun Roy Ditto

রামমোহনের ইহাই প্রথম শাস্ত্রীয় বিচার। ইহা ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। শ্রীরামপুর কলেজে এই বিচারপুস্তকগুলি আছে (N. 80. 3. 090)।

৩১ আশ্বিন ১২২৩ (১৫ অক্টোবর ১৮১৬) তারিখে আত্মীয় সভায় "পূর্ব্বের প্রাপ্ত প্রত্যুত্তরের এই উত্তর শ্রীযুক্ত বাবু ভৈরবচন্দ্র দত্তের দ্বারা দেওয়া যায়।" রামমোহনের এই প্রত্যুত্তরটির বঙ্গানুবাদ ১৩৩৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা 'প্রবাসী'তে (পৃ. ১০৪-১১০) প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্ধকার

রাত্রি দুপুর হ'ল। চোখে ঘুম নাই,
ঘুম নাই চোখে আজ। রাতের আকাশে
টুকরা তারার কুচি জ্বলে আর নেভে,
নেভে আর জ্বলে শুধু মুমূর্ষুর মত,
অতল আঁধারে যেন ডুবিছে তাহারা।
বিবর্ণ কাহারো জ্যোতি নীলাভ কঠিন
শেষরক্তোচ্ছ্বাসস্ফীত আরক্ত কেহবা
শ্বাসরোধত্রাসত্রস্ত হায় রে তারকা!
যতদূর দৃষ্টি যায় নিশ্ছিদ্র আঁধার
কঠিন নির্ম্মম দৃঢ়—বিষাক্ত জিহ্বার
লালায় করিছে জীর্ণ পৃথিবী আকাশ।
মূঢ় তারকার দল, এ মিথ্যা প্রয়াস
কেন তবে? এতটুকু জ্যোতির কণিকা!
হাসে অন্ধকার মেলি জিহ্বা লেলিহান।

শ্রীউমা দেবী

পিতা-পুত্র

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নুটুবাবুর অট্টালিকার সুদৃশ্য ড্রয়িং-রুম

নুটুবাবু এখন প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ঘটনার চার-পাঁচ বৎসর পর। ইতিমধ্যেই সে লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল এবং অর্থশালী হইয়া উঠিয়াছে। ড্রয়িং-রুমে মূল্যবান আধুনিক আসবাব। দেওয়ালে কয়েকখানি অয়েল-পেন্টিং—রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু। প্রাচীন জিনিসের মধ্যে সেই সূচীশিল্প, It is easier for a camel—সেইখানি রহিয়াছে। নুটুর পরনে মূল্যবান মিহি খদ্দর। পায়ে দামী শুঁড়-তোলা চটি। গায়ে শাল। মাথায় টাকের চিহ্ন। মুখে সিগার। একমনে নুটুবাবু খবরের কাগজ পড়িতেছে

চাকর আসিয়া প্রবেশ করিল এবং একখানি স্লিপ দিল। নুটু সিগার অ্যাশ-ট্রের উপর রাখিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিল

নুটু। কোথায়? কোথায় তিনি?

চাকর। আজ্ঞে, বাইরে চেয়ারে বসতে দিয়েছি।

নুটু। আঃ, ইডিয়ট কোথাকার!

ব্যস্তভাবে বাহিরে গেল, চাকরও গেল, পুনরায় নুটু এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে লইয়া প্রবেশ করিল

আসুন, আসুন। কাশী থেকে কবে ফিরলেন? বসুন।

নিজে দামী আসন আগাইয়া দিল

বৃদ্ধ। ফিরেছি আজ চার-পাঁচ দিন হ'ল। শুনলাম সব। ভারী আনন্দের কথা। তুমি এত বড় বাড়ি করেছ, অ্যাসেম্ব্লির মেম্বার হয়েছ, তোমার ছেলে এম. এ.-তে ফার্স্ট হয়েছে। ভাবলাম, বেটার লেট দ্যান নেভার, যাই, একবার নুটুর সঙ্গে দেখা ক'রে আসি। এখন বল, কি জানাব—অভিনন্দন, না আশীর্ব্বাদ?

নুটু। (প্রণাম করিয়া) সমস্তই আপনাদের আশীর্ব্বাদ।

বৃদ্ধ। বার থেকে যখন তোমাকে সাপোর্ট ক'রে আপীলটা আমার সইয়ের জন্যে পাঠালে, তখন প্রথমটা একটু আশ্চর্য্য হলাম। হুটু কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে! কংগ্রেস হুটুকে নমিনেশন দিলে না! যাক, বার-লাইব্রেরির এককালে প্রেসিডেন্ট ছিলাম, তুমি হ'লে বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট, আমি সঙ্গে সঙ্গেই সই ক'রে পাঠিয়ে দিলাম।

হুট। আপনার নামে অনেক কাজ হয়েছে। আপনার নাম—

বৃদ্ধ। না না। বড় উকিল ব'লে পসার ছিল; তাকে কি আর নাম বলে! তুমি কর্ম্মী, কীর্ত্তিমান পুরুষ, উদ্যোগী পুরুষসিংহ; তোমার নিজের গুণেই কংগ্রেস-ক্যাণ্ডিডেটকে হারানো সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু কেন? কংগ্রেস তোমাকে নমিনেশন দিলে না কেন?

হুট। পার্টি পলিটিক্স তো জানেন! পার্টি পলিটিক্স আর কি! আমি যথাসর্ব্বস্ব কংগ্রেসের প্রয়োজনে ঢালতে পারছি না; এবারকার সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স মুভমেণ্টে আমি জেলে যাই নি।—এই আমার অপরাধ।

বৃদ্ধ। সত্যি কথা বলতে কি হুটু, মডার্ন পলিটিক্স, এই সব আন্দোলন আমি বেশ বুঝতে পারি না বাপু। জেলেই যদি সবাই যাবে, তবে কাজ করবে কে হে বাপু?

হুট। (হাসিয়া) জানেন, পার্টির মুভমেণ্টের সময়, আমার ছেলেকে আমি সেই কথা বলেছিলাম। বলেছিলাম, দেশের অন্নবস্ত্রের আগে সংস্থান কর। জেলে যাওয়ার চেয়ে সেটা বড় কাজ। মুখে সে প্রতিবাদ করলে না, কিন্তু সেই দিনই বিকেলে সে অ্যারেস্টেড হ'ল। থার্টি থার্টি-ওয়ান, দু বছর মাটি ক'রে এবার সে এগ্‌জামিন দিলে। আমার ছোট ছেলে আরও প্রগতিশীল, সে এখনও দেউলীতে। আমার বড় ছেলে, ইলেক্‌শনের সময় কলকাতায় গিয়ে ব'সে রইল, পাছে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আমার জন্যে তাকে কাজ করতে হয়।

বৃদ্ধ। ছেলের বিয়ে দাও হে, ছেলের বিয়ে দাও। সব সেরে যাবে। ওসব হ'ল এক ধরনের হিষ্টিরিয়া।

হুট। বিয়ে তো হয়েই যেত এতদিনে, কিন্তু জেলে তো আর ছাঁদনাতলা

পাতা যায় না! এইবার বিয়ে দেব। কিন্তু ছেলে বলে কি জানেন, উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করব না।

বৃদ্ধ। ভাল কথা হুটু। তুমি কি ছেলের বিয়ে কোথাও ঠিক ক'রে রেখেছ?

হুট। হ্যাঁ। (ইতস্তত করিয়া) মানে, অনেকদিন আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমার স্ত্রী; আমিও অবশ্য—

বৃদ্ধ। দেখ, কয়েকদিন আগে, আমার বাড়ির সামনেই নর্দ্দমার ধারে একটা মাতাল প'ড়ে ছিল, লোকে বললে—হুটুবাবুর বেয়াই। আজ আবার দেখলাম, সে একটা অতি ইতর জাতের মাতালের সঙ্গে মাতলামো করছে। আজও লোকে বললে—হুটুবাবুর বেয়াই। একটি দরিদ্র বিধবা এসেছিল আমাদের বাড়ি, হাতে তৈরি জামা, টেবিল-ক্লথ বিক্রি করতে। মেয়েরা বললে—তোমার বেয়ান। প্রতিশ্রুতি কি তোমার এদের কাছে?

হুট। (মাথা হেঁট করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রতিশ্রুতি আমার এদের কাছেই। এ আমার হয়েছে নীলকণ্ঠের বিষ।

বৃদ্ধ। এ বিষ উদরস্থ হ'লে কিন্তু মারাত্মক হবে হুটু। না না, তুমি এ কাজ ক'রো না। কঙ্কণার ন্যায়রত্নের বংশ তোমরা, তুমি নিজে কীর্ত্তিমান হয়েছ ওই বংশের পবিত্রতায়। এ কাজ তুমি ক'রো না।

মহাভারতের প্রবেশ। ভঙ্গি তাহার সঙ্কুচিত, পূর্ব্বের মত স্বচ্ছন্দ নয়

হুট। কি মহাভারত?

মহাভারত প্রণাম করিল

মহা। আজ্ঞে, দিদি-ঠাকরুণ এলেন, সঙ্গে এলাম। তাই বলি, আপনাকে পেনাম—

হুট। কল্যাণী এসেছে?

মহাভারত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধ। এটি তোমার সেই চাষী-বীর নয়? যাকে নিয়ে তোমার কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে লড়াই শুরু হয়?

হুট। (হাসিয়া) আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধ। সবচেয়ে বড় কীর্ত্তির কন্‌গ্রাচুলেশনই তোমাকে দেওয়া হয় নি হুটু। ওইটেই তোমার সবচেয়ে বড় কীর্ত্তি হে। কঙ্কণার বাবুদের মত দাম্ভিক অত্যাচারী বাবুদের তুমি জব্দ কর নি, সংশোধন করেছ। কঙ্কণায় আমি গিয়েছিলাম, আমার পুরনো মক্কেল তো, ওঁদের এলাকায় জমি-জেরাত আমার আছে। দেখলাম, সে আমলই আর নেই, ধারা-ধরন সব পাল্টে গেছে। কর্ত্তাবাবু বললেন, এসব হ'ল হুটু উকিলের শিক্ষা রাজেনবাবু। ব'লে হা-হা ক'রে হাসলেন। স্বীকার করলেন, আগে যা করতেন, সেসব অন্যায়। তোমার অ্যাসেম্‌ব্লি ইলেক্‌শনে ওঁরা তো তোমাকে সাপোর্ট করেছিলেন শুনলাম। বড়বাবু বললেন, হুটুর ওপর রাগ তো নেই-ই, আমি তাকে শ্রদ্ধা করি, কত বড় লোক হুটু, আমাদের গ্রামের গৌরব ; তাকে আমরা সাপোর্ট করব না!

মহা। আমি বাইরে যাই দাদাঠাকুর।

সসম্ভ্রমে প্রস্থান

হুট। (মহাভারতের যাওয়াটা গ্রাহ্যই করিল না) হ্যাঁ, ওঁরা আমাকে সত্যিই লজ্জা দিয়েছেন রাজেনবাবু। অল্প বয়সে মানুষ এক দিকই দেখে, দু দিক সে দেখতে চায় না। দিনে আলোকেই ভাবে এক-মাত্র সত্যি, আলোই থাকবে চিরকাল ; আবার রাত্রে অন্ধকারকেও ভাবে তাই। দোষগুণ নিয়ে মানুষ, কঙ্কণার বাবুদের দোষটাই সে বয়সে আমার চোখে পড়েছিল, দোষ ছাড়া কিছু দেখতে পাই নি ; কিন্তু আজ দেখছি, গুণও যথেষ্ট আছে ওঁদের।

বৃদ্ধ। কর্ত্তাবাবু তোমার এখানে আসবেন একদিন।

হুট। কর্ত্তাবাবু?

বৃদ্ধ। হ্যাঁ। কর্ত্তাবাবু রসিক লোক তো, বললেন, যাব একদিন হুটুবাবুর ওখানে। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তা বললেন, হুটু শুনেছি মস্ত উকিল, এ-জেলা ও-জেলা থেকে ডাক আসে ; আমি একবার তার সঙ্গে সওয়াল জবাব করতে যাব রাজেনবাবু। নিজের নাতি, দেবনারাণবাবুর ছেলেকে দেখালেন, ছেলেটি এবার বি. এ.

পাস করেছে। ভাল ছেলে। বললেন, একেও আমি উকিল করব। তা তোমার ছেলেটি কই? আমাদের দেশের ভাবী উজ্জ্বল নক্ষত্র?

হুট। অরুণ!

প্রবেশ করিল শ্যামা

শ্যামা। দাদা বেরিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি।

বৃদ্ধ। এটি তোমার মেয়ে?

হুট। প্রণাম কর শ্যামা।

শ্যামা প্রণাম করিল

বৃদ্ধ। রাজরাণী হও ভাই। বাঃ, চমৎকার মেয়ে! (শ্যামা ভিতরে চলিয়া গেল) মেয়ের বিয়ের ঠিক কিছু করলে? এইবার বিয়ে দাও।

হুট। পাত্র খুঁজছি, কিন্তু মনের মত যে পাচ্ছি না! বর পাচ্ছি তো ঘর পাচ্ছি না, ঘর মিলছে তো বর মনের মত হচ্ছে না।

বৃদ্ধ। এক কাজ কর না, দেবনারাণের ছেলেটিকে দেখ না! ছেলেটিকে আমার বড় ভাল লাগল হে।

হুটু চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিল

তবে আজ উঠলাম হুটু। তোমার ছেলেকে একদিন পাঠিয়ে দিও আমার কাছে। আলাপ করব।

নেপথ্যে জড়িত কণ্ঠে সুশোভন বলিতেছে—

"মরণ রে! তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান।"

বৃদ্ধ। ওই সেই লোকটি না?

হুট। (গম্ভীরভাবে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

বৃদ্ধ। না হুটু, তুমি এ কাজ ক'রো না। না না না, তোমার মত লোকের—ছি! ছি! ছি!

হুটু চুপ করিয়া রহিল। প্রবেশ করিল সুশোভন

আচ্ছা, আমি আজ আসি।

প্রস্থান। হুটু তাঁহাকে আগাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল ; ক্রুদ্ধ গম্ভীর তাহার মূর্ত্তি

হুট। দারোয়ান!

সু। (অত্যন্ত বিমর্ষভাবে) আমার মুখ দিয়ে আজ রক্ত উঠল হুটুদা। আমায় দশটা টাকা দেবে? ডক্টর সেন আট টাকার কম দেখেন না।

দারোয়ানের প্রবেশ। অভিবাদন করিল

হুট। ইসকো নিকাল দো বাড়িসে।

দারো। হুজুর?

সে বিস্মিত হইল

হুট। নিকাল দো ইস্‌কো।

সুশোভনকে আঙুল দিয়া দেখাইল

সু। আমাকে নিকাল দেবে হুটুদা?

হুট। (দারোয়ানকে) খাড়া হোকে কেয়া দেখতা তুম?

সু। আমি যাচ্ছি হুটুদা। I have no desire to live। রোগের যন্ত্রণা প্রায় অসহ্য হয়ে উঠেছে। Still I wanted to live for কল্যাণী। সে বড় আঘাত পাবে। That is the reason why I came abegging for money। আমি যাচ্ছি। মরণ রে! তুঁহু মম শ্যাম সমান।

প্রস্থান

হুট। আওর কভি ইনকো বাড়িমে ঘুষনে মত দো। নেহি তো তুমহারা নোকরি চলা যায়েগা। যাও।

দারোয়ানের প্রস্থান

মুহুরীর কয়েকটা ফাইল লইয়া প্রবেশ

এখন নয়, পরে। যাও এখন।

ফাইল রাখিয়া মুহুরীর প্রস্থান

শ্যামা!

শ্যামার প্রবেশ

শ্যা। বাবা?

হুট। মহাভারত বললে, কল্যাণী এসেছে!

শ্যা। হ্যাঁ। মায়ের সঙ্গে গল্প করছেন।

হুট। পাঠিয়ে দাও এখানে।

শ্যামা চলিয়া যাইতেছিল

এক্ষুনি। বলবে, আমি অপেক্ষা ক'রে রয়েছি। এক্ষুনি।

শ্যামার প্রস্থান

হুটু দীর্ঘ দৃঢ় পদক্ষেপে পায়চারি করিতে লাগিল। কল্যাণীর প্রবেশ

হুট। (স্থির হইয়া দাঁড়াইল) কল্যাণী! আমি সুশোভনকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিয়েছি। আর কোন দিন আমার বাড়ি ঢুকতে তাকে বারণ ক'রে দিয়েছি।

কল্যাণী। (মাথা হেঁট করিল, তারপর মৃদুস্বরে বলিল) আপনি দাদা, শাসন আপনি করবেন বইকি হুটুদা।

হুট। না, শাসন নয়। তার সঙ্গে কোন আত্মীয়তা আমার নেই। হতে পারে না। তোমাকেও ওকে ত্যাগ করতে হবে কল্যাণী।

কল্যাণী। (শিহরিয়া) হুটুদা! ছোড়দার মুখ দিয়ে মধ্যে মধ্যে রক্ত ওঠে। উনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না।

হুট। তার মরবার জায়গার অভাব হবে না কল্যাণী। হাসপাতাল আছে, গাছতলা আছে, পথ আছে।

কল্যাণী। আপনি কি বলছেন হুটুদা!

হুট। সত্য চিরদিন নিষ্করুণ কঠোর। জ্ঞানহীন শিশু আগুনের শিখায় হাত দিলে, জ্ঞানহীন ব'লে আগুন তাকে ক্ষমা করে না। বিধাতার বিচার আগুনের মতই দীপ্ত, পবিত্র, অথচ নিষ্ঠুর। সে বিচারের দণ্ড থেকে অপরাধীকে রক্ষা করতে গেলে, তার আঁচ তোমাকেও লাগবে। আরও একটা কথা। তোমাকেও কতকগুলো জিনিস ছাড়তে হবে।

কল্যাণী। (স্থিরভাবে হুটুর দিকে তাকাইয়া, ধীর স্বরে) বলুন।

হুট। দারিদ্র্যকে আমি শ্রদ্ধা করি কল্যাণী; কিন্তু সে দারিদ্র্য মর্য্যাদাহীন নয়, সে দারিদ্র্য মহত্ত্বহীন নয়, তাতে মালিন্য নেই।

কল্যাণী। সেই দীক্ষাই তো আপনার কাছে—

হুট। আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু তুমি নিতে পার নি। কল্যাণী, তুমি জামা তৈরি ক'রে বিক্রি করতে যাও ভদ্রলোকের বাড়িতে, তারা

তোমাকে করুণা ক'রে জিনিস কেনে, দাম বেশি দেয় দয়া ক'রে। সেটা বিনিময় নয়, দান। তোমার বেশভূষার দিকে চেয়ে দেখ, সেখানে মালিন্যের ছাপ। ওসব তোমায় পরিত্যাগ করতে হবে।

কল্যাণী। আর কিছু আমায় বলবেন দাদা?

হুট। তোমার উত্তর শুনতে চাই বোন।

কল্যাণী। না।

হুট। সময় চাচ্ছ? উত্তর এখন দিতে পারবে না?

কল্যাণী। না। আমার উত্তরই দিচ্ছি। না। আপনার যুক্তি আমি স্বীকার করি না। দয়া আমি কারও কাছে নিই না। আমার দারিদ্র্য আমার অহঙ্কার। আর ছোড়দা আমার রুগ্ন ভাই। তা ছাড়া হুটুদা, আপনি যখন তাকে আত্মীয় ব'লে স্বীকার করতে পারছেন না, তখন মমতার বাপকেই বা আত্মীয় ব'লে স্বীকার করবেন কি ক'রে? মমতা তো তার বাপকে অস্বীকার করতে পারবে না হুটুদা।

হুট। (মুখের দিকে চাহিয়া) তোমার সঙ্গে আজ থেকে আমি সকল সংস্রব ত্যাগ করলাম কল্যাণী। ভবিষ্যতেও—

কল্যাণী। মমতাকে ছোড়দাকে নিয়ে আজই আমি এখান থেকে চ'লে যাব।

প্রস্থানোদ্যত

হুট। অপেক্ষা কর। (কল্যাণী দাঁড়াইল) (হুটু আলমারি খুলিয়া গহনার বাক্স বাহির করিয়া কল্যাণীকে দিল) মমতার গহনা, আমার কাছে গচ্ছিত রেখেছিলে। আর একটা কথা।

কল্যাণী। বলুন।

হুট। সম্বন্ধ ছাড়বার আগে যদি মমতার মামা হিসেবে, তার বিবাহে কিছু যৌতুক দিই, সে কি তুমি নেবে না?

কল্যাণী। (একটু ভাবিয়া) মাথা পেতে নেব হুটুদা।

হুটু চেক-বই বাহির করিয়া একটা চেক লিখিল

হুট। এই নাও। মমতার বিয়েতে যৌতুক দিও।

কল্যাণী। (চেক মাথায় ঠেকাইয়া) শ্যামা, অরুণের আমি পিসীমা।

তাদের বিয়েতে আমাকেও কিছু দিতে হয় দাদা। গরিব বোন ব'লে ফিরিয়ে দেবেন না।

প্রণাম করিয়া চেকখানি পায়ে রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল

হুটু চেকখানি কুড়াইয়া লইয়া ধীরে ধীরে ছিঁড়িয়া ফেলিল। চেয়ারে বসিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। সিগার ধরাইল। মুহুরীর প্রবেশ

মুহুরী। যে মকদ্দমাটায় আমরা হেরেছি, সেইটার রায়। (রায়ের কাগজ নামাইয়া দিল) হাইকোর্টে আপীল করবে পার্টি। তাই বলে, পয়েন্টোগুলো একবার দেখে—

হুট রায়খানা তাহার হাত হইতে লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল

মুহুরীর প্রস্থান

হুট। (পড়িতে পড়িতে উত্তেজিতভাবে) অ্যান ইডিয়ট! গর্দ্দভে বিচারকের আসনে বসলে চীৎকারের মূল্য থাকে, যুক্তি হয় মূল্যহীন! (রায়খানা সক্রোধে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল) পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার!

উঠিয়া পদচারণা আরম্ভ করিল। বাহিরে মোটরের হর্ন বাজিল

মুহুরীর পুনঃপ্রবেশ

মুহু। (ব্যস্তভাবে) বাবু! কঙ্কণার বাবুরা, কর্ত্তাবাবু, দেবনারাণবাবু এসেছেন।

হুট। (চকিত হইয়া উঠিল) কে? কঙ্কণার বড়বাবু?

ব্যস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। মুহুরী রায়খানা কুড়াইয়া ফাইল সমেত গুছাইয়া লইল।

হুটু, শিবনারায়ণ ও দেবনারায়ণের প্রবেশ। মুহুরীর প্রস্থান

হুট। আসুন, আসুন, আসুন। মহাভাগ্য আমার আজ। বসুন।

বড়বাবুকে প্রণাম করিল, দেবনারায়ণকে নমস্কার করিল

শিব। সে তো তুমি না বলতেই এসেছি হে! এখন তাড়িয়ে দেবে কি না বল?

হুট। (পুনরায় প্রণাম করিয়া) তা বলতে পারেন। আপনাদের কাছে আমার অনেক অপরাধ। তবে আমি অমানুষ নই।

শিব। একশো বার, হাজার বার। শুধু মানুষ নয় হে, তুমি একটা মরদ। মরদ পুরুষ সংসারে বড় দুর্লভ হে—তুমি একটা মরদ।

দেব। অপরাধ আপনার নয় হুটুবাবু, দোষও আমাদের অনেক ছিল।

শিব। (চারিদিক দেখিয়া) তাই তো হে হুটু, এ যে তুমি ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছ দেখছি! বা-বা-বা! বলিহারি বলিহারি! হুঁ, তুমি মরদ বটে!

হুট। এখন বসুন।

শিব। শোন হে হুটু, কি জন্যে এসেছি শোন। তোমার সঙ্গে সওয়াল করতে এসেছি। দেশের মধ্যে তো তুমি সবচেয়ে বড় উকিল। এ-জেলা ও-জেলা ক'রে বেড়াচ্ছ। আজ আমি তোমার সঙ্গে সওয়াল করব।

হুট। (হাসিয়া) বেশ, বসুন।

শিব। ধর, তোমার বাড়িতে ভিখিরী এসেছে। তাকে বসতে ব'লে আর কি আপ্যায়িত করবে, যদি ভিক্ষেই না দাও তাকে?

হুট। এ যে বড় অসম্ভব কথা—আশঙ্কার কথা। আমার কাছে আপনারা ভিক্ষা চাইবেন, এ যে বলির দ্বারে বামনদেবের ভিক্ষা চাওয়া। বেশ, আগে বসুন।

শিব। হুঁ। উপমাটা তুমি বড় ভাল দিয়েছ হুটু। তবে দেখ, বিবেচনা ক'রে দেখ। পাতালে থাকতে যদি ভয় হয় তো ভেবে দেখ। (হা-হা করিয়া হাসিলেন)

হুটু। বসুন আগে।

শিব। উঁহু। আগে তুমি দেবে বল; তবেই বসি, নইলে যাই।

হুট। বেশ, মাথাই পাতলাম আপনার পায়ে। এইবার বসুন।

শিব। (বসিয়া) তোমার বড় ছেলেটিকে আমাকে ভিক্ষে দিতে হবে; আমার নাতনীকে তোমায় আশ্রয় দিতে হবে। দেবনারাণের মেয়ে—

দেব। (হুটুর হাত চাপিয়া ধরিল) আমাকে কন্যাদায় থেকে আপনি উদ্ধার করুন।

শিব। তোমার ছেলে খুব ভাল, বি. এ. এম. এ.-তে ফাষ্টো হয়েছে। তুমি নিজে একটা মরদ; দেশ-বিদেশে নামডাক। টাকাও করেছ অঢেল, কিন্তু কঙ্কণার বাবুদের বাড়ির মেয়ে, ধনে, কুলে, মানে,

তোমার বাড়ির অযোগ্যি হবে না। আর নাতনীর আমার লক্ষণ ভারী ভাল-হে। রূপের কথা আর বলব না, তুমি নিজেই দেখবে। আমি তো হুটু, ম'জে আছি নাতনীর রূপে। দেবুর যে আমায় জামাই পছন্দ হ'ল না, নইলে—(হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন)

দেব। হুটুবাবু?

হুট। (হাসিয়া) ছাড়ুন। কর্তাকে আগে প্রণাম করি। (প্রণাম করিয়া) ভিক্ষে আমি দিচ্ছি, কিন্তু ভিক্ষে তো শুধু দিতে নেই—সে তো আপনাকে বলতে হবে না। দক্ষিণে সমেত ভিক্ষে দোব আমি। "না" বললে শুনব না। আমার কন্যাও বিবাহযোগ্যা। সেইটিকে দক্ষিণেস্বরূপ আপনাদের নিতে হবে—দেবুবাবুর বড় ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে।

শিব। বলিহারি, বলিহারি, বলিহারি! এই না হ'লে উকিল! ওরে বাপ রে! উল্টো ছাঁদে গেরো! ও দেবু, হুটু যে হারিয়ে দিলে রে! (হা-হা করিয়া হাসিলেন) আচ্ছা, তাই হ'ল।

হুটু। ছেলে-মেয়েকে আমি ডাকি।

শিব। না। আজ থাক। দেখাশোনা দিন দেখে। আজ নয়। আচ্ছা, আজ তা হ'লে উঠলাম।

হুট। সে কি, একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যেতেই হবে।

শিব। আজ নয় বাবা। আগে তুমি যাবে কঙ্কণার বাড়ি, আমার বাড়ি পায়ের ধুলো দেবে, তবে। আজ ব'লো না। সে আমার প্রতিজ্ঞা আছে হুটু। উঁহু, সে হবে না।

হুট। (হাসিল) বেশ, আজ বিকেলেই যাব আমি।

শিবনারায়ণ দেবনারায়ণ অগ্রসর হইলেন, হুটু অনুসরণ করিল। হুটু ফিরিল।

হুট। বিমলা! বিমলা!

শ্যামার প্রবেশ

শ্যা। মা কঙ্কণায় গেছেন।

হুট। কঙ্কণায়? এ কি, তুই যেন কেঁদেছিস মনে হচ্ছে শ্যামা?

শ্যা। না বাবা, না।

প্রস্থান

স্থূট। শ্যামা!

অনুসরণোদ্যত মহাভারতের প্রবেশ

মহা। দাদাঠাকুর!

স্থূট। এস মহাভারত। বাবুরা আজ কি জন্যে এসেছিলেন জান? দেবু-বাবুর মেয়ের সঙ্গে—

মহাভারত প্রণাম করিল

মহা। আমি চললাম দাদাঠাকুর।

স্থূট। না। ওবেলায় আমার সঙ্গে যাবে। আমি ওবেলা বাবুদের ওখানে যাব, তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

মহা। না।

স্থূট। তুমি অরুণের খুড়ো, দেবনারাণবাবু তোমাকে বেয়াইয়ের মত সম্মান করবেন।

মহা। না দাদাঠাকুর। দিদি-ঠাকরুণ কাশী যাচ্ছে, আমিও তেনার সাথে কাশী যাচ্ছি। আর কটা দিন বলেন, ই কটা দিনের তরে বাবুদের বেয়াই হতে লারব। (চলিয়া যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আপুনি শেষটা এই করলেন দাদাঠাকুর?

প্রস্থান

স্থূট। (দৃঢ়ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া) মহাভারত! মহাভারত!

অগ্রসর হইল, দরজার মুখেই অরুণ প্রবেশ করিল, স্থূট থমকিয়া দাঁড়াইল

অরুণ। সে চ'লে গেল।

স্থূট। ডাক তো তাকে।

অরুণ। সে ফিরবে না বাবা।

স্থূট। (হাসিয়া) সে আমার ওপর রাগ করেছে। একজন লোক পাঠাতে হবে ওর বাড়িতে। যাক, তোমাকে আমার অনেক কথা বলবার আছে অরুণ।

অরুণ। আপনার কাছে আমারও কিছু বলবার আছে।

স্থূট। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অরুণের আপাদমস্তক দেখিয়া) অরুণ!

অরুণ। বলুন।

স্থূট। আমার মনে হচ্ছে, আমার বক্তব্যের সঙ্গে তোমার বক্তব্যের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। নয় কি?

অরুণ চুপ করিয়া রহিল

স্থূট। বল, কি বলবে বল? তোমার বক্তব্যই আগে শুনব আমি।

অরুণ। আপনি কি কল্যাণী-পিসীমাকে—

স্থূট। কল্যাণীর সঙ্গে আমি সমস্ত সংস্রব ত্যাগ করেছি।

অরুণ। ত্যাগ করেছেন?

স্থূট। তুমি কি আমার কাছে তার জন্যে কৈফিয়ৎ চাও?

অরুণ। না। ও কথা আর জিজ্ঞাসা করব না। আমার আর একটা কথা জানবার আছে। আপনি কি করুণার গাঙুলীদের বাড়িতে আমার বিবাহের সম্বন্ধ করেছেন?

স্থূট। লজ্জাহীনতা কি মডার্নিজ্‌মের প্রধান ধর্ম্ম অরুণ?

অরুণ। জীবনের অতি গুরুতর সমস্যায় আপনার মত ব্যক্ত করা কি লজ্জাহীনতা বাবা? সে হ'লে আপনার কথা সত্য, আমি স্বীকার করছি।

স্থূট। ভাল। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা তোমায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই অরুণ।

অরুণ। বলুন।

স্থূট। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ইণ্ডিভিজুয়াল হিসেবে তোমার অধিকার আমার চেয়ে কম নয়। তোমার সে অধিকার আমি স্বীকার ক'রে এসেছি। কিন্তু আমার ঘর, আমার গ'ড়ে তোলা সাম্রাজ্য, সেখানে আমি সম্রাট।

অরুণ। দেশের শাসনতন্ত্রের মধ্যে যদি আপনার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বাধীনতার অধিকার থাকে, সে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যদি বিদ্রোহ করবার অধিকার আপনার থাকে, তবে আপনার সাম্রাজ্যের মধ্যে—

স্থূট। তুমি বিদ্রোহ করবে অরুণ? তুমি আমাকে অমান্য করবে?

অরুণ। গাঙুলীদের বাড়িতে আমি বিয়ে করতে পারব না বাবা, এই কথাটা আপনার পায়ে ধ'রে বলতে এসেছি।

হুট। (সরিয়া গিয়া) থাক। আমার পা তুমি স্পর্শ ক'রো না।

অরুণ নীরব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল

তোমার বক্তব্যের বোধ করি আরও কিছু বাকি আছে। সেটা বোধ করি এই যে, মমতাকেই তুমি বিবাহ করতে চাও ?

অরুণ নীরব হইয়া রহিল

হুট। (আপন মনেই আবৃত্তি করিল)

I tax not you, you elements, with unkindness ;
I never gave you kingdom, called you children
You owe me no subscription ; then let fall
Your horrible pleasure ; here I stand your slave,

অরুণ, আজ কিং লিয়ারকে আমার মনে পড়ছে। অবশ্য কিং লিয়ারের মত সর্ব্বস্বান্ত ইমোশানাল নই আমি। (অরুণের মুখোমুখী দাঁড়াইয়া) তুমি বিদ্রোহ করতে চাও অরুণ ?

অরুণ। (নতজানু হইয়া আবেগভরে) আপনার কাছে আমি মিনতি করছি। আপনার গৌরবে আমি যে বিশাল সৌধ গ'ড়ে তার ওপর দাঁড়িয়ে আছি, সে সৌধ আপনি ভেঙে দেবেন না। আপনার আদর্শ—

হুট। ইউ মীন টু সে কঙ্কণার বাবুদের বাড়িতে তোমার বিয়ে দিলে আমি আদর্শচ্যুত হব ?

অরুণ। কল্যাণী-পিসীমাকে, সুশোভনবাবুকে, মমতাকে পরিত্যাগ করলে আপনি আদর্শচ্যুত হবেন, সে কি আপনি বুঝতে পারছেন না ?

হুট। আমার আদর্শবোধে তোমার সন্দেহ জেগেছে অরুণ ? এত বড় ইম্পার্টিনেন্স তোমার ? এত বড় স্পর্দ্ধা ? গেট আপ, উঠে দাঁড়াও।

অরুণ উঠিল

এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার ?

অরুণ নীরব

উত্তর দাও। এত বড় স্পর্দ্ধা তোমার ?

অরুণ। না, স্পর্দ্ধা আমার নয়, স্পর্দ্ধা আমার আদর্শের, যে আদর্শে আপনি আমায় দীক্ষা দিয়েছেন। স্পর্দ্ধা আমার শিক্ষার, যে শিক্ষা আমাকে দিয়েছেন আপনি।

হুট। সে শিক্ষার আরও কিছু বাকি আছে। শোন। অবাধ্য সন্তান আর দুষ্ট অঙ্গের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। দুষ্ট অঙ্গের মতই তাকে পরিত্যাগ করতে হয়।

অরুণ বাপের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল

তুমি জান অরুণ, কত বড় আঘাত তুমি আমায় দিয়ে যাচ্ছ ?

অরুণ একবার দাঁড়াইল। তারপর চলিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই সে ফিরিয়া আসিল

অরুণ। ওইটে আমি নিয়ে যাব। কার্পেটের ওপর লিখেছিলাম আমি, বুনেছিলেন মা। ওটা আমি নিয়ে যাব।

It is easer for a camel লেখা সূচীশিল্পের দিকে অগ্রসর হইল

হুট। (সক্রোধে) অরুণ !

অরুণ। না, ওটা আর এখানে থাকবে না। থাকতে পারে না। ওটা রাখবার আপনার অধিকার নেই।

হুট। অরুণ !

অরুণ। আপনি আজ ধনী, দারিদ্র্যকে আজ আপনি ঘৃণা করেন। মিথ্যা মর্য্যাদার মোহে মানুষকে আপনি আত্মীয় স্বীকার করতে লজ্জা পান। বীর্য্যে সাহসে গৌরবান্বিত অতীতকে স্বীকার করতে আপনার আজ সঙ্কোচ হয়। এ আপনার কাছে থাকবে না, এ আমি নিয়ে যাব।

হুট। ওটা তোমার মায়ের হাতের কাজ অরুণ, ওটা তুমি রেখে যাও। তোমার মা আমাকে পরিত্যাগ করেন নি।

অরুণ। আমার আগেই আমার মা চ'লে গেছেন।

হুট। চ'লে গেছেন ?

অরুণ। কল্যাণী-পিসীমা চ'লে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চ'লে গেছেন।

অরুণ চলিয়া গেল

হুট। রেখে যাও, ওটা রেখে যাও, অরুণ ! ওটা রেখে যাও।

(থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) বিমলা! অরুণ! মহাভারত! (দরজার সন্ধান করিতে করিতে) দরজা! দরজা! দরজা কই? দরজা! গেট অফ হেভেন্স কি বন্ধ হয়ে গেল? স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হয়ে গেল? বিমলা! বিমলা! (কাঁপিতে কাঁপিতে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া সোফায় পড়িয়া গেল)

শ্যামার প্রবেশ

শ্যামা। বাবা! বাবা! বাবা! এ কি! দাদা! দাদা!

ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল

দ্বিতীয় দৃশ্য

কক্ষান্তর

অরুণ চলিয়া যাইতেছে, শ্যামা প্রবেশ করিল

শ্যামা। ফেরো দাদা, ফেরো। বাবা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

অরুণ। অজ্ঞান হয়ে গেছেন?

শ্যামা। হ্যাঁ। শিগগির ডাক্তার ডাক—শিগগির।

অরুণ। এইটে—এইটে, শ্যামা, এইটে নিয়ে যা। আমি পাশের বাড়ির ডাক্তারকে ডাকি।

শ্যামা। মায়ের কাছে লোক পাঠাও দাদা, শিগগির।

সূচীশিল্পটিকে লইয়া সে চলিয়া গেল

অরুণ। মুহুরীবাবু, শিগগির পাশের ডাক্তারবাবুকে ডাকুন। বাবার অসুখ। অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

নেপথ্যে শ্যামা। জল ঢাল, কেষ্ট, মাথায় জল ঢাল।

অরুণ। দারোয়ান, দারোয়ান!

দারোয়ানের প্রবেশ

শিগগির তুমি কঙ্কণায় যাও। মাকে গিয়ে বল, বাবার বড্ড অসুখ, শিগগির।

দারোয়ানের প্রস্থান। অরুণ ভিতরে গেল। পুনরায় ফিরিয়া আসিল

বরফ। বরফ। মুহুরীবাবু! মুহুরীবাবু! ডাক্তারবাবু কি এখনও এলেন না?

প্রস্থান

নেপথ্যে হুট। দরজা, দরজা। বিমলা, দরজা খুলে দাও। বিমলা!

নেপথ্যে অরুণ। এই যে ডাক্তারবাবু।

ডাক্তার ও অরুণ ঘর অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। পরমুহূর্তেই অরুণ প্রবেশ করিল

অরুণ। মুহুরীবাবু! হরিশ! মুহুরীবাবু কি এখনও বরফ নিয়ে ফেরেন নি?

প্রস্থান

নেপথ্যে হুট। বন্ধ হয়ে গেল—বন্ধ হয়ে গেল।

নেপথ্যে শ্যামা। সব দরজা-জানালা খুলে দিয়েছি বাবা।

বরফ লইয়া মুহুরী ভিতরে গেল

বিমলা ও অরুণের প্রবেশ

বিমলা। রাস্তায় দরোয়ানের সঙ্গে দেখা হ'ল। কি হয়েছে অরুণ? কোন আশাই কি নেই। ওরে, ওদের তুই নিয়ে আয়। আমি—

নেপথ্যে হুট। মাই লর্ড!

বিমলা ও অরুণের বিপরীত দিকে প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

ড্রয়িং-রুম

সোফার উপর হুট শায়িত। ডাক্তার, শ্যামা, চাকর। ডাক্তার ইন্‌জেক্‌শনের সিরিঞ্জ ধুইতেছে

বিমলা প্রবেশ করিল এবং স্বামীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া স্থিরভাবে তাহাকে দেখিল

হুট। (প্রলাপ বকিতেছে) It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God!

বিমলা। (কঠিন সংযমে নিজেকে সংযত করিয়া ধীরভাবে) ডাক্তারবাবু!

ডাক্তার। উতলা হবেন না। ধৈর্য্য ধরুন মা। এ তো উতলা হবার সময় নয়। আইসব্যাগটা ভাল ক'রে ধরুন। (শ্যামা আইসব্যাগ ভাল করিয়া ধরিল)

বিমলা। ধৈর্য্য কি আমি হারিয়েছি ডাক্তারবাবু? (স্বামীর পাশে বসিল)

ডাক্তার মাথা নত করিল

কোন আশাই কি নেই?

ডাক্তার। চিকিৎসককে নিরাশ হতে নেই মা। শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ ক'রে তবে মৃত্যুর কাছে আমরা হার মানি।

বিমলা। (স্বামীকে আর একবার দেখিয়া) একবার কি জ্ঞানও হবে না?

ডাক্তার। মৃত্যুকে প্রতিরোধ করা যায় না, সে অপ্রতিহতগতি। কিন্তু তাকেও বিজ্ঞানকে সম্মান দেখাতে হয়। পরিণাম যাই হোক, জ্ঞান হতেই হবে। (ব্যাগ গুছাইয়া লইল) আমি পাশের ঘরেই রইলাম। জ্ঞান শিগগির হবে। বোধ হয় জ্ঞান হচ্ছে, দেখুন।

যাইতে যাইতে মুহুরীর সঙ্গে কথা হইল জনান্তিকে। ওদিকে বিমলা, শ্যামা স্থুটুর উপর ঝুঁকিয়া ব্যাকুল আগ্রহে চাহিয়া রহিল

মুহুরী। কি রকম বুঝছেন? অ্যাপোপ্লেক্সি নাকি?

ডাক্তার। (ঘাড় নাড়িলেন) হার্টের অবস্থা বড় খারাপ। অ্যাপোপ্লেক্সি নয়।

উভয়ের প্রস্থান

স্থুটুর চেতনা হইল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিতে দেখিতে বিমলার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল

বিমলা। আমায় চিনতে পারছ?

স্থুটু। বিমলা, আমার স্বর্গদ্বার বন্ধ হয়ে গেল। চারদিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে।

বিমলা। না না; তোমার সে দ্বার কি বন্ধ হয়? না, হতে পারে?

স্থুটু। বন্ধ হয়ে গেছে। আমি সুশোভনকে তাড়িয়ে দিয়েছি। কল্যাণীর সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করেছি। মমতাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। মহাভারত চ'লে গেছে। অরুণ—; কঙ্কণার বাবুদের সঙ্গে—; আমার স্বর্গদ্বার বন্ধ হয়ে গেছে বিমলা। অন্ধকার আমি দেখতে পাচ্ছি।

বিমলা। না, ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, খোলাই আছে। আমি নিজে খুলে দিয়েছি। কঙ্কণার বাবুদের আমি নিজে জবাব দিয়ে এসেছি। কল্যাণী, মমতা, সুশোভনকে ফিরিয়ে এনেছি। মহাভারত ফিরে এসেছে।

এই মুহূর্ত্তেই অরুণ সকলকে লইয়া প্রবেশ করিল, কেবল সুশোভন নাই

ওই দেখ, সকলে এসেছে।

স্থুটু। এসেছে? এসেছে?

নেপথ্যে বেহালা বাজিয়া উঠিল

কল্যাণী!

কল্যাণী। দাদা!

স্থুটু। মার্জ্জনা, বোন, মার্জ্জনা—

কল্যাণী কথা বলিল না, কেবল প্রণাম করিল

মহাভারত। দাদাঠাকুর!

স্থুটু। এসেছ? সুশোভন কই?

মহা। ছোট দাদাঠাকুর বারান্দায় ব'সে আছেন দাদাঠাকুর। বললেন, আপনার যন্ত্রণা তিনি দেখতে পারবেন না।

হুট। বেহালা বাজাচ্ছে নয়? আঃ, চমৎকার!

অরুণ পায়ে ধরিয়া

অরুণ। বাবা!

হুট। কে?

বিমলা। অরুণ। মাফ চাচ্ছে তোমার কাছে।

হুট। না। অপরাধ তার নয়।

বিমলা। তাকে আশীর্ব্বাদ কর।

হুট। আমি থামলাম, তোমার যাত্রা শুরু হ'ল। সে যাত্রায় তোমার জয় হোক। তবে অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা হারিও না। (অকস্মাৎ ব্যস্তভাবে) তোমায় একটা কথা বলব বিমলা, তোমায় একটা কথা বলব।

বিমলা। বল।

হুট। না, কারও সাক্ষাতে নয়—কারও সাক্ষাতে নয়। যেতে বল সব—যেতে বল।

সকলে চলিয়া গেল

বিমলা। বল, কি বলছ বল?

হুট। বলবার কিছু নেই। দিচ্ছি, তোমায় দিচ্ছি, তুমি গ্রহণ কর।

বিমলা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

আমার মন, আমার হৃদয়, আমার সব—আমার সব—আমি দিচ্ছি, তুমি গ্রহণ কর।

বিমলা পাথরের মত উপরের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। বাহিরে বেহালা বাজিয়া চলিতেছে

যবনিকা ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল

নারী

১

আপন মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করিব রচনা
সে মাধুরী আর নাই,
অলীক স্বপনে অতিশয়োক্তি করিতে চাহে না রসনা,—
তুমি যাহা, তুমি তাই।
তুমি নারী, তুমি যৌবনময়ী—ওষ্ঠে বক্ষে সুধা,
আমার রক্তে বাবা আদমের চির-অতৃপ্ত ক্ষুধা;
বিদ্যুৎশিখা তব কটাক্ষে, অয়ি কামাকুললোচনা,
দেহে রতি-রোশনাই।
অলীক স্বপনে অতিশয়োক্তি করিতে চাহে না রসনা,—
তুমি যাহা, তুমি তাই।

২

অর্দ্ধেক তুমি নারী আর বাকি অর্দ্ধেক কল্পনা—
কহিছে রোম্যান্টিক;
পুরুষের মনে তোমার সৃষ্টি! হায় মূঢ় জল্পনা!
তুমি কি কাল্পনিক!
পুরুষের অভিশাপের প্রতাপে অহল্যা হবে শিলা!
পুরুষেরি পদ-পরশ-ধন্য হবে সে পুণ্যশীলা!
পাঁজর-খসানো-ঋণ-পরিশোধ হয়েছে তো অল্প না!
—এবার মুক্তি দিক।
পুরুষের মনে তোমার সৃষ্টি! হায় মূঢ় জল্পনা!
তুমি কি কাল্পনিক!

৩

স্বর্গের দেবী নহ, তুমি নহ স্বপ্নের সঙ্গিনী,—
দিগন্ত-নভচারী

স্বষ্টির বুকে নহ প্রহেলিকা, বাস্তব-শরীরিণী
তুমি মর্ত্ত্যের নারী।
পুরুষের ক্ষণ-স্বপনে বিকশি নহে তব সম্মান,
শিল্পীর চোখে তব সত্যের নাহি পাবে সন্ধান।
তোমারি দেহের দর্পণে আজ তোমারে লইব চিনি
—উদ্বোধ কর তারি।
স্বষ্টির বুকে নহ প্রহেলিকা, বাস্তব-শরীরিণী
তুমি মর্ত্ত্যের নারী।

৪

তোমার তড়িতে আমার রক্ত হোক লীলা-চঞ্চল,
দূর কর মোহপাশ;
মোক্ষ-লাভের নিগ্রহ-পথে কৌপীন সম্বল—
মিথ্যা সে সন্ন্যাস।
পাশে তুমি আছ, এ পাশ কাটায়ে আকাশেতে উড়ে যাওয়া,
যারে পাই তারে ভুলিয়া কেবল না-পাওয়ার পিছে ধাওয়া,
ভীরু-মানসের এ পলায়নের প্রবঞ্চনার ছল—
করে তোমা পরিহাস;
মোক্ষলাভের নিগ্রহ-পথে কৌপীন সম্বল—
মিথ্যা সে সন্ন্যাস।

৫

শত-চুম্বনে চেতনা নিবাও, ঘন-আশ্লেষে বাঁধি
কর মোরে মদালস,
নগ্ন বুকের যুগ্ম-শিখরে মাদন-মন্ত্র সাধি
পৌরুষে কর বশ।
ঘন-সন্নিধি রতি-রমণীয় দেহের বন্ধ দ্বারে
স্বপন-বিলাসী মন ডুবে যাক অতল অন্ধকারে,

কল্পনা-নভে ঘনীভূত হবে অমাবস্যার আঁধি,
তনু হবে তামরস;
নগ্ন বুকের যুগ্ম-শিখরে মাদন-মন্ত্র সাধি
পৌরুষে কর বশ।

৬

ভুজ-বন্ধনে বাঁধিবে যখন মনে যেন নাহি ভাবি
আত্মসমর্পিলে,
প্রণয়ে তোমার রক্তধারার স্বষ্টির চির-দাবি
জানাইছ তিলে তিলে।
আলিঙ্গনের প্রতি ইঙ্গিতে তুমিই আপ্তকাম,
সুরত-প্রিয়ের নিপীড়ন সহ—সেই তো তাহার দাম;
প্রেম যার নাম সেই প্রাণারাম বাসনা রসস্রাবী
তুমিই জন্ম দিলে।
প্রণয়ে তোমার রক্তধারার স্বষ্টির চির-দাবি
জানাইছ তিলে তিলে।

৭

এই পৃথিবীর দুলালী কন্যা, মন্মথ-মনোজয়ী
মৈথুন-মনোরমা;
রক্ত-মাংসে পঞ্চেন্দ্রিয়া সুললিত তনুময়ী
পুরুষের প্রিয়তমা।
অবগুণ্ঠন টানো ক্ষতি নাই; ঢাকিও না মুখখানি,
পুরুষের হাতে মিলাও তোমার চল-বিদ্যুৎ-পাণি;
মনসিজা নহ, আপন স্বরূপে হও তুমি চিন্ময়ী,
তন্বী বহ্নিসমা।
রক্ত-মাংসে পঞ্চেন্দ্রিয়া সুললিত তনুময়ী
পুরুষের প্রিয়তমা।

"কলেজ বয়"

দৈনিক

১

রাতারাতি একজন আত্মত্যাগী বীর হইয়া পড়িয়াছি, ইংরেজীতে যাহাকে বলে—হিরো।

ব্যাপারটা নিতান্ত আকস্মিকভাবে ঘটিয়া গেল। সামান্য বিলম্বের জন্য পারের স্টীমারটা হাতছাড়া হইল। দুই ঘণ্টা বসিয়া না থাকিয়া নৌকাতেই যাওয়া স্থির করিলাম। প্রায় জন আষ্টেক আরোহী হইলাম আমরা, তাহার মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। বৃদ্ধই বলা উচিত, তবে বয়স হইলেও বেশ সবল চেহারা। গায়ে নামাবলি, পায়ে কটকী চটি, হাতে মালা জপিবার একটি পুরানো মখমলের ঝুলি। শুচিতা রক্ষা করিয়া এক দিকে একটু ধার ঘেঁষিয়াই বসিয়াছেন। দুই-একজন বলিল, তাহাতে মৌনভাবেই একটু হাস্য করিলেন মাত্র।

জোর ভাঁটার টান, পার হইতে সময় লইবে। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, বেশ একটি ঝিরঝিরে বাতাস উঠিয়াছে। এখানে ওখানে বীচিকুঞ্চিত গঙ্গাবক্ষে আলোর প্রতিবিম্ব দোল খাইতেছে। অভ্যাসের দোষে একটু ভাবের আবেশে পড়িয়া গেলাম। একটু বাড়াবাড়িও হইয়া গেল,—নীচে সন্তুষ্ট না হইয়া একেবারে নৌকার ছইয়ের উপর গিয়া বসিলাম যখন মাঝামাঝি আসিয়াছি এবং গুনগুনানির মধ্যে একটা গান স্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, কোথা হইতে কি হইল বলিতে পারি না, নৌকাটা হঠাৎ একপেশে হইয়া গিয়া ছইয়ের পিচ্ছিল তেরপলের গা বাহিয়া নীচে পড়িয়া গেলাম। যখন সম্বিত হইল অনুভব করিলাম, আমার হাতে একগোছা কাহার চুল, আর কে যেন দৃঢ়মুষ্টিতে আমার বাঁ হাতটা ধরিয়া

আছে। এইটুকু বুঝিতেছি যে, যতই উঠিবার চেষ্টা করিতেছি, ততই ঢেউয়ের উপর ঢেউ আসিয়া অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে এবং এই ভাসা-ডোবার ক্ষণিক আলো ও ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে কতকগুলা ত্রস্ত মিশ্র কলরোল ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে।

ইহার পরের ব্যাপার যাহা আমার মনে পড়ে তাহা এই যে, আমি বাবুঘাটের একটি রানার উপর চিত হইয়া শুইয়া আছি। আমাকে ঘিরিয়া একটি বেশ বড়গোছের ভিড়। কাছে সিক্তবসনে, পা মুড়িয়া পণ্ডিতমশাই বসিয়া আছেন।

প্রথম সংলগ্ন কথা কানে গেল—ঐ চোখ খুলেছেন! কেমন আছেন মশাই? আর একটু ব্র্যাণ্ডি হ'লে হ'ত। কোথায় গেলে হে, দেখ না আর একটু পারি কি না যোগাড় করতে—

একজন সরিয়া আসিয়া মুখের কাছে ঝুঁকিয়া একটু জোরেই বলিল, ঠিকানাটা দিন, না হয় খবর দিই, অবিশ্যি ভয় নেই, মা-গঙ্গাকে ডাকতে থাকুন।

আশা করিয়াছে, প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছি। কোন রকমে ঠিকানাটা দিয়া ক্লান্তির বশে আবার চক্ষু বুজিলাম। শুনিতেছি, পেলে? ওঁকেও দাও একটু ব্র্যাণ্ডি। খেয়ে নেবেন ঠাকুরমশাই ঢুক ক'রে একটু। ওষুধ, ওতে দোষ নেই।

একটা ক্লান্ত স্বরে উত্তর হইতেছে, না না বাবারা, আমি হবিষ্যাশী ব্রাহ্মণ, আমায় শুনতে নেই ও কথা। দাও নি তো আমায় খাইয়ে-টাইয়ে? দুর্গা দুর্গা! তা হ'লে আবার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। একটু জিরিয়ে আমি বেশ যেতে পারব 'খন, একটা গাড়ি ডেকে দিও বরং।

ভাঙা ভাঙা হিন্দী-বাংলায় কে বলিতেছে, না মহারাজজী, আপনার মুহমে কিছু না দিয়েছে, আপনি তো বরাবর জাগিয়ে ছিলেন। শুধু

একবার দু মিনিটকা বাস্তে বেহোস হয়ে গেলেন। যেই বাবু ওপর থেকে গঙ্গাজীমে গিরিয়ে পড়ল কি—

স্মৃতিটা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। স্বরটা যেন চেনা, খুব সম্ভবত মাঝি পণ্ডিতমশায়ের শক্তির পরিচয় পাইয়াছে, সংযমের পরিচয় পাইয়া ওর মনটা শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিয়াছে। আসল ঘটনাটা সবাইকে বুঝাইতে চায়, কিন্তু বৃদ্ধ যুবাকে বাঁচাইবে, এ কথাটা যেন কেহ বিশ্বাস করিতে চাহিতেছে না। ওরই নৌকায় দুর্ঘটনা হইয়াছে, সুতরাং ওর সত্য মিথ্যা কোন কথাই গ্রাহ্য হইতেছে না। আমি যে পণ্ডিতমশায়ের টিকি যথা-পদ্ধতিতে বাগাইয়া ধরিয়াছিলাম আর অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম, এইগুলা আমার পক্ষে মস্ত বড় প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

কি একটা বলিবার প্রবল ইচ্ছা অনুভব করিতেছি, কিন্তু শক্তি হারাইয়া যেন কোথায় তলাইয়া চলিয়াছি। গলায় একটা উগ্র জ্বালা অনুভব করিলাম, আবার যেন অতল হইতে ভাসিয়া উঠিতেছি, যা হোক চলিয়া যাইতে পারিব। কেমন একটা অস্পষ্ট আনন্দে আমায় উপরে ঠেলিয়া তুলিতেছে, কোথাও বহুদিনের জন্য যাইবার আগে সবচেয়ে দরকারী কথাটা বলিয়া যাইবার একটা অস্পষ্ট নিশ্চিন্ততা, একটা দায়-মুক্তির ভাব, হাতটা বাড়াইলাম, গোলমালটা হঠাৎ বাড়িয়া কোথায় যেন বিলীন হইয়া গেল।

দ্বিতীয় বার যখন সংজ্ঞা হইল, তখন পূর্ব্বের চেয়ে বল পাইয়াছি মনে হইল। ঘটনাটাও পূর্ব্বাপর যেন স্পষ্টতরভাবে মনে পড়িতেছে। কনুয়ের উপর ভর দিয়া একটু সোজা হইয়া বসিতে চেষ্টা করিতেছি, চারিদিকে আতঙ্কসূচক একটা বারণের কলরব উঠিল, আপনি একটু শুয়ে থাকুন মশাই, অ্যাম্বুলেন্সে খবর দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, ততক্ষণ—

বলিলাম, অ্যাম্বুলেন্সে দরকার নেই। পণ্ডিতমশাই কোথায়?

একসঙ্গে উত্তর ও অভিমত আরম্ভ হইয়া গেল, তিনি চ'লে গেছেন গাড়ি ক'রে, তাঁর তো বিশেষ কিছু হয় নি, আপনি সমস্ত ভারটা নিজের ওপর তুলে নিয়েছিলেন কিনা, কি রকম বোধ করছেন এখন?

আপত্তি সত্ত্বেও উঠিয়া বসিলাম, বলিলাম, ভালই বোধ হচ্ছে; আপনারা স'রে গিয়ে একটু হাওয়া ছাড়ুন দয়া ক'রে।

অগ্রণী কয়েকজনের ঠেলাঠেলি আর অনুরোধে ভিড়টা একটু পিছনে সরিয়া গিয়া জায়গা ছাড়িয়া দিল। মিনিটখানেকের জন্যও নয়, তখনই আবার বীরের মুখের কথা শুনিবার আগ্রহে আরও চাপ বাঁধিয়া ঘিরিয়া ফেলিল; নানাবিধ প্রশ্ন, মন্তব্য—কি হয়েছিল মশাই? আচ্ছা দোরস্ত হাত, এসা বজ্রমুষ্টিতে পণ্ডিতমশায়ের টিকিটা ধরেছিলেন মুঠিয়ে। আপনি যখন ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, তখন উনি বুঝি একেবারে তলিয়ে গেছেন?

মাঝিটা কি বলিতে যাইতেছিল, চারিদিক হইতে আবার মারমুখো হইয়া উঠিল সকলে, তোম চোপ রও, পুলিসমে হ্যাণ্ডোভার করেগা। বল কি তোর নৌকোর নম্বর, ব্যাটার লাইসেন্স কন্‌ফিস্‌কেট করিয়ে দাও, যত সব আনাড়ী মুল্লুক থেকে জুটেছে, হাল ধরতে পারে না, রোজ একটা না একটা—

বলিলাম, ওকে বলতে দিন মশাই, কি হয়েছিল আসলে ওই জানে, আমার ঠিক গুছিয়ে মনে আসছে না।

একটি বয়স্থগোছের লোক আগাইয়া আসিলেন, বলিলেন, গুছিয়ে মনে পড়া মানে? তুমি তো আর যাত্রার মহলা দিচ্ছিলে না বাপু যে, পড়া মুখস্থর মত সব মনে ক'রে ক'রে বলবে! দেখলে, একটা বুড়ো মানুষ যেতে বসেছে, যেমন ছিলে তেমনটি ঝাঁপিয়ে পড়েছ। সাবাস ছোকরা! বাঃ! তোমার চেহারা দেখলে মনে হয়, জলে পড়লে কুটোর

মত ভেসে যাবে, কিন্তু তুললে তো লাস ডাঙায় টেনে! কোথায় বাড়ি?

বলিলাম, মশাই, আমি তাঁকে টেনে তুলেছি বললে ভুল হয়। আমি তো—

বৃদ্ধ বাধা দিয়া অনুমোদনের ভঙ্গিতে তর্জ্জনীটি বাঁকাইয়া বলিলেন, নিমিত্ত মাত্র। ঠিক ঠিক। সাধু। সব কর্ম্ম তাঁকেই সমর্পণ করবে বাবা, আমি করলাম, আমি ধরলাম, আমি এত বড়, আমি তত বড়, আরে তুই কে? কতটুকুই বা খ্যামতা তোর?

একটা বখাটে গোছের ছোকরা একটা বিড়ির শেষ প্রান্তে টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, তুই তো স্রোতের কুটোটি! কি বলুন ঠাকুরমশাই?

বৃদ্ধ তাহার দিকে একবার আড়ে চাহিয়া লইয়া বলিলেন, নাও, একটা গাড়িটাড়ি ডেকে দাও তোমরা কেউ, ভিড় হ'লেই আবার গাঁটকাটা জোটে। তুমি ঘরে যাও বাবা, ভিজে কাপড়ে আবার বেশিক্ষণ থাকাটা—

ছোকরার দিকে আর একটা বক্রদৃষ্টি হানিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

২

ঘোড়ার গাড়িটা মেট্‌কাফ হলের প্রায় কাছাকাছি আসিয়াছে, 'এই গাড়োয়ান! এই গাড়োয়ান!' করিয়া একটা চীৎকার কানে গেল এবং গাড়োয়ানটা গাড়ি থামাইয়া ফেলিল। গলা বাড়াইয়া দেখি, সেই বখাটে গোছের ছোঁড়াটা আর একজন ভদ্রবেশী যুবক, একরকম ছুটিয়াই চলিয়া আসিতেছে। নিকটে আসিয়া ছোকরা আমায় দেখাইয়া দিয়া বলিল,

এই ইনি। আমি বিস্মিতভাবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

যুবক যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া বলিল, নমস্কার! ডিটেন করলাম, মাফ করবেন। আপনিই আজ একজন জলমগ্ন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করেছেন?

বলিলাম, আজ্ঞে, আমি তাঁকে উদ্ধার করি নি, আসলে—

ভগবান করেছেন।—বলিয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত যুবক পকেট হইতে একটা নোটবুক-গোছের বাহির করিয়া একটা কি টুকিয়া লইল, তাহার পর নোটবুই আর পেন্সিলটা হাতে করিয়াই বলিল, সে তো ঠিক, আমরা কে? ইফ ইউ ডোণ্ট মাইণ্ড, আপনার সঙ্গে খানিকটা যেতে পারি কি? মানে, ওখানে আমি খানিকটা বিবরণ যোগাড় করেছি, তারপর এ বললে, আপনি বোধ হয় বেশি দূর যান নি, তাই ভাবলাম, মানে, আমি হচ্ছি 'দৈনিক সত্যপ্রকাশে'র স্টাফ-রিপোর্টার—

বলিলাম, মশাই, যদি আদত কথাটা রিপোর্টেড হয়, আমার আপত্তি নেই। কিন্তু—

যুবক গাড়ির দরজার হ্যাণ্ডেলটা ঘুরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল, একটি অক্ষর বাদ যাবে না। এইখানেই ব'সে ব'সে স্টোরি ঠিক ক'রে নিয়ে আপনাকে শুনিয়ে নোব। ডাক-এডিশনেই বের ক'রে দোব আপনাকে। এই কোচম্যান, হাঁকো। বাই দি বাই, ফোটো আছে আপনার?

বলিলাম, আছে একটা বোধ হয়।

তবে আর কি। সুইমিং-কষ্টিয়ুমে?

না, ধুতি-চাদরে।

যুবক একটু বোধ হয় নিরাশ হইল, কিন্তু তখনই উৎসাহিত হইয়া

বলিয়া উঠিল, হয়েছে, আই হ্যাভ এ ব্রেন-ওয়েভ। আপত্তি না থাকে তো নেমে সরকার কোম্পানির ওখানে আপনার একটা টাটকা-টাটকি ফোটো তুলিয়ে নিই। চমৎকার হবে। এই ভিজে কাপড়-জামা, ভিজে চুল, ক্লান্ত ভাব—

দৈনিক কাগজের রিপোর্টার স্বয়ং স্বশরীরে আমার সামনে! কি রকম একটা যশের মোহ ধীরে ধীরে পাইয়া বসিতেছে। তবুও ক্লান্তিতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি, বলিলাম, সিধে বাড়িই যেতে দিন এখন মশাই; সমস্ত জলটা গায়েই শুকোচ্ছে—

এই স্ট্র্যাণ্ড রোডের ওপর, একটু ভেতরে গিয়েই। বিলেত হ'লে আপনি বোধ হয় এতক্ষণ পঞ্চাশখানা কাগজে উঠে গেছেন—অলরেডি। আমাদের অর্গ্যানাইজেশ্যন তার সিকির সিকিও নয়। তবু—মিনিট পাঁচেকও লাগবে না। আপনার একটু পাব্লিসিটি দরকার মশাই, অমন সব ব্যাপারই তিনিই করিয়েছেন ব'লে ছেড়ে দিলে চলে না। কাল আপনার এই রকম ভিজে কাপড়, ভিজে চুলের ব্লকের সঙ্গে অ্যাকাউণ্ট বেরুবে। সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ থেকে অসাধারণের কোটায় উঠে পড়বেন। হ্যাঁ, বলতে হবে না, বুঝেছি আপনার ফিলিংস; কিন্তু দেশের সামনে আদর্শ থাকা চাই তো মশাই, সবাই ভাল কাজ ক'রে যদি 'ত্বয়া হৃষিকেশ' ব'লে চুপ ক'রে ঘরে লুকিয়ে থাকেন তো দেশের ইউথরা আদর্শ পায় কোথা? আর ওসব পুরোনো ইয়ে ছাড়ুন মশাই, সাঁতরে আধমরা হলেন আপনি, ক্রেডিটটা নেবেন হৃষিকেশ? উত্তর দিন, চুপ ক'রে থাকলে শুনব কেন? নিন, সিগারেট খান। ও, খান না! এক্স্‌কিউজ মি—

সিগারেট খাই, বিশেষ দরকারও ছিল। খাই যে তাহার প্রমাণ পকেটে ভিজে গোল্ডফ্লেকের বাক্সের মধ্যে আছে। কিন্তু ভদ্রলোক

নিজের প্রশ্নের নিজেই উত্তর দিয়া আমার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। ঠিক মুখবন্ধও বলিতে পারি না, স্পষ্ট উত্তর দিলাম, আজ্ঞে না, ওটা অভ্যেস নেই।

যুবক পেন্সিলটা নোটবুকের উপর লাগাইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, মানে, আপনার মত হচ্ছে, ওটা মস্তবড় একটা বদ অভ্যেস? আপনার বক্তব্য—স্মোকিং লাংসকে উইক ক'রে দম নষ্ট ক'রে দেয়?

অথচ প্রশ্নকর্ত্তা স্বয়ং ধূমপান করিতেছে। আমি কতকটা কুণ্ঠিত-ভাবে, পকেটের বাক্সটার উপর হাতটা ধীরে ধীরে চাপিয়া, বলিলাম, একটু করে বইকি অপকার।

একটু না, বিলক্ষণ। আমাদের কথা বাদ দিন, ভবঘুরের দল। পেন্সিলটা চালাইতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া আমার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, নাম?

বলিলাম, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

যুবক পড়িতে পড়িতে লিখিয়া চলিল, শৈলেনবাবু মনে করেন, ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ হানিকারক, যেহেতু নিকোটিন নামক বিষাক্ত পদার্থ ফুসফুসযন্ত্রকে দুর্ব্বল করিয়া শেষ পর্য্যন্ত রুগ্ন করিয়া তোলে এবং তাহার দ্বারা পরিশেষে প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা থাকে। বিশেষ করিয়া যাঁহারা ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলাধূলা এবং সন্তরণ বা অন্য কোন প্রকার ব্যায়াম করিয়া থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে ধূমপানের শৈলেনবাবু একেবারেই বিরোধী। তিনি নিজে সমস্ত জীবনে কোন মাদক দ্রব্যই স্পর্শ করেন নাই এবং এ বিষয়ে কাহারও মতের সঙ্গে আপস করিতে একেবারেই নারাজ।

বিনা আয়াসেই বাঁধা গতের মত সমস্তটা লিখিয়া যুবক পেন্সিল

থামাইয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, কেমন এই আপনার অভিমত তো? অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দেখুন মশাই।

বেশ অনুভব করিতেছি, মোহটা ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে আমায়। কাল এই সময় সমস্ত বাংলা দেশে শৈলেন-বাবুর মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কলিকাতার কোন একটা গলির অখ্যাত অজ্ঞাত শৈলেন নয়, বিখ্যাত সন্তরণবীর, উদারপ্রাণ পরোপকারী শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। তবুও কিন্তু পণ্ডিতমশাইয়ের শান্ত নিরহঙ্কার মূর্ত্তিটি মনে পড়িয়া যাইতেছে, বোধ হয় মুখ ফুটিয়া বলেনও নাই যে, তিনিই আমার ত্রাণকর্ত্তা। চিন্তার একটা যেন অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়া বলিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি তো এই রকমই ভাবি।

যুবক "সো ফার সো গুড" বলিয়া একটু গুছাইয়া বসিল। সিগারেটটা ধরাইয়া দুইটা আঙুলের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, এবার আমি এ পর্য্যন্ত যতটা সংগ্রহ করতে পেরেছি লিখে ফেলি। সংগ্রহ করা কি সহজ মশাই? জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে একটা দাঁড় করানো। তা আপনাকে যখন পাওয়া গেছে, শেষ পর্য্যন্ত তখন শুনিয়ে মিলিয়ে নিলেই হবে। একটু রেস্ট নিন, মেলা বকাব না আপনাকে।

মাঝে মাঝে গুনগুন করিয়া গান করিতে করিতে, কখনও বা পেন্সিলটা ঠোঁটে চাপিয়া একটু ভাবিয়া লইয়া গড়গড় করিয়া খানিকটা লিখিয়া ফেলিল। আমার মনটা অকৃতজ্ঞতার অনুশোচনা আর যশের আকর্ষণে তোলপাড় খাইতেছে। একবার সিগারেটটা সরাইয়া সমস্তটা মনে মনে পড়িয়া ও এক-আধটা জায়গা সংশোধন করিয়া লইয়া যুবক বলিল, শুনুন, যেখানটা ঠিক হবে না, বলবেন।—

গঙ্গাবক্ষে নৌকা-দুর্ঘটনা

নদীগর্ভ হইতে নিমজ্জিত অশীতিপর বৃদ্ধের পুনরুদ্ধার

বাঙালী সন্তরণবীরের অসমসাহসিকতা

কল্য গঙ্গাবক্ষে একটি শোচনীয় দুর্ঘটনা একজন বাঙালী যুবকের সৎসাহস ও আত্মত্যাগের প্রেরণায় নিবারিত হইয়াছে। চাঁদপাল ঘাটের সাতটা বারোর স্টীমার ছাড়িয়া যাইবার পর পরিশিষ্ট কয়েকজন যাত্রী লইয়া শিবপুর ফেরী ঘাট হইতে একটি নৌকা ছাড়ে। যাত্রীদের মধ্যে একজন প্রায় অশীতিপর পুরোহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন, আর ছিলেন—আপনার ঠিকানাটা?

ঠিকানাটা দিলাম। যুবক খালি জায়গাটুকুতে ঠিকানাটা বসাইয়া দিয়া পড়িতে লাগিল, আর ছিলেন হাতিবাগানের (১৭নং রামু খানসামা লেন) বিখ্যাত সাঁতারু শ্রীমান শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২৬)। পুরোহিত মহাশয় শুচিবায়গ্রস্ত, নৌকায় দুই-একজন ধোপা ও নিম্নশ্রেণীর লোক থাকায় তিনি সকলের নিষেধ সত্ত্বেও এক প্রান্তে গিয়া উপবেশন করেন। নৌকা যখন প্রায় মাঝগঙ্গায়—ভিন্নমুখী দুইটি স্টীমারের ঢেউ লাগিয়া নৌকা হঠাৎ বানচাল হইয়া যায়। পশ্চিমা আনাড়ী মাঝি কোন প্রকারেই সামাল দিতে না পারায়···

যুবক নোটবুক হইতে দৃষ্টি সরাইয়া বলিল, দুটো লাইন দিলাম মশাই জুড়ে, যত সব আনাড়ী মেড়ো এসে নিতুই এই রকম দুর্ঘটনা ঘটাচ্ছে। তাও চোখের সামনে কি হচ্ছে, না হচ্ছে, খোঁজ রাখবে? বলে, সেই বুড়ো আপনাকে তুলতে ঝাঁপিয়ে পড়ল! ইডিয়ট! অ্যাজ ইফ ওয়ান কুড সোয়ালো দ্যাট অ্যাব্‌সার্‌ডিটি! ঐ যে পুরুত, আর রক্ষে আছে? কত কায়দা ক'রে, আর পাঁচজনকে জিজ্ঞেস ক'রে তবে আসল ব্যাপারটা বের করা গেল। হ্যাঁ, সামাল দিতে না পারায়, বৃদ্ধ টাল সামলাইতে না পারিয়া সেই বিপরীতমুখী জাহাজের ঢেউয়ের মধ্যে পড়িয়া গিয়া একেবারেই তলাইয়া যান। জাহাজে ইতরভদ্র অনেকগুলি লোক, কিন্তু কেহই এই বৃদ্ধের প্রাণরক্ষার্থে অগ্রসর হইল না। শ্রীমান

শৈলেন্দ্র নৌকার ছইয়ের উপর পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিলেন, বোধ হয় স্বভাবত একটু ভাবপ্রবণ হওয়ায় কিছু অন্যমনস্ক ছিলেন, প্রথমটা সেকেণ্ড কয়েক কিছু বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু ঘুরিয়া প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করামাত্র যেমনভাবে ছিলেন ঠিক সেই অবস্থাতেই উর্মিমধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া যাওয়ায় ঘটনাটি কোন স্টীমার বা অপর কোন নৌকার গোচরীভূত হয় না এবং বৃদ্ধকে উদ্ধার করা নিরতিশয় দুষ্কর হইয়া পড়ে। তাহার উপর তীব্র জোয়ারের টানে বৃদ্ধ পতনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায়—কি বলেন, প্রায় রশিখানেক দূরে গিয়ে পড়েছিলেন ব'লে আপনার মনে হয়?

চমৎকার দাঁড় করাইয়াছে! এত বড় একটা বীরত্বের মূল নায়ক হওয়ার লোভ না হইয়া পারে না। মনে করার ভঙ্গিতে একটু টানিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, তা রশিখানেক হবে বইকি—ইজিলি।

অনুশোচনার দংশনে আর ততটা জ্বালা নাই; অথবা কোথায় একটা সগর্ব্ব আনন্দ ঠেলিয়া উঠিতেছে, তাহাতেই বিষটা কতকটা নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতেছে; যাই হউক।

তীব্র জোয়ারের টানে বৃদ্ধ পতনের সঙ্গে সঙ্গেই রশিখানেকেরও আগে গিয়া পড়েন। নৌকার আর সকলেই নৌকার আশেপাশে অন্বেষণ করিতেছিল, কিন্তু…এবার আপনি নিজের মুখেই বলুন শৈলেনবাবু, মানে, ঝাঁপ দিয়েই আপনার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব অর্থাৎ প্রেজেন্স অব মাইণ্ড হারিয়ে ফেললেন; না, বেশ বুঝতে পারলেন, বৃদ্ধ নিশ্চয়ই হাতের কাছে নেই, তলিয়ে রশিখানেক দূরে ঠেলে উঠে থাকবেন?

একটা যে কুণ্ঠা ছিল, বেশ অনুভব করিতেছি, সেটা দ্রুত অপসৃত

হইয়া যাইতেছে। ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, না, ও সামান্য ব্যাপারে আর মাথা ঠিক রাখতে পারব না?

যুবক যোগাইয়া দিল, ডুবন্তদের উদ্ধার—এ তো রোজই আপনাদের সুইমিং ক্লাবে প্র্যাক্‌টিস করছেন, কি বলেন? হ্যাঁ, বাই দি বাই, কি নাম আপনাদের ক্লাবের?

পাড়ায় কয়টা সাঁতারের ক্লাব আছে, অথবা একটাও আছে কি না, জানা নাই। বলিলাম, আমাদের আহিরীটোলা সুইমিং-ক্লাব।

আমারও ঐ রকম একটা আন্দাজ ছিল। এ তো শখের ওয়াটার-পোলো-খেলা হাত নয়, দস্তুরমত স্রোতে প্র্যাক্‌টিসের লক্ষণ। আমার মনে হয়, এর আগে আরও দু-পাঁচটা অ্যাক্‌সিডেণ্টে হাত পাকিয়েছেন আপনি। "না" বললে শুনব কেন মশাই?

একেবারে সোজা "হ্যাঁ" বলাটা বিপজ্জনক, তবে "না"ও বলিতে মন সরিল না। মুখটা নীচু করিয়া লজ্জিতভাবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলাম।

স্টুডিওর ফ্ল্যাশ-লাইটে ফোটো লওয়া হইল। লিখিতে লজ্জা হয়, ফোটো লইবার পূর্ব্বে টাটকা নদী ছাড়িয়া ওঠার ভাবটা বজায় রাখিবার জন্য মাথায় এক ঘটি জল ঢালিয়া লইতেও রাজি হইলাম। যুবকেরই 'প্রযোজনায়' মুখে দিব্য একটি ক্লান্ত অথচ উদার আত্মত্যাগের ভাবও ফুটাইয়া রাখিতে সমর্থ হইলাম।

৩

পরদিন সকালে ক্লান্তির জন্য একটু বিলম্ব করিয়া উঠিলাম; কিন্তু উঠিয়াই দেখি, এত বিখ্যাত হইয়া গিয়াছি যে নিজেকেই নিজে চেনা দায়।

প্রথমেই পিসীমার সঙ্গে দেখা। অত্যন্ত রাগিয়া আছেন বলিয়া বোধ হইল। কারণ না জানায় প্রশ্ন করিতেই ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, সকালবেলায় মুখ খুলব না মনে করেছি শৈল, আমায় বকাস নি। তোর এরকম বিদকুটে বাই কেন শুনি? একটা এঁদো ডোবার কখনও মুখ দেখলেন না, উনি বীরপুরুষ হয়ে গঙ্গায় সাঁতরে—

বুঝিলাম, কালকের জের, খবরটা ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, একটা লোক ডুবে মরছে চোখের সামনে, চেষ্টা করব না পিসীমা? কি যে বল তুমি! কিন্তু তুমি টের পেলে কি ক'রে?

না, টের পেয়ে কাজ কি! সমস্ত শহরে ঢিঢি প'ড়ে গেছে, কাগজে কাগজে ছবি, আর বাইরে একপাল সব জড়ো হয়ে ব'সে আছে। ও অলপ্পেয়েদের আর কি! হাততালি দিয়ে দিয়ে উস্কে দিয়ে একটা কাণ্ড না ঘটিয়ে ছাড়বে? দাদা আসুন, বলি, আমায় দিন কাশী পাঠিয়ে, নইলে বুড়ো বয়েসে আমায় অনেক কিছু দেখতে হবে। শরীরে এককড়া দম নেই, অথচ গোঁয়ারতুমি যোলো আনা,—ও ছেলেকে মাদুলি-মানতে কতদিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে? জলে ভেজা ছবি দেখলে বুক আঁতকে ওঠে একেবারে!

গরগরানি শুনিতে শুনিতে বাহিরে আসিয়া দেখি, সত্যই প্রায় জন ত্রিশেক ছোকরা বাহিরের ঘরে, বারান্দায় ভিড় করিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। সবার মুখেই একটি স্তম্ভিত শ্রদ্ধার ছাপ। বাহির হইতেই সকলে কপালে যুক্তকর স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল। কয়েকজনকে চিনি, তাহাদেরই একজনকে উদ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিলাম, যতীন, ব্যাপার কি হে?

যতীনের হাতে একখানি 'সত্যপ্রকাশ', অগ্রসর হইয়া বিনীত হাস্যের

সহিত আমার হাতে কাগজটা দিয়া বলিল, ব্যাপার আপনার পক্ষে কিছুই নয়, কিন্তু আমাদের পাড়ার আজ মুখোজ্জ্বল হয়েছে।

কাগজটার দিকে চোখ পড়িতেই সমস্ত শরীরে একটা রোমাঞ্চ হইয়া গেল,—সিক্ত বস্ত্র, সিক্ত কেশে আমারই ছবি, এমন একটা চমৎকার ক্লান্ত অথচ নির্লিপ্ত ভাব, যেন এই জগতের বহু উর্দ্ধে কোন এক ভিন্ন জগতের মানুষ আমি। একবার মনেও পড়িতে দিল না যে, আমি একজন অভিনেতা,—অত ভালও কিছু নয়, একজন প্রবঞ্চক মাত্র। বিবরণীর খানিকটা পাঠ করিলাম, তাহার পর কাগজটা ফিরাইয়া দিতে দিতে বলিলাম, যা অপছন্দ করি তাই, টেরই বা পেলে কি ক'রে? ফোটোই বা নিলে কখন?

যতীন ধীরে ধীরে হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল, জানি আপনি পাব্লিসিটি পছন্দ করেন না, নইলে এতদিন এই পাড়ায় রয়েছেন, ঘুণাক্ষরেও কি কেউ জানতে পেরেছে যে···আমরা কিন্তু আজ সন্ধ্যেয় আপনাকে একটা অভিনন্দন দোব ঠিক করেছি···না, মত না দিলে শুনব না।

একটি নতুন জগৎ একেবারে! যশ—অপ্রত্যাশিত যশ;—একটা নবজীবন। একটা চাপা উল্লাসের জোয়ার সত্য-মিথ্যার বিচারকে তৃণখণ্ডের মতই কোথায় যেন ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। তবু চকিতে একটা আত্মসমাহিত নির্লোভ ব্রহ্মণ্যমূর্ত্তি চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল —আমার এ যশোলোকেরও বহু উর্দ্ধে কোন্ এক লোকে। কি একটা বেদনা—ক্ষণিক, কিন্তু তীব্র, যশোঘাতীর অনুতাপ।

বলিলাম, না, আমি ওসব একেবারেই পছন্দ করি না।

সমস্বরে আপত্তি হইল, সে তো জানিই—তবে, আমাদের একটা কর্ত্তব্য আছে তো। আজ সন্ধ্যেয় আমাদের ক্লাবে···আপনার এই ছবিটা এন্‌লার্জ করিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে এসেছি আর্টিস্টকে।

যাক, বিবেকের কাছে কর্ত্তব্য তো করা হইল। যদি না-ই ছাড়ে এরা তো কি করিতে পারি আমি?

কি রকম যে একটা স্বস্তি অনুভব করিতেছি!

ঠেলিয়া সামনে আসিল অপর দলের কয়েকজন। চিনি না। একজন অগ্রসর হইয়া বলিল, কাগজে দেখলাম, আপনি আহিরীটোলা ক্লাবের মেম্বার—

বেশ অনুভব করিলাম, আমার মুখ হইতে সমস্ত রক্ত যেন উঠিয়া গেল এক মুহূর্ত্তে। কপালে কিছু কিছু ঘাম জমিয়া উঠিল। এইবার চোরের যা প্রাপ্য, প্রবঞ্চকের যা পুরস্কার—কিন্তু অদৃষ্ট স্বয়ং যখন একের প্রাপ্য মাল্য অন্যের কণ্ঠলগ্ন করে, তখন আটঘাট বাঁধিয়াই করে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অপর একজন বলিল, কিন্তু আহিরীটোলায় তো মাত্র একটা সুইমিং ক্লাব নয়, এমন অনেক আছে; তবে আমাদের ক্লাবটাই সবচেয়ে প্রাচীন আর রেস্‌পেক্টেব্‌ল। সাতটা রেকর্ড ব্রেক করা আছে আমাদের—আড়াইশো মেম্বার। কিন্তু আমাদের ক্লাবে আপনার নাম না দেখে—

কপালের ঘামটা মুছিয়া বলিলাম, ক্লাবের নামটা আমি ডিস্‌ক্লোজ করতে চাই না, মাফ করবেন।

যতীন সহায় হইল, উনি চান না পাব্লিসিটি, তবে আর শুনছেন কি?...কিন্তু আপনার যা-তা একটা ক্লাবেও প'ড়ে থাকা চলে না শৈলেনদা।

ওদিক হইতে আবার নিবেদন, আমাদের ক্লেমটা আগে...আপনি বরং চলুন একবার আমাদের ক্লাবে একটু সময় ক'রে, দেখবেন—

সাতটা রেকর্ড ভাঙিবার স্পর্দ্ধা রাখে, এমন ক্লাবের দিকে পা বাড়াইব অতটা দুর্ব্বুদ্ধি নিশ্চয় কখনও হইবে না। তাহা হইলে তাহারা এই দুর্ব্বল পা জোড়াটাই কি ছাড়িয়া দিবে? তবুও বলিলাম, আচ্ছা, আপনাদের রুল্‌স রেগুলেশনগুলো দেখাবেন একবার, তবে তারাও কি ছাড়তে চাইবে শিগগির?

কিছু লোক পাতলা হইল, কিন্তু বাড়িল আরও বেশি। পাড়াতেই দুইটা সুইমিং ক্লাব আছে, তিনটে হিতকারিণী সভা আছে। একটু দূরে দূরে আড্ডা, খবর পাইতে একটু দেরি হইয়াছে বোধ হয়। আসিয়া উপস্থিত হইল। আরও একটু বেলা হইতে আসিল পাঁচজন রিপোর্টার—তিনটি ইংরেজী ও দুইটি বাংলা কাগজের, একেবারে আপ-টু-ডেট, মায় কাঁধে স্ট্র্যাপ দিয়া ক্যামরা পর্য্যন্ত ঝোলানো।

যশের সৌধ আকাশ লক্ষ্য করিয়া উঠিতেছে—দ্রুত, অব্যর্থ। কিন্তু তাসের সৌধ, একজনের দুটি কথাতেই কি ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে না? উল্লাসের পাশে কোথায় একটা আতঙ্ক জমিয়া উঠিতেছে। যেখানে একটা ক্ষীয়মান শ্রদ্ধা ছিল, সেখানে কি একটা বিদ্বেষের ভাবও ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে! না, কোথাও এখনও একটু অনুতাপ রহিয়াছে জাগিয়া!

এমন সময় গলি ঘুরিয়া সাইকেলে অতি ক্ষিপ্রগতিতে মণিমোহন আসিয়া উপস্থিত হইল। মণি আমার কলেজের অন্তরঙ্গ বন্ধু, থাকে বৈঠকখানা রোডে।

মণিমোহনের দৃষ্টিটা উদ্‌ভ্রান্ত। খুব জোরে ঘণ্টি দিতে দিতে ভিড় ঠেলিয়া আসিয়া বারান্দায় উঠিয়া পড়িল। ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে হইতেই উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিল, কি রকম আছিস? কি ক'রে পড়লি? পিছলে? তোর আবার আম্বাটুকু আছে কিনা, কবিত্ব ক'রে সূর্য্যাস্ত দেখছিলেন বাবু!

শান্তভাবে বলিলাম, ব'স, কোথায় শুনলি?

স্বয়ং পুরুতমশায়ের কাছে, যিনি বাঁচালেন তোমায়। প্রথমটা অত বুঝতে পারি নি, তারপর যখন তোর নাম শুনলাম, ইস্তক ঠিকানা সুদ্ধ।

আমার অবস্থা বর্ণনাতীত। শুধু এইটুকু হুঁশ আছে যে, যে মিথ্যাকে কুণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্রয় দিয়াছি, এবার তাহাকে বুকে হাতে করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে, না হইলে গঙ্গাগর্ভের চেয়েও অতলে ডুবিলাম। সমস্ত দলটা যেন মন্ত্রবলে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছে। আমি

প্রসন্ন অবহেলার হাসি হাসিয়া বলিলাম, তিনি বললেন তিনিই আমায় বাঁচিয়েছেন? ভাল। কি বললেন একটু শুনিই না, বেশ ইন্টারেস্টিং হবে।

সেই ভাবেই চাহিয়া একবার সবার মুখের উপর দিয়া দৃষ্টিটা ঘুরাইয়া আনিলাম। মণিমোহন অতিমাত্র বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, মানে?

আমি ধীরে ধীরে কাগজটা বাড়াইয়া দিলাম এবং সকলেই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মণিমোহনের পরিবর্ত্তিত মুখভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। উপরে কাগজের নামটা স্পষ্টাক্ষরেই লেখা, মণিমোহন তবুও শেষ করিয়া একবার প্রথম পৃষ্ঠাটা উল্টাইয়া দেখিয়া লইল, ব্লক টাইপে 'সত্যপ্রকাশ' লেখাটা জলজল করিতেছে। মণি ধীরে ধীরে আমার মুখের উপর চোখ তুলিয়া বলিল, আর স্বচ্ছন্দে আমায় উল্টো বুঝিয়ে দিলে! হয়েছিল সন্দেহ ভাই। তুই ষাট বছরের একটা নড়বড়ে বুড়ো, চালকলা খেয়ে জীবন কাটালি, হোক রোগা, কিন্তু তবুও একটা সমর্থ লোক তো? পারিস তাকে তুই তুলতে? লোকটা যে এরকম, কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি রে!

দলের মধ্যে কে একজন বলিল, কত রকম লোক আর কাণ্ড দুনিয়ায় দেখবেন মশাই। উই লিভ টু লার্ন।

একজন রিপোর্টার আগাইয়া আসিয়া কহিল, আমাদের অভিজ্ঞতায় এরকম ঘটে মাঝে মাঝে। যশের লোভ। কি করেন ভদ্রলোক?

মণিমোহন চোখ বড় বড় করিয়া উত্তর করিল, আমাদের কুলগুরু মশাই! থাকেন শিবপুরে। কাল রাত্তিরে—

সমস্ত ভিড়ের মধ্য হইতে একটা গুঞ্জন উঠিল, গুরুঠাকুর! ...ফোঁটা-চন্দন!...নো ওয়াণ্ডার!

বুকের কোথায় একটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল। মুখের ব্যঙ্গহাস্যটা কিন্তু বেশ সহজভাবেই ধরিয়া রাখিলাম।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমার ট্রেঞ্চ

আমি বাংলা দেশের মেয়ে, সুতরাং বাঙালী। শুধু বাঙালী নয়, একেবারে যাহাকে বলে 'বাঙাল'। এই বৎসরই দৈবাৎ বিবাহ হইয়া গেল। স্বামী থাকেন বার্মায়, অতএব গেলাম বার্মা দেশে। রেঙ্গুনে নয়, তাহার কিছু এদিকে। গিয়েছিলাম বেশি দিন হয় নাই, আবার বাংলা দেশে আসিয়া পৌছিয়াছি অল্প কয়দিন আগে।

যুদ্ধ এখন রেঙ্গুন হইতেও অনেক কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। আমিও এ খবর জানি। তখন জানিতাম না। আমি যেখানে ছিলাম, যুদ্ধ এখন সে অবধি আসিয়াছে কি না জানি না, কেন না এখন কোনও সংবাদ পাওয়া যায় না। আশা আছে, অদূরভবিষ্যতে হয়তো শুনিব। যুদ্ধের কাছে থাকিলেও যুদ্ধ বা বোমা দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। যুদ্ধ আমাকে আসিয়া ধরিবার আগেই পলাইয়া আসিয়াছি। আমার স্বামীকে বার্মা গভর্মেণ্ট খুব ভালবাসে, তাঁহাকে তাই আসিতে দেয় নাই। তিনি হয়তো যুদ্ধ দেখিতে পাইবেন, এবং তারপর আমি আবার তাঁহার কাছে শুনিব।

তবে যুদ্ধ ঠিক না হউক, যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারের অভিজ্ঞতা আমি বাঙালও খানিকটা অর্জ্জন করিয়াছি। সে অভিজ্ঞতার একটা অঙ্গ, নিজস্ব ট্রেঞ্চ তৈরি করার কায়দা।

আজকাল যুদ্ধমূলক ও সতর্কতামূলক কথা ও ছবি সিনেমা হইতে আরম্ভ করিয়া রেলগাড়ির কামরা ও মাসিক-পত্রিকার মলাট পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই পাওয়া যাইতেছে। পিত্রালয়ে পৌছিয়া দেখিতেছি, ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরাও এখানে বোমার নামে ভয় পায় না, তাহারাও

সামান্য একখণ্ড বাঁশের 'চটা' বা কঞ্চি পাইলেই ঘরেচ বাইরেচ মাটি খুঁড়িতে থাকে, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'গথ করি, এরোপ্লেনে আইলে ঢুকুম'। আমরা সেখানে ভয় খুব সম্ভবত পাইয়াছিলাম; পাই বা নাই পাই, 'গথ' আমরাও খুঁড়িয়াছিলাম। এখানে যুদ্ধ আসিতে হয়তো এখনও কয়দিন দেরি আছে। ইতিমধ্যে শিশুরা 'গথ' খুঁড়ুক, তালগাছ ও গরুর গাড়ি সামরিক সার্ভিস দিতে থাকুক, মাতা ধরিত্রী বিদীর্ণ হইয়া আপন সন্তানের জন্য কবর রচনা করিয়া রাখুন। আমি এই ফাঁকে একটু পেটটা হালকা করিয়া লই। ট্রেঞ্চ করিতে গিয়া অনেক রকম সমস্যার দেখা পাইয়াছিলাম, সমাধানও হাতড়াইয়া বাহির করিতে হইয়াছিল। সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলিতেছি। এখানেও নাকি বাড়িতে বাড়িতে ট্রেঞ্চ করার হুকুম হইয়াছে। হুকুম হউক না হউক, বোমা যদি পড়ে ট্রেঞ্চের প্রয়োজন হইবেই। নিজের বাড়িতে ট্রেঞ্চ যাঁহারা করিবেন, আমার অভিজ্ঞতার কথা তাঁহাদের কাজে লাগিয়া যাইতে পারে।

আমি যখন বাংলা দেশ হইতে ওখানে যাই, তখন যুদ্ধ ট্রাঙ্ক-পোর্টম্যাণ্টো সাজাইতেছিল, বার্মায় রওয়ানা হইবার জন্য। প্রিকশন আগেই নেওয়া দরকার। পৌঁছিবার অল্প দিন পরেই আমাদের উপর নোটিস আসিল—ট্রেঞ্চ কর। আমি বাপু বাঙাল। আমি বলি, ওমা, হেয়া আবার কি? হেয়া ক্যামনে করে? কিন্তু করিতে হইবেই। বাঙাল আমি একা, কিন্তু অভিজ্ঞতা সে সময়ে অনেক অ-বাঙালেরও সেই রকমই ছিল। কয়েক দিন পর্য্যন্ত যাহার সঙ্গে দেখা হয়, ঐ এক প্রশ্ন করি, 'ট্রেঞ্চ ক্যামনে করমু'? জবাব বড় কেহ দেয় না, দিলেও তাহা সন্তোষজনক হয় না। শেষে খবরের কাগজে দেখিলাম, ট্রেঞ্চ মানে হইল এক গর্ত্ত, যেখানে বিমান-আক্রমণের সময় মানুষ আশ্রয়

লইতে পারে। কাগজে তাহার আকৃতি-প্রকৃতিও দেওয়া ছিল। সেটা হইল এই—গর্ত্তটা ছয় ফুট গভীর হওয়া চাই, প্রস্থ উপরে সাড়ে চার ফুট, তলায় সাড়ে তিন ফুট। আকার ইংরেজী বড় হাতের L-এর মত। ইহার এক প্রান্তে এক সিঁড়ি থাকিবে। লম্বাটা প্রত্যেকের পরিবারস্থ লোকের সংখ্যার উপর নির্ভর করিবে। মানে প্রত্যেক লোকের জন্য আঠারো ইঞ্চি জায়গা দরকার; যাহার বাড়িতে যে কয়জন লোক, সে সেই অনুপাতে এবং অতিরিক্ত তিনজন লোকের মত জায়গা তাহার ট্রেঞ্চে করিবে।

শুনিলাম। বাঙাল, বুঝিলাম না কিছুই, করিতেও পারিলাম না। তারপর দ্বিতীয় নোটিস আসিল—তাড়াতাড়ি ট্রেঞ্চ তৈয়ারি কর, তিন দিনের মধ্যে শেষ করিতে না পারিলে জরিমানা হইবে। বাধ্য হইয়া তখন মজুর ডাকিলাম। জানি না কিছুই, তবু করিতে হইবে, কম্পালসরি অর্ডার। তারপর আরম্ভ হইল আমার ইঞ্জিনিয়ারিং, আমার স্বামীর টাকা ও মজুরের পরিশ্রমের সমবেত কুস্তি। প্রথম নোটিসের বর্ণনানুযায়ী এক গর্ত্ত হইল বাড়ির সংলগ্ন মাঠের মাঝখানে। ও, একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছি, ওখানে আর একটা কথা ছিল যে, ট্রেঞ্চ করিতে হইবে খোলা মাঠে এবং বাসগৃহের উচ্চতা যতটা, গৃহ এবং ট্রেঞ্চের দূরত্ব তাহার চেয়ে বেশি ছাড়া কম হইতে পারিবে না। সেখানে সমস্ত বাড়িই কাঠের; বাড়ি যদি জ্বলিয়া উঠে বা ধসিয়া পড়ে, ট্রেঞ্চ যাহাতে তাহার তলায় না পড়ে, সেইজন্যই এই ব্যবস্থা। যথাসময়ে আমার গর্ত্ত করা শেষ হইল। আর সদর-দরজার দুই পাশে বালি ও জল ভরা দুইটা কেরোসিনের মঙ্গল-টিন, নারিকেল ও পল্লব-বিহীন মঙ্গল-কলসের মত শোভা পাইতে লাগিল। আমি আসন্ন শাস্তির হাত হইতে রেহাই পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

সামান্য একখণ্ড বাঁশের 'চটা' বা কঞ্চি পাইলেই ঘরেচ বাইরেচ মাটি খুঁড়িতে থাকে, জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'গথ করি, এরোপ্লেনে আইলে ঢুকুম'। আমরা সেখানে ভয় খুব সম্ভবত পাইয়াছিলাম; পাই বা নাই পাই, 'গথ' আমরাও খুঁড়িয়াছিলাম। এখানে যুদ্ধ আসিতে হয়তো এখনও কয়দিন দেরি আছে। ইতিমধ্যে শিশুরা 'গথ' খুঁড়ুক, তালগাছ ও গরুর গাড়ি সামরিক সার্ভিস দিতে থাকুক, মাতা ধরিত্রী বিদীর্ণ হইয়া আপন সন্তানের জন্য কবর রচনা করিয়া রাখুন। আমি এই ফাঁকে একটু পেটটা হালকা করিয়া লই। ট্রেঞ্চ করিতে গিয়া অনেক রকম সমস্যার দেখা পাইয়াছিলাম, সমাধানও হাতড়াইয়া বাহির করিতে হইয়াছিল। সেই অভিজ্ঞতার কথাই বলিতেছি। এখানেও নাকি বাড়িতে বাড়িতে ট্রেঞ্চ করার হুকুম হইয়াছে। হুকুম হউক না হউক, বোমা যদি পড়ে ট্রেঞ্চের প্রয়োজন হইবেই। নিজের বাড়িতে ট্রেঞ্চ যাঁহারা করিবেন, আমার অভিজ্ঞতার কথা তাঁহাদের কাজে লাগিয়া যাইতে পারে।

আমি যখন বাংলা দেশ হইতে ওখানে যাই, তখন যুদ্ধ ট্রাঙ্ক-পোর্টম্যাণ্টো সাজাইতেছিল, বার্মায় রওয়ানা হইবার জন্য। প্রিকশন আগেই নেওয়া দরকার। পৌঁছিবার অল্প দিন পরেই আমাদের উপর নোটিস আসিল—ট্রেঞ্চ কর। আমি বাপু বাঙাল। আমি বলি, ওমা, হেয়া আবার কি? হেয়া ক্যামনে করে? কিন্তু করিতে হইবেই। বাঙাল আমি একা, কিন্তু অভিজ্ঞতা সে সময়ে অনেক অ-বাঙালেরও সেই রকমই ছিল। কয়েক দিন পর্য্যন্ত যাহার সঙ্গে দেখা হয়, ঐ এক প্রশ্ন করি, 'ট্রেঞ্চ ক্যামনে করমু'? জবাব বড় কেহ দেয় না, দিলেও তাহা সন্তোষজনক হয় না। শেষে খবরের কাগজে দেখিলাম, ট্রেঞ্চ মানে হইল এক গর্ত্ত, যেখানে বিমান-আক্রমণের সময় মানুষ আশ্রয়

লইতে পারে। কাগজে তাহার আকৃতি-প্রকৃতিও দেওয়া ছিল। সেটা হইল এই—গর্ত্তটা ছয় ফুট গভীর হওয়া চাই, প্রস্থ উপরে সাড়ে চার ফুট, তলায় সাড়ে তিন ফুট। আকার ইংরেজী বড় হাতের L-এর মত। ইহার এক প্রান্তে এক সিঁড়ি থাকিবে। লম্বাটা প্রত্যেকের পরিবারস্থ লোকের সংখ্যার উপর নির্ভর করিবে। মানে প্রত্যেক লোকের জন্য আঠারো ইঞ্চি জায়গা দরকার; যাহার বাড়িতে যে কয়জন লোক, সে সেই অনুপাতে এবং অতিরিক্ত তিনজন লোকের মত জায়গা তাহার ট্রেঞ্চে করিবে।

শুনিলাম। বাঙাল, বুঝিলাম না কিছুই, করিতেও পারিলাম না। তারপর দ্বিতীয় নোটিস আসিল—তাড়াতাড়ি ট্রেঞ্চ তৈয়ারি কর, তিন দিনের মধ্যে শেষ করিতে না পারিলে জরিমানা হইবে। বাধ্য হইয়া তখন মজুর ডাকিলাম। জানি না কিছুই, তবু করিতে হইবে, কম্পালসরি অর্ডার। তারপর আরম্ভ হইল আমার ইঞ্জিনিয়ারিং, আমার স্বামীর টাকা ও মজুরের পরিশ্রমের সমবেত কুস্তি। প্রথম নোটিসের বর্ণনানুযায়ী এক গর্ত্ত হইল বাড়ির সংলগ্ন মাঠের মাঝখানে। ও, একটা কথা ভুলিয়া গিয়াছি, ওখানে আর একটা কথা ছিল যে, ট্রেঞ্চ করিতে হইবে খোলা মাঠে এবং বাসগৃহের উচ্চতা যতটা, গৃহ এবং ট্রেঞ্চের দূরত্ব তাহার চেয়ে বেশি ছাড়া কম হইতে পারিবে না। সেখানে সমস্ত বাড়িই কাঠের; বাড়ি যদি জ্বলিয়া উঠে বা ধসিয়া পড়ে, ট্রেঞ্চ যাহাতে তাহার তলায় না পড়ে, সেইজন্যই এই ব্যবস্থা। যথাসময়ে আমার গর্ত্ত করা শেষ হইল। আর সদর-দরজার দুই পাশে বালি ও জল ভরা দুইটা কেরোসিনের মঙ্গল-টিন, নারিকেল ও পল্লব-বিহীন মঙ্গল-কলসের মত শোভা পাইতে লাগিল। আমি আসন্ন শাস্তির হাত হইতে রেহাই পাইয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

গেল কয়েক দিন। ইতিমধ্যে রেঙ্গুনে বোমা পড়িল। অনেকে হতাহত হইল। ভাবিলাম, বাঁচাইয়াছে, প্রাণটা আর বিদেশে রাখিয়া যাইতে হইল না। আমার তো গর্ত্তই আছে। আমার বাঙাল মন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করিয়া বসিল, ও গর্ত্তে কি হইবে? এই রকম খোলা, একে তো রৌদ্র লাগিবে মাথায়, আরও ছাদ নাই, অতএব এরোপ্লেনও আমাকে দেখিতে পাইবে। ইহার মধ্যে নামা আর একটা বেশ বড়সড়ো গামলার মধ্যে নামিয়া বসার মধ্যে তফাতটা কোন্ জায়গায়? প্রশ্নটা শুনিয়া হাসিলেন অনেকেই, জবাব কেহই দিলেন না। তা জবাব না দিলেও, রৌদ্রের তাপটা যে গ্রীষ্মে খুব মাথারোচক হইবে না, এ কথাটা অনেকেই স্বীকার করিলেন। পরামর্শের ফলে স্থির হইল যে, অন্তত রৌদ্র হইতে আত্মরক্ষার মত একটা শেড করা দরকার।

তখনও আমাদের চিন্তাধারা—সাইরেন দিনে বাজিলে রৌদ্রের হাত হইতে, রাত্রিতে বাজিলে হিম হইতে আত্মরক্ষার উপায় লইয়াই সীমাবদ্ধ। রেঙ্গুনে যাহারা খোলা ট্রেঞ্চে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাদের কেহ কেহ নাকি সরাসরি মেশিন-গানের গুলি খাইয়া মরিয়াছে—এ সংবাদ আমরা তখনও পাই নাই। যাহা হউক, অল্পদিনের মধ্যেই ঐ এল-শেপ ট্রেঞ্চ আবার মজুর-করকবলিত হইল। তখন আমরা আরেকটি তথ্য সংগ্রহ করিলাম, বাঁশ বস্তুটা আতপ-নিবারক—মানে non-conductor of heat। ব্যবস্থা হইল, বাঁশ চিরিয়া বেড়া বুনিয়া সেই বেড়া একখানা খাদের গায়ে অর্থাৎ কর্ত্তিত দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাইয়া দেওয়া হইবে। কেহ কেহ ঐ বেড়া নীচে অর্থাৎ খাদের মেঝেয়ও পাতিয়া দিলেন। তারপর খাদের মধ্যে বেড়ার গায়ে খুঁটি পুঁতিয়া তাহার আগায় দড়ি লাগাইয়া সেই দড়ি উপরে দূরে ছোট ছোট খুঁটির

সঙ্গে টানিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল। ইহার ফলে বেড়া দেওয়ালের গায়ে চাপিয়া রহিল এবং দেওয়াল ভাঙিলেও তাহার মাটি মধ্যস্থিত মানুষের গায়ে চাপিয়া পড়ার সম্ভাবনা থাকিল না। উপরে গর্ত্তের মাথার উপর দিয়া আড়াআড়িভাবে কয়েকখানা বাঁশের বা কাঠের খুঁটি পাতিয়া তাহার উপর এই বেড়া পাতা হইল; তাহার উপর চাটাই বিছাইয়া বালি ঢালিয়া দেওয়া হইল। উদ্দেশ্য, চারিপাশের মাঠ হইতে ইহাকে যেন পৃথক করিয়া চেনা না যায়। সেখানে মাঠ সমস্তই বালি, বালির রং।

এই পর্য্যন্ত শেষ করিয়া আমরা আপাতত নিশ্চিন্ত হইলাম। কিন্তু নূতন তথ্য সংগ্রহের দিকেও লক্ষ্য কমাইলাম না। অল্পদিনের মধ্যেই অনেক খবর আমরা যোগাড় করিলাম। অবশ্য এক জায়গা হইতে সমস্ত নয়। ইহা আমাদের 'কলেক্‌শন'—কতক রেঙ্গুন হইতে পলাতক বোমা-খাওয়াদের নিকট, কতক বার্মা গভর্মেণ্টের প্রচারিত কমিউনিক ও খবরের কাগজের আলোচনা হইতে, অধিকাংশই 'Illustrated Weekly' হইতে।

আবার মনে প্রশ্ন উঠিল, গর্ত্তই যদি নিরাপদ হয়, গর্ত্ত তো যে কোন রকমের হইতে পারে। এল-শেপের উপর জোর দেওয়া হইতেছে কেন? কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম। জবাব পাইলাম, অত কথা জানি না বাপু, করতে কইছে করইয়া থো। আমি বাঙাল। আদব-কায়দা কম জানি। বলিলাম, হেয়া হইবে না। 'অথ' কিছু নিশ্চয়ই আছে। রেডিওতে পর্য্যন্ত সব সময় কয় ঐ কথা, এল-শেপ। জীবন লইয়া যে-হানে কথা, না বুঝইয়া আমি করতেও রাজি না, ঢোকতেও রাজি না।

শেষে একজন বলিলেন, এল-শেপের অর্থ আমি জানি। শুনিলাম,

ট্রেঞ্চের দুইটা দিক থাকা দরকার। তাহার কারণ, যে দিকে সিঁড়ি সে দিকের মুখ খোলা থাকিবে। বোমা যদি সিঁড়ির কাছে কোনখানে পড়ে, তাহার স্প্লিন্টার ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকিবে। কাজেই যে দিকে সিঁড়ি তাহার অন্য দিকটা হইল নিরাপদ আশ্রয়। সেইজন্য ট্রেঞ্চটা ঐ রকম বাঁকা করিতে হয়।

আর একবার ধপাস করিয়া ভাবনার মধ্যে পড়িয়া গেলাম। কি করিয়াছি আমি? আমি তো লম্বা দিকের উপর সিঁড়ি করিয়াছি। নিরাপদ অংশে তাহা হইলে আমার জায়গা অনেক কম হইল। কি করি এখন? আবার খুলিয়া ফেলিব? সময় কোথায়?

স্বামীকে একদিন সমস্যার কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, খোল আবার সব।

বিশেষ ভরসা কিন্তু আমি পাইলাম না। রেঙ্গুনে তখন বোমা, শুধু বোমাপতন নয়, বোমাবর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। এখানেও যে কোন সময় আক্রমণ হইতে পারে। এ অবস্থায়, যেটুকু আশ্রয় যোগাড় হইয়াছে, তাহাও হঠাৎ ভাঙিয়া ফেলিতে সাহস করিলাম না। ভাঙিব যে, বাঁশ কাঠও কিনিতে বিশেষ পাওয়া যাইতেছে না। ভাঙিব তো, আবার বানাইব কি দিয়া?

গেল কয়দিন। খালি ভাবি আর ভাবি, কি করা যায়! শেষে একদিন আমার স্বামী বলিলেন, সব খুলে ফ্যালো, আবার ঠিক ক'রে কর। আমি কাঠ এনে দেব, খুঁটি তক্তা দুইই দেব, যত লাগে। তুমি একেবারে নতুন ক'রে আবার তৈরি কর।

আমি বাঙাল ভাষায়ই কথা বলি। তিনি সাহেব মানুষ, বলেন না। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বলিলাম, কাঠ পাবা কই?

তিনি বলিলেন, কোথায় নাকি অনেক কাঠ-তক্তা মজুত আছে, তাঁহার জিম্মায়। সেই কাঠ-তক্তা তিনি ব্যবহার করিতে পারিবেন, তাঁহার সে অধিকার আছে। আমি তখন বলিলাম, আচ্ছা, দেখা যাউক। তুমি তোমার কাঠ-তক্তা আনো, আমি দেখি কি কি এডার ডিফেক্ট। তারপর খুলুম।

তিনি কাঠ আনাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। আমি ইতিমধ্যে আমার ট্রেঞ্চের ত্রুটি কি কি আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে লাগিলাম। এ বিষয়ে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় সহায় হইয়াছিল 'Illustrated Weekly', রেঙ্গুনের নানা সময়ের নানা আকারের নানা প্রকার ট্রেঞ্চের ছবি তাহাতে বাহির হইতেছিল। প্রত্যেক ছবিতে, ট্রেঞ্চের পোজিশন, নিকটে পতিত বোমা ও তাহার স্প্লিন্টারের পোজিশন, ও রাস্তায় উপস্থিত লোকের পোজিশন দেওয়া থাকিত। কোন্ ট্রেঞ্চের কি ত্রুটি, এবং রেঙ্গুনে কোন্ ত্রুটির জন্য কোন্ রকম ক্ষতি হইয়াছে, তাহারও আলোচনা থাকিত। রেঙ্গুন হইতে তখন প্রত্যহ দলে দলে পলাতক আসিতেছে, কারণ এদিকে আসিবার রাস্তাটা আমাদের শহরের মধ্য দিয়া গিয়াছে। আমরা এই সকল প্রত্যক্ষদর্শী পলাতকের মুখ হইতেও অনেক বর্ণনা শুনিলাম। টোকিও-রেডিওতে এ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইত, তাহাও শুনিলাম।

দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলাম, আমরা যে ট্রেঞ্চ করিয়াছি, তাহা কি ভয়ানক রকম অকর্ম্মণ্য ও ত্রুটিপূর্ণ। তখন সকলে আবার প্ল্যান শুরু হইল, ট্রেঞ্চ নূতন করিয়া বানাইতে হইবে। কিন্তু তাহার অসম্ভব ব্যয়। উপরে স্যাণ্ড-ব্যাগ দিতে হইবে, রক্ষার ব্যবস্থাও যাহা আমরা করিয়াছি, তাহার চেয়ে অনেক মজবুত করা দরকার। বাজারে তখন কোন রকম কাঠ বা বস্তা বা টিন পর্য্যন্ত কিনিতে পাওয়া যায় না। অল্পসল্প যা ছিল, সব গভর্মেণ্ট দখল করিলেন, পাব্লিক তাহার কিছুই

পাইল না। প্রাণ বাঁচাইতে হইলে আমাদের ট্রেঞ্চগুলি মেরামত করা দরকার, সেটা সকলেই প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছি; কিন্তু 'র মেটিরিয়াল' তথা কুলি-মজুরের অভাবে কেহই কিছু করিতে পারিতেছি না। তাহার আগের কুড়ি-বাইশ দিনের মধ্যে ওখান হইতে বাহিরে বা বাহির হইতে ওখানে কোন মেল যায় নাই। মালপত্র সবই আসে বাহির হইতে। এদিকে, বোমার নামে কতক, আহত 'ইভাকুই'দের চেহারা দেখিয়া কতক, লোক পলাইতে আরম্ভ করিল। এবং প্রথমেই পলাইল শহরের যত ধোপা নাপিত ও দিনমজুর কুলি, যাহাদের শহরে কোন ভেস্টেড ইন্টারেস্ট নাই, কাহারও সঙ্গে বাধ্য-বাধকতাও নাই। মজুরির হার বহুগুণ চড়িয়া গেল, তাহা দিয়াও লোক পাই না। কাজেই ট্রেঞ্চ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা যখন আমরা অর্জ্জন করিলাম, তখন সেটা কার্য্যে পরিণত করাই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। অনেকেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। আরও হতাশ হইলেন আর কিছুদিন পরে, যখন আরও একটা নূতন সমস্যার কথা মনে হইল—বর্ষা। ওখানকার বর্ষা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। সকলেরই ভাবনা হইল, যতই কেন করি, তিন মাস পরে বর্ষা আরম্ভ হইবে, তখন এই আণ্ডার-গ্রাউণ্ড শেল্টারের অস্তিত্বও থাকিবে না। যাঁহারা একটু বিচক্ষণ তাঁহারাও বলিবেন, এটাকে আর মেরামত না করিয়া বরং আর একটা পাকা ট্রেঞ্চ করা হউক—এখনও চলিবে, বর্ষায়ও টিকিবে। কিন্তু বাজারে সিমেণ্ট কিনিতে পাওয়া গেল না। কাজেই পাকীপন্থীরা চুপ করিয়া গেলেন। আমরাও মজুর না পাইয়া বসিয়া থাকিলাম।

ইতিমধ্যে আমি প্রায় প্রত্যহই ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকিয়া (সাইরেন বাজার সময় নয়) মধ্যটা দেখিতাম, আর ভাবিতাম, কি করিয়া এটাকে আর একটু বাসোপযোগী করা যায়। কখন এবং কতক্ষণ এখানে

থাকিতে হইবে কে জানে। এই পরীক্ষার সময় একদিন দেখিতে পাইলাম, উপরে বালি কিছু বেশি দেওয়ার ফলে একটা আড়া কাটিয়াছে, আর কিছু ভার পড়িলেই একেবারে পড়িয়া যাইবে ছাদসুদ্ধ। তখন আর বিলম্ব করিতে পারি না। পরের দিন বেশি মজুরি দিয়াই মজুর ডাকিলাম। ডাকিয়া ভাবিলাম, যখন খুলিতেছি, তখন এবার এমন করিয়া করিব যেন আর কোনও দোষ না থাকে। তখন একটু দেখি, একটু করি, আবার ভাঙি, আবার গড়ি, আবার ভাঙি, এই রকম করিয়া দিন সাতেক পরে ট্রেঞ্চ সারা হইল। সে ট্রেঞ্চের মধ্যে ঢুকিয়া বসিতে পারিলে প্রাণ বাঁচিবে আশা হইল। ডিফেক্ট ও রেমিডির তালিকা পরে দিতেছি।

ট্রেঞ্চ সারা করিয়া ভাবিলাম, এবার একবার এটার মধ্যে ঢুকিয়া সবটা পরিষ্কার করিতে হইবে, বসার জন্যও কিছু একটা পাতিতে হইবে। অনেকেই ঐ বাঁশের বেড়া পাতিয়াছিলেন। আমি পাতি নাই, কারণ ভাবিয়া দেখিলাম, চেরা বাঁশের উপরে বসা খুব আরামপ্রদ হইবে না। আমার চিন্তাধারা ঘুরিত আমার স্বামীকে কেন্দ্র করিয়া। ভাবনা ছিল, আমি তো শুধু না, সাইরেন বাজিলে তাঁহাকেও ইহার মধ্যে আশ্রয় লইতে হইবে, কাজেই আমি তো যেন তেন প্রকারেণ করিতে পারি না। ইতিমধ্যে আমার কাঠ-তক্তা অনেক আসিয়া গেল। ট্রেঞ্চের তলায় আমি প্রথমে আগাগোড়া তক্তা পাতিলাম, তাহার উপর কয়েক প্রস্থ চাটাই বিছাইয়া দিলাম। ইহার উপর সময়কালে একটা শীতলপাটি বিছাইলেই বেশ মোলায়েম হইবে, বসিতেও কষ্ট হইবে না।

এবার উপর, মানে ছাদ। নির্দ্দেশ ছিল, ছাদের উপর স্যাণ্ড্‌ব্যাগ দিতে হইবে দুই পুরু করিয়া। অর্থাৎ বালিপূর্ণ বস্তা একটার পাশে

একটা রাখিয়া সমস্ত জায়গাটা ঢাকিয়া দিতে হইবে। তাহার উপরে আর এক সেট দিতে হইবে, দ্বিতীয় সেটের জোড় লাইনগুলা প্রথম সেটের বস্তার মাঝখান বরাবর থাকিবে। ব্যাগের উদ্দেশ্য, যদি ট্রেঞ্চের উপরে বোমা পড়ে, বালি যেন তাহাকে ঠেকাইতে পারে। একটু ভারী বোমা দুই ফুট পর্য্যন্ত মাটি-বালি ভেদ করিয়া মধ্যে ঢুকিয়া যায়। কাজেই বালি দুই ফুটেরও বেশি উঁচু করিয়া লইতে হইবে। সেইজন্যই দুই সেট বস্তা দরকার। আমি বস্তা দিলাম না। বস্তার অসম্ভব দাম, তাহাও কিনিতে পাওয়া কষ্টকর। তাহা ছাড়া ভাবিলাম, দুইটা বস্তার মধ্যে যেটুকু ফাঁক থাকে, ঝুরা বালি ঢালিয়া দিলে তো তাহাও থাকিবে না। আমি বালি ঢালিয়া দিলাম, মাঠ হইতে হাত তিনেক উঁচু করিয়া।

তাহার পর থাকিল চেহারা। এল-শেপ একটু জিনিস যদি প্রত্যেক বাড়ির মাঠের মধ্যে দেখা যায়, সন্দেহ সেখানে হওয়ারই কথা। বালি দিবার সময় আমি এল-এর কোণা ভাঙিয়া চতুষ্কোণ করিয়া দিলাম। (আমি অবশ্য মধ্যেও এল-শেপ রাখি নাই।) মাঠ হইতে পৃথক করিয়া না বুঝা যায়, এইজন্য অনেকেই উহার উপর নূতন ঘাস বা ফুলগাছ বসাইয়া দিলেন। বাম্মিজরা ফুল খুব বেশি পছন্দ করে। তাহাদের প্রত্যেকেরই বাড়ির সামনে নূতন একটি এল-শেপ বাগান শোভা পাইতে লাগিল। রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়া প্রত্যেক বাড়িতে একই চেহারা, আমারই মনোযোগ আকর্ষণ করিল। কাজেই মত বদল করিলাম, ফুলগাছ লাগাইব না। পেঁয়াজ লাগাইব, লাউ-কুমড়াগাছ তুলিয়া দিব।

আবার বিপদ, এততেও হইল না। খবর আসিল, রেঙ্গুনে ট্রেঞ্চের মধ্যে সাপ ঢুকিয়া পাঁচ-ছয়জনকে কামড়াইয়াছে। সর্ব্বনাশ, এখন

কি করি? মাঠের মধ্যে ট্রেঞ্চ, সাপ তো সব সময়েই ঢুকিতে পারে। আমারও কখন ঢুকিতে হইবে তাহার ঠিক নাই। আগে গিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা সাইরেনের সময় সম্ভব নয়। ইহার পর হইতে আগের মত যখন তখন হুট করিয়া ঢুকিয়া যাইতে ভয় করিতে লাগিল। অনেক শব্দ-টব্দ করিয়া টোকাটাকা দিয়া তবে ঢুকিতাম। তারপর একদিন কতকগুলি ইট সংগ্রহ করিলাম। মধ্যে যে তক্তা পাতিয়াছিলাম, তাহা আবার তুলিলাম। মাঝে মাঝে আস্ত ইট বসাইয়া দিয়া তাহার উপরে তক্তা আবার পাতিলাম, মাটি হইতে আঙুল আস্টেক উঁচু হইল। ইহাতে লাভ হইল এই, সাপ যদি ট্রেঞ্চের মধ্যে থাকে, তক্তার নীচে লুকাইতে পারিবে। আমি যদি তাহার ঘাড়ে পা না দিয়া ঢুকিয়া পড়িতে পারি, তারপর ধীরে-সুস্থে লঙ্কা পোড়াইবার বা কার্বলিক অ্যাসিড ঢালিবার সময় পাইব।

আমার ট্রেঞ্চ সম্পূর্ণ হইল। বাকি থাকিল তাহার শেপ, সিঁড়ি ও দরজা। এটা আমার নিজস্ব ট্রেঞ্চ, ইহার গঠনপ্রণালী ও ইঞ্জিনিয়ারিং আমার নিজের। ট্রেঞ্চ সম্বন্ধে আমার ধারণা কোন কালেই ছিল না, নিজের বুদ্ধিমত যেমন বুঝিয়াছি, করিয়াছি। ইহার ত্রুটি যদি কাহারও চোখে ধরা পড়ে, তাহা যেন দেখাইয়া দেন। লোকের হয়তো কাজে লাগিবে।

আমার ট্রেঞ্চের শেপ এল নহে, ডবলুও নহে। কলিকাতার মত উঁচু সাদা বর্ডার লাইন আমার ট্রেঞ্চে নাই। রেঙ্গুনের মত খোলাও নহে। বাম্মিজদের ট্রেঞ্চের মত এল-শেপ কলাবতী * ফুলের বাগান আমার নাই।

আমার ট্রেঞ্চ প্রথমে ছিল এল-শেপ, খোলা। তারপর রৌদ্রের

* সর্ব্বজয়া।

জন্য করিলাম শেড। লম্বা আড়া কয়েকটা দিয়া, চাটাই দিয়া, উপরে বালি দিলাম হাতখানেক উঁচু করিয়া। সিঁড়ি থাকিল খোলা। তারপর শুনি, বোমা দুই ফুট বালি ভেদ করিবে, কাজেই বালি আরও দেওয়া দরকার। দিতে লাগিলাম। খানিক দেওয়ার পরে আড়া ভাঙিল। আবার খুলিয়া ফেলিলাম। খুলিয়া এবার জায়গা কিছু বাড়াইলাম সেফ সাইডে—এল-এর গায়ে পর পর আরও গোটা দুই এল জুড়িয়া দিলাম। চওড়াটা খবরের কাগজের মাপ হইতে বাড়াইতে পারিলাম না। অথচ পাশে বেড়া দাঁড় করানোর ফলে খাতটা আরও সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল। আর এক আশঙ্কা মাথায় ঢুকিল, সামনে বোমা পড়িলে, স্প্লিন্টারের হাত হইতে বাঁচিতে হইবে সেফ সাইডে যাইয়া, কাজেই সেফ সাইড একটা নয়, অনেকগুলা করিয়াছি। কিন্তু বোমা যদি গর্ত্তের মুখে পড়ে বা পাশে পড়ে, পাশের মাটি ভাঙিয়া যদি দরজা বন্ধ হইয়া যায়, বাহির হইব কি করিয়া? নিজের কবর কি নিজেই কাটিলাম? আবার ভাব। শেষে অন্য প্রান্তেও একটা সিঁড়ি করিলাম। দুইটা দরজা হইল। দুইটা সিঁড়ি হইল। ছাদ করিলাম আগাগোড়া, সিঁড়ি বাদে। তখন দেখিলাম, মধ্যটা বড় অন্ধকার। দুইটা পথ হইল সত্য, দম বন্ধ হইয়া মরিব না, কিন্তু জায়গাটা বড় সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকার। তখন ঐ জিগ্‌জাগের জিগ বাদে জাগটা অথবা জাগ বাদে জিগটা কাটিয়া ফেলিলাম, দুই পাশের দুইটা বাহু ও তাহার পাশের দুই বাহুর আধা-আধি ঠিক রাখিয়া, তাহার মধ্যের পাশাপাশি কোণ দুইটা কাটিয়া মিশাইয়া দিলাম। এবার দুই পাশের দরজা দুইটার ব্যবধান কমিল, মধ্যে আলো পাওয়া গেল, সকলের উপরে এমন একটু জায়গা পাওয়া গেল যেখানে দরকারমত দুই-তিনজন লোক বসিয়া অন্তত কিছু টিফিন

খাইতে পারে, স্টোভ থাকিলে চা করিতে বসিতেও কোন অসুবিধা হয় না। এই কামরার এক পাশে ছাদের বাঁশ একটু উঁচু করিয়া সেই ফাঁকে একটা বাঁশের চোঙা উপর পর্য্যন্ত চালাইয়া দিলাম। চোঙার মুখটা রহিল পাশের ঝোপের মধ্যে লুকানো। ইহাতে উপর হইতে চোঙাটা দেখা যাইবে না; ট্রেঞ্চের দুই মুখও যদি একবারে ভাঙে, তবু চোঙা দিয়া কিছু হাওয়া পাওয়া যাইবে, দমবন্ধ হইয়া মরিবার ভয় রহিল না।

এবার সিঁড়ি। সিঁড়ি হইল তিন ধাপ, তৃতীয়টার প্রান্ত পর্য্যন্ত ছাদ বিস্তৃত। দেখিলাম, এ সিঁড়ি হইতে মধ্যে ঢুকিতে হইলে প্রায় নমাজ পড়িতে হয়, উপুড় হইয়া একেবারে পড়িয়া যাওয়ার সুবিধাও খুব বেশি। তখন ছাদটা আবার খানিক কাটিয়া পিছনে সরাইলাম, সিঁড়িটাও আরও কাটিয়া নীচের খাদের সঙ্গে সমান করিয়া মিলাইয়া দিলাম। তখন নামিবার ব্যবস্থা হইল, সিঁড়ি দিয়া নামিয়া নীচের খাদে দাঁড়াও, তারপর মাথা নীচু করিয়া হাঁটিয়াই মধ্যে ঢুকিতে পারিবে, ঠিক আমাদের পূর্ব্ববঙ্গের নৌকার (সাম্পান নহে) ছইয়ের মত। আবার সমস্যা দেখা দিল। সিঁড়ির মুখ ও খাদ বড় করিতেই দেখা গেল, সে প্রকাণ্ড গর্ত্ত উপর হইতে লুকাইবার নয়।

কয়েকজন বাঙালী পাইলট একদিন আমাদের বাসায় বেড়াইতে আসিলেন। উদ্দেশ্য কিছুই নয়, বাঙালী শুনিয়া বেড়াইতে আসিলেন। তাঁহাদের কাছে শুনিলাম, রাস্তায় মানুষের হাঁটা-চলা, ছুটাছুটি করিয়া ট্রেঞ্চে ঢোকা, ট্রেঞ্চের উপর এল-শেপ ফুলবাগান, সমস্তই উপর হইতে দেখা যায়। বুঝিলাম, সিঁড়ির ঢাকনা একটা করা দরকার। কি দিয়া করা যায়? দরজার উপরে চাপা না পড়িয়া যায়, তাহাও তো দেখিতে হইতে হইবে। প্ল্যান করিলাম, দোকানের

ঝাঁপের মত বাঁশ দিয়া ঝাঁপ তৈরি করিব, মধ্য হইতে বাঁশ দিয়া যেন তুলিয়া ধরা যায়।

পরদিন আবার মজুর ডাকিতে পাঠাইলাম। অতিরিক্ত মজুরি দিয়াও তাহাদের পাত্তা পাওয়া গেল না। তখন ঠিক করিলাম, নিজেই তৈরি করিব। চাকরচন্দ্রকে রিহার্সাল দিয়া যথাসাধ্য ঠিক করিয়া লইলাম। সে ভূতটা জানে না কিছুই, বাঁশের কোন কাজ কোন দিন করে নাই। আমিও যে খুব ওস্তাদ ডোম তাহা নয়, তবু দরকার যখন পিটাইয়া কোপাইয়া খাড়া একটা করিতে পারিতামই। চাকরের যা বিদ্যা, তাহাকে লাগাইয়া দিলেও আসলে করিব আমিই, সে নিমিত্ত মাত্র। কিন্তু ভাগ্য প্রসন্ন ছিল, দা আর হাতে লইতে হইল না। পরের দিন কুলি আসিয়া হাজির হইল। কাজ তাহারা করিল, আমিই অবশ্য ডিরেক্‌শন দিলাম। দুইটা দরজার জন্য দুইটা ঝাঁপ করা হইল। ট্রেঞ্চের মধ্যে আমার হাতে থাকিবে বাঁশের লগি, তাহা দিয়া ঠেলিয়া আমি ঝাঁপ খুলিতে পারিব। আবার ফ্যাসাদ—মাঠের সঙ্গে, ট্রেঞ্চের সঙ্গে, ঝাঁপের রং মিলিল না। একটা চারকোণা জায়গার দুই কোণে দুইটা ঝাঁপ দেখা গেলে সেটা সন্দেহজনক নিশ্চয়ই। তখন বালতিতে করিয়া জলে কাদায় গুলিয়া, ঝাঁপকে রেশ একমেটে, দুইমেটে ও তিনমেটে করিয়া লেপিয়া মাঠের সঙ্গে তাহার রং মিলাইয়া দিলাম, ওজনও বিশেষ বাড়িল না।

যেদিন শেষ হইল, তাহার দিন কয়েক পরেই দেখা গেল, এখানে টিকিয়া থাকা আর সম্ভব হইবে না। তখন স্বামীকে বলিলাম, 'তুমি এডার মধ্যে বইও।' বলিয়া আমি স্টীমারে চড়িয়া ভু—উ—স করিয়া পলাইয়া আসিলাম।

"শ্রীমতী"

সরোজিনী

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

হারাণ পিছনে দাঁড়াইয়া সরোজিনীর দিকে, হঠাৎ সামনে কিছু একটা দেখিলে যেমন করিয়া লোকে তাকায়, ঠিক তেমনই করিয়া তাকাইয়া রহিল। কিন্তু হারাণের দোষ কি? গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে যেদিন প্রথম সরোজিনীকে দেখিয়াছিলাম, হয়তো অমনই করিয়া তাকাইয়া ছিলাম। যাহাকে এতটুকু কুঁড়ি অবস্থায় দেখিয়াছেন, তাহাকে যদি হঠাৎ রূপ-রস-গন্ধ-বর্ণ-প্রাচুর্য্যে সহস্রদল-মেলা বিকশিত অবস্থায় চোখের সামনে হাজির হইতে দেখেন, তাহা হইলে আপনারাও আমাদের মত এমনই করিয়াই তাকাইয়া থাকিবেন। তবে হারাণের মত বেহুঁশ হইয়া তাকাইবেন না। একটুখানি হুঁশ রাখিবেন।

মণীন্দ্র কহিল, তোমার মাস্টার এসেছে যে।

সরোজিনী পরম আত্মীয়তার সুরে কহিল, তাই নাকি! কই? আগাইয়া আসিতেই আমাকে দেখিতে পাইয়া একেবারে আমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া ঠিক নিজের ছোট বোনের মত আবদারের সুরে কহিল, দাদা, অন্ধকারে সকলের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন যে? কহিলাম, বাড়ি যাচ্ছিলাম, দারোগাবাবু ধ'রে নিয়ে এলেন।

সরোজিনী দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিল, ওঃ! তাই নাকি! না হ'লে আসতেন না!—বলিয়া কৃত্রিম অভিমানে অধর স্ফুরিত করিল। মণীন্দ্র দারোগাবাবুকে কহিল, আসুন আসুন, ওরা আসছে পরে। দারোগাবাবু এতক্ষণ সরোজিনীর দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তাহার রূপ-সুধা পান করিতেছিলেন, অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্থান ত্যাগ করিলেন। রহিলাম আমি, হারাণ আর সরোজিনী।

মণীন্দ্র বাড়ির ভিতর হইতে হাঁক দিয়া কহিল, মাস্টারকে ধ'রে নিয়ে এস।

সরোজিনী আমার ডান হাতটা ধরিয়া কহিল, চলুন। কহিলাম, একজন ভদ্রলোককে নেমন্তন্ন করেছ, তার মধ্যে আমার যাওয়াটা—

সরোজিনী বাধা দিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, আপনাকে আবার নেমন্তন্ন করতে হবে নাকি? কহিলাম, তাই বলছি নাকি! কতদিন খেয়ে গেছি যে! তবে আজ শরীরটা খারাপ, রাত্রে কিছু খাব না ভাবছি, আজকের দিনটা আমাকে রেহাই দাও।

সরোজিনী শান্তকণ্ঠে কহিল, বেশ, না খান তো ওখানে গিয়ে বসবেন চলুন।

হারাণকে দেখাইয়া কহিলাম, একে চেন না?

সরোজিনী ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না তো!

কহিলাম, আমাদের হারাণ, ঐ যে পদ্ম, তার দাদা।

সরোজিনী এক মুহূর্তে মুখ আঁধার করিয়া কহিল, চিনতে পেরেছি। উনি আমায় আপনার লোক, কিন্তু কোন দিন তো খবর নেন না। বরং বোনকে পাঠিয়ে অপমান করান।

হারাণ প্রতিবাদ করিয়া কহিল, কই, না।

সরোজিনী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিতে লাগিল, ওঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমার সম্পর্কে দিদি; তাঁর মা আমার খুড়ীমার সাক্ষাৎ খুড়তুতো বোন। তাঁকে নিজের চোখে কোন দিন দেখি নি, বিয়ের সময়ে মার কাছে তাঁর কথা শুনেছিলাম। কিন্তু আর দেরি করবেন না, ওঁরা সব ব'সে রয়েছেন, আসুন। আপনিও আসুন হারাণবাবু।

হারাণ টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, আমাকে আর কেন? মানে, আমার আবার একটুখানি কাজ—

সরোজিনী কহিল, কাজ থাক; আপনাকে আসতেই হবে। না হ'লে ছোট শালী, জানেন তো! এমন ক'রে টেনে নিয়ে যাব যে—। বলিয়া হাত বাড়াইবার উপক্রম করিতেই হারাণ শশব্যস্ত হইয়া কয়েক পা পিছাইয়া কহিল, না না, যাচ্ছি।

উঠানে চেয়ার ও টেবিল পাতিয়া, বসিবার ও বোধ হয় খাইবারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। টেবিলটি একটি ধবধবে সাদা টেবিল-ক্লথ দিয়া ঢাকা। তাহা ছাড়া একটি টুল ও একটি বেঞ্চি রহিয়াছে। ইতিমধ্যে দারোগাবাবু একটি চেয়ার দখল করিয়াছেন; মণীন্দ্র লণ্ঠনটি টেবিলের

উপরেই রাখিয়া পাশে দাঁড়াইয়া আছে; লছমন সিং অদূরে টুলে উপবিষ্ট। আমাদিগকে দেখিয়া দারোগাবাবু কহিলেন, বসুন আপনারা। হারাণবাবু, আসুন, বসুন এখানে।—বলিয়া নিজের পাশের চেয়ারটা দেখাইলেন। হারাণ আসিয়া চেয়ারে বসিল, আমিও আর একটা চেয়ারে বসিলাম। দারোগাবাবু মণীন্দ্রকে কহিল, আপনি দাঁড়িয়ে থাকলেন কেন?

মণীন্দ্র সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে, আজ্ঞে, আমার কি বসলে চলে? এত বড় অতিথি আমার বাড়িতে!—বলিয়া সরোজিনী ও তিনকড়ির পাছু-পাছু রান্নাঘরের দিকে চলিল। চেয়ার হইতে উঠিয়া ডাক দিয়া কহিলাম, মনুদা, শোন।

মণীন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কি?

উঠিয়া কাছে গিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলাম, আমাকে খেতে-টেতে দিও না।

মণীন্দ্র প্রবল বেগে ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, পাগল নাকি!

ত্রস্তকণ্ঠে কহিলাম, চুপ কর, আস্তে কথা বলতে জান না নাকি?

মণীন্দ্র মৃদুকণ্ঠেই কহিল, কি, বল?

কহিলাম, আমি কিছু খাব না, শরীর খারাপ, সরোজিনীকে বলেছি। হারাণকেই শুধু খেতে দাও দারোগাবাবুর সঙ্গে।—বলিয়া চক্ষের ইঙ্গিতে উদ্দেশ্যটা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম।

মণীন্দ্র বুঝিয়া, পুলকিত হইয়া কহিল, ঠিক, হেরোকে জব্দ করতে হবে, কিন্তু তুমি কিছুই খাবে না, দুখানা লুচি আর মিষ্টি—

কহিলাম, না না, থাক, পরে একদিন খাব এখন।

কাছে আসিতেই দারোগাবাবু বলিলেন, কি কথা হচ্ছিল?

কহিলাম, শরীরটা খারাপ কিনা, তাই আমার জন্যে খাবার আনতে মানা ক'রে দিলাম। শুধু হারাণের জন্যে—

হারাণ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল, বাঃ রে! আমারও পেটের অসুখ, কদিন কিছু খাচ্ছি না।

কহিলাম, তোমার আবার পেটের অসুখ হ'ল কখন? এই তো সকালে তেলে-ভাজা খাচ্ছিলে দোকানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। এটি হারাণের

অনেকদিনের অভ্যাস, আজ অবশ্য চোখে দেখি নাই, আন্দাজে ঢিল ছুঁড়িলাম।

হারাণ বলিয়া উঠিল, তেলে-ভাজা তো সকালে খাই, রাত্রে কিছু খাই না।

দারোগাবাবু হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, হারাণবাবুর জাতটা নেহাত গেল দেখছি আজ, ম্লেচ্ছের পাশে ব'সে—

হারাণ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, সে কি হুজুর? আপনার থানায় ব'সে কতদিন খেয়েছি যে!

দারোগাবাবু গম্ভীর মুখে কহিলেন, সে কবে কি খেয়েছেন মনে নেই।—বলিয়া কৃত্রিম অভিমানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

হারাণ কহিল, বেশ, আজও খাব তা হ'লে। মাস্টার ব'লে দাও। হাঁকিয়া মণীন্দ্রকে জানাইয়া দিলাম।

তিনকড়ি ও মণীন্দ্র দুইজনে খাদ্যদ্রব্য আনিয়া হাজির করিল। হরেক রকমের খাবার, লুচি, তরকারি, মাংসের কালিয়া, চপ, কাটলেট, ক্ষীর, সন্দেশ, দই ইত্যাদি। বুঝিলাম, সরোজিনী সব নিজহস্তে তৈয়ারি করিয়াছে। না হইলে ফুন্টি—অনেক খাবার জীবনে দেখে নাই, তৈয়ারি করিবে কি!

হারাণ করুণ চক্ষে আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, মাস্টার, তা হ'লে খাই। অসুখ-বিসুখ হ'লে খবর নিও।

মনু কহিল, কিছু ভয় নেই, অসুখ কেন, ম'লেও খবর নেবার লোকের অভাব হবে না। তিনকড়ি সব ভার নেবে বলেছে।

হারাণ তাহার দিকে কটমট করিয়া তাকাইল।

দারোগাবাবুও আশ্বাস দিয়া কহিলেন, কিছু ভয় নেই হারাণবাবু। সরোজিনী দেবীর নিজের হাতে তৈরি খাবার খেয়ে ম'লেও স্বর্গে যাবেন। সরোজিনী আসিয়া কাছে দাঁড়াইল।

দারোগাবাবু সসম্মানে কহিলেন, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

মণীন্দ্র শশব্যস্ত হইয়া কহিল, ব'স তুমি, দারোগাবাবু এত ক'রে বলছেন। আমাকে কহিল, তুমিও ব'স না মাস্টার। দুইজনে বসিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, সব সরোজ নিজের হাতে রেঁধেছে।

দারোগাবাবু ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, তা আর বলতে হবে না, জিবে টের পাচ্ছি, তাই তো হারাণবাবুকে বলছিলাম।

সরোজিনী মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি?

দারোগাবাবু কহিলেন, উনি খেতে ভয় করছিলেন।

সরোজিনী শ্লেষের সহিত কহিল, ভয় কিসের হারাণবাবু? দারোগাবাবু খাচ্ছেন। তবে জাত যাবার ভয় হতে পারে বটে, আমরা তো জাতে পতিত কিনা।

হারাণ ভরাট মুখে কহিল, না না। পেটে হাত দিয়া জানাইল, অসুখ।

কহিলাম, অসুখ তো বটে, সাঁটছ তো মন্দ নয়। তিনকড়ি হাসিয়া উঠিল। হারাণ তাহার দিকে কটমট করিয়া তাকাইতেই তিনকড়ি হাসি বন্ধ করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

দারোগাবাবু কহিলেন, মাস্টার মশায়ের কিন্তু দেরি হয়ে যাচ্ছে, ওঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। সরোজিনী আমার মুখের দিকে সপ্রশ্ন মুখে তাকাইতেই দারোগাবাবু কহিলেন, উনি বাড়ি থেকে রাগ ক'রে এসেছেন, হারাণবাবু ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

সরোজিনী কহিল, তাই নাকি! বউদিদির সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে? তা হ'লে আজ বোনের বাড়িতেই রাতটা কাটিয়ে যান দাদা। বউদিদি একটু জব্দ হোক।

দারোগাবাবু বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, মাস্টার মশায় আপনার দাদা নাকি?

ঘাড় নাড়িয়া ছেলেমানুষির স্বরে সরোজিনী কহিল, হুঁ, নিজের দাদার চেয়েও ঢের দেশি। হারাণ খাওয়া বন্ধ করিয়া সরোজিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া তাহার কথা শুনিতেছিল। সরোজিনী তাহার দিকে তাকাইতেই মুখ নামাইয়া আবার খাইতে শুরু করিল।

সরোজিনী তাহার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, হারাণবাবুও আমার দাদা, আমার জামাই-দাদা।

দারোগাবাবু অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিলেন, সত্যি! তবে যে হারাণবাবু আপনার বিপক্ষদলে দাঁড়িয়েছেন!

হারাণ কহিল, আজ্ঞে, আমি তো কোন দলে নেই। লছমন সিং এতক্ষণ নির্ব্বাকভাবে সব শুনিতেছিল; সে এখানে বসিয়া কিছু খাইতে রাজি হয় নাই, বাড়ি যাইবার সময় কিছু লুচি ও মিষ্টি সঙ্গে লইয়া যাইবে; হারাণের কথা শুনিয়া স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, হারাণবাবু সব দলেই আছেন।

হারাণ কাঁচুমাচু মুখে চুপ করিয়া রহিল। সরোজিনী কথাটা চাপা দিয়া কহিল, ওঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী আমার দিদি, আমার খুব আপনার লোক উনি।

দারোগাবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, সবাই আপনার নিজের লোক দেখছি, আমিই শুধু পর।

মণীন্দ্র কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। সরোজিনী কি কথা বলিতে যাইতেছিল, তাহার কথা লুফিয়া লইয়া কহিল, আপনি আমাদের সকলের চেয়ে আপনার। যা করেছেন আপনি! আপনি না থাকলে সব এতদিন ভূত-ভোজন হয়ে যেত।

সরোজিনী কহিল, সত্যি, আপনি না থাকলে, কি যে হ'ত আমার! হয়তো—। বলিতে বলিতে কণ্ঠ অশ্রুজড়িত হইয়া উঠায় বক্তব্য শেষ করিতে না পারিয়া, বোধ করি, অশ্রু গোপন করিবার জন্য মাথা নত করিল।

দারোগাবাবু তাহার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া বীরবিক্রমে বলিয়া উঠিলেন, আপনি কিছু ভাববেন না, আমি সব এমনই ঢিট ক'রে দিয়ে যাব যে, আপনি এখানে না থাকলেও, আপনার জমিদারি ঠিকমত চ'লে যাবে।

সরোজিনী নত-মস্তকে থাকিয়াই কোনমতে কহিল, আপনার দয়া।

মণীন্দ্র আগাইয়া আসিয়া যুক্তহস্তে কহিল, তাই ক'রে দিন দারোগা-বাবু। সরোজিনী যদি কখনও তীর্থে-টীর্থে গিয়েও থাকে, তা হ'লে যেন আমি একাই জমিদারি চালিয়ে দিতে পারি।

খাওয়া-দাওয়ার পর দারোগাবাবুর সঙ্গেই আমরা বাহির হইয়া আসিলাম। সরোজিনীও বিদায় দিবার জন্য রাস্তা পর্য্যন্ত আসিতে উদ্যত হইয়াছিল।

দারোগাবাবু তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন, থাক থাক, আপনাকে আর যেতে হবে না। এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। আপনার হাতের খাবার খাইয়ে লোভ বাড়িয়ে দিলেন আজ। হয়তো মাঝে মাঝে বিরক্ত করতে আসব।

মণীন্দ্র কহিল, বিরক্ত! বলেন কি? আপনার পায়ের ধুলো পড়লে কৃতার্থ হয়ে যাব আমরা।

কায়দামত বিদায় লইয়া দারোগাবাবু কহিলেন, মাস্টার মশায়, আর দেরি করবেন না। হাসিয়া কহিলেন, হারাণবাবু আজ ম্লেচ্ছের সঙ্গে ব'সে খেয়েছেন, খবরটা গাঙুলী মশায়কে দিয়ে দেবেন।—বলিয়া চলিয়া গেলেন।

মণীন্দ্রর কাছে বিদায় লইয়া চলিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় তিনকড়ি আসিয়া খবর দিল, দিদি ডাকছেন। প্রশ্ন করিলাম, কাকে? তিনকড়ি হারাণের উদ্দেশে চক্ষের ইঙ্গিত করিল।

হারাণ সবিস্ময়ে কহিল, আমাকে?

তিনকড়ি চলিয়া যাইতে যাইতে কহিল, হুঁ।

হারাণ পুলকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, দাঁড়াও হে মাস্টার, কি বলছে শুনে আসি, যাই হোক শালী তো!—বলিয়া চলিয়া গেল।

অন্ধকারে একা দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিন্তু মনের কোণে একটি ছোট ঈর্ষার কাঁটা খচখচ করিতে লাগিল। আমি যে অছিলা করিয়া খাইলাম না, তাহা বুঝিয়াও সরোজিনী আমাকে আর একবারও খাইতে অনুরোধ করিল না, আর ওদিকে হারাণকে পেট পুরিয়া খাওয়াইয়াও আবার ডাকাডাকি! আজ আমার চেয়েও হারাণ হইল তাহার আপনার! অথবা ইহা হয়তো সরোজিনীর চাল। স্নেহ-শ্রদ্ধা কিছুই সে কাহাকেও করে না, যাহা করে তাহা স্বীয় কার্য্যোদ্ধারের জন্যই করে। দারোগার সামনে অভাগিনী অসহায়া বিধবাসুলভ অশ্রুছলছল ভাব, আমার বুকের কাছে ঘেঁষিয়া ছোট বোনের মত আদুরে আবদার, এবং হারাণের সঙ্গে শ্যালিকাসুলভ সরস আত্মীয়তা, সবই তাহার পোজ। দ্রুতপদে হারাণ আসিয়া হাজির হইল। মুখের ভাব দেখিয়া মনে হইল, যেন রাজ্য-জয় করিয়া ফিরিতেছে। কহিলাম, কি বললে হে?

হারাণ গম্ভীর মুখে কহিল, ওসব গোপন কথা। কাউকে বলতে মানা করলে।

চুপ করিয়া গিয়া চলিতে শুরু করিলাম; কিছুক্ষণ পরে কহিলাম, সরোজিনীকে ওর শাশুড়ীর কথা কিছু বললে? হারাণ চিন্তা-সাগরে বোধ করি ডুব-সাঁতার দিতেছিল; হঠাৎ মাথা তুলিয়া কহিল, কি? বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করিলাম।

হারাণ কহিল, পাগল নাকি! আমি তোমাদের ওসবের মধ্যে আর নেই।—বলিয়া আবার ডুব দিল। আবার ডাক দিয়া কহিলাম, গাঙুলী মশায়কে কি বলবে? হারাণ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ইঃ, সমস্ত শরীরটা এখনও সিরসির করছে মাইরি! থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, কি হ'ল হে?

হারাণও থামিয়া কহিল, সে এক ব্যাপার! কাউকে না বল তো বলি।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, পাগল! আমি তোমার কোন কথা কাউকে কখনও বলেছি?

হারাণ আমার হাত ধরিয়া রাস্তার এক পাশে টানিয়া লইয়া গিয়া কহিল, তবে শোন, তিনকড়ির পিছুপিছু তো গেলাম, গিয়ে দেখি মণীন্দ্র খেতে বসেছে, কিন্তু সরোজিনী নেই। তিনু বললে, বোধ হয় ওপরে আছেন। মনুও বললে, ওপরে আছে, যাও। আমি দোতলায় গেলাম, প্রথম ঘরটা তালাবন্ধ, মাঝের ঘরটা দেখি খোলা, কিন্তু অন্ধকার, ভেতরে ঢুকতেই কে বললে, কে? আমি বললাম, আমি হারাণ। সরোজিনী বললে, আপনি জামাইবাবু! তারপর—ওঃ, এখনও গাটা কেমন করছে! সরোজিনী আমার গায়ে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, জড়িয়ে ধ'রে, বুকে মাথা রেখে চাপা গলায় কেঁদে উঠল, জামাইবাবু, আপনি দিদিকে একেবারে ভুলে গেছেন? অভাগিনী ছোট শালীটার দিকে একবারও তাকাচ্ছেন না? আমার যে আপনি ছাড়া এখানে সত্যিকার আপনার বলতে কেউ নেই জামাইবাবু! কি ব্যাপার দেখ দেখি ভাই! আমি তো কোনমতে ছাড়িয়ে—

হারাণের উপর কেন যেন রাগ হইয়া গেল, কড়া গলায় কহিলাম, মিথ্যে কথা। তুমি ছাড়াবার চেষ্টা কর নি।

হারাণ টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, তা করি নি, ওই নিজে ছেড়ে দিয়ে, সামনে দাঁড়িয়ে মুখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে লাগল। কি করি ভাই! মুখ থেকে আঁচল ছাড়িয়ে কান্না বন্ধ করবার জন্যে বললাম, কেঁদো না, তোমার কোন ভাবনা নেই। গাঁয়ের যে যাই করুক, আমি তোমার ধারেই থাকব। বলতেই সে কান্না থামিয়ে বললে, আপনি কিন্তু দিনে একবার ক'রে খবর নিয়ে যাবেন। বললে, ভগ্নীপতি আপনি, স্বামীর পরেই তো আপনার স্থান। কি কথা শোন দেখি ভাই! বুকটা আমার এখনও ধড়ফড় করছে, দেখ।—বলিয়া আমার হাতটা টানিয়া বুকে চাপিয়া ধরিল।

হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলাম, তবে আর কি! এ পক্ষের বউকে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে প্রবোধ গাঙুলীর গদিতে ব'সে যাও এবার।

হারাণ কহিল, দূর! তোমার যেমন কথা! ছোট বোনের মত। কিন্তু তুমি ভাই কাউকে এ কথা ব'লো না। তা ছাড়া আমি যে খেলাম, তাও কাউকে ব'লো না।

কহিলাম, সেজন্যে তোমার চিন্তা নেই, ও খবর যাতে গাঁয়ের সবাই জানতে পারে, মনু চক্রবর্ত্তী তার ব্যবস্থা করবে।

হারাণ চিন্তিত হইয়া উঠিয়া কহিল, সত্যি। একটু পরেই একটা কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়া কহিল, করুক গে! আমি কাউকে ভয় করি না। আমি আর তোমাদের দলাদলিতে নেই তো আর কাকে ভয়?

কহিলাম, তা হ'লে গাঙুলী মশায়কে ব'লে এস, তুমি আর এসবে নেই।

হারাণ বেপরোয়াভাবে কহিল, দায় পড়েছে। তুমি ব'লে দিও। আরও ব'লে দিও, আমি সরোজিনীর দলে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি সরোজিনীকে ব'লে দিয়ে এসেছি, তাকে ভুলিয়ে তার শাশুড়ীকে নিয়ে যেতে, গাঙুলী মশায় তোমাকে পাঠিয়েছিল, আমাকে তুমি ধ'রে নিয়ে এসেছিলে। আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া বিরক্ত স্বরে কহিলাম, তুমি তো আচ্ছা মিথ্যেবাদী! এ কথা তুমি বললে কি ক'রে?

হারাণ হাসিতে হাসিতে কহিল, তা আর কি করব? নিজের ঘাড়ে দোষ নোব নাকি?

রাগিয়া উঠিয়া কহিলাম, বেশ। আমিও এর শোধ নোব। কনে-বউকে সব ব'লে দোব।

হারাণ থমকিয়া দাঁড়াইয়া ডান হাতের তর্জ্জনীটি আমার মুখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া বীরদর্পে কহিল, সাবধান মাস্টার, এসব কর তো ভাল হবে না বলছি।

কহিলাম, তুমি আমার সম্বন্ধে ও কথা বললে কেন?

হারাণ হাসিয়া উঠিয়া কহিল, মিথ্যে কথা। তুমি কি কর দেখছিলাম। কিছুই বলি নি। তুমিও যেন কাউকে কিছু বলতে যেও না। ডুবে ডুবে দুজনে জল খাব আমরা, কাউকে জানাবার দরকার কি?

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

লাল বনাত

শত্রুপক্ষের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিল, রায় মহাশয় অদ্ভুত বেশে সজ্জিত হইয়া সাক্ষী দিতে আসিয়াছেন। গায়ে টকটকে লাল বনাতের কোট, মাথায় ধপধপে সাদা রেশমের পাগড়ি, অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া সাক্ষী দিতেছেন। তিন বৎসর আত্মগোপন করিবার পর আজ এই প্রথম তিনি আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। সাতটি ফৌজদারী মকদ্দমায় তিনি আসামী—সাতটি গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তাঁহার নামে জারি হইয়াছে; কিন্তু অদ্যাবধি তিনি অধৃত। আজ এই প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার আবির্ভাবের গুরুতর হেতু আছে। স্বয়ং আসিয়া সাক্ষী না দিলে একটি প্রকাণ্ড মকদ্দমায় তিনি পরাজিত হইবেন, তাঁহার সম্পত্তির অর্দ্ধেক বেহাত হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহাকে আসিতে হইয়াছে।

শত্রুপক্ষের লোকেরা পুলিস সমভিব্যাহারে আদালতের বারান্দায় সাগ্রহে অপেক্ষমান,—সাক্ষী দিয়া বাহির হইলেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইবে। ঠিক বারান্দার নীচেই একটি তেজস্বী অশ্ব গ্রীবা বাঁকাইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছে। রায় মহাশয়ের ঘোড়া। পুলিস সাহেবের ঘোড়াও অদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

রায় মহাশয় সাক্ষী দিয়া বারান্দায় বাহির হইলেন এবং নিমেষের মধ্যে বারান্দার উপর হইতেই একলম্ফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অশ্ব বিদ্যুদ্বেগে বাহির হইয়া গেল।

পুলিস প্রথমটা হতভম্ব হইয়া পড়িল, তাহার পর একজন দারোগা পুলিস সাহেবের ঘোড়াটা লইয়া আসামীর অনুসরণ করিলেন। রায় মহাশয় আগাইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুদূর গিয়াই লাল বনাতের কোট গায়ে মাথায় সাদা পাগড়ি অশ্বারোহীকে দেখিতে পাওয়া গেল। অশ্ব তীরবেগে ছুটিতেছে। দারোগাও ঘোড়ার গতিবেগ বাড়াইলেন। বন্ধুর মসৃণ ছোট বড় বহুবিধ প্রান্তর পার হইয়া রায় মহাশয়ের অশ্ব অবশেষে একটা বনের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিছুক্ষণ পরে দারোগার অশ্বও প্রবেশ করিল। বন অতিক্রম করিয়া আবার একটা মাঠ। মাঠে পড়িয়া দারোগা রায় মহাশয়কে পুনরায় দেখিতে পাইলেন—উদ্দাম বেগে ঘোড়া ছুটিতেছে। তিনিও ঘোড়াকে সজোরে কয়েকবার কশাঘাত

করিলেন। কিছুক্ষণ ছুটিবার পর দারোগার মনে হইল, বিধি প্রসন্ন হইয়াছেন। রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি খুলিয়া গিয়াছে এবং তাহা ঠিক করিবার জন্য তাঁহাকে নামিতে হইয়াছে। উর্দ্ধশ্বাসে দারোগা অকুস্থলে আসিয়া পৌছিলেন; রায় মহাশয়ের ঘোড়ার পেটি তখনও ভাল করিয়া বাঁধা হয় নাই।

দারোগা ঘোড়া হইতে নামিয়া গ্রেপ্তার করিতে গিয়া কিন্তু বিস্ময়ে অবাক হইয়া গেলেন। রায় মহাশয় নয়। দারোগার বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষু দেখিয়া সে নীরবে দন্তপংক্তি বিকশিত করিয়া হাসিল।

"বনফুল"

যাত্রী

কোথা পথ রচি যুগের আবর্ত্তনে ?
গতিপথে সখা, জমিয়া উঠিছে অতীতের আঁধিয়ার ;
পারায়ে কতই মরু পর্ব্বত বন
যে শ্যামলিমার মিলেছিল সন্ধান,
তারে পিছে ফেলি কোথায় নিয়তি টানে—
সমুখে ঘনায় অতীতের শত ব্যথা।
মরুর তপ্ত অগ্নিসূচিকা বিঁধিছে ক্লান্ত চোখে—
মরীচিকা যেন মেলে সহস্র বাহু।
সেই বিস্মৃত যুগে
নয়নে যখন ভাসিছে কুহেলীছায়া,
তখন বন্ধু, পড়েছিল আসি স্বর্গের জ্যোতিরেখা
ব্যবধান সৃজি আদিম জন্তু সনে ;
তারপর হতে পেয়েছি পাথেয় কত—
কত প্রদেশের ছিঁড়ি রহস্যজাল
গোপনবার্ত্তা ছড়ায়ে দিয়েছি সোনালী আলোর তলে।
আজ কেন সখা, মনে হয় সব ব্যর্থ আবিষ্কার !
সোনার সূর্য্য গলি নিঃশেষ হ'ল,
আদিম জন্তু উঁকি দেয় ফিরে ফিরে,
জ্যোতির পুঞ্জ তাহার নয়ন অন্ধ করে না কেন ?
তাই সখা, আর চরণ চলে না বুঝি—
মরুর তপ্ত অগ্নিসূচিকা বিঁধিছে ক্লান্ত চোখে—
মরীচিকা যেন মেলে সহস্র বাহু।

শ্রীসত্যব্রত মজুমদার

প্রসঙ্গ কথা

অনেক দিন "প্রসঙ্গ কথা" লিখি নাই। প্রধান কারণ যুদ্ধের দরুন কাগজের দুর্ম্মূল্যতা ও অপ্রতুলতাজনিত স্থানাভাব। এবারে ঐ অভাব সত্ত্বেও বিস্ময় ও কৌতূহলবশত একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া পারিতেছি না। প্রসঙ্গটি অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ঢাকা ষ্টেশন ও বাংলা সাহিত্য। রেডিওর সাহায্যে মুখ্যত স্থানীয় গভর্মেণ্টের অত্যাবশ্যক প্রচারকার্য্য পরিচালিত হইলেও গৌণভাবে জনসাধারণের জ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রসারের ব্যবস্থা হইতে পারে। বস্তুত বহুক্ষেত্রে এই ফালতু (by-product) উপকার এত অধিক সাধিত হইয়া থাকে যে, গোপন মূল উদ্দেশ্য একরকম চাপা পড়িয়া যায় এবং রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফের মত আমরা বেতারকেও পাশ্চাত্য সভ্যতার একটি বিরাট দান হিসাবে মান্য করিয়া থাকি। গৌণ বিষয়গুলির মধ্যে রেডিও মারফৎ সাহিত্য ও ভাষা শিক্ষাদান বর্ত্তমানে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইয়াছে এবং নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, জনসাধারণের প্রভূত উপকারও হইতেছে। বি. বি. সি. এই ব্যপদেশে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়া দূর দূরান্তর হইতে বক্তা বা কথক সংগ্রহ করিয়া থাকেন। দেশের প্রতি প্রীতি আছে বলিয়াই সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ দেশের কল্যাণকর এই সকল ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন না। তাঁহারা জোরের সঙ্গেই বলিতে পারেন—

> Broadcasting in this country has been built up on definite policies of comprehensive and constructive public service. Those connected with the organisation are fully conscious of the new territories which have to be penetrated and opened up, and of the known areas still to be further developed.

কিন্তু এই পরাধীন দেশে আমরা দেখি, সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত মানুষের প্রধান আসক্তি মাস-মাহিনার প্রতি। কোনও ক্রমে দিনগত পাপক্ষয়

হইলেই তাঁহারা খুশি হইয়া উঠেন। কোনও নূতন ব্যাপারে প্রবেশ করিয়া দেশের ও দশের উপকার সাধনের প্রবৃত্তি তাঁহাদের হয় না; গতানুগতিক কাজ কুৎসিততমভাবে নিষ্পন্ন করিয়াই তাঁহারা তৃপ্ত থাকেন; ইহার মধ্যেই যদি নিজের বা আত্মীয়বান্ধবের উপরি কিছু জুটিয়া যায়, সে তো সোনায় সোহাগা! দেশের সর্ব্বত্রই যখন এই ব্যবস্থা, তখন ঢাকা রেডিও ষ্টেশনের বেতনভোগী কর্ম্মচারীদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করি কেন? করিতেছি এইজন্য যে, তাঁহারা এমন কাজে অবহেলা করিতেছেন যাহার জন্য তাঁহাদিগকে বুদ্ধি বা গতর কিছুই খরচ করিতে হইত না। যাহা তাঁহাদের অত্যন্ত হাতের কাছে তাহাই সংগ্রহ করিতে তাঁহারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় গাফিলতি করিতেছেন। বর্ত্তমানে বাংলা দেশে বাংলা সাহিত্যের নানা দিক সম্বন্ধে ভাবিবার বা বলিবার খুব বেশি লোক নাই। যে দুই-একজন মাত্র আছেন, তাঁহাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার প্রধান। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও ভাষণ বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। তিনি ঢাকাতে সুলভ হওয়া সত্ত্বেও ঢাকা ষ্টেশন হইতে তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক আলাপ-আলোচনা প্রচারিত হয় না কেন, এই প্রশ্নের জবাব কি স্থানীয় দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কর্ম্মচারীরা দিতে পারিবেন? কবি মোহিতলাল তাঁহার কবিতা আবৃত্তির জন্যও সর্ব্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আবৃত্তিও তো কই বহু দিন মাইক-মাধ্যমে আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই! যদি সেখানে সাহিত্যবিষয়ক আলাপ-আলোচনা-আবৃত্তির ব্যবস্থা একদম না থাকিত, তাহা হইলে বিস্মিত হইতাম; কিন্তু এভাবে অভিযোগ করিতাম না। কিন্তু যেভাবে সেখান হইতে দিনের পর দিন অতিশয় নিকৃষ্ট সাহিত্যালাপ দুই-চারিজন বিশেষ বিশেষ কারণে অতিশয় ভাগ্যবান ব্যক্তির কণ্ঠে প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা শুনিয়া এবং ঢাকায় মোহিতবাবুর অস্তিত্বের কথা অবগত হইয়া শুধু বিস্ময় নয়, নানা সংশয়ও মনের মধ্যে উদিত হয়। যত দিন যাইতেছে, এই সংশয় ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সংশয়ের নিরসন করিবে কে?

অথচ সেদিন শুনিলাম, বাংলা কাব্য ও কবিতা সম্বন্ধে কবি মোহিতলালের একটি আলাপ কলিকাতা ষ্টেশন হইতে রেকর্ডযোগে প্রচারিত হইল। কলিকাতায় যাহা গ্রাহ্য, ঢাকায় কি তাহা গ্রাহ্য নয়? অথবা কাহারও কোনও ব্যক্তিগত দুষ্প্রবৃত্তি এরূপ ব্যবস্থার অন্তরালে কাজ করিতেছে? যাঁহারা বাংলা সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী, তাঁহাদের নিশ্চয়ই এ সকল প্রশ্নের জবাব দাবি করিবার অধিকার আছে।

মোহিতবাবু আমাদের লেখকগোষ্ঠীর একজন, আমাদের আপনার জন, শুধু সেই কারণেই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছি না; ইতিমধ্যেই বহুলোকে মুখে এবং পত্রে আমাদের নিকট এই বিস্ময়কর ব্যাপারের কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন। আমরা জবাব দিতে পারি নাই। উপরন্তু উক্ত ষ্টেশনে কতিপয় ভাগ্যবান ব্যক্তির বাংলা সাহিত্যবিষয়ক বিবিধ কণ্ঠকুর্দ্দনের মূলে কোনও গূঢ় কারণ আছে কি না, বহু ব্যক্তির সে-প্রশ্নের উত্তরেও আমরা নীরব থাকিতে বাধ্য হইয়াছি।

আর এক কথা, বাংলা কাব্যের রসবিচার, মধুসূদন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাংলার কবিদের বৈশিষ্ট্য, বাংলার কাব্যধারা, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, বাংলা কবিতার ছন্দ ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে বর্ত্তমানে মোহিতবাবু অথরিটি অর্থাৎ অতিশয় নির্ভরযোগ্য মতামত পোষণ করিয়া থাকেন; একমাত্র বেতারযোগেই বাংলা দেশের সকল শ্রেণীর শ্রোতার পক্ষে এই সকল বিষয়ে তাঁহার আলাপ শুনিবার সুযোগ হইতে পারে; লেখায় যত দরদই থাক, ব্যক্তিগত সংযোগের অভাব ঘটে। বেতারের কর্ত্তৃপক্ষ যদি আমাদিগকে অকারণে বা কোনও গুপ্ত কারণে বঞ্চিত করেন, আমরা তাহা হইলেও অনুযোগ করিবার অধিকারী। ধারাবাহিক বক্তৃতা বহু অবাঞ্ছিত লোকেও দিয়া থাকেন, একজন সত্যকার জ্ঞানী ব্যক্তিকে দিয়া বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি ধারাবাহিক আলাপের ব্যবস্থা সহজেই হইতে পারে। ঢাকার কারণ যদি ঢাকাই থাকে, আমরা কলিকাতার বেতার প্রতিষ্ঠানের শরণাপন্ন হইতেছি।

———

সংবাদ-সাহিত্য

"এখনো তারে চোখে দেখি নি
শুধু বাঁশী শুনেছি।"

মাঝে মাঝে বাঁশী শুনিতেছি—নাগরের ওষ্ঠনিঃসৃত বংশীধ্বনি নয়, তাঁহার অভ্যর্থনা ব্যপদেশে উত্থিত স্বরলহরী। অনুভব হইতেছে তিনি উত্তরোত্তর সান্নিধ্যে আসিতেছেন। শাস্ত্রকৃত শৃঙ্গার শেষ করিয়া আমরাও প্রস্তুত হইয়া আছি। এক শত পঁচাশি বৎসর পূর্ব্বে একবার যেমন আম্রকুঞ্জের অন্তরালে বঁধুর জোঁহ-আড়বাঁশীর ধ্বনি আচমকা শুনিয়া অপ্রস্তুত অবস্থাতেই তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইয়াছিলাম, এবার তেমনটি ঘটিতে দিব না। বঁধু শিখাইতেছেন, দুষ্ট নাগরের জন্য আর কিছু না হউক নখদন্ত শানাইয়া রাখিতে, এবার জয়দেবী প্রথায় অভ্যর্থনা করিব। বঁধু যে আত্মরক্ষার জন্য বহুদিন হইল আমাদের মুড়া ঝাঁটাগাছটাও গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া বসিয়াছেন; পুরাতন প্রেমের আতিশয্যে নূতন ঝাঁটাও আর সংগ্রহ করা হয় নাই। মধ্যরাত্রে নাগর আসিয়া দরজায় টোকা মারিতেছেন। এখন তাঁহাকে ঠেকাই কি দিয়া? নখদন্ত? তাও কি ছাই এই বুড়া বয়সে আছে?

• • •

তবু আমরা প্রস্তুত হইয়াছি। সেদিন আমাদের কেহ ছিল না, এবারে বঁধু সহায়। স্লিট ট্রেঞ্চের ভরসা এবং বিফল প্রাচীরের আশ্বাস লইয়া আমরা মুহুর্মুহু আস্ফালন করিতেছি—নির্ভর-নিদ্রাসুখে-প্রসুপ্ত বঁধুর ঘুম ভাঙিয়াছে, আর আমাদের ভয় নাই। নাগরের টোকাই শুনিলাম, বোধ হয় আর চোখে দেখিতে হইবে না।

• • •

তবু আজ কেন জানি মনে হইতেছে, বঁটি ঝাঁটা ও নোড়াটা হাতে থাকিলে নিজেও বুকে বল পাইতাম, বঁধুরও কতকটা নিশ্চিন্ত হইবার অবকাশ মিলিত।

কি ছুটাছুটি দৌড়ধাপটাই না বেচারাকে করিতে হইতেছে! এই কাঁচা ঘুম ভাঙা অবস্থায়! মায়া হয় দেখিলে। এক একবার মনে হইতেছে, কোমরে কাপড় জড়াইয়া ফোকলা মাড়ি লইয়াই নামিয়া পড়ি; হাতিয়ারটা-আসটাও তো প্রয়োজনের সময় হাতে তুলিয়া দিতে পারিব; তৃষ্ণার সময় জলের গেলাসটাও তো মুখে ধরিতে পারিব; কিন্তু আবার অসূর্য্যম্পশ্যা-কুলবধূর দীর্ঘকালের অনভ্যাসের লজ্জা আসিয়া বাধা দিতেছে; বঁধু সাহস দিয়াছেন, তবু মন মানিতেছে না। তোমরা এখন বল তো আমি কি করি?

• • •

তোমরা ভাবিতেছ, বাড়াবাড়ি হইতেছে, বড় বেশি সতীপনা দেখাইতেছি। এ যুগে মুখ বদলাইতে পাইলে আবার কে ছাড়ে? তা ছাড়া, উনি কি সুখেই না রাখিয়াছিলেন! না, গো না। এ যদি ভাব, তাহা হইলে তোমরা মেয়েমানুষের সাইকলজি কিছুই জান না। পুরুষান্তর করিতে মেয়েদের বড় সাধ বা প্রবৃত্তি নাই; তা করুক অনাদর, হউক কাপুরুষ। রাজরাণীর কন্যাকে ঘেঁড়োর ঘর করিতে দেখ নাই? একবার যাহাকে বুকে টানিয়া লইয়াছি, তাহাকে ছাড়িতে আমাদের বড় বাজে; তা যাই বলুন আমাদের গান্ধারী দিদি। তাঁহার বড় অভিমান। মেয়েমানুষের অত অভিমান সাজে না। বিধবা হইয়া কাঁদিতে, একাদশী করিতে, মাছ না খাইতেও রাজি আছি। কিন্তু পরপুরুষ? ছি!

—

ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের কথা জানি না, যুদ্ধের দরুন আমাদের বাংলা দেশে নিদারুণ অন্নসমস্যা দেখা দিতেছে। আমরা অনেকেই হয়তো জানি না, আমাদের এই সুজলা সুফলা দেশে সকল অধিবাসীর উপযুক্ত পরিমাণ ধান্য উৎপন্ন হয় না—অনেক কোটি মণ অভাব থাকিয়া যায়। এই অভাব এতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ পূরণ করিয়া আসিত। ব্রহ্মদেশ এখন আমাদের নাগালের বাহিরে, সুতরাং অভাব রহিয়াই যাইতেছে। তা ছাড়া, ব্রহ্মদেশ মালয় প্রভৃতি

স্থান হইতে বহু ভারতবাসী অন্তত কিছু দিনের জন্য বাংলা দেশে আসিয়া আশ্রয় লইতেছে; এই সকল দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশপথই বাংলা দেশ। যুদ্ধের জন্য সহস্র সহস্র নূতন লোকেরও আমদানি এখানে হইয়াছে, ফলে অন্নসমস্যা মারাত্মক হইয়া উঠিতেছে। গভর্মেণ্ট অধিক খাদ্য শস্য উৎপানের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। চাষের জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, এবং জমিতে সারপ্রয়োগে উৎপাদিত শস্যের পরিমাণ—এই দুইটিই হইতেছে মুখ্য লক্ষ্য। সারের ব্যাপারে পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একটু চেষ্টা করিলেই বাংলা দেশে এতদিন যাহা ভয়ের কারণ ছিল, সেই কচুরিপানা নামক নিতান্ত অনিষ্টকর দ্রব্যটিই উৎকৃষ্ট সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া মঙ্গলের কারণ হইতে পারে। ইহা লইয়া পরীক্ষা সরকারীভাবে শেষ হইয়াছে এবং কচুরিপানাকে সাররূপে ব্যবহার করিবার পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য গভর্মেণ্টের লোক সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন।

উত্তম কথা। তবু আর একটা কথা মনের মধ্যে জাগিয়া থাকে। বাংলা দেশে অনেক হাজার বিঘা জমিতে পাট চাষ হয়। পাট খাদ্যদ্রব্য নয় এবং বর্ত্তমানে বিদেশে পাট চালান দিয়া পরিবর্ত্তে সেখান হইতে কোনও খাদ্যদ্রব্য আনয়নও সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে শুধু শ্রেণীবিশেষের স্বার্থের খাতিরে পাট-চাষ করার কোনও অর্থ হয় না। সমস্ত পাটের জমিকে যদি ধেনো জমিতে পরিণত করা যায়, তাহা হইলে বাংলা দেশের অন্নসমস্যা দূর হইতে পারে। এ ব্যবস্থা গভর্মেণ্ট একটু চেষ্টা করিলেই হইতে পারে। গভর্মেণ্ট চেষ্টা করিবেন কি?

—

যুদ্ধের ওজুহাতে স্থানচ্যুতি ঘটাইয়া বহু বাঙালীকে বিপন্ন করা হইয়াছে, গভর্মেণ্ট আর একটু সহৃদয় হইলেই এই সকল স্থানচ্যুত লোকেদের নূতন আস্তানা নির্ম্মাণে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারিতেন। পৈতৃক ভিটামাটি উচ্ছন্নে যাইবার দুঃখের সঙ্গে নিরাশ্রয় হইবার দুঃখ যুক্ত হইয়া অনেকের পক্ষে জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়াছে। গভর্মেণ্টের হাতে অনেক লোক, অনেক পয়সা;

বসতবাটি নির্ম্মাণের উপযুক্ত জমিও অনেক আছে। অস্থায়ী বসতবাটি নির্ম্মাণ করাইয়া লোকদের সরাইবার ব্যবস্থা হইলে কাতর আর্ত্তনাদ এত অধিক শুনা যাইত না।

—

সাহিত্যের সহিত পলিটিক্স জড়াইয়া বিভিন্ন জেলায় নানা সভাসমিতির অধিবেশন সম্প্রতি অত্যধিক পরিমাণে হইতেছে। তথাকথিত বহু সাহিত্যিক এই সকল ব্যাপারে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছেন। মফস্বলেই এগুলির প্রসার বেশি। সাহিত্য-নামাঙ্কিত হইলেও আসলে এগুলি নিছক পলিটিক্স সংক্রান্ত অনুষ্ঠান। সাহিত্যিক হইয়া এই জাতীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পিছনে এক ধরনের "পলায়নী" মনোবৃত্তি আছে। মানুষ যখন সর্ব্ব বিষয়ে বিফল-প্রযত্ন হয় তখনই ন্যান্নাম জাত অথবা গোলে-হরিবোলের সন্ধান করে। সত্যকার সাহিত্য সৃষ্টির অক্ষমতা যখন পলিটিক্স-প্রবণতা হইয়া দেখা দেয়, তখন সত্যকার পলিটিক্সেরই সাবধান হইবার কথা।

—

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর প্রথম জন্মদিন উৎসবের নামে সেদিন কলিকাতার "ওভাটুন হলে" যে জলসা হইয়া গেল, তাহাতে অ্যান্টি-ফ্যাসিষ্ট সাহিত্যিকেরা যোগ দিয়াছিলেন। কয়েকজন সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিক মিলিয়া রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা' নাটিকাটি অভিনয় করিয়াছিলেন। উক্ত নাটিকার কবির ভূমিকাটি আসলে রবীন্দ্রনাথেরই ভূমিকা। সেই ভূমিকায় 'এক পয়সায় একটি'র কবি বুদ্ধদেব বসু অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। গরদের ধুতি, বাসন্তী রঙের ডুরে চাদর এবং পাকা চুলে তাঁহাকে চমৎকার মানাইয়াছিল। বুদ্ধদেববাবু অ্যান্টি-ফ্যাসিষ্ট; রবীন্দ্রনাথকে একদল লোক কেন ফ্যাসিষ্ট বলিত, সেদিন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, রঙে, রূপে, অভিনয়ে, উচ্চারণে একজন আর একজনের অ্যান্টি যতটা হইতে পারে। বুদ্ধদেববাবু যদি এই অনুষ্ঠানের কর্ম্ম-কর্ত্তাদের কেহ হন, তাহা হইলে বলিতে বাধ্য হইতেছি, ঐ ভূমিকায় তাঁহার অবতরণ (আরোহণ!) নিশ্চয়ই ফাসি-মনোবৃত্তির পরিচায়ক।

গোপালদা বলিলেন, দগ্ধ হইবার প্রাক্কালে স্বর্ণলঙ্কার যে অবস্থা হইয়াছিল, সোনার বাংলারও সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। রাবণ রাজা বিস্মিত আতঙ্কে বলিয়াছিলেন, বানরে সঙ্গীত গায়, জলে ভাসে শিলা—এ বড় দুর্লক্ষণ! জলে শিলা ভাসিতে অবশ্য দেখি নাই (শীলাদেবীদের দেখিয়াছি!) কিন্তু অপর দুর্লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। বাঙালী সাবধান!

—

সনাতন এবং আধুনিকদের মধ্যে তফাত কি, সেদিন কে একজন প্রশ্ন করিয়াছিলেন। চট করিয়া জবাব দিতে পারি নাই। জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষ' হাতে আসার পর সৌরীনদার (শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়) "একই ধারা" পড়িয়া জবাব পাইয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রেও নজির মিলিয়াছে। তাঁহাদের ধারা এবং সৌরীনদা'র ধারা একই—সনাতন। সৌরীনদা অবশ্য মহাভারতের অর্জ্জুনের নজির দিয়াছেন। ব্যাপারটা খোলসা করিয়াই বলি। সনাতন ধারায় সবই বন্দোবস্তে হয়; সুভদ্রাহরণ করিতে গিয়া অর্জ্জুন বন্দোবস্ত করেন ভ্রাতা-কৃষ্ণের সঙ্গে; উ-বাবুর সহিত ইন্দিরার প্রেমে সুভাষিণীর বন্দোবস্ত থাকে, উ-বাবুকে পূর্ব্ববিবাহিত পতি হইতেই হয়; রমেশের বন্দোবস্ত করিবার কেহ থাকে না বলিয়া শেষরক্ষা হয় না, কমলা পালায় এবং স্বামী নীলাম্বরই ব্যাধিগ্রস্তা ভিখারিণী বিরাজ বউয়ের পা মাড়াইয়া দেয়। এক্ষেত্রেও নায়ক মনোজের বন্দোবস্ত থাকে নায়িকা সুমিত্রার বাবার সঙ্গে—ফলে সুমিত্রার মনের এমন যে অতি-আধুনিক রোমান্স, তাহাও পর্য্যবসিত হয় বিবাহে। 'চরিত্রহীনে'র প্রশুরাজের মত আমাদেরও বলিতে ইচ্ছা হয়, ভগবান এ ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন, এ হতেই হবে।

• • •

আধুনিকের ধারা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর দেখা যায়, মাসী পিসী অথবা সহোদর বোন; শাস্ত্র যত elastic-ই হউক, সামলাইয়া লইবার আর কোন উপায় থাকে না। শৈলজানন্দের 'বানভাসি', নরেশচন্দ্রের

'শুভা' অথবা মন্মথ রায়ের 'একাঙ্কিকা'য় শাস্ত্রমাফিক ব্যবস্থা হয় নাই বলিয়াই এগুলি অসনাতন অর্থাৎ আধুনিক। ইহারাই পায়োনীয়ার, পরে অবশ্য পায়োনীয়াররাই বানে ভাসিয়া গিয়াছেন। ডাকাতি, ভূমিকম্প, জলপ্লাবন যত বারই ঘটিয়াছে, ততবারই দেখা গিয়াছে, জোর মিলিয়াছে বটে কিন্তু হিসাব মেলে নাই। "তা হোক" বলিয়া টেম্পোরারি কাজ হাসিল করিয়া যে যেদিকে পারে কাটিয়া পড়িয়াছে। ইহাই আধুনিকতা।

—

বোমার ভয়ে শহরের মানুষেরাই যে শুধু স্থানত্যাগ করিয়া মফস্বলগামী হইয়াছে তাহা নয়, হালী কবিতারাও ইভ্যাকুয়েট করিয়া এদিকে ওদিকে বাসা বাঁধিয়াছে। নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রবে যে সকল ভদ্র ব্যক্তি এতকাল মফস্বলীয় শহরের অনাড়ম্বর আরামের মধ্যে বাস করিতেছিলেন, আপাতত শুধু বাজার দর চড়াতেই তাঁহারা বিভ্রান্ত হইয়াছেন। দুদিন পরে যখন অন্তঃপুরে অন্তঃপুরে এই সকল হালী কবিতার তাণ্ডব-নৃত্য আরম্ভ হইবে, তখন তাঁহারাই হয়তো ত্রাহি ত্রাহি বলিয়া পরিত্যক্ত শহরের দিকে ধাওয়া করিবেন। দুর্ভিক্ষের দেশ বাঁকুড়ায় ইতিমধ্যেই ইন্‌ফিল্‌ট্রেশন শুরু হইয়াছে। তমসার বক্ষ ভেদ করিয়া সেখানকার 'নবীনা' জাগিয়াছেন। প্রাচীন 'প্রবাসী' সেখানে খুঁটি গাড়িলেও শেষরক্ষা হইবে কিনা কে জানে! বাঁকুড়ায় "ধূসর গোধূলী" দেখা দিয়াছে—বাঁকুড়াবাসী টেক কেয়ার! ট্রেনের ভিড়ে চাপাচুপিতে একটু এদিক ওদিক হইলেও এ একেবারে খাঁটি কলকাতাই মাল, বেহালার পাঁচন মার্কা—

ধূসর গোধূলি—ঝলসে দিগন্তর!—
দূর অন্তরীক্ষে লক্ষ ইসারা দৃষ্টিহারা হলো
অরণ্যানীর নিভৃত মনোমন্দিরে বনস্পতির মৃত্যু দেখেছো কেউ?
রক্তিম অঙ্কনে হলো রাঙায়িত দিগন্ত অঙ্গন।
ঘন তমিস্রার সুপ্তিকার, নিমেষে অন্তর্হিত
শূন্য ব্যোমে বিমান চংক্রমণ মরণের সংকেত
ধূসর ক্ষুধায় ইনরন্ধ অন্ধকার

ঐশ্পাতিক কামনার ল্যাবরিন্থ।

তন্বী-তমাল-তালি-তরুণীর দিন গেলো—জীবনের রিম্‌ঝিম্ স্পন্দন

ঝলসে দিগন্তর!

দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা যেখানে নিরন্তর রহিয়াছে, সেখানে যদি ধূসর গোধূলিতে দিগন্তর ঝলসিতে থাকে, তাহা হইলে অনেকগুলা কুষ্ঠাশ্রমেও কুলাইবে না।

—

রবীন্দ্রনাথের "বিচারক" গল্প মনে আছে? ষ্ট্যাটুটরি সিভিলিয়ান জজ মোহিতমোহন দত্ত ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দিয়াছিলেন, কিন্তু সেই হতভাগিনীর যে অপরাধের জন্য এই শাস্তি তাহার মূলে যে স্বয়ং তিনি ছিলেন, অন্তরীয়-অভিজ্ঞানে তাহা জানিতে পারিয়া সেদিন বন্দিনীশালার একটি নির্দিষ্ট কক্ষে তাঁহার মনে কি অনুশোচনা জাগিয়াছিল? শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও আজ বিচারক, তাঁহার যৌবনের ভাবাগত অনাচার এক হতভাগ্য ক্ষীরোদাকে কি ভয়াবহ পরিণামের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছে, তাহা দেখিলে শাস্তি দিবার জন্য রায় লিখিতে কি তাঁহার হাত কাঁপিবে না? কে জানে, মুন্সেফ-হাকিমের মনোবৃত্তি দেবাঃ ন জানন্তি। হায় নিষ্ঠুর, তোমার কীর্তি একবার তুমিই দেখ—

"সহজ ছন্দেই আসেমা একসময় ষোলো ছেড়ে সতেরোয় পা দিতে গিয়ে নিজেকে মূল্যবতী বলে চিনে ফেললো। বয়স্কা কোনো আত্মীয়া না থাকতে আসেমার আঁট-সাট গড়ন-ফুর্ত-তরুণ্য আর কারুর সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে পড়ছিলো না। তবু একদিন ভাইকে [সহোদর] পান দিতে গিয়ে আয়েশলোভী ভাইকে এক শুভ-মুহূর্তে আসেমা বিস্ফোরণের সংগেই জাগিয়ে দিয়ে এলো।

...একটা পরিস্কার আনন্দোচ্ছল কাঁতরানি তার মনের প্রত্যেক খাঁজে বিপুল চাঞ্চল্য জাগিয়ে দিলো। নীরব [নায়ক] চোখ বুজে অনুভব করবার চেষ্টা করলো, আসেমা সম্ভবত নিজেই তাকে ঘনিষ্টভাবে ভেঙে চুম্বন করতে আসচে। হয়তো এক্ষুণি সে নীরবকে জড়িয়ে গ্রাস করে ঘন-ঘন চুম্বনে ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। কিন্তু আসেমা যখন চুমোও খেলো না, কিংবা তার কোমল শরীরে গ্রাস করেও

ফেললো না,—অথচ খানিকক্ষণ ঝুঁকে থেকে তার অদ্ভুত দৃষ্টি নীরবের মুখ-চোক-নাকের পাশ থেকে সরিয়ে নিলো, তখন নীরব আর আস্ত থাকতে পারলো না, সম্পূর্ণ করে ভেঙে খান্-খান্ হয়ে গেলো। তার সমস্ত স্বামীত্ব একটা নিষ্ঠুর বোবা চীৎকারের সংগে কুঁকড়ে এতোটুকু হয়ে পড়লো।....

নিজের স্পর্শের উত্তপ্ত তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে আসেমা নীরবের ঠোঁটে একটা ছোট্ট তীক্ষ্ণ চুমো খেলো। নীরবের মনে হলো, এবারে সে গলে গড়িয়ে পড়বে। তবু কিন্তু সে প্রকাশিত হলো না।"

নীরব-চূর্ণ কলুটোলার হকিমদের দোকানে অনুসন্ধান করিলে সম্ভবত পাওয়া যাইতে পারে।

—

শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—

"মাথাটা হয় নি উর্ব্বর
বই-পড়া বর্ব্বর
ধুঁকচি শিক্ষিত সহুরে বিবর্ণ চাকুরির বৃত্তে;"

অমিয়বাবু অতিশয় অমায়িক।

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে "সাহিত্য-সাধক চরিতমালা"র ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ গ্রন্থ যথাক্রমে 'জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার'; 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত', এবং 'উইলিয়ম কেরী' প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনে একেবারে প্রথম যুগে যাঁহারা সাধনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহিনী আজ দীর্ঘ দেড় শতাব্দীর ব্যবধানে বাঙালী সমাজকে আনন্দদান করিবে।

—

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'র ১৬শ গ্রন্থ কেরী-সঙ্কলিত 'কথোপকথন' বাহির হইয়াছে। দীর্ঘ ভূমিকায় কেরীর জীবনের বিচিত্র কাহিনী ও বাংলা ভাষা গঠনে তাঁহার অক্লান্ত অধ্যবসায়ের কথা বিবৃত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই 'কথোপকথন' পুস্তকটিকে একটি যুগান্তকারী পুস্তক বলিয়াছিলেন। এক দিকে সেই যুগের (১৮০১খ্রী) ভাষা ও বাক্যরীতি যেমন ইহাতে বিবৃত হইয়াছে, অন্য দিকে আবার তখনকার সামাজিক রীতিনীতির একটা প্রামাণিক পরিচয়ও ইহাতে মিলিবে।

পুস্তক-প্রসঙ্গ

বিবিধ কথা—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। মিত্র ও ঘোষ, কোং, কলিকাতা। পৃ. ২৩৫, মূল্য ২॥০।

বিচিত্র কথা—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। শ্রীগুরু লাইব্রেরি, কলিকাতা। পৃ. ২৫৬, মূল্য ২॥০।

বাংলার সাহিত্য-ক্ষেত্রে মোহিতলাল কবি-হিসাবে যেমন, সমালোচক-হিসাবেও তেমনই নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রবর্ত্তকরূপে একটি একান্ত নিজস্ব আসন দাবি করিতে পারেন। গত সিকি শতাব্দী ধরিয়া তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে যে তত্ত্ব-চিন্তা করিয়াছেন, তাহার ফল-স্বরূপ আমরা ইতিপূর্ব্বেই বাংলা সাহিত্য-সমালোচনায় অপরিহার্য্য দুই-খানি গ্রন্থ—'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য' ও 'সাহিত্য-কথা' লাভ করিয়াছি। সম্প্রতি তাঁহার 'বিবিধ কথা' ও 'বিচিত্র কথা' বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিল।

'বিবিধ কথা'য় জাতির জীবন ও সাহিত্য, সত্য ও জীবন, অতি-আধুনিক সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহন রায়, আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও নবযুগ, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, শরৎ-পরিচয়, রবি-প্রদক্ষিণ, মৃত্যু-দর্শন ও বাঙালীর অদৃষ্ট—এই দশটি প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে। বইখানির নাম 'বিবিধ কথা' না হইয়া 'আধুনিক বাংলার সংস্কৃতি ও সাধনা' হইলেই এই সংকলনের সত্যকার নাম-পরিচিতি সম্ভব হইত। বস্তুত এই প্রবন্ধগুলিতে রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙালী জাতির সংস্কৃতি ও সাধনার কথাই আলোচিত হইয়াছে। ভক্তের স্তুতিবাচন নহে, আত্মনিরপেক্ষ সত্য-সন্ধানীর দৃষ্টিতে প্রবন্ধগুলি জাতীয় জীবনের গতিপথ নির্ণয়ে বিশেষ মূল্যবান।

'বিচিত্র কথা'য় অতি পুরাতন কথা, পুঁথির প্রতাপ, সংবাদপত্র ও সাহিত্য, সাহিত্যের শিরঃপীড়া, জাতীয় জীবন-সঙ্কটে, বঙ্কিমচন্দ্রের জাতি-প্রেম, সত্যেন্দ্রনাথ স্মরণে, কাব্যে আধুনিকতা, অতি-আধুনিক প্রতিভা, রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ ও বিচিত্র কথা—এই এগারোটি প্রবন্ধ আছে। তন্মধ্যে প্রথম প্রবন্ধ 'অতি পুরাতন কথা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার

নামকরণ 'জীবন-জিজ্ঞাসা' হইলেই সমীচীন হইত বলিয়া মনে করি। ইহা জীবনরস-রসিকের জীবন-জিজ্ঞাসা। মোক্ষ, নির্ব্বাণ বা স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য নহে; জীবনের মধ্যেই বাঁচিয়া থাকার কোনও সদর্থ পাওয়া যায় কি না, এই জিজ্ঞাসাই প্রবন্ধটির মূল কথা।

'বিচিত্র কথা'র অন্যান্য প্রবন্ধ প্রধানত সাহিত্যের বিচিত্র সমস্যা সম্পর্কিত, এবং মোহিতলালের বৈশিষ্ট্যও সেগুলিতে পূর্ণভাবেই বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

আমাদের পরিচয়—শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত, বীণা লাইব্রেরি, কলিকাতা। পৃ. ২২২, মূল্য ২৲।

একটি অতিশয় মূল্যবান গ্রন্থ, এই জাতীয় পুস্তক বাংলা ভাষায় খুব কমই আছে। যাঁহারা ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি ধারাবাহিক পরিচয় চান, এই বইটি তাঁহাদের সংগ্রহ করিতে হইবে। অতি প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে একেবারে আধুনিকতম বর্ত্তমান পর্য্যন্ত নানা ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্য দিয়া আমরা আচারে বিচারে ও সংস্কারে বেদপন্থা হইতে এখন কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, ইহাতে তাহা চমৎকারভাবে বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম সাত অধ্যায় ভারতীয় সংস্কৃতির এবং শেষের পাঁচ অধ্যায় বিশেষভাবে বাংলা দেশের সংস্কৃতি ও ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাস।

নির্বাণ—শ্রীপ্রতিমা ঠাকুর, বিশ্বভারতী। পৃ. ৭৬, মূল্য ১৲।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ দুই বৎসরের অন্তরঙ্গ পরিচয় 'নির্বাণ'। পড়িয়া বিস্ময় বোধ করিলাম। এটি লেখিকার প্রথম সাহিত্য-প্রচেষ্টা, অথচ ইহাতে পাকা হাতের মুন্সিয়ানা আগাগোড়াই। ইহাতে রবীন্দ্রনাথের যে চিত্রটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার সাহায্যে পাঠক সমাজ সত্যকার রবীন্দ্রনাথকে পাইবেন; লেখিকা অনেক সুযোগ সত্ত্বেও উৎকট অহমিকার দ্বারা তাঁহাকে আচ্ছন্ন করেন নাই, যেমন অন্য অনেকে করিয়াছেন। অতি সামান্য ঘটনাকে তিনি যেভাবে সাহিত্যের উপকরণ করিয়া তুলিতে পারিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় 'নির্বাণ' এই জাতীয় রচনার আদর্শস্থল হইয়া থাকিবে।

পাঞ্চজন্য—কাব্য, শ্রীতীন্দ্রমোহন বাগচী। পৃ. ১৫১, মূল্য ১॥০।

'রেখা', 'জাগরণী' এবং 'নাগকেশরে'র কবির এখন পর্য্যন্ত শেষ কাব্যফসল 'পাঞ্চজন্য'—শেষ হইলেও গোড়ার সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল আছে। "যৌবন ও জরা"র দ্বন্দ্ব ঘটিলেও কবি-মন এখনও তাজা, কিন্তু উদাসীন বাউল উঁকি দিতেছে। কবি নিজেই বলিতেছেন—

বর্ষার জল নামিয়া গিয়াছে, জাগিয়া উঠেছে চর।
কাঁচা রোদখানি বালুকার বুকে চিক্কণ ভাস্বর;
নূতন গজানো বাবলার বনে বাসা বাঁধিয়াছে পাখী,
চখাচখীদের চরণ-চিহ্ন তলে কে দিল রে আঁকি!
বুনো ঝাউয়েদের বুকের ঝুরিতে উদাসীন মেঠো হাওয়া
কি ধন খুঁজিতে ঘুরে মরে যেন দিবসে নিশিতে-পাওয়া।

চারিদিকের অ-সুর আবহাওয়ার মধ্যে 'পাঞ্চজন্য' বংশীধ্বনির মত মধুর ঠেকিল।

রজনীগন্ধা—কাব্য, মহারাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। পৃ. ২৫২, মূল্য ১॥০।

বাংলা কাব্যের যুগবিভাগ যদি করি, তাহা হইলে বলিব "রজনীগন্ধা"র যুগ শেষ হইয়াছে, এখন উগ্র ছাতিম ও ঘেঁটুফুলের যুগ। শুচিশুভ্র সুগন্ধ রজনীগন্ধা পুরাতন যুগের স্মৃতি বহন করিয়া আনিয়াছে। সে সব দিন আর ফিরিয়া আসিবে না।

কোরো না মিথ্যা আশা—
কণ্ঠ আমার আছে গো কেবল, নাই তার কোন ভাষা;
দেবতা সে গেছে চলে
প্রতিমা ডুবেছে জলে
চারিদিকে আজ বেঁধেছে বাঁধন মরণ সর্ব্বনাশা,
ভাঙ্গা হাটে আজ এসেছ গো কেন—মিছে তোমাদের আসা।

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এফ, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

৬

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের চরণ কোনখানেই 'অমিতাক্ষর' নয়; অমিতাক্ষর হইলে, উহার ওই পয়ারের কাঠামোটার কোন প্রয়োজন হইত না। এই ১৪ অক্ষরের মাপটিই বাংলা অমিত্রাক্ষরকে যেমন সম্ভব করিয়াছে, তেমনই ওই পদভাগও (৮+৬) অনাবশ্যক হইয়া যায় নাই। চরণের ওই পদক্ষেপ—উহার অবয়বের ওই অঙ্গসন্ধিই—এ ছন্দের স্বাধীন গতিভঙ্গির একটা বড় সহায়; কারণ, freedom-এর সঙ্গে ওই 'form' আছে বলিয়াই, অমিত্রাক্ষর ছন্দ এমন মহিমা লাভ করিয়াছে। নূতনতর যতিবিন্যাস ইহার সঙ্গীতকে যেমন বৃহত্তর সঙ্গতি (larger harmony) দান করিয়াছে, তেমনই ওই ৮+৬-এর যতি-দুইটি ছন্দের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিয়াছে। চরণমধ্যে বা চরণান্তরে ভাব-অর্থের স্বচ্ছন্দ গতিবেগ যেখানে আসিয়া যেমনই বিরাম লাভ করুক, ওই যতি দুইটি কখনও মুছিয়া যায় না। ইহাকেই আমি এ-ছন্দের 'Law of Gravitation' বলিয়াছি। ওই মাপ এবং ওই যতি যদি ঠিক না থাকে, তবে ছন্দহিসাবে অমিত্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্যই লোপ পায়—গিরিশ ঘোষের মিলহীন doggerel তাহার দৃষ্টান্ত। এ জ্ঞান যে কাহারও নাই, তাহার প্রমাণ—একালের মহা মহা ছন্দ-ধুরন্ধরগণ, গিরিশ ঘোষের ছন্দ, রবীন্দ্রনাথের ধাবমান (run on) পয়ার, এবং

'বলাকার ছন্দ', এই সকলকেই অমিত্রাক্ষরের সমধর্মী মনে করিয়া, তুলনায় তাহাদের তারতম্য [illegible] করিয়া থাকেন। এ জ্ঞান এখনও হইল না যে, এই অমিত্রাক্ষর একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু—ইহার আত্মাই স্বতন্ত্র। আর সকল ছন্দই গীতিচ্ছন্দ; কেবল ওই একটি ছন্দ তাহা নহে। অমিত্রাক্ষরেরও একটা লিরিক রূপ আছে; উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ কবিগণের মত আমাদের রবীন্দ্রনাথও তাহার যথেষ্ট চর্চ্চা করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর লিরিক তো নহেই, এমন কি, উহা নাটক-গোত্রীয়-ও নয়—খাঁটি এপিকের অমিত্রাক্ষর; অর্থাৎ, উহা একেবারে নিকষ-কুলীন,—কিন্তু আমাদের দেশের নেড়ানেড়ীর দল তাহা কিছুতেই বুঝিবে না! চৌদ্দ অক্ষরের কম বা বেশি হইলে উহার জাত থাকে না; হয় কোমরে হাত দিয়া নাচিতে থাকে, বা কাঠি বাজায়; নয় তো সুর-মূর্চ্ছনায় ঢলিয়া পড়ে। এইজন্যই ওই চৌদ্দ অক্ষরের মাপটি এত মূল্যবান। ওই মাপের ওই চরণ, বাংলা কবিতায় দীর্ঘকাল কর্ষণের ফলে, শেষে স্বাভাবিক বাক্‌ছন্দের অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়াই, বাংলা কাব্যে ছন্দের এই সিংহাসন-রচনা আদৌ সম্ভব হইয়াছিল।

চৌদ্দ অক্ষরের কথা বলিয়াছি, এক্ষণে মিলের কথা বলিব। সকল নামের মত 'অমিত্রাক্ষর' নামটিও এই ছন্দের একটি উপাধিমাত্র—চূড়ান্ত পরিচয় নয়। সেকালের—হেম, নবীন প্রভৃতি কবিগণ, উহার ওই মিলহীনতাকেই আসল লক্ষণ মনে করিয়াছিলেন; কিন্তু বাংলা ছন্দের পক্ষে মিলহীন হওয়া যে কত দুরূহ—মিলের ঘুঙুর কাড়িয়া লইলে, তাহার পরিবর্ত্তে কোন্ দুর্লভতর ভূষায় ইহাকে ভূষিত করা প্রয়োজন, সে ধারণা তাঁহাদের ছিল না। আরও ঠিক করিয়া বলিতে হইলে, মিলের অভাব-পূরণ নয়—যেন সে ভাবনাই নয়,—মিলকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ অনাবশ্যক করিয়া তোলাই এ ছন্দের গৌরব। এইজন্যই স্বচ্ছন্দ যতি, বা অনিয়মিত

পদবিন্যাস সত্ত্বেও, যে ছন্দে মিলের লেশমাত্র প্রয়োজনীয়তা আছে, সে ছন্দ অমিত্রাক্ষরের হাজার মাইলের মধ্যেও আসিতে পারে না,—তুলনীয় হওয়া তো পরের কথা! ঠিক সেই কারণেই, আজকাল যে সব মিলহীন কবিতা রচিত হইয়া থাকে, তাহাদের সহিতও অমিত্রাক্ষরের দূরতম সম্পর্ক নাই—যেমন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার মিলহীন ছন্দ অমিত্রাক্ষর ছন্দ নয়; সে সকল ছন্দও গীতিচ্ছন্দ।

অতএব, আমরা এ পর্য্যন্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দের তিনটি বাহ্য লক্ষণ পাইতেছি;—(১) চরণ হিসাবে উহা সেই পুরাতন পয়ার; (২) উহাতে মিল নাই; এবং (৩) ৮+৬-এর সেই যতি ছাড়াও, ইহার নিজস্ব একপ্রকার যতি আছে। কিন্তু এই বাহ্য; বাংলা ছন্দহিসাবে (ইংরেজী ছন্দে সে প্রশ্নই উঠে না) ইহার প্রথম বা প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য—ইহার Rhythm বা ছন্দস্পন্দ। এই Rhythm-সৃষ্টি মধুসূদন যে উপায়ে করিয়াছিলেন, তাহার সবিশেষ আলোচনা পরে করিব; এখন কেবল ইহাই বলিয়া রাখি যে, এই সমস্যা মধুসূদনকে কখনও উদ্বিগ্ন করে নাই; ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! প্রথম হইতেই, মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল—ওই নূতন যতিবিন্যাস বা ছন্দের গতি-স্বাচ্ছন্দ্যের উপরে। অতএব মনে হয়, Rhythm এবং যতি—অমিত্রাক্ষরের এই দুই প্রধান উপকরণের একটির সম্বন্ধে তিনি যেমন সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন, অপরটির (Rhythm) সম্বন্ধে তাঁহার কানই সজাগ ছিল, তাঁহাকে সজাগ থাকিতে হয় নাই; একটিকে নানা রকমে সাজাইয়া বার বার পড়িয়া কানের সম্মতি লাভ করিতে হইয়াছে, অপরটিকে, শব্দের ধ্বনিতরঙ্গে—কান আপনিই ঠিক করিয়া লইয়াছে। নতুবা মধুসূদন তাঁহার নূতন ছন্দ সম্বন্ধে পাঠকগণকে (বন্ধুর মারফৎ) কেবল এই কয়টি কথা বলিতেন না—

> "So many fellows have, of late, been at me to explain to them the structure of the new verse, that I have been obliged to think on the subject [ইহার পূর্ব্বে একবারও আবশ্যক হয় নাই!]

and the result is that I find that the যতি instead of being confined to the 8th syllable, naturally comes in after the 2nd, 3rd, 4th, 6th, 7th, 10th, 11th and 12th."

ইহাতেও দেখা যায় যে, তখন পর্য্যন্ত এ বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করিবার অবকাশ বা প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই, এবং এক্ষণে ইহাই হইল তাঁহার বিশেষ চিন্তার ফল! ইহার পূর্ব্বে আর একবার তিনি এই মাত্র বলিয়াছিলেন—

"If your friends know English, let them read the Paradise Lost, and they will find, how the verse in which the Bengali poetaster writes is constructed. Let your friends guide their voices by the pause (as in the English Blank verse) and they will soon swear that this is the noblest measure in the language."

—এই উক্তিটিতেই বরং—যতই অসম্পূর্ণ হউক—মধুসূদন তাঁহার ছন্দনির্ম্মাণকৌশলের একটা বড় সন্ধান দিয়াছেন; সেই সন্ধান অনুসারেই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। মিল্‌টনের ছন্দের যতিবিন্যাস-পদ্ধতির কথাটাই কবি এখানে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলেও, আসলে ইহার মধ্যে সব কথাই আছে; তিনি যে, কেবল যতিই নয়, ছন্দস্পন্দের সর্ব্ববিধ কৌশল উহা হইতেই আদায় করিয়াছিলেন, পরে আমি তাহাও দেখাইব। কিন্তু কবির সে বিষয়ে কোন সজ্ঞান চিন্তাই নাই—এমন একটা সম্পূর্ণ বিজাতীয় ভাষার ছন্দ-কৌশল বাংলা ভাষার উপযোগী হইল কি করিয়া, তাহার কোনও কৈফিয়ৎই নাই; এ যেন—"Let there be light, and there was light!" তথাপি, উপায় নাই, যেমন করিয়াই হউক—এ রহস্যের সমাধান আমাদিগকেই করিতে হইবে।

ইংরেজী ছন্দ পয়ারের মত পদভূমক নয়—পর্ব্বভূমক; তাহার চরণে

যতি পড়ে foot বা পর্ব্বের পরে—অক্ষরের পরে নয়। মধুসূদনের ছন্দে পদভাগেরও পদচ্ছেদ আছে, এই পদচ্ছেদের পরেই যতির স্থান হইয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া পদচ্ছেদগুলিই এক একটি 'foot' নয়। এসব বিচার তিনি করেন নাই। কাজ কি ওসব ব্যাকরণ-সমস্যার মধ্যে গিয়া? ছন্দটি কানে বেশ লাগিতেছে তো? ব্যস্, আর কি চাই? বাংলা পয়ারে ওই সকল হাঙ্গামা সত্যই নাই। পদ বা metrical section আছে, কিন্তু তাহার মধ্যে নিয়মিত পদচ্ছেদ বা পর্ব্ব নাই, প্রাচীন পয়ার একেবারে নিছক বর্ণবৃত্ত ছন্দই বটে, তাহাতে বর্ণগত কালাংশ (unit), এবং তাহারই মাপে প্রত্যেক শব্দের, তথা পদসমষ্টির কালপরিমাণই ছন্দের ছন্দত্ব বজায় রাখে। ইহাতে যেমন সংস্কৃত গণবৃত্তের মত কোন নির্দ্দিষ্ট বর্ণসজ্জা নাই, তেমনই হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বর-পরম্পরার ছন্দস্পন্দও নাই। মিল্‌টনের ছন্দে পদচ্ছেদের স্থানে foot আছে, এবং প্রধানত, অক্ষর-বিশেষের গুরু উচ্চারণে ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হয়। মধুসূদনের এসব বিচার করিবার প্রবৃত্তিও ছিল না, অবকাশও ছিল না; ছিল না বলিয়াই, তিনি যাহা অভাবনীয় তাহাকেও সম্ভব করিতে পারিয়াছিলেন। মধুসূদন মিল্‌টনের ছন্দকে, ইংরেজী ছন্দসূত্রের সাহায্যে, কখনও বুঝিতে চেষ্টা করেন নাই—তাই, ওই ছন্দের ধ্বনি-সঙ্গীত উপভোগ করিবার কালে, তাঁহার কাম কিছুক্ষণের জন্যও ইংরেজী বাক্যরীতি বা বাক্যার্থ, এমন কি, শব্দের অন্বয় পর্য্যন্ত উপেক্ষা করিয়া কেবল ধ্বনিটিকে মাত্র গ্রাহ্য করিয়াছে। এ সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিবার অবকাশ পরে ঘটিবে, এখানে প্রাসঙ্গিক-ভাবে কিছু বলিব; ইংরেজী অমিত্রাক্ষর বাংলা ছন্দে ছন্দান্তরিত হইল কোন্ মন্ত্রে, এখানে তাহার একটু আভাস দিব।

৭

বাংলা অমিত্রাক্ষরের ভিত্তি যেমন পয়ার, তেমনই মিল্‌টনের ছন্দের ভিত্তিও—ইংরেজী পয়ার—Heroic Verse বা Iambic Pentameter। মিল্‌টন ইহাকেই অবলম্বন করিয়া, এবং ইহাকে যতদূর সম্ভব শিথিল করিয়া, তাঁহার অমিত্রাক্ষর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মধুসূদনের কানে এই ইংরেজী পয়ারের ধ্বনি কি ভাবে ধরা দেওয়া সম্ভব, তাহা দেখাইবার জন্য, আমি, একেবারে মিল্‌টনের ছন্দে না গিয়া, একটি খাঁটি Heroic Verse-এর চরণ লইব, যথা—

The curfew tolls the knell of parting day

এই চরণটির ছন্দ-ব্যাকরণ এইরূপ—

The cur—few tolls— / the knell—of par—ting day

মিল্‌টনের ছন্দ যাহার পড়া অভ্যাস হইয়াছে তাহার কানে, এই পংক্তিটির ছন্দধ্বনি অনায়াসে এইরূপ শুনিতে হইবে—

The curfew — tolls / the knell — of parting day

—অর্থাৎ, পদভাগ ঠিক রহিল, কেবল পর্ব্ব বা foot-এর পরিবর্ত্তে ওই পদভাগের মধ্যে বিভিন্ন আয়তনের পদচ্ছেদ মাত্র দেখা দিল। এখানে মাত্র চারিটি পদচ্ছেদ আছে (অন্যত্র বেশি থাকিতে পারে), এবং তিনটি বড় stress আছে। ইংরেজী ছন্দের এইরূপ শ্রুতি-গুণ নির্ণয় করিয়া, এবং কানে কেবল তাহাই রক্ষা করিয়া, বাংলায় তাহার অনুরূপ ধ্বনিসৃষ্টি করা যে দুরূহ নয়, তাহা আমরা পরে দেখিব। ইহাতে যেমন পর্ব্বের গোলযোগ আর থাকে না, তেমনই ছন্দস্পন্দরীতিরও বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। বাংলা ছন্দস্পন্দ বা Rhythm-এর কথাও পরে বলিব। তৎপূর্ব্বে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-রচনার প্রয়াসের একটু ইতিহাস দিব।

মধুসূদন সর্ব্বপ্রথম তাঁহার 'পদ্মাবতী' নাটকের জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে

কতকগুলি পংক্তি রচনা করিয়াছিলেন। সেই নাটকে এই পংক্তিগুলি আছে—

জন্ম মম দেবকুলে;—অমৃতের সহ
গরল জন্মিয়াছিল সাগর মন্থনে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলি সমান মোর কাছে।
পরের যাহাতে ঘটে বিপরীত, তাতে
হিত মোর; পরদুঃখে সদা আমি সুখী।

এখানে কবির একমাত্র লক্ষ্য—ভাষায় কথ্যভঙ্গিকে, এবং ছন্দে বাক্যরীতিকে প্রাধান্য দিয়া তদনুযায়ী যতিস্থাপন। কিন্তু এই প্রথম প্রয়াস প্রায় ব্যর্থ হইয়াছে; মিলের পরিবর্ত্তে ছন্দস্পন্দ নাই—সেজন্য নূতনতর যতিবিন্যাসের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। রচনা প্রায় গদ্য হইয়া উঠিয়াছে—ওই 'জন্মিয়াছিল' ক্রিয়াপদটি সে পক্ষে কম বিপদজনক হয় নাই।

ইহার পর, 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র এই পংক্তিগুলিতে মধুসূদনের ছন্দ-সাধনা আর এক স্তরে উঠিয়াছে। যথা—

আচম্বিতে পূর্ব্বভাগে গগনমণ্ডল
উজলিল, যেন দ্রুত পাবকের শিখা,
ঠেলি' ফেলি' দুই পাশে তিমির তরঙ্গে
উঠিলা অম্বর পথে; কিংবা দ্বিষাম্পতি
অরুণ সারথি সহ স্বর্ণচক্ররথে
উদয় অচলে আসি দরশন দিলা।
* * *
এ সুন্দর প্রভাকর-পরিধি মাঝারে,
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই?
কেমনে, কহ, মা শ্বেতকমলবাসিনী!
কেমনে মানব আমি চাব ওর পানে?
রবিচ্ছবি পানে, দেবি! কে পারে চাহিতে?
এ দুর্ব্বল দাসে কর তব বলে বলী।

—এখানে তেমন ছন্দস্পন্দ, অথবা পদমধ্যস্থ বিরাম-যতির কৌশল না থাকিলেও—মিলের অভাব আর একটা বস্তুর দ্বারা পূরণ হইয়াছে; নিপুণ শব্দযোজনার জন্য পংক্তিগুলির সুরঝঙ্কারে একটি সুললিত কাব্যচ্ছন্দের সৃষ্টি হইয়াছে; অর্থাৎ, ইহাই বাংলা কবিতার প্রথম

Lyrical Blank Verse ; এখানে speech-rhythm-এর পন্থা ত্যাগ করিয়াই কবি কতকটা সাফল্য লাভ করিয়াছেন। উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে ইহাই প্রমাণ হইল যে, মিল ত্যাগ করিয়াও বাংলায় ছন্দসঙ্গীত সম্ভব। কিন্তু এ অমিত্রাক্ষর Epic নয়—Lyric-এর উপযোগী; ইহাতে ভাবের সুরই আছে—প্রাণের সর্ব্ববিধ অনুভূতি ও আকূতির বিচিত্র কণ্ঠস্বর-সঙ্গীত নাই। তথাপি, ইহাই প্রথম খাঁটি মিলহীন বাংলা কাব্যচ্ছন্দ—ইহাতেই কবি-মধুসূদনের জন্ম হইল। আজ এতকাল পরেও, যখন এইরূপ পংক্তিপর্ব্ব পাঠ করি, এবং ইহার সহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা ছন্দের তুলনা করি, তখন বিস্ময়ে অভিভূত না হইয়া পারি না। এই Lyric Blank Verse-ই পরে রবীন্দ্রনাথের হাতে অপূর্ব্ব গীতি-ঝঙ্কার লাভ করিয়াছে। তথাপি, ইহার ছন্দগতিতে যে যতিসংযম আছে—ইহার সুপরিমিত পদক্ষেপে যে একটি ধীর মাধুর্য্য আছে, রবীন্দ্রনাথের ছন্দে তাহা নাই; তাহার কারণ, দুই কবির প্রকৃতিই স্বতন্ত্র,—একজনের প্রকৃতি ক্লাসিকাল, অপরের রোমান্টিক।

কিন্তু মধুসূদন শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন, গীতিসুরপ্রধান অমিত্রাক্ষর তাঁহার কাম্য নহে। 'তিলোত্তমা' তাঁহার প্রথম কাব্য, এখানে তিনি নিছক কাব্যপ্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া, ছন্দের মত, কল্পনারও একটা মুক্তি-সুখ আস্বাদন করিতেই ব্যাকুল। ছন্দকে এই পর্য্যন্ত আয়ত্ত করিয়া তিনি সহসা মহাকাব্য রচনার প্রবল প্রেরণা অনুভব করিলেন—দুঃসাহস বাড়িয়া গেল। কিন্তু পুরানো পয়ারের সেই লিরিক প্রবৃত্তিকে এইরূপ প্রশ্রয় দিয়া মহাকাব্যের ছন্দসৃষ্টি করা যাইবে না—তাই তিনি মিল্‌টনের ছন্দধ্বনি বাংলায় প্রতিধ্বনিত করিবার উপায় সন্ধান করিতে লাগিলেন। আমি পূর্ব্বে ইংরেজী ছন্দটিকে বাংলায় ধরিবার একটা সঙ্কেত নির্দ্দেশ করিয়াছি—একটা স্থূল সাদৃশ্য-বোধ যে সম্ভব, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু আসল সমস্যা ওই ঝোঁকগুলি। সেইরূপ ঝোঁকের আভাস ইতিপূর্ব্বে ভারতচন্দ্রের পয়ারে দেখা দিলেও—রীতিমত rhythmical accent হিসাবে তাহার পরীক্ষা তখনও হয় নাই। বাংলা উচ্চারণ-রীতিতে, শব্দ বা বাক্যাংশের আদ্য-অক্ষরে যেটুকু ঝোঁক পড়ে, তাহাও এই ছন্দের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে। ছড়ার ছন্দে, আদ্য-অক্ষরে যে ধরনের

স্বরবৃদ্ধি হয়, তাহা দ্বারাও ছন্দস্পন্দের বৈচিত্র্য-বিধান অসম্ভব; তাহাতে ছন্দ একরূপ স্পন্দিত হয় বটে, কিন্তু তাহার সেই একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি ছন্দের সুরকে কথার অনুকূল করে না। ঈশ্বর গুপ্তের সুরহীন পয়ারও একপ্রকার ছড়ার ছন্দের মত শুনিতে হয়—

বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে

—ইহার চার-চার পদচ্ছেদ লক্ষণীয়, এবং ইহাও পড়িবার সময়ে প্রতি পর্ব্বের আদ্য-অক্ষরে একটু ঝোঁক দিলে ভাল হয়; ইহাও যেন—

এক কন্যা রাঁধেন বাড়েন এক কন্যা খান

—এইরূপ ছড়ার খুব নিকট-জ্ঞাতি। এইরূপ ছক-কাটা ছন্দ, ও নিয়মিত ঝোঁক অমিত্রাক্ষরের পক্ষে যে অচল, তাহার প্রমাণ—মিল্‌টনের ছন্দেও ইংরেজী Iambic foot-এর ঘন ঘন নিয়ম-লঙ্ঘন। মধুসূদনের কান বোধ হয় প্রথম হইতেই এই তত্ত্বটিকে আভাসে বুঝিয়া লইয়াছিল। বাংলা ছন্দে একটু ঝোঁকের অবকাশ আছে বটে, কিন্তু তাহা সর্ব্বত্র আদ্য-অক্ষরের ঝোঁক। তথাপি সেই ঝোঁকের বলেই শব্দগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পদচ্ছেদের সৃষ্টি করে। এই পদচ্ছেদ অনুসারেই ঝোঁকগুলির স্থানসন্নিবেশ হইলে, ছন্দ প্রকৃত অমিত্রাক্ষর-গুণোপেত হইতে পারিবে—ভাব-অর্থের বিচিত্র ধ্বনিময় অভিব্যক্তিকে ধারণ করিতে সমর্থ হইবে, এই ধারণা তাঁহার মনে উদয় হইতে বিলম্ব হয় নাই। তথাপি 'তিলোত্তমা'র প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'মেঘনাদে'র মেঘনির্ঘোষ ধ্বনিয়া উঠা বিস্ময়কর বটে; ইহাতে প্রমাণ হয়, মধুসূদনের প্রতিভার বিকাশ অসম্ভব দ্রুত হইয়াছিল; অর্থাৎ যে অসাধারণ শ্রম-শক্তিকে প্রতিভার প্রধান লক্ষণ বলা হইয়া থাকে, এই অল্প সময়টুকুতে মধুসূদনের ভিতরে সেই শক্তির পূর্ণ ক্রিয়া চলিতেছিল। তিনি যে, এই সময়ে, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের ভাষা, এবং ভারতচন্দ্রের পয়ার, এই দুইয়ের সহিত কানের ও মনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় করিতেছিলেন, তাহা খুবই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। ছন্দের সঙ্গে সঙ্গেই ভাষারও আবির্ভাব হয়; তাই, খাঁটি বাংলা বাক্‌পদ্ধতি আরও ভাল করিয়া আয়ত্ত করার পর, তিনি সেই পদ্ধতিতেই প্রচুর পরিমাণে সাধু সংস্কৃত শব্দ যোজনা করা আবশ্যক বোধ করিয়াছিলেন—মিল্‌টনের কাব্যের ধ্বনিবৈভবও যে কেন খাঁটি Saxon

ইংরেজীর দ্বারা সম্ভব হয় নাই, তাহা তিনি জানিতেন। 'তিলোত্তমা'র যে পংক্তিগুলি আমি পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা বাংলা কাব্যভাষার উপর মধুসূদনের অসাধারণ অধিকারের সাক্ষ্য দিতেছে। সে ভাষা যেমন খাঁটি বাংলা ভাষা, তেমনই তাহাতে যে নূতন ছন্দধ্বনি যুক্ত হইয়াছে, তাহার রূপটিই নূতন—মূল প্রকৃতি নূতন নয়। ইহার পর, এই ভাষারই বাক্‌বৈভব—তথা ধ্বনিগৌরব—বৃদ্ধি করিয়া, মধুসূদন যে কাব্যসঙ্গীত সৃষ্টি করিলেন, তাহারও মূলে রহিয়াছে সেই খাঁটি বাংলা বাচনভঙ্গি ও বাক্যরীতি; এতবড় কাব্যচ্ছন্দ—এমন সুমহান সঙ্গীতরব সহজ ও স্বাভাবিক বাক্যচ্ছন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হইল! এইবার আমি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের ধ্বনিকৌশল, যতদূর সম্ভব বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিব।

৮

আমি পূর্ব্বে পয়ার ছন্দের যে ক্রমবিবর্ত্তন দেখাইয়াছি, তাহাতে শেষ পর্য্যন্ত চার অক্ষরের পদচ্ছেদ প্রকট বা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—ইহাই ছন্দের সেই আদি প্রবৃত্তির জের। এইরূপ চারের ছক-কাটা, এবং সুরযুক্ত ছিল বলিয়াই, পয়ারে ভাষার ধ্বনি-রূপটি কখনও আমল পায় নাই। শেষে ভারতচন্দ্রের যুগে আসিয়া বাংলা শব্দগুলির পৃথক ধ্বনিমূর্ত্তি এ ছন্দে কিছু কিছু দেখা দিতে আরম্ভ করিয়াছে—পদগুলি চারের ছক-কাটা না হইয়া, শব্দের আয়তন অনুসারে ভিন্নতর ছেদের সৃষ্টি করিতেছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, রচনা গীতিপ্রধান না হইয়া, বর্ণনা, বিবৃতি ও চিত্রপ্রধান হওয়ায়, এবং তজ্জন্য, ভাব-অর্থকে মূর্ত্তিমান করা—শব্দ-ভাণ্ডারকে চিত্রকরের বর্ণভাণ্ডে পরিণত করা অত্যাবশ্যক হওয়ায়—ছন্দকেও 'গীতি' হইতে 'কথা'র অভিমুখী হইতে হইয়াছিল; কবিগণকে—শুধু ছন্দ নয়, শব্দকৌশলের দিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইয়াছিল। এজন্য এখন হইতে ছন্দের মধ্যে ২, ৩, ৫, ৬-অক্ষরের পদচ্ছেদ দেখা দিয়াছে। ভারতচন্দ্রের কবিতায় ছন্দের উপরে ভাষায় কথ্যভঙ্গির প্রভাব আরও

বাড়িয়াছে, এবং আবশ্যকমত, একই কবিতায়, পাশাপাশি 'গীতি' ও 'কথা'র সুর স্থান পাইয়াছে, যেমন—

বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ।
পাটনি বলিছে মাগো বৈস ভাল হয়ে।
পায়ে ধরি কি জানি কুমীরে যাবে লয়ে।

ইহার প্রথম দুই পংক্তির গীতিসুর যেমন স্পষ্ট, তেমনই শেষের চরণ দুইটিতে কথার ছন্দই প্রবল। আমার বিশ্বাস, মধুসূদন এ সকলই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, অথবা অজ্ঞানে আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল শব্দ-অনুযায়ী পদচ্ছেদের ভঙ্গিই নয়, মধুসূদনের প্রয়োজন আরও বেশি। নূতন বাংলা গদ্য হইতেই মধুসূদন তাঁহার প্রয়োজনসিদ্ধির পক্ষে আরও সুস্পষ্ট সঙ্কেত পাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সেই গদ্যের ভাষাও তাঁহার পরিকল্পিত মহাকাব্যের বাগ্‌বন্ধের প্রায় সমধর্ম্মী। সেই গদ্যের বাক্যবিন্যাসে যে একটা ছন্দের আভাস ছিল, তাহা বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন। ইহার সেই বাক্যচ্ছন্দ নির্ভর করে প্রধানত দুইটি বস্তুর উপরে—(১) বাক্যের অঙ্গসন্ধির ছেদগুলি; (২) শব্দবিশেষের উপরে বাক্যরীতি-গত (syntactical) ঝোঁক। মধুসূদন ভারতচন্দ্রের কবিতাও যেমন পড়িয়াছিলেন, তেমনই বিদ্যাসাগর প্রভৃতির গদ্য-রচনাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। এই সামান্য সঙ্কেতগুলি হইতেই তাঁহাকে তাঁহার ছন্দের প্রাথমিক উপকরণ উদ্ভাবন করিতে হইয়াছিল। 'তিলোত্তমা' হইতে 'মেঘনাদে' পৌঁছিয়া তিনি এই ভাব-অর্থের বাক্যচ্ছন্দকেই পয়ারের কাব্যচ্ছন্দের সহিত মিলাইয়া অমিত্রাক্ষরের সেই আদি রূপটির একটি বড় পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন, যথা—

এ সুন্দর প্রভাকর-পরিধি মাঝারে
মেঘাসনে বসি ওগো কোন্ সতী ওই?

—এই গীতিচ্ছন্দের অমিত্রাক্ষর রূপান্তরিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তুতে পরিণত হইয়াছে,—

গাঁথিব নূতন মালা, তুলি সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে ফুল, ইচ্ছা সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে ভাষা, কিন্তু কোথা পাব,

(দীন আমি!) রত্নরাজী, তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর? কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্চনে।

[মধুসূদন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই, একই কারণে, রচনায় কমা-সেমিকোলন কিছু বেশি ব্যবহার করিতেন]

উপরের পংক্তিগুলি পড়িবার সময়ে, কেবল ভাব ও অর্থের অনুযায়ী বাক্যচ্ছেদ করিলেই, এ ছন্দ যেন আপনিই চলিতে থাকিবে; অথচ, প্রত্যেক চরণের ছন্দ-যতিও (৮+৬) ক্ষুণ্ণ হইবে না। কিন্তু পড়িবার সময়ে, নূতন যতিগুলি ছাড়া, আর কি ঘটিতেছে—পদভাগের মধ্যে ভিন্নতর বিরাম-স্থানই শুধু নয়, পদচ্ছেদগুলি কি করিয়া হইতেছে, তাহা আমরা সব সময়ে লক্ষ্য করি না; কিন্তু কবির সেদিকে বিশেষ যত্ন ও দৃষ্টি ছিল। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে যে একটি কৌতুককর সংবাদ আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহা সত্যই মূল্যবান। তিনি লিখিয়াছেন, মধুসূদন তাঁহার কাব্য পাঠ করিবার সময়ে, ধীরে ধীরে প্রত্যেক শব্দটির পৃথক উচ্চারণ করিতেন—তাই, তাঁহার পাঠ-ভঙ্গি বড়ই অদ্ভুত বোধ হইত। আমার মনে হয়, ইহা মধুসূদনের কাব্যপাঠ নয়—ছন্দপাঠের বর্ণনা; কবি তখন নূতন ছন্দটিকেই তাঁহার শ্রোতৃবর্গের কানে ভাল করিয়া ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন—মিলহীন চরণগুলিকে স্পন্দিত করিবার রীতিটি বুঝাইবার জন্যই ওইরূপ করিয়া পড়িতেন। উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলি পড়িবার সময়ে, আমরাও—ততটা না হইলেও, কতকটা সেইরূপ করিয়াই পড়ি; অথচ পড়িবার সময়ে তাহা লক্ষ্য করি না; যথা—

গাঁথিব—নূতন মালা,—তুলি—সযতনে
তব—কাব্যোদ্যানে—ফুল;—ইচ্ছা—সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে—ভাষা;—কিন্তু—কোথা পাব,
দীন আমি! রত্নরাজী? তুমি—নাহি দিলে,
রত্নাকর?—কৃপা—প্রভু—কর—অকিঞ্চনে।

উপরে যে ছেদগুলি দেখাইয়াছি, তাহা পদচ্ছেদ মাত্র; কারণ, ওই ছেদগুলি, প্রত্যেক শব্দের আদ্য-অক্ষরে যে ছেদ পড়ে, তাহারই অনুযায়ী;

শব্দও সর্ব্বত্র একক নহে, সমাস বা অন্বয়ের ফলে তাহা যুক্ত হইতেও পারে। তথাপি, এইরূপ পদচ্ছেদ হইতেই বাংলায় ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হইয়াছে; সেখানে ঝোঁকগুলি আরও প্রবল বলিয়া ছেদগুলিও অন্যরূপ হইয়া থাকে; যথা—

গাঁথিব—নূতন মালা, / তুলি—সযতনে
তব কাব্যোদ্যানে—ফুল; ইচ্ছা—সাজাইতে
বিবিধ ভূষণে—ভাষা; কিন্তু—কোথা পাব,
(দীন আমি!)—রত্নরাজী,—তুমি নাহি দিলে,
রত্নাকর?—কৃপা, প্রভু, কর—অকিঞ্চনে।

উপরে উচ্চারণগত ছোট ঝোঁকগুলি বাদ দিয়া—বাক্যরীতিগত (syntactical) বড় ঝোঁকগুলিই দেখাইয়াছি। এইরূপ ঝোঁকের ঠিক আগেই একটি করিয়া ছেদ পড়িতেছে—পদচ্ছেদও সেই ভাবে হইতেছে। এ সম্বন্ধে পরে আরও বলিব।

মধুসূদনের ছন্দের Rhythm বা ছন্দস্পন্দের প্রাথমিক পরিচয় এই পর্য্যন্ত। এক্ষণে আমাকে বাংলা পয়ারের প্রকৃতি, ও তাহাতে এই ঝোঁকের স্থান এবং মূল্য সম্বন্ধে, পুনরায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে হইবে।

৯

'মাত্রা' (Quantity), 'অক্ষর' (Syllable) এবং 'ঝোঁক' বা 'স্বরবৃদ্ধি' (Stress, accent)—ইহাদের কোন-একটা ছন্দের unit বা পরিমাপক হিসাবে, ক্ষুদ্রতম অংশের কাজ করিয়া থাকে। আমাদের বাংলা ছন্দে 'অক্ষর' যে সেই কাজ করিয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইংরেজীতে যাহাকে Syllable বলে, আমাদের অক্ষর তাহাই; যদিও গুণ ও ক্রিয়াহিসাবে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে এই অক্ষরের নাম—'বর্ণ'। অক্ষর যে-ছন্দের unit বা মাত্রা (এখানে

'মাত্রা' শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহার করিতেছি), তাহাতে অক্ষরসংখ্যা কম-বেশি হইবার জো নাই। সংস্কৃত ছন্দও মূলে অক্ষরমাত্রিক; Rhythm বা ছন্দতরঙ্গের জন্য অক্ষরের গুরু-লঘু গুণভেদ, এবং ছন্দে তাহার স্থান যেমনই হউক;—ওই অক্ষরের সংখ্যা সর্ব্বদা ঠিক থাকা চাই। কিন্তু পরে, এই অক্ষর-মাত্রা—যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব-বর্ণ এবং দীর্ঘস্বর-যুক্ত বর্ণের প্রভাব স্বীকার করিয়া—আর এক প্রকার ছন্দের উদ্ভব করিয়াছে; সংস্কৃতে ইহাকে 'জাতিছন্দ' বলে। প্রথমে প্রাকৃত বা ভগ্ন-সংস্কৃত ভাষার কাব্যেই সম্ভবত এইরূপ মাত্রাবৃদ্ধিও ছন্দের ভিত্তিস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল, এবং শেষে সংস্কৃতেও সেই ছন্দ চলিত হইয়াছিল—সে ইতিহাস আমার জানা নাই; কেবল ইহাই দেখিতেছি যে, বৈদিক ভাষার ছন্দ যেমনই হউক, খাঁটি সংস্কৃত ছন্দ বর্ণবৃত্ত ছিল; এইরূপ Quantity তাহার পরিমাপক ছিল না। বাংলার প্রাকৃত গোত্র-বশে আদিতে তাহার ছন্দও ওইরূপ মাত্রাবৃত্ত ছিল, তাহা আমরা দেখিয়াছি—পরে মাত্রার প্রভাবমুক্ত হইয়া আমাদের ছন্দ খাঁটি বর্ণবৃত্ত বা অক্ষরসংখ্যামূলক হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সংস্কৃত বা অন্য ছন্দের মত তাহাতে ছন্দস্পন্দের কোন উপকরণ রহিল না—অক্ষরগুলি যেমন সমমাত্রার, তেমনই তাহারা মাত্রাগুণবর্জ্জিত। এরূপ ছন্দ, গানে ভিন্ন কবিতায় চলে না। প্রত্যেক অক্ষরকে স্বরান্ত করিয়া একটা কাল-পরিমিত, যতিযুক্ত চরণ, এবং তাহার বিশিষ্ট ছাঁদটির পুনরাবর্ত্তন—ইহাই এই ছন্দের প্রকৃতি। মাত্রা যেমন ইহার উপাদান নয়, তেমনই Stress বা স্বরবৃদ্ধি এ ছন্দের কোনরূপ সহায় নয়। ইংরেজী ছন্দে অক্ষর বা Syllable-এর একটা হিসাব থাকিলেও, তাহা Stress-প্রধান; সংস্কৃত ছন্দ বর্ণবৃত্ত হইলেও, তাহাতে অক্ষরের মাত্রা-গুণ ছন্দের একটা বড় সহায় হইয়া আছে। আমাদের প্রাচীন বাংলা ছন্দে ওই বর্ণ ছাড়া আর কিছুই নাই। কিন্তু আমি পূর্ব্বে পদভূমক ছন্দকে—অর্থাৎ এই-জাতীয় বনিয়াদী বাংলা ছন্দকে 'মাত্রিক' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, আধুনিক পয়ার-জাতীয় ছন্দ যেমন দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বর্ণেরও একরূপ মাত্রা-গুণ স্বীকার করিতে হয়, এবং তাহা ছন্দেরই প্রয়োজনে—ছন্দস্পন্দের নয়। আমরা এখন হসন্তবর্ণকে স্বরান্ত করিয়া

পড়ি না, অথচ তাহাকেও একটা পূরা unit হিসাবে গণ্য করি; এবং তাহা সম্ভব হইয়াছে—পূর্ব্ব-বর্ণের ওজন বৃদ্ধি করিয়া। যেমন—

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি

ইহার 'সম্মুখ' যেমন চার অক্ষর নয়—তিন অক্ষর, তেমনই 'বীর'ও এক অক্ষর না হইয়া দুই অক্ষর। যুক্ত অক্ষরটির কথা ছাড়িয়া দিলাম; হসন্ত বর্ণটিকেও একটি পূরা unit ধরিতে হয়, এবং সেজন্য পূর্ব্ব-বর্ণের ওজন বা মাত্রা একটু বাড়াইয়া লওয়া হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, আধুনিক পয়ার-জাতীয় ছন্দে, বর্ণসংখ্যার উপরে আর একটা বস্তুর যোগ হইয়াছে; ইহাকেই আমি একরূপ 'Quantity' বা মাত্রা-স্থানীয় করিয়া এ ছন্দকে 'মাত্রিক' বলিয়াছি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও, রহস্য এমনই যে, উহাও ঠিক মাত্রাবৃদ্ধি নয়; অর্থাৎ, ঐ পূর্ব্ব-বর্ণের ওজন বৃদ্ধির দ্বারাই ছন্দরক্ষা হইতেছে না—হসন্তবর্ণটিকেও ঠিক ওই স্থানে চাই; এই মাত্রাবৃদ্ধির দ্বারা তাহারই মাত্রার অপূর্ণতাটুকু কোনরূপে পূরণ করা হইতেছে; প্রমাণ—

কাশীরাম দাস কহে—

এই পদটির হসন্তবর্ণ দুইটি উঠাইয়া দিয়া, কেবল তাহার পূর্ব্ব-বর্ণ 'রা' ও 'দা'-এর মাত্রা বৃদ্ধি করিলে,—একটু টানিয়া পড়িলে,—ছন্দই নষ্ট হইয়া যাইবে; ওইরূপ দীর্ঘ উচ্চারণ বাংলা ছন্দের স্বভাব-বিরুদ্ধ; ওই 'দা' ও 'রা'র পরে হসন্তবর্ণের স্থানটি লোপ পাইলে চলিবে না। বাংলার এই ছন্দকে 'মাত্রিক' বলিবার আরও কারণ এই যে, পদভূমক ছন্দে মাত্রার বিশেষ লক্ষণ না থাকিলেও সাধুভাষায় ওই বনিয়াদী ছন্দেই তাহার প্রাচীন মাত্রাধর্ম্ম যে এখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই তাহার প্রমাণ, ওই ভাষার ধ্বনি হইতেই আধুনিক পর্ব্বভূমক ছন্দের জন্ম হইয়াছে; এবং তাহাতে মাত্রাবৃত্তের স্পষ্ট আমেজ রহিয়াছে।

এইবার এই খাঁটি বর্ণবৃত্তের বর্ণবিন্যাসে rhythm কি করিয়া সম্ভব হইল তাহাই বলিব। আমাদের উচ্চারণে, শব্দ বা বাক্যাংশের (Phrase) আদ্য-অক্ষরে একটু যে ঝোঁক পড়ে, সে কথা বলিয়াছি। আবার হসন্তবর্ণের জন্য পূর্ব্ব-অক্ষরে যে একটু মাত্রাবৃদ্ধি হয়, তাহাও দেখিয়াছি। এই দুইটির সাহায্যে, বাংলা ছন্দে ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করার

উপায় পূর্ব্ব হইতেই ছিল। তথাপি, এ পর্য্যন্ত বাংলা কবিতার ছন্দে স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরভঙ্গি প্রশ্রয় পায় নাই—যেন প্রাণের ভাষা, কাব্যচ্ছন্দে ছন্দিত হইতে পারে নাই। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে বাঙালীর প্রাণ যে মুক্তিকামনার আবেগে স্পন্দিত হইয়াছিল—ভাবচিন্তার ক্ষেত্রে, নূতন করিয়া যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আগ্রহে সে অধীর হইয়াছিল, সেই Romantic ভাবোৎসারের ফলে, আর সকল আন্দোলনের মত, কাব্যের আদর্শ-কল্পনায় যে বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠিল—মধুসূদন তাহারই প্রথম ও প্রধান নেতা; তিনিই ভাষা অপেক্ষা, যে বস্তুর সহিত কবিতার ভাবগত যোগ অধিক, সেই ছন্দকে স্বাধীন স্বচ্ছন্দ বাক্যরীতি ও উচ্চারণরীতির সহিত যুক্ত করিলেন; তাহাতে সেই পুরাতন অক্ষর, বা স্বরান্ত বর্ণ, তাহার ছন্দোগত বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াই, নূতন গুণ-সমৃদ্ধি লাভ করিল—বাংলা বর্ণবৃত্ত সত্যকার ছন্দ-গৌরবের অধিকারী হইল। অক্ষরগুলি পূর্ব্বের মতই পায়ে পায়ে ঠিক চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের মাথা শস্যশীর্ষের মত দুলিতে আরম্ভ করিল, আমাদের বর্ণবৃত্তেও অক্ষরের স্বরবৃদ্ধি ছন্দকে তরঙ্গিত করিতে লাগিল। এখনও বর্ণই ছন্দের পরিমাপক unit হইয়া আছে, কিন্তু অতঃপর Syllable-এর সহিত স্বরবৃদ্ধিও যুক্ত হইল; দীর্ঘস্বর-জনিত মাত্রা(Quantity)র কথা পরে বলিব।

কিন্তু ইংরেজী ছন্দের মত আমাদের ছন্দে এই স্বরবৃদ্ধি (accent) প্রাধান্য লাভ করে নাই—তাহার দ্বারা বর্ণের প্রাধান্য ক্ষুণ্ণ হয় নাই। বাংলায় ওই স্বরবৃদ্ধির এমন শক্তি নাই, যাহাতে অক্ষরপরিমাণকে গৌণ করিয়া, ওই স্বর-বৃদ্ধির নিয়মিত বিন্যাসই ছন্দকে ধারণ করিতে পারে। বর্ণের এই প্রাধান্য হেতু আমাদের ছন্দে—ধীর, দ্রুত, মন্থর—কত প্রকার লয় যে সম্ভব হইয়াছে, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ভাল করিয়া পড়িতে জানিলে, তাহা লক্ষ্য করিয়া, মুগ্ধ হইতে হয়। নিয়মিত গুরু-লঘু বর্ণপরম্পরার উপরে নির্ভর করে না বলিয়া, এ ছন্দে কণ্ঠস্বরাশ্রিত ভাবের এমন লীলা সম্ভব হইয়াছে। সংস্কৃত গণ-মুক্ত অক্ষরবৃত্তেও এই কারণে কাব্যের ভাবরূপ এমন সজীবতা লাভ করে। বর্ণ বা অক্ষর, এবং এই স্বরবৃদ্ধি—এই দুইয়েরই সহযোগে মধুসূদনের ছন্দ এইরূপ

সজীব ও শক্তিশালী হইয়াছে। অতএব মিল্‌টন যে উপাদান ও উপকরণ হইতে এমন অপূর্ব্ব ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছিলেন,—'Syllable', 'Accent' এবং 'Quantity', এ সকলকেই ছন্দ-রাসায়নিক যাদুকরের মত তিনি যেরূপ মিলাইয়াছিলেন,—সে বিষয়ে, মধুসূদনের কেবল ওই Syllable-এর সুবিধাই ছিল, অপর সুবিধাগুলি নিজেই করিয়া লইতে হইয়াছিল; মিল্‌টনের কেবল Stress-এর সুবিধাই ছিল। অপর-গুলিও তিনি নিজের শক্তিবলে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিলেন। মধুসূদনের ওই Stress, Accent বা Quantity-র সুযোগ ছিল না—বাংলার পক্ষে সে সুযোগ করিয়া লওয়া একরূপ দৈবীশক্তি-সাপেক্ষই বটে। কোথায় সংস্কৃত বর্ণবৃত্তের সেই স্বরতরঙ্গলীলা—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

অথবা—

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি / বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগা,

[সংস্কৃত ছন্দেও স্বরবৃদ্ধি একজাতীয় নয় বলিয়া দুই রকমের চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছি।]

—আর কোথায় সেই বর্ণমাত্রসম্বল নিস্তরঙ্গ পুরানো পয়ার—

রতনরঞ্জিত তার পদাঙ্গুলি সব।
রাজহংস গতি যেন নূপুরের রব।

মধুসূদনের কানে অবশ্য সংস্কৃত অনুষ্টুভের বাজনা বাজে নাই—তাঁহার কানে বাজিতেছিল—

Hail—holy light / offspring—of Heaven—first born!

কিংবা—

Then feed on thoughts that voluntary move
Harmonious numbers, as the wakeful bird

Sings darkling, and in shadiest covert hid
Tunes her nocturnal song.

অথবা—

Bright "effluence of bright "essence "in create

[চিহ্নগুলি ছন্দ-ব্যাকরণের চিহ্ন নয়। প্রত্যেক চরণে যে প্রবল স্বরবৃদ্ধি (stress) আছে তাহার স্থানে (") চিহ্ন, এবং যেখানে যেখানে ওই স্বরবৃদ্ধিতে দীর্ঘ স্বরমাত্রার বেগ আছে, সেখানে অক্ষরের নিম্নে (—) এই চিহ্ন দিয়াছি।]

সংস্কৃতের ছন্দস্পন্দ বাংলায় সম্ভব নয়, কিন্তু কতকটা এই ধরনের তরঙ্গ বাংলায় যে সম্ভব তাহার কারণ পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি; এবং ইংরেজী ছন্দের সহিত এই ধ্বনিসাদৃশ্যের সম্ভাব্যতাও পূর্ব্বে উদাহরণসহ উল্লেখ করিয়াছি। উপরে উদ্ধৃত দুই ভাষার কবিতার একটি বর্ণবৃত্ত, অপরটি একরূপ Accent-বৃত্ত—ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির জন্য ছন্দই ভিন্নজাতীয়। আসলে, ওই Accent, Syllable এবং Quantity নামগুলির একটা সাধারণ অর্থ থাকিলেও, ভাষাবিশেষে উহাদের প্রত্যেকটির গুণ স্বতন্ত্র। সংস্কৃত syllable এবং ইংরেজী Syllable যেমন ব্যাকরণ অনুসারে এক হইলেও, কার্য্যত বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ধ্বনিরূপ ধারণ করে, তেমনই ইংরেজীর stress ও সংস্কৃতের স্বরবৃদ্ধি এক নয়—বাংলারও নহে। Quantity নামে ছন্দের যে সাধারণ উপাদান বুঝায়—দুই বিভিন্ন ভাষায় সেই Quantity-মূলক ছন্দ একইরূপ ধ্বনির সৃষ্টি করে না। উপরি-উদ্ধৃত সংস্কৃত ছন্দে যে Syllable এবং যে Stress বা স্বরবৃদ্ধি আছে, ইংরেজীতেও সেই দুই নামের দুই বস্তুই আছে, এমন কি দীর্ঘ-স্বরও যেমন আছে, তেমনই, যে স্বরবৃদ্ধি বা Stress আছে, তাহাও সংস্কৃতের যুক্তাক্ষর-পূর্ব্ব বর্ণের প্রায় সমজাতীয়। তথাপি উভয়ের ছন্দধ্বনিতে আদৌ সাদৃশ্য নাই। বাংলা 'অক্ষর' ও সংস্কৃত 'অক্ষর' এক হইলেও, বাংলা পয়ারে যুক্ত বা অযুক্ত হসন্তের ব্যবহার একটু বিচিত্র বলিয়া, অক্ষরের ধ্বনিধর্ম্ম সম্পূর্ণ এক নহে। আবার ইংরেজীর সহিত বাংলা অক্ষরের তুলনা করিলে দেখা যাইবে, উহাদের ওজনে কত পার্থক্য রহিয়াছে। ইংরেজী Syllable-এর শোষণশক্তি বাংলা অক্ষরের নাই; বাংলা 'সম্মুখ'-এর 'সম্' যদি এক অক্ষরও হয়, তথাপি তাহা ইংরেজী এক অক্ষর Heaven (Heav'n)-এর সমান নয়; বাংলা 'কবি'র দুই অক্ষর ইংরেজী 'holy'র

দুই অক্ষরের সমান হইলেও, 'offspring'-এর সমান নয়। তথাপি মধুসূদন যে বাংলা অমিত্রাক্ষর রচনায় মুখ্যত ইংরেজীর সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহার কারণ, মিল্‌টনের ছন্দ ইংরেজী ছন্দ হইলেও, তাহার মধ্যেই মহাকবি যে সঙ্গীত প্রবাহিত করিয়াছিলেন, তাহার সেই উদারতর নীতি যেন ভাষার ধ্বনিকে অবলম্বন করিয়াও অতিক্রম করিয়াছে; তাই, অপর একটি ভাষাতেও সেই সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছিল; সে যেন ছন্দেরই প্রতিচ্ছন্দ নয়—সেই সঙ্গীতেরই একটা প্রতিরূপ। মিল্‌টনের ছন্দ মধুসূদনের কানে কিরূপ বাজিয়াছিল, ইতিপূর্ব্বে তাহার আভাস দিয়াছি; তাহাতে দেখা যাইবে যে, ইংরেজী Iambic pentameter-এর বাঁধা foot, এবং নিয়মিত ছোট বড় ঝোঁক-(accent)-এর দিকে দৃষ্টি রাখিবার কোন প্রয়োজন নাই; তাহা না হইলে, মধুসূদন ইংরেজী ছন্দের বন্ধন হইতে ওই সঙ্গীত-ধ্বনিকে পৃথক করিয়া, বাংলায় প্রতিধ্বনিত করিতে পারিতেন না। ইংরেজী অমিত্রাক্ষর সম্বন্ধে নিম্নোদ্ধৃত উক্তিটি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

"The lack of fixed syllablic quantities is just what I emphasise. This lack makes definite beat impossible; or at least it makes it absurd to scan English verse by feet."

এবং—

"If the student has a good ear he reads the verses as it was meant to be read, as a succession of musical bars (with pitch of course), in which the accent marks the rhythm, and pauses and rests often takes the place of missing syllables."

মধুসূদনের বাংলা ছন্দের পক্ষে, ওই 'definite beat impossible' বড়ই কাজে লাগিয়াছিল; 'succession of musical bars with pitch of course' তাঁহার কানকে তৈয়ারি করিয়াছিল; এবং বাংলা পয়ারের (৮+৬) পদভাগের succession, তাহারই কতকটা উপযোগী হইয়াছিল। কেবল 'missing syllables'-এর স্থান পূরণ আর কিছু দ্বারা সম্ভব ছিল না—বাংলা বর্ণবৃত্ত তাহা সহ্য করিতে পারে না; তাই মধুসূদনের ছন্দের লয় আরও সংযত ও ধীর-মন্থর—সে ততটা মুক্তপক্ষ নয়। এইবার আমি মধুসূদনের পংক্তিগুলির ধ্বনিনির্ম্মাণ-কৌশলের বিশেষ পরিচয় দিব।

ক্রমশ

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

নারায়ণী সেনা

তোমরা এসেছ ভীরু-পায়ে দূর প্রান্তর হয়ে পার,
সদর-দুয়ার বন্ধ হয়েছে, খুলেছে খিড়কি-দ্বার।
তোমরা এসেছ গোধূলি-বেলায়,
রবি ডোবে-ডোবে ; রঙের খেলায়
কালো ছায়া ফেলে চুপিসারে ওই নামিছে অন্ধকার।
তোমরা এসেছ ভীরু-পায়ে দূর প্রান্তর হয়ে পার।

আপনারে ল'য়ে ব্যস্ত ছিলাম হ'ল যে অনেক কাল,
তোমাদের কথা ভুলে গিয়েছিনু ? অতীতের জঞ্জাল
ভেদ করি মোর মন-আঙিনায়
জাগ নি তোমরা কুসুম-শোভায় ?
চকিতে কখনো অলস দুপুরে ছেঁড়ে নি অন্তরাল ?
আপনারে ল'য়ে ব্যস্ত ছিলাম হ'ল যে অনেক কাল।

বনপথে যেতে কুসুম-গন্ধ-পিয়াসী আমার মন,
আপন তৃপ্তি চেয়ে খোঁজে নাই বহুবিধ আয়োজন ;
শুধু ছিলে সখি, তোমরা কজন,
তবু বনপথ ছিল নির্জ্জন,
বাতাসে ভাসিত ফুল-পরিমল অলির গুঞ্জরণ।
বনপথে যেতে কুসুম-গন্ধ-পিয়াসী আমার মন।

গণদেবতার রাজদরবারে পড়ে নি আমার ডাক,
ভক্ত কোথাও থাকেও যদি-বা, ছিল তারা নির্ব্বাক।
তখনো মানিয়া জনতার দাবি,
মনের আগারে লাগাই নি চাবি,
যশোগঙ্গারে ভগীরথ মম আনে নি বাজায়ে শাঁখ।
গণদেবতার রাজদরবারে পড়ে নি আমার ডাক।

কাজের তাড়না বড় হয়ে গেল, খেলা ধীরে ভুলিলাম,
এক এক ক'রে তোমরাও সখি, শুধু হয়ে এলে নাম।
অরণ্যপথে চরণের রেখা
লেপে মুছে গেল, ফিরে এনু একা—
এক দিকে যাহা করিলাম লাভ, আর দিকে দিনু দাম।
কাজের তাড়না বড় হয়ে গেল, খেলা ধীরে ভুলিলাম।

অন্তরে হয়ে নিঃস্ব, বাহিরে বসিলাম সমারোহে,
পিছু ফিরিবার নাই অবসর অবিরাম-গতিমোহে,
হায় রে, আমার সফল সাধনা,
গোপন বেদনা কেহ বুঝিল না ;
নিজেও বুঝি নি, বিজয়মাল্য এসেছি কণ্ঠে ব'হে।
অন্তরে হয়ে নিঃস্ব, বাহিরে বসিলাম সমারোহে।

সমুখের ভিড় কমেছে, এবার পিছন ফিরিয়া চাই,
প্রখর দিনের আলোকের জ্বালা বেলাশেষে আর নাই।
আবছা আলোয় শোভে ম্লান ধরা,
কঠিন নহে তো তোমাদের ধরা,
একে একে সখি, ফিরিয়া ফিরিয়া তোমাদের গান গাই।
সমুখের ভিড় কমেছে, এবার পিছন ফিরিয়া চাই।

হয়তো সকলে পড়িবে না ধরা পুরাতন গৌরবে,
হয়তো কাহারো উজ্জ্বল ছবি খানিকটা ম্লান হবে ;
স্মৃতি-সমুদ্র মন্থন ক'রে
ভুল হবে কেবা আগে কেবা পরে ;
ক্ষমিও তোমরা—সবাই সমান রাত্রির উৎসবে।
হয়তো সকলে পড়িবে না ধরা পুরাতন গৌরবে।

* * *

আমি একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম—
বিচিত্র দেশ, এক দিকে তার শ্যামলশোভন মাটি,

ফলফুলশোভা দৃশ্য সে অভিরাম ;
কুলকুল রবে বহে স্রোতোজল, তীরে তার পরিপাটী
নিবিড়-বসতি সম্পদ-ভরা গ্রাম।
বহুদিন আগে আমি একবার স্বপ্ন দেখেছিলাম।

স্বপ্ন দেখেছিলাম—
আর দিকে ঝলে ধুধু মরুভূমি, তপ্ত বালুকারাশি
সারমেয়-রূপী প্রকৃতির যেন লকলকে জিবখানি—
কাছে দূরে যত সলিলবিন্দু সকলি ফেলিবে গ্রাসি ;
চীৎকার-ফরা মরুভূমি, নয় জনপদ-কানাকানি ;
ভুলিয়া গিয়াছি কি তার আছিল নাম।

স্বপ্ন দেখেছিলাম—
ভ্রমিতেছিলাম সেই বিচিত্র দেশে,
দেখিতেছিলাম এ-পাশে ও-পাশে দুই রূপ ধরণীর—
কভু উদ্যান, কভু বা শ্মশান-বেশে।
মরু-বালুবুকে জলধারা দেখে চকিতে হলাম থির,
বিস্ময় মানিলাম।

স্বপ্ন দেখেছিলাম—
মনে হয়েছিল মরীচিকা বুঝি হবে,
আমি বুঝি মৃগ, হায় মৃগতৃষ্ণিকা !
কাছে গেলে ফাঁকি সুশীতল বাপী মিলাবে শূন্য নভে,
হবে লেলিহান শ্মশান-বহ্নিশিখা।
জ্ব'লে-পুড়ে-মরা অতিলোভী এই পথিকের পরিণাম !

স্বপ্ন দেখেছিলাম—
ত্যজি জনপদ ক্লান্ত পথিক মরু-জলধারা পানে
ছুটে চ'লে গেল, কি তার আকর্ষণ !
যত কাছে যায়, মায়া না মিলায়, অতি বিস্ময় মানে—

ঝাঁপ দেয় জলে, দেহ সুশীতল, জুড়াল ক্লান্ত মন ;
সাহস-ভুলের মিলে গেল পুরা দাম।

স্বপ্ন দেখেছিলাম—
তারপর কি যে হ'ল, কোথা জল, কোথায় পান্থ সেই,
পথের তৃষায় শুকাল মরুর ধারা ;
বহু ক্লেশ স'য়ে চিহ্ন ধরিয়া পথে ফিরে এল যেই
নূতন লক্ষ্যে পথিক আত্মহারা।
বিপথে বিপথে পথ পেয়ে তার পূর্ণ মনস্কাম।

বহুদিন আগে স্বপ্ন দেখেছিলাম—
মরুজলধার কোথায়, কে তুমি এসেছ ফল্গু আজি,
আতপতপ্ত পথের ক্লান্তি তোমার বক্ষ মাঝে—
রৌদ্রদাহন মূর্ত্তি তোমার শিশিরে কি এলে মাজি,
মরীচিকা এলে সাত-সায়রের সাজে ?
রাতের শান্তি-রূপ ধ'রে এলে দিবসের সংগ্রাম ?

স্বপ্ন দেখেছিলাম—
সেদিন তোমায় দেখি নি সত্য, তুমি ছিলে অনুভূতি,
আজ সেই তুমি এসেছ মোহন বেশে—
বসিবে নিশীথে নায়িকা-আসনে হে মোর দিনের দূতী,
দয়া করি যাহা দিয়াছ, আজ তা দিবে তুমি ভালবেসে,
ফণী-বেষ্টন হোক সখি আজ কুঞ্চিত কেশদাম।

* * *

ত্যাগের গর্ব্বে ভরিয়া উঠেছে মন,
অন্তরবাসী করে তবু হাহাকার।
তোমারে কি আমি দিয়েছি বিসর্জ্জন,
কান পেতে গান শুনিতেছি তবে কার ?
শেষ হ'ল খেলা না হইতে আয়োজন,
প্রভাত-বেলায় নামিল অন্ধকার।

পূর্ব্ব-অচলে রবির উদয় পানে
গোধূলি-আকাশ চিরদিন চেয়ে থাকে,
বিমূঢ় দাস্তে বিয়াত্রিচেরই টানে
ফিরে ফিরে চায় শূন্য পথের বাঁকে—
তুমি আমি ছাড়া আর কে খবর জানে,
পূর্ণিমা ছুঁয়ে গেল অমাবস্যাকে।

আমি জানি শেষ হয় নাই বোঝাপড়া,
তবুও তোমায় ডাকিব না আর সখি—
যদি ভুল হয়, যদি প'ড়ে যাই ধরা,
যদি হাতে পেয়ে মনে হয় গেছি ঠকি
সেদিন গিয়েছে, দুজনেরই ছিল ত্বরা,
খসেছে কখন হস্তের আমলকী।

তোমারে বিকানু কি মূল্য-বিনিময়ে
আজ মনে হ'লে অনুশোচনায় মরি।
তুমি ভেবেছিলে, এ সাবধানীরে ল'য়ে
সারাটা জীবন কাটাবে কেমন করি।
বুঝি নি সেদিন—ছিলাম অন্ধ হয়ে,
কেটে গেল কত নিষ্ফল্য বিভাবরী।

তুমি ছিলে সতী, আমিও ছিলাম সৎ,
পীরিতির নদী বহে নি উজান মেলে,
বজায় অতীত, থাকেও ভবিষ্যৎ—
বর্ত্তমানের উপরি পাওনা পেলে।
দুকূলপ্লাবিনী বর্ষার নদীবৎ
পারি নি ছুটিতে তটবন্ধন ঠেলে।

সৌর-আকাশে ঘুরিয়া কক্ষহীন
হঠাৎ মিলিতে পারে দুই ধূমকেতু,

গ্রহদল রয় ম্যাপে-আঁকা-পথলীন,
পরস্পর যে দূরে রয় সেই হেতু।
এ-পারে ও-পারে ব্যবধান চিরদিন,
দুই পারে তবু বন্ধন করে সেতু।

মোদের মাঝারে ছিল না জলের ধারা,
দুই মরুভূমি, মাঝখানে মরীচিকা।
ধুধু প্রান্তর মাঝে রয় সীমাহারা,
দুপ্রান্তে তার যেন আলেয়ার শিখা।
দুই মেঘ ভাসে আকাশেতে ছাড়া ছাড়া,
মাঝখানে তার নাই বিদ্যুৎলিখা।

আস নি এখন, আর আসিও না কাছে,
তব বাঁশীখানি বাজিতে থাকুক দূরে,
স্বপ্ন পুড়িতে দিও না দেহের আঁচে,
বিফল চুমায় চাপিয়া মেরো না সুরে।
বাদলা-পোকারা থামুক সার্শি-কাচে,
প্রদীপ-শিখায় মরিতে দিও না পুড়ে।

* * *

রৌদ্রদহনে দগ্ধ ধরণী, আরাম পঙ্ক-সলিলে—
বল কর্দ্দম, তিমিরবরণী, তুমি কি পথিকে ছলিলে?
সে তো করে নাই পঙ্কের ভয়, জ্বালাই চেয়েছে ভুলিতে,
সে জ্বালা করেছ তুমি নিরাময় তব জলকণাগুলিতে।
অশুচি হয়তো ছিল, তৃষিতের কি হবে হিসাবে ভালমন্দের,
সে শুধু জ্বালিত জ্বালা গাত্রের যাবে তোমারেই দলিলে।

নিদাঘ-দিবস কেটে গেছে, বেলা সন্ধ্যায় আসে নামিয়া,
তৃপ্ত, করিয়া কর্দ্দম-খেলা ঘরে ফিরে গেছে ঘামিয়া।
তাপিত-স্পর্শ তুমি কর্দ্দম, তারো পরে কর কামনা,
বিলাসী জনের ফুরায় যে দম, তুমি কোন দিন থাম না।

ভাগ্য তোমার তুমি থাক কাদা, যেতে চায় যেবা তারে দাও বাধা,
দেখেছি তোমার সকরুণ সাধা, থাকিতে পারি নি থামিয়া।

ঘরেতে ফিরিল বিজয়ী পরিয়া পঙ্কতিলক ললাটে,
তুমি বহিতেছ স্মৃতিটি ধরিয়া করকলঙ্ক-মলাটে।
কাদা ও তৃষিতে জানি তারপর দেখাশুনা নাই কভুও,
তিমির-নিশার স্মৃতিসহচর—দিনে মনে ভাসে তবুও?
হায় সখি, হায়, ক্রূর সংসার, বহে মাঝখানে স্রোত ক্ষুরধার,
তুমি চিরদিন থাক ঐ-পার, আমি বিপরীত তলাটে।

পাপপুণ্যের হিসাবনিকাশ ফুরাল দিনের আলোকে,
কণ্টকজ্বালা আর ফুলবাস ঢাকে যে মুদিত পালকে।
মনে পড়িতেছে কাঁটার মুখেতে একটি শোণিত-বিন্দু,
কবে হয়েছিল ক্ষুদ্র বুকেতে উদ্বেল মহাসিন্ধু!
আজ গোষ্পদে সাগরের ছায়া পাই যে দেখিতে বল এ কি মায়া,
বুঝিতে পারি না আত্মা বা কায়া নিন্দিত আর ভাল কে!

দারুণ নিদাঘে তোমরা একদা জল যোগায়েছ পথিকে,
সেই কথা আজ মনে জাগে সদা জানি না অসতী সতী কে!
আমি কি পেয়েছি আমি শুধু জানি, পারি না বিচার করিতে,
দিয়েছিনু দাম, সাথে মনখানি বাঁধা ছিল কিনা কড়িতে।
দেওয়া-নেওয়া দাবি তোমরা কর নি, দিয়েছ যোগায়ে পারের তরণী,
আজ মনে হয় মধুর ধরণী শুধু তোমাদের গতিকে।

আজ অবেলায় এস এস সখি, চাঁদ উঁকি দেয় আকাশে,
পূর্ণিমা-চাঁদ—দেখিবে চমকি অমাবস্যায় ঢাকা সে।
চিরচলমান এ জগৎ মাঝে কিছুই নহেক নিত্য,
এ কি কম লাভ, ফাল্গুন-সাঁঝে খুশি হয়েছিল চিত্ত।

চকিতে ফুটিয়া রজনীগন্ধা সুরভি করেছে একটি সন্ধ্যা,
বিফল বিচার—সুফলা বন্ধ্যা, রক্তরঙিন ফ্যাকাশে।

মনে পড়িতেছে ক্ষণবিশ্রাম আলোকোজ্জ্বল কক্ষ,
শুধু মনে নাই কাহার কি নাম, কার কি যে ছিল লক্ষ্য।
ঢেউয়ের চূড়ায় বুদ্বুদশোভা ক্ষণে জাগে ভাঙে চকিতে—
মহাসমুদ্রে ভাসা আর ডোবা, জিতে নিয়ে পুন ঠকিতে
আসে-যায় নাই কিছুই সেদিন; আজ যে হয়েছি হিসাব-অধীন,
দিবসের আশা সন্ধ্যায় ক্ষীণ, দুরু দুরু করে বক্ষ।

মাটির গর্ভে যে জীবন মোর, যে জীবন মোর আঁধারে,
বাঁধিয়াছ দিয়ে ফুলমালা-ডোর, দাঁড়ায়েছ তার বাঁ-ধারে।
পঙ্কের বুকে পঙ্কজ হয়ে ফুটেছ অমল সলিলে,
সে কাহিনী সখি, কে বেড়াবে ক'য়ে, কি লিখিবে পাকা দলিলে?
খিড়কির পথে কাছে এসে শোন, স্মৃতি-মন্থনে বাধা নাই কোনো,
তোমাদের সাথে হবে না কখনো নূতন জীবন ফাঁদা রে।

* * *

লিখতে হবে তোমার কথা শেষ পাতাতে;
বুকে যখন জাগল ব্যথা নিশীথ-রাতে—
দুয়ের মাঝে নীরবতা হাতটি হাতে।

মুখে আজো হয় নি বলা, "ভালবাসি";
দুজনে পথ হয় নি চলা পাশাপাশি।
গোপন—প্রেমের ছলাকলা কান্নাহাসি।

অলস দ্বিধা ভাঙব কি না বুঝতে নারি,
ছুঁলেই হয়তো হবে বীণা ছিন্নতারই;
সুর যে হবে মিলন-বিনা মিথ্যাচারই।

মনে তোমার ভাঙন ধরে একলা শুয়ে ?
কান্না আসে বালিশ 'পরে মুখটি থুয়ে—
তারার আশিস্ তখন ঝরে আঁধার ভুঁয়ে ?

যাও নি দূরে, তুমি ছিলে কাছাকাছি,
আস নি হায় মোর নিখিলে প্রসাদ যাচি।
চলি নি পথ দুজন মিলে মরি বাঁচি।

মরা গাঙে সহসা বান আসবে কবে,
ফল্গুধারায় লাগবে যে টান উজান বেয়ে ?
মিলবে দুটি ভীরু পরান মহোৎসবে !

পথ চলা শেষ হয় নি আমার, দাও নি ধরা,
সন্ধ্যা নামে, ক্রমেই আঁধার বসুন্ধরা ;
ব'সে আছি খুলিয়া দ্বার, কর ত্বরা।

এখনো ঠাঁই আছে বুকে, দীর্ঘ রাতি—
সব হাহাকার যাক না চুকে ; জীবন-সাথী
হই দুজনে সুখে-দুখে—নিবুক বাতি।

* * *

রাখো রাখো তুমি নারায়ণ,
ছাড়হ কপট নিদ্রা, মেলহ নয়ন।
নিয়ে নারায়ণী সেনা জানো মোর চলিবে না,
সূত্র বিনা মালিকা বয়ন
নাহি হয় তুমি জানো, সেনাদল বৃথা আনো,
রাখো রাখো তুমি নারায়ণ।

বেঁধেছি ক্ষণিক খেলাঘর,
তুমি জানো ভিত্তি তার বালুকা-উপর।

বার বার ঘর বাঁধি, আসে ঝড় আসে আঁধি,
পুনরায় ধুধু করে চর।
মাটির পরশ খুঁজি, যত বাধা তত বুঝি
বেঁধেছি ক্ষণিক খেলাঘর।

জীবনের স্বপ্ন যায় টুটে,
জল গ'লে গ'লে যায় বদ্ধ করপুটে।
লইয়া আকণ্ঠ তৃষা মন নাহি পায় দিশা,
লক্ষ্যহীন যায় ছুটে ছুটে ;
ক'রো না ছলনা আর তৃষিতেরে বার বার,
জীবনের স্বপ্ন যায় টুটে।

সবে মানিয়াছে পরাজয়—
কামনা মরিয়া যায় প্রেম জেগে রয়।
শুধু কি শুনিব গান, আমি খুঁজিতেছি প্রাণ
মৃত্যুমাঝে চির-জ্যোতির্ময়।
নিশীথের অন্ধকার রৌদ্রালোকে মানে হার,
সবে মানিয়াছে পরাজয়।

সব স্মৃতি ম্লান হয়ে আসে,
শোভিছে সিন্দুরদীপ্তি ললাট-আকাশে।
তুলসীর বেদীতলে সন্ধ্যাদীপখানি জ্বলে,
শঙ্খরব বাতাসেতে ভাসে।

ছায়াছবি দলে দলে ভেঙে যায় স্রোতোজলে,
সব স্মৃতি ম্লান হয়ে আসে।

প্রণতি ঘনায় মনোমাঝে,
সেনাদল একে একে ফিরে যায় লাজে।
ডাক তুমি বিদ্রোহীরে, তোমারে থাকুক ঘিরে,
ফিরে যাক সংসার-সমাজে ;
ভুলে ভুলে পেয়ে পথ পুরে তার মনোরথ,
প্রণতি ঘনায় মনোমাঝে।

দেবতা, বিলম্ব নহে আর,
চাহ চোখ মেলে, লহ নিজ অধিকার।
শান্ত হ'ল রণাঙ্গন, ক্লান্ত তব সেনাগণ,
এবারে আপনি লহ ভার।
নিশীথিনী শ্রান্তিহরা নামিতেছে, কর ত্বরা,
দেবতা, বিলম্ব নহে আর।

সব দুঃখ কর নিবারণ,
ছাড়হ অনন্ত-শয্যা, জাগো নারায়ণ,
মনে হয় আজো কারা চেয়ে আছে সর্ব্বহারা ;
নব পুষ্প করিয়া চয়ন,
হয়তো গাঁথিছে মালা, সে হবে ভুজঙ্গ-জ্বালা,
সে দুঃখ করহ নিবারণ।

ছোটলোক

উন্নতমস্তক রাঘব সরকার দ্বিপ্রহরের নিদারুণ রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া দ্রুতপদে পথ চলিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে খদ্দর, মাথায় ছাতা নাই। পায়ে জুতা অবশ্য আছে, কিন্তু তাহা এমন কণ্টকসঙ্কুল যে, বিক্ষত পদদ্বয়কে শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের মর্য্যাদা দিলে খুব বেশি অন্যায় হয় না। উন্নতমস্তক রাঘব সরকারের কিছু ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি দ্রুতপদেই চলিয়াছেন। সুনির্দ্দিষ্ট-নীতি-অনুসরণকারী, অনমনীয়-চরিত্র রাঘব সরকার—চিরকালই উন্নতমস্তক। তিনি কখনও কাহারও অনুগ্রহের প্রত্যাশী নহেন, কাহারও স্কন্ধারূঢ় হইয়া থাকেন না, যথাসাধ্য সকলের উপকার করেন, পারতপক্ষে কাহারও দ্বারা উপকৃত হন না। স্বকীয় মস্তক সর্ব্বদা উন্নত রাখাই তাঁহার জীবনের সাধনা।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া এক রিকশাওয়ালা তাঁহার পিছু লইল।

রিকশা চাই বাবু—রিকশা—

রাঘব একবার ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলেন। অস্থিচর্ম্মসার লোকটা তাঁহার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। যাহারা নিতান্ত অমানুষ, তাহারাই মানুষের কাঁধে চড়িয়া যায়—ইহাই রাঘবের ধারণা। তিনি জীবনে কখনও পালকি অথবা রিকশা চড়েন নাই, চড়া অন্যায় মনে করেন। খদ্দরী আস্তিন দিয়া কপালের ঘামটা মুছিয়া বলিলেন, না, চাই না।

দ্রুতপদে হাঁটিতে লাগিলেন।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া রিকশাওয়ালাটাও পিছু পিছু আসিতে লাগিল। সহসা রাঘব সরকারের মনে হইল, বেচারার ইহাই হয়তো অন্নসংস্থানের একমাত্র উপায়। রাঘব কৃতবিদ্য ব্যক্তি, সুতরাং তাঁহার মস্তিষ্কে ধনিকবাদ, দরিদ্র-নারায়ণ, বল্‌শেভিজ্‌ম, ডিভিশন অব লেবার, পল্লীর দুর্দ্দশা, ফ্যাক্টরি, জমিদারি অনেক কিছুই নিমেষের মধ্যে খেলিয়া

গেল। তিনি আর একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। আহা, সত্যই লোকটা জীর্ণশীর্ণ অনাহারক্লিষ্ট। হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল।

ঘণ্টা বাজাইয়া রিকশাওয়ালা আবার বলিল, চলুন না বাবু, পৌঁছে দিই—কোথায় যাবেন?

ওই শিবতলা পর্য্যন্ত যেতে ক পয়সা নিবি?

ছ পয়সা।

আচ্ছা, আয়।

রাঘব সরকার চলিতে লাগিলেন।

আসুন বাবু, চড়ুন।

তুই আয় না।

রাঘব সরকার গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন।

রিকশাওয়ালাও পিছু পিছু ছুটিতে লাগিল।

মাঝে মাঝে কেবল নিম্নলিখিতরূপ বাক্য-বিনিময় হইতেছে।

আসুন বাবু, চড়ুন।

আয় না।

শিবতলায় পৌঁছিয়া রাঘব সরকার পকেট হইতে ছয়টি পয়সা বাহির করিয়া বলিলেন, এই নে।

আপনি চড়লেন কই?

আমি রিকশা চড়ি না।

কেন?

রিকশা চড়া পাপ।

ও। তা আগে বললেই পারতেন—

লোকটার চোখে মুখে একটা নীরস অবজ্ঞা মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। সে ঘাম মুছিয়া আবার চলিতে শুরু করিয়া দিল।

পয়সাটা নিয়ে যা।

আমি কারও কাছ থেকে ভিক্ষে নিই না।

ঠুনঠুন করিয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে সে পথের বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

"বনফুল"

রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী

২

৬। **ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার***। ইং মে ১৮১৭ (১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৩৯ শক)। পৃ. ৩+৬৪।

এই পুস্তকের ভূমিকাটি (পৃ. ১-৩) রামমোহনের কোন গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হয় নাই। আমরা উহা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম:—

॥ ভূমিকা॥

ওঁতৎসৎ। মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের বেদান্তচন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগতদিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জন্মিয়াছে, যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকলশাস্ত্র প্রসিদ্ধ যে পথ তাহা সর্ব্ব সাধারণ প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য একবার প্রবর্ত্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম। কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদ জন্মে প্রথম এই যে সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ়২ সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থহইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্ত-চন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়। দ্বিতীয়। বেদান্ত-চন্দ্রিকা সাতষষ্টিপৃষ্ঠ তাহাতে অভিপ্রায় করি যে বেদান্তের আট নয় সূত্রের

* ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রকাশিত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র উত্তরে এই বিচারপুস্তক লিখিত। "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ৪র্থ পুস্তক-রূপে 'বেদান্ত চন্দ্রিকা" প্রকাশিত হইয়াছে।

অধিক নাই আর বেদের দুই তিন প্রমাণ লিখিয়া থাকিবেন অধিকন্তু এই সকল সূত্র কোন অধ্যায়ের কোন পাদের হয় আর ঐ শ্রুতি কোন উপনিষদের অথবা কোন ভাষ্যে ধৃত হয় তাহা লিখেন না এবং বেদান্ত-চন্দ্রিকার মঙ্গলাচরণীয়-প্রভৃতি শ্লোকসকল কোন গ্রন্থের হয় তাহা প্রায় লিখেন না অতএব নিবেদন দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সূত্র এবং শ্রুতি আর স্মৃত্যাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য্য লিখিবেন তাহার বিশেষরূপে নিদর্শন যেন লিখেন। তৃতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথমে লিখেন যে এগ্রন্থ কাহার ভাষা বিবরণের উত্তর দিবার জন্যে লেখা যাইতেছে এমৎ নহে অথচ প্রথমঅবধি শেষ পর্য্যন্ত হে অগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কেবল আমাদিগ্যেই শ্লেষ করিয়াছেন এবং স্থানে২ যাহা আমরা কদাপি কোনো গ্রন্থে লিখি নাই এবং স্বীকার করি নাই তাহা আমাদের মত হয় এমৎ জানাইয়াছেন অতএব তৃতীয় প্রার্থনা এই যে শাস্ত্রার্থের অনুশীলনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য্য দূষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠ এবং পংক্তির নির্দ্দেশ পূর্ব্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রালাপে দুর্ব্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য্য কৃপা পূর্ব্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব ইতি।

৭। **কঠোপনিষৎ**। ইং আগষ্ট ১৮১৭।

৮। **মাণ্ডুক্যোপনিষৎ**। ইং অক্টোবর ১৮১৭। পৃ. ২৩+১৯।

৯। **গোস্বামীর সহিত বিচার**। ইং জুন ১৮১৮। পৃ. ৫০।

ইহা "ভগবদ্গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর"।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৯-২০) সহিত যে পুস্তক-তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার বাংলা-বিভাগে রামমোহনের একখানি পুস্তিকার এইরূপ উল্লেখ পাইতেছি :—

Reply to a MS. of Ram-gopala Sormono.

ইহা 'গোস্বামীর সহিত বিচার' হওয়া অসম্ভব নহে।

১০। **সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ**। ইং নবেম্বর ১৮১৮। পৃ. ২২।

এই পুস্তিকার শেষে কোন প্রকাশকাল দেওয়া নাই। ইহা যে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, ২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

"সহমরণ।—কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু স্থূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"

১১। **গায়ত্রীর অর্থ**। ইং ১৮১৮ (শকাব্দা ১৭৪০)।

১২। **মুণ্ডকোপনিষৎ**। ইং মার্চ ১৮১৯।

এই পুস্তকের শেষে প্রকাশকাল দেওয়া নাই। সকলেই ইহার প্রকাশকাল "১৮১৭" খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা যে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়, ২৭ মার্চ ১৮১৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

"নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত রামমোহন রায় অথর্ব্ব বেদের মণ্ডুকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্য্য কৃত তাহার টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জ্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন।"

পাদরি লংও তাঁহার মুদ্রিত-বাংলা-পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন,—"Mundak Upanishad, by R. Ray, 1819."

রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 'রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'র ৮০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, মণ্ডুকোপনিষৎ "মাণ্ডুক্যোপনিষদের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভূমিকাতে এমন উল্লেখ আছে।" কিন্তু মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় এরূপ কোন উল্লেখ নাই।

রাজনারায়ণ বসু ও বেদান্তবাগীশ 'রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'তে যে মূল পুস্তকের সাহায্যে মুণ্ডকোপনিষৎ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহার একটি স্থল খণ্ডিত। গ্রন্থাবলীর ৫৮৭ পৃষ্ঠার শেষে এই অংশ বসিবে :—

ব্রহ্ম তেঁহই সত্য ইহা পূর্ব্বকালে অঙ্গিরাঋষি আপন শিষ্য শৌনককে কহিয়াছেন আর ব্রতোপাসনার অনুষ্ঠান যাহারা না করিয়া থাকেন

তাঁহারা এ উপনিষদের পাঠ করিবেন না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি নমস্কার পুনরায় তাঁহাদের প্রতি নমস্কার দুইবার কথনের তাৎপর্য্য এই যে মুণ্ডকোপনিষদের সমাপ্তি হইল।

ইতি মুণ্ডকোপনিষৎ সমাপ্তা।

১৩। **সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ** *। ইং নবেম্বর ১৮১৯। পৃ. ৩৩।

Second Conference / between / An Advocate and an Opponent / of the practice of / Burning Widows Alive. / সহমরণ বিষয়ে / প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ. / Calcutta, / Printed at the Mission Press. / 1819. /

১৪। **কবিতাকারের সহিত বিচার।** ইং ১৮২০। পৃ. ২৩+৪৯।

"ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখমাত্র না করিয়া কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানাপ্রকার কদুক্তি ও ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন···তাহার মধ্যে২ দেবতা বিষয়ের শ্লোক এই দুইকে একত্র করিয়া ঐ পুস্তককে প্রত্যুত্তর শব্দে বিখ্যাত করিয়াছেন···।"

১৫। **সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার।** ইং ১৮২০। পৃ. ১৬।

ইহা দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায়, এবং বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় মুদ্রিত। শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে।

ইহার ইংরেজী অনুবাদও *Apology for the Pursuit of Final Beatitude, independent of Brahmunical Observances* নামে মুদ্রিত হইয়াছিল।

---

* কালাচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' (আগষ্ট ১৮১৯, পৃ. ২৮) ইংরেজী অনুবাদ-সহ প্রকাশ করেন। ইহারই উত্তরে রামমোহন উপরিলিখিত পুস্তকখানি প্রচার করিয়াছিলেন।

এই সময় সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত সুবা শাস্ত্রীর সহিত রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচার হয়। বাংলা ও সংস্কৃতে রচিত রামমোহনের এই বিচার-পুস্তকখানির উল্লেখ কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (১৮১৯-২০) পরিশিষ্টে মুদ্রিত পুস্তকাবলীর তালিকায় আছে। এই তালিকার বাংলা এবং সংস্কৃত বিভাগে প্রকাশ :—

Reply to the Observations
of Sobha-sastree...Rammohun Roy...Baptist Mission Press.

সুবা শাস্ত্রী ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী উভয়েই সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

১৬। **ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ।** ইং ১৮২১।

এই সাময়িক পুস্তকের প্রথম তিন সংখ্যার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ইহার এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ (*The Brahmunical Magazine. The Missionary and the Brahmun*) থাকিত। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ৪র্থ সংখ্যা *The Brahmunical Magazine* দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা কেবল ইংরেজীতে মুদ্রিত।

'ব্রাহ্মণ সেবধি' সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকের ২২-২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

১৭। **চারি প্রশ্নের উত্তর।** ইং মে ১৮২২। পৃ. ২৬।

২৫ চৈত্র ১২২৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী চারিটি প্রশ্ন করেন ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ ৩২৬-২৮ দ্রষ্টব্য)। এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তর আলোচ্য পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।

১৮। **পাদরি ও শিষ্য সংবাদ।** ইং ১৮২৩।

ইহার ইংরেজী অংশ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল; বাংলা অংশও ঐরূপ সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

১৯। **গুরুপাদুকা**। ইং ১৮২৩। পৃ. ৬।

পাদরি লঙের মুদ্রিত-বাংলা-পুস্তকের তালিকায় প্রকাশ :—

Guru Paduka, by R. Ray, pp. 6, 1823, reply to the Chandrika's defence of idolatry.

এই পুস্তিকার ভূমিকাটি এইরূপ :—

১৭ই আষাঢ় ৭০ সংখ্যার সমাচারচন্দ্রিকা সম্বলিত শ্রীমদ্ধর্ম্ম সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির প্রিয় পোষ্যস্য কস্যচিৎ ক্ষুদ্র শিষ্যস্য ইতি স্বাক্ষরিত জ্ঞানাঞ্জন শলাকা নামে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছিল যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে সে দুর্ব্বাক্যের উত্তর দিবার প্রয়োজনাভাব কিন্তু গত চন্দ্রিকায় তদুত্তর প্রার্থনায় শ্রীগৌরাঙ্গ দাস এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন সুতরাং তাহার এবং তৎসংসর্গিদের কৃতার্থের নিমিত্ত গুরুপাদুকা নামিকা এই পত্রিকা প্রদান করিতেছি ইহাতে যদি জ্ঞান না জন্মে তবে চেষ্টান্তর করিতে হইবেক।—'ছোট গল্প', ২য় বর্ষ, ২৪শ সংখ্যা, পৃ. ১১৭৯।

২০। **পথ্যপ্রদান**।* ইং ১৮২৩। পৃ. ২৬১।

পথ্য প্রদান / সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমতজ্জন্যমনস্তাপবিশিষ্ট কর্ত্তৃক / কলিকাতা / সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / শকাব্দা ১৭৪৫ / MEDICINE / for the sick / offered / By / One who laments / his inability to perform / all righteousness. / Calcutta, / Printed at the Sungscrit Press. / 1823. /

২১। **প্রার্থনাপত্র**। ইং ১৮২৩। পৃ. ৪।

* এই পুস্তকখানি উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দ্দেশে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-রচিত 'পাষণ্ডপীড়নে'র উত্তরে লিখিত। "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ৮ম গ্রন্থরূপে 'পাষণ্ডপীড়ন' রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে প্রকাশিত হয়। লঙের মুদ্রিত-বাংলা-পুস্তকের তালিকাতে ইহার প্রকাশকাল—১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ দেওয়া আছে।

২২। **ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ**। ইং ১৮২৬ (শকাব্দা ১৭৪৮)।

২৩। **কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার**। ইং ১৮২৬ (শকাব্দা ১৭৪৮)।

২৪। **বজ্রসূচী** (১ম নির্ণয়)। ইং ১৮২৭ (শকাব্দা ১৭৪৯)।

২৫। **গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং**। ইং ১৮২৭ *।

২৬। **ব্রহ্মোপাসনা**। ইং ১৮২৮।†

২৭। **ব্রহ্মসঙ্গীত**। ইং ১৮২৮।†

২৮। **অনুষ্ঠান**। ইং ১৮২৯। পৃ. ৬+৪।

অনুষ্ঠান। / শকাব্দাঃ / ১৭৫১ /

২৯। **সহমরণ বিষয়**। ইং ১৮২৯ (শকাব্দাঃ ১৭৫১)। পৃ. ১১।

৩০। **সহমরণ-নিবারণে লর্ড বেণ্টিঙ্ককে মানপত্র**। জানুয়ারি ১৮৩০।

এই মানপত্রখানি রামমোহনের রচনা হওয়া বিচিত্র নহে। ইহার ইংরেজী অনুবাদটিকে তাঁহারই রচনা বলিয়া ধরা হয়।

* যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত রামমোহন রায়ের ইংরেজী গ্রন্থাবলীতে (i. xx) রামমোহনের রচনাবলীর যে তালিকা আছে, তাহাতে এই তারিখ পাওয়া যায়। আলোচ্য পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

† Jogendra Chunder Ghosh : The Eng. Works of Raja Ram Mohun Roy, i. xx.

মানপত্রখানির ইংরেজী ও বাংলা উভয় অংশই ১৮ জানুয়ারি, ১৮৩০ তারিখের *Government Gazette* পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্ত্তী ২৩এ জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' উহা উদ্ধৃত করেন ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ২য় সং., পৃ. ২৯০-৯২ দ্রষ্টব্য)।

৩১। **গৌড়ীয় ব্যাকরণ**। ইং ১৮৩৩। পৃ. ৯৭।

Grammar / of / the Bengali Language. / গৌড়ীয় ব্যাকরণ / তদ্ভাষা বিরচিত / শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়দ্বারা পাণ্ডুলিপি / ও / কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিদ্বারা / এবং / তন্মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। / ১৮৩৩। / Calcutta : / Printed at the School-Book Society's Press ; and sold at its / Depository, Circular Road. / 1833. /

ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত পুস্তিকা দুইখানি রামমোহন-গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু এগুলির প্রকাশকাল জানা যায় নাই :—

ক্ষুদ্রপত্রী (বিতরণার্থ মুদ্রিত)

আত্মানাত্মবিবেক (বঙ্গানুবাদসহ)

এই তালিকায় রামমোহন কর্ত্তৃক "প্রকাশিত" অথচ প্রণীত নহে, এমন কতকগুলি পুস্তকের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। যথা,—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসা' (পৃ. ৩৭৭), * এবং ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক প্রভৃতি

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৮০৩-৫ দ্রষ্টব্য। রাজনারায়ণ বসুও রামমোহন-গ্রন্থাবলীর ৮১২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"রাজা রামমোহন রায় বেদান্ত সূত্রের সমগ্র সংস্কৃত শাঙ্কর ভাষ্য পৃথক্ মুদ্রিত করিয়াছিলেন,...বেদান্ত সূত্র ভাষ্য খানি চতুষ্পত্রাকারের (quarto size) ৩৭৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।"

কয়েকখানি উপনিষদের মূল ও ভাষ্য। 'কুলার্ণব' সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। 'কুলার্ণব' রামমোহন-গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু উহা বোধ হয় রামমোহনের গুরুস্থানীয় হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কলিকাতা অবস্থানকালে—সম্ভবতঃ ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে—প্রকাশ করিয়াছিলেন। *

রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি। ইং ১৮৮০। পৃ. ৮১৪।

ইহা রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পুনঃ প্রকাশিত। ইহাই রামমোহনের বাংলা গ্রন্থাবলীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংস্করণ।

ইহার পূর্ব্বে, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের বাংলা গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।† তাহার পর তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক রামমোহনের ইংরেজী-বাংলা অধিকাংশ গ্রন্থেরই সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

* ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাশীতে হরিহরানন্দের মৃত্যু হইলে, পরবর্ত্তী ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সমাচার দর্পণ' যাহা লেখেন তাহার এক স্থলে আছে :—"প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়।"

† "It affords us great pleasure to be able to announce that Baboo Annodapersaud Bonerjee, a distinguished Patron of native education has published at his own expence the whole of the Bengallee writings of the late RAJA RAMMOHUN ROY, for the purpose of disseminating generally the enlightened views of that Indian philosopher in respect to theology and the Hindoo Shasters."—*The Calcutta Courier* for January 6, 1840.

সরোজিনী

১১

পরদিন সকালে বৈঠকখানার দাওয়ায় দাঁড়াইয়া ছিলাম। শেষরাত্রি হইতে প্রবল বৃষ্টি নামিয়াছিল; অবিশ্রান্ত কয়েক ঘণ্টা বর্ষণের পর এখন ঝিরঝির করিয়া পড়িতেছিল। আকাশে কিন্তু এখনও মেঘ থমথম করিতেছিল, কাজেই আশা করিতেছিলাম, যদি নয়টা-দশটার সময়ে আবার বর্ষণ শুরু হয় এবং ঘণ্টাখানেক ধরিয়া চলে তো আজ রেনি-ডের জন্য স্কুল বন্ধ করিয়া দিব। হঠাৎ দেখিলাম, ছাতা-মাথায় হারাণ হনহন করিয়া আসিতেছে। হারাণ তো এত সকালে কোন দিন উঠে না! হঠাৎ ব্যাপার কি! বাড়িতে কনে-বউয়ের কোন অসুখ-বিসুখ নয় তো! কাছে আসিতেই উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করিলাম, কি হে, এত সকালেই?

হারাণ ছাতাটা সশব্দে বন্ধ করিয়া সিঁড়িতে পা ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল, মনুদার কাছে গিছলাম, কাউকে কিছু বলতে মানা করলাম।

রাজি হ'ল মনুদা? আর রাজি হ'লেও—

হারাণ কহিল, না, কাউকে ও আর বলবে না। আমি যে ওদের দলে, তা আমি ওকে বিশ্বেস করিয়ে এসেছি।

কহিলাম, কি ক'রে?

এদের দলের দু-চারটা গোপন কথা ফাঁস ক'রে দিয়ে। সরোজিনীর শাশুড়ীকে যে ওরা বার ক'রে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে, তাও ব'লে দিয়ে এসেছি।

আমার নামে মিথ্যে ক'রে কিছু লাগাও নি তো?

পাগল! তা আবার লাগাতে পারি! কিন্তু যাক ওসব কথা, একটু চা খাওয়াও দেখি।—বলিয়া ঘরে আসিয়া চেয়ারে বসিল। আমি বাড়ির ভিতরে গিয়া চায়ের জন্য বলিয়া ফিরিতেই হারাণ কহিল, কাল সারারাত চোখে পাতায় করি নি।

চেয়ারে বসিয়া কহিলাম, কেন হে?

বিরক্তিতে সারামুখ কুঞ্চিত করিয়া হারাণ কহিল, কনে-বউয়ের ঘ্যানঘ্যানানি। রাত্রেতে বাড়ি ফিরতে একটু দেরি হ'লই, তার ওপর কিছু খেতেও পারলাম না। তা কনে-বউ এমনই যা করুক, বোঝলে বোঝে, আর বুঝিয়েও এনেছিলাম খানিক।

কি ক'রে?

বললাম, গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে মজলিস ছিল, রাত হয়ে গেল ব'লে না খাইয়ে ছাড়লেন না।

তারপর?

তারপর, আমাদের সেই ফেউটি আছেন তো—পদ্ম পোড়ামুখী! সেই ধরিয়ে দিলে সব—

ও জানলে কি ক'রে?

জানবে না কেন? গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে কাল গিয়েছিল যে। আমি আর তুমি যে প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ি গিয়েছিলাম, তা ও দেখে এসেছিল।

তা হ'লে বউ সব জানতে পেরেছে বল।

অত্যন্ত করুণ মুখে উপরে ও নীচে ঘাড় নাড়িয়া হারাণ কহিল, হ্যাঁ, সে এক রকম জানাই—তবে আমি বলেছি, দারোগার ওখানে খেয়ে এসেছি, তুমিও সঙ্গে ছিলে। বউ বিশ্বেস করে নি বোধ হয়।

কি বললে বউ?

যৎপরোনাস্তি গালাগালি করলে—হাড়ী, ডোম, ম্লেচ্ছ, মায় কুকুর পর্য্যন্ত। তারপর বিছানায় শুতে দিলে না; মেঝেতে মাদুর পেতে শুলাম তো বিছানায় ব'সে ফোঁস-ফোঁস ক'রে কাঁদতে লাগল; ভুলোবার জন্যে বিছানায় উঠতে গেলাম তো তড়াক ক'রে নেমে বাইরে বেরিয়ে গেল; বাইরে গেলাম তো ভেতরে ঢুকে দড়াম ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। তারপর সারারাত্রি ধ'রে দরজা-ঠেলাঠেলি। বিশ্বেস তো নেই! যা রাগ! হয়তো গলায় দড়ি দেবে। কিছুতেই খুললে না। শেষ-রাত্রে বৃষ্টি নামল; তার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়; বৃষ্টির ছাটে ভিজে সপসপে হয়ে সারারাত্রি দরজা-গোড়ায় ব'সে কাটালাম।

পদ্ম কি করলে?

রাগে দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিল, ওদের মা-বেটাকে আমি ঘর থেকে বার করব। রাতদিন বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া কচকচি, চালে কাক বসতে দেয় না। ওই তো বউয়ের মেজাজ খারাপ ক'রে দেয়। না হ'লে বউ খারাপ লোক নয়।

শিকল ঝনঝন করিয়া উঠিল। বুঝিলাম, সিগ্‌ন্যাল পড়িল, পত্নী চা-হস্তে দ্বারান্তরালে সমুপস্থিত, ত্বরিতপদে কাছে গিয়া দুই হাতে দুই পেয়ালা ধূমায়মান চা লইয়া আসিতেই হারাণ আগ্রহের সহিত হাত বাড়াইয়া কহিল, দাও। পেয়ালাটা লইয়াই গরম চায়ে এক চুমুক দিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিল, গরম। তারপর সতর্কভাবে দুই-চারিবার চুমুক দিয়া কহিল, ভারী আরাম হ'ল ভাই। বউদিদির হাতের চা চমৎকার! যেমন রঙ, তেমনই স্বাদ! আমার বাড়ির চা যেন আলকাতরা, খেতে গেলে কান্না পায়।

কহিলাম, পদ্মর ছেলে তো এখন চাকরি করছে।

ঘাড় নাড়িয়া হারাণ কহিল, করছে তো। সরকারী ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডারি করে। পনরো টাকা ক'রে মাইনে পায়। তবে আজ পর্য্যন্ত একটি পয়সাও ঠেঁকায় নি, মা-ই সব জমাচ্ছেন। ডাইনীটার কুচুটে বুদ্ধি তো কম নয়। তাই তো কনে-বউ বলে, অনেকদিন তো করলাম আমরা; এর পর ছেলে মানুষ হয়েছে, স'রে পড়লেই হয়, ঘরও তো দিচ্ছি, আমাদের বামুন-ডোবার পাশে প'ড়ো বাড়িটা, একটু সারিয়ে-সুরিয়ে নিলেই চলবে; তা ডাইনী কিছুতে নড়তে চাইছে না। বলতে গেলেই ঝগড়া।

ভায়া আছ নাকি?—বলিয়া মণীন্দ্র হাজির হইল। হাতের সপসপে ভিজা ছাতাটা সুদ্ধ ঘরে ঢুকিতেই কহিলাম, ছাতিটা বাইরে রেখে এস মনুদা। মণীন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, দেখ মাস্টার, কার সঙ্গে কেমন ক'রে কথা বলতে হয় শিখে রেখো, যাকে বলে—

বাধা দিয়া ধমকের সুরে কহিলাম, শিখব এখন, তুমি ছাতাটা রেখে এস তো।

মণীন্দ্র এক মুহূর্ত্তে নরম হইয়া কহিল, রাখছি, রাখছি, রাগ কিসের? —বলিয়া ছাতাটা বাহিরে রাখিয়া, ঘরে আসিয়া কহিল, চা খাচ্ছ নাকি?

আমার জন্যে এক কাপ ব'লে দাও দেখি, হারাণকে লক্ষ্য করিয়া মুরুব্বিয়ানার সহিত কহিল, দেখ হারু, সমঝে চলাফেরা ক'রো। যার-তার সঙ্গে মিশো না। কতবড় একটা ঘরের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক, সব সময়ে খেয়াল রেখো।

হারাণ চুপ করিয়া রহিল। মণীন্দ্র গম্ভীরভাবে কড়িকাঠের দিকে তাকাইয়া পা দুইটি দোলাইতে লাগিল।

এক পেয়ালা চা লইয়া ফিরিয়া আসিয়া মণীন্দ্রর সামনে নামাইয়া দিয়া কহিলাম, কি হ'ল? মণীন্দ্র চায়ে চুমুক দিয়া কহিল, কিছু না, হারাণকে সাবধান ক'রে দিচ্ছিলাম, গাঙুলী, রাধানাথ, ঐসব ছোট-লোকগুলোর সঙ্গে যেন না মেশে। ওতে আমাদের মাথা হেঁট হবে।

কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, তোমাদের মাথা হেঁট হবে কেন? মণীন্দ্র ভ্রূ দুইটা বার দুই তোলা-নামা করিয়া কহিল, বাঃ রে! জান না নাকি? ও যে আমাদের ভগ্নীপতি। আমি জানতাম না, সরোজ জানত বরাবরই।

হারাণের দিকে কটাক্ষ করিয়া কহিলাম, তবে আর কি হে! তোমার তো পোয়া বারো। মণীন্দ্র থ্যাক করিয়া উঠিল, মানে?

এমন একটি শালী—মানে বড়লোক শালী পাওয়া কম ভাগ্যের কথা নাকি?

মণীন্দ্র সন্দিগ্ধ স্বরে কহিল, ওতে আর ওর কি সুবিধে হবে? আমি ভাই, আমারই ব'লে কিছু হচ্ছে না। মুখে রক্ত উঠিয়ে মাসে পনরো টাকা। ফুন্টি-ভিন্টের—। বলিয়াই মণীন্দ্র চুপ করিয়া গেল।

হারাণ কহিল, ফুন্টি-ভিন্টের কি?

কিছু নয়, কিছু নয়। দেখ হেরো, না না, দেখ ভাই হারু, সকালের কথাটা সত্যি তো? তা হ'লে বুড়ীটাকে একটু সাবধানে রাখতে হবে। তা ছাড়া থানায় একটা ডাইরি করিয়ে দিয়ে আসি, কি বল?

বাইরে সজোরে বৃষ্টি নামিল। মণীন্দ্র কহিল, বর্ষাটা নেমে গেল বোধ হয়। বাস-চলাচল বন্ধ হয়ে যাবে। তা হ'লে জেলায় যাবার কি হবে বল দেখি?

কহিলাম, জেলায় গিয়ে কি হবে?

মণীন্দ্র বিস্ময়ের সুরে কহিল, আরে, মনে নেই? অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত কহিল, মাস্টারি ছেড়ে দাও মাস্টার। তোমার স্মরণশক্তি একেবারে গোল্লায় গেছে। ছেলেগুলোকে ভুল শিখিয়ে মাথা খেও না আর। তারপর দুই চক্ষের দৃষ্টি বাঁকা করিয়া, চোখের তারা দুইটা চোখের ডান পাশে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, মনে নেই? সেই যে, লা—ব—কে—হা—

বুঝিলাম—লাইব্রেরির বই কেনা ও হাকিমের সঙ্গে দেখা করা। বলিলাম, বুঝেছি, পরে ভেবে বলব এখন।

ভাবাভাবি আর করতে হবে না, যত শিগগির হয় ততই ভাল। তুমি আর আমি, বুঝলে?

দরজায় গোষ্ঠ ডোমের ডাক শোনা গেল, মাস্টারবাবু রইছেন গো?

সাড়া দিয়া কহিলাম, কে, গোষ্ঠ? কি খবর?

খবর কিছু লয়, কর্ত্তাবাবু বললেক উস্কুলের চাবিটা দিতে। হুজুর সাহেব এসেছেন। আর আপনকাকেও যেতে বললেক। হঠাৎ হারাণকে দেখিতে পাইয়া বলিল, ও ঘোষাল মশয়! আপনার কাছে যাচ্ছিলাম যে। আপুনিও চল।

হারাণ অসহ্য বেদনায় নাক-মুখ কুঞ্চিত করিয়া কহিল, আবার পেটটা মোচড়াতে শুরু করল মাস্টার। আমি উঠি।

গোষ্ঠকে কহিল, বাবা গোষ্ঠ! ভারী পেটের অসুখ, গাঙুলী মশায়কে ব'লো, সারারাত ভেদবমি হয়েছে; অনেক কষ্টে ক'পা হেঁটে মাস্টারের কাছে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খেতে এসেছিলাম। ক্ষীণ-কণ্ঠে কহিল, চলি হে মাস্টার! তুমিও ব'লে দিও। হারাণ ছাতা লইয়া ধুঁকিতে ধুঁকিতে বাহির হইয়া গেল।

মণীন্দ্র কহিল, আমিও উঠি তা হ'লে। আমার কথাটা বুঝতে পেরেছ তো? আর দেরি নয়। দু আনা চার আনা দামের বিশ-ত্রিশ টাকার বই কিনলেই এক গাদা বই হবে, তাই দিয়ে এক রকম ক'রে একটা আলমারি ভর্ত্তি ক'রে, হাকিমকে এনে হাজির করা চাই, তা হ'লেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

গোষ্ঠ মুখ বাড়াইয়া কহিল, কে কথা কইছেন গো? চক্রবর্ত্তী মশয় নাকি? আপনকাকেও যে একবার ডাকছিলেন গাঙুলী মশয়, বললেক—

মণীন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া কহিল, তোর গাঙুলী বুড়োকে বলগে যা, মনু চক্রবর্ত্তী কারও তাঁবেদারের নফর নয় যে, তু করলেই ছুটে যাবে, তার দরকার থাকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করুক।—বলিয়া ছাতাটি লইয়া হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

গোষ্ঠর হাতে চাবি পাঠাইয়া দিয়া আমিও স্কুলের দিকে চলিলাম।

স্কুলে পৌঁছিতেই দেখিলাম, গাঙুলীমশায়, রাধানাথ, আরও পাড়ার দুই-চারিজন লোক স্কুলের উঠানে জড়ো হইয়াছে। গ্রামের চৌকিদাররা সরকারী নীল জামা ও পাগড়ী পরিয়া, হন্তদন্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতেছে। আমাকে দেখিয়াই গাঙুলী মশায় শশব্যস্তভাবে কহিলেন, হুজুর আফিস-ঘরে রয়েছেন, আজ আর স্কুল থাক, বাদলার জন্যে বন্ধের নোটিস দিয়ে দাও।

পাড়াগাঁয়ে দারোগা ও সার্কল-অফিসার বাস্তু-দেবতারই সামিল। নিত্য তাঁহাদের সেবা যোগাইতে হয় এবং সকাল সন্ধ্যা ভক্তি নিবেদন করিতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেট, এস. ডি. ও. প্রভৃতি উপরওয়ালা হাকিমরা দুর্গা-কালীর মত বৎসরে দুই-একবার আসেন এবং যখন আসেন, তখন সারাগ্রামে হৈ-চৈয়ের অন্ত থাকে না।

আফিস-ঘরে ঢুকিয়া দেখিলাম, সার্কল-অফিসার একটি চেয়ারে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসিয়া আছেন, সবুট পা দুইটি টেবিলের উপর রক্ষিত; আরামে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সিগারেট টানিতেছেন। আমার জুতার শব্দে একবার চোখ মেলিয়া চাহিয়া আমাকে দেখিয়া লইয়া আবার চোখ বুজিলেন। একজন শিক্ষককে সাধারণ ভদ্র-লোকের প্রাপ্য সৌজন্যটুকু দেখানোও তাঁহার হাকিমী মর্য্যাদাজ্ঞানে বোধ করি বাধিল। বসিতে না বলিলেও বসিলাম, চেয়ারে নয়, কারণ চেয়ারটিতে হাকিম বাহাদুর তাঁহার টুপিটি রাখিয়াছেন, কাজেই একটি টুল সংগ্রহ করিয়া সম্মানসূচক দূরে বসিলাম।

এই হাকিমটি কৈবর্ত্ত-সন্তান, নাম অদ্বৈতচরণ ঘোষ। বয়স

প্রায় ত্রিশ ; এম. এ. পাস ; ভাল ছেলে ছিলেন নিশ্চয়ই, না হইলে প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় পাস করিয়া চাকুরি পাইতেন না। চেহারাও হাকিমোচিত দশা-সই। ইনি যে পরাক্রান্ত ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের একজন প্রতিনিধি ও গ্রাম্য জনমণ্ডলীর একান্ত ভক্তির পাত্র, তাহা নিজেও কখনও ভুলেন না, কাহাকেও কখনও ভুলিতে দেন না। ইনি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও উপরওয়ালাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেন জানি না, কিন্তু আমাদের কাছে নিজের চতুর্দ্দিকে সদাসর্ব্বদা এমনই একটি দেবতাসুলভ মহিমাময় পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেন যে, আমরা গ্রামবাসীরা যুক্তহস্তে ইঁহার সামনে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ইঁহার দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকি ও ইঁহার মুখে মনিষ্যসুলভ কথাবার্ত্তা, হাসি ও কাসি দেখিতে ও শুনিতে পাইলে কৃতার্থ হইয়া যাই।

হঠাৎ হাকিম বাহাদুর আমি আগে যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম, সেই দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, আপনাদের গ্রামের ব্যাপার কি? চোখ খুলিয়া আমাকে দেখিতে না পাইয়া পাশে তাকাইতেই আমাকে দেখিতে পাইলেন, এবং ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, ওঃ, বসেছেন দেখছি, তা বেশ করেছেন। এখন গাঁয়ে কি সব ব্যাপার চলছে বলুন দেখি?

কহিলাম, বিশেষ কিছু না। মানে—

হুজুর বাধা দিয়া কহিলেন, সে কি মশায়? এত সব কথা শুনলাম, আর আপনি সব উড়িয়ে দিচ্ছেন?

জবাব দিলাম, আমি সব ব্যাপার ভাল জানি না। গাঙুলী মশায় জানেন।

তবে যে রাধানাথবাবু বললেন, আপনি ভেতরে ভেতরে ও দলে রয়েছেন।

গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিলাম, আমি কোন দলেই নেই, অথবা দুই দলেই আছি। শিক্ষক হয়ে দলাদলিতে যোগ দেওয়া আমাদের চলে না।

হুঁ-শব্দে হুজুর গর্জ্জন করিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া, দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া, মুখে নানা প্রকার ভাব ফুটাইয়া, হুজুর হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া নূতন আর একটা সিগারেট ধরাইয়া টানিতে

লাগিলেন। আমিও একখণ্ড কাগজ সংগ্রহ করিয়া রেনি-ডের নোটিস লিখিয়া, বাহিরের নোটিস-বোর্ডে আঁটিয়া দিতে গেলাম। গাঙুলী মশায় আমাকে দেখিয়াই ছুটিয়া কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হুজুর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন নাকি?

কহিলাম, দলাদলির কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন।

আগ্রহান্বিত স্বরে গাঙুলী মশায় কহিলেন, কি বললে?

এই সময়ে রাধানাথও আসিয়া হাজির হইল। কহিলাম, বললাম, রাধানাথ দাদা সব জানে, ওই তো দলাদলি সৃষ্টি করেছে কিনা।

রাধানাথ চটিয়া উঠিয়া কহিল, তার মানে?

কহিলাম, মানে বুঝতে পারছ না নাকি? বাংলা ভুলে গেছ?

রাধানাথ চোখ পাকাইয়া তর্জ্জনী নাড়িয়া কহিল, দেখ-মাস্টার, মিথ্যে চুকলি ক'রো না বলছি।

কহিলাম, তুমি আমার নামে কর নি? তুমি বল নি, ভেতরে ভেতরে আমি ঐ দলে আছি?

রাধানাথ কহিল, আছ তো, বলব না?

তুমি দলাদলি সৃষ্টি করেছ তো, বলব না?

গাঙুলী মশায় দুই হাত দুইজনের কাঁধে দিয়া কহিলেন, আরে, থাক থাক, ঘরে ঘরে ঝগড়া করতে হবে না। হুজুর শুনতে পেলে কি ভাববেন বল দেখি? মাস্টার, হুজুরের কাছে ব'সগে যাও। আর রাধানাথ ভাই, মাছধরার কতদূর কি হ'ল একবার দেখগে যাও। বেশি দরকার নেই, একটা সের পাঁচেক রুই কি মিরগেল হ'লেই হবে। ওবেলায় তো আবার পাঁঠার হাঙ্গামা আছে। আর দেখ, ফেরবার সময়ে অনুকূল মামাকে (প্রবোধ গাঙুলীর মামা) ডেকে নিয়ে আসবে।

রাধানাথ চলিয়া গেল। গাঙুলী মশায় কহিলেন, হুজুরকে সব বলেছি। দারোগার ওপর তো এমনিই চটা, আরও চ'টে গেছেন আজ। হাকিম হোক, হিন্দুর ছেলে তো। হিন্দুর বিধবার সঙ্গে মোছলমানের নটখটি শুনলে চটবারই কথা। যাও, কাছে ব'সে আরও একটু উসকে দাওগে যাও। হুজুরকে দিয়েই আজ রাত্রে কার্য্যোদ্ধার করতে হবে।

ভিতরে গিয়া বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে গাঙুলী মশায় ভিতরে

ঢুকিয়াই একেবারে আঁতকাইয়া উঠিয়া কহিলেন, হুজুর ঘামছেন, আর মাস্টার ব'সে ব'সে দেখছ? পাখা! পাখা! ঐ যে পাখা।—বলিয়া পিছনে বেঞ্চির উপর পাখাটার দিকে ছুটিলেন এবং পাখাটা তুলিয়া লইয়া হুজুরের পিছনে দাঁড়াইয়া সজোরে পাখা চালাইতে লাগিলেন।

হুজুর একবার ক্ষীণ প্রতিবাদ করিয়া কহিলেন, থাক না, দরকার নেই।

কিন্তু গাঙুলী মশায় প্রতিবাদে কর্ণপাত না করিয়া পাখা করিতেই লাগিলেন। হুজুর চেয়ারের নীচে পা দুইটা চালাইয়া দিয়া, চেয়ারে ঠেস দিয়া, মুদ্রিত চক্ষে প্রশ্ন করিলেন, সে মেয়েটির বয়স কত?

গাঙুলী মশায় জবাব দিলেন, আজ্ঞে, ভরা যৌবন, তার ওপরে—সুন্দরী।

হুজুর চোখ খুলিয়া কহিলেন, আমি গাঁয়ে প্রায় আসা-যাওয়া করছি জেনেও দারোগার কাছে গেল কেন?

আজ্ঞে, স্বভাব। তা ছাড়া মনু চক্রবর্ত্তীর কারসাজি, বোনকে মোছলমানের হাতে তুলে দিয়ে সব মেরে দেবার চেষ্টা।

হুজুর হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, চাবকাতে পারেন না? ডেকে পাঠান তাকে, আমি ঠিক ক'রে দিয়ে যাচ্ছি। নচ্ছার! হারামজাদা!

গাঙুলী মশায় নিবেদন করিলেন, ডেকে পাঠিয়েছিলাম তাকে হুজুরের নাম ক'রে, তো বলেছে, আমার গরজ পড়ে নি, যার ইচ্ছে এসে দেখা করুক আমার সঙ্গে।

হুজুর রক্তচক্ষু হইয়া কহিলেন, তাই নাকি?

গাঙুলী মশায় পাখা-সুদ্ধ দুই হাত যুক্ত করিয়া কহিলেন, হুজুর, ভারী বেড়েছে কিনা! বোনের পয়সায় নবাব ব'নে গেছে, লঘুগুরু জ্ঞান-গম্যি কিছু আর বাকি নেই।

হুজুর রোষে ফুলিয়া উঠিয়া কহিলেন, আচ্ছা, আমিই যাব। আমার সামনে কি রকম মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে দেখব।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, আপনার সামনে দাঁড়াবার সাধ্য কি? দেখলেই পায়ের নীচে প'ড়ে পা চাটবে দেখবেন। তাই তো বলছিলাম সবাইকে, মামলা-মকদ্দমা, আইন-আদালত কিছুর দরকার নেই।

আমাদের হুজুর আসুন। উনি যদি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে একবার ব'লে দেন তো ঐ মনু চক্রবর্ত্তী আর তার বোন বুড়ীকে হাতে তুলে দিতে পথ পাবে না।

বাধা দিয়া হুজুর কহিলেন, বুড়ীকে নিয়ে কি করবেন আপনারা?

গাঙুলী মশায় জবাব দিলেন, হুজুর, বুড়ীর কি কম দুর্দ্দশা হচ্ছে! চোখে দেখতে পায় না, কানে শুনতে পায় না, একেবারে অথর্ব্ব। তা বউটা তাকে একবারও চোখ চেয়ে দেখে না, নিজের সাজগোজ, আমোদ-আহ্লাদ নিয়েই মেতে থাকে। তা ছাড়া যে বাড়িতে দিনরাত ঐ কুকুরে কীর্ত্তি, সেখানে হিন্দু বিধবার থাকা চলেও না।

হুজুর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, তা বটে। কিন্তু দারোগার আনাগোনাতে গাঁয়ের ছোকরারা আপত্তি করে না?

জিহ্বা ও তালু সহযোগে ক্ষোভসূচক শব্দ করিয়া গাঙুলী মশায় কহিলেন, ও কথা আর বলবেন না। গাঁয়ের ছোকরাগুলোকে সব ভেড়া বানিয়েছে। রাতদিন মাটি কামড়ে প'ড়ে আছে সব ওর বাড়িতে।

ওদের সঙ্গেও তা হ'লে—। বলিয়া হুজুর চক্ষের ইঙ্গিতে বক্তব্য জ্ঞাপন করিলেন।

গাঙুলী মশায় ঘাড় নাড়িয়া সহাস্যে কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হ'লে তো রেগুলার প্রষ্টিটিউট দেখছি।

গাঙুলী মশায় বুঝিতে পারিলেন না, কহিলেন, কি বললেন?

মানে, রীতিমত—বেশ্যা—

গাঙুলী মশায় সোৎসাহে কহিলেন, তারও বেহদ্দ। বলব কি হুজুর, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা ঠিক করেছি, বুড়ীকে বার ক'রে নিয়ে আসি। ওর ভাইও এই বিপদ শুনে এসে হাজির হয়েছেন। তাঁকে দিয়ে একটা খোরপোষের মামলা করিয়ে দিই। ওদিকে শুনছি প্রবোধ গাঙুলীর একজন ভাগনে আছে। তাকে সব জানিয়ে চিঠি লেখা হয়েছে। সে এসে পড়লে মেয়েটা যদি দারোগার সঙ্গে ভিড়েও যায় তো সম্পত্তিটা সব বেহাত হবে না।

হুজুর চিন্তিতমুখে কহিলেন, সম্পত্তি যদি মেয়েটির নামে থাকে, তা হ'লে?

গাঙুলী মশায় মুদ্রিত চক্ষে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, আজ্ঞে, সব সম্পত্তি নেই। প্রবোধ গাঙুলী যে সম্পত্তি স্বয়ং করেছিল, তা সব স্ত্রীর নামে। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তি সব তার নিজের নামেই ছিল। সেও বিস্তর সম্পত্তি হুজুর।

হুজুর কহিলেন, সে ভদ্রলোককে খবর দেন নি?

আজ্ঞে দিয়েছি, এই এলেন ব'লে।

বলিতে বলিতেই ভদ্রলোক অর্থাৎ প্রবোধ গাঙুলীর মাতুল, ঝাকড়দা স্কুলের ফিফ্‌থ মাস্টার অফিস-ঘরে প্রবেশ করিল। আজও পরিধানে থান-ধুতি, কোঁচাটা দু ভাঁজ করিয়া পেটের উপর গোঁজা, গায়ে কেটের কোট। ইহার মধ্যেই স্নানাহ্নিক সারিয়া তিলক-ফোঁটা কাটিয়াছে। রাধানাথ পরম আপ্যায়নের সহিত তাহাকে বেঞ্চির উপর বসাইয়া হুজুরের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিল। মাতুল হুজুরকে নমস্কার করিতেই, হুজুর মস্তকে মৃদু ঝাঁকানি দিয়া প্রতি-নমস্কারের ভঙ্গি করিলেন।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, আজ তা হ'লে চলুন, হুজুরকে নিয়ে আমরা যাই ওখানে। আপনার ভাগ্নে-বউকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে দিদিকে নিয়ে আসবেন।

মাতুল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, আমি তো বলেছি, ও বাড়িতে পা দোব না। আপনারা হাতে এনে দিন, তারপর যা করতে হয় করব। রাধানাথের দিকে তাকাইয়া কহিল, কি বল রাধানাথ বাবাজী?

রাধানাথ সায় দিয়া কহিল, আজ্ঞে, তা বইকি। মামলা-মকদ্দমার সমস্ত ধকল আমরা পোয়াব, আনাআনির হাঙ্গামায় আমরা নেই।

গাঙুলী মশায় রাধানাথের দিকে চাহিয়া কহিলেন, তুমিও যাবে না নাকি? হুজুরের উদ্দেশে কহিলেন, শুনছেন হুজুর, আমাদেরই যেন গরজ!

হুজুর কহিলেন, আপনারা সব না গেলে আমি যাব না। আপনারা নিজেরা বোঝাতে পারছেন না, তাই আমাকে ধরেছেন। আপনাদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে, আমি যেতে রাজি হয়েছি, এর পর যদি আপনারা পেছপা হন, তা হ'লে আমি যাব কেন? আপনারা যা

পারেন নিজেরাই করবেন। তা ছাড়া, আমার এসব হাঙ্গামায় থাকা উচিত নয়, তবে নেহাত একটা কুৎসিত ব্যাপার হচ্ছে, সেটা বন্ধ করবার জন্যেই রাজি হয়েছিলুম, না হ'লে আমার কি?

গাঙুলী মশায় রাধানাথের দিকে তাকাইয়া চোখের ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন। রাধানাথ অবশেষে কহিল, তা হ'লে হুজুর, আমরা সকলেই যাব। ইনি বুড়োমানুষ, ইনি না হয় না গেলেন। আপনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে মিটমাট ক'রে দেবেন, তার চেয়ে সুবিধে আর কি আছে! আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, তুমিও যেও হে মাস্টার। কাজের বেলায় পালিও না যেন, আর হারাণ—

গাঙুলী মশায় কহিলেন, ওর পেটের অসুখ হয়েছে, গোষ্ঠ বলছিল। আমাকে কহিলেন, ভায়া, একবার খবর নিও দেখি। যদি ভাল থাকে, খাওয়া-দাওয়া না করুক, আমাদের সঙ্গে যেন যায়।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে বৃষ্টি ছাড়িয়া গেল। পূর্ব্বাকাশে কৃষ্ণাভ ধূসর মেঘ ছড়াইয়া রহিল বটে, কিন্তু পশ্চিমাকাশ একেবারে নির্ম্মেঘ হইয়া গিয়া, অস্তোন্মুখ সূর্য্য ঝলমল করিয়া উঠিল। কাজেই গাঙুলী মশায়ের আদেশমত হারাণের খবর লইবার জন্য তাহার বাড়ির দরজায় আসিয়া হাঁক দিলাম।

হারাণ সাড়া দিয়া কহিল, এস হে, নির্ভয়ে এস, বাড়িতে কেউ নেই। উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। প্রায় বিঘাখানেক জায়গা চারিদিকে উঁচু মাটির প্রাচীর দিয়া ঘেরা, জায়গাটি উত্তর-দক্ষিণে লম্বা; উত্তর দিক ঘেঁষিয়া খানতিনেক উঁচু-দাওয়াওয়ালা-ঘর, দেওয়াল মাটির, ঘরের মেঝে, বারান্দার মেঝে ও সিঁড়ি ইট-সিমেণ্ট দিয়া বাঁধানো। ডান দিকে রান্নাঘর, তাহারও দাওয়া বেশ উঁচু, উঠানের মাঝখানে চার-পাঁচটা বড় বড় ধানের মরাই। উঠানের দক্ষিণ দিকে পূর্ব্ব দিক ঘেঁষিয়া গোটা দুই প্রকাণ্ড খড়ের পালুই, তাহার পাশেই গোয়াল। পশ্চিম দিকে কতকটা জায়গা বাঁশের কঞ্চি দিয়া ঘিরিয়া তরি-তরকারির বাগান। দেখিলেই মনে হয়, হারাণরা বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। হারাণ আমাকে ডাকিয়া কহিল, দাঁড়িয়ে রইলে কেন হে? এস।—বলিয়া একটা মাদুর পাতিয়া

দিয়া নিজে মাটিতে বসিতে যাইতেই কহিলাম, ও কি হচ্ছে? মাটিতে কেন?

হারাণ কহিল, গিন্নীর হুকুম নেই, ম্লেচ্ছের বাড়িতে খেয়ে ম্লেচ্ছ হয়ে গেছি কিনা, তাই কোন জিনিস ছুঁতে দিচ্ছে না আমাকে।

টানিয়া মাদুরে বসাইয়া কহিলাম, ব'স তো এখন। গিন্নী কই?

হারাণ কহিল, ঘাটে গেছে।

তোমার ওপর বাড়ি আগলাবার ভার কেন? পদ্ম কোথায় গেল?

হারাণ সক্ষোভে কহিল, রাগ ক'রে ঘর থেকে সকালে বেরিয়েছে, সারাদিন ঢোকে নি।

সবিস্ময়ে কহিলাম, সে কি?

হারাণ কহিল, সকালে ধুম ঝগড়া, এ মারে তো ও মারে। দুজনের কেউ তো কম যায় না!

কহিলাম, ঝগড়ার হেতু?

হেতু তেমন কিছু না, সকালে বউ আমাকে মরাইতলায় খেতে দিয়েছিল, তো পদ্ম তাই দেখে বললে, বউ, দাদা কি মুনিষ না মান্দের যে, মরাইতলায় খেতে দিয়েছ? বউ প্রথমে জবাব দিলে না। তবে পদ্ম তো চুপ ক'রে থাকবার মেয়ে নয় কিনা, আবার বললে, তোমার ভাইরা এলে যা ইচ্ছে ক'রো, আমার ভাইয়ের এমন হেনস্তা করলে সহ্যি করব না বলছি। এমনই দু-চার কথা। তারপরেই লেগে গেল চুলোচুলি, মারামারি, টেনে ছাড়ানো যায় না, আর ছাড়ানোও বিপদ। এই দেখ না, কামড়ে দিয়েছে বউ।—বলিয়া ডান বাহুতে দুই পাটি দাঁতের কামড়ের দাগ দেখাইল।

কহিলাম, ভাগনে বাড়িতে ছিল না?

কে, পকা? (অর্থাৎ প্রকাশ, হারাণের ভাগিনেয়) বাড়িতে ছিল না। কি কাজে এসে পড়ল তাই, না হ'লে একা সামলাতে পারতাম না।

হঠাৎ ভিজা কাপড়ের সপসপ শব্দ হইতেই হারাণ কহিল, বউ আসছে ভাই।—বলিয়া মাদুর ছাড়িয়া মেঝেতে বসিল। হারাণের বউ উঠানে পা দিয়াই আমাকে দেখিয়া ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া দিল। সে

পুকুরে গা ধুইয়া, কাপড় কাচিয়া ফিরিয়াছে, কাঁধে লাল ডুরে গামছা। দ্রুতপদে রান্নাঘরে ঢুকিয়া বউ শিকলের ঝনঝন শব্দ করিতেই হারাণ কহিল, একবার উঠে চল ভাই, বউ কাপড় ছাড়বে। উঠিয়া উভয়েই উঠানের একপ্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলাম। হারাণের বউ শয়নকক্ষে ঢুকিয়া কাপড় ছাড়িয়া, আধময়লা লালপাড় শাড়ি ও শেমিজ পরিয়া আবার রান্নাঘরে চলিয়া গেল। আমি ফিরিয়া আসিয়া মাদুরে বসিলাম ও হারাণ রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়াইয়া সবিনয়ে আর্জি পেশ করিল, মাস্টারকে এক কাপ চা—

প্রশ্ন হইল, আর তোমাকে?

হারাণ কহিল, আমার থাক, মাটির ভাঁড়ে যা সোঁদা গন্ধ, চা খাওয়া যায় না।

হারাণের জন্য মাটির ভাঁড়ের ব্যবস্থা হইয়াছে সম্ভবত। জবাব আসিল, যাকে তাকে কাপ-প্লেট দিতে পারব না, নতুন কিনে দিতে পার, দিচ্ছি।

হারাণ বিষণ্ণ-বদনে ফিরিয়া আসিতেই, কনেবউকে শুনাইয়া কহিলাম, ওহে! তুমি তো একা খাও নি, আমিও তো খেয়েছিলাম। জাত গেলে আমারও গেছে। আমাকেও ভাঁড়ে ক'রেই দিতে বল, কোন জবাব আসিল না।

কিছুক্ষণ পরে চা আসিল, আমার যথারীতি পেয়ালায় ও হারাণের জন্য মাটির ভাঁড়ে। কহিলাম, কতদিন শাস্তি চলবে?

অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে চাপা গলায় কনেবউ কহিল, যতদিন না প্রাচ্চিত্তির করে।

কহিলাম, কিন্তু এ লঘুপাপে গুরুদণ্ড হয়ে যাচ্ছে না? তা ছাড়া সব বাড়িতেই যদি এ রকম শুরু হয়ে যায়, তা হ'লে—

কনেবউ জবাব দিল, সে আমি কি জানি? আমার বাড়িতে অনাচার করলেই প্রাচ্চিত্তির করতে হবে, তাতে কারও না ভাল লাগে তো বাপের বাড়ি রেখে এলেই পারে।

হারাণ চোখের ইঙ্গিত করিয়া কহিল, চেপে যাও ভাই। যা আছে

অদৃষ্টে হবে। কনেবউ চলিয়া গেলে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, ও বেলায় কি হ'ল ?

কহিলাম, আজ সন্ধ্যেবেলায় সব দল বেঁধে যাবে, স্বয়ং হুজুর দলের নেতা। আমারও যাবার হুকুম হয়েছে, আর তোমারও, অবশ্য পেটের অসুখ ভাল হয়ে থাকলে।

হারাণ কহিল, আমি আর সরজমিনে যাব না ভাই, এমনিই তো চ'টে আছে, তার ওপর আবার গেছি শুনলে আর আস্ত রাখবে না। ফিসফিস করিয়া কহিল, কি ফ্যাসাদ করেছি মাইরি আবার বিয়ে ক'রে, রান্নাঘরের দরজার আড়াল হইতে শাড়ির লালপাড় দেখা যাইতেই কহিলাম, চুপ, বউ শুনছে।

হারাণ মুখ ফ্যাকাশে করিয়া কহিল, তাই নাকি! সব সময়ে আড়ি পাতা অভ্যেস। মনে মনে কহিলাম, আমারটিরও; শুধু আমারটির কেন, বোধ করি মেয়েমানুষ-মাত্রেরই, স্বামীর সম্বন্ধে তাহাদের সন্দেহের সীমা নাই।

অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত মুখ-চোখ কুঁচকাইয়া হারাণ কহিল, এমন একটা শালী আছে জানলে মাইরি কোনও দিন বিয়ের নাম করতাম না।

সন্ধ্যাবেলায় স্কুলে আসিয়া দেখিলাম, সকলে জড়ো হইয়াছে। হুজুর স্কুলের বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া, ও তাঁহাকে ঘিরিয়া সাঙ্গোপাঙ্গ দল—গাঙুলী মশায়, রাধানাথ, দোলগোবিন্দ, পাড়ার আরও কয়েকজন লোক। গোষ্ঠ ডোম হুজুরের পিছনে দাঁড়াইয়া পাখা চালাইতেছে। হুজুর কহিলেন, আপনাদের মাতুল তা হ'লে সত্য সত্যই যাবেন না ?

রাধানাথ আগাইয়া আসিয়া কহিল, হুজুর, না। তা ছাড়া সময়ও নেই। সন্ধ্যে থেকে তো জপে বসেছেন, রাত্রি নটা পর্য্যন্ত চলবে। এ রকম নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দেখা যায় না। একেবারে নিরামিষভোজী, মাছ পেঁয়াজ কিছু খান না, খান শুধু পাঁঠা, তাও মা কালীর পেসাদী হওয়া চাই। আজকের পাঁঠাটা, হুজুর, তাই মা কালীর সামনে বলি দিতে হ'ল। তা ছাড়া ওঁর জন্যে এসপেশাল ক'রে, পেঁয়াজ না দিয়ে সাত্ত্বিক মতে রান্না হচ্ছে।

হুজুর মুচকি হাসিয়া কহিলেন, তাই নাকি! ওঁর জন্যে গঙ্গাজল দিয়ে মাংস সেদ্ধ করছেন নাকি ?

রাধানাথ রসিকতা না বুঝিয়া কহিল, না হুজুর। গঙ্গাজল এত কোথায় পাওয়া যাবে ? তবে খেতে বসেন যখন, ইষ্ট-দেবতাকে নিবেদন করবেন, তখন গঙ্গাজলের ছিটে দেবেন ঠিক।

অন্ধকার একটু গাঢ় হইতেই সকলে বাহির হইল। সর্ব্বপ্রথমে লণ্ঠন হাতে গোষ্ঠ—তাহার পিছনে হুজুর, তারপরে পর-পর গাঙুলী মশায়, রাধানাথ, দোলগোবিন্দ ইত্যাদি, সর্ব্বশেষে আমি, তারপরে গ্রামের জনকয়েক ডানপিটে ছেলে; তাহাদের পিছনে নারী-বাহিনী অর্থাৎ ত্রিশ হইতে ষাট বৎসর বয়সের গ্রামের যতগুলি বিধবা, তাহাদের নেত্রী সৌদামিনী, সহনেত্রী পদ্ম, সকলের পিছনে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়া হারাণ। পাশে পাশে যাইতে লাগিল, রংলাল, বৈকুণ্ঠ, হারু প্রভৃতি চৌকিদারেরা, প্রত্যেকের হাতে একটি করিয়া লণ্ঠন।

এই বিরাট বাহিনীর মস্তকদেশ প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ি সামনে পৌঁছিতেই, হুজুরের আদেশে গোষ্ঠ গেটের মধ্যে ঢুকিয়া দরজার কাছে যাইয়া হাঁকিতে লাগিল, চক্রবর্ত্তী মশায় রইছেন গো ?

ভিতর হইতে সাড়া আসিল, কে ?

আমি গোষ্ঠ, একবার বাইরে আসুন কিপা ক'রে।

অচিরে মণীন্দ্র আসিয়া হাজির হইল; গোষ্ঠ অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে কহিল, হুজুর আইছেন আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে, দাঁড়িয়ে রইছেন বাইরে।

মণীন্দ্র আগ্রহান্বিত স্বরে কহিল, তাই নাকি!—বলিয়া ত্বরিতপদে একেবারে গেটের বাহিরে আসিয়া, হুজুরের সামনে প্রায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া নমস্কার করিয়া কহিল, আমাদের কত ভাগ্য! চলুন, বসবেন চলুন।—বলিয়া মুখের ইঙ্গিতে বৈঠকখানার বারান্দায় খান-দুই বেঞ্চিকে নির্দ্দেশ করিল।

হুজুর বুক চিতাইয়া কড়া গলায় কহিলেন, বসতে আসি নি, আপনাদের সঙ্গে একটু কথা বলবার আছে।

মণীন্দ্র হাতজোড় করিয়া কহিল, হুজুর, বলুন।

হুজুর ফটকের একটা থামের গোড়ায় বুট দিয়া ঠুকিতে ঠুকিতে কহিলেন, আপনারা প্রবোধ গাঙুলীর মাকে আটকে রেখেছেন কেন?

মণীন্দ্র পূর্ব্ববৎ পোজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, হুজুর, সে কি কথা! আটকে রাখবে আবার কে? রাখবার দরকারই বা কি? তাঁর নিজের বাড়িতে তিনি আছেন।

হুজুর বজ্র-গম্ভীর স্বরে কহিলেন, তাঁর এখানে থাকার ইচ্ছে নেই, আপনারা জোর ক'রে তাঁকে আটকে রেখেছেন।

মণীন্দ্র কহিল, হুজুর, আপনি দয়া ক'রে ভেতরে গিয়ে বসবেন চলুন। প্রবোধের মাঠাকরুণ এখনও জেগে আছেন। আপনি নিজে তাঁকে সব জিজ্ঞাসা করুন। যদি তিনি বলেন, এখানে কষ্ট হচ্ছে, আর তিনি আপনাদের সঙ্গে যেতে চান তো এখনই তাঁকে আপনাদের সঙ্গেই পাঠিয়ে দেওয়া হবে। আর যদি না যেতে চান, তাও নিজের কানে শুনে গাঁয়ের লোকদের বিচ্ছে-সিচ্ছে বুঝে নেবেন।—বলিয়া মণীন্দ্র গোষ্ঠকে কহিল, তিনুকে বলগে, বারান্দায় একটা শতরঞ্জি পেতে দিতে।—বলিয়া আবার যুক্তহস্ত হইয়া কহিল, হুজুর, আসুন তা হ'লে।

হুজুর গাঙুলী মশায় ও রাধানাথের দিকে তাকাইতেই তাহারা কহিল, তাই চলুন হুজুর। নিজের চোখে-কানে সব দেখে-শুনে যাবেন।

হুজুরের পিছু পিছু সকলে ভিড় করিয়া ঢুকিলাম।

ছেলেগুলাকে দেখিয়া রাধানাথ কহিল, হারামজাদা ছেলেগুলো সব জায়গাতেই আছে! সকলে উঠানে গিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের সকলকে দেখিয়া ফুন্টি রান্নাঘরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, হাতে একটি লণ্ঠন, চোখে বিস্ময় ও আশঙ্কা। এদিকে লম্বা একটানা বারান্দায় তিনু ও গোষ্ঠ ধরাধরি করিয়া একটা বড় শতরঞ্জি পাতিতে লাগিল।

মণীন্দ্র ফুন্টিকে ডাক দিয়া কহিল, ঐ লণ্ঠনটা নিয়ে আয়। তোর পিসীমা কোথায়?

ফুন্টি আসিতে আসিতে জবাব দিল, আসন করছেন।

সমবেত জনতার মধ্যে একটা চাপা হাসির তরঙ্গ গড়াইয়া গেল।

কে কহিল, আসন নয়, আসনাই করছেন। কে কহিল, চপ-কাটলেট সাঁটছেন। কে প্রশ্ন করিল, চপ-কাটলেটও খায় নাকি?

উত্তর হইল, খুব, খুব। দারোগাবাবুর খানসামা দিন একটা ক'রে মুরগীর ঠ্যাং বাড়িতে দিয়ে যায়।

মণীন্দ্র প্রবোধ গাঙুলীর মাকে হাতে ধরিয়া আনিয়া শতরঞ্জিতে বসাইয়া দিয়া যুক্তহস্তে হুজুরকে কহিল, হুজুর, এসে বসুন, যা জিজ্ঞেস করবার করুন।

হুজুর কহিলেন, আমরা বসব না, এমনই এখান থেকেই জিজ্ঞাসা করছি।—বলিয়া গাঙুলী মশায়কে কথা বলিতে আদেশ দিলেন।

গাঙুলী মশায় কতকটা আগাইয়া গিয়া উচ্চৈস্বরে কহিলেন, খুড়ী, কেমন আছ?

বৃদ্ধা কম্পিত স্বরে টানিয়া টানিয়া কহিল, কে তুমি?

আমি পরাণ।

বৃদ্ধা পুলকিতা হইয়া কহিলেন, ও! পরাণ! আয় বাবা, ব'স। আসিস না কেন আজকাল?

গাঙুলী মশায় প্রশ্নের জবাব না দিয়া কহিলেন, ভাই এসেছে যে তোমার।

বৃদ্ধা আগ্রহের সহিত কহিল, কে, অনুকূল? কই?

আসে নি এখানে; রাধানাথের বাড়িতে উঠেছে।

বৃদ্ধা বিস্ময় ও ক্ষোভের সহিত কহিল, সে কি! আমি এখনও বেঁচে আছি। আর অনুকূল কোথায় রাধানাথের বাড়িতে উঠেছে! কই, অনুকূলকে ডেকে দে দেখি, এত বয়েসেও বুদ্ধি-শুদ্ধি হয় নি ওর।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, এ বাড়িতে পা দেবেন না বলেছেন।

বৃদ্ধা ঘাড় নাড়িয়া কহিল, প্রবোধ আমার নেই ব'লে বুঝি আসতে চাইছে না? অশ্রুজড়িত কণ্ঠে কহিতে লাগিল, কি করবি বল? ভগবানের মার, মাথা পেতে নিতেই হবে। না হ'লে এমন ছেলে হারিয়ে মাকে বেঁচে থাকতে হয়? তবু তো হতভাগী আমি বেঁচে রয়েছি, খাচ্ছি-দাচ্ছি; মরণ হচ্ছে কই বল? বলিতে বলিতে ভাবলেশ-হীন দৃষ্টিহারা চক্ষু দুইটি হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আঁচলে

মুছিয়া কহিল, অনুকূলকে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে পাঠিয়ে দিগে। আর বাঁচব না বেশিদিন, শেষদেখা দেখে যাক।

গাঙুলী মশায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন।

হুজুর কহিলেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওসব কি শুনছেন? যা বলতে এসেছেন, ব'লে দিন না।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, ওজন্যে নয় খুড়ী। তোমার বাড়িতে ম্লেচ্ছ-কীর্ত্তি হচ্ছে কিনা, তাই আসবে না বলেছে।

সবিস্ময়ে বৃদ্ধা কহিলেন, আমার বাড়িতে ম্লেচ্ছকীর্ত্তি! স্বয়ং জনার্দ্দন এসে বললে যে, বিশ্বাস করব না পরাণ। আমার বউমা থাকতে সে হবার উপায় নেই। দেখেছ তো আমার বউমাকে, যৌবনে যোগিনী সেজেছে, একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করে; কত বলি, বউমা, একটু জল খাও, শোনে না।

আবার হাসির তরঙ্গ উঠিল।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, তুমি জান না খুড়ী, দেখতে তো কিছু পাও না। তোমার বউ যা-তা করতে আরম্ভ করেছে। মোছলমান দারোগার বাড়িতে আনাগোনা করে, তাকে এনে বাড়িতে বসিয়ে খাওয়ায়, আরও যা যা করে, তা আর মুখে বলা যায় না।

সহসা পাশের ঘর হইতে সরোজিনী বাহির হইয়া দৃঢ়চরণে ঋজু-ভঙ্গিতে সকলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। পরনে গরদের থান, গায়ে শুধু শেমিজ, মাথায় এলোচুল হইতে অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে, মুখে বিস্ময় ও বিরক্তি; মণীন্দ্রের দিকে চাহিয়া কহিল, কি ব্যাপার?

মণীন্দ্র কহিল, গাঁয়ের সব মাতব্বররা এসেছেন তোমার কাছে, আর এসেছেন আমাদের হুজুর।

কপাল কুঁচকাইয়া সরোজিনী কহিল, কে?

মণীন্দ্র কহিল, আমাদের এ তল্লাটের ছোট হাকিম।

সরোজিনী তাচ্ছিল্যের সহিত হুজুরের দিকে একবার কটাক্ষক্ষেপ করিয়া কহিল, কি জন্যে এসেছে সব?

হুজুর গরম হইয়া কহিলেন, আপনি যে হিন্দুঘরের বিধবা হয়ে

সমাজের বুকে ব'সে যা ইচ্ছে তাই করছেন, তারই কৈফিয়ৎ নিতে এসেছি আমরা।

সরোজিনী মণীন্দ্রর দিকে চাহিয়াই ভারী গলায় কহিল, ব'লে দাও, কারও কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই আমরা।

অপমানে মুখ কালো করিয়া হুজুর গাঙুলী মশায়ের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, তবে আর কি, ফিরে চলুন। ভাল কথায়—

বলিতে না বলিতে রাধানাথ আগাইয়া গিয়া কহিল, নিশ্চয় বাধ্য। সমাজে বাস ক'রে যা-তা করতে পার না তুমি।

সরোজিনী রাধানাথের দিকে তাকাইয়া শান্তকণ্ঠে কহিল, কি করেছি আমি?

রাধানাথ কহিল, দারোগার সঙ্গে থানায় গিয়ে দেখা করেছ।

সরোজিনী দুই চোখ ডাগর করিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, দারোগার কাছে গিছলাম আমি একা? রাধানাথ ঠাকুরপো! মিথ্যে কথা ব'লো না, এখনও চন্দ্র-সূর্য্য উঠছে।

রাধানাথ ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, উঠছেই তো। কিসের মিথ্যে!

গাঙুলী মশায় কহিলেন, রাধানাথ, তুমি থাম, আমি বলছি। তারপর আগাইয়া গিয়া কহিলেন, দারোগাকে ঘরে বসিয়ে তার সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া স্ফূর্ত্তি-আমোদ কর নি তুমি?

রাগে সরোজিনীর মুখ আগুনের মত লাল টকটকে হইয়া উঠিল; কিন্তু কিছু জবাব দিল না।

রাধানাথ কহিল, গাঁয়ের জোয়ান ছেলেগুলোকে বাড়িতে জড়ো ক'রে তাদের মাথা চিবিয়ে খাচ্ছ না তুমি?

সরোজিনী জলন্ত চোখে দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, তোমরা মিথ্যেবাদী।

রাধানাথ ভড়কাইয়া গিয়া কহিল, মিথ্যেবাদী বইকি? নিজে যা-তা ক'রে—

পিছন হইতে কে বলিয়া উঠিল, বেশ্যার আবার তেজ!

হঠাৎ সরোজিনী চীৎকার করিয়া উঠিল, কি, আমি বেশ্যা? আমার বাড়িতে এসে আমাকে অপমান? আমার স্বামী নেই ব'লে কি এমনই নেমে গেছি যে, পথের কুকুর এসে আমাকে লাথি মারবে? তীক্ষ্ণকণ্ঠে

শাশুড়ীকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, মা, শুনছেন কি বলছে? আমি বেশ্যা! হঠাৎ ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া, 'ও মা গো' বলিয়া, ভাল ভাল যাত্রা-থিয়েটারে নায়িকাদের যেমন ভাবে পতন ও মূর্চ্ছা হয়, ঠিক তেমনই কায়দায়, অতি সুনিপুণভাবে সরোজিনী শতরঞ্চির উপর ধড়াস করিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল।

মণীন্দ্র চীৎকার করিয়া উঠিল, ওরে, আমাদের কি হ'ল রে! সবাই মিলে বোনকে আমার মেরে দিলে রে! সঙ্গে সঙ্গে ফুন্টি মিহি গলায় তান ধরিল, পিসীমার কি হ'ল গো!

শাশুড়ী স্খলিতকণ্ঠে 'অ বেউমা, কি হ'ল গো' বলিতে বলিতে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া সরোজিনীর দিকে যাইতে শুরু করিলেন। বেগতিক দেখিয়া হুজুর দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেই কহিলাম, চ'লে যাচ্ছেন যে?

হুজুর ত্রস্তকণ্ঠে কহিলেন, আরে মশায়, এমন সীন করবে জানলে কে আসত! সাংঘাতিক মেয়েমানুষ! একটা চৌকিদারকে ডেকে দিন দেখি!—বলিয়া ডাকার অপেক্ষা না করিয়াই দরজার দিকে ছুটিলেন। চৌকিদাররা ব্যাপার দেখিয়া আগেই সরিয়া পড়িয়াছিল। শুধু গোষ্ঠ পিছনে পড়িয়া গিয়াছিল এবং এখন সুযোগ বুঝিয়া পলাইতেছিল; তাহাকে ডাকিয়া হুজুরের চার্জ বুঝাইয়া দিলাম। রাধানাথ, গাঙুলী মশায়, দোলগোবিন্দ 'হুজুর চ'লে গেলেন যে, হুজুর চ'লে গেলেন যে' বলিতে বলিতে সরিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই তিনুর দল তাহাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিল। রাধানাথ তাহাদের একজনকে একটা চড় কষাইবার চেষ্টা করিতেই সেই ছেলেটি রাধানাথের হাতের পাঞ্জা ধরিয়া এমনই মুচড়াইয়া দিল যে, রাধানাথ 'উঁহু, ছাড়, ছাড়' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দোলগোবিন্দ উত্তেজনায় বুকে হাত দিয়া বসিয়া পড়িয়া কাসিতে শুরু করিল। বিধবারা ও ছেলেগুলা সরোজিনীর মূর্চ্ছিত দেহের কাছে ভিড় করিল। হঠাৎ 'কি হ'ল গো' বলিয়া মিণ্টা এবং 'কি হ'ল হে, অ্যাঁ' বলিয়া তাহার বাপ বীরু আচায্যি ছুটিয়া ঘরে ঢুকিল। মিণ্টা সটান সরোজিনীর কাছে চলিয়া গেল, বীরু আচায্যি ব্যূহ-মধ্যস্থ রথীদের কাছে দাঁড়াইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

উপরে এতগুলি ব্যাপার বর্ণনা করিতে এত সময় লাগিল বটে, কিন্তু ঘটিতে তাহাদের দু-তিন মিনিটের বেশি সময় লাগিল না। আমি সমস্ত ব্যাপারটা একবার দেখিয়া লইয়া সরোজিনীর কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। সরোজিনী নিস্পন্দ, অচেতন ভাবে পড়িয়া আছে; পায়ের কাছে বসিয়া ফুন্টি হাউহাউ করিয়া কাঁদিতেছে; মাথার কাছে উবু হইয়া বসিয়া মণীন্দ্র মুখের মধ্যে আঙুল চালাইয়া দাঁত ছাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, তিনু মাথায় জল ঢালিতেছে ও তিনুর পাশে দাঁড়াইয়া মিণ্টা পাখা করিতেছে। হঠাৎ হিন্দুস্থানী মোটা গলায় 'কি হয়েছে' বলিয়া বোধ হয় লছমন সিং প্রবেশ করিল। তারপর দারোগাবাবুর গলা শুনিলাম, ঘর চড়াও ক'রে মারপিট করতে এসেছেন সব! বুড়ো বয়সে ৪৪৮ ধারায় কেসে পড়লেন শেষে! ওখানে কি ব্যাপার!

মণীন্দ্র দাঁত ছাড়িয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাথায় হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে হেঁড়ে গলায় কাঁদিয়া উঠিল, দারোগাবাবু, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।

কি হয়েছে? খুন-জখম কিছু হয়েছে নাকি, অ্যাঁ?—বলিতে বলিতে দারোগাবাবু ছুটিয়া আসিলেন। সকলে পাশ কাটিয়া রাস্তা করিয়া দিল। দারোগাবাবু কাছে আসিয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে কহিলেন, ম'রে গেছেন?

মেয়েদের মধ্যে কে বলিল, মরে নি বাছা, উতলা হ'য়ো না, মূর্চ্ছো গেছে।

দারোগাবাবু আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, ও মূর্চ্ছা! ভাঙে নি? একবার ডাক্তারবাবুকে কেউ ডেকে আনুক। কড়া গলায় ভিড়ের উদ্দেশে কহিলেন, এখানে কেউ ভিড় ক'রো না। ধমক দিয়া কহিলেন, যাও। কেউ এখানে থাকতে পাবে না।—বলিয়া দুই পা আগাইয়া যাইতেই ছেলেগুলা ছুটিয়া পলাইল ও বিধবারা গনগন করিতে করিতে সরিয়া দাঁড়াইল। দারোগাবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কে ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গেল?

ফুন্টি মিহিসুরে কাঁদিতে কাঁদিতে মিণ্টা ও তিনকড়ির দিকে তাকাইয়া ছিল; তিনুর উদ্দেশে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, আপনি যান না তিনু দাদা। ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনুনগে, মিণ্টা দিদি জল দিচ্ছে।

দারোগাবাবু কহিলেন, ওঁর মাথাটা মাটিতে গড়াচ্ছে, কেউ কোলে তুলে নিলেই পারেন।

হঠাৎ পাশে গুঁতা খাইয়া দেখিলাম, হারাণ ঠেলাঠেলি করিয়া আগাইয়া যাইতেছে। আমাকে দেখিয়া কহিল, যাব?

সকলকে শুনাইয়া কহিলাম, যাও না হারাণ, কোলে নিয়ে ব'স; তোমার তো ছোট শালী—নিজের বোনের মত।

মণীন্দ্র না বসিতে বসিতেই, হারাণ ঝপ করিয়া বসিয়া পড়িয়া সরোজিনীর মাথাটা কোলে তুলিয়া লইল এবং লইতেই সরোজিনী সম্বিৎ লাভ করিয়া, দুই কনুয়ের উপর ভর দিয়া মাথা তুলিয়া, হারাণের মুখের দিকে দুই বিহ্বল-চোখ মেলিয়া কহিল, কে, জামাইবাবু? তারপর হারাণের কোলে মাথা গুঁজিয়া দুই বাহু দিয়া হারাণের কোমর জড়াইয়া ধরিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কোথায় ছিলেন? সাহেব নিয়ে সব মারতে এসেছিল আমাকে।—বলিয়া আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

মণীন্দ্র হাঁকিয়া কহিল, গোবর-গণেশের মত ব'সে থেকো না হারু, দাঁতটা ছাড়াও।

দারোগাবাবু কহিলেন, তিনকড়িবাবু এত দেরি করছেন! আচ্ছা, আমি ওঁকটা একবার দেখি, যা-ই আরম্ভ করেছে সব। একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

পলাতক

তাহারা আসিতেছিল।

রেঙ্গুন হইতে প্রোম, প্রোম হইতে পোডাং, তারপর সেখান হইতে একশো কুড়ি মাইল অতি দুর্গম পাহাড়ের পথ পার হইয়া চট্টগ্রামের অভিমুখে।

১৯৪২ সালের ২৩এ জানুয়ারি। ব্রহ্মদেশে তখন বসন্ত আসিয়াছে। পাহাড়ে পাহাড়ে ফুল ফুটিতেছে অজস্র। সোনার মন্দির সোয়েডাগন প্যাগোডার ধ্যানী বুদ্ধের সামনে ধূপদানিতে সুগন্ধি ধূপ পুড়িতেছে। পথ বাহিয়া ফুলের মত সুন্দরী মেয়েদের শোভাযাত্রা।

প্রতিবার তো এমন করিয়াই বসন্ত আসে। কিন্তু এবার সে আসিল রূপ বদলাইয়া। আকাশের নির্মেঘ নীলিমা বিমানধ্বংসী কামানের ধোঁয়ায় কালো হইয়া গেল। বাতাসে বনফুলের মদিরতা নয়—মাস্টার্ড-গ্যাসের তীব্র ঝাঁজ কি ভাসিয়া বেড়াইতেছে! আগুনে-বোমা হইতে উঠিতেছে পোড়া রবারের মতো একটা বিকট দুর্গন্ধ। একটা পলাতক ভয়ার্ত্ত জন্তুর মতই যেন বসন্ত আসিয়া স্লিট-ট্রেঞ্চে আশ্রয় লইয়াছে।

বন্দরের পাশেই আরমান স্ট্রীট। তেইশে জানুয়ারির সুপ্রভাতে জাপানী বিমান আসিয়া বোমার বিস্ফোরণে নববসন্তকে অভিনন্দিত করিয়া গেল। এবং তারপর—

তাহারা পলাইতেছিল।

প্রোমে বসিয়াছে সরকারী ক্যাম্প। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ী পথে যাহাতে মানুষের অস্বাভাবিক ভিড় না জমিয়া যায়, সেইটা নিয়ন্ত্রিত করিবার

জন্যই। কিন্তু বন্যার জলকে বালির বাঁধ দিয়া ঠেকাইবার চেষ্টার মতই দাঁড়াইয়াছে ব্যাপারটা। এক-একদল করিয়া বাহির হইবার ছাড়পত্র পায় তো অবশিষ্ট সহস্র সহস্র কণ্ঠে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ধ্বনিত হইয়া উঠে।

অবশ্য বিক্ষুব্ধ হইবার কথাই।

ক্যাম্পে যাহারা আটক পড়িয়াছে, কলেরা শুরু হইয়াছে তাহাদের মধ্যে। কথা নাই, বার্ত্তা নাই—বারকয়েক ভেদবমি করিয়াই এক-একজন চোখ উল্টাইয়া পড়িতেছে, আর সরকারী লোক আসিয়া তাহাদের কোন্ দিকে যে টানিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা ভগবানই জানেন। অন্তত যাহারা যাইতেছে, তাহারা আর ফিরিতেছে না।

তবু যেমন করিয়া হোক, ফেরী ষ্টীমারে ইরাবতী পাড়ি দিয়া তাহারা আসিয়া পোডাঙে পৌছিয়াছে, এবং তারপরেই আরাকানের পথ ধরিয়া বহু দুঃখের যাত্রা শুরু হইয়াছে তাহাদের।

পথ—পথ—পথ। এ যেন আর কখনও ফুরাইবে না। আরাকানের দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়া, উটের পিঠের মত বন্ধুর ও অসমতল চড়াই-উতরাই ভিঙাইয়া তাহারা চলিতেছে। থাকিয়া থাকিয়া এক-একবার ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিগুলি মাথার উপর দিয়া বুলাইয়া লইতেছে—কোন্ সময় বা সূর্য্যোদয়ের দেশ হইতে "মিৎসুবিশি" বিমান আসিয়া গোটা-কয়েক বোমা বর্ষণ করিয়া যায়।

পথ, কিন্তু পথ বলিতে কি ইহাই? সম্মুখে পিছনে যতদূরে তাকানো যায়, অপরিচ্ছন্ন জঙ্গল আর উদ্ধত মাথা তুলিয়া পাহাড়ের শ্রেণী; সংকীর্ণ পথের গা ঘেঁষিয়া অতলস্পর্শ গভীর খাদ হাঁ-হাঁ করিতেছে, শ্যাওলায় পা পিছলাইয়া একবার পড়িলেই নিশ্চিতভাবে পাতালে টানিয়া

লইয়া যাইবে—এতটুকু আর্ত্তনাদও বাহিরের আলো-বাতাসে ভাসিয়া আসিবে না হয়তো।

কষ্ট হয় বুড়া আব্বাসেরই সব-চাইতে বেশি।

দিগন্তকে আবৃত করিয়া পাহাড়ের পর পাহাড় যেন প্রতিরোধের তর্জ্জনী তুলিয়া আছে। সেদিকে চাহিলে এতটুকু আশা করিবার থাকে না। একশো কুড়ি মাইল ডিঙাইয়া টাঙ্গাপে পৌছিতে হইবে; কিন্তু আজ পরম দুঃসময়ে এই পথটা যেন অনন্ত পর্য্যন্তই প্রসারিত হইয়া গিয়াছে।

আব্বাসের কণ্ঠস্বর অনেকটা যেন আর্ত্তনাদের মতই শোনায়।

একে বয়স হইয়াছে, তাহার উপর একখানা পাকে টানিয়া টানিয়া হাঁটিতে হয়। কোন্ একটা কারখানার দান। ছোটবেলায় কবে মুখের একটা দিক পুড়িয়া গিয়াছিল, খানিকটা কালো মাংস সেখানে যেন শিক-কাবাবের মত জমিয়া আছে। সে মুখে যখন যন্ত্রণার চিহ্ন দেখা দেয়, তখন সেটাকে রীতিমত পৈশাচিক বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলে, আল্লা!

আল্লা! তীক্ষ্ণ রূঢ়কণ্ঠে কালু মিঞা কথাটার প্রতিধ্বনি করে। দলের মধ্যে তাহার একটু বিশেষত্ব আছে। জোয়ান বয়স, হয়তো সেইজন্যই নিজের ভাবনাটাকে তেমন করিয়া আমল দেয় না সে। কিন্তু পঙ্গু ওই সহযাত্রীর দল—বিশেষ করিয়া আসন্নপ্রসবা ওই মান্দ্রাজী মেয়েটির দিকে চাহিলে সে যেন মাথা ঠিক রাখিতে পারে না।

চলিতে চলিতে আব্বাস বিড়বিড় করে, এখন মরলেই বেঁচে যেতাম।

কিন্তু মরিতে যে আদৌ চায় না—এ তো চোখের সামনেই দেখা

যায়। খোঁড়া পাটা লইয়া বার বার পিছাইয়া পড়ে, তবু প্রাণপণে দলের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে চেষ্টা করে। খানিকদূর আসিয়া ধপ করিয়া একটা ঢিবির উপর বসিয়া পড়ে, তারপর জিব বাহির করিয়া শুরু করে হাঁপাইতে।

সঙ্গীরা খুশি হয় তা নয়। এই অক্ষম বুড়াটাকে পথের মধ্যে ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিলেই অনেকে স্বস্তি বোধ করে যেন।

মজিদের বিরক্তিটা আর কোনক্রমেই গোপন থাকে না।

কালু মিঞা কিন্তু রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠে। ডক-কুলিদের কি একটা ইউনিয়নে সে ছোটখাটো পাণ্ডাই ছিল বলিতে হইবে। হয়তো সেই কারণেই মানুষের জীবন সম্বন্ধে ধারণাটা তাহার কিছু পরিমাণে বদলাইয়া গিয়াছে।

রূঢ় চট্টগ্রামী ভাষায় ধমক দিয়া বলে, মানুষ না তোমরা সব? খালি নিজের প্রাণটা বাঁচাবার জন্যেই ব্যস্ত?

তিরস্কারটা কঠিন। কিন্তু এ সত্যটা কে না জানে যে, নিজের প্রাণটা বাঁচাইয়া রাখার চাইতে বড় কাজ পৃথিবীতে আর কিছুই নাই! নিঃস্বার্থতা শব্দটা শুনিতে চমৎকার, কিন্তু জীবন লইয়াই যেখানে প্রশ্ন, সেখানে ওটা চিরকাল নীতি-পাঠের রাজত্বেই বিরাজ করে মাত্র।

মজিদ বলে; সে তো ঠিক। কিন্তু এমন ক'রে হাঁটলে কাউকেই বাঁচতে হবে না। তা ছাড়া—। হাত বাড়াইয়া সে নির্দেশ করে মান্দ্রাজী মেয়েটির দিকে।—ওর অবস্থা তো দেখছ?

না দেখিবার মত নয়। মাতৃত্বের আশীর্বাদ যে কতবড় অভিশাপ হইয়া দাঁড়াইতে পারে সময়বিশেষে, কাঞ্চীই তাহার প্রমাণ। ইচ্ছা করিয়া কিনা কে জানে—মান্দ্রাজী কুরুঙ্গীর দল তাহাকে পিছে ফেলিয়া গিয়াছে। সেই হইতেই সে সঙ্গ ধরিয়াছে ইহাদের।

এক মুহূর্ত্ত ভাবিয়াই কালু মিঞা কর্ত্তব্যটা স্থির করিয়া ফেলে। চট করিয়া সে সামনে ঝুঁকিয়া পড়ে, তারপর পরক্ষণেই আব্বাসকে তুলিয়া লয় সোজা কাঁধের উপর। নিবিড় জঙ্গলের ছায়ায় আরাকান রোডের আঁকাবাঁকা সরীসৃপগতিকে অনুসরণ করিয়া সে আগাইয়া চলে, এক মুহূর্ত্তে সে একটা আসুরিক শক্তি লাভ করিয়াছে যেন। সঙ্গীরা একবার এ ওর মুখের দিকে তাকায় মাত্র।

আরাকান রোড।

ইতিহাসের জরাজীর্ণ পাতায় সন্ধান করিলে আজও খুঁজিয়া পাওয়া যায় ইহার বিবর্ণ স্বাক্ষর। জরাগ্রস্ত সম্রাট শাজাহানের পঙ্গুশিথিল মুষ্টি হইতে 'দিল্লীশ্বরো জগদীশ্বরো বা'র রাজদণ্ড যখন স্খলিত হইয়া পড়িতেছে; সেদিনকার সেই ভ্রাতৃরক্তে কলঙ্কিত কাহিনী। রাজ-মহলের বিলাস-দুর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া বিশখালির নদীর ধারে, নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে সুজাবাদের কেল্লায় শ্বাপদের মত লুকাইয়া থাকিয়া, অবশেষে নিতান্ত নিরুপায় বাংলার নবাব শা-সুজা এই পথ ধরিয়াই আরাকানে পলাইয়া গিয়াছিলেন। বিশ্বাসঘাতকের হাতে নিজেকে সমর্পণ করিয়া সপরিবারে তিনি আত্মরক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার অশ্রুচিহ্ন আজও বিস্মৃতির পারে মিলাইয়া যায় নাই।

আজ আবার সেই পথ দিয়াই ইহারা পলাইতেছে। হয়তো এমনই করিয়াই ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে নিজেকে। অথবা ইহাই হয়তো মহাকালের পরিহাস।

রেঙ্গুনে যখন ছিল, স্বাতন্ত্র্যের সীমা ছিল না। সাম্প্রদায়িকতার বিষ হিংসার নীল ফেনা বাহিয়া ইহাদের মধ্যে যে ফুঁসিয়া না উঠিয়াছিল

তাও নয়। কিন্তু দুঃখের এই পরম মুহূর্তে হিন্দুস্থানের দিবাস্বপ্ন আর পাকিস্তানের আকাশ-কুসুম খানিকটা অলীক ধোঁয়ার মতই মিলাইয়া গিয়াছে শূন্য দিগন্তে। সমস্ত সংস্কারকে ছাড়াইয়া কোথা হইতে নিত্য-কালের অখণ্ড মানুষটি আসিয়া আজ ইহাদের মধ্যে দেখা দিয়াছে।

সন্ধ্যা নামিতেছে। পাহাড়ের মাথায় মাথায় রক্তের মত প্রগাঢ় সূর্যের আলো। এলোমেলো জঙ্গল যেন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল লইয়া দিকে দিকে উঁকি মারিতেছে কালো কালো বিকটমূর্তি রাক্ষসের মত। যেন সন্ধ্যার অন্ধকার আরও একটু ঘন হইয়া আসিলে একেবারে ইহাদের ঘাড়ের উপরেই ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

সামনে অচেনা দীর্ঘ পথ। বাঁকের পর বাঁক রচিয়া চলিয়াছে তো চলিয়াছেই। কবে যে শেষ হইবে, কে জানে! কখনও কখনও এমনও সংশয় জাগে যে, ইহা কোন দিন আর ফুরাইবে না—মহাপ্রলয়ের দিনটি পর্যন্ত অশ্রান্তভাবে চলিয়া সোজা নামিয়া যাইবে মহাপ্রস্থানের পাতাল-গর্ভে।

কিন্তু থামিতে হইল। পথের শেষ না থাক, মানুষের ক্লান্তি আছে। উপত্যকার এক পাশে একটা শালবনের মধ্যে ইহারা ডেরা বাঁধিল রাত্রির মত। সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, তাই দিয়াই পোড়াং হইতে চাল, ডাল, চিঁড়া কিনিয়া আনিতে হইয়াছে। এক টাকা করিয়া পড়িয়াছে চালের সের, তাহাও ফুরাইয়া আসিল প্রায়। দলসুদ্ধ সকলে যদি একবেলা করিয়া খায়, তাহা হইলে টাঙ্গাপ পর্যন্ত কোন রকমে কুলাইতে পারে হয়তো।

শুকনা ডালপাতা সংগ্রহ করিয়া ছোট একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালাইয়া লইতে হইল। হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের অভাব নাই কোনখানে। জঙ্গলের আড়ালে আড়ালে আশামুগ্ধ হইয়া ঘুরিয়া

বেড়াইতেছে তাহারা। কান পাতিয়া থাকিলে ঝরা পাতার উপর হয়তো শোনা যায় তাহাদের লুব্ধ পদধ্বনি।

আজ প্রায় পঞ্চাশ মাইল ধরিয়া তাহাদের বিনা জলেই কাটিতেছে এক রকম। এই পথের সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব এই যে, এতটা সুদীর্ঘ পথ ধরিয়া কোনখানে একবিন্দু তৃষ্ণার জল পাইবার জো নাই। পাষাণ প্রকৃতি নির্মম কঠিনতায় যেন মুখ ফিরাইয়া বসিয়া আছে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এই রূঢ়তার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া অর্দ্ধ-উলঙ্গ যে নাগাজাতি বাস করে, তাহাদের কাছ হইতেও এতটুকু সহানুভূতি মেলে না। এক ঘটি জল চাহিলে তীর-ধনুক বাগাইয়া নাগারা তাড়া করিয়া আসে।

দিন-দুই আগে পাহাড়ের মধ্যে হঠাৎ একটা কর্দ্দমাক্ত ঝরনার সন্ধান মিলিয়াছিল। টাঙ্গাপ হইতে আসিবার সময় যে গোটা-তিনেক মাটির ভাঁড়ে জল সঞ্চয় করিয়া আনা হইয়াছিল, সেগুলি আবার নূতন করিয়া ভরিয়া লওয়া হইয়াছে। পালা করিয়া সকলে এই জলের ভার বহন করে। অপচয় করিবার উপায় নাই, ক্ষুধা পাইলে চিঁড়া আর কাঁচা চালই চিবাইতে হয়, রান্না করা চলে না।

মজিদ জলের কলসীগুলির দিকে তাকাইল।—এও ফুরিয়ে এসেছে।

কালু জবাব দিল, তা তো দেখছিই।

কিন্তু এর পরে কি হবে? যা জল ছিল, তাতে আমাদের তো টাঙ্গাপ পর্যন্ত কুলিয়ে যেত, কিন্তু—

দ্বিতীয় 'কিন্তু'টার মানে অত্যন্ত সহজ। এতদিন তো তাহারা চলিয়া যাইত নিশ্চয়ই। কিন্তু বুড়া আব্বাস আর কাঞ্চীর উপসর্গ তো কালু মিঞাই জুটাইয়া লইয়াছে।

আগে তো ফুরোক, তারপর সে ভাবনা ভাবা যাবে।

হুঁ। মজিদ চুপ করিয়া রহিল। দুইটা পরস্পরবিপরীতমুখী মন

লইয়া কখনই তর্ক চলিতে পারে না। অথচ যেমন করিয়া হউক, ইহার একটা প্রতিবিধান করিতে হইবে।

আব্বাস এক পাশে পড়িয়া গোঙাইতেছে—লোকটার খোঁড়া পায়ে কি একটা ঘটিয়াছে যেন। কাঞ্চী একটু দূরে একটা গাছে ঠেসান দিয়া পাথরের মূর্ত্তির মত বসিয়া আছে নীরবে। তরুণী, কিন্তু মান্দ্রাজী মেয়ের স্বাভাবিক কাঠিন্য আর কুলিজীবন তাহার চেহারায় এতটুকু শ্রীছন্দ আঁকিয়া দেয় নাই। বাঙালী কিংবা আর কোনও জাতের মেয়ে হইলে এ পথ বাহিয়া এ ভাবে আসিতে পারিত কি না সন্দেহ।

তাহার ভাঙা ভাঙা হিন্দী চট্টগ্রামী মুসলমানেরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না, সেও যে তাহাদের কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারে এমন নয়। তবু বাধ্য হইয়া ইহাদের সঙ্গ তাহাকে লইতে হইয়াছে, কোন্ ঘাটে গিয়া যে ভিড়িবে, তাহাও অনুমান করার জো নাই।

সামনে শুকনা ডালপাতার আগুন জ্বলিতেছে দপদপ করিয়া, আর তাহার লাল আলোটা থাকিয়া থাকিয়া নাচিতেছে গর্ভকাতর কাঞ্চীর পীড়িত মুখের উপর। পেটে একটু একটু ব্যথা উঠিতেছে যেন। দাঁতে দাঁত চাপিয়া কাঞ্চী পাথরের মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল।

পাহাড়ের গায়ে কালো রাত্রি ঘন হইয়া নামিতেছে। আকাশে চাঁদের একটা বাঁকা রেখা শালবনের ওপারে অস্তে নামিয়া গেল। আব্বাস গোঙাইতেছে।

কিছু চাল আর চিঁড়া একত্রে গো-গ্রাসে গিলিয়া লইয়াছে সকলে। সারাদিনের কঠিন পরিশ্রমের পরে যে যেখানে পারিয়াছে, লম্বা হইয়া অঘোরে নিদ্রায় মগ্ন। রহমনের নাক ঘড়ঘড় করিয়া ডাকিতেছে, যেন বাড়িতে নরম গদির উপরে শুইয়া গভীর আরামে ঘুমাইতেছে সে। তাহার নিশ্চিন্ত পরিতৃপ্তি দেখিলে ঈর্ষ্যা হয়।

কালু মিঞা স্তব্ধ চোখে আকাশের দিকে তাকাইয়া রহিল। তারার অজস্রতায় কোনখানে এতটুকু ফাঁক নাই। উপরের এত আলোর দিকে চাহিয়া নীচের অন্ধকারপুঞ্জকে একান্তই অর্থহীন বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

কিন্তু তারার সঙ্কেত তো চিরদিন স্পর্শের বাহিরেই রহিয়া যায়। অন্ধকারটাই বুঝি একমাত্র সত্য। নিষ্প্রদীপ নগরীর মৃত্যুমগ্ন আতঙ্ককে চিরিয়া ফাড়িয়া বোমারু বিমানের আবির্ভাব ঘটে। শিসের মত তীক্ষ্ণ শব্দ করিয়া বোমা নামিয়া আসে—আগুন, এক্সপ্লোশন, গ্যাস। বাজ-পাখির মত ছোঁ মারিয়া এক ঝাঁকে মেশিনগানের গুলিবৃষ্টি করিয়া যায়। সামাদ মিঞার কথা মনে পড়িতেছে। গ্যাসে পুড়িয়া লোকটার সর্ব্বাঙ্গে টেনিস বলের মত বড় বড় ফোসকা পড়িয়াছিল এক-একটা।

যুদ্ধ! আপনা হইতেই কথাটা মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল যেন। এ বর্ব্বরতার শেষ হইবে কবে, কে জানে! পৃথিবীর প্রথম দিনটি হইতে যে ইতিহাসের ধারা বহিয়া আসিতেছে, তাহার স্রোতটাকে উল্টা মুখে ঘুরাইয়া দিতে না পারিলে আর ইহার অবসান হইবে না।

মজিদ জাগিয়া এখনও। প্রশ্ন করিল, ঘুমোও নি কালু ভাই?

না।

ফস করিয়া মজিদের দীর্ঘশ্বাস পড়িল একটা। তাই তো, ঘুম আর কেমন ক'রে আসবে! যে সর্ব্বনাশের দিন—সর্ব্বনাশ!

অন্ধকারের মধ্যে কালু মিঞার মুখ দেখা গেল না। আমাদের সর্ব্বনাশ আর কি হবে? সর্ব্বনাশ তাদেরই—এতকাল ধ'রে যারা মানুষের রক্ত শুষে খেয়েছে।

মজিদ বুঝিতে পারিল না। বলিল, কি বলছ?

কিছু না।

আবার মজিদের দীর্ঘশ্বাস পড়িল, তোমার বিয়ে হয়েছে কালু ভাই ?

না, সময় পাই নি।

তা বুঝতে পেরেছি।—মজিদের কণ্ঠস্বর গভীর হইয়া আসিল, সেই-জন্যেই নিজের প্রাণটার কোনও দাম নেই তোমার কাছে। কিন্তু আমার ছেলে আছে, মেয়ে আছে, আমি মরলে তারা না খেয়ে মরবে।

কোথায় আছে তারা ?

চুনতি। চুনতি জান ? হার্বাঙের কাছে। চৌধুরীদের প্রজা আমরা। যেন ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছে সে, তোমার বাড়ি কোথায় ?

জানি না।

বিস্ময়ে মজিদ স্তব্ধ হইয়া গেল, জান না ?

কেমন ক'রে জানব ? ছোটবেলায় বাপ-মা ম'রে গেছে, কারখানার আওতায় বেড়ে উঠেছি। দেশ-গাঁয়ের খবর কেউ কখনও দেয় নি।

ওঃ, তাই। মজিদ চুপ করিয়া গেল। এতক্ষণে স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছে ব্যাপারটা, এইজন্যই লোকটা এমন নিরঙ্কুশ। নাঃ, ইহার সংস্রবটা ছাড়িতেই হইল।

দূর হইতে বোধ হয় গাড়িই আসিতেছে একটা। পাহাড়ের অসমতল পথে খড়খড় খটখট করিয়া উঠিতেছে একটা রূঢ় কর্কশ শব্দ। ধোঁয়ায় জড়িত মিটমিটে ল্যাম্পটার তির্য্যক রশ্মি শ্যাওলা-পড়া পাথরের উপরে চিকচিক করিতেছে। নিশ্চয়ই কোনও বড়লোক। যথেষ্ট টাকা না থাকিলে গাড়ি ভাড়া করিয়া এ পথ দিয়া যাওয়ার সামর্থ্য নাই কাহারও।

সহসা মজিদ যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে।

দিব্যি গড়গড়িয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে যাচ্ছে ব্যাটারা !—কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা প্রকাশ পাইল তাহার, আর রাস্তার ধারে আমরা না খেয়ে মরছি।

পাহাড়ী পথে দুলকি চালে টলিতে টলিতে গাড়িটা দেখা দিল। মগ-গাড়োয়ান আয়েশ করিয়া বসিয়া বিড়ি টানিতেছে। বিড়ির জোনাকি-স্ফুলিঙ্গে তাহার মুখ দেখা যায় না, কিন্তু কঠিন অবয়বটার যেন আভাস পাওয়া যায়।

কালু হাসিল, আর বেশিক্ষণ গড়গড়িয়ে যেতে হবে না। আরও একটু এগিয়ে ওই গাড়োয়ানই হয়তো মেরে-ধ'রে সব কেড়ে নেবে।

মজিদ চাপা গলায় বলিল, তাই নেওয়া উচিত।

রাত্রি বাড়িতেছে। জঙ্গলের ওপারে বহুদূরে কোথায় বাঘ ডাকিতেছে—পাহাড়ের গায়ে গায়ে গমগম করিতেছে তাহার প্রতিধ্বনি। ও না হয় দূরেই ডাকিতেছে, কিন্তু আশপাশের অরণ্যের মধ্যে আর কেহই যে ওত পাতিয়া বসিয়া নাই, এমন আশ্বাস কে দিবে ? আরাকান হিল্‌সের রহস্যাবৃত কত গুহার অন্ধকারে বসিয়া যে মৃত্যু তাহার অস্ত্র শানাইতেছে, পরিপূর্ণ দিনের আলোকেও তো তাহা নিশ্চয় করিয়া জানিবার জো নাই।

কালু উঠিয়া আসিয়া আগুনের কুণ্ডটায় কতকগুলি ডালপালা চাপাইয়া দিল।

বাতাসে একটা জান্তব গন্ধ। অদূরেই কোথায় যেন মাংস পচিতেছে। যাত্রীর ভিড় ক্রমশ বাড়িতেছে, বাড়িতেছেই। ইহার আগে যে দলটা এ পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাহাদেরই কাহারও মড়া গলিতেছে সম্ভবত। সরকার হইতে কি একটা 'রিলিফে'র বন্দোবস্ত হওয়ার কথা, কিন্তু এখনও তো তাহার কিছুই হয় নাই। পথে আসিতে আসিতে

দশ-পনরোটা শবদেহ তাহাদের চোখে পড়িয়াছে। অনশন ও পিপাসার সঙ্গে সঙ্গে হাত মিলাইয়া চলিতেছে কলেরা।

মানুষ, আকাশ-বাতাস, এই পাহাড়, বনের জীবজন্তু, রোগ, পীড়া—ইহারা সবাই একসঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াছে যেন। একের পর এক থাবা গাড়িয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, হত্যা করা ছাড়া কাহারও যেন আর কোন সংকল্প নাই। এখানে ওখানে তীব্রস্বরে ঝিঁঝি ডাকিতেছে। মনে হইতেছে, কাহারা যেন সম্মুখে পশ্চাতে ছন্দোবদ্ধ একটানা সুরে মারণ-মন্ত্র জপ করিয়া চলিয়াছে।

চুনতি। পাহাড়ের কোলে ছায়াছবির মত এক খণ্ড গ্রাম। দূর হইতে রৌদ্রের আলোয় চৌধুরীদের সাদা বাড়িটা দেখা যায়, কাঁচের সার্শিগুলি হীরার মত ঝকমক করে। স্ত্রী পুত্র কন্যা, ভালবাসায় গড়া ছোট একটি সংসার। মজিদের চোখ ভরিয়া ঘুম জড়াইতে লাগিল।

বোমা! বোমা পড়ছে! পালাও, বোমা!

একটা আর্ত্ত চীৎকারে চারদিকের পাহাড়গুলি চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। এতক্ষণ নিশ্চিন্ত আরামেই বোধ হয় ঘুমাইয়া ছিল, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে রহমন দাঁড়াইয়াছে সটান খাড়া হইয়া। আগুনের অস্পষ্ট আলোতেও দেখা যায়, তাহার ভীত চোখ দুইটা যেন কোটরের মধ্য হইতে বাহিরে ছুটিয়া পড়িতেছে; মাথার চুলগুলি সজারুর কাঁটার মত তীক্ষ্ণাগ্র হইয়া উঠিয়াছে, অমানুষিক উত্তেজনায় সর্ব্বাঙ্গ বাঁশ-পাতার মতো কাঁপিতেছে থরথর করিয়া।

মজিদ তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া সজোরে নাড়া দিতে লাগিল, রহমন, রহমন!

রহমন শুনিতেই পাইল না।—ওই, ওই আসছে! বোমা, আগুন! আল্লা, মালিক!

পরক্ষণেই মৃগীরোগীর মত সোজা সে মাটিতে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া গেল। কশ বাহিয়া তখন তাহার গ্যাঁজলা গ্যাঁজলা ফেনা নামিতেছে।

চাপা দাঁতের মধ্য দিয়া অস্ফুটভাবে কাঞ্চী গোঙাইতেছে। বাতাসে উগ্রতর হইয়া উঠিতেছে পচা মাংসের বীভৎস গন্ধটা।

কতকগুলি মানুষের গুঞ্জনে আব্বাসের তন্দ্রা টুটিয়া গেল।

পায়ের যন্ত্রণায় ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারে নাই, পেটে অসহ্য ক্ষুধার আগুন। সন্ধ্যার সময়ে ভাগে যে যৎসামান্য খাদ্য জুটিয়াছিল, দুঃসহ পথশ্রমে বহুক্ষণ আগেই তাহা হজম হইয়া গিয়াছে। ঠিক তন্দ্রাও নয়, অনেকটা আফিংখোরের মতই ঝিমাইতেছিল সে।

চেতনাটা ভাল করিয়া সজাগ হইতেই সে দেখিল, একটু দূরেই শেষরাত্রির জ্যোৎস্নায় সমুজ্জ্বল পাহাড়ের পথ বাহিয়া কাহারা সম্মুখের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। পরক্ষণেই মনে হইল, বাগানটা যেন একেবারে ফাঁকা।

তবে কি মজিদের দল তাহাকে পিছে ফেলিয়াই চলিয়া গেল?

ভয়ে এবং উৎকণ্ঠায় শুকাইয়া উঠিল একেবারে বুক পর্য্যন্ত। ক্ষীণ একটা আর্ত্তনাদ বাহির হইল কি হইল না। সে অক্ষম, সে বৃদ্ধ। এইভাবে উহারা তাহাকে একা ফেলিয়া গেলে পথের মধ্যেই পড়িয়া মরিবে যে। বাঘে খাওয়াও নেহাত আশ্চর্য্য নয়।

আব্বাসের সমস্ত চিন্তায় যেন প্রলয় শুরু হইয়া গেল। খোঁড়া পা-খানাকে টানিয়া টানিয়া ওই দলটার অভিমুখেই ছুটিয়া চলিল সে। মজিদের দলই বটে।

যা হোক, তবু সে ইহাদের ধরিয়া ফেলিয়াছে। হাঁপাইতে হাঁপাইতে রুদ্ধস্বরে বলিল, বাঃ, আমাকে ফেলে যাচ্ছ যে?

অস্বচ্ছ জ্যোৎস্নায় মজিদের সমস্ত মুখ ভরিয়া হিংসা ফুটিয়া উঠিল। দুই হাতের মুষ্টি মুহূর্ত্তের মধ্যে কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এমন অবস্থায় কি করিতে হইবে, বহুপূর্ব্ব হইতেই সেটা তাহার নির্দ্ধারিত আছে।

এক মুহূর্ত্ত সে দ্বিধা করিল কি করিল না, পরক্ষণেই বাঘের মত থাবা দিয়া আব্বাসের ঘাড়টা ধরিয়া পাঁচ-সাত হাত দূরে ঠেলিয়া দিল তাহাকে।

আব্বাস চীৎকার করিবার একটা চেষ্টা করিল, কিন্তু গলা হইতে তাহার স্বর বাহির হইল না। শ্যাওলা-পড়া পিছল পাহাড়ী পথের পাশে যেখানে তিন হাজার ফুট গভীর খাদ যুগ যুগান্তের ক্ষুধায় আকাশের দিকে হাঁ করিয়া আছে, সেইই আদর করিয়া টানিয়া লইল বুড়া আব্বাসকে। অতল-অন্ধকারের গভীরতা ঠেলিয়া শব্দের ক্ষীণতম একটা তরঙ্গও বাহিরের ঈথারে এতটুকু দোলা জাগাইতে পারিল না।

প্রকাণ্ড একটা উতরাই বাহিয়া মজিদের দল নিঃশব্দে তিরোহিত হইয়া গেল।

নিশ্চিন্তে ঘুমাইবার জো নাই। ভোর হইতে না হইতেই আবার যাত্রা শুরু করিতে হইবে। দৈনন্দিন সংস্কার আবছায়া অন্ধকার থাকিতে না থাকিতেই তুলিয়া দিল কালু মিঞাকে।

তুলিয়া দিল বটে, কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া চোখকে যেন বিশ্বাস হইল না। আগুনটা কখন নিবিয়া গিয়াছে, শুধু বাতাসে খানিকটা ছাই উড়িয়া বেড়াইতেছে। শালবনের মধ্যে সে ছাড়া আর কেহই নাই, এমন কি বুড়া আব্বাস পর্য্যন্ত নয়। এত তাড়াতাড়ি তাহারা পলাইয়াছে যে, যাওয়ার সময় আব্বাস তাহার লাঠিগাছা অবধি সঙ্গে লইতে পারে নাই। সে কি এতটাই বেশি খাইত?

তৎক্ষণাৎ মনে হইল, মানুষকে বিশ্বাস করিবার মূল্য কতটুকু। কাহার ভাল করিবার স্পর্দ্ধা সে রাখে? এই চরম দুঃসময়েও জল আর শুকনা চালের হিসাব ছাড়া বৃহত্তর পৃথিবীর কোনও রূপই যাহারা দেখিতে পাইল না, সকলের সঙ্গে কেমন করিয়া এক হইয়া তাহারা দাবি-দাওয়া বুঝিয়া লইবে? জন্ম আর জীবনের অর্থটাকে যাহারা সংকীর্ণ স্বার্থ ছাড়া আর কোনও আলোতেই ব্যাখ্যা করিতে পারে না, চাকার নীচে তাহারা আরও লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়াই গুঁড়া হইয়া চলিবে যে।

কিন্তু—

একটা অদ্ভুত শব্দে কালু মিঞার চটকা ভাঙিয়া গেল। না, সে তো একা নয়। ওই তো একটা গাছের তলায় কাঞ্চী উবু হইয়া পড়িয়া, আর, আর, তাহার পায়ের কাছে ওটা কি নড়িতেছে!

নক্ষত্রবেগে কালু আগাইয়া গেল সেদিকে।

কাঞ্চীর সর্ব্বাঙ্গে রক্ত; মাটিতেও রক্ত ও সদ্যোমাতৃত্বের কতকগুলি আনুষঙ্গিক চাপ বাঁধিয়া আছে। আর শুষ্ক অস্ফুট গলায় ট্যাঁ ট্যাঁ করিয়া কাঁদিবার চেষ্টা করিতেছে রক্ত-ক্লেদে মাখা সদ্যোজাত একটি শিশু।

কালু ডাকিল, কাঞ্চী!

কাঞ্চী সাড়া দিল না, নড়িল না পর্য্যন্ত। হয়তো অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে। গায়ে একবার হাত ছোঁয়াইয়াই সে পিছাইয়া আসিল। কাঞ্চীর সর্ব্বাঙ্গ শক্ত আর শীতল হইয়া আসিতেছে। বেশিক্ষণ আগে হয়তো মরে নাই। পথ-শ্রান্তির গভীর তন্দ্রায় সে আচ্ছন্ন হইয়া ছিল, টের পায় নাই। পাইলে হয়তো এমনটা ঘটিত না।

বাষ্পে চোখ ঝাপসা হইয়া আসে, তবু ইহারই মধ্যে সে দেখিল,

অদূরে একটা ঝোপের আড়াল হইতে ডোরা-কাটা একটা প্রকাণ্ড হায়েনা নাক বাহির করিয়া বাতাস শুঁকিতেছে। শিশুর কান্না আর রক্তের গন্ধই তাহাকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছে নিশ্চয়।

পরক্ষণেই নত হইয়া কালু মিঞা অপরিচ্ছন্ন শিশুটিকে দুই হাতে ধরিয়া অতি সাবধানে তুলিয়া আনিল। তারপর গায়ের কাপড় দিয়া বেশ করিয়া তাহাকে জড়াইয়া লইয়া পাহাড়ের পথে অত্যন্ত দ্রুতবেগে আগাইয়া চলিল সে। সময় নাই, সময় নাই। যদি সামনে কোথাও হঠাৎ একখানা গ্রাম জুটিয়া যায়, একটু দুধ যদি মেলে, তাহা হইলে ইহাকে বাঁচানো হয়তো অসম্ভব নয়। একটি শিশুর জীবন, কে জানে, সমস্ত কৌলীন্যবর্জ্জিত ভবিষ্যৎ পৃথিবীর একজন যুগপ্রবর্ত্তক কি না!

দূরে পাহাড়ের মাথায় রক্তের রং ধরিল। সূর্য্য উঠিতেছে। সামনে আরাকান রোড সরীসৃপের মত কুণ্ডলী পাকাইয়া পাকাইয়া কোন্ অলক্ষ্য দিগন্তে বহিয়া গিয়াছে, কে জানে!

এই পথ দিয়াই বাংলার নবাব শা-সুজা পালাইয়াছিলেন, আজ আবার পালাইতেছে ইহারাও। কিন্তু ইতিহাস কি কেবলই পুনরাবৃত্তি করিবে নিজেকে? নূতন করিয়া তাহার রচনা হইবে না কোনও দিন? এই পলাতকের স্রোত কি সেদিন দিগ্বিজয়ী সেনার রূপ ধরিয়া মুক্ত তরবারির ফলকে মিথ্যাবাদী ইতিহাসের ধারাটাকে, বিপরীত মুখেই ফিরাইয়া লইয়া যাইবে না?

সম্মুখে সূর্য্য উঠিল।

শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পাকিস্থানী স্কিম

পাকিস্থানী স্কিম যে ভাল
বুঝতে নারি আভাসে,
শুধু জানি, কতক মানুষ
চায় যেতে সেই আবাসে।
কিন্তু ভেবে হই যে সারা,
দেবদারু নিম কদম-চারা
কে রবে ভাই পাকিস্থানেই,
এমন নসিব কার হবে,
জুঁই চামেলি পদ্ম গোলাপ
কে যাবে আর কে রবে?
উড়িয়ে দিয়ে সব কোকিল—
পাকিস্থানেই পাঠিয়ে দিলে
উঠবে নেচে হয়তো দিল,
ছোট্ট কথা কিন্তু মোর—
'বাদুড়' 'বায়স' কোথায় রবে,
কোথায় বা 'বক' 'শামুক-খোর'?
টিয়া তোতা বুলবুলি,
শ্যামা দোয়েল চুলবুলি,
কোন্ ঠাঁয়ে নীড় বাঁধবে গিয়ে,
কোন্ পাখিরা বাদ যাবে,
'চড়াই' এতই বড়াই করে
কোন্‌খানে সে ঠাঁই পাবে?

এসব কথা নাই ধরি,
চাঁদকে ফুটা ক'রে কি হায়,
সুধা তাহার ভাগ করি—
পাঠিয়ে দেবে 'পাক'সেপুর,
তারার আলোয় চেরাগ জ্বালি
ভাগাভাগি করবে নূর ?
'ষণ্ড' 'পাঁঠা' 'গাড়োল'দের—
কোন্‌খানেতে হবে যে ঠাঁই
বুঝতে নারি, 'গ্রহের ফের'।
বুদ্ধিও যে মাথায় নাই,
বুঝতে নারি, এমনতর
পাকিস্থানী স্কিম যে তাই।

"কুমারভট্ট"

দেহবাদ

যুগে যুগে মানুষের স্মৃতি বহিয়া আনিছে কোন্ বাণী,
থামে সুর থামিলেই গীতি—প্রাণ রয়, ক্ষয় দেহখানি।
তত্ত্ব কথা সবি আছে জানা তবু দেহে আঁকড়িয়া ধরি।
দিব্যদৃষ্টি পায় যদি কানা, সহসা কি ছাড়ে তার নড়ি ?

সন্দেহ

এ বিশ্বের খেলাঘরে হ'ল বহু ভাঙাগড়া খেলা,
এবার ভাঙন দেখে মনে হয়, খেলা বুঝি শেষ ;
লণ্ডভণ্ড হাঁড়িকুড়ি পুতুল ভাঙিয়া হ'ল ঢেলা,
বিয়ে ক'রে শ্বশ্রূগৃহে এবার কি যাবে পরমেশ ?

টকিতে খুকী

প্রথম পর্ব্ব

টকি হাউস। শো শুরু হইয়া গিয়াছে। জনৈক মহিলা তাঁহার আট-নয় বছরের একটি কন্যাসহ প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া অনেক ফিসফিসানি ও হাঁটু অতিক্রম-পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে গিয়া বসিলেন। বালিকাটির হাতে লজেঞ্জুসের একটি ছোট ঠোঙা।

পর্দ্দায় চিরকুমার নায়কের বসিবার ঘর দেখা যাইতেছে। ঘরটি ষ্টুডিওর উদ্ভাবন। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় অর্দ্ধবর্গ-মাইল ; মেঝেটি পাথরের। কয়েকটি ফোয়ারা ও "পাম"গাছের একটি ছোটখাট জঙ্গল কক্ষটিতে বিদ্যমান।

চিত্রের লম্পট নায়ক তাহার ভৃত্যকে বলিতেছে, "শোন, আজ রাতে মিস হোড় ছাড়া আর কেউ এলে ব'লে দিবি যে, আমি বাড়ি নেই।" ভৃত্য প্রস্থান করিলে সম্মুখস্থ টেবিল হইতে মদের গ্লাস তুলিয়া তাহার তলদেশে নায়ক মিস হোড়ের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাইল এবং গান আরম্ভ করিল, "পেয়ালা, মোর পেয়ালা।"

আট বছরের খুকীটি প্রশ্ন করিল, ও কি খাচ্ছে মা ?

মা উত্তর দিলেন, শরবৎ।

প্রশ্ন। শরবৎ বুঝি কালো হয় ?

উত্তর। লাল শরবৎ ফোটোতে কালো দেখায় খুকু।

[একটু পরে]

প্র। আচ্ছা মা, মিস হোড় ছাড়া ও আর কারও সঙ্গে দেখা করবে না ?

উ। না।

প্র। কেন মা ?

উ। সে তুমি বুঝবে না।

[খানিকক্ষণ পরে]

প্র। মেয়েটার বুঝি খুব কষ্ট হচ্ছে? চোখ দিয়ে কত জল পড়ছে মা, দেখ।

উ। আঃ, চুপ।

প্র। বাবুটির হাতের নখে ও চুমো খাচ্ছে কেন মা?

উ। (রূঢ়ভাবে) ও রকম কড়মড় ক'রে যদি তুমি লেবেনচুষ চিবোও তো তোমাকে বার ক'রে দেবে।

নায়ক (নায়িকার প্রতি) "বাস্তবিক তোমাকে দেখলে, তোমার মুখ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায় গীতা। বিশ্বাস করছ না আমার কথা?"

প্র। ওর চোখ কি জ্বালা করছে মা?

উ। স্—স্—স্।

প্র। চোখে কিছু পড়েছে বুঝি?

উ। চুপ কর। বলছে যে, মেয়েটিকে দেখে ও খুব খুশি হয়েছে।

প্র। কেন? ও, বুঝেছি, মেয়েটা বুঝি ওর চোখ থেকে ময়লা বার ক'রে দেবে।

উ। বললাম তো, ওর চোখে কিছু পড়ে নি।

প্র। তবে চোখ জুড়োবে বলছে কেন?

উ। ওটা হচ্ছে কথা বলবার কায়দা।

প্র। কায়দা কি মা?

উ। মানে—মানে হচ্ছে যে, সত্যিই যদি ওর চোখে কিছু হয়, তা হ'লে ঐ মেয়েটি তা ভাল ক'রে দিতে পারবে।

প্র। ও নার্স নাকি মা?

উ। না না, ওকে দেখলেই ওর চোখ সেরে যেত।

প্র। কিন্তু মা, মেয়েটা যে অত ঝকঝকে সব গয়না পরেছে, তা দেখে বাবুটির চোখ আরও জ্বালা করত না?

উ। উঃ, তুমি ভয়ানক অসভ্য মেয়ে!

প্র। মা, ধর যদি ওর চোখে—

উ। (রাগতভাবে) দেখ, আবার যদি তুমি ঐ রকম ফোঁস-ফোঁস ক'রে সামনের বুড়ো বাবুটির ঘাড়ের ওপর নিশ্বাস ফেল তো উনি পেছন ফিরে তোমাকে এখুনি এক চড় কষিয়ে দেবেন, আর তা হ'লে আমি খুব খুশি হই।

নায়িকা—"ও, তুমি মনে করেছ যে, তুমি ইচ্ছে করলেই অর্থ দিয়ে আমাকে সামান্য একটা—একটা ইয়ের মত কিনে নিতে পার?" (ক্রন্দন)

প্র। একটা "কিয়ের" মত মা?

উ। সে তুমি বুঝবে না।

প্র। লেবেনচুষের মত বুঝি?

উ। (বিরক্ত হইয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ।

প্র। ঐ মেয়েটা লেবেনচুষের মত কেন মা?

উ। (ছবি দেখিতে দেখিতে তন্ময় চিত্তে) লেবেনচুষের মত নয়।

প্র। এই যে বললে?

উ। না, বলি নি। আমি বলছিলাম—। আঃ, শোন না কি বলছে!

প্র। ইয়ের মত বললে কেন মা? ওর পার্ট ভুলে যায় নি তো? আমাদের ইস্কুলে প্রাইজের দিন একটা মেয়ে তার পার্ট ভুলে—

উ। হাসাস নি বাপু (হাসিয়া ফেলিলেন)। মেয়েটা একটা বিচ্ছিরি কথা মুখ দিয়ে বার করতে পারছে না।

প্র। কি কথা মা?

উ। কি জানি! আমি জানি না।

প্র। তা হ'লে কি ক'রে বুঝলে যে কথাটা বিচ্ছিরি?

উ। মানে—আমি—

প্র। (সেই একঘেয়েভাবে) কি ক'রে বুঝলে মা যে, কথাটা—

উ। (দাঁতে দাঁত চাপিয়া) ফের যদি আমার কোলে তুমি থুতুসুদ্ধু লেবেনচুষ ফেলো তো কান ছিঁড়ে দোব।

নায়িকা (আবেগভরে) "তুমি আমাকে চরম দুর্গতির হাত থেকে বাঁচিয়েছ বিজয়দা। সে অবস্থার চেয়ে মৃত্যুও ভাল।"

প্র। ও কি বলছে মা?

উ। স্—স্—স্।

প্র। কার চেয়ে মৃত্যু ভাল মা?

উ। (সরোষে) তুমি চুপ করবে কি না?

প্র। ওঃ, বাবুটি ওকে মারত বুঝি মা? আচ্ছা মা, ঐ বাবুটি যদি তোমার কাছে আসত, তা হ'লে তুমি কি ওর নখে—

উ। চুপ, নচ্ছার মেয়ে।

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক পিছন ফিরিয়া দেখিলেন।

[কিছুক্ষণ পরে]

প্র। আচ্ছা মা, মরার চেয়েও খারাপ জিনিসের থেকে বাবুটি ওকে বাঁচিয়েছেন, তবু ও অত গোমড়া মুখ ক'রে ব'সে আছে কেন?

উ। ও মোটেই মুখ গোমড়া ক'রে নেই। ও এখন একটা ব্যথা চাপবার চেষ্টা করছে।

প্র। ওর কোথায় ব্যথা করছে মা?

উ। আঃ, চুপ কর খুকী।

প্র। আচ্ছা, ওর যদি এখন কোথাও একটা ব্যথা হয়, সেটা কি ম'রে যাওয়ার—

সশব্দে মুখ হইতে লজেঞ্জুস পড়িয়া গেল

উ। আবার মেঝেতে লেবেনচুষ ফেলেছ! ফের যদি ফেলো তো তক্ষুনি তোমাকে নিয়ে বাড়ি চ'লে যাব।

নায়ক—(একটি পক্ককেশা বৃদ্ধার কাঁধে মাথা রাখিয়া) "মাগো আমার, এ সব-ই তো তোমার জন্যে, মা।"

প্র। বাবুটি ঐ বুড়ীকে 'মাগো আমার' ব'লে ডাকছে কেন মা?

উ। (আবিষ্টভাবে)—ও যে ওর মাকে বড় ভালবাসে, মণি।

প্র। আমি যদি তোমাকে 'মাগো আমার' ব'লে ডাকি, তা হ'লে তোমার ভাল লাগবে, মা?

উ। (তত আবিষ্টভাবে নয়), তুমি আমাকে শুধু 'মা' ব'লেই ডেকো।

প্র। তা হ'লে 'মাগো আমার' ব'লে ডাকতে দেবে না তো?

উ। না।

প্র। কেন মা?

উ। আমরা তো আর সিনেমার লোক নই।

প্র। আচ্ছা মা, ধর, যদি বাবা একদিন রামধারীকে বলেন যে, তিনি কেবল বীণা-মাসী ছাড়া আর কারও সঙ্গে দেখা করবেন না—

উ। কি?

প্র। ধর, বাবা যদি ওরকম বলেন; আর তুমি যদি বল যে, বাবা তোমার সঙ্গে একটা ইয়ের মত—

উ। কিসের মত?

প্র। সেই যে মা, সেই বিচ্ছিরি কথাটা—তুমি জান, কিন্তু আমাকে বললে না। আচ্ছা, তখন আমাকে 'মাগো আমার' ব'লে ডাকতে দেবে তো?

উ। যেমনই অসভ্য, তেমনই হাড়জ্বালানি আর পাকা মেয়ে হয়েছিস।

প্র। আর আমি ওরকম কথা বলব না, মাগো আমার।

উ। চুপ করলি, লক্ষ্মীছাড়ি?

প্র। হ্যাঁ, মাগো আ—। না না, শুধু মা। এইবার, এইবার!

উ। কি হ'ল রে?

প্র। ছবি শেষ হয়েছে। এবার "মিকি মাউস" দেখানো হবে; "মিকি মাউস", "মিকি মাউস"।

উ। বাব্বা, বাঁচা গেল।

মাতা খুকীর হাতের ঠোঙা হইতে একটা লজেঞ্জুস লইয়া মুখে পুরিলেন

দ্বিতীয় দৃশ্য

পূর্ব্ব-বর্ণিত দৃশ্য। এবার খুকীটির হস্তে লজেঞ্জুসের ঠোঙার বদলে একটি বোতল। শার্লি টেম্পল ও রিন-টিন-টিন দেখিতে পাইবে আশায় আসিয়াছিল; কিন্তু মিস কায়াকে পর্দ্দায় দেখিয়া তাহার মেজাজ অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে এবং সে একবর্ণও বুঝিতে পারিতেছে না।

প্র। মা, মেয়েটা ওরকম মুখ করছে কেন?

উ। স্-স্-স্।

প্র। দেখ না মা।

উ। আঃ, বোতলের লেবেনচুষগুলো অমন ঝনঝন ক'রে বাজিও না, ঠিক ক'রে ধ'রে থাক।

প্র। ঐ দেখ মা, আবার এসেছে। ওরকম কেন করছে মা?

উ। ও একজন বন্ধুর জন্যে ব'সে আছে।

প্র। বন্ধুর জন্যে ব'সে থাকলেই ওরকম মুখ করতে হয় নাকি মা? কুশনগুলোতে সেণ্ট ছিটোচ্ছে কেন?

উ। তার আমি কি জানি?

প্র। নিজের গায়েও তো দিচ্ছে! ওর গায়ে বোটকা গন্ধ হয়েছে নাকি মা?

উ। আঃ, জ্বালিও না।

প্র। তা হ'লে সারা গায়ে সেণ্ট ঢালছে কেন মা?

উ। সেই বন্ধুটি আসবে ব'লে।

প্র। সেণ্ট লাগালেই বুঝি বন্ধুটি ওকে খুব ভাল বলবে মা?

উ। হ্যাঁ হ্যাঁ।

প্র। কি ক'রে জানলে?

উ। জানি না যা।

প্র। কি ক'রে জানলে মা যে, ওর গায়ে গন্ধ—

উ। আঃ, চুপ ক'রে ছবি দেখ।

ইতিমধ্যে নায়ক আসিয়া ঘরে ঢুকিতেই নায়িকা ছুটিয়া তাহার কাছে গেল এবং বলিতে লাগিল, "এসেছ নগেন, এসেছ।...জানি তুমি আসবেই...তুমি কত-ও-ও-ও বড়, আর আমি কত-ও-ও-ও ছোট—কত-ও-ও-ও অসহায়, এইজন্যেই তো এত ভাল লাগে তোমাকে নগেন। (দীর্ঘাকৃতি নায়কের ভুঁড়ির উপর বেঁটে নায়িকা মাথা রাখিল।)

প্র। আচ্ছা মা, বাবুটি অত-ও-ও বড় ব'লেই বুঝি মেয়েটার অত ভাল লাগে বাবুটিকে?

উ। বাবুটি ওকে নিরাপদে রাখতে চায়, তাই।

প্র। কেন, ওকে কেউ মারবে নাকি?

উ। না, ওকে অনেকের কাছ থেকে দূরে রাখতে চায়।

প্র। কেউ ওকে মারবে বুঝি?

উ। না না, ও সকলের কাছে খুব খারাপ ব্যবহার পেয়েছে, সেইজন্যে ওকে দূরে রাখবে।

প্র। তা হ'লে অত হীরের গয়না ও কোত্থেকে পেলে মা?

উ। আহা, টাকা-পয়সার কথা নয়।

প্র। তা হ'লে কিসের কথা বলছ?

উ। বলছি যে, ওর দুঃখ কেউ বুঝল না।

প্র। সেইজন্যেই বুঝি ও অত রোগা আর ছোট?

উ। হ্যাঁ বাপু, হ্যাঁ।

প্র। যদি ও অতই দুর্ব্বল, তবে কি ক'রে ঐ বাবুটির কাঁধ ধ'রে দোল খাচ্ছে?

উ। চুপ কর খুকী।

প্র। বাবুটি যদি ওর চেয়ে জোয়ান হয়, তা হ'লে ওকে থামাচ্ছে না কেন?

উ। ওরা দুজনে দুজনকে খুব ভালবাসে কিনা, তাই।

প্র। তাই ওরকম ঝুলছে?

উ। আবার বোতল নাড়াচ্ছ? চুপ ক'রে ব'স।

প্র। বাবুটির এরকম ভাল লাগছে?

উ। আমি জানি না।

প্র। তুমিও বাবার কাঁধ ধ'রে ওরকম দোল খাও নাকি মা?

উ। মোটেই না।

প্র। তা হ'লে বাবাকে বুঝি তুমি ভালবাস না?

উ। দুটো মোটেই এক কথা নয়।

প্র। আচ্ছা, তুমি যদি একদিন বাবার কাঁধ ধ'রে—

উ। চুপ।

প্র। আর ধর, যদি—

উ। ছি ছি, কি ইল্লুতে, মাগো! মুখ থেকে লেবেনচুষগুলো আবার বার করছিস কেন?

প্র। সেই কালো ডোরাগুলো মিলিয়ে গেছে কি না দেখছি মা।

উ। তোমাকে নিয়ে কি যে মুশকিল আমার! শিগগির লেবেনচুষ মুখে পোর বলছি।

রূপালী পর্দায় বহু অভিব্যক্তিতে আদিরস ঘনীভূত হইয়া আসে। নায়কের চক্ষু ধীরে ধীরে জ্বলিয়া উঠে; নায়িকার চক্ষু মুদিয়া আসে। নায়ক নায়িকার কানে কানে কি যেন বলে। এই চিত্রের দর্শকদের মধ্যেও যাঁহারা রুচিবাগীশ ছিলেন, যেন তাঁহাদেরই মনস্তুষ্টির জন্য নায়িকা গোপন কথাটি শুনিয়া চমকিয়া উঠে এবং কৃত্রিম আর্তস্বরে বলিতে থাকে, "তা হয় না নগেন, তা হয় না।"

প্র। (ব্যগ্রভাবে) কি হয় না মা?

উ। স্-স্-স্।

প্র। বল না, কি হয় না?

উ। চুপ ক'রে শোন বলছি।

প্র। আমি তো শুনছি মা, ও খালি 'তা হয় না' বলছে।

উ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই বলছে। এখন চুপ কর তো।

প্র। কি হয় না মা?

উ। (হতাশভাবে) ও বেশিদূর এগোতে দিতে চায় না।

প্র। কতদূর যেতে দিতে চায় মা?

উ। মানে, বেশি ভালবাসা ও পছন্দ করে না।

প্র। তা হ'লে কেন বাবুটির কাঁধ ধ'রে ঝুলছিল?

উ। আমি জানি না তো কি ক'রে বলব?

প্র। কতটা ভালবাসা ও পছন্দ করে মা?

উ। আঃ, চুপ ক'রে শোন।

নায়িকা—"আমরা কি শুধু বন্ধু হয়ে থাকতে পারি না নগেন?"

প্র। ওদের মধ্যে কি বন্ধুত্ব নেই মা?

উ। ওঃ, একটু চুপ কর তো।

প্র। আমি কিন্তু বাড়ি গিয়ে মণ্টুদার কাঁধ ধ'রে ঝুলব।

উ। খবরদার, ওসব অসভ্যতা শিখো না খুকী; তুমি কক্ষনো ওসব করতে পাবে না, তা ব'লে রাখছি।

প্র। এ মেয়েটা তা হ'লে অসভ্য হয়েছে মা?

উ। না, ও একজনকে ভালবাসে কিনা, তাই অমন করছে।

প্র। ভালবাসলে বুঝি অসভ্যতা করা হয় না মা?

উ। না, তখন সব অন্য রকম হয়।

প্র। তা হ'লে ও কেবল 'তা হয় না, তা হয় না' বলছে কেন?

উ। (অন্যমনস্কভাবে) ও আর একজনের বউ কিনা, তাই।

প্র। ওর বরকে ও 'তা হয় না, তা হয় না' বলে নাকি?

উ। উঃ, খুকী, তুমি অসহ্য হয়ে উঠেছ।

প্র। ঐ দেখ মা, আবার ঐ কথা বলছে। কি হয় না মা, বল না?

উ। একটু চুপ ক'রে কি শুনতে পার না মা?

প্র। (নাকী কান্নার সুরে) শুনছিই তো; কিন্তু কি হয় না, তা বলছ না কেন?

উ। নাঃ, আর দেখতে দিলি না তুই ছবিটা। চল, বাড়ি চল। জ্বালাতন ক'রে খেলে!

মাতাপুত্রীর পিছন হইতে শ্লেষাত্মক স্বর—"কি জন্যে যে এতটুকু মেয়েকে নিয়ে এই সব ছবি দেখতে আসা, তা বুঝি না। ধন্য আজকালকার শিক্ষা!"

প্র। বললে না মা, কি হয় না?

উ। অসহ্য! চল, চল লক্ষ্মীছাড়ি।

মাতা নির্দ্দয়ভাবে খুকীর হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন। দূর হইতে শিশুটির প্রশ্ন শুনা যাইতে লাগিল—"কি হয় না, বল না মা?"

এদিকে পর্দ্দায় নায়িকা বলিয়া চলিয়াছে—"তা হয় না নগেন, তা হয় না।"

কিন্তু নায়িকার স্বরের দৃঢ়তা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শিথিল হইয়া আসিয়াছে বুঝা যায়। পার্শ্বের একটি দর্শক মন্তব্য করিল যে, শিশুসহ চলিয়া গিয়া মাতা বুদ্ধির পরিচয়ই দিয়াছেন।

শ্রীঅমূল্যকৃষ্ণ রায়

Beverley Nichols প্রণীত ও Jonathan Cape কর্ত্তৃক প্রকাশিত *For Adults only* পুস্তক হইতে গ্রন্থকারের ও প্রকাশকের সৌজন্যে অনূদিত।

তন্ত্রের দর্শনবাদ

যে দর্শনবাদের উপর এসিয়ার ভূয়িষ্ঠ ঐতিহাসিক কীর্ত্তি আশ্রিত, যা সমগ্র প্রাচ্য চিন্তার সহিত ওতপ্রোত, এমন কি যার প্রভাব ইউরোপীয় ও ইসলাম জগতেও প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করেছে, তার কোনরূপ সুষ্ঠু চর্চ্চা না হওয়া বিস্ময়জনক। বস্তুত এই দর্শনবাদ পরিত্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এসিয়ায় একটি অভিনব অন্ধকার যুগ আরম্ভ হয়—যার প্রভাব এখনও চলছে। জাপানী ভাবুক ওকাকুরা এ অবস্থাকে বলেছে, "night of Asia"। এই নৈশযুগে ভারতের চিন্তাধারাকে নিজের ভিত্তি হারিয়ে পরের আশ্রয় নিতে হয়েছে—তাতে ক'রে আর কোনও গভীর বা নূতন দর্শনবাদের সৃষ্টি হতে পারে নি।

তান্ত্রিকযুগ বলতে সনাতন প্রাচ্য দিগ্‌দর্শনের নির্দ্দেশের কথাও উল্লেখ করতে হয়। ইউরোপে নূতন চিন্তাকে অগ্রসর হতে হ'লে পূর্ব্বের চিন্তাধারাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে অগ্রসর হতে হয়। ভারতের পথ ঠিক বিপরীত; এখানকার সকল চিন্তাধারাই বেদের প্রামাণ্যতা স্বীকার করে, বেদের ভিতরই নিজেদের উৎস খোঁজে। বেদের ভিতর যার আদিতম সন্ধান নেই, তাতে শ্রদ্ধা করবার কিছু নেই, এই হ'ল মূল কথা। ফলে অন্যান্য মতবাদের মত তন্ত্রের মতবাদকেও আর্য্য চিন্তার প্রাঙ্গণে পাওয়া যায় বলা হয়েছে। ঋগ্‌বেদের দেবীসূক্তে তন্ত্রের আদি প্রেরণা আছে বলা হয়ে থাকে (মণ্ডল ১০ সূক্ত ১২৫)। অথচ তারাপ্রদীপে আছে, কলিযুগে তান্ত্রিকধর্ম্মই প্রবল হবে—বৈদিক নয়। কুল্লুকভট্ট তন্ত্রের উচ্চতর মর্য্যাদা দান ক'রে বলেছেন, শ্রুতি দ্বিবিধ—বৈদিক ও তান্ত্রিক।

তান্ত্রিক শ্রুতিই যে কলিযুগে জাগ্রত ও কার্য্যকরী, এ কথাও তন্ত্রকারেরা বার বার বলেছেন। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে :—

কলাবাগমুলঙ্ঘ্য যোঽন্যমার্গে প্রবর্ত্ততে
ন তস্য গতিরস্তীতি সত্যং সত্যমসংশয়ম্।

কলিতে জগতের সর্ব্বত্রই তান্ত্রিক শক্তিবাদই যে চলবে, তান্ত্রিক আচার্য্যগণের এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর সত্যতা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

এ সমস্ত ভেবে মনে হয় এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণ তন্ত্রকে অভূতপূর্ব্ব শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছেন। তাঁরা বার বার তন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলেছেন :—

নির্বীর্য্যাঃ শ্রৌতজাতীয় বিষহীনোরগা ইব
সত্যাদৌ সফলা আসন্ কলৌ তে মৃতকা ইব।

সত্যাদি যুগে শ্রৌত মতাদি চলে এসেছে, কলিযুগে সেসব বিষহীন অবসন্ন সর্পের মতই থাকবে—তন্ত্রশাস্ত্রের এই মতের পশ্চাতে ছিল একটা দূরদৃষ্টি। আজ ইউরোপের ভাবের রাজ্য পরীক্ষা ক'রে দেখা যায়, পূর্ণভাবে ও-দেশ শাক্ত হয়েছে বা শক্তিধর্ম্ম গ্রহণ করেছে। যীশুখ্রীষ্টের এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল সম্প্রসারণের নীতি সেখানে বর্জ্জিত হয়েছে। সমাজ, রাষ্ট্র, সর্ব্বত্রই ইউরোপে আজ যা প্রচলিত, তা তান্ত্রিক-ধর্ম্মেরই অনুরূপ বলতে হয়। তান্ত্রিকধর্ম্ম শক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচীন যুগের মন্ত্রযান ও বজ্রযান প্রভৃতির প্রভাবও যে ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম্মে গেছে, এর যথেষ্ট প্রমাণ আছে। Sir Charles Eliot তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে (Hinduism and Buddhism) বলেছেন, খ্রীষ্টীয় আচার-অর্চ্চনার অনেক কিছুই তান্ত্রিক ব্যবহারের অনুরূপই মনে হয়, কাজেই তন্ত্রকে ঘৃণা করা নিরর্থক। তন্ত্রকে ঘৃণা করার বাতিক ইউরোপে খুবই প্রবল। ইউরোপের একখানি অতি-আধুনিক গ্রন্থ

গেটির (Getty) "গণেশে" ফরাসী পণ্ডিত ফুসে (Foucher) বলছেন—"It is a kind of leprosy"। অবশ্য ইদানীং বিপরীত মতও চলতে শুরু করেছে। অধ্যাপক Giuseppe Tucci সম্প্রতি বলছেন, "we know many misleading ideas are current in the west as regards the Tantras"। ভদ্রভাষার বন্ধন অতিক্রম ক'রে তন্ত্রের উপর গালাগালি দেওয়া হয়েছে। তার প্রচুর কারণও আছে।

একটা বিরাট তত্ত্ব যখন সমগ্র সভ্যতাকে রূপান্তরিত করে, অধিকারী-ভেদে চিন্তার নানা অলিগলিতে এর বিকারের প্রভাবও হতে বাধ্য। বস্তুতন্ত্রতা (Realism) যখন ফ্যাশন হয়—তখন শুধু উচ্চচিন্তার ভিতর নয়, অতি নীচ, ঘৃণিত ও ইতর পয়ঃপ্রণালীর খবর Zolaর মত ঔপন্যাসিক জগৎকে দান করতে ইতস্তত করেন নি। এ যুগের প্রাকৃতবাদের (Naturism) যখন বিস্তার হয়, তখন নগ্নদেহে অসংখ্য লোক এক-একটি জায়গায় Colony করেছে—sunbath উপলক্ষ্য ক'রে শালীনতা দূর করেছে, এমন কি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার প্রমাণ উপলক্ষ্যে এই স্বভাববাদী psycho-analytic যুগ যেসব বই ছাপিয়েছে—তন্ত্রের গ্লানিযুক্ত চরম চর্চ্চার কোথাও সেসব পাওয়া যাবে না।

বস্তুত কোন বিরাট শহর প্রদক্ষিণ করতে হ'লে, সে শহরের ড্রেন ও গলিত পূতিগন্ধপূর্ণ আবর্জ্জনার স্তূপকেই পরমার্থ মনে করা ভুল। হিমালয়ের গৌরীশঙ্কর বা কাঞ্চনজঙ্ঘা—নিম্নতর অবনত ভূভাগের অন্ধকার ও বিভীষিকাকে অস্বীকার করে না। সব কিছুকেই সমগ্রতার দিক দিয়ে অধ্যয়ন করা প্রয়োজন, খণ্ডতার দিক দিয়ে নয়। কাজেই তন্ত্রবাদের মুখ্য প্রতিপাদ্য কি তাই বিচারের ব্যাপার—শুধু সাময়িক আবেষ্টন বা সমসাময়িক আচার-অর্চ্চনা, রীতিনীতির বা ব্যবহারের accedents-এর ভিতর সেই তত্ত্বকে খুঁজতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

বলা প্রয়োজন, আধুনিক যুগে ভারতীয় ভাববাদ ইউরোপে বিস্তৃত হয়েছে Schopenhauer-এর চিন্তাধারার ভিতর দিয়ে। আমি Schopenhauer-এর "will"-বাদকে ভারতীয় 'সোঽহং' বাদের রূপান্তর বলতে চাই। দার্শনিক নিজেই উপনিষদের নিকট থেকে প্রাপ্ত নিজের ঋণ স্বীকার করেছেন। এই ঋণ ইউরোপের চিন্তাধারায় কি ভাবে গৃহীত হয়েছে, দুঃখের বিষয়, আজ পর্য্যন্ত সে বিষয়ের কোন বিচারই হয় নি।

ইউরোপ উপনিষদের, "শান্তং শিবং অদ্বৈতং"-এর আত্মসমর্পণের অন্বয়ী দিক গ্রহণ না ক'রে—অন্বয়ী-মূলক ব্যতিরেকী বিধিতে অহংতত্ত্ব ধ্যান করেছে। ফলে এখানকার প্রলয়ঙ্কর শক্তিবাদ ইউরোপের জাগ্রত ধী ও উগ্র জীবনযাত্রা গ্রহণ করেছে। এই মতবাদ উদ্দাম হয়ে নীট্‌সে-র অতিমানববাদের শক্তির চর্চ্চাকেই বরণীয় মনে করেছে। ইউরোপের দার্শনিক চিন্তার ধারা অনুসরণ ক'রে পাশ্চাত্য জনগণ কি ক'রে রক্তাক্ত শাক্তবাদ গ্রহণ করে, সে সম্বন্ধে কোন লেখক (M. A. Mugge) বলেছেন, "They scorned Kant's dream of an ultimate rule of reason and of permanent peace. They quoted Goethe. They referred to Schopenhauer's will expressing itself as a struggle."

মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দিক থেকে বিচার করলে আধুনিক ইউরোপকে তান্ত্রিক না ব'লে উপায় নেই। বস্তুত ইউরোপ আত্মাশক্তিরই উপাসক—মেষশাবকরূপধারী খ্রীষ্টের প্রচারিত শান্তির নয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, তান্ত্রিক গ্রন্থাদি কলিযুগের যে অবস্থার কথা কল্পনা করেছে, সে অবস্থার ভিতর দিয়েই এ যুগ আজ যাচ্ছে।

ভারতবর্ষ শঙ্করের মায়াবাদ, বৌদ্ধের সন্ন্যাস ও কৌপীনবাদের পিছনে ছুটেছিল উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে। এখনও তার ধারা চলেছে। এ আলেয়া থেকে মুক্তি কখন হবে বলা যায় না। তবে বলিষ্ঠভাবে তন্ত্রের মুখ্য দর্শনবাদ অধ্যয়ন যে ভারতের উন্নয়নের পক্ষে একটা পরম ভেষজ, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। এ কথা লক্ষ্য করা প্রয়োজন, এশিয়ার শ্রেষ্ঠ যুগগুলি তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবান্বিত। চীন, জাপান, ভারত এক সময় তন্ত্রের প্রভাবে জগতের বাস্তবতা স্বীকার ক'রে শক্তি ও রসবত্তায় অপরাজেয় হয়।

কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা বা শারীরিক যন্ত্রণাদির সাহায্যে কিছু অধিগত করার চেষ্টা ভুল—এ হচ্ছে তন্ত্রের আর একটি মুখ্য তথ্য। রুদ্রযামলের সপ্তদশ অধ্যায়ে বশিষ্ঠের সাধনার উপাখ্যান আছে। ছয় হাজার বছর সাধনা ক'রে তিনি ব্যর্থ হন এবং ব্রহ্মার নিকট নূতন মন্ত্র প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মা আবার সাধনা করতে উপদেশ দান করেন। সমুদ্রতীরে গিয়ে আবার হাজার বছর তপস্যা ক'রেও বশিষ্ঠ ব্যর্থ হন এবং তিনি মহাবিদ্যাকে শাপদান করেন। মহাবিদ্যা আবির্ভূতা হয়ে বলেন, তুমি আমাকে পূজা করতে জান না, আমার ধ্যানে কৃচ্ছ্রকৃত্য বা যন্ত্রণা নেই, আমার সাধনা ও মন্ত্র পবিত্র এবং বেদেরও অগোচর।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে গলিত বা স্খলিত ক'রে সাধনার ভিতর অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্র সাধন তন্ত্রের অনুমোদিত নয়। রবীন্দ্রনাথের

"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়।"

এবং—

"ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন সে নহে আমার।"

এসব তান্ত্রিক অনুভূতিপ্রসূত ভক্তি। বহু শত বৎসর পূর্ব্ব থেকে ভারতেই এর বাণী উত্থিত হয়েছে; কুলার্ণব তন্ত্রে আছে—

"ভোগো যোগায়তে সম্যক্ দুষ্কৃতং সুকৃতায়তে
মোক্ষায়তে চ সংসারং কুলধর্ম্মে কুলেশ্বরী।"

শুধু তা নয়, আধুনিক সভ্যতার চরম রসপাত্র হাতে ক'রে তন্ত্রবিদ্ দুনিয়ায় তুরীয় আনন্দ পান করেছেন। অপর দিকে এ যুগের সার্ব্বভৌমিক সাম্যের ধ্যানেও তন্ত্র একাল থেকেও অধিক অগ্রসর হয়েছিল। তন্ত্রের পথ ছিল সর্ব্বজনীন। সকল বর্ণ ও স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে তান্ত্রিক সাধনামার্গ ব্যবহৃত হয়। তন্ত্রে নারীর প্রতি শ্রদ্ধা অসীম—বহু পরিমাণে তা পাশ্চাত্য দেশের নারীর প্রতি আনুকূল্যের সহিত তুলনীয়। সর্ব্বোল্লাসে আছে—

"স্ত্রিয়ো দেবাঃ স্ত্রিয়ো প্রাণাঃ"।

গৌতমীয় তন্ত্রে আছে—

"সর্ব্ববর্ণাধিকারাশ্চ নারীণাং যোগ এব চ।"

কাজেই এ যুগের চরম লক্ষ্য যা, তা তন্ত্রের আদি যুগেই স্বীকৃত হয়েছিল, সেজন্য আন্দোলন বা আলোচনার প্রয়োজন হয় নি। এমনই ভাবে দেখা যাবে, তন্ত্র একটি সার্ব্বভৌমিক পাদপীঠে জগতের মননকে আহ্বান করেছিল।

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

ওঠো, জাগো, নাচো—

তব আহ্বান এসেছে এবার ভারতীয় নটরাজ,
ঠ্যাং তুলে এক পোজ
আছ কতকাল নাহি জানি মোরা, সেই একমত সাজ
দেশী তাণ্ডবী ভোজে।
এবার এসেছে গ্র্যাণ্ড তাণ্ডব, কাণ্ড বিশ্বব্যাপী,
ওঠো, জাগো, নাচো শিব,
কাঁধে-ম'রে-যাওয়া সতীরে তোমার এবার করহ "হ্যাপি"
থেকো না কো নির্জ্জীব।

সংবাদ-সাহিত্য

একবার একটি বিশ্ববিখ্যাত ব্যাডমিণ্টন টুর্নামেণ্টের ফাইনাল খেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। খেলাটা কোথায় হইয়াছিল ঠিক স্মরণ নাই, কিন্তু হইয়াছিল। সমগ্র পৃথিবীর দুই চ্যাম্পিয়ন পক্ষ দুই দিকে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—জোড়ায় জোড়ায়। ইঁহারা বলেন, আমাদের দেখ, উঁহারাও তাই বলেন। সমরাঙ্গণ দর্শকে দর্শকারণ্য হইয়া গিয়াছিল। খেলা আরম্ভ হইল; খেলোয়াড়দের হাত-পা চালাইবার কি অপরূপ ভঙ্গি, কি বিচিত্র মার! পালকশীর্ষ বলটি মারের চোটে জালের এপারে-ওপারে ছুটাছুটি করিয়া এমনই কসরৎ শুরু করিয়া দিল যে, আমরা তাজ্জব বনিয়া গেলাম। খেলোয়াড়দের এমনই হাত-সাফাই যে, বল মাটিতে পড়িবার পথ পায় না। দর্শকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মত খেলা দেখিতে লাগিল। আমরাও সবিস্ময়ে বলের গতিপথ লক্ষ্য করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া গেলাম। যখন জ্ঞান হইল, তখন হঠাৎ অনুভব করিলাম যে, বলের দিকে আর আমাদের লক্ষ্য নাই; আমরা বিহ্বলভাবে শুধু দর্শকদের ঘন ঘন মস্তক-সঞ্চালন দেখিতেছি। সে এক অপরূপ দৃশ্য! বলের গতির সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র দর্শকের মাথা একসঙ্গে একবার বামে এবং একবার ডাহিনে ঈষৎ আবর্ত্তিত হইতেছে, অনেকে মাথা স্থির রাখিয়া শুধু ডান-বাম কটাক্ষের দ্বারা ঠিক একজাতীয় চোখ-ঠারা ডলি-পুতুলের মত ভঙ্গি করিতেছে। সকলের সমবেত মাথা-নাড়া এবং চোখ-ঠারার ফলে এমন একটা বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইতেছে যে, বল-চলাচলের মজা তাহার তুলনায় কিছুই নয়। আমাদের সাঙ্খ্যদর্শনে ঠিক এই জাতীয় ব্যাপারেরই পুরুষ-প্রকৃতিমার্কা কি একটা নাম আছে; প্রকৃতির খেলা দেখিতে দেখিতে পুরুষ নিজেই দর্শনীয় হইয়া বিশ্বনিয়ন্তার বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিতেছে, এরূপ ব্যাপার সচেতন পুরুষমাত্রই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন।

• • •

ভারতবর্ষের পলিটিক্যাল রণাঙ্গণে এই জাতীয় টুর্নামেণ্ট কিছুদিন হইতে চলিতেছে; কয়েক রাউণ্ড খেলা ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে; কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভা, ভারত-সরকার এবং ইংলণ্ডীয় সরকারের পক্ষে যথাক্রমে মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আজাদ ও পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, জনাব জিন্না, বীর সাভারকর, মহামান্য বড়লাট বাহাদুর, সার্ ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্স প্রভৃতি মিলিয়া প্র্যাকটিস ম্যাচের সিঙ্গল্স এবং ডবল্স খেলা এক দফা শেষ হইয়াছে; মহাচীন হইতে মাদাম চিয়াংকাইশেক-শাসিত মার্শাল চিয়াংকাইশেক এবং আমেরিকা হইতে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের প্রতিনিধিকে ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহারা ঠিক কাহাদের পক্ষে আসিয়াছিলেন, এখনও বুঝা যাইতেছে না। টাই নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বেই দল বদল করিবার চেষ্টাও দেখা যাইতেছে, কংগ্রেসের রাজা-গোপালাচার্য্য লীগদলের জনাব জিন্নার পার্টনার হইবার প্রবল চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এই সকল বহুবিধ গোলযোগের মধ্যে একটা কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, ফাইনাল খেলা হইবে শেষ পর্য্যন্ত কংগ্রেস ও ভারত-সরকারের মধ্যে এবং কংগ্রেস পক্ষে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলাল যে থাকিবেন, তাহাও একরূপ স্থির হইয়া গিয়াছে। ভারত-সরকারের পক্ষে কে বা কাহারা থাকিবেন, তাহা জানা সম্ভব নয়; খেলা শেষ হইবার পরও সম্ভবত আমরা তাহা জানিতে পারিব না।

• • •

প্র্যাকটিস ম্যাচ শুরু হইয়াছে। কথা হইতেছিল দর্শকদের লইয়া। মহাত্মা গান্ধী এবং ভারত-সরকারের মধ্যে যে খেলা ইতিমধ্যেই চলিতেছে, তাহা দেখিতে দেখিতেই আমরা দর্শকেরা দর্শনীয় হইয়া উঠিয়াছি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা (?) রক্ষার জন্য ভারত-সরকার দেশব্যাপী আন্দোলন চালাইতেছেন, মহাত্মা গান্ধী একটি অহিংস মার মারিয়া বলটিকে সজোরে জালের ওপারে পাঠাইয়া বলিতেছেন, স্বাধীনতা রক্ষা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য, কিন্তু যুদ্ধে তিনি বিশ্বাস করেন না। ভারতবর্ষের দরিদ্র দর্শকদের মুগ্ধ করিবার জন্য ভারত-সরকার বলে একটি ছোট্ট মার দিয়া বলিলেন, যুদ্ধের দরুন ভারতবাসীর খাদ্যের

অপ্রতুলতা হইতেছে, সুতরাং আমরা "খাদ্য উৎপাদন বাড়াও"-আন্দোলন করিতেছি। মহাত্মা গান্ধী অমনই পাল্টা মার দিয়া ফোকলা হাসি হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের ও ইয়ার্কি রাখ। খাদ্যের অভাব কোথায়? শহরে তোমরা যে পরিমাণ খাদ্যের অপচয় করিতেছ, তাহা বাঁচানো হইলে সমগ্র দেশের খাদ্যসমস্যার মীমাংসা হইবে; আমি "অপচয় বন্ধ কর"-ক্যাম্পেন চালাইব। এই মারামারির মধ্যে আমরা একবার এদিকে একবার ওদিকে মস্তক সঞ্চালন করিয়া সচেতন পুরুষদের দর্শনীয় হইয়া উঠিতেছি। শুনিতেছি, আসল খেলা শীঘ্রই আরম্ভ হইবে; তখন মহাত্মা গান্ধী কি বলিবেন এবং ভারত-সরকারই বা কি বলিবেন, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু আমাদের মাথা যে ঘন ঘন নড়িবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

• • •

এবং সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা আসলে ব্যাডমিণ্টন খেলা মাত্র; খেলা বিশ্বব্যাপী হইলেও ব্যাডমিণ্টন টেনিস নয়। ব্যাডমিণ্টনকে টেনিস করিতে হইলে হাতের কব্জি আরও শক্ত করিতে হইবে, বলের মাথায় মোহন পালকগুচ্ছ ঘুচাইতে হইবে। যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন আমরা দর্শকহিসাবে যতই মাথা-চালাচালি করি না কেন, পুরুষপর্য্যায়ে উন্নীত হইব না। যাহারা আজীবন টেনিস খেলিয়াছে এবং ভাল টেনিস খেলিয়াছে, তাহারা মজা ও প্রয়োজনের খাতিরে মাঝে মাঝে ব্যাডমিণ্টন টুর্নামেণ্টে নাম লিখাইতে পারে, দর্শকদের মনোরঞ্জনও করিতে পারে, কিন্তু ব্যাডমিণ্টন খেলাই যাহাদের জীবনের চরম লক্ষ্য, বিশ্বব্যাপী টেনিস খেলার দর্শকহিসাবে তাহাদের মাথা ঘন ঘন নড়িবে বটে, কিন্তু তাহারা সমঝদার দর্শক বলিয়া খাতির পাইবে না।

—

"স্বাধীনতা" ও "দেশপ্রেম" শব্দ দুইটির প্রকৃত তাৎপর্য্য খুঁজিতেছিলাম। 'এন্‌সাইক্লোপীডিয়া বৃটানিকা' হইতে 'চলন্তিকা' অবধি সন্ধান করিয়াও হদিশ পাইলাম না। ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডি—জন ষ্টুয়ার্ট মিল হইতে কার্ল মার্ক্স পর্য্যন্ত ঘাঁটিলাম, কোনও মীমাংসাই হইল না। শেষ পর্য্যন্ত গোপালদার

শরণাপন্ন হইলাম। শুনিয়াছিলাম, তিনি ইদানীং একটি পলিটিক্যাল অভিধান সঙ্কলনে মনোনিবেশ করিয়াছেন। গোপালদা বাড়িতে ছিলেন না। গোপাল-বউদি ঘোমটার আড়াল হইতে ফিসফিস করিয়া যে সংবাদ দিলেন, তাহা শুনিয়া বিস্ময়বোধ করিলাম। গোপালদা এ. আর. পি. দলে যোগ দিয়াছেন এবং চাকুরি বজায় রাখিবার জন্য আপিসে দৈনন্দিন হাজিরা দিতে গিয়াছেন। হায় কপাল, গোপালদাও শেষ পর্যন্ত—

গোপালদার অভিধানের পাণ্ডুলিপির কথা জানা ছিল। সেটা টানিয়া লইয়া পাতা উল্টাইতে লাগিলাম। প্রথমেই "স্বাধীনতা" খুঁজিলাম। গোপালদার সবই বিচিত্র; তিনি এই শব্দের ইংরেজী বাংলা সংস্কৃত কোনই প্রতিশব্দ দেন নাই; অর্থস্থানে একটা হেঁয়ালি টুকিয়া রাখিয়াছেন। হেঁয়ালিটি এই—"ক যদি খ কর্তৃক কৌশলে বিজিত ও শাসিত হয় এবং পরে গ আসিয়া যদি গায়ের জোরে ক-কে স্বাধিকার করিতে চায়, তখন খ-এর অধিকার বজায় রাখিবার জন্য ক যদি গ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাহা হইলে ক নিজের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করিতেছে বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ এই অবস্থায় ক যাহার জন্য যুদ্ধ করিবে, তাহার নাম ক-এর স্বাধীনতা।"

• • •

পড়িয়া কেমন অসোয়াস্তি বোধ হইতে লাগিল। ঠিক বুঝিতে না পারিলেও এক একবার কেমন সন্দেহ হইতে লাগিল—ইহা রাজদ্রোহ। কিন্তু গোপালদার এ. আর. পি. যোগদান সংবাদে সে সন্দেহ মন হইতে মুছিয়া ফেলিয়া "দেশপ্রেম" খুঁজিলাম। সেখানেও সেই একই কাণ্ড—হেঁয়ালি। "ক খ-এর শাসনে থাকিয়া যদি গ-এর আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে জীবনদান করে, তাহা হইলে সে তাহা দেশপ্রেমবশতই করিবে। অর্থাৎ খ-এর অধীন থাকিয়া ক যে প্রবৃত্তির বশে খ-এর অধিকার বাঁচাইতে গ-কে প্রতিরোধ করিবে, সেই প্রবৃত্তির নাম দেশপ্রেম।"

কেমন গোলমাল ঠেকিল। "ভূমিকা" উল্টাইয়া দেখিলাম, গোপালদা

লিখিয়াছেন, "এই অভিধান-সঙ্কলিত অর্থ শুধু ভারতবর্ষের পক্ষেই খাটিবে, আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতি দেশের পক্ষে খাটিবে না। ভারতবর্ষের সহিত চীনের যোগ দীর্ঘকালের, চীনের পক্ষেও ইহা অংশত প্রযোজ্য।"

• • •

বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছি, হঠাৎ বিমান-আক্রমণ-প্রতিরোধী ধড়াচূড়া পরিয়া গোপালদা হাজির হইলেন। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে গোপালদার মুখের দিকে চাহিতেই তিনি প্রথম ধাক্কায় কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া পরে সামলাইয়া লইয়া সেই লজ্জা চাপা দিবার জন্য হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, আরে ভায়া, বেকার ব'সে ব'সে কোমরে বাত ধ'রে যাচ্ছিল; আমাদের ক্যাপ্‌টেন ঘোষকে ধ'রে এ একটা অকুপেশনও হ'ল, আবার এদিকে ঘরে টু-পাইস কিঞ্চিৎ আসবেও। গোপালদা বুঝিলেন, এত অল্পে প্রিন্সিপ্‌ল পরিবর্তনের ওজুহাতটা আমার পছন্দ হইল না। তাই কানের কাছে মুখ লইয়া আসিয়া চুপি চুপি বলিলেন, তা ছাড়া ভায়া, পাড়ার হরেরাম চাটুজ্জে বেটাকে কিছুতেই বাগে আনতে পারছিলাম না; এইবারে টের পাবেন বাছাধন!

বুঝিলাম। কিন্তু ইহা লইয়া মাথা ঘামাইবার সময় ছিল না; 'দেশপ্রেম' ও 'স্বাধীনতা'র ব্যাপারে বড় দুশ্চিন্তায় ছিলাম। গোপালদাকে আমার কথাটা নিবেদন করিতেই তিনি বলিলেন, ও অভিধানটা বাতিল ক'রে দিয়েছি ভাই। কর্তাদের হুকুমে খাঁটি বাংলার একটা অভিধান সঙ্কলন করছি। বলিলাম, তার তো অভাব নেই, বরং এই পলিটিক্যাল অভিধানেরই—

গোপালদা বাধা দিয়া বলিলেন, সে হবে এখন ভাই, এখন এই বাংলা অভিধানটিই জরুরি। আমাদের কাজের পক্ষে তোমাদের অভিধানগুলি বাতিল। আমাদের বানান আলাদা, শব্দবিন্যাস আলাদা—সবই আলাদা। এই দেখ।—বলিয়া সেদিনকার 'যুগান্তর' ও 'আনন্দবাজার' খুলিয়া একটি সরকারী বিজ্ঞাপনের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। বিজ্ঞাপনটি হুবহু এই—

শত্রুর মিষ্টিকথায় ভুলবেন না। তারা যে বক্তৃতায় নিজেদের দুর্জ্জয়ী প্রমান করার জন্য আপনাদের কাছে চেষ্টা করছে, সে বিষয় লক্ষ্য রাখ্‌বেন। তারা রেডিও তে ব'লে বেড়াচ্ছে - তারা ভারতের বন্ধু - কারণ তারা ভারতে আসিলে আপনাদেরই হাতে নিহত হ'তে চায় না। মিথ্যা বক্তৃতাদ্বারা তারা আমাদের মধ্যে সন্ত্রাশ সৃষ্টি করতে চায়, আমাদের দিশেহারা করতে চায়, আমাদের দুর্ব্বল করতে চায়। ইহাই হ'ছে এযুদ্ধের নব-নীতি। ভারত আক্রমনের সময় তাহারা ভারতীয়দের দ্বারা নিহত হ'তে চায় না। আমাদের গৃহেই তারা বাস করতে চায়। কিন্তু এটিধ্রুবসত্য জানবেন যে আক্রমনকারী জাপানীরা সমস্তই বিনষ্ট হ'বে আমাদের সৈন্যদের বিক্রম আমাদের কামান, আর পিছন থেকে আপনাদের যথাপাধ্য সাহায্য, তাদের মৃত্যু-মুখে নিক্ষেপ করবে। এই ৩৮ কোটি মানবের মহাদেশ যদি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় তো কেহই তাহাকে জয় করতে পারে না।

জাপানের মিথ্য প্রচারে চীন ভোলেনি। যে চীন এক-কালে বহুভাগে বিছিন্ন ছিল, সেই চীন আর ৫ বৎসর ধরিয়া কি বীর বিক্রমেই না জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে করছে-পরাজয়ের ছায়া ও সেখানে নাই। রাশিয়াও নাজীদের দ্বারা প্রতারীত হয় নি, এই নাজিই রশিয়ার সহিত বন্ধুত্বের সান্ধি-সর্ত্তে আবদ্ধ থাকা সত্বেও রশিয়াকে আক্রমণ করিয়াছিল। রাশিয়া ও চীন আমাদের যেন চোখ খুলে দিক্। জাপানের প্রচারে যেন আমরা কান না দিই।

পড়িয়া এমনই বেকুব বনিয়া গেলাম যে, মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বাড়ি ফিরিয়া আসার পথ কষ্টে পাইলাম।

—

জ্যৈষ্ঠের 'ভারতবর্ষে' ৫৯৯ পৃষ্ঠায় যে কবিতা দুইটি পাশাপাশি প্রকাশিত হইয়াছে, হিসাব করিয়া দেখিলাম, তাহাতে সাম্প্রদায়িক পার্সেন্টেজ আশ্চর্য্য রকমে

বজায় আছে। সম্পাদক-বিভাগ সবিবেচক তাহাতে সন্দেহ নাই। কবিকঙ্কন শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য পাইয়াছেন ১৮ লাইন স্থান এবং কবিখাড়ু বন্দেআলী মিয়া পাইয়াছেন ২২ লাইন। ১৮ : ২২ = ৪৫ : ৫৫। দুইটিই বর্ষার কবিতা এবং দুইটিতেই সরস-কঠিন কথা আছে। ফিফ্‌টিফাইভ পার্সেন্ট লিখিয়াছেন—

"কামরাঙা পাতা লাগে অবনত কামনার অনুরাগে"

এবং ফরটিফাইভ পার্সেন্ট লিখিয়াছেন—

"বর্ষাতি মন ভেঙে পড়ে ঘন অশ্রুবাদল মাঝে"

"কামরাঙা পাতা" ও "বর্ষাতি মন" আসলে একই বস্তুর দুই সত্তা।

—

জ্যৈষ্ঠের 'প্রভাতী' পত্রিকায় শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার "আমাদের সাহিত্য" সম্বন্ধে বলিতে গিয়া লিখিয়াছেন—

"বৃথা অহঙ্কারে মত্ত থাকিয়া আমরা আমাদের ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারের অনেক বিঘ্ন ঘটাইতেছি। আমাদের আশে পাশে সর্ব্বদা যাহা ঘটিতেছে, চক্ষু বুজিয়া থাকিয়া তাহাও আমরা দেখিয়াও দেখি না। 'কল্যাণ' মফঃস্বল হইতে প্রকাশিত একখানি হিন্দী মাসিক পত্র। ইহাতে সদ্যস্নাতা ও অভিসারিকাদের চিত্র প্রকাশিত হয় না। ফিল্ম ষ্টার বা সিনেমা উপগ্রহদের ছবিও পাতায় পাতায় বাহির হয় না। শুধু ইহাই নহে; ইহাতে বাহিরের কোন বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত গ্রহণ করা হয় না; তবুও ইহার গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ষাট হাজার। বাংলার সাময়িকগুলি গল্প উপন্যাস ও যৌনবিজ্ঞানের ছড়াছড়ি করিয়াও, এবং দেশী ও বিদেশী শ্লীল অশ্লীল সর্ব্বপ্রকারের বিজ্ঞাপন ছাপিয়াও আজ পর্য্যন্ত এরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইতে পারে নাই।"

• • •

ইহার কারণও লেখক একটা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—

"হিন্দী সাহিত্য যে আজ এরূপ বহুদূরপ্রসারী হইয়াছে, এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে আচ্ছন্ন করিবার উপক্রম করিয়াছে, ইহার মূল কোথায়, তাহাও

আমাদের বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার। মিথিলা হইতে আরম্ভ করিয়া রাজস্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড হিন্দী সাহিত্যকে আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের সর্ব্বস্থানের কথ্যভাষা অবশ্য একরূপ নহে। একথা সকলেই বিশেষ করিয়া জানেন যে মিথিলার কথ্যভাষা মৈথিলী, এবং রাজস্থানের কথ্যভাষা রাজস্থানী; কিন্তু তৎসত্ত্বেও মিথিলা ও রাজস্থানবাসী হিন্দীকে তাহাদের সাহিত্যিক ভাষারূপে স্বীকার করিয়া লইয়াছে। আর ইহা এই জন্য সম্ভব হইয়াছে যে হিন্দী সাহিত্যে স্বেচ্ছাচারিতার স্থান একেবারেই নাই; ইহার রূপ সর্ব্বত্রই একই-প্রকার; এবং কথ্যভাষাকে ইহাতে মোটেই আমল দেওয়া হয় নাই।"

হিন্দীর প্রসার এবং বাংলার অপ্রসারের ইহাই একমাত্র কারণ না হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে একটা বড় কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। নানা প্রাদেশিক ভাষার আশ্রয়ে আমরা যখন লেখ্য ভাষাকে জোরালো করিবার স্বপ্ন দেখিতেছি, তখন অক্ষমতার দরুন নানা অনাচার ঢুকিয়া বাংলা লেখ্য ভাষা এমন একটা রূপ লইয়াছে, যাহা বাংলা নয় এবং যাহা বুঝিতে সর্ব্বপ্রদেশীয় সাধারণ বাঙালীর কষ্ট হয়। আমরা এই ভাবে নানা বৈদেশিক প্রক্রিয়ায় সাহিত্যকে যখন শক্তি ও বৈদগ্ধ্য মণ্ডিত করিতেছি বলিয়া ভাবিতেছি, সাহিত্যের পাঠক-সম্প্রদায় তখন হ্রাস পাইতে পাইতে নিতান্ত এক একটা দল বা coterie-তে পরিণত হইতেছে। এক দলের লেখা অন্য দলে পড়ে না—এখন বাংলা সাহিত্যের এই অবস্থা; এবং ইহা দুরবস্থা সন্দেহ নাই। 'বঙ্গদর্শনে'র বহুলপ্রচারের ফলে বাংলা দেশে এক-দিন যে লেখ্য ভাষা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহার পাঠক ছিল সারা বাংলা দেশ জুড়িয়া; ঢাকা, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, বীরভূম কোনও অঞ্চলের লোকেরই সে ভাষা বুঝিতে কষ্ট হইত না; এমন কি অশিক্ষিত এবং অর্দ্ধশিক্ষিত অন্তঃপুরিকারা পর্য্যন্ত এই ভাষা শুনিলে বা বানান করিয়া পড়িলে বুঝিতে পারিত। 'সবুজপত্রে'র যুগে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত প্রথম চৌধুরীর প্রবল চেষ্টায় সেই ভাষার একটা নকল চল্‌তি ভাষার কোটিং দেওয়া হইল বটে, কিন্তু আসলে যাহা দাঁড়াইল তাহা

ইংরেজী-না-জানা পাঠকের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। ফলে এই সকল শক্তিমানদের কৃপায় যে নূতন সাহিত্য বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তাহার পাঠক সংখ্যায় কমিয়া গেল। যে কোনও সাময়িক-পত্রিকার ইতিহাস লক্ষ্য করিলেই এ কথার প্রমাণ মিলিবে। আধুনিকেরা এবং অতি-আধুনিকেরা অনাচারের মাত্রা বাড়াইয়া 'সবুজপত্রে'র ধারারই অনুবর্ত্তন করিলেন; এবং তাঁহারা তথাকথিত পণ্ডিতসমাজের বাহবা পাইয়া এমনই আত্মবিস্মৃত হইলেন যে, লক্ষ্য করিলেন না, বাংলা দেশের জনগণ তাঁহাদের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরিয়া গেলেন এবং তাঁহাদের অল্প পাঁচকড়ি দে ও দীনেন্দ্রকুমার রায় অতি সহজেই কাড়িয়া লইলেন। দেশের লোকের সহিত মাখামাখির ভান করিয়া তাহাদিগকে নির্ম্মমভাবে পরিত্যাগ করা হইয়াছে বলিয়াই তাহারাও চরম প্রতিশোধ লইতেছে। ইহা লইয়া আক্ষেপ করা বৃথা। অবিলম্বে প্রতিকার করা প্রয়োজন।

• • •

মজুমদার মহাশয়ের আর একটি কথাও বিবেচনার যোগ্য। তিনি বলিয়াছেন—

"মিথিলার ভাষার সহিত বঙ্গদেশের ভাষার সম্পর্ক অতি নিকট; উভয়ের লিপিকে ত প্রায় এক বলিলেও চলে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও মিথিলাবাসী কেন বাংলার পরিবর্ত্তে হিন্দীকে আপনাদের সাহিত্যিক ভাষারূপে স্বীকার করিয়াছে, ইহা কি আমরা নির্ণয় করিতে পারিয়াছি? উড়িষ্যা ও আসামের সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলা যায়। এই দুইটি স্থানেও বাংলারই সাহিত্যিক ভাষারূপে প্রচলিত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু একদিকে আমাদের সঙ্কীর্ণতা অন্য দিকে আমাদের দারুণ অবহেলা, এই উভয় কারণে আসাম ও উড়িষ্যাকেও আমরা সম্পূর্ণরূপে হারাইয়াছি।"

আসাম উড়িষ্যা তো সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রদেশ, এই ভাবে বেশিদিন চলিলে আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিজ বাংলা দেশকেও হারাইবে। পুস্তক-প্রকাশক ও পত্রিকা-প্রকাশকেরা ইতিমধ্যেই আতঙ্কিত হইয়াছেন; চিন্তাশীল

সাহিত্যিকেরা সকলে সমবেত হইয়া বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ অবহিত না হইলে বাংলা সাহিত্যের আরও দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী।

—

আশ্চর্য্যের বিষয়, বাংলা দেশের আধুনিক কবিরা উপরোক্ত সর্ব্ববিধ সমস্যার মধ্যে সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ আছেন। তাঁহাদের প. পি. চু. স. (পরস্পর পিঠ-চুলকানি সমিতি) যথারীতি চলিতেছে—বিষ্ণু শিবকে, শিব ব্রহ্মাকে তারিফ করিয়া চলিয়াছেন; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কার্য্য সুষ্ঠুভাবেই নির্ব্বাহ হইতেছে। ইঁহাদের বহুবিধ "উন্মেষ" আমরা দেখিতেছি, শুধু জ্ঞানের উন্মেষ ছাড়া। এক "উন্মেষ" দেখুন—

"হনলুলু সাগরের জল,
ম্যানিলা—হাওয়াই,
টাহিটির দ্বীপ,
কাছে এসে দূরে চলে যায়—
দূরতর দেশে।
কি এক অশেষ কাজ করেছিল তিমি,
সিন্ধুর রাত্রির জল এসে
মৃদু মিথিরি জলে মিশে গিয়ে তাকে
বোনিও সাগরের শেষে—
যেখানে বোনিও নেই—ম্লান আলাস্কাকে
ডাকে।
যতদূর যেতে হয়
ততদূর অবাচী অন্ধকারে গিয়ে
তিমির শিকারী এক নাবিককে আমি
ফেলেছি হারিয়ে;
তিমির পিপাসী এক রমণীকে আমি
হারায়ে ফেলেছি;...

নিপট আঁধার;
ভালো বুঝে পুনরায়
সাগরের সব অন্ধকারে নিক্রমণ।...
বেবুনের রাত্রি নয় তার হৃদয়ের
রাত্রির বেবুন।"

—

আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে "সাহিত্যিক"-শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখিয়াছেন—

"অন্য লোকের মত লেখকদের চিত্তও আজ বিক্ষিপ্ত। নিজের সৃষ্টির মূল্য বোধে ক্ষণে ক্ষণে মনে সংশয় জাগে। প্রপাগাণ্ডাকে মনে হয় সাহিত্য,—জীবনের সঙ্গে যার যোগ। কিন্তু এ চিত্ত-বিক্ষেপ সংযত করতে হবে, মনের সংশয় উঠতে হবে কাটিয়ে। সাহিত্য সৃষ্টির নামে প্রপাগাণ্ডা রচনা ক'রে কাজের লোক সাজার প্রলোভনকে দমন করতে হবে। যে জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের যোগ তা কেবল আজকের দিনের জীবন নয়, চিরন্তন মানুষের চিরপুরাতন ও চিরনূতন জীবন। আজকের দিনের সাহিত্য আজকের দিনের জীবনই গড়বে, কিন্তু কেবল সেই জীবনের প্রয়োজন-সিদ্ধির তাগিদে নয়। আজকের জীবনের পারিপার্শ্বিকে সেই সনাতন মানুষকে গড়বে চিরকালের মানুষ যার মধ্যে চিরপরিচিতকেই দেখবে।

"আমাদের দেশের উপর প্রলয়ের টর্ণেডো আজ উদ্যত। এর অবসানে আমরা ভেঙেচুরে কেমন গড়ন নেবো কে জানে। তবে নিদারুণ দুঃখের মধ্য দিয়েই আমাদের চলতে হবে। বিপদের প্রতিকার চেষ্টায় মনে যে উৎসাহের বল আসে আমরা তা থেকেও বঞ্চিত। কারণ প্রতিকারের চেষ্টা আমাদের হাতে নেই। এ দুর্দ্দিনে আমরা হয়তো কিছুই রক্ষা করতে পারব না, কিন্তু মনুষ্যত্বের গৌরবকে যেন রক্ষা করি। সাহিত্যিকদের কণ্ঠরোধ ও কণ্ঠনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলবে। কোনও ভয় বা লোভে আমরা যেন মিথ্যাকে সত্য, কুৎসিতকে

সুন্দর না বলি। না-বলার পাপ যদি আমাদের স্বীকার করতেই হয়, মিথ্যা-বলার পাপ আমরা কিছুতেই স্বীকার করব না।"

• • •

দুঃখের বিষয়, মিথ্যাকে সত্যবলার পাপে আজ বাংলা দেশের সাহিত্য, বিশেষ করিয়া সাময়িক সাহিত্য পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রবীণ সমালোচক কারণে অথবা অকারণে অর্ব্বাচীন কবিদের এমন সকল কাব্যের ও কবিতার জয়গান করিতেছেন, সত্য কাব্য-জিজ্ঞাসার নিক্তিতে মাপা হইলে যাহা কাব্যের পংক্তিতেই বসিতে পারে না; এমন সকল গল্প-কবিতা প্রতিদিন মাসিকে সাপ্তাহিকে এবং দৈনিকের রবিবাসরীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হইতেছে, যাহা নিছক প্রপাগাণ্ডা এবং সন্দেহ হইতে পারে লেখক এবং প্রকাশক এগুলি লিখিয়া ও প্রকাশ করিয়া পকেট ভারী করিতেছে। আষাঢ়-সংখ্যাগুলিতেই দেখিতেছি এই মারাত্মক ব্যাধি (প্রসিদ্ধ আট-হাজারী দশ-হাজারী মাসিকগুলিতে পর্য্যন্ত) ছড়াইয়া পড়িয়াছে; ষাট-হাজারীরা পর্য্যন্ত জানিয়া অথবা না জানিয়া এই বিষম প্রপাগাণ্ডায় সহায়তা করিতেছেন। সাহিত্যকে প্রচারের দ্বারা কলুষিত করিবার জন্য বাংলা দেশের প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিকের কাছে উপরোধ-অনুরোধ আসিতেছে; এই উপরোধের তেলোর নীচে অন্য বস্তুও দেখা যাইতেছে। ইতিমধ্যেই কয়েকজন অসতর্ক ও অসহায় সাহিত্যিকের পতন হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় অতুলবাবু যে সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন, তাহা সত্যই সময়োচিত হইয়াছে।

—

এই আষাঢ় মাসটা দেখিতেছি অধ্যাপক দার্শনিক ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের "কচে বারো" মাস; আমাদের মহামান্য সম্রাটের জন্মদিন আষাঢ়ে পড়িলে আমরা এবারে দুই নম্বর সার্ সারেণ্ডারনটকে পাইতাম। আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে তাঁহার প্রবন্ধ-কবিতাই শুধু বাহির হয় নাই; "বিবিধ প্রসঙ্গে" সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে কবি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত গোপাল ঠাকুর শালুক চিনিয়াছেন। "ভারতবর্ষ' পূর্ব্বাপরই কিঞ্চিৎ ব্যাকওয়ার্ড! তাঁহারা অধ্যাপক মহাশয়ের "নারী"-স্তুতিটির অধিক আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তবে অধ্যাপক মহাশয়ের "নারী" একাই একশো! যাঁহারা ডক্টর

দাসগুপ্তের হাতসাফাই দেখিতে চান, তাঁহারা "নারী" পড়িবেন; "নারী"-স্তুতির মধ্যেই কি ভাবে নিজের টাই-বাঁধার ইতিহাস দেওয়া যাইতে পারে, কৌশলী ব্যক্তি তাহা পাঠ করিয়া পুলকিত হইবেন।

• • •

অধ্যাপক মহাশয়ের দার্শনিক যুক্তি সর্ব্বত্র মানিয়া লইলেও দুই-এক স্থলে আমাদের প্রতিবাদ করিবার আছে। তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন—

"পুরুষের মধ্যে যে বুদ্ধি, যে বিচার শক্তি, যে চরিত্রবল আছে নারীর মধ্যেও তাই আছে।...স্বামীর চিতায় সহাস্যে অগ্নি-প্রবেশ করেছেন, এমন দৃঢ়তার দৃষ্টান্ত অনেক মেয়ে দেখিয়েছেন।"

এটি কিন্তু নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। চালাক পুরুষের ধাপ্পায় ভুলিয়া এই আত্মনাশ সে-যুগে যতই প্রশংসা পাইয়া থাকুক, এ-যুগে তাহা নিন্দনীয় বিবেচিত হইয়া থাকে। কিন্তু তবুও কি নারী এই সর্ব্বনাশা শিক্ষা ভুলিয়াছে? ভোলে নাই। এ-যুগেও দেখিতে পাই, লম্পটদের পাল্লায় পড়িয়া শুধু বিধবা সতীরাই নয়, কুমারী সতীরাও তিলে তিলে অগ্নিপ্রবেশ করিতেছেন! হায় নারী, তুমি আজিও কি নিয়োদ্ধৃত সুরম্য স্তুতিবাদেই মুগ্ধ থাকিবে—

"নারীর মধ্যে যে আত্মভোলা প্রেম আছে, যে সহজ স্বার্থত্যাগ আছে, যে কোমলতা আছে, যে সেবা এবং শুশ্রূষা-পরায়ণতা আছে তা পুরুষের মধ্যে অতি বিরল।"

না, এই সকল স্তুতিবাদ ভুলিয়া সত্যকার ধূর্ত্ত লম্পট পুরুষের কবল হইতে আত্মরক্ষা করিয়া সত্য নারীত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে?

—

এই নারী-স্তুতির প্যাঁচ বুড়া বয়সে নরেনদাও কষিয়াছেন! আষাঢ়ের 'ভারতবর্ষে' তাঁহার কবিতা "সারা পৃথিবীর মানুষের দেশ—" দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, দীনচণ্ডীদাসী "শুন হে মানুষ ভাই"-জাতীয় নূতন কিছু তথ্য পাইলাম। তথ্য কুড়াইতে গিয়া দেখিলাম, শিলা গলিয়া কাদা হইয়া গিয়াছে—

"যাদের ইসারা ইঙ্গিত বুঝি, আঁখির চটুল ভাষা
অন্তর মাঝে অনুভব করি অকথিত ভালবাসা

"বুঝি যাহাদের প্রেম অনুরাগ
ঘৃণা উপেক্ষা আদর সোহাগ
যাদের সঙ্গ সাহচর্য্যের আনন্দ আমি পাই
সেই পৃথিবীর মানুষের দেশ আমার স্বদেশ ভাই !"

এই তত্ত্বকথাই তো খুনে রমজান মিঞা ফাঁসির কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া মৌলভীকে শুনাইয়াছিল, তাহাকে মৃত্যুর পর নরকে যাইতে হইবে শুনিয়া সে প্রশ্ন করিয়াছিল, গহরজান বিবি কোথায় যাইবে ? মৌলভী সাহেব তোবা উচ্চারণ করিয়া দোজখের কথাই বলিয়াছিলেন। রমজান তখন একটা গভীর দুশ্চিন্তা কাটাইয়া উঠিয়া সোল্লাসে বলিয়াছিল, "সেই পৃথিবীর মানুষের দেশ আমার স্বদেশ ভাই !" নরেনদার কাছ হইতে আমরা 'বেটার' কিছু এক্সপেক্ট করিয়াছিলাম।

—

কিন্তু কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় (আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে) আমাদের সে দুঃখও ঘুচাইয়াছেন বজ্রকণ্ঠে "আল্লা হো আকবর" ধ্বনি তুলিয়া। ইসলাম এবং বৈদিক ধর্ম্ম, হদিস এবং পুরাণকে তিনি মন্থদাঠাসা করিয়া এমনই লেচি বানাইয়া দিয়াছেন যে, লুচিভাজা হইলে কাহারও সাধ্য হইবে না খাঁটি গছম ও খাঁটি সোপষ্টোনকে তফাত করে ; ভেজিটেবল ঘিয়ে দুইই সমান ফুলকো হইয়া উঠিবে। শুনুন—

"আল্লা হো আকবর !
আমারে তোমার গাণ্ডীব ধর হে মহাধনুর্দ্ধর !
পঙ্গুরে তুমি পাহাড়ে চড়াও, বোবারে দাও হে বাণী,
তুমি যদি কৃপা না কর দেবতা, হালে পায় নাকো পাণি।"

কবি নজরুল একবার চেষ্টা করিয়া হালে পাণি পান নাই, দেখা যাক এই মন্বন্তরের কবি বিজয়লাল অঘটন ঘটাইতে পারেন কি না !

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শনিবারের চিঠি
১৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৯

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

১০

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের stress-গুলিকে আমি স্বরবৃদ্ধি বলিব, যদিও সাধারণ অর্থে আমি 'ঝোঁক' শব্দটিই ব্যবহার করিতেছি। আমাদের উচ্চারণে সর্ব্বদা আদ্য-অক্ষরে যে ঝোঁক পড়ে, তাহা এমন নয় যে, তাহার দ্বারা ছন্দস্পন্দের কাজ চলিতে পারে—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পর্ব্বভূমক ছন্দে এই ঝোঁকের উপরেই একটু জোর দিয়া তাহাকে rhythmical accent করিয়া লওয়া হইয়াছে ; কিন্তু, আমি যাহাকে স্বর-বিস্ফোরণ বলিয়াছি ('বাংলা ছন্দ'-বিষয়ক প্রবন্ধে)—এ ঝোঁক সেই ছড়ার ছন্দের ঝোঁকগুলির মত প্রবল নয় ; সেরূপ ধাক্কা দিয়া পড়িলে, ছন্দ সাধুভাষার ধ্বনি-ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করিয়া যেন ব্যঙ্গ করিতে থাকিবে। এই ঝোঁকগুলি মধুসূদনের ছন্দের কেবল এইটুকু উপকার করিয়াছে যে, সেই ঈষৎ-স্পৃষ্ট বর্ণগুলি চরণের ধ্বনি-প্রবাহকে একেবারে সমতল হইতে দেয় নাই। এগুলিকে স্ফুটতর করিবার জন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে তিনি শব্দগুলিতে যে স্বরবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে ভাষা ও শব্দের উপরে তাঁহার কবিজনোচিত অধিকার ও আধিপত্যের পরিচয় পাওয়া যায় ; ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির উপরেই নির্ভর করিয়া, আর কেহ এমন ছন্দসৃষ্টির কৌশল করেন নাই। এই ঝোঁকগুলির মর্ম্ম—তাহাদের বৃদ্ধির তারতম্য, সংখ্যা, ও সজ্জা-কৌশল—তিনি মিল্টনের

ছন্দ হইতেই উত্তমরূপে বুঝিয়া লইয়াছিলেন। মধুসূদনের ছন্দে আমরা এই ঝোঁকগুলির যে নিয়ম লক্ষ্য করিব, মিল্টনের ছন্দেও ঠিক সেইরূপ; সে সম্বন্ধে একজন ছন্দোবিদ্ যাহা বলিয়াছেন, এ প্রসঙ্গের ভূমিকাস্বরূপ এখানে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।—

> "Nor should it be forgotten that the 'sense' of words, their meaning weight, their rhetorical value in certain phrases, constantly affects the theoretical number of stresses belonging to a given line; in blank verse, for instance, the theoretical five stresses are often but three or four in actual practice, lighter stresses taking their place in order to avoid a pounding monotony."

আমি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর চরণের যে পরিচয় এক্ষণে দিব, তাহার মূলতত্ত্ব এই কথাগুলির মধ্যেই নিহিত আছে। এইবার আমি, এই ঝোঁকগুলির পরিচয় গোড়া হইতেই দিব।—

(১) মাত্র পদচ্ছেদ—ও তজ্জনিত ঝোঁক; চরণমধ্যে তাহাদের ন্যূনতম ও অধিকতম সংখ্যা দ্রষ্টব্য।—

জন্মভূমি রক্ষাহেতু। কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ়। শত ধিক তারে!

* * *

নতুবা এসেছি মিছে। সাগরে বাঁধিয়া
এ কনক-লঙ্কাপুরে, কহিনু তোমারে।

* * *

দানব মানব দেব। কার সাধ্য হেন,
ত্রাণিবে সৌমিত্রি তোরে। রাবণ রুষিলে?

[৮+৬ ভাগের চৌদ্দ অক্ষরে ন্যূনতম পদচ্ছেদের সংখ্যা—চার; অধিকতম সংখ্যা, ছয়। এইরূপ পদচ্ছেদ যে পর্ব্ব বা foot নয়, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। শব্দের আয়তন ও স্বাভাবিক উচ্চারণরীতির ফলে যেখানে যে কয়টি ঝোঁক পড়িতে

পারে—কেবল তাহারই একটা হিসাব। প্রবল ঝোঁক বা 'beat'-এর সাহায্যে, আমাদের ভাষায় 'bar' বা অমিতাক্ষর 'foot' যে হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। প্রাচীন পুঁথির লিপিদোষ, অথবা কবিদেরই অক্ষমতা, কিংবা ছন্দে সুর-সংযোগের ফলে, যে সকল অনিয়ম প্রাচীন বাংলা ছন্দে দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা প্রকৃত-পক্ষে ছন্দপদ্ধতির লক্ষণ নয়।]

(২) ঝোঁকগুলি প্রধান ও অপ্রধান-ভেদে ছন্দকে কিরূপ স্পন্দিত করিতেছে, তাহাই দ্রষ্টব্য।—

হে রাঘবকুল—চূড়া! তব কুলবধূ
রাখে বাঁধি—পৌলস্ত্যের? না শান্তি সংগ্রামে
হেন দুষ্টমতি চোরে, উচিত কি তব
এ শয়ন?—বীরবীর্য্যে সর্ব্বভুক্‌সম
দুর্ব্বার সংগ্রামে তুমি? উঠ, ভীমবাহু—

* * *

তোমর, ভোমর, শূল, মুষল মুদ্গর,
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত—শোভে দন্তরূপে!

* * *

নির্ব্বাণ পাবক যথা, কিম্বা দ্বিষাম্পতি
শান্তরশ্মি—মহাবল রহিলা ভূতলে!

* * *

নীরব—রবাব, বীণা, মুরজ মুরলী

[প্রধান ঝোঁকের সংখ্যা সাধারণত দুই বা তিনটি, তৎসহ একাধিক অপ্রধান ঝোঁক—ছন্দস্পন্দের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু চরণের মধ্যে, শব্দের উপরে পৃথক ঝোঁকের সংখ্যা বাড়াইতে পারিলে ছন্দের ধ্বনিগৌরব বৃদ্ধি হয় এবং ছন্দের বৈচিত্র্য ঘটে।]

(৩) ঝোঁকগুলি প্রায় সমান, বিশেষ বড় ঝোঁক নাই—চরণ-মধ্যে সমাস-বদ্ধ দীর্ঘ পদের জন্যই এরূপ ঘটে; অথবা, কেবল পদচ্ছেদের

ঝোঁকগুলির দ্বারাই ছন্দ স্পন্দিত হইয়া থাকে,—ইহাতে ছন্দে লিরিক সুরের সঞ্চার হয়, যথা—

পিকবর—রব নব—পল্লব মাঝারে
• • •

কুসুমবন-জনিত পরিমল-সখা
সমীর, জুড়ায় কাণ শুনি বহুদিনে
পিককুল-কলরব জনরব-সহ—
• • •

—যথা জলতলে
কনক-পঙ্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয়া
কবরী বাঁধিতে ছিলা—

(৪) বাংলা উচ্চারণরীতির সাহায্যে চরণমধ্যে কয়েকটি ঝোঁক আমদানি করা সম্ভব হইলেও, তাহাদের পরস্পরের দূরত্ব কত অসমান, তাহাও লক্ষ্য করা যায়। ইহার কারণ, পদচ্ছেদের আয়তন দুই হইতে পাঁচ অক্ষর তো হয়ই; তাহার উপর, যদি সমাসের উপদ্রব থাকে, তবে ছয় অক্ষর পর্য্যন্ত হইতে পারে। সে ক্ষেত্রে, অন্তত চরণের সেই অংশে, বর্ণবৃত্তের বর্ণধ্বনিই ছন্দের লয়কে দ্রুততর করিয়া, সুরের বৈচিত্র্যবিধান করে, যথা—

নয়ন-রঞ্জন—কাঞ্চী / কৃশ—কটিদেশে
• • •

বননিবাসিনী—দাসী / নমে—রাজপদে
• • •

দৈত্যকুলদল—ইন্দ্রে / দমিনু সংগ্রামে
• • •

মুহু—অশ্রুবারিধারা / দাশরথি রথি

[এরূপ স্থলে, syllable ও accent দুইয়ে মিলিয়া ছন্দ-সঙ্গীত বৃদ্ধি করিতেছে।]

(৫) বড় ঝোঁকগুলির অবস্থানগুণে চরণমধ্যে ছন্দতরঙ্গের উত্থান-পতন নানা রকমের হইয়া থাকে। মিল্‌টনের ছন্দে এই তরঙ্গ ক্রম-উর্দ্ধমুখী হইবার যে সুযোগ আছে—বাংলায় তাহা নাই; কারণ আমাদের ছন্দের বর্ণগুলি বড় ঠাসা, এবং পর্ব্বের আভাসমাত্র নাই বলিয়া, ঝোঁকগুলি কোথাও তেমন ধারাক্রমিক হইতে পায় না। এজন্য, মিল্‌টনের চরণের মত—"O Prince, O chief of many-throned powers"—ছন্দতরঙ্গের এই ক্রমিক উচ্চতা (rising rhythm) আমাদের ছন্দে সম্ভব নয়। তথাপি তরঙ্গের নানাবিধ উঠা-নামা মধুসূদনের ছন্দেও দেখা যায়। কোথাও মধ্যস্থলে উঠিয়া শেষের দিকে নামিয়া গিয়াছে; কোথাও শেষ পর্য্যন্ত উচ্চতা রক্ষা করিয়াছে; কোথাও বা দুই পদভাগেরই আদিতে সমান উচ্চ হওয়ায়, ছন্দটি আর এক ভাবে দুলিয়াছে।—

অরাম করিবে ভব দুরন্ত রাবণি
• • •

লাঘবিতে রাঘবের বীরগর্ব্ব রণে
• • •

সোনার প্রতিমা যথা বিমল সলিলে
• • •

গরজিল গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে।

* * *

মজালে রাক্ষসকুলে মজিলে আপনি!

এ পর্য্যন্ত, আমি ছোট ও বড় 'ঝোঁক' এবং তদ্দ্বারা ছন্দস্পন্দ-(rhythm)-সৃষ্টির কিঞ্চিৎ পরিচয় দিলাম। এইবার সামান্য ঝোঁকগুলিকে জোরালো করিবার উপায় এবং সেগুলিকে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিবার যে-কৃতিত্ব, সে সম্বন্ধে সবিস্তারে কিছু বলিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, বাংলা বাক্যের উচ্চারণে প্রত্যেক পৃথক শব্দের বা বাক্যাংশের আদ্য-অক্ষরে যে একটু ঝোঁক পড়ে, মধুসূদন তাহা দ্বারাই তাঁহার চরণগুলির rhythm-এর গোড়াপত্তন করেন। কিন্তু এই ঝোঁকগুলি একটু বৃদ্ধি করিতে না পারিলে ছন্দ রীতিমত তরঙ্গিত হইতে পারে না,—যদিও গীতিসুরের ছন্দে তাহার দ্বারাই কাজ চলিতে পারে। অতএব, মিল্টন যেমন ইংরেজী শব্দের মৌলিক (Etymological) accent-কেই সাধারণভাবে কাজে লাগাইয়া, তাঁহার অমিত্রাক্ষরের ছন্দস্পন্দ সৃষ্টি করিবার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন,—তেমনই, মধুসূদনও প্রায় সেই কৌশলে ভাষার সেই সামান্য ঝোঁকগুলিকে বাংলা অমিত্রাক্ষরের উপযোগী করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি প্রধানত, বাক্যরীতি- এবং শব্দের ভাব-অর্থ-ঘটিত গুরুত্ব ('meaning weight', 'rhetorical value') এই দুইয়ের উপরেই অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন। কিন্তু, কাব্যের ভাষা গদ্যের ভাষা নয় বলিয়া, যে সকল শব্দালঙ্কার সেই ভাষাকে সমৃদ্ধ করে, তাহাও এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছে। আমি এই উপায়গুলির একটি তালিকা দিলাম।

(১) বাক্যরীতির (Syntactical বা Logical) কারণে শব্দ-বিশেষে স্বরবৃদ্ধি; অর্থাৎ, বাক্যের মধ্যে যে শব্দগুলি প্রধান—তাহারই উপরে স্বাভাবিক ঝোঁক পড়িয়াছে,—

যা কহিলে—সত্য,—ওহে অমাত্য-প্রধান—

সারণ!—জানি হে আমি—এ ভবমণ্ডল

মায়াময়,—বৃথা এর—দুঃখ-সুখ যত!

* * *

নিশায়—পাইলে রক্ষা, মারিব—প্রভাতে।

* * *

এ—বৃথা গঞ্জনা,—প্রিয়ে,—কেন দেহ—মোরে?

গৃহদোষে—দোষী-জনে—কে নিন্দে—সুন্দরী?

[এই বাক্যরীতিঘটিত উপায়টিই স্বরবৃদ্ধির প্রধান উপায়—এবং সর্ব্বত্র তাহাই দেখা যাইবে। কিন্তু মধুসূদন ইহার মর্ম্ম যেমন বুঝিয়াছিলেন—যে ভাবে Logical accent ও Rhythmical accent-কে তাঁহার ছন্দে এক করিয়া লইয়াছিলেন—তেমনটি তাঁহার পরবর্ত্তী কবিদের সাধ্যায়ত্ত হয় নাই; তাহার কারণ, তাঁহারা 'অমিত্রাক্ষর'-ছন্দের কেবল ওই নামটাই বুঝিয়াছিলেন—এ ছন্দের জ্ঞানই তাঁহাদের ছিল না।]

(২) উপরে প্রদর্শিত ওই জাতীয় ঝোঁক ছাড়াও আর একপ্রকার ঝোঁক—যাহাকে বক্তার নিজের ভাব-অনুরূপ কণ্ঠস্বরের জোর (Rhetorical বা Emphatic) বলা হইয়া থাকে, তাহাও এই ছন্দে বড় কাজে লাগিয়াছে। এই ধরনের ঝোঁকই সবচেয়ে বড় ঝোঁক—

নিশার স্বপনসম তোর এ বারতা

রে দূত! অমরবৃন্দ যাঁর ভুজবলে

কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী

বধিল সম্মুখরণে? ফুলদল দিয়া

কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে!

এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে!

শতপুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে
দিবানিশি!

হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!

রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে

আনিলে এ কথা তাত, কহ তা' দাসেরে!

স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে,

পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি

ধূলায়!

[উপরে আমি কেবল Rhetorical accent-গুলিই চিহ্নিত করিয়াছি—অন্যবিধ ঝোঁকও যথাস্থানে আছে।]

এইবার, কাব্যকলাকৌশল বা শব্দালঙ্কার-ঘটিত ঝোঁকের নমুনা দিব। ইহাকেও দুই শ্রেণীতে ফেলা যায়—

(ক) অনুপ্রাস। [অনুপ্রাসের দ্বারা কাব্যভাষার সৌন্দর্য্য এবং ছন্দের যে মাধুরী বৃদ্ধি হয়, সে কথা যথা-প্রসঙ্গে বলিয়াছি। কিন্তু মিল্‌টনের ছন্দের মত মধুসূদনের ছন্দকেও এই অনুপ্রাস কতখানি ধারণ করিয়া আছে, তাহাও লক্ষণীয়,—যেখানে শব্দহিসাবে অতি সামান্য ঝোঁক মাত্র পড়ে, সেখানে এই অনুপ্রাস সেই শব্দকে বাজাইয়া ঝোঁকের কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি সাধন করে। 'মেঘনাদে'র ভাষায় প্রায় আগাগোড়া

অনুপ্রাসের এমন ছড়াছড়ি যে, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, মধুসূদন প্রায় প্রত্যেক চরণকে অল্পবিস্তর অনুপ্রাস-শিঞ্জনে শিঞ্জিত করিয়াছেন—সর্ব্বত্র কেবল ঝোঁকবৃদ্ধির জন্যই নয়। আমি এখানে তাহার কয়েকটি মাত্র, ছন্দস্পন্দের কৌশল-হিসাবে, উদ্ধৃত করিতেছি। এখানেও অন্যবিধ ঝোঁক চিহ্নিত করিব না; যেখানে অনুপ্রাস ছাড়া ঝোঁকের অন্য কারণ আছে, সেখানেও ঝোঁক-চিহ্ন দিলাম না।]

সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর শ্মরিলা শঙ্করে।

ভগ্ন-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র রণে!

কি সাধ্য আমার সাধিব, রোধি আমি গতি?

রবিকুলরবি শূর রাঘবের শরে,

মানস সকাশে শোভে কৈলাস-শিখরী

আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন।

দ্বিরদরদনির্ম্মিত গৃহদ্বার দিয়া

কাঁদে অনুহ্রা সই বিলাপি বিষাদে।

এ বর বরণ মম—

উপরে আমি কেবল অনুপ্রাস দ্বারা ঝোঁকবৃদ্ধির উদাহরণ দিলাম; ইহাতে কেবল ঝোঁকের সংখ্যাবৃদ্ধিই হয় না—যেখানে ঝোঁক স্বভাবতই অল্প, সেখানেও তাহা স্পষ্টতর হইয়া উঠে।

(খ) যমক, একই শব্দের পুনঃপ্রয়োগ, চরণের মধ্যে শব্দের মিল-জনিত অনুপ্রাস,—প্রভৃতির দ্বারা ছন্দকে স্পন্দিত করিবার উপায়। এইগুলিতে কোথাও আমি ঝোঁক-চিহ্ন দিলাম না; চিহ্ন না দেখিয়া,

কেবল, একটু মনোযোগ সহকারে আবৃত্তি করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে —কোথায় ঝোঁকটি কি কারণে স্পষ্টতর হইয়াছে।—

হেন বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী

* * *

চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে।

* * *

অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি
তালজঙ্ঘা, হাতে গদা গদাধর যথা।

* * *

রতনে খচিত
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী।

* * *

গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোষে বিভাবসু,
বাস যাঁর, ভবেশ্বরি, ভবেশ্বর ভালে।

* * *

খুল্লতাত বিভীষণ বিভীষণ রণে।

* * *

মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে।

১১

এতক্ষণ আমি, মধুসূদনের ছন্দে, আদ্য-অক্ষরে স্বরবৃদ্ধির দ্বারা ছন্দ স্পন্দিত করিবার নানা উপায় বিশেষ করিয়া দেখাইলাম। এইবার এই স্বরবৃদ্ধির একটি অন্য উপায়, ও তাহার বিশিষ্ট গুণের উল্লেখ করিব। 'মাত্রা' বা 'quantity' বলিতে যে ধরনের স্বরবৃদ্ধি বুঝায়—মধুসূদনের ছন্দে তাহারও অবকাশ রহিয়াছে, দেখা যায়। যদিও দীর্ঘস্বরের গুরুত্ব বাংলা ভাষার স্বভাবসিদ্ধ নয়—বাংলা ছন্দেরও প্রকৃতিগত নয়, তথাপি, ওই-জাতীয় স্বরধ্বনিও ইহার ছন্দস্পন্দকে সমৃদ্ধ

করিয়াছে। কোনরূপ হিসাবের মধ্যে ইহাকে পাওয়া না গেলেও, এবং এ ছন্দের Rhythm মুখ্যত ওই ঝোঁকগুলির দ্বারাই সম্পন্ন হইলেও, পাঠক পড়িবার সময়ে কানকে একটু সজাগ রাখিলেই বুঝিতে পারিবেন —কোন্ কোন্ স্থানে অক্ষরের দীর্ঘস্বর সত্যই একটু দীর্ঘত্ব কামনা করে; তাহাতে ছন্দস্পন্দের যেমন বৈচিত্র্য ঘটে, তেমনই তাহার সঙ্গীত-গুণও বৃদ্ধি পায়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে, ছন্দের সঙ্গীতটি সম্পূর্ণ আদায় করিবার মত ছন্দরসপিপাসাও পাঠকের থাকা চাই। মাত্রাজাতীয় স্বরবৃদ্ধি হয় দুই কারণে; প্রথম, যুক্তবর্ণের অবস্থান: দ্বিতীয়, দীর্ঘস্বরযুক্ত বর্ণ। আমি এ পর্য্যন্ত স্বরবৃদ্ধির প্রসঙ্গে যুক্তবর্ণের উল্লেখ করি নাই; তাহার কারণ, এই যুক্তাক্ষরের জন্য পূর্ব্ব-অক্ষরে যে ঝোঁক পড়ে তাহা একটু ভিন্ন রকমের—উহা কতকটা সংস্কৃত গুরুবর্ণের মত। 'সম্মুখ সমরে'—এখানে 'সম্মুখে'র 'সম্', 'কশ্চিৎ কান্তা'র 'কশ্', অথবা 'পশ্যতি'র 'প'এর মত গুরু অক্ষর। যদিও এই গুরুত্ব ঠিক দীর্ঘস্বরযুক্ত অক্ষরের সমতুল্য নয়, তথাপি এই স্বরবৃদ্ধি ঠিক stress-এর মতও নয়; উচ্চারণে একটু দীর্ঘতার আভাস আছে। প্রসঙ্গক্রমে, এইখানে, একটা অপণ্ডিতসুলভ কথা বলিব; প্রাচীন বা আধুনিক সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রীরা এ পর্য্যন্ত তাহা বলিয়াছেন কি না জানি না। সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্রে, যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণও যেমন গুরু, দীর্ঘস্বরমাত্রাও তেমনই গুরু—দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা গণনার মধ্যে আসে না। 'কশ্চিৎ কান্তা'র আদ্য-অক্ষর ওই 'ক', এবং মধ্যের ওই 'কা' এই দুইয়ের স্বরবৃদ্ধি নিশ্চয় একরূপ নহে। অতএব, এমন কথা বলিলে ভুল হইবে না যে, সংস্কৃত ছন্দে ধ্বনিতরঙ্গের যে বৈচিত্র্য এমন শ্রুতিসুখকর হয় তাহার মূলে আছে, এই বিভিন্ন মাত্রাধ্বনির সমাবেশ—চরণমধ্যে ওই দুই-জাতীয় অক্ষরের গণনা একই হিসাবে করিলে চরণগুলির ধ্বনিবৈচিত্র্য অস্বীকার করা হয়।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। মধুসূদনের ছন্দেও স্বরবৃদ্ধির যে মাত্রাগুণ আছে, তাহার একটি ওই-জাতীয়, অর্থাৎ যুক্তাক্ষরঘটিত। বাংলা সাধুভাষার পর্ব্বভূমক ছন্দে যে Rhythmical accent অধুনা আমরা পাইয়াছি, তাহা কথ্য বাংলার ছড়ার ছন্দের মত ধাক্কাযুক্ত নয়; ভাষার ধ্বনিপ্রকৃতির বশে তাহা ঈষৎস্পৃষ্ট হইয়া থাকে, যুক্তাক্ষর সহযোগে এই ঝোঁক স্ফুটতর হয়। মধুসূদনের ছন্দে এইজন্য ইহার মূল্য সমধিক হইয়াছে। তথাপি ইহাকে আমি খাঁটি stress বা আঘাত-মূলক স্বরবৃদ্ধি না বলিয়া একরূপ মাত্রাগন্ধী 'গুরু'-ঝোঁক হিসাবে ইহার প্রাথমিক আলোচনা করিব। প্রথমে আমি ইহারই কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি; লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইহা সর্ব্বত্র আদ্য-অক্ষরের ঝোঁক নয়।—

দুরন্ত কৃতান্ত দূত সম পরাক্রমে

* * *

মূর্চ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী

* * *

হে কর্ব্বুরকুলগর্ব্ব! মধ্যাহ্নে কি কভু
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী?

* * *

অসংখ্য রাক্ষসবৃন্দ নাচিছে হুঙ্কারে

[ইহার সহিত, নিম্নোদ্ধৃত পংক্তি দুইটিতে যুক্তাক্ষর-পূর্ব্ব বর্ণের ঝোঁক তুলনীয়:—

তোমরা বিপ্র হয়ে ভৃত্যকার্য্য করে' বাড়ি ফিরে'
শাস্ত্র ভুলে, রেখে শুধু আর্কফলা শিরে—

মধুসূদন যে ধরনের ঝোঁক তাঁহার ছন্দে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা স্বরধ্বনি-প্রধান ভাষারই উপযোগী। এ বিষয়ে তাঁহার কান এত সজাগ ছিল যে, তিনি কোথাও প্রাচীন কবিদের মত কোন কারণে, 'হৈল' 'কৈল'—প্রভৃতিরও শরণাপন্ন হন নাই।]

যুক্তবর্ণঘটিত স্বরবৃদ্ধির—এবং তদ্দ্বারা ছন্দস্পন্দ-সৃষ্টির উপায় সম্বন্ধে ইহার অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। এইবার দীর্ঘস্বরঘটিত মাত্রাবৃদ্ধি ও সেই কারণে ছন্দের গৌরববৃদ্ধির নমুনা দিব—

(১) যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ববর্ণে দীর্ঘস্বর থাকায় তাহার মাত্রাবৃদ্ধি।

রত্নাকর রত্নোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী।

* * *

নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পূজিনু মায়েরে।

* * *

যাদঃপতি-রোধ যথা চলোর্ম্মি আঘাতে।

(২) দীর্ঘস্বরের জন্যই অক্ষরের মাত্রাবৃদ্ধি।

ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,

আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি
তোমার।

* * *

দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে

* * *

সুবর্ণদীপ-মালিনী রাজেন্দ্রাণী যথা

রত্নহারা।

* * *

এ হেন ঘোর ঘর্ঘর কোদণ্ডটঙ্কারে।

* * *

ওই ভীম বামকরে

কোদণ্ড, টঙ্কারে যার বৈজয়ন্তধামে

পাণ্ডুবর্ণ আখণ্ডল!

* *

উড়িছে কৌশিক ধ্বজ…

সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে…

[মধুসূদন বোধ হয় এইজন্যই, ঐ-কার ও ঔ-কারের ব্যবহারে কার্পণ্য করেন নাই।]

উপরে দীর্ঘস্বরজনিত স্বরবৃদ্ধির যে উদাহরণগুলি দিলাম, তাহাদের ঠিক ওই গুণ ওই স্থলে আছে কি না—পাঠকের নিজের ছন্দরসবোধ ও আবৃত্তি-কৌশল তাহার মীমাংসা করিবে। আমি কেবল এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, মধুসূদনের নিজের যে এই দিকে দৃষ্টি ছিল, তাহা, তাঁহার ছন্দ ভাল করিয়া পাঠ করিলে অনুমান করা যায়। তাহা ছাড়া, তাঁহার নিজেরই কথায় একটু প্রমাণ হয় যে, তিনি স্থানবিশেষে বাংলা অক্ষরের দীর্ঘমাত্রা মানিতেন, যথা (একখানি পত্রে)—

> Allow me to give you an example of how the melody of a line is improved when the 8th syllable is made long....In that description of evening you have these lines—
>
> আইলা তারাকুন্তলা, শশীসহ হাসি
> শর্ব্বরী,
>
> —How, if you throw out the তারাকুন্তলা and substitute সুচারুতারা, you improve the music of the line, because the double syllable স্থ mars the strength of লা। Read—
>
> আইলা সুচারুতারা, শশীসহ হাসি
> শর্ব্বরী—"

—ইহা হইতে নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, মধুসূদনের কানে, স্থানবিশেষে এবং শব্দবিশেষে, দীর্ঘস্বরের দীর্ঘতার প্রয়োজন-বোধ ছিল। ইহার পরে, মধুসূদনের ছন্দ সম্বন্ধে বোধ হয় এমন কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে—

> "As we listened it was easy to believe that 'stress' and 'quantity' and 'syllable' all playing together like a chime of bells, are concordant and not quarrelsome elements in the harmony of Modern Bengali Verse."

১২

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর-চরণে বাংলা ছন্দের একটা প্রাথমিক অভাব দূর করিয়া কি উপায়ে বৃহত্তর ও জটিলতর ছন্দস্পন্দের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা যতদূর সাধ্য সবিস্তারে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এক্ষণে এই ছন্দের অপর প্রধান উপাদান—ইহার নূতন যতি-বিন্যাস, বা যতিস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে কিছু বলিব। মধুসূদন যেমন এই ঝোঁকগুলি দ্বারাই Rhythm সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইলেন, তেমনই, ছন্দের ছাঁদ (৮+৬), এবং ছন্দের তরঙ্গটি রক্ষা করিয়া, যে কোন ছেদকে বাক্য বা বাক্যাংশের ছোট-বড় বিরাম-স্থল করিয়া লইতে, তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি ও দেখাইয়াছি, পয়ারের দুই পদভাগের শেষে যে দুইটি যতি আছে, তাহা এখানেও লুপ্ত হয় না; কেবল, চরণান্তিক যতিটি এক্ষণে আর সর্ব্বত্র pause বা বিরাম-যতি হইতে পারিতেছে না; কিন্তু উভয় যতিই সর্ব্বত্র ছন্দ-যতির যাহা কাজ সেই কাজ করিতেছে, অর্থাৎ, চরণের পদভাগ ঠিক রাখিয়া তাহার গতিকে পূর্ব্ববৎ ছন্দিত করিতেছে। আমি অতঃপর এই দুই প্রকার যতির দুই পৃথক নাম দিব—ছন্দভাগের যতিকে (Caesura, Harmonic pause) 'ছন্দ-যতি', এবং বাক্যাংশ বা বাক্যশেষের যতিকে 'বিরাম-যতি' বলিব। নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে এই দুই প্রকার যতির পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হইবে।—

> বহিছে পরিখারূপে / বৈতরণী নদী /
> বজ্রনাদে ,+ রহি রহি / উথলিছে বেগে /
> তরঙ্গ,+ উথলে যথা / তপ্তপাত্রে পয়ঃ /
> উচ্ছ্বাসিয়া ধূমপুঞ্জ,+ / ত্রস্ত অগ্নিতেজে ! //
> নাহি শোভে দিনমণি / সে আকাশ দেশে ,+ /
> কিম্বা চন্দ্র,+ কিম্বা তারা ,+ / ঘন ঘনাবলী, /
> উগরি পাবকরাশি, / ভ্রমে শূন্যপথে /

বাতগর্ভ,+গর্জ্জি উচ্চে, / প্রলয়ে যেমতি /
পিনাকী,+পিনাকে ইষু / বসাইয়া রোষে। //

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা—কারণ, (১) এই পংক্তিগুলিতে ছন্দ-যতি ও বিরাম-যতি সর্ব্বত্র নির্ব্বিরোধে অবস্থান করিতেছে ; (২) বিরাম-যতির স্থান একরূপ নহে—৮ অক্ষরের মত, ৩ ও ৪ অক্ষরেও বিরাম ঘটিয়াছে (এ বিষয়ে আরও বৈচিত্র্য দেখা যাইবে) ; (৩) বিরাম-কালের স্বল্প-দীর্ঘ ভেদ রহিয়াছে। পংক্তিগুলির মধ্যে পূর্ণচ্ছেদ আছে দুইটি ; তৎসত্ত্বেও, সব পংক্তিগুলি মিলিয়া একটি পূর্ণ ছন্দ-মণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। ইহাকে অমিত্রাক্ষরের 'Verse Paragraph' বা 'ছন্দ-ব্যূহ' বলে। এ সম্বন্ধে পরে বলিব। এক্ষণে উপরের verse paragraph-টির মধ্যে দুই প্রকার যতি-স্থান লক্ষ্য করিতে বলি ; এবং আরও লক্ষ্য করিতে বলি—ওই বিরাম-যতিগুলি সত্ত্বেও সর্ব্বত্র সেই (৮+৬)-এর ছন্দ-যতি বজায় রহিয়াছে। ছন্দ-যতির চিহ্ন (/) এইরূপ, বিরাম-যতির চিহ্ন (+) এইরূপ, এবং পূর্ণচ্ছেদের চিহ্ন (//) এইরূপ দিয়াছি।

মধুসূদনের ছন্দে, কোন কোন স্থানে বিরাম-যতি ও ছন্দ-যতির এইরূপ নির্ব্বিরোধ অবস্থান দেখা যায় না, কিন্তু তাহাতে ছন্দ-হানিও হয় নাই। তথাপি, এই ছন্দের স্বাভাবিক (normal) গতি যে ওই নিয়মকেই মানিয়া চলে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা ছাড়া, মধুসূদনের ছন্দ মহাকাব্যের ছন্দ, এজন্য এ ছন্দে সর্ব্ববিধ বৈচিত্র্যবিধান যেমন অত্যাবশ্যক, তেমনই মধুসূদন নিজেও সর্ব্বত্র ছন্দের বিশুদ্ধি রক্ষা করিতে পারেন নাই, ইহাও নিশ্চিত। আমি এইবার কয়েকটি এমন অংশ উদ্ধৃত করিতেছি, যাহাতে দেখা যাইবে, এই যতি-স্বাচ্ছন্দ্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।—

(১) পশিল কাননে দাস ;+/ আইল গর্জ্জিয়া /
সিংহ ;+বিমুখিনু তাহে ; / ভৈরব হুঙ্কারে /

বহিল তুমুল ঝড় ;+ কালাগ্নি সদৃশ /
দাবাগ্নি বেড়িল দেশ ;+/ পুরিল চৌদিকে /
বনরাজি ;+কতক্ষণে / নিবিলা আপনি
বায়ুসখা,+বায়ুদেব / গেলা চলি দূরে ।//

(২) দীপিছে ললাটে /
* শশিকলা,+মহোরগ-ললাটে যেমতি /
মণি !+জটাজুট শিরে+/ তাহার মাঝারে /
জাহ্নবীর ফেনলেখা+/ শারদ নিশাতে /
কৌমুদীর রজোরেখা / মেঘমুখে যেন ।//

(৩) গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া / কোষাকোষী+ভরা /
হে জাহ্নবী, তব জলে+/ কলুষনাশিনী /
তুমি !+পাশে ঘণ্টা ; / উপহার নানা /
হেমপাত্রে ;+ রুদ্ধদ্বার ;+/ বসেছে একাকী /
রথীন্দ্র,+নিময় তপে / চন্দ্রচূড় যেন /
যোগীন্দ্র,+ কৈলাসগিরি, / তব উচ্চচূড়ে ।//

উপরে আর সব পংক্তির যতি-স্থান ঠিক আছে, কেবল (*) চিহ্নিত পংক্তিটির যতি-বিন্যাসে যেন নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। এখানে আট-ছয়ের মধ্যবর্ত্তী ছন্দ-যতিটি লোপ পাইয়াছে। এইরূপ আরও একটি স্থান উদ্ধৃত করিতেছি—

ভেবে দেখ মনে, শূর,+/ কালসর্প-তেজে /
* তবাগ্রজ,+ / বিষদন্ত তার / মহাবলী /
ইন্দ্রজিৎ।

ইহার প্রথমটিতে যতিভঙ্গ-দোষ হইয়াছে ;—'মহোরগ-ললাটে', এই শব্দ দুইটির যতি রক্ষা করিতে গেলে অন্বয় রক্ষা হয় না ; অতএব এখানে ছন্দেরই দোষ ঘটিয়াছে। এইরূপ যতিভঙ্গ-দোষ মেঘনাদের ছন্দে অনেক স্থলে আছে ; বিশেষত এক ধরনের যতি-ভঙ্গকে কবি যেন, ভাবের বাক্য-স্রোতে ভাসিয়া, গ্রাহ্য করা আবশ্যক মনে করেন নাই ; যথা—

অলঙ্ঘ্য-সাগর-
সম রাঘবীর চমূ বেড়িছে তাহারে!

* * *

নিশার শিশির-
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন!

এইরূপ আরও আছে। ইহার কোন কৈফিয়ৎ নাই। কিন্তু উপরে (*) চিহ্নিত দ্বিতীয় পংক্তিটির কথা স্বতন্ত্র। এখানে ছন্দ-যতির স্থান রীতিমত হটিয়াছে—যেন, আট অক্ষরের প্রথম পদভাগকে দুই ভাগ করিয়া (৪+৪), তাহার ফাঁকে দ্বিতীয় পদভাগটিকে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে; ফলে, চরণের মধ্যে দুইটি ছন্দ-যতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার প্রথমটিতে ছন্দ-যতি ও বিরাম-যতি—দুই যতিই আছে; দ্বিতীয়টিতে কেবল ছন্দ-যতিই আছে। এইরূপ যতিবিপর্য্যয় 'মেঘনাদে'র ছন্দে খুব বেশি না থাকিলেও, ইহাকে ছন্দ-দোষ বলা যাইবে কি না সে বিষয়ে আমি নিসংশয় নহি। মধুসূদন, তাঁহার ছন্দে সর্ব্ববিধ বিরাম-যতির ব্যবস্থা করিয়াও, কোথাও ছন্দ-যতিকে স্থানচ্যুত করেন নাই; এমন কি, ছন্দের এই অবারিত গতিমুখে, তিনি (৮+৬)-এর পরিবর্ত্তে (৬+৮)-এর ছন্দভাগও পছন্দ করেন নাই; কারণ, উহাতে এ ছন্দের প্রকৃতি ক্ষুণ্ণ হয়। এজন্য, আমার মনে হয়, যেহেতু এখানেও কানে ছন্দ ঠিক আছে; অতএব এমন একটা কিছু এখানে ঘটিয়াছে, যাহাতে শেষ পর্য্যন্ত (৮+৬)-এর যতি কোন না কোন প্রকারে বজায় আছে, কান ওই (৮+৬)-এর ছাঁদকে হারাইয়া ফেলে না। আমি ইহাতেও সেই (৮+৬)-এর ভাগ দেখিতেছি; কেবল, আটের ভাগটি খণ্ডিত (split) হইয়া ছয়ের ভাগকে মাঝে বসাইয়াছে। আরও একটি যতি-ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক—

যোগাতেন আনি
* নিত্য ফলমূল / বীর সৌমিত্রি / +মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু।

এখানেও, দ্বিতীয় পংক্তিটিতে বিরাম-যতি পড়িয়াছে 'সৌমিত্রি'র পরে; তাহাতে মাঝের ছন্দ-যতিটি যেন লোপ পাইয়াছে; এবং, ওই মাঝের পদটিতে ছয় অক্ষরও নাই। তথাপি, এখানে ছন্দ-যতি লোপ পাইতেছে অন্য কারণে। বিরাম-যতিটি ১১ অক্ষরের পরে থাকা সত্ত্বেও ছন্দ ক্ষুণ্ণ হয় না, তাহার প্রমাণ—

অদূরে শোভিল বনে/—দেউল, +উজলি
সুদেশ।

এখানে যথাস্থানে স্বাভাবিক ঝোঁক পড়ার ফলে, আট অক্ষরের ছন্দ-যতিটি অক্ষুণ্ণ আছে। 'দেউল' শব্দটির উপরে Logical accent একটু প্রবল হওয়ায়, উহার আগে ও পরে, যে সামান্য যতির প্রয়োজন তাহাতেই, সুকৌশলে ছন্দ-যতি ও বিরাম-যতির বিরোধ মিটিয়াছে। এখানে ছন্দ-যতিটি বিরাম-যতির সহযোগিতা করিতেছে। আবার 'উজলি'র উপরেও বাক্যরীতিঘটিত একটু বিশেষ ঝোঁক পড়ে, এজন্য তাহার একটু পৃথক উচ্চারণের ব্যবস্থা ঠিকই হইয়াছে। প্রথম নমুনাটিতে এইরূপ যথাস্থানে আবশ্যকমত ঝোঁক পড়ে না বলিয়াই, ওই ছন্দ-যতিটিকে কষ্টে উদ্ধার করিতে হয়। এখানে 'বীর' ও 'সৌমিত্রি' দুইয়েরই ঝোঁক সমান, এবং শব্দ দুইটি অন্বয়-বদ্ধ, যথা—

নিত্য ফলমূল বীর—সৌমিত্রি, মৃগয়া—

তাই মাঝের ছন্দ-যতিটি রক্ষা করা দুরূহ। পড়িবার সময়ে

'সৌমিত্রি'র উপরে একটু বেশি ঝোঁক দিলে, যতিস্থান বজায় থাকিবে, এবং ছন্দটিও নির্দ্দোষ হইবে।

এই বিরাম-যতির সম্বন্ধে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। মধুসূদন তাঁহার ছন্দে, শব্দের মধ্যে বা শেষে হসন্ত-বর্ণ-ধ্বনি সম্বন্ধে বেশ একটু সজাগ ও সতর্ক ছিলেন—ছন্দের সুর-বৈচিত্র্য, ও যথাস্থানে গীতিকলধ্বনির প্রয়োজনে, তিনি হসন্তের ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু যতিস্থানের অক্ষরগুলিকে যতদূর সম্ভব স্বরান্ত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। 'মেঘনাদে'র যে কোন একটা অংশ পড়িলে দেখা যাইবে—মধুসূদনের ছন্দের যতিস্থানে স্বরান্ত অক্ষরই সংখ্যায় অধিক। উপরের উদ্ধৃত পত্রাংশেও, অন্তত ওই অষ্টম অক্ষরের যতিস্থানে তাঁহার এ বিষয়ে সতর্কতার প্রমাণ রহিয়াছে। ইংরেজী ছন্দেও masculine ও feminine pause নামে যতির যে একটা প্রকারভেদ করা হয়, বাংলায় সেইরূপ এই স্বরান্ত যতিগুলিকে masculine pause বা 'ধীর যতি', এবং ওই হসন্ত-শেষ যতিগুলিকে feminine বা 'ললিত যতি' নাম দেওয়া যাইতে পারে। আমি এখানে মধুসূদনের ছন্দে এই দ্বিবিধ যতির কিছু নমুনা দিব।—

দণ্ডক ভাণ্ডার যার / ভাবি দেখ মনে
কিসের অভাব তার ? / যোগাতেন আনি
নিত্য ফলমূল বীর / সৌমিত্রী ; মৃগয়া
করিতেন কভু প্রভু ; / কিন্তু জীবনাশে
সতত বিরত, সখি, / রাঘবেন্দ্র বলী—
দয়ার সাগর নাথ, / বিদিত জগতে ;

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে দেখা যাইবে অধিকাংশ হসন্ত-বর্ণ পদশেষে (যতির স্থানে) না থাকিয়া পদমধ্যে রহিয়াছে। তথাপি এখানে কয়েকটি feminine pause বার বার আসিয়া পড়িয়াছে। ইহার

সহিত অপর যে কোন স্থানের কয়েক পংক্তির তুলনা করিলে দেখা যাইবে, মধুসূদন সাধারণত 'ললিত যতি' অপেক্ষা 'ধীর যতি'রই অধিকতর পক্ষপাতী ; আমার মনে হয়, এইজন্যই তিনি বাংলা কর্ম্ম-কারকে এ-বিভক্তি, এবং বাংলা শব্দের শেষে সংস্কৃতের মত বিসর্গ ব্যবহার করিয়াছেন।—

বননিবাসিনী দাসী / নমে রাজপদে,
রাজেন্দ্র ! যদিও তুমি / ভুলিয়াছ তারে,
ভুলিতে তোমারে কভু / পারে কি অভাগী ?
হায়, আশামদে মত্ত / আমি পাগলিনী !
হেরি যদি ধূলারাশি, / হে নাথ, আকাশে ;
পবন-স্বনন যদি, / শুনি দূর বনে ;
অমনি চমকি ভাবি, /—মদকল করী,
বিবিধ রতন অঙ্গে, / পশিছে আশ্রমে,
পদাতিক, বাজিরাজি, / সুরথ, সারথি,
কিঙ্কর, কিঙ্করী সহ ! / আশার ছলনে
প্রিয়ংবদা, অনসূয়া, / ডাকি সখীদ্বয়ে ;

যতিস্থানের অক্ষরগুলি চিহ্নিত করিয়াছি, তাহাতে দেখা যাইবে, উপরের পংক্তিগুলিতে একটিও 'ললিত যতি' (feminine pause) নাই।

১৩

এইবার মধুসূদনের ছন্দের যাহা প্রথম ও শেষ, অর্থাৎ প্রধানতম লক্ষণ, তাহার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়া এই ছন্দ-পরিচয় শেষ করিব। মধুসূদনের এই মিল্‌টন-অনুগামী ("তব অনুগামী দাস") অমিত্রাক্ষর-ছন্দের

প্রধান বৈশিষ্ট্য—ইহার Verse-Paragraph বা 'পদ্যপংক্তি-ব্যূহ'। বাংলা নামটা একটু শ্রুতিকটু হইল, কিন্তু ঠিক অর্থটি বজায় রাখিতে হইলে নামটিকে আরও ছোট করা দুরূহ। আমি সংক্ষেপে 'পংক্তিব্যূহ' বলিব। এই পংক্তিব্যূহ-রচনাতেই মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর প্রকৃত ছন্দ-গৌরব লাভ করিয়াছে। কেবল ছন্দ-যতিকে গৌণ করিয়া বিরাম-যতিকে মুখ্য করিয়া তোলাই ইহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়—এ কথা আমাদের ছন্দশাস্ত্রীরা একবারও ভাবিতে পারেন নাই। বাংলা ছন্দের পরিচয় দিতে গিয়া, তাঁহারা, সমুদ্রকেও পুষ্করিণীর, এবং হিমালয়কেও উইঢিবির সমশ্রেণী বলিয়া প্রমাণ করিতেই ব্যস্ত; যাহারা গোঠে-মাঠেই বিচরণ করে, তাহারা পাঁচনবাড়ি অপেক্ষা বড় মাপকাঠি কোথায় পাইবে? এই Verse-Paragraph-এর জন্যই মধুসূদনের ছন্দ মিল্টনের ছন্দের সমকক্ষ হইতে পারিয়াছে—এবং ইহারই গুণে, ওই এক ছন্দে একখানি বৃহৎ কাব্য বিচিত্র সঙ্গীতস্রোতে প্রবাহিত হইয়া, ভাবের সঙ্গে সঙ্গে সুরের আবর্ত্তন রক্ষা করিতে পারিয়াছে; নতুবা, কেবল চরণমধ্যে যতি-স্বাচ্ছন্দ্যের গুণেই ওই এক ছন্দে মহাকাব্য রচনা করা যাইত না। এই Verse-Paragraph-এর আয়তন ছোট বা বড় হইতে পারে; কিন্তু, ইহা তিনটি বা চারিটি পংক্তির ব্যাপার নয়। স্বল্প ও দীর্ঘ বিরাম-যুক্ত বহু বাক্য ও বাক্যাংশের সমাহার—বা, সঙ্গীত-সঙ্গতির সহায়ে, একটি ভাব, একটি চিত্র, বা একটি ব্যাখ্যান যে পূর্ণ ছন্দ-রূপ লাভ করে—তাহাই অমিত্রাক্ষরের পংক্তিব্যূহ। এ যেন ছন্দের এক-একটি সৌরমণ্ডল—প্রত্যেক গ্রহের নিজস্ব গতি যেমন আছে, তেমনই, সকলে একটি এক-কেন্দ্রিক বৃহত্তর গতিচক্রের সঙ্গতি রক্ষা করিয়া থাকে। এ সম্বন্ধে আমি মূল প্রবন্ধের একটি প্রসঙ্গে পূর্ব্বেই কিছু আলোচনা করিয়াছি; কিন্তু এখানেও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিবার উপায়

নাই—কারণ, এ বিষয়ে কোন মাপ-যন্ত্রের আস্ফালন চলিবে না; এখানে কেবল কাব্যের সুরে নিজের কান মিলাইতে হয়, এই 'পংক্তিব্যূহ'গুলি বার বার পড়িতে হয়। এ সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিক কিছু বলিবার নাই। তাঁহার মতে—

> "These combinations or paragraphs are informed by a perfect internal concent and rhythm—held together by a chain of harmony. With a writer less sensitive to sound this free method of versifying would result in mere chaos. But Milton's ear is so delicate that he steers unfaltering through these long involved passages, distributing the pauses and rests, and alliterative balance with a cunning which knits the paragraph into a coherent regulated whole."

—এ সম্বন্ধে ইহার বেশি কেহ বলিতে বা বুঝাইতে পারেন না। মিল্টনের একটি Verse-Paragraph, ও তাহার পরেই মধুসূদনের একটি, নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি; পাঠকের যদি একটু ছন্দরস-বোধ থাকে (এবং সেই অনুপাতে ছন্দের ব্যাকরণবিদ্যা কম হয়), তাহা হইলে তিনি, যে বস্তুটি এত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি, তাহা কানের দ্বারাই বুঝিয়া লইতে পারিবেন।—

> Now came still Evening on, and Twilight gray
> Had in her sober livery all things clad;
> Silence accompanied; for beast and bird,
> They to their grassy couch, these to their nests,
> Were slunk, and all but the wakeful nightingale;
> She all night long her amorous descant sung:
> Silence was pleased. Now glowed the firmament
> With living sapphires; Hesperus, that led
> The starry host, rode brightest, till the Moon,
> Rising in clouded majesty, at length
> Apparent queen, unveiled her peerless light,
> And o'er the dark her silver mantle threw;

এবং—

হাসি দেখা দিল উষা উদয়-অচলে,
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে
দুঃখতমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদলে লয়ে সঙ্গে; উষার ললাটে
শোভিল একটি তারা শততারাতেজে!
ফুটিল কুন্তলে ফুল নব-তারাবলী!'

এই সঙ্গে মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' হইতে একটি পংক্তিব্যূহ উদ্ধৃত করিতেছি, তাহাতে দেখা যাইবে, বিভিন্ন আয়তনের ছোট-বড় পদ, এবং নানাবিধ ঝোঁকের 'rhythm'—held together by a chain of harmony'—কি সুন্দর ও সুসম্পূর্ণ ছন্দমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে!—

যে দিন,—কুদিন তারা বলিবে কেমনে
সে দিনে, হে গুণমণি, যে দিন হেরিল
আঁখি তব চন্দ্রমুখ—অতুল জগতে!
যে দিন প্রথম তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিলা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নবকুমুদিনীসম এ পরাণ মম
উল্লাসে,—ভাসিল যেন আনন্দ-সলিলে।
এ পোড়া বদন মুহু হেরিনু দর্পণে;
বিনাইনু যত্নে বেণী; তুলি ফুলরাজি,
(বন-রত্ন) রত্নরূপে পরিনু কুন্তলে!
চির পরিধান মম বাকল; ঘৃণিনু
তাহায়। চাহিনু কাঁদি বন-দেবী-পদে,
দুকূল, কাঁচলি, সিঁতি, কঙ্কণ, কিঙ্কিণী,
কুণ্ডল, মুকুতাহার, কাঞ্চী কটিদেশে।
ফেলিনু চন্দন দূরে, স্মরি মৃগমদে!
হায়রে, অবোধ আমি! নারিনু বুঝিতে
সহসা এ সাধ কেন জনমিল মনে?

কিন্তু বুঝি এবে, বিধু! পাইলে মধুরে
সোহাগে বিবিধ সাজে সাজে বনরাজী!—
তারার যৌবন-বন-ঋতুরাজ তুমি!

• • • •

মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে ইহার অধিক বলিবার অবকাশ উপস্থিত নাই—বোধ হয়, প্রয়োজনও নাই; অনেক সূক্ষ্ম বিচার যে বাদ পড়িল তাহাও স্মরণ আছে। কিন্তু আজ বাংলা কবিতা ও বাংলা ছন্দের যে দিন আসিয়াছে, তাহাতে সহস্র বিচারে কিছু হইবে বলিয়া আশা করি না। কেবল, যাঁহারা আধুনিক বাংলা ছন্দের পরিচয় লইবেন, তাঁহারা যাহাতে এই একটি কথা বুঝিতে পারেন যে, মধুসূদনের ছন্দ শুধুই একটা নূতন ছন্দ-সৃষ্টি নয়, উহা একাই বাংলা-ছন্দের একটা সম্পূর্ণ পৃথক রাজ্য; আর যাবতীয় বাংলা ছন্দ গীতিচ্ছন্দ, কেবল ভগবানের আশীর্ব্বাদে, আমরা ওই একটি অপর ছন্দ লাভ করিয়াছি—যাহার দ্বারা কাব্যচ্ছন্দকেই, সাগর-কল্লোল হইতে তটিনীর কলধ্বনি পর্য্যন্ত, সকল সুরে ঝঙ্কৃত করা যায়; বিশেষ করিয়া, জীবন ও জগতের যাবতীয় প্রত্যক্ষ রূপরসের অনুভূতিকে মানবকণ্ঠেরই বিচিত্র স্বরব্যঞ্জনায়, ভাষার ছন্দে প্রকাশ করা যায়। মধুসূদনের ছন্দে সাধু বা সংস্কৃত শব্দের ঝঙ্কার থাকিলেও, তাহা খাঁটি বাংলা বাক্‌পদ্ধতি ও উচ্চারণরীতির ছন্দ; ইহার চরণও পয়ারের চরণ; অতএব, Blank-verse-কে যেমন ইংরেজী 'National verse' বলা হইয়া থাকে—এই অমিত্রাক্ষরকেও তেমনই আধুনিক বাংলার সেইরূপ বিশিষ্ট ছন্দ বলা যাইতে পারে। ভাষার সেই রূপ, ও সেই ধ্বনির চর্চ্চা এখন আর নাই বলিলেই হয়; তাই, কেবল, এই ছন্দের নির্ম্মাণ-কৌশল বুঝিতে পারিলেই ইহার বিচিত্র ও সূক্ষ্ম শ্রুতিমাধুর্য্যের ধারণা করা যাইবে না; এইরূপ লিখিত আলাপ-আলোচনার দ্বারা তাহা সম্ভব নয়। ভাষা ও

ছন্দের সে সংস্কার পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিতে হইলে রীতিমত পাঠ-চক্রের ব্যবস্থা করিতে হয়।

সর্ব্বশেষে আমি এই বলিয়া বিদায় লইব যে, মধুসূদন যেমন এই ছন্দ-সৃষ্টির জন্য কোনরূপ ছন্দ-বিজ্ঞান বা ছন্দ-সূত্রের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই—সে বিষয়ে তাঁহার কানই একমাত্র গুরুর কাজ করিয়াছিল, আমিও তেমনই, মধুসূদনের সেই কানের সুরটিকে আমার কানে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছি, এবং তাহারই সাহায্যে এই ছন্দ-পরিচয় লিখিয়াছি; কেবল, আমার সেই কানের সাক্ষ্যকে যাচাই করিবার জন্যই ব্যাকরণের কিঞ্চিৎ সাক্ষ্যও সংগ্রহ করিয়াছি। ছন্দের ব্রহ্মসূত্র নির্ম্মাণ করিবার স্পর্দ্ধা বা দুঃসাহস আমার নাই। ইতিপূর্ব্বে, বাংলা ছন্দের পরিচয়, যে প্রয়োজনে আমারই জ্ঞান ও বুদ্ধিমত লিখিয়াছি, এবারকার প্রয়োজন তদপেক্ষাও গুরুতর। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ—তাঁহার কাব্যের মতই, গত ৪০ বৎসর বাংলা কবিতার বহির্ভূত হইয়া আছে—সে ছন্দ এখন আর কেহ পড়ে না, পড়িতে পারেও না। তাহাও বরং ভাল ছিল; ইহার উপরে, আধুনিক ছন্দ-পণ্ডিতগণের অত্যধিক পাণ্ডিত্যের দাপটে অমিত্রাক্ষরের পিতৃনাম পর্য্যন্ত লোপ পাইতে বসিয়াছে। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এ ছন্দের ধর্ম্ম ও মর্ম্মের সন্ধান এ পর্য্যন্ত কেহ করিল না, তাহার উপর বাংলা সাহিত্যের ছাত্রগণকে ইহার একটি দুষ্ট নাম (অমিতাক্ষর) শিখাইবার চেষ্টা হইতেছে! আমি আমার সাধ্যমত, বাংলার এই অদ্বিতীয় ছন্দের যে পরিচয় দিলাম, আশা করি, তদ্দ্বারা, আর কিছু না হউক—বাঙালী কাব্যরসিক বিদ্বজ্জন, ইহার অপূর্ব্ব ধ্বনি-কৌশল ও ইহার মহিমা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা করিতে পারিবেন।

সমাপ্ত

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

সরোজিনী

ইতিমধ্যে ছেলে ও বিধবারা আবার হুমড়ি খাইয়া পড়িয়াছিল, দারোগাবাবু আমাকে কহিলেন, আমি আসছি, একটু দেখবেন, এরা কেউ যেন না পালায়। থানা থেকে জনকয়েক কন্‌স্টেব্‌ল আনতে পাঠাচ্ছি, সব ধ'রে নিয়ে যাবে। দারোগাবাবুর কথা মন্ত্রবৎ কাজ করিল, দেখিতে দেখিতে ছেলেগুলা কে কোথায় পলাইয়া গেল, তাহা টের পাওয়া গেল না। বিধবাদের মধ্যে যাহাদের বয়স কিছু কাঁচা তাহারাও সরিয়া পড়িল, শুধু সৌদামিনী, পদ্ম এবং আরও জনকয়েক নেতৃস্থানীয়া বিধবা, নারীসুলভ লজ্জা ও সঙ্কোচ যাহারা হজম করিয়া ফেলিয়াছে, তাহারাই অটল হইয়া রহিল। অধিকন্তু একজন মন্তব্য করিল, ছোঁড়ার বাড় দেখ, হিন্দুর মেয়েকে হাজতে দেবে বলে! কে একজন বলিল, ও পদ্ম! লক্ষ্মী-নারাণ মূর্ত্তি দেখে নয়ন সার্থক কর লো, কনেবউকেও ডেকে নিয়ে এসে দেখা। কনেবউয়ের নাম শুনিতেই হারাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল বোধ হয়, হয়তো ভাবিল, স্পর্শসুখে আর কাজ নাই; কনেবউ আসিয়া হাজির হইলে যে গুরুতর স্পর্শসুখের ব্যবস্থা হইবে, তাহার ধকল এ বয়সে শরীরে সহ্য হইবে না। কিন্তু বেচারার উপায় নাই, সরোজিনী এমন সজোরে তাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে যে, সে বাহুবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা তাহার একার সাধ্য নহে।

দারোগাবাবু বন্দীদের কাছে আগাইয়া গিয়া হুকুম দিলেন, লছমন সিং, নিয়ে চল সব থানায়।—বলিয়া দুই পা আগাইয়া যাইতেই দোলগোবিন্দ মেঝেতে সটান চিত হইয়া শুইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। দারোগাবাবু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কি হ'ল?

দোলগোবিন্দ বুকে হাত দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল, হাঁপানির রুগী হুজুর, রোগটা চাড়া দিয়ে উঠেছে, টানা-হেঁচড়া করলে ম'রে যাব হুজুর।

দারোগাবাবু কিছুক্ষণ তাহার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া ধমকের সুরে কহিলেন, রোগ তো এসব হাঙ্গামায় আসেন কেন?

দোলগোবিন্দ উঠিয়া বসিয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, হুজুর, আসতে চাই নি আমি, সব্বাই মিলে—বলিয়া কথা শেষ না করিয়া, টানিয়া টানিয়া কাসিতে শুরু করিল।

দারোগাবাবু কহিলেন, শুধু রাধানাথবাবু, আর গাঙুলী মশায়কে নিয়ে চল, বাকি সব ছেড়ে দাও, ওঁরা এলেই হবে। রাধানাথ কহিল, হুজুর, আমাদের কি দোষ? মেয়েটার সব ঢং। কিছু হয় নি ওর। দারোগাবাবু গম্ভীরমুখে কহিলেন, সেসব জানবার আমার দরকার নেই, পরের বাড়ি চড়াও করতে আপনারা এসেছেন কেন? মণীন্দ্রবাবু আগেই ডাইরি করিয়ে এসেছেন আপনাদের নামে। গাঙুলী মশায় ও রাধানাথ দুইজনেই চোখ কপালে তুলিয়া একসঙ্গে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, হুজুর, তাই নাকি! দারোগাবাবুর পিছনে পিছনে রাধানাথ ও গাঙুলী মশায় চলিল, তাহাদের পিছনে চলিল লছমন সিং এবং লছমনের পিছনে পিছনে বাকি সব পুরুষেরা একে একে চলিয়া গেল। মেয়েদের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, পদ্ম নাই, সেও বোধ হয় বাড়ি চলিয়া গিয়াছে।

তিনু আসিয়া হাজির হইল। কহিল, ডাক্তারবাবু বললেন, আমার যাবার দরকার নেই, এই ওষুধটা শুঁকিয়ে দিলেই ভাল হয়ে যাবেন—বলিয়া অ্যামোনিয়ার একটি শিশি দেখাইল। কহিলাম, একটু একটু ক'রে শুঁকিয়ে দাও—একেবারে বেশি ক'রে দিও না, ভারী কড়া গন্ধ কিনা। তিনু, মিন্টা ও হারাণ মাঝখানে বসিয়া শুঁকাইতে লাগিল, তাহাই কিছুক্ষণ চাহিয়া দেখিয়া ফুন্টি কহিল, তিনু দাদা, আপনি পা দুটো ধরুন, আমি যাচ্ছি শুঁকিয়ে দিতে।

মেয়েদের মধ্যে কে বলিল, ফুন্টি যে তিনুকে খুব হুকুম করছিস লো। ফুন্টি খনখন করিয়া কহিল, বেশ করছি, তোমাদের কি? শকুনির মত জুটেছ কেন সব বল দেখি? একসঙ্গে যতগুলি বিধবা অধরোষ্ঠ সহযোগে 'ফিচ' শব্দ করিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করিল। মণীন্দ্র হাঁকিয়া কহিল, তোমরা এখানে এসে জুটেছ কেন বল দেখি? মজা দেখতে এসেছ নাকি?

সৌদামিনী কহিল, দেখ মনু, ফুন্টি একফোঁটা মেয়ে হয়ে অপমান করলে, তাও সহ্য করেছি। বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নি ওর, কাকে কি বলতে হয় জানে না। কিন্তু তুই বুড়ো মিনসে হয়ে এই কথা! বিপদে-আপদে লোক আসবে না তো কখন আসবে?

মণীন্দ্র উত্তর দিল, গাঁয়ের কারও সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নেই। আমাদের বিপদে-আপদে কারও এসে কাজ নেই। তোমরা যাও যাও।—বলিয়া হাত বাড়াইয়া দরজা দেখাইয়া দিল। ঠিক এই সময়ে হনহন করিয়া আসিল পদ্ম, আর তার পিছনে পিছনে কনেবউ, মাথা হইতে অবগুণ্ঠন প্রায় খসিয়া গিয়াছে, চোখ দুইটা ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত জ্বলিতেছে। দুইজনে একেবারে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। পদ্ম কহিল, এই দেখ কি কাণ্ড! হারাণ একবার কনেবউয়ের দিকে তাকাইয়াই পাংশুমুখে নতমস্তক হইয়া বসিয়া রহিল। ঠিক এই সময়ে সরোজিনীর জ্ঞান হইল, মাথা তুলিয়া কহিল, কি? কে? তারপর মুখ ফিরাইয়া পদ্ম ও কনেবউয়ের দিকে তাকাইয়া ভয়ার্ত স্বরে কহিল, কে তোমরা? পেত্নী? জামাইবাবু, ধরুন আমাকে, পেত্নীরা আমাকে ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছে।—বলিয়া আবার হারাণের কোলে মুখ গুঁজিয়া সজোরে তাহার কোমর আঁকড়াইয়া ধরিল।

কনেবউ গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, কি? আমি পেত্নী? এই কথা ব'সে ব'সে শুনছ তুমি? উঠে এস। চীৎকার করিয়া কহিল, উঠে এস বলছি।

হারাণ থতমত খাইয়া কহিল, ছাড়ছে না যে!

ধমকাইয়া কনেবউ কহিল, ছাড়ছে না যে! কেন কোলে নিতে গিছলে? পরের মেয়েমানুষ ভারী মিষ্টি, না?

হারাণ কহিল, পর আবার কি? নিজের শালী—

দাঁতমুখ খিঁচাইয়া কনেবউ কহিল, শালী! শালীর নিকুচি করেছে! উঠে এস। ঠাকুরঝি, দাও তো একটা ঝাঁটা—

ফুন্টি হাঁকিয়া কহিল, আমাদের জিনিসে কেউ হাত দিও না বলছি।

কনেবউ কহিল, ঝাঁটা দেবে না? বেশ।—বলিয়া হারাণের হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিয়া কহিল, ঠাকুরঝি, তুমিও ধর তো—

আমি বাধা দিয়া কহিলাম, কনেবউ, ভারী বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?

কনেবউ ত্বরিত-হস্তে মাথায় ঘোমটা টানিল। যাহাই করুক, কনেবউয়ের লজ্জা-শরম নাই—এ কথা পরম শত্রুতেও বলিতে পারে না।

হারাণকে কহিলাম, মাথাটা আর কারও কোলে দাও।

তিনকড়ি উঠিবার উপক্রম করিতেই, ফুন্টি কহিল, আমি নিচ্ছি। ফুন্টি সরিয়া বসিল। তখন সবাই মিলিয়া টানাটানি করিয়া সরোজিনীর বাহুবন্ধন একটু আলগা করিতেই হারাণ নিজেকে ছাড়াইয়া লইল। তারপর হেডমাস্টারের পিছু পিছু অপরাধী ছাত্র যেমনভাবে আপিস-ঘরের দিকে যায়, ঠিক তেমনইভাবে কনেবউয়ের পিছনে পিছনে চলিল। পদ্মকে কহিলাম, তুমিও যাও।

পদ্ম কহিল, দাঁড়াও, জ্ঞান হোক। একবার শুনিয়ে যাব না! পেত্নীই হই আর যা-ই হই, ছিনালি করা আমাদের অভ্যেস নেই।

মণীন্দ্র কহিল, খুব হয়েছে, আর শোনাবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। তুই বেরো দেখি।

পদ্ম মুখ নাড়িয়া জবাব দিল, তোর যে ভারী বাড় হয়েছে রে মনু! বড়লোক বোন চিরদিন গাঁয়ে থাকবে না। মাথা ন্যাড়া ক'রে, ঘোল ঢেলে, কুলোর বাতাস দিয়ে গাঁয়ের লোক একদিন গাঁ থেকে তাড়াবেই। তখন কি ক'রে গাঁয়ে থাকিস দেখব।

মণীন্দ্র কহিল, শুনছ মাস্টার? নেহাত মেয়েমানুষ ব'লে সহ্য করতে হচ্ছে। না হ'লে—মনু চক্রবর্ত্তী এসব সয়?—বলিয়া আমার দিকে কটমট করিয়া তাকাইল।

আমি, পদ্ম ও আরও অন্যান্য বিধবাদের উদ্দেশে কহিলাম, আপনারা যান, আর ভয় নেই। ওষুধ যখন শোঁকানো হচ্ছে, তখন এখনই ভাল হয়ে উঠবে।

সৌদামিনী কহিল, ভাল হয়ে উঠলেই ভাল ভাই, আমাদের আর কি? চোখে দেখা তো। তাও যদি সহ্যি না হয় তো আমরা চ'লেই যাচ্ছি।—বলিয়া অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত সাঙ্গোপাঙ্গদের লইয়া স্থান-ত্যাগ করিল।

ফুন্টি ছিপিটা বন্ধ করিয়াই শুধু শিশিটা শুঁকাইতেছিল। লক্ষ্য করিয়া কহিলাম, ও রকম ক'রে নয়; ছিপিটা খুলে ভাল ক'রে শোঁকা। একবার শোঁকাতেই সরোজিনী চেতনালাভ করিয়া 'আঃ' শব্দ করিয়া উঠিল এবং শিশিটা হাত দিয়া সরাইয়া কহিল, থাক, আর দিতে হবে না।—বলিয়া শান্ত ও স্বাভাবিক ভাবে শুইয়া রহিল।

মণীন্দ্রকে কহিলাম, যদি ঘুমিয়ে পড়ে, আর ঘুম ভাঙিও না। তবে আবার যদি মূর্চ্ছো হয় তো ওষুধটা শুঁকিয়ে দিও।

সরোজিনীর শাশুড়ী এতক্ষণ একটানা সুরে বিনাইয়া বিনাইয়া কাঁদিতেছিলেন।—ওমা, আমার কি হ'ল গো! কাকে নিয়ে এ সংসারে থাকব গো! ইত্যাদি।

এতক্ষণে কান্না থামাইয়া আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, হ্যাঁ বাবা, ভাল হবে?

আমি বলিলাম, ভাল হবে কি, হয়ে গেছে। আপনি আর ব'সে থাকবেন না, শোন গে। তারপর চলিয়া আসিলাম।

১২

পরদিন রবিবার। বেলা আটটার সময়ে হুজুর ও তাঁহার অনুচর-বৃন্দের খবর লইবার জন্য গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে হাজির হইলাম। বৈঠকখানায় ছিলেন না। বাড়ির মধ্যে গিয়া দেখিলাম, দাওয়ায় মাদুর পাতিয়া বসিয়া গাঙুলী মশায় চা খাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া গম্ভীর-মুখেই কহিলেন, এস, ব'স। পাশে বসিয়া কহিলাম, আজ এত বেলা? গাঙুলী মশায় জবাব না দিয়া চা পান করিতে লাগিলেন। চুপ করিয়া মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম। বিনিদ্র-রজনীর ক্লান্তি ও অপরিতৃপ্তি মুখে-চোখে পরিস্ফুট, চোখ দুটি ফুলিয়া উঠিয়াছে, মুখ শুষ্ক ও বিবর্ণ, ঠোঁটের কোণ দুইটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কহিলাম, কাল কি হ'ল?

সে অনেক ব্যাপার।—বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন। দিদিমা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে আসিয়া হাজির হইলেন এবং কলিকাটি হুঁকার মাথায় দিয়া ও হুঁকাটি দাদামশায়ের হাতে ধরাইয়া দিয়া আমাকে উদ্দেশ

করিয়া কহিলেন, আমি বলেছিলাম না নাতি, যে ল্যাটা গাঁয়ে এসে জুটেছে, সকলকে নিকেশ না ক'রে যাবে না? গাঙুলী মশায় তামাক টানিতে টানিতে কহিলেন, সত্যি।—বলিয়া মাঝারি-গোছের নিশ্বাস ফেলিলেন। দিদিমা উৎসাহিতা হইয়া কহিলেন, গরিবের কথা বাসী হ'লেই মিষ্টি লাগে কিনা! তখন পইপই ক'রে বলেছিলাম, এসব হাঙ্গামে থেকো না, কথা না শুনে কি ফ্যাসাদে পড়লে দেখ! আগ্রহের সহিত কহিলাম, কি ফ্যাসাদ?

দিদিমা কহিলেন, পেঁয়াজ, পয়জার—দুই হয়ে গেছে কাল। অপমান, তার ওপর জরিমানা।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তাই নাকি?

গাঙুলী মশায় একাগ্রচিত্তে তামাক টানিতে লাগিলেন। গাঙুলী-গিন্নী উঁচু পর্দ্দায় কহিলেন, তবে আর বলছি কি! সব শোন ব'সে ব'সে। আমি আবার ডাল চড়িয়ে এসেছি।—বলিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াই আবার ফিরিয়া দাঁড়াইয়া, তর্জ্জনী নাড়িয়া কহিলেন, এই আমি ব'লে দিচ্ছি, ও ছুঁড়ীকে জব্দ করা তোমাদের সাধ্যি নয়। উলটে ওই যদি সবাইকে জব্দ ক'রে না ছাড়ে তো কি বলেছি।—বলিয়া রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে ছুটিলেন।

অনেকক্ষণ ক্রমাগত ধূমপান করিয়া কতকটা চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া, গাঙুলী মশায় কহিলেন, ওঃ, কাল ভারী বিপদ গেছে! বেটা দারোগা গুলিখেকো বাঘের মত হয়ে উঠল! যেমন লম্ফঝম্প, তেমনই দাঁত-মুখের খিঁচুনি! কখনও বলে, হাজতে পুরব; কখনও বলে, কোমরে দড়ি বেঁধে জেলা পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যাব। অনেক বোঝালাম, মিনতি করলাম।

ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, কিছুতেই না।

দুজনে তখন লম্বালম্বি পায়ের নীচে গড়িয়ে পড়লাম। ম্লেচ্ছটার তাতেও মন গলল না। শেষে টাকা দিয়ে ছাড়ান পেলাম।

কত টাকা?

মুখ ভারী করিয়া, বিষণ্ণ গম্ভীরকণ্ঠে কহিলেন, অনেক। পাঁচশো টাকা। সঙ্গে সঙ্গে দিতে হ'ল।

অত রাত্রে এত টাকা পেলেন কোথায়?

ঐ গাঁজাওয়ালার কাছে। অত রাত্রে উঠিয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিলাম দুজনে—টাকায় মাসে দু পয়সা সুদ।—বলিয়া প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

কখন ফিরলেন?

ফিরলাম রাত তিনটেয়। হুজুরের কাছে গেলাম, হুজুর তখনও জেগে। ঘুম কি হয়! হাকিম হয়ে এতবড় অপমান! তাও আবার একটা একফোঁটা মেয়ের কাছে!

হুজুরকে সব বললেন?

বললাম বইকি।

ঘুষের কথা বললেন?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হাঁ।

কহিলাম, ওটার জন্যে কোন ব্যবস্থা করা যাবে না? ঘুষ যে নিয়েছে, তা তো হ্যাণ্ডনোট থেকেই প্রমাণ হবে।

করুণ মুখে গাঙুলী মশায় কহিলেন, হায় হায়! তার কি উপায় রেখেছে বেটা! এক মাস আগের তারিখ দিয়ে হ্যাণ্ডনোট লিখিয়েছে।

সাক্ষী?

সাক্ষী—দোকানের কর্ম্মচারীরা আর বীরু আচায্যি।

সবিস্ময়ে কহিলাম, বীরু আচায্যি গিছল নাকি?

গাঙুলী উত্তেজিত হইয়া কহিলেন, যাবে না! মাতঙ্গ পাকে পড়েছে, ব্যাং নয়ন ভ'রে দেখবে না! মনু চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে দল বেঁধেছে। প্রবোধ গাঙুলীর কাছে ঘরবাড়ি বাঁধা আছে, জান না? ভাবছে, মনুকে তেল দিয়ে সব ছাড়িয়ে নেবে।

কহিলাম, রাধানাথের ভগ্নীপতি যে!

হ'লই বা। জমি নিয়ে দুজনে ঝগড়া চলছে না! এখন খুব দারোগার কাছে যাওয়া-আসা করছে। রূপসী মেয়েটার ওপর যখন খাবল পড়বে, তখন বুঝবে মজাটা।

হুজুর কি পরামর্শ দিলেন?

বললেন, এস. ডি. ও.-কে সব বিবরণ জানিয়ে দরখাস্ত করুন, দারোগা যে ও-দলে রয়েছে, তাও খুলে লিখবেন। তা হ'লে এন্‌কোয়্যারির ভার আমার হাতেই পড়বে। তারপর এমন রিপোর্ট দোব যে, মাথায় ক'রে বুড়ীকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যাবে।

কহিলাম, আজ আর কোথাও বেরোবেন না। সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে ঘুমুনগে।

খিন্ন কণ্ঠে গাঙুলী মশায় কহিলেন, আর ঘুম! ঘুম কি আমার আসবে ভাই! এতগুলো টাকা ন দেবায় ন ধর্ম্মায় গেল। শোধ যে কি ক'রে করব, তাই ভাবতে গেলে মাথায় আগুন জ্ব'লে উঠছে। ঘুম! ঘুম আর আমার হবে না।

উঠিলাম। উঠানে পা দিতেই দিদিমা পাছু ডাকিলেন, ওহে! এদিকে একবার শুনে যাও দেখি।

কাছে যাইতেই কহিলেন, লুকিয়ে লুকিয়ে পালাচ্ছ যে বড়! নাত-বউয়ের টানে, না ঐ ডাইনীটার টানে?

কহিলাম, মানে?

তুমিও তো খুব যাওয়া-আসা করছ শুনছি। খুব সাবধান কিন্তু। বাগে পায় তো চুষে নেবে। কাউকে বাদ দেবে না ও, ব'লে দিচ্ছি। হারাণের কি হাল হয়েছে, জান না? পদ্ম ব'লে গেল এখনই।

উৎসুক কণ্ঠে কহিলাম, কি?

আজ মাথা মুড়িয়ে প্রাশ্চিত্তির করাচ্ছে ওর বউ, তারপর নাকি রাত্রেই ওকে নিয়ে পালাবে।

কোথায়?

বাপের বাড়ি। শুধু কি ওই, পাড়ার যতগুলো বউ আছে, সকলেরই টনক নড়েছে। সব পালাবে নিজের নিজের স্বামী নিয়ে। পুরুষদের মড়ক লেগে গেছে গাঁয়ে ভাই। নাতবউকে একটু সাবধান হতে ব'লে দিয়ে আসব ভাবছি।

দোহাই দিদিমা! আমার বাড়িতে আর আতঙ্ক ছড়িয়ে আসবেন না। নাতবউ আপনার বেশ দিল ঠাণ্ডা ক'রে আছে।

দিদিমা মুচকি হাসিয়া কহিলেন, তার জন্যেই তো ভয় হয় হে।

যদি কোন বিপদ-আপদ হয়ে যায় তো জানতেই পারবে না। কপাল চাপড়ে মরবে শেষে।

আমার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। আপনার নাতবউকে বইতে বইতে ঘাড়ে কড়া প'ড়ে গেছে, যেমন দাঁতই হোক, এখানে বসবে না।

বিকালে হারাণের খবর লইতে চলিলাম। দরজায় শিকল তোলা। হারাণের সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে, হারাণকে কনেবউ একা ছাড়িয়া দিয়া কোথাও যাইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে কি সঙ্গে লইয়াই গা ধুইতে গিয়াছে? তাও সম্ভব বলিয়া মনে হইল না। তবে কি বাড়িতে আটকাইয়া রাখিয়া গিয়াছে? হারাণের নাম ধরিয়া ডাক দিলাম।

হারাণ সাগ্রহে সাড়া দিল, এস হে, শেকল, না তালা?

জবাব দিলাম, শেকল।

হারাণ মিনতির সুরে কহিল, তবে খুলে ভেতরে এস ভাই।

বাড়ির ভিতরে গিয়া হারাণের মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলাম, গলা হইতে সমস্ত মুণ্ডটায় কেশের লেশমাত্র নাই—মাথাটা একটা প্রকাণ্ড বেলের মত একেবারে চাঁছা-পোঁছা, গোঁফ-দাড়ি যৎসামান্য যাহা ছিল, মায় ভ্রূ দুইটা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মূল। হারাণের গা খালি, পরনে একটা নূতন গামছা; গলা হইতে নূতন পৈতা ঝুলিতেছে।

কহিলাম, কি ব্যাপার?

হারাণ কহিল, এস, সব বলছি।

কাছে গিয়া বসিতেই হারাণ কহিল, কাল যে কি ক'রে রাত কেটেছে, তা আমিই জানি। ঝাঁটা হাতে এই মারে তো এই মারে, উল্টে কিছু বলতে গেলেই মূর্চ্ছো। তারপর সকাল হতেই এই ব্যাপার। ঢোক গিলিয়া কহিল, প্রাশ্চিত্তির করতে হ'ল।

কহিলাম, ভ্রূ দুটো কামিয়ে দিয়েছ কেন?

শোকার্ত্ত কণ্ঠে হারাণ কহিল, আমি কি নিজে কামিয়েছি? বউ গোবিন্দ নাপিতকে হুকুম করলে, মাথায় মুখে যেন একগাছি চুল না থাকে। আর বেটা গোবিন্দকে জান তো! হুকুম করতে না করতেই

একেবারে ফস ক'রে (ডান হাত দিয়া ক্ষুর-চালনার ভঙ্গি করিল) একটা ভুরু সাবাড় ক'রে দিলে, তখন আর একটাকে কি ক'রে রাখি বল ?

কহিলাম, কাপড়-চোপড়ও কেড়ে নিয়েছে নাকি ?

হারাণ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সব-ঘরে চাবি দিয়ে রেখে গেছে ; পাছে দেওয়াল ডিঙিয়ে পালাই। বাইরে শেকল তুলে দিয়েও বিশ্বাস হয় নি।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আজ রাতেই আবার ধানশোল (হারাণের শ্বশুরালয়) টেনে নিয়ে যাবে।

প্রশ্ন করিলাম, পদ্ম কোথায় ?

তার কথা আর ব'লো না মাইরি ! ভাত খেয়ে পুঁথি শুনতে গেছে। ঐ যে সদু বামনীর বাড়িতে দিন ভাত খাবার পর বিধবাগুলোর আড্ডা বসে, একটা রামায়ণ কিংবা মহাভারত সাক্ষী রেখে পরচর্চ্চা করে—

কহিলাম, পদ্মই বুঝি কাল কনেবউকে ডেকে নিয়ে গিছল ?

তা ছাড়া এত কুবুদ্ধি কার ? বদমাইসের জাস্থ কিনা ! এদিকে এত ঝগড়া, তবু সাত-তাড়াতাড়ি ছুটে এসে ডেকে নিয়ে গেছে। একবার ভালয় ভালয় ফিরে আসি, ওকে তাড়াব আমি। যেখানে ইচ্ছে যাক, জায়গা-টায়গা কিচ্ছু দোব না। ছেলে তো রোজগার করছে, বাড়ি করুক গিয়ে কোথাও।

কহিলাম, গাঙুলী মশায়েরও কাল খুব বিপদ গেছে।

হারাণ কহিল, সব শুনেছি। আমাদের গেজেটটি তো সকালে এক-পাক ঘুরে এসেছেন কিনা ! কিন্তু খুব ভাল হয়েছে। ওদের একটু শাস্তি হওয়া দরকার।

বিস্ময়ের স্বরে কহিলাম, কেন ?

ওরা ভারী অন্যায় করতে আরম্ভ করেছে। একটা অনাথা অবলা মেয়েমানুষ, অল্প বয়সে স্বামী হারিয়ে গাঁয়ে এসে আশ্রয় নিলে তো সবাই তার যা কিছু সম্বল সব সাবাড় ক'রে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। যখন তা পারলে না, তখন তাকে গাঁ থেকে অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দেবার জন্যে উঠে-প'ড়ে লেগে গেল।

কহিলাম, কিন্তু সরোজিনীর দারোগাবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করা, গাঁয়ের ছোকরাগুলোকে হাত করা, এগুলো কি ?

হারাণ বাধা দিয়া কহিল, বাধ্য হয়ে করেছে। তা ছাড়া যদি অন্যায়ই করেছে, আর তার শাশুড়ীর জন্যে তোদের বুকই ফাটছে তো তাকেই সরিয়ে নিয়ে আয়।

সরতে দেয় কই ? হুজুরকে পর্য্যন্ত হিমসিম খাইয়ে দিলে কাল।

কই, সে কথা তো কাল কিছু হ'ল না ! হুজুর বুড়ীকে নিজের মুখে জিজ্ঞাসা করলেই পারতেন, তার কষ্ট হচ্ছে কি না, সে যেতে চায় কি না ? তা না ক'রে গাঙুলী মশায় আর রাধানাথকে লেলিয়ে দিলেন। আর ওরাও, আসল কথা জিজ্ঞাসা না ক'রে, সরোজিনী এই করে, সরোজিনী সেই করে, সে বদমাইস, সে বেশ্যা, এই সব অবান্তর ঝগড়া করলে।

সত্য কথা। গাঙুলী মশায় ও রাধানাথ, বৃদ্ধাকে উদ্ধার করার চেয়ে, সরোজিনীর স্বরূপ-মূর্ত্তি হুজুরকে দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল। এবং সেই মূর্ত্তি হুজুর যতটা দেখিয়াছেন, তাহাতেই মোহিত হইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয় ; আর বোধ হয় সহজে সরোজিনীর ত্রিসীমানায় পা দিবেন না।

হঠাৎ হারাণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, কাল কার মুখ দেখে উঠেছিলাম মাইরি !

কহিলাম, পরশু রাতে তো ঘুমোও নি বলছিলে।

হারাণ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, তাই। না হ'লে, দেখে দিনটা ভাল যাবে এমন মুখ তো আমাদের ত্রিসীমানায় নাই কিনা।

কহিলাম, কি ভালটা হ'ল ?

দুই চোখ ডাগর করিয়া হারাণ কহিল, ভাল নয় ? সরোজিনীর মত মেয়ে আধ ঘণ্টা ধ'রে যার কোলে মাথা গুঁজে শুয়ে থাকে, হাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধ'রে থাকে, তার ভাল নয় ? কাল দারোগাবাবুর চোখ দেখ নি ? ওর ইচ্ছে ছিল—ওই ব'সে যায়, নেহাত চক্ষুলজ্জায় পারলে না। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, সত্যি, কি রকম রঙের জলুস দেখেছ ! এই পাড়াগাঁয়ের রোদ-হাওয়াতেও একটু পোড়

খায় নি। কাল মনে হচ্ছিল, মুখ নয়, যেন একরাশ তাজা পদ্মফুল নিয়ে ব'সে আছি। আর হাত দুটো কি নরম! এত জোরে ধরেছিল, তবু একটুও কষ্ট হয় নি। আর আমাদের-গুলির? হাত তো নয়, যেন লোহার বেড়ি!

কহিলাম, ওসব কথা বাদ দাও।

হারাণ কহিল, কেন? হিংসে হচ্ছে বুঝি? তা দাদা সাজতে রাজি হয়েছিলে কেন? বউয়ের সঙ্গে বোন সম্পর্ক পাতিয়ে দিয়ে জামাইদাদা সাজলেই পারতে।

কথার মোড়টা ঘুরাইবার জন্য কহিলাম, কখন যাচ্ছ তোমরা?

হারাণ কহিল, কাল ভোরে। কত বোঝাচ্ছি, এই চেহারা নিয়ে এক মাস কোথাও বার হতে পারব না, তা শুনছে না। ভারী একগুঁয়ে মেয়েমানুষ।

এই চেহারার জন্যে বাপের বাড়িতে কি কৈফিয়ৎ দেবে বলছে?

তাও ঠিক করে নি নাকি? বলবে, বাড়িতে একটি গাই গলায় দড়ি দিয়ে ম'রে গেছে, তাই প্রাশ্চিত্তির করতে হয়েছে। সুবুদ্ধি না থাক, কুবুদ্ধির অভাব নেই কিনা।

কহিলাম, আচ্ছা, আমি উঠি। একবার সরোজিনীর ওখানে যাব ভাবছি, খবরটা নিতে।

হারাণ করুণস্বরে কহিল, ব'লো ভাই সব বুঝিয়ে আমার কথা, কি অবস্থায় প'ড়ে গাঁ ছেড়ে চ'লে যাচ্ছি; যদি গাঁয়ে থাকতাম তো তাকে বুক দিয়ে আমি আগলে রাখতাম।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া পত্নীকে কহিলাম, সরোজিনীকে একবার দেখতে যাবে না?

পত্নী বিস্ময়ের সহিত কহিলেন, কি হয়েছে ওর?

কহিলাম, বারে! জান না, কাল হঠাৎ মূর্চ্ছা হয়ে গিছল?

পত্নী আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, ওঃ, তাই। আমি বলি, আর কিছু হয়েছে।

কহিলাম, মূর্চ্ছা যাওয়াটা সোজা নাকি? মনের আর মস্তিষ্কের কতখানি উত্তেজনা হ'লে—

বাধা দিয়া পত্নী ধারালো স্বরে কহিলেন, দেখ, ব'কো না, আমার এসব ঢের দেখা-শোনা আছে। তোমরা পুরুষরাই ওতে ভুলবে, আমরা ভুলব না। আমাদের বড় মামীর মূর্চ্ছা দেখ নি?

দেখি নাই। বড় মামীকেই দেখি নাই তো তাঁহার মূর্চ্ছা দেখিব কি? বড় মামাকে দেখিয়াছি। তিনি জজের সেরেস্তাদার। কেহ কোথাও সরকারী চাকরি করে শুনিলে ইঁহারই নাম পত্নী সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখ করেন। ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, না।

পত্নী মৃদু হাসিয়া কহিলেন, সে ভারী মজার মূর্চ্ছা! সারাদিন বেশ ভালমানুষ, খাচ্ছেন-দাচ্ছেন, হাসছেন-খেলছেন; কিন্তু যেমনই মামা কাছারি থেকে বাড়িতে পা দেওয়া, অমনই মূর্চ্ছা। আর বড় মামা সারাদিনের রোজগার পকেট খালি ক'রে হাতে গুঁজে দেবামাত্রই মূর্চ্ছা ভেঙে উঠে বসা।

কহিলাম, সরোজিনীর মূর্চ্ছা ও রকম মেকী মূর্চ্ছা নয়, খাঁটি।

অধর ও ওষ্ঠ সহযোগে অবজ্ঞাসূচক ধ্বনি করিয়া পত্নী কহিলেন, খাঁটি! পদ্মর কাছে যদি না সব শুনতাম।

কহিলাম, পদ্ম এসেছিল নাকি?

ঘাড় নাড়িয়া পত্নী কহিলেন, হুঁ, এইমাত্র তো গেল।

কি বললে পদ্ম?

ঢঙী মেয়ের ঢঙের কথা সব ব'লে গেল। মেয়েটা সত্যি খারাপ। পরপুরুষকে জড়িয়ে ধরতে একটু সঙ্কোচ হয় না! আমাদের তো ভাবলে গা-ঘিনঘিন করে।

কহিলাম, জড়িয়ে ধরবার লোক আছে কিনা, তাই বলছ; না থাকলে—

পত্নী ধমক দিয়া কহিলেন, ওসব কথা যেতে দাও। মোট কথা, ওখানে যাবার দরকার নেই তোমার। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, পরের বউরা মূর্চ্ছা গেলে পুরুষদের বুক ফেটে যায়, আর নিজেদের বউরা মুখে রক্ত উঠে মরলেও দেখতে পায় না। হারাণ কোন্ লজ্জায় ওর মাথা কোলে করলে?

কহিলাম, নিজের শালী যে!

স্ত্রী কহিলেন, শালী নয়, ওসব ধাপ্পা। পদ্ম বললে, ও কোন দিন ও কথা শোনে নি।

কহিলাম, পাগল নাকি! সরোজিনীর মিছে কথা ব'লে লাভ কি? হারাণ এমন কিছু স্বনামধন্য ব্যক্তি নয় যে, মেয়েরা সব ওর শালী হবার জন্যে ঝুলোঝুলি করবে।

স্ত্রী দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, আমি বলছি, হারাণকে হাত করবার জন্যে ও মিথ্যে বলেছে। তুমি যে রকম আনাগোনা করছ, তোমাকেও ও বিপদে ফেলবে ব'লে দিচ্ছি। সাংঘাতিক মেয়েমানুষ ও। মুচকি হাসিয়া কটাক্ষ হানিয়া কহিলেন, যদি জড়িয়ে-টড়িয়ে ধরে তো কনে-বউয়ের মত আমি ছাড়িয়ে আনতে পারব না, ব'লে দিচ্ছি। মজাটা টের পাবে তখন।

১৩

দিন চার অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলাম। বিভাগীয় সহকারী ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামের স্কুলে ইঁহাদের আগমন উপলক্ষ্যে প্রধান-শিক্ষককে যে কি অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া কেহ বুঝিবেন না। স্কুল-গৃহের সারাবৎসরের পুঞ্জীকৃত আবর্জ্জনা পরিষ্কার করানো, ভাঙা বেঞ্চি, চেয়ার ও টেবিলগুলি মেরামত করানো, স্কুলের খাতাপত্র সারা, ছাত্রদিগকে আদব-কায়দা শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষকদিগের পোশাক-পরিচ্ছদের পরিচ্ছন্নতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা, প্রত্যেক ক্লাসে শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য শিক্ষকদিগকে উপদেশ দেওয়া, ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের আদর-আপ্যায়ন ও আহারের ব্যবস্থা করা, এবং অনিবার্য্য ত্রুটিগুলি যাহাতে ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়ের শ্যেন-দৃষ্টি এড়াইয়া যাইতে পারে, সেই-জন্য তাঁহার বিদায়গ্রহণ পর্য্যন্ত দুর্গানাম জপ করা ইত্যাদি সকল কার্য্যই প্রধান-শিক্ষকেই করিতে হয়। কাজেই এ কয়দিন গ্রামের কোন খোঁজ-খবর রাখার ফুরসৎ হয় নাই। গাঙুলী মহাশয় স্কুলে

আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইন্‌স্পেক্টর সাহেব চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কখন চলিয়া আসিয়াছিলেন, জানিতে পারি নাই।

সেই দিন স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিবার পর পত্নী কহিলেন, সাহেব চ'লে গেল?

আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলাম, গেছে। সাহেব নয়, ফাঁড়া; তা এক রকম কেটে গেছে, বছর খানেকের জন্যে এখন নিশ্চিন্ত।

স্ত্রী কহিলেন, মুখ-হাত ধুয়ে নাও, খাবে না?

কহিলাম, চা-খাবার স্কুলে খেয়ে এসেছি, এখন আর খাব না। একটু চা দেবে তো দাও।

আচ্ছা।—বলিয়া পত্নী রান্নাঘরের দিকে গেলেন; আমিও রাজবেশ ছাড়িয়া রাখাল-বেশ ধারণ করিলাম। ইতিমধ্যে পত্নী চা আনিয়া হাজির করিলেন। খাইতে খাইতে কহিলাম, চোখে কানে কদিন দেখতে শুনতে পাই নি। গাঁয়ের কি কি খবর বল দেখি?

পত্নী কহিলেন, ভারী মজার মজার ব্যাপার সব চলছে গাঁয়ে।

উৎসুক কণ্ঠে কহিলাম, কি?

পত্নী কহিলেন, এক নম্বর, পদ্মর মূর্চ্ছা।

মানে?

ভাত খাবার পর সদু দিদিমার বাড়িতে গাঁয়ের বিধবাদের যে একটা আড্ডা বসে, সেখানে পরশুর আগের দিন পদ্ম গোবিন্দকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, ছুঁচোর চাকর চামচিকে—তার মাইনে চোদ্দ সিকে।

কহিলাম, এ কথা বলার অর্থ?

অর্থ বুঝতে পারছ না? গোবিন্দর ভাই তিনু যে ফুন্টিকে পড়ায় কিনা, তাই।

তারপর?

শুনে গোবিন্দ ফোঁস ক'রে উঠে বললে, শুধু আমার ভাই চামচিকে? আর তোর ছেলে? পদ্ম হাত নেড়ে বললে, সে বলতে হয় না, তেমন ছেলে গর্ভে ধরি নি, আমার ছেলে সরকারী চাকরে। গোবিন্দ মুখ ভেংচিয়ে বললে, সরকারী চাকরে! তবু যদি না প্রবোধ গাঙুলীর বউয়ের দিনরাত মাথা না টিপত। পদ্ম লাফিয়ে উঠে বললে, খবরদার

বলছি, আমার ছেলের নামে যা-তা বলবি না। জিব কেটে দোব। গোবিন্দও লাফিয়ে উঠে বললে, জিব সবাই কাটে! তোরও খ্যাঁদা নাক বুঁচিয়ে দোব না! দেখে আয়গে যা, বিশ্বেস না হয় তো! পদ্ম গোবিন্দর হাত ধ'রে টেনে বললে, আয়, দেখাবি চল। যদি দেখাতে পারিস, সবাইকার সামনে মাঝ-উঠোনে ঘ'ষে ঘ'ষে সাত হাত নাকখত দোব; আর যদি দেখাতে না পারিস, তোর মুখে গুনে গুনে সাতবার মুড়ো ঝাঁটা মারব। তারপর দুজনে চলল প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ি; সদর-দরজা খোলা ছিল; ওরা ঢুকে একেবারে উঠল দোতলায়। পা টিপে টিপে গিয়ে দেখে, সরোজিনী বিছানায় শুয়ে আছে। প্রকাশ মাথার কাছে ব'সে সরোজিনীর মাথায় হাত বুলোচ্ছে, আর সরোজিনীর পাশে, প্রকাশের মুখোমুখি ব'সে, পাখা করছে মিণ্টা।

ঔৎসুক্যের সহিত কহিলাম, তারপর?

দেখে, পদ্ম চেঁচিয়ে উঠে বললে, তাই তো লো! আমার ননীর পুতুল রাক্ষুষীদের গহ্বরে ঢুকেছে!—ব'লে ছুটে পালিয়ে এল।

সাত হাত নাকখত দেওয়ার কি হ'ল?

আর নাকখত দেওয়া! এসেই ধড়াস ক'রে প'ড়ে পদ্ম মূর্চ্ছা গেল। তখন গোবিন্দই গিয়ে প্রকাশকে ডেকে নিয়ে এল।

তারপর?

প্রকাশ ওষুধ শোঁকাতেই পদ্ম ভাল হয়ে উঠে ব'সে, কাঁদতে শুরু ক'রে দিলে। প্রকাশ বললে, চল, বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। পদ্ম কেঁদে বললে, না, আমি যাব না, তুই আগে আমার পা ছুঁয়ে বল, ওখানে আর যাবি না। প্রকাশ বললে, আমি তো নিজে যাই নি, ডাক্তারবাবু আমাকে যেতে বলেছেন। পদ্ম বললে, সে মুখপোড়া নিজে না গিয়ে তোকে পাঠিয়েছে কেন?

আমি বাধা দিয়া কহিলাম, আমারও ঐ প্রশ্ন, তার নিজেরই তো যাওয়া উচিত ছিল!

পত্নী হাত নাড়িয়া কহিলেন, সবাই তো আমার মত হাবা-গোবা মেয়ে নয়। ওঁর গিন্নী নিশ্চয় ছাড়ে নি।

কহিলাম, ও তো তোমার জবাব, প্রকাশের জবাবটা কি হ'ল?

প্রকাশ বললে, তাঁর শরীর খারাপ, কদিন কোথাও বেরোন নি। তা ছাড়া আমি তো বিনা পয়সায় যাচ্ছি না। আমাকে রীতিমত টাকা দিচ্ছে। পদ্ম রেগে বললে, ও টাকার মুখে আমি ঝাঁটা মারি, তুই কিছুতেই ও বাড়িতে পা দিতে পাবি না, দিলে আমি দেশান্তরী হব। প্রকাশ চুপ ক'রে রইল। তখন পদ্মর বন্ধুরা প্রকাশকে বোঝাতে লাগল। প্রকাশ বেঁচে থাকলে অনেক টাকা রোজগার করবে, ও রকম একটা নষ্ট-দুষ্ট মেয়ের কাছে যেয়ে পদ্মর মত মায়ের মনে কষ্ট দেওয়া প্রকাশের মত সুসন্তানের উচিত নয়। প্রকাশ শেষে বললে, বেশ, যাব না। তুমি বাড়ি চল। তারপর পদ্মকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে প্রকাশ চ'লে এল।

আবার সরোজিনীর বাড়ি?

না, ডাক্তারখানায়। পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রে আর কি যেতে পারে?

কহিলাম, তোমার দু নম্বর খবর বল এবার।

পত্নী হাসিয়া কহিলেন, সেও ভারী মজার। পরশু দুপুরবেলায় হঠাৎ গোবিন্দ এসে হাজির হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি গো ঠাকুরঝি, কি খবর? গোবিন্দ খুঁট থেকে একটি মোড়ক-করা কাগজ খুলে আমার হাতে দিয়ে বললে, দেখ তো, কে লিখেছে? বললাম, কার চিঠি? বললে, তিনুর বোধ হয়, ফুণ্টির ভাই দিয়ে গেল। বললাম, তিনু তো দিনরাত ওখানেই থাকে, তা আবার চিঠি পাঠানো কেন? গোবিন্দ বিরক্ত হয়ে বললে, তুমিও ঐ কথা বলছ বউ! দিনরাত ওখানে থাকবে কিসের দুঃখে? গরিব হ'লেও মাথা গোঁজবার জায়গা ওর আছে। বললাম, না ঠাকুরঝি, আমি কিছু ভেবে বলি নি। গোবিন্দ বললে, তুমি হয়তো বল নি, কিন্তু সবাই তো বলছে। দু পয়সা পাবে ব'লে সবাইকার বুক চড়চড় করছে, তাও এখনও এক পয়সা ঘরে ঢোকে নি। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, তাও তো কাল সারাদিন ঘরেই ছিল, ওদের বাড়ি যায় নি।

চিঠিটা প'ড়ে আকাশ থেকে পড়লাম।

প্রশ্ন করিলাম, কেন?

পত্নী কহিলেন, চিঠি নয়—প্রেমপত্র, ফুন্টি লিখেছে—তিনুকে। পাঠ লিখেছে—প্রাণের মাস্টার মশায়। নীচে লিখেছে—তোমারই জীবনে-মরণে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তিনেটা এর মধ্যেই খুব শিখিয়েছে তো! একেবারে প্রেমপত্র-লেখা অবধি! মেয়েদের লেখাপড়ার চরম শিখিয়ে দিয়েছে একেবারে।

পত্নী সহাস্যে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন। চিন্তার ভান করিয়া কহিলাম, কিন্তু ফুন্টি যে তিনুকেই লিখেছে, তা নাও হতে পারে। হয়তো তিনু ওকে লিখতে দিয়েছিল। ফুন্টি লিখে, কেমন হয়েছে দেখবার জন্যে তিনুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিল।

পত্নী কহিলেন, তোমার তো ঐ রকমই বুদ্ধি কিনা। তিনু লিখতে-টিখতে দেয় নি। ও পুরো একদিন সরোজিনীর বাড়ি যায় নি; ওকে এতক্ষণ না দেখতে পেয়ে ফুন্টির বিরহ-আগুন দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে উঠেছিল, তাই পত্রপাঠ দেখা দিয়ে আগুন নেবাবার জন্যে তিনুকে চিঠি লিখেছিল।

কহিলাম, তাই নাকি! ফুন্টি একফোঁটা মেয়ে, তার এই কাণ্ড!

একফোঁটা মেয়ে! ষোল বছরের ধাড়ী। বুকের ভেতরটা এখন একেবার বারুদের মত হয়ে আছে যে। পুরুষের ছোঁয়াচ লাগলেই দপ ক'রে জ্ব'লে উঠবে; তুমি পড়াতে গেলেও ও তোমার প্রেমে প'ড়ে যেত।

কথাটা উল্টাইয়া দিয়া কহিলাম, তিনুর মানসিক অবস্থার কোন খবর জান?

পত্নী কহিলেন, বলছি। গোবিন্দকে বোঝালাম, সরোজিনীর চিঠি—তিনু কাল পড়াতে যায় নি কিনা, তাই যেতে লিখেছে। তিনু বোধ হয় কোন কারণে রাগ করেছে। গোবিন্দ চোখ কপালে তুলে বললে, বিধবা মেয়ের ওপর রাগ আবার কি বউ? ভাল কথা নয়। তিনুকে আর আমি যেতে দোব না। থাক আমার রোজগার।

বললাম, না না, ওসব কিছু নয়। তুমি তিনুকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও। চিঠিটা আমার কাছে থাক, আমি বুঝিয়ে দোব।

প্রশ্ন করিলাম, তিনু এসেছিল?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হুঁ, সেই দিন বিকেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলে। জিজ্ঞেস করলাম, পড়াতে যাচ্ছ না কেন? তিনু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, আপনি জানলেন কি ক'রে? বললাম, সে জেনেছি যেমন ক'রে হোক, না যাবার কারণটা কি শুনি? তিনু একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, ফুন্টি বারণ করেছে। আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন? তিনু একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, সরোজিনী দেবীর কদিন ধ'রে দিন-রাত ঘন ঘন মূর্চ্ছা হচ্ছিল। তাই তাঁর কাছে থেকে সেবা করতে হয়েছিল। বললাম, সে তো উচিত কাজই করেছিলে, তাতে ফুন্টি বারণ করলে কেন? একটু ইতস্তত ক'রে তিনু বললে, মানে, আমি একা তো নয়, মিন্টাও করছিল; একরাত্রি তো দুজনকেই জাগতে হ'ল। ফুন্টি জাগতে না পেরে ঘুমিয়ে পড়ল, তার পরের দিন সকালেই ফুন্টি হঠাৎ রেগে উঠে বললে, পিসীমা ভাল না হ'য়ে ওঠা পর্য্যন্ত আমি পড়ব না। আপনি এ কদিন আসবেন না। হেসে বললাম, ফুন্টি যদি পছন্দ না করে তো মিন্টার সঙ্গে রাত জাগবার দরকার কি? তিনু বললে, ফুন্টি পছন্দ করবে না ব'লে আমি আমার কর্ত্তব্য করব না? বললাম, বুকে হাত দিয়ে বল দেখি, ফুন্টি রাগ করলে তোমার কিছু যাবে-আসবে না। তিনু চুপ ক'রে রইল। বললাম, এই চিঠি নাও, ফুন্টি তোমাকে লিখেছে; রাগ ক'রে পুরুষত্ব না দেখিয়ে, তাকে ভোলাওগে যাও, আর তাড়াতাড়ি বিয়ে করগে।

তারপর?

তারপর আর কি? তিনু শুনছি, সেই দিনই ওখানে গিছল, আর বিয়েরও নাকি কথাবার্ত্তা হচ্ছে।

কি ক'রে জানলে?

গোবিন্দ আজ ব'লে গেল, মনু চক্রবর্ত্তী ওর সঙ্গে দেখা ক'রে বিয়ের কথাবার্ত্তা ক'য়ে গেছে।

গাঙুলী মশায়ের সহিত দেখা করিতে গেলাম। বৈঠকখানায় বসিয়া ইহার মধ্যেই লণ্ঠন জ্বালাইয়া ইউনিয়ন বোর্ডের খাতাপত্র সারিতেছিলেন,

আমাকে দেখিয়া কহিলেন, এস ভায়া। তখন তোমাকে বলবার সময় হ'ল না, এস. ডি. ও. সাহেব আসছেন আসছে রবিবার।

কহিলাম, ইউনিয়ন বোর্ড দেখবেন নাকি?

তা দেখতে চান, দেখাব। খাতাপত্র সব ঠিক ক'রে রাখছি। চোখ মটকাইয়া কহিলেন, কি জন্যে আসছেন, জান? আমাদের সেই দরখাস্তটার তদন্ত করতে। আমাদের হুজুর নিজে গিয়ে সব বলেছেন তো। ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, ভায়া, নেকড়ে হ'লেও বাঘ তো! মুখ শোঁকাশুঁকি আছেই।

ওরা দরখাস্ত করে নি?

গাঙুলী মশায় নাসিকা উঁচাইয়া কহিলেন, করলেই বা। মুরুব্বী তো ওদের দারোগা। দরখাস্ত পাবামাত্র ছিঁড়ে ফেলে দেবে।—বলিয়া কাল্পনিক দরখাস্তটি দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার ভঙ্গি করিলেন। তারপর ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, কিচ্ছু হবে না। কবে বুড়ীকে কাঁধে ক'রে পৌঁছে দিয়ে যায় দেখ।

বাড়ি ফিরিবার রাস্তায় মণীন্দ্রর সঙ্গে দেখা হইল। পরিধানে সাদা জিনের গলাবন্ধ কোট, পায়ে মেটে রঙের বাটার তৈয়ারি ক্যামবিসের জুতা, বগলে ছাতা, আমাকে দেখিয়া হাঁক দিয়া কহিল, কোথায় যাওয়া হয়েছিল—অ্যাঁ? গাঙুলীর আড্ডায় বুঝি? ওই তোমার মাথা খাবে দেখছি।

জবাব না দিয়া কহিলাম, কোথায় গিছলে?

আমার মুখের দিকে তাকাইয়া ভ্রূ দুইটি নাচাইয়া কহিল, বলব কেন? সবাইকে সব কথা বলতে আছে কি?—বলিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। আমিও সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। হঠাৎ মণীন্দ্র বলিয়া উঠিল, সব ব্যাটার গুড়ে বালি দিয়ে এলাম।

চুপ করিয়া থাকিয়া চলিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে মণীন্দ্র আবার বলিয়া উঠিল, হিন্দুর অনিষ্ট করতে হিন্দুর জোড়া আর নেই; মুসলমানরা ঢের ভাল।—মণীন্দ্র বোধ হয় দারোগাবাবুর কথা বলিতেছে। কিন্তু কথাটি তো সত্য। সরোজিনী গ্রামে আসার পর হইতেই, গ্রামের ছোকরারা ছাড়া সব হিন্দুধর্ম্মধ্বজীরাই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে; শুধু দারোগাবাবু, বিধর্ম্মী হইয়াও, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি বা হৃদয়-বৃত্তি যাহারই তাগিদে হোক, সরোজিনীর স্বপক্ষে দাঁড়াইয়াছেন।

মণীন্দ্র হঠাৎ আমাকে প্রশ্ন করিল, হ্যাঁ হে মাস্টার, এস. ডি. ও. সাহেবকে যে ওরা দরখাস্ত করেছে সরোজিনীর বিরুদ্ধে, সেটা তো তোমার লেখা, নয়?

থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, কে বললে?

মণীন্দ্র কহিল, কে আবার বলবে? আমি বললাম—

আর্ত্তকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, কাকে বলেছ?

মণীন্দ্র বেপরোয়াভাবে কহিল, কেন? এস. ডি. ও. সাহেবকে, জিজ্ঞাসা করছিলেন কিনা! তা এম. এ. পাস ক'রে এত ভুল লিখেছ কেন? সাহেব চোখ-মুখ কুঁচকে একাকার।

আমি কড়া গলায় কহিলাম, দেখ মন্থদা, তুমি অত্যন্ত বোকা। কি ক'রে জানলে তুমি, আমি লিখেছি?

মণীন্দ্র জবাব দিল, গাঁয়ে তোমার ছাড়া ইংরিজীতে দরখাস্ত লেখার বিদ্যে আর কার আছে?

মুখ ভেংচাইয়া কহিলাম, বিদ্যে আর কার আছে! কেন, তোমাদের মামাবাবুটি এসেছে, ও লিখতে পারে না?

মণীন্দ্র আকাশ হইতে পড়িল। চোখ বড় করিয়া, ঘাড় কাত করিয়া কহিল, ঠিক ধরেছ তো! ঐ ব্যাটারই তো লেখা। তাই তো বলি, আমাদের মাস্টারের মত বিদ্বান লোক—ছি ছি! হাকিম কি ভাবলেন বল দেখি? আমাকে মনে করিয়ে দিতে হয়।

মনে করিয়ে দিতে হয়! আমি কি তোমার সঙ্গে গিয়েছিলাম নাকি?

অনুতাপের সুরে মণীন্দ্র কহিল, তাই তো, তুমি সঙ্গে থাকলে ঠিক হ'ত।—বিরক্তির সহিত কহিল, বললাম তখন সরোজকে, মাস্টারকেও ধ'রে নিয়ে যাই। বললে, না না, যাকে-তাকে নিয়ে গিয়ে কাজ নেই।

যাকে-তাকে কথাটা খচ করিয়া মনের গায়ে বিঁধিল। সরোজিনীর আদর-আপ্যায়ন তাহা হইলে মৌখিক, অন্তরে সে আমাকে পর বলিয়াই জানে।

মণীন্দ্র ক্ষোভের সহিত কহিল, ব্যাটার নামটা ক'রে দিলে কত কাজ এগিয়ে যেত বল দেখি? তোমার নাম করাটা ভাল হয় নি। ভাবলে, মাস্টারের মত লোক ও-দলে আছে! যেমন ক'রেই হোক, এম. এ. পাস করেছে তো। আবার নিজেই প্রবোধ মানিয়া কহিল, যাকগে, ওতে কিছু হবে না। তোমার ইংরিজী প'ড়েই—

ধমক দিয়া কহিলাম, আবার বলছ, আমার ইংরিজী?

মণীন্দ্র থতমত খাইয়া কহিল, আরে না না, তোমার ইংরিজী নয়, কিন্তু সাহেবকে বলেছি তো তোমার ইংরিজী, সেইটাই সে বুঝে ব'সে আছে। কিন্তু থাকগে ব'সে, তুমি তো জান, তোমার লেখা নয়। কিন্তু বাজে কথা যাক, আজ আজিজ সাহেব খুব উপকার করেছে ভাই, আমরা দু ভাই-বোনে চিরদিন তার কাছে কেনা হয়ে থাকব। অন্যমনস্ক-ভাবে চুপ করিয়া রহিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, আজিজ সাহেবকে জান না? ঐ যে হে, চপাইয়ে বাড়ি, মস্ত বড়লোক, জমি-জায়গা পুকুর-বাগান বিস্তর; নিজ জোতেই তো দুশো বিঘে জমি; বিশ জোড়া বলদ, ছাগলের মত নয়, প্রকাণ্ড—এক-একটা যেন হাতি; গাই-বাছুর যে কত, তার ইয়ত্তা নেই। আর খামার যদি দেখ তো হাঁ ক'রে চেয়ে থাকবে, ধানের মরাইয়ে ঠাসা, পা ফেলবার জায়গা নেই।

আজিজ সাহেবকে জানি। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সরকারী-মনোনীত সভ্য। এ তল্লাটের একজন অবস্থাপন্ন জাঁদরেল ব্যক্তি; আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডেরও একজন সভ্য।

মণীন্দ্র বলিতে লাগিল, তা ছাড়া খাঁটি মুসলমান, ইয়া চাপদাড়ি, পাঁচ ওখ্‌ত নমাজ করে।

বিরক্তির সহিত কহিলাম, জানি হে, জানি আজিজ সাহেবকে, অত ব্যাখ্যান ক'রে বলতে হবে না। কি করেছে বল না!

মণীন্দ্রও মেজাজের সহিত কহিল, অত ধমক কিসের বল দেখি? ছাত্র পেয়েছ নাকি? যাও, বলব না।—বলিয়া আবার চলিতে শুরু করিল। আমি পিছু পিছু চলিতে লাগিলাম। ভুল ইংরেজীটি আমার লেখা বলিয়া এস. ডি. ও. সাহেব জানিয়াছেন ভাবিয়া মনটা বিরক্তিতে

ভরিয়া গিয়াছিল, কথা কহিতে বা শুনিতে ভাল লাগিতেছিল না। মণীন্দ্র হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ভালয় ভালয় শোন তো সব বলছি। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মণীন্দ্র বলিতে লাগিল, দারোগাবাবু কাল আজিজ সাহেবকে ডেকে সরোজিনীর ওপর গ্রামের লোকের অত্যাচারের সব পরিচয় দিলেন। শুনে আজিজ সাহেবের চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গাল বেয়ে পড়তে লাগল।

কহিলাম, দেখতে পেলে কি ক'রে? নাক চোখ বাদ দিয়ে সারা মুখে তো দাড়ির জঙ্গল।

মণীন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিল, জঙ্গল তো কি হবে? কাঁদলে বোঝা যায় না? গোঁফ-দাড়ি ভিজে সপসপ করছিল যে।

তাই বল।

মণীন্দ্র রাগিয়া উঠিয়া কহিল, অত কথা ধরলে কথা বলা যায় না। শোন না, আজিজ সাহেবের চোখ থেকে জল পড়তে লাগল, বললে যে, সে জান দিয়ে সাহায্য করবে। তারপর দারোগা সাহেব তাকে যা যা করতে হবে, ব'লে দিলেন। ঠিক হ'ল, আমাকে নিয়ে জেলায় গিয়ে ও যথাকর্ত্তব্য সব করবে।

কহিলাম, তারপর?

আজ সকালে গিয়েছিলাম। ভাল উকিল দিয়ে মুসাবিদা করিয়ে দরখাস্ত লেখানো হ'ল, আজিজ সাহেবের সঙ্গে এস. ডি. ও. সাহেবের বাড়ি গিয়ে দরখাস্ত দিলাম। আজিজ সাহেব সমস্ত ঘটনা সাহেবকে বুঝিয়ে বলতে তিনি বললেন, ও পক্ষেরও দরখাস্ত পেয়েছি।—ব'লেই কাগজের তাড়া থেকে তোমাদের দরখাস্ত—

বাধা দিয়া কহিলাম, তোমাদের মানে?

মণীন্দ্র কহিল, বেশ বেশ। ঐ ব্যাটাদের দরখাস্ত প'ড়ে শুনিয়ে দিলেন, শেষে বললেন, রবিবার নিজে এসে তদন্ত ক'রে সব ঠিক ক'রে দিয়ে যাবেন।

কহিলাম, এই বারেই তিনুকে নিয়ে গিয়ে লাইব্রেরির বই-টইগুলো কিনে আনলে না কেন? এস. ডি. ও. সাহেবকে দিয়ে এই বারেই লাইব্রেরিটার উদ্বোধন করিয়ে নিলে হ'ত।

মণীন্দ্র ভারী গলায় কহিল, লাইব্রেরি-টাইব্রেরি ওসব হবে না। সরোজ বলেছে, ও এখন থাক। পরে করলেই হবে। এখন অনেক খরচ। তা ছাড়া তিনুরও ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো আর চলবে না।

আন্দাজে কতকটা বুঝিলাম; তবু প্রশ্ন করিলাম, কেন?

তিনুর সঙ্গে ফুন্টির বিয়ে দোব ভাবছি, সরোজ সব খরচ দেবে।

কহিলাম, ওদের মত হয়েছে?

মণীন্দ্র তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, মত! হাত ধুয়ে ব'সে আছে। ছেলে তো না বলতে বলতেই রাজি।

আর গোবিন্দ?

ঢোক গিলিয়া মণীন্দ্র কহিল, হ্যাঁ, সেও রাজি। ব্যারিং পোস্টে তো আর চালান হচ্ছে না, রীতিমত পয়সা খরচ করা হবে। বললাম যে, সরোজিনী সব খরচ দেবে বলেছে।

প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ির সামনে আসিতেই মণীন্দ্র কহিল, এস না, একবার সরোজিনীর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবে। সেদিন এত বিপদ দেখে গিয়েও তো একবার উঁকি পর্য্যন্ত মার নি। ঢের ঢের নেমকহারাম দেখেছি, তোমার মত দেখি নি। আর ওদিকে গাঙুলী বুড়োর বাড়ি রোজ যাওয়া হচ্ছে।

কহিলাম, দেখ মনুদা, মিথ্যে কথা ব'লো না। ইন্‌স্পেক্টর আসার হিড়িকে নাইতে খেতে সময় পাই নি, লৌকিকতা করব কি?

ওঃ, তাই! তা চল না একবার। এতবড় একটা কন্যাদায় ঘাড়ে চেপে বসেছে। ঘাড় থেকে নামাবার একটা ফন্দি-ফিকির বাতলে দাওগে দেখি, তুমি তো এসব বিষয়ে ওস্তাদ লোক।

সরোজিনীর যাকে-তাকে কথাটা এখনও মনের গায়ে খচখচ করিতেছিল। তাই এড়াইবার জন্য কহিলাম, হ্যাঁ, ওস্তাদ বইকি। কতগুলো মেয়ে পার করলাম এই বয়সে!

তা নাই বা করলে। বুদ্ধি-শুদ্ধি তো আছে? অন্য উপকার তো কোন দিন কর নি, করবেও না, এক-আধটা পরামর্শ দিয়ে উপকার করতেও অনিচ্ছে?

যাইতেই হইল। উঠানে পা দিতেই দেখিলাম, মনুর ও বীরু আচায্যির একপাল ছেলেমেয়ে উঠানে কলরব সহকারে খেলা করিতেছে। রান্নাঘরের দাওয়ায় গোবিন্দ, মিণ্টা ও মনু চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী মুখামুখি বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে।

মণীন্দ্র হাঁক দিয়া কহিল, ওরে কে আছিস, একটা শতরঞ্চি পেতে দিয়ে যা তো। আমাকে কহিল, দাঁড়াও হে মাস্টার, আসছি।—বলিয়া পাশের ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। মণীন্দ্র বিবাহের অছিলায় সপরিবারে এখানে আড্ডা গাড়িয়াছে বুঝিলাম। ফুন্টি আসিয়া একটা ছোট শতরঞ্চি পাতিয়া দিল। আমার সহিত চোখোচোখি হইবামাত্র ফুন্টি লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লইল। তাহার গোপন দুষ্কর্ম্মের কথা আমরা জানিতে পারিয়াছি, ফুন্টি বোধ হয় জানে।

মণীন্দ্র খালি গায়ে আসিয়া কহিল, ব'স হে মাস্টার। দাঁড়িয়ে রইলে কেন? শতরঞ্চিতে বসতে মন সরছে না বুঝি? সাহেব মানুষ তো!

বলিলাম, না না, তা কেন?—বলিয়া জুতা খুলিয়া বসিয়া পড়িলাম।

মণীন্দ্র পরনের কাপড় হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত তুলিয়া দিয়া চৌকস হইয়া বসিয়া আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আজ ভারী ছুটোছুটি করতে হয়েছে। যাক, কাজ এক রকম হাসিল করা গেছে তো। আর বাছাধনদের চুলবুল করতে হবে না।

চুপ করিয়া রহিলাম।

মণীন্দ্র কহিল, আর একদিন আবার গিয়ে বিয়ের জিনিসপত্রগুলো কিনে আনতে হবে।

কহিলাম, তিনুকে নগদ টাকা না দিয়ে কিছু জমি-জায়গা ক'রে দাও না।

মণীন্দ্র বিজ্ঞের মত কহিল, সব হবে। সরোজ যখন রয়েছে, কোন ব্যবস্থার জন্যে কারও মাথা ঘামাতে হবে না।

কিঞ্চিৎ উষ্মার সহিত কহিলাম, কাউকে যখন মাথা ঘামাতে হবে না, তখন আমাকে মিছিমিছি টেনে আনলে কেন?

সরোজিনী আসিয়া হাজির হইল। আমাকে দেখিয়া হাসিয়া

কহিল, দাদা, পথ ভুলে এসেছেন নাকি? বোন পোড়ামুখী একেবারে মরেছে, না এখনও বেঁচে আছে, দেখবার জন্যে?

হাসি দেখিয়া বিগলিত হইলাম না। নীরস কণ্ঠে কহিলাম, ভারী ব্যস্ত ছিলাম কদিন, ইন্‌স্পেক্টর স্কুল দেখতে এসেছিলেন।

সরোজিনী গম্ভীর মুখে কহিল, ওঃ, তাই! তা কাউকে পাঠিয়েও একবার খবর নিতে পারতেন।

কহিলাম, খবর রোজই পাচ্ছি। যাক, ভাল আছ তো?

সরোজিনী কহিল, কই আর ভাল! সেদিন তো প্রায় সারারাতই মূর্চ্ছা হয়েছিল, তার পরদিনও অনেকবার, আজ দুদিন একটু ভাল আছি, দুবার ক'রে হয়েছে মাত্র।

ডাক্তার এসেছিল কোন দিন?

সরোজ ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ডাক্তার তো একদিনও এ বাড়িতে পা দেয় নি। রাধানাথ ঠাকুরপোরা মানা ক'রে দিয়েছে বোধ হয়। তবে প্রকাশ এসেছিল। ভারী ভাল ছেলেটি! ও-মায়ের ছেলে ব'লে মনেই হয় না।

প্রকাশ এখনও আসছে নাকি?

ওর মা নাকি আসতে মানা করেছে। তবু আসে দিন একবার ক'রে, রাত্রে বাড়ি ফেরবার সময়ে।

মণীন্দ্র কহিল, বিনা পয়সায় ভেবো না, রীতিমত ফী দেওয়া হচ্ছে।

সরোজ কহিল, কই আর ফী দেওয়া হচ্ছে! প্রথম দুদিন নিয়েছিল, আজকাল নিচ্ছে না। পকেটে গুঁজে দিলেও ফিরিয়ে দেয়, বলে, আপনার লোকের কাছে ফী নোব কি? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া উচ্ছ্বাসের সহিত কহিল, ভারী ভাল ছেলে, আমাকে মাসীমা ব'লে ডাকে।

প্রকাশ-প্রসঙ্গ বন্ধ করিবার জন্য কহিলাম, তিনকড়িকে দেখছি না?

সরোজিনী হাসিয়া কহিল, জানেন না বুঝি, ফুন্টির সঙ্গে ওর বিয়ের কথা হচ্ছে যে। বিয়ের কথাবার্ত্তার পর থেকে আর লজ্জায় আসে না সব সময়। দুবেলা দুবার খবর নিতে আসে শুধু।

মণীন্দ্র কহিল, মাস্টার বলছে, তিনুকে নগদ টাকা না দিয়ে, জমি দিতে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সরোজিনী কহিল, তোমার যদি তাতেই সুবিধে হয়, তাই কর।

কথাটা উল্টাইয়া দিয়া মণীন্দ্র কহিল, গোবিন্দ এসেছে।

সরোজিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল, তাই নাকি! কোথায়?

মণীন্দ্র কহিল, রান্নাঘরে ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কচ্ছে।

আমার দিকে চাহিয়া সরোজিনী কহিল, আমি ওঁর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কইগে, আপনাদের চা-খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি, না খেয়ে যাবেন না কিন্তু।—বলিয়া আপত্তির অবসর না দিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

নিরঙ্কুশ

পিঙ্গল পাণ্ডুরছায়া রক্তহীন রিক্ত দিনক্ষণ,
ঝ'রে যায় একে একে পীতবর্ণ পাতার মতন।
নিরুপায় বর্ত্তমান; অতীতের শুনি দীর্ঘশ্বাস,
মুছে যায় সব রঙ রাঙা দিন স্বপ্নের আকাশ।
এখানে ফোটে না ফুল, ফলে নাই ফসল সোনার,
বিশীর্ণ বসন্তদিন, বর্ণহীন ভুবন আমার।
হেরি শুধু শূন্যময় সম্মুখেতে ছায়া রাশি রাশি,
নিরন্তর মৃতস্বপ্ন নিরাশার শুনি প্রেতহাসি।

জীবনে অনেক সাধ—দিগন্ত সে দূরে স'রে যায়,
কামনার মায়াদীপ তবু জ্বলে হলুদ শিখায়।
আহত আশারা শুধু ফিরে ফিরে স্বপ্নে কথা কয়,
নিষ্পলক অন্ধ আঁখি অন্ধকারে তবু জেগে রয়।
জীবনে অনেক সাধ—দিগন্ত সে দূরে যায় স'রে,
ঘোরে ফেরে স্বর্ণমৃগ তবু এই স্বপ্নের প্রান্তরে।

মৃণালকান্তি দাশ

বাইশে শ্রাবণ

অনেক শ্রাবণ-দিন—বহু ব্যর্থ বাইশে শ্রাবণ
রিক্তহস্তে ফিরে গেছে ; মিশে গেছে তার প্রতিক্ষণ
প্রীতিহীন মৃত্তিকায়—খ্যাতিহীন, গৌরববিহীন,
পাণ্ডুর, মলিন।

বিবর্ণ শ্রাবণ-দিনে সেই শ্রান্ত আনত আকাশ
কুড়ায়েছে রিক্ততার রুক্ষ পরিহাস
বহুদিন। রেখাহীন রঙহীন বুকে
শরৎ হেমন্ত আর বসন্তের বর্ণচ্ছটা
হেসে গেছে নির্ম্মম কৌতুকে।

তারপর একদিন অকস্মাৎ দিন এল তার
একটি মৃত্যুই শুধু দিল তারে মহিমা অপার।
দীর্ঘদিন পৃথিবীতে পরম গৌরবে বাঁচিবারে
একটি সে মৃত্যু এসে দিয়ে গেল তারে
লক্ষ লক্ষ মানুষের সিক্তপক্ষ্ম আঁখির প্রসাদ,
অশ্রুসিক্ত বন্ধনের স্বাদ।

বাইশে শ্রাবণ সেই উর্দ্ধে তুলি সে মৃত্যুর মসীলিপ্ত কর
রেখে গেল পৃথিবীতে চিরন্তন অক্ষয় স্বাক্ষর।

আহসান হাবীব

গরু

প্রথম দৃশ্য

দেশ—মানবীয় সভ্যতার অন্যতম আদি-লীলাভূমি মধ্য-এশিয়া—থিরঘিজের দিগন্ত-ব্যাপী দীর্ঘ-তৃণাচ্ছন্ন প্রান্তর। মধ্যস্থলে চালকর-টেঙ্গিজ হ্রদ। হ্রদের তীরবর্ত্তী খানিকটা স্থান অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে ঘন-বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা প্রান্তর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।

কাল—প্রাচীন প্রস্তর-যুগের শেষ সহস্রক।

পাত্র—একদল প্রাগৈতিহাসিক মানুষ। একপাল প্রাগৈতিহাসিক কুকুর। এবং একপাল প্রাগৈতিহাসিক গরু।

মানুষে ও কুকুরে বহুপূর্ব্বেই বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছে। উভয়ে একসঙ্গে শিকার করিয়া থাকে। মানুষই কুকুরের সহিত, কি কুকুরই মানুষের সহিত যাচিয়া বন্ধুত্ব করিয়াছিল তাহা গবেষণার বিষয়। তবে পশু-মনস্তত্ত্ববিদরা কুকুরকেই মানুষ অপেক্ষা অধিকতর মিশুক বলিয়া মনে করেন। অতএব কুকুরই গায়ে পড়িয়া মানুষের বন্ধু হইতে চাহিয়াছিল, ইহাই সম্ভব। এখনও আমরা কাহারও গায়ে-পড়া ভাব দেখিলে কুকুরের সহিত তাহাকে উপমিত করি।

যাহা হউক, একদা একদল মানুষ (নর ও নারী) ও একপাল কুকুর (পুং ও স্ত্রী) একপাল গরুর (পুং ও স্ত্রী) পশ্চাদ্ধাবন করিয়া টেঙ্গিজ-হ্রদের ধারে উপস্থিত হইয়াছিল। গরু, কুকুর এবং মানুষ সকলেই পরিশ্রান্ত হইয়া যথাক্রমে তৃণভূমিতে, বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে এবং হ্রদতীরবর্ত্তী বৃক্ষশ্রেণীবেষ্টিত স্থানে আশ্রয় লইল। মানুষেরা চর্ম্ম-নির্ম্মিত তাঁবু খাটাইয়া ফেলিল।

পরদিন। সূর্য্য উঠিতেছে। হ্রদের জল গলিত স্বর্ণের মত জ্বলিতে লাগিল। কুকুরেরা ঘেউ ঘেউ শব্দে জাগিয়া উঠিল। সূর্য্যের কিরণ গাছের ফাঁকে ফাঁকে ভূমিতলে প্রতিহত হইতেই মানুষেরা মহান কলরব করিয়া গাত্রোত্থান করিল। রৌদ্রস্নাত তৃণ-প্রান্তরে গরুরাও সমস্বরে হাম্বারব করিয়া উঠিল। ত্রয়ীর সমবেত ধ্বনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রকম্পিত হইল।

তারপর মানুষ, গরু ও কুকুর তদানীন্তন স্ব-স্ব অভ্যাস অনুযায়ী প্রাতঃকৃত্য সম্পাদনে রত হইলে সহসা প্রাগৈতিহাসিক নারী-কণ্ঠের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। অমনই এক-প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত অবধি মানুষের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গেল।

১ম (পুং)। লে-লে-লে-লে-লে-হো-ও-ও-অ-অ-অঃ।

২য় (স্ত্রী)। লি-লি-লি-লি-লি-হে-এ-এ-অ্যা-অ্যা-অ্যাঃ।

বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে দলে দলে নরনারী বাহির হইয়া তৃণ-প্রান্তরের প্রান্তে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

২য়। অ্যাঃ, দেখেছিস, মেরে ফেলেছে!

১ম। শিং বিঁধিয়ে দিয়েছে শালা গরু।

৩য়। ঐ—ঐ!

৪র্থ। তেড়ে আসছে, বাবা গো!

৩য়। গাছে চড়, গাছে চড়।

তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্যে ৪র্থ ব্যক্তি গাছে চড়িল।

২য়। মার—মার।

৩য়। মার—মার।

বিশ-পঁচিশজন মানুষ যূথ-ভ্রষ্ট গরুটাকে বৃত্তাকারে ঘিরিয়া ফেলিল এবং শাণিত পাথরের ছুরি ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল।

১ম। মার শালাকে।

৪র্থ। (গাছের উপর হইতে) মার শালাকে।

৫ম। পালা—পালা সব।

সকলে সচকিত হইয়া তাকাইল, দেখিল, কয়েকটি বন্য গরু ছুটিয়া আসিতেছে।

১ম। ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ।

২য়। ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ।

৪র্থ। (গাছের উপর হইতে) ঘেউ—ঘেউ—ঘেউ।

অমনই "ঘেউ ঘেউ ঘেউ" শব্দ করিতে করিতে কুকুরের পাল ছুটিয়া আসিল। মানুষেরা গাছে চড়িয়া গরুদের উপর প্রস্তর-বর্ষণ করিতে লাগিল। কুকুরেরা গরুদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ভীষণ সংগ্রাম শুরু হইল। নরহত্যাকারী গরুটি ও অপর দুইটি গরু শীঘ্রই ধরাশায়ী হইল। অন্যান্য গরুরা রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। কুকুরেরা একটি গরুর মৃতদেহ লইয়া ভোজ শুরু করিল। প্রসঙ্গত বলিতে চাই, ইহাই প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাসে যুগান্তকারী 'ব্যাট্‌ল ফর ডমেষ্টিকেশন অব ক্যাট্‌ল' নামে সুবিখ্যাত।

১ম। পালাচ্ছে ব্যাটারা।

২য়। এখন নাব।

৩য়। নেবে পড়, নেবে পড়।

সকলে নামিয়া পড়িল।

৩য়। আগুন ধরা।

১ম। মাটি খোঁড়

কয়েকজন অদূরে মৃত নারীদেহকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। একজন কবর খুঁড়িতে লাগিল। ১ম ব্যক্তি অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা মৃতদেহের উপর প্রাক্-সমাধি ইন্দ্রজাল-কৃত্য সম্পন্ন করিল। অপর কয়েকজন শুষ্ক পত্র ও কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আগুন ধরাইল। দুইজন ব্যক্তি একটি গরুর মৃতদেহকে টানিয়া আনিয়া আগুনে ফেলিল। তখন নরনারী সকলে মিলিয়া তদানীন্তন প্রথানুযায়ী উন্মত্তবৎ 'প্রাগশন-নৃত্য' আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—সিন্ধুনদতীরবর্ত্তী একটি আর্য্য-জনপদ।
কাল—বৈদিক যুগ।
পাত্র—অগ্নিযাজী, সোমপায়ী, বেদাধ্যায়ী প্রভৃতি।

প্রস্তর-যুগ হইতে বৈদিকযুগের মধ্যে অনেক কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। গরুরা গৃহপালিত জন্তুতে পরিণত হইয়াছে। মানুষ কৃষিকার্য্য শিখিয়া ফেলিয়াছে। ক্ষেত্রে কাজ করে এবং মাংস ও দুগ্ধ দান করে বলিয়া মানুষ এখন গরুকে অমূল্য সম্পদ জ্ঞান করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুকুরের সহিত মানুষের বন্ধুত্বের অবসান ঘটিয়াছে। কুকুরকে সে এখন স্নেহ করে বটে, কিন্তু সেই স্নেহের সহিত কিছু পরিমাণ দয়া, করুণা ও ঘৃণাও করে। কেন না, এখন সে অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। নিজের শক্তি ও মহত্ত্ব বিষয়ে মানুষ যথেষ্ট সচেতন হইয়া পড়ায় গরুকেও সে ক্রীতদাস বলিয়া মনে করে, এবং তাহার প্রতি ক্রীতদাসের মতই আচরণ করে। মধ্য-এশিয়া হইতে ভারত আগমনের সময় বহুসংখ্যক গরু তস্কর কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হয় এবং প্রবল শীতে মারা পড়ে। তাই খাদ্য হিসাবে গরুর ব্যবহার কমিয়াছে। উৎসবাদি উপলক্ষ্যেই শুধু তাহাকে খাদ্য হিসাবে স্মরণ করা হয়। কিন্তু উৎসব প্রায় প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

সিন্ধুতীরবর্ত্তী তপোবন-সদৃশ একটি গৃহ। প্রাঙ্গণের পার্শ্বে গো-দোহনরতা প্রিয়দর্শিনী আর্য্য-দুহিতা। অদূরে দ্রাবিড় পরিচারক গোবৎসকে ধরিয়া রাখিয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে সদ্যস্নাত গৃহস্বামী অগ্নিযাজী হবিঃ-সংযোগে যজ্ঞে রত।

অ। ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভির্ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
সদেবাঁ এহ বক্ষতি ॥

হঠাৎ গরুটি ডাকিতে ও পা ছুঁড়িতে আরম্ভ করিতেই দুধের মৃন্ময়পাত্র ভাঙিয়া সমস্ত দুধ গড়াইয়া পড়িল।

দুহিতা। বাবা, দেখ দেখ, গরুটা কেমন করছে; দুধটা সব ফেলে দিলে।

অ। অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎ পোষমেব দিবেদিবে।
যশসং বীরবত্তমম্ ॥

দু। যগ্যি এখন রাখ। শিগগির এস।

অ। আসছি মা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। অগ্নয়ে স্বাহা।

শেষ আহুতি দিতে দিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এমন সময় গরুটি দুহিতাকে পদাঘাত করিয়া শুইয়া পড়িল ও ছটফট করিতে লাগিল।

অ। তাই তো! ওর হ'ল কি?

অগ্নিযাজী ছুটিয়া গেলেন। বাছুরটিকে ছাড়িয়া দিয়া দ্রাবিড় পরিচারকও গরুর উপর ঝুঁকিয়া পড়িল।

অ। শিগগির আর্য্য সোমপায়ীকে ডেকে নিয়ে আয় তো।

পরিচারক অগ্রসর হইবার পূর্ব্বেই সোমপায়ীকে আসিতে দেখা গেল।

সো। ভো ভো আর্য্য অগ্নিযাজিন্, শীঘ্র একবার চল দেখি। আমার গাভীটা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

অ। আরে ভায়া, আমারটাও কেমন যেন করছে।

সোমপায়ী আসিয়া গরুর সমীপে দাঁড়াইলেন।

সো। আমারটাও ঠিক এমনই ছটফট করতে করতে কেমন যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। চক্ষু বিস্ফারিত, দন্তপাটি সংবদ্ধ, পদচতুষ্টয় প্রসারিত। মুমূর্ষুর লক্ষণগুলো সব পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

অ। এরও তো তাই।

সো। ঠিক এমনই।

অ। কি হ'ল বল দেখি?

সো। তাই তো, তুমিই বল তো ভাই।

দু। বাবা, বাবা, ম'রে গেছে।

সো, অ। তাই তো।

সোমপায়ীর পুত্র ছুটিতে ছুটিতে প্রবেশ করিল।

সো-পু। তাত, গাভীটা অকালাভ করেছে।

অ, সো। তাই তো হে, চিন্তায় ফেললে।

অগ্নিযাজী ও সোমপায়ী চিন্তিত মুখে বিজ্ঞের মত মস্তক আন্দোলন করিতে লাগিলেন; এবং যাজীনন্দিনী ও পায়ীনন্দন পরস্পরের প্রতি কটাক্ষ হানিতে লাগিল

সো। যজ্ঞ কর।

অ। ঠিক।

সো। যাও তো বৎস, সমিধ নিয়ে এস। এই যজ্ঞকুণ্ডেই পঞ্চগব্য দিয়ে যজ্ঞ করা যাক। যাও তো অম্বা, পঞ্চগব্য নিয়ে এস।

যাজী-তনয়া ও পায়ী-তনয়ের বিপরীত দিকে প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে দ্রব্য লইয়া প্রবেশ। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত-সমস্তভাবে আর্য্য বেদাধ্যায়ীর প্রবেশ।

বে। উভয়েই উপস্থিত রয়েছ দেখছি।

অ, সো। ব্যাপার কি?

বে। (উচ্ছ্বাসভরে) আমার নন্দিনীতুল্য গাভীটা ভবলীলা সংবরণ করেছে।

অ। বল কি হে! আমাদেরও যে সেই দশা।

সো। অর্থাৎ, আমাদের গাভীদের।

অ। তাই যজ্ঞ করছি।

সো। গো-মড়ক নিবারণ হবে।

অগ্নিদুহিতা যাজ্ঞীনন্দিনী প্রিয়দর্শিনী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল

অ। হাসছিস যে?

দু। গরুর হয়েছে অসুখ, যজ্ঞ করলে কি হবে?

সো-পু। গরুকে ওষুধ খাওয়াতে হবে।

সো। (পুত্রের প্রতি) অর্ব্বাচীন, গুরুজনসমক্ষে বাচালতা পরিহার করা কর্ত্তব্য—এও শেখ নি!

বে। আধুনিক শিক্ষা পেয়ে আর্য্য-সংস্কৃতি উৎসন্নে দিতে বসেছে সব।

সো। এসব তোমার ওই বেদ-বিরোধী দেব-নিরোধী আকাটমূর্খ অকাল-কুষ্মাণ্ড কণাদের কীর্ত্তি।

বে। তোমার ছেলে তো ওরই কাছে পড়ে?

সো। তা, হ্যাঁ, মানে—

বে। তোমার নন্দিনীও?

অ। হ্যাঁ।

বে। আমার কাছে অধ্যয়ন করতে ব'লে দিও। আমিও বিনা-দক্ষিণায় পড়াব।

সো। অবশ্য। অবশ্য। তা হ'লে তো অতি উত্তম হয়।

বে। যজ্ঞ নিয়ে কৌতুক!

অ। যাক, ক্রোধ সংবরণ কর। এস, যজ্ঞ আরম্ভ করা যাক।

যজ্ঞকুণ্ডের নিকট গমন করিয়া যজ্ঞ শুরু করিল। নন্দন-নন্দনী পরস্পরের প্রতি সহাস্য সকৌতুক সলজ্জ সানুরাগ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে যজ্ঞানুষ্ঠান দেখিতে লাগিল।

সো। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।

বে। অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূবসি।
সইদ্দেবেষু গচ্ছতি॥

সো। অগ্নির্হোতা কবিক্রতুঃ সত্যশ্চিত্রশ্রবস্তমঃ।
দেবো দেবেভিরাগমৎ॥

অ। যদঙ্গদাশুষে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি।
তবেত্তৎ সত্যমঙ্গিরঃ॥

বে, সো, অ। অগ্নয়ে স্বাহা।

দু। বাবা, যতই দুধ-ঘি খাওয়াও, জড়-পরমাণু-সমষ্টি অগ্নিদেব ওসব কিছুই বুঝছেন না।

অ। চুপ কর তো তুই। এর মানে বুঝিস কিছু?

দু। শুনবে? অগ্নিদেবকে ঘুষ দিয়ে তোমরা ভোলাতে চাচ্ছ—হে অগ্নিদেব, তুমি, তোমার উদ্দেশে হবির্দানকারী যজমানের যে মঙ্গলবিধান করিবে, তাহা তোমারই অর্থাৎ তাহা দ্বারা তোমারই সুখসাধন হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই। কেন না, তোমাকে উপাসনা করিয়া যজমান ঐশ্বর্য্যশালী হইলে তাহা দ্বারা উত্তরোত্তর তোমাকে উপাসনা করিতে থাকিবে।

সো। অগ্নিযাজিন্, তোমার দুহিতা বিদুষী বটে।

অ। (প্রসন্ন হাস্যে) তা বটে। যাক, এইবার শেষ আহুতি দেওয়া যাক।

বে, সো, অ। অগ্নয়ে স্বাহা।

পঞ্চগব্যে পাঁচবার আহুতি দিল। এমন সময় কণাদ-প্রমুখ সাত-আটজন নাগরিকের প্রবেশ।

কণা। হাঃ হাঃ হাঃ, তোমরা যজ্ঞ করছ নাকি?

নন্দন-নন্দিনী গুরুদেবকে প্রণাম করিতে তিনি আশীর্বাদ করিলেন।

১ম নাগ। ভালই তো, গো-মড়ক নিবারিত হবে।

বে, সো, অ। অগ্নয়ে স্বাহা।

শেষ আহুতি প্রদান।

অ। কি সংবাদ ?

কণা। গো-মড়ক। তোমাদের গাভীর কুশল তো ?

সো। (মৃত গাভীর প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশে) অবলোকন কর।

সকলে। তাই তো।

কণা। এর প্রতিকারের উপায় চিন্তা করছ ?

বে। এই তো দেখছ, যজ্ঞ করছি।

কণা। তোমাদের বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে বোধ হয়।

১ম না। এ তল্লাটের সব কটা গরুই এখন মারা গেছে।

২য় না। গো-হীন মনুষ্যজাতি কল্পনার অতীত।

৩য় না। দুধের অভাবে শিশুরা মারা পড়বে।

৪র্থ না। মাংসাভাবে যুবকেরা দুর্ব্বল হবে।

৫ম না। গব্যাভাবে যজ্ঞ বন্ধ হবে।

৬ষ্ঠ না। চর্ম্মাভাবে পাত্র ও পাদুকার অভাব হবে।

৭ম না। অতএব আমার মনে হয়, দলবদ্ধ হয়ে আমাদের এস্থান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কণা। তার চেয়ে অন্য স্থান থেকে গরু কিনে নিয়ে আসাই শ্রেয়।

সো। কিন্তু অত গাভী পাওয়া যাবে কোথায় ?

ক। তা বটে।

অ। যে কটি পাওয়া যায়, তাই নিয়ে আসতে হবে। শিশুদের বাঁচাতে হবে তো।

সো। যজ্ঞও করতে হবে।

বে। মাংস-ভক্ষণে বিরত থাকলেই সংখ্যাল্পতায় বিচলিত হবার কারণ থাকবে না।

২য়, ৩য়, ৫ম। সাধু প্রস্তাব।

৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম। কিন্তু মাংসভক্ষণে বিরত থাকাটা যে কতখানি—

২য়, ৩য়, ৫ম। থাকতেই হবে।

সো, অ, বে। আজ থেকে গোমাংস-ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

কণাদ ব্যতীত সকলে। (সমস্বরে) যে গোমাংস ভক্ষণ করবে, সে নিরয়গামী হবে।

ক। হাঃ হাঃ হাঃ, হোঃ হোঃ হোঃ, হাঃ হাঃ হাঃ।

বে। কেন, তুমি এ প্রস্তাব সমর্থন কর না ?

ক। নিরুপায়।

"গোমাংস নিষিদ্ধ" ধ্বনি করিতে করিতে নাগরিকগণ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—ফতেপুর সিক্রী।
কাল—মোগল-যুগ।
পাত্র—বিখ্যাত ঐতিহাসিকযুগল বাদাওনী ও নিজামুদ্দীন।

গোমাংস নিষিদ্ধ হইবার পর কালক্রমে গরু গোমাতারূপে পূজা পাইতে লাগিল। হিন্দুযুগের অবসান পর্য্যন্ত খাদ্যহিসাবে নিষিদ্ধ হওয়ায় গরুদের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটে। পক্ষান্তরে গাঙ্গেয়-উপত্যকার আর্দ্র মৌসুমী-জলবায়ুর প্রভাবে গরুরা শীর্ণকায় ও শ্রমকুণ্ঠ হইয়া পড়িল। গোখাদক পাঠান, ইরানী, তুর্কী, তাতার, মোগল ভারতে আগমন ও রাজত্ব আরম্ভ করায় পুনরায় খাদ্য হিসাবে গোমাংসের প্রচলন হয়। যে সমস্ত হিন্দু ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তাহারা পুনরায় গরু খাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে সমস্ত হিন্দু ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ করিল না, তাহারা পুনরায় গরু খাইতে আরম্ভ করিল না। আকবর মুসলমান-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষেই গোমাংস নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন, যে গোমাংস ভক্ষণ করিবে, তাহার প্রাণদণ্ড হইবে এবং সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইবে।

ফতেপুর সিক্রীর ধনী নাগরিক নিজামুদ্দীনের প্রাসাদের বহিঃ-প্রাঙ্গণ। সম্মুখে সুপ্রশস্ত রাজপথ। প্রাঙ্গণের একাংশে উদ্যান। উদ্যানমধ্যস্থ বেদিকায় অতিথিবর্গ সমাসীন। বাদাওনীর পুত্রের সহিত নিজামুদ্দীনের কন্যার বিবাহের বাক্‌দান-উৎসব উপলক্ষ্যে প্রাসাদটি মুখর ও কর্ম্মচঞ্চল

নিজাম। (জনৈক পরিচারককে) উলুগ এখনও আসে নি ?

পরি। আজ্ঞে না হুজুর।

নি। বড়ই মুশকিলে ফেললে দেখছি। মেহমানরা সব এসে গেছে। এখনও হুকুম পাওয়া গেল না।

বাদা। বাদশার হুকুম আনতে পাঠিয়েছ বুঝি?

নি। হ্যাঁ ভাই। সেই ফজিরে গেছে। এদিকে বেলা বেড়ে চলেছে, না এল হুকুম, না এল বকরা।

বা। তুমিও যেমন। ব্যাটা কাফের—

নি। কে?

বা। কে আবার, বাদশাহ স্বয়ং।

নি। আস্তে দোস্ত, আস্তে।

বা। আমার ভাই খোলসা বাত। শালা কাফেরগুলোর পাল্লায় প'ড়ে গোশ্‌ত্‌ খাওয়া বন্ধ ক'রে দিলে।

নি। আস্তে দোস্ত, আস্তে।

বা। আরে ব্যাটা, তোর গোশ্‌ত্‌ খেতে ভাল লাগে না, তুই খাস না। তাই ব'লে আর পাঁচজনের খাওয়া বন্ধ করবার তোর কি অধিকার?

নি। আস্তে দোস্ত। পাঁচজনে ঘুরে বেড়াচ্ছে; কে কোথায় শুনে ফেলে টুক ক'রে বাদশার কানে গিয়ে লাগাবে।

বা। (আরও উত্তেজিত) লাগাক। খাওয়া বন্ধ করবে, আবার জবানও বন্ধ করবে নাকি! এ কি ইবলিসের রাজত্ব হ'ল নাকি? বাপ! আল্লাতালার রাজত্বে সব সমান। সকলের সমান স্বাধীনতা। আল্লাহ বকরা সৃষ্টি করেছেন খাবার জন্যে; তুই ব্যাটা খোদার ওপর খোদকারী করবার কে?

নি। আহা চ'টো না ভাই, চ'টো না।

বা। চটব না? হাড়ে হাড়ে চটাচ্ছে, চটব না! জৈনরা নিজের বদন খাটিয়ায় বেঁধে খটমল খিলায়, হিন্দুরা গরুকে হারাম মনে করে। তাতে মুসলমানের কি?

অনেকে। যা বলেছেন।

বা। বলব না! হাজারবার বলব। পৈগম্বর হবার সাধ হয়েছে! বামন হয়ে আসমানের চাঁদে হাত!

নি। বাঃ ভাই, বলেছ বেশ। তা আমি কিন্তু হিন্দুদের কোন দোষ দেখি না। তাদের কিতাবে গোশ্‌ত্‌ খেতে মানা।

বা। আমিই কি তাদের দোষ দিচ্ছি নাকি? সব শয়তানির জড় তোমার ওই মুবারক শেখ আর ব্যাটা আবুলফজল। বাপ-ব্যাটা মিলে বাদশাহকে ক'রে তুলেছে দীন-দুনিয়ার মালিক। আল্লাহ আকবরের কি মানে করে ওরা জান?

নি। কি?

বা। আকবরই আল্লাহ! উঃ, কি বেয়াদপি, শালারা আসল শয়তান।

জনৈক পরিচারকের দুইটি বাছুর লইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ।

নি। ওই, ওই, এসে গেছে দেখছি।

পরিচারক আগাইয়া আসিল।

নি। কত দাম নিলে দুটোর?

প। দুশো ফুলুস।

নি। দুশো!

প। জী হুজুর। পহলে তো বেচতেই চায় না। পুছল, কি করবে, জবহ কর যদি, বেচব না। আসলে ব্যাটা দাম বাড়াতে চায়।

বাদা। যাক, নিয়ে যা। দেরি করিস না। জলদি জবহ ক'রে রসুই-ঘরে পাঠিয়ে দে।

পরি। আজ্ঞে, আরজির জবাব না এলে—

বা। দুত্তোর জবাব! আমি দেখে নোব।

নি। না হে, আর একটু দেখাই যাক।

বা। তুমি বড় ডরপোক।

নি। না না, ডরাচ্ছি না, তবে—

বা। তবে কি?

নি। এই, বাদশাহ যদি গোশসা করে—বড় খতরনাক!

বা। কি সাজা দেবে শুনি?

নি। জান না নাকি?

বা। জানি হে, জানি। জান নেবে, মাল ছিনে নেবে—হাঃ হাঃ হাঃ, তুমি বড় ডরপোক দোস্ত।

নি। আচ্ছা, যা।

গোবৎস লইয়া পরিচারকের প্রাঙ্গণে পুনরাবর্ত্তন। অন্য একটি পরিচারক ছুরিকা-হস্তে অগ্রসর হইল। একটিকে জবাই করা হইল। অপরটির গলায় ছুরি বসাইতে যাইবে, এমন সময় রাজপথ হইতে জনৈক অশ্বারোহী রাজপুরুষ তাহা দেখিতে পাইয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল।

রা। ও কি হচ্ছে?

পরি। (ভীত) হুজুর!

রা। জবাই! কার হুকুমে?

প। জী হুজুর।

রা। জী হুজুর! বাদশার হুকুমৎনামা কোথায়?

গণ্ডগোল শুনিয়া বাদাওনী ও নিজামের প্রবেশ। রাজপুরুষের অশ্ব হইতে অবতরণ। রাজপুরুষ ও বন্ধুদ্বয় পরস্পরকে সেলাম জানাইল।

রা। আল্লাহু আকবর।

নি। জল্লা জলালাহু।

রা। এ কি হচ্ছে বক্সী সাহেব?

নি। আজকে ভোজ কিনা!

রা। সে তো বুঝলাম, হুকুম নিয়েছেন?

নি। হুকুম আনতে পাঠিয়েছি।

রা। তাঁর আগেই জবহ ক'রে ব'সে আছেন দেখছি।

বাদা। তাতে হয়েছে কি?

রা। আপনাকে বলা হয় নি।

বাদা। না হোক; বাদশাহ হুকুম না দিলেও আমরা গোশ ত্ খাব।

নি। আহা-হা, থাম ভাই, থাম।

রা। জানেন, এর কি সাজা?

বাদা। জানি খুব ভাল ক'রেই। তোমার বাদশাহকে খবর দাও গিয়ে।

রা। বহুৎ আচ্ছা।

রাজপুরুষ অশ্বারোহণে উদ্যত; নিজামুদ্দীন বাধা দিল।

নি। শুনুন, শুনুন।

রা। বলুন।

নি। গোস্‌সা করবেন না।

রা। বাদশাহের গোলাম হয়ে বাদশাহকে অপমান, এত বড় বে-আদবি!

বাদা। আলবৎ করব। যে অন্যের সম্মান রাখে না, অন্যের ধর্ম্মের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে, অন্যের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করে, যে তৃণাদপি তৃণ, অণু হতে অণু হয়েও আল্লা আর আল্লার রসুলকে অপমান করে, যে—

রা। খবরদার বাদাওনী! আর একটি কথা বলেছ কি গর্দ্দান নোব।

তরবারি নিষ্কাশণ। নিজাম ঝটিতি তরবারি কাড়িয়া লইল। বাদাওনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

নি। চটবেন না কোতোয়াল সাহেব। আসুন, বসবেন।

বাদা। মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা ক'রে নেবেন।

রা। আমার মেজাজ গোশ্‌ত্‌-খাওয়া মেজাজ নয়।

বাদা। গোশ্‌ত্‌ না খেয়েই আপনার যা মেজাজ, খেলে না জানি—

নি। চুপ ভাই, চুপ। আসুন কোতোয়াল সাহেব।

জেব হইতে দুইটি স্বর্ণমোহর বাহির করিল।

নি। এই নিন যৎসামান্য উপহার। আজ আমার ঘরে উৎসব। সবাই খুশ-মেজাজ। আপনি যখন মেহেরবানি ক'রে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন, আপনাকেও খুশি দেখতে চাই।

নিজাম কোতোয়ালের হাতে মুদ্রা দুইটি গুঁজিয়া দিয়া আভূমি সেলাম করিল। রাজপুরুষের মুখে হাসি দেখা দিল। অশ্বারোহণে উদ্যত, এমন সময় উলূগের প্রবেশ।

উলূগ। এই যে হুজুর, বাদশার হুকুমনামা।

নিজাম, বাদাওনী ও রাজপুরুষ একসঙ্গে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। উলূগ বেকুবের মত অপস্রিয়মান রাজপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিল। নিজাম কোতোয়ালের তরবারি দ্বারা তাহার পৃষ্ঠে খোঁচা দিতেই সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। নিজাম ও বাদওনী পুনরায় হাসিয়া উঠিল।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—কলেজ স্কোয়ার।

কাল—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ।

পাত্র—রাম-শ্যাম-যদু ওরফে টম-ডিক-হ্যারি।

ডিরোজিও ও তাৎকালীন শিক্ষার প্রভাবে রাম-শ্যাম-যদু টম-ডিক-হ্যারির ধর্মে দীক্ষালাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তন্ত্রোক্ত পঞ্চ-মকার না হইলেও প্রথম দুইটি মকারের অনুশীলন এই সাধনার প্রধান অঙ্গ। মদ্য-মাংসের মধ্যে মোক্ষ-লাভের মার্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিন্দুর হারাম আর মুসলমানের হারাম দুইই এখন ইংরেজের কৃপায় সুলভ।

রা। জয় ডিরোজিওর জয়।

শ্যা। Eat, drink—

য। And be merry!

রাম তিনটি প্লেট তিনজনের সম্মুখে স্থাপন করিল। তারপর পার্শ্বস্থ একটি ডেকচি হইতে চামচ দিয়া তিনটি প্রকাণ্ড মাংসের টুকরা পরিবেশন করিল।

রা। আরম্ভ হোক।

শ্যা। র'স ভাই, শুধু eat-এ ক্ষিধে মেটে, তৃষ্ণা মেটে না।

ট্রাউজারের পকেট হইতে একটি মদের বোতল বাহির করিল। যদু চাদরের আড়াল হইতে ডিক্যাণ্টার বাহির করিয়া মধ্যস্থলে স্থাপন করিল।

য। এইবার তোমার ভৈরবী-চক্র সম্পূর্ণ হ'ল।

রা। তা হ'লে সাধন-ভজন আরম্ভ হোক।

শ্যা। জয় ডিরোজিওর জয়।

রা। জয় গুরুজীকি জয়।

য। জয় এপিকিউরাসের জয়।

রা। আরে, এপিকিউরাস নয়, ব্যাকাস।

য। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে থাকে না ছাই।

শ্যা। ঐ হ'ল, আসল মাল ঠিক থাকলেই হ'ল। ফর্মের ভুলচুকে কিছু যায়-আসে না।

রা। কেন ফর্মটা কি তুচ্ছ ব্যাপার? ডিরোজিও অ্যারিস্টটলের দর্শন বোঝাতে গিয়ে ফর্ম আর ম্যাটারের সমন্বয়-তত্ত্ব কি সুন্দর বোঝালে, মনে নেই বুঝি?

শ্যা। মনে নেই? একশো বার আছে। এই বোতলটা যদি হয় ফর্ম, মদটা হ'ল ম্যাটার অর্থাৎ বস্তু। এখন বল, ফর্ম খেয়ে তৃষ্ণা মিটবে, না ম্যাটারে?

রা। ছি ছি ডিক, তুমি দর্শনের কিছুই বোঝ না।

শ্যা। আর যত বোঝে আমাদের টমটম।

রা। ধিক ডিক!

য। তোমরা ঝগড়াই কর তা হ'লে। আমি আরম্ভ করি।

গো-গ্রাসে গরুর মাংস গিলিতে লাগিল। রামা-শ্যামা ওরফে টম-ডিক যদুর কর্ম্মতৎপরতায় অনুপ্রাণিত হইয়া হ্যারির হস্তাঙ্ক অনুসরণ করিল।

রা। (চিবাইতে চিবাইতে)। দিস ইজ রিয়াল ম্যাটার অর্থাৎ আসল মাল।

শ্যা। ব্র্যাভো! মাংস হচ্ছে ম্যাটার, মদটা হচ্ছে তার ফর্ম।

রা। তুমিও দর্শন-শাস্ত্র বোঝ দেখছি।

শ্যা। দর্শন মানে সত্য-বস্তু-নির্ণয়। আসল বস্তু যখন জিবে ঠেকিয়েছি, তখন সত্য-বস্তু-নির্ণয় না হয়ে পারে! দর্শন ব'লে দর্শন, দর্শনের উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশ পুরুষও এখন সহজ সরল সুবোধ্য হয়ে গেছে।

রা। (মুখ হইতে একটি হাড় বাহির করিতে করিতে) নাঃ নাঃ, না হে। এখন ফিলসফিই শুধু। মেটাফিজিক্স এখন দুর্ব্বোধ্য। ফিলসফির কারবার বস্তু নিয়ে, প্রত্যক্ষ নিয়ে, সমীক্ষা নিয়ে, বিজ্ঞান নিয়ে। ডিরোজিও কি বললে মনে নেই?

শ্যা। মনে নেই আবার? একশো বার আছে।

রা। বল দেখি?

শ্যা। Philosophy is ths quintessence of sciences।

রা। তোমার স্মৃতিশক্তিটা বড় জোরালো দেখছি।

য। হবে না? পেটে পদার্থ পড়লে মস্তিষ্কের ধূসর-পদার্থ যে বেড়ে যায়, এটাও মনে করিয়ে দিতে হবে নাকি অপদার্থ?

রা। দেখ যেদো, তুই কি বুঝিস ফিলসফির? পড়িস তো ডাক্তারি।

শ্যা। তা ও ডাক্তারি-বিজ্ঞানের বাইরে কথা বলে নি তো।

রা। তা বটে। তুই বলেছিস ঠিক। ডিরোজিও সেদিন বললে—কি বললে যেন শ্যাম?

শ্যা। বললে, বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করা খুবই দরকার।

রা। হিয়ার ইউ আর। তাতে ক'রে তার পক্ষে দর্শন বোঝা হয় সোজা, আবার বিজ্ঞান-শিক্ষাও হয় সার্থক।

য। কেন না দর্শন হ'ল বিজ্ঞানের বিজ্ঞান।

রা। (যদুর পিঠ চাপড়াইয়া)। ব্র্যাভো! ঠিক এই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। দর্শন হ'ল বিজ্ঞানসমূহের সমন্বয়। দর্শন মেটাফিজিক্স নয়। ডিরোজিও ডেমোক্রিট্সের অত্যন্ত ভক্ত, জান শ্যাম?

শ্যা। কণাদ পড়েছ?

রা। না।

শ্যা। প'ড়ে দেখ, হুবহু ডেমোক্রিট্স।

য। কণাদ গোমাংস খেত, গোমাংস নিষিদ্ধ হবার পরও।

রা। তুই জানলি কোত্থেকে?

য। লজিক্যালি। কণাদের মতবাদ থেকে একমাত্র ব্যবহারিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, কণাদ গরু খেত, যজ্ঞ করত না, ঈশ্বর মানত না, অথচ সুনীতি আর মার্জ্জিত রুচির সে ছিল দৃষ্টান্ত-স্থল।

রা। অবাক করলি তুই যেদো! তুই এখন সাহিত্য-দর্শন পড়ছিস, না ডাক্তারি?

য। দর্শনটা একটু আধটু—

রা। একটু আধটু? কি হে শ্যাম! তোমার গাম্ভীর্য্যটা কেমন যেন সন্দেহজনক মনে হচ্ছে! যদুর প্রশংসায় হিংসে হচ্ছে নাকি?

শ্যা। (উচ্চহাস্যে) মনস্তত্ত্বটা আর কলঙ্কিত ক'রো না। দর্শনের আর সব বিভাগকে তো অপবিত্র করেছ—

রা। হয়েছে; Condillac পড়েছ?

য। পড়ছি।

রা। তুই?

য। মানে, শ্যামের কাছে।

রা। আর শ্যাম তোর কাছে পড়ছে শরীরতত্ত্ব। ওঃ, বুঝেছি, ষড়যন্ত্র—ঘোর ষড়যন্ত্র। শ্যাম, ভাল হবে না বলছি। যেদো, তুই একটা মিটমিটে। আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা দুজনে শরীরতত্ত্ব আর মনস্তত্ত্ব স্টাডি করছ—এ ঘোর অন্যায়। বিশ্বাসঘাতক! বন্ধুদ্রোহী! নাঃ, এ দুঃসহ। হা বিধাতঃ, হা শেক্সপীয়র, তুমি ঠিকই বলেছিলে—কি বলেছিল যেন শ্যাম?

শ্যা। Most friendship is feigning,

রা। Most loving mere folly;

য। Then heigh ho! the holly

রা, শ্যা, য। This life is most jolly।

তিনজনে বোতল চাপিয়া ধরিল। পানপাত্র পূর্ণ করিয়া তিনজনে মদ্যপান শুরু করিল।

রা। এইবার মেটাফিজিক্স।

শ্যা। নো, নো, বি মেরি!

য। উইথ এ কাপ অব শেরি।

রা। জয় গুরু।

শ্যা, য। লং লিভ ব্যাকাস।

পুরাদমে মদ্যপান চলিতে লাগিল। সহসা রাস্তার উপর চোখ পড়িতেই রাম লাফাইয়া উঠিল।

রা। পালা, পালা যেদো, তোর বাবা আসছে।

য। বল কি রামদা! লুকোই কোথায়?

যদু মুক্তকচ্ছ হইয়া পশ্চিম-মুখে দৌড়াইল।

শ্যা। ভয় কি হে?

রা। না না শ্যাম, তোমার heroics এখন রেখে দাও। বোতলটা পকেটে পুরে নাও জলদি।

শ্যাম বোতল পকেটে পুরিয়া ও ডিক্যান্টার হাতে পূর্ব্বদিকে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। রাম হাড়গুলি কুড়াইয়া প্লেটগুলি গুছাইতে গুছাইতে বিলম্ব হওয়ায় ভীত হইয়া হাড়গুলি লইয়াই প্রস্থান করিল। এইগুলিই পরে গোঁড়া হিন্দুদের গৃহপ্রাঙ্গণে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। যদুর পিতার প্রবেশ এবং ডেকচি ও প্লেটগুলির সমীপে আগমন।

য-পি। হা বিধাত!

ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়া ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিট্যুট।

কাল—বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক।

নিখিল-ভারত-গোখাদক-মহাসভার অধিবেশনে যোগদানের জন্য দলে দলে লোক হলে প্রবেশ করিতেছে। মহামহোপাধ্যায় ত্রিপিটকাচার্য্য শামসুল-উলেমা অমুকেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য D. D., D. Sc., D. Phil. সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পরনে পাজামা ও হাফশার্ট। মঞ্চের উপর বক্তা ও উদ্যোক্তরা আসীন। সভাপতি-বরণ ও অনেকগুলি বাণী পাঠের পর সভার কাজ আরম্ভ হইল।

সভাপতি। ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ, এই সভা কি উদ্দেশ্যে আহূত হয়েছে, তা আপনারা জানেন। আমরা যারা গরু খাই না, তারা কেন গরু খাব; আর আমরা যারা গরু খাই, তারা কেন গরু খাওয়া বন্ধ করব না, তৎসম্পর্কে আপনাদের কিঞ্চিৎ আলোক বিতরণ করাই এই সভার উদ্দেশ্য। প্রথম বক্তা ঐতিহাসিক দিক থেকে বিষয়টির বিবেচনা করবেন।

১ম বক্তা। বন্ধুগণ, ইতিহাস বিজ্ঞান। অতএব ঐতিহাসিক বিচার

বৈজ্ঞানিক বিচার। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ব হইতে মানুষ গোমাংস ভক্ষণ করিয়া আসিতেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে বৈপ্লবিক "ব্যাট্‌ল ফর ডমেষ্টিকেশন অব ক্যাট্‌ল"-এর পর গরুরা গৃহপালিত জন্তুতে পরিণত হয়। হিন্দুযুগে কৃষি ও বাণিজ্য বিস্তারের ফলে গরুর সংখ্যাল্পতার দরুন গোমাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ হয়। মুসলমান যুগে পুনরায় গোমাংসের প্রচলন হইল। তবে যে সমস্ত হিন্দু মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তাহারা পুনরায় গরু খাইতে আরম্ভ করিল বটে, কিন্তু যে সমস্ত হিন্দু মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিল না, তাহারা পুনরায় গরু খাইতে আরম্ভ করিল না। তাহার পর হইতে গরু হিন্দু-মুসলমানে ভেদ ও বিরোধকে জিয়াইয়া রাখিয়া মনুষ্যজাতির উপর প্রতিশোধ লইতেছে; এবং হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের জীবন্ত প্রতীকরূপে ভারতের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে (হিয়ার হিয়ার)। উনবিংশ শতাব্দীতে গোখাদকদের মহাতীর্থ এই কলেজ-স্কোয়ারে কতিপয় বঙ্গীয়-যুবক ফ্যাশান-হিসাবে গোমাংস ভক্ষণ প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিলে তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের ইতিহাস আপনাদের হাতে। (হাততালির মধ্যে উপবেশন)।

সভা। দ্বিতীয় বক্তা ধর্ম্মনীতির দিক থেকে বিষয়টির আলোচনা করবেন।

২য় বক্তা। বেদে লেখা না থাকলেও, হিন্দুরা গরুকে গোমাতারূপে পূজো ক'রে থাকেন। কিন্তু হিন্দুর বহুদেববাদ পৌত্তলিকতা নয়, এরূপ একটি প্রবাদ আছে। বহুদেববাদ আর সর্ব্বেশ্বরবাদ একটা বিস্কুটেরই দুটো দিক (হিয়ার হিয়ার)। তাই গরুকে দেবতাও বলা হয়, আবার 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'-ফরমুলা অনুযায়ী গরু ব্রহ্মরূপে

কল্পিত হয়। তান্ত্রিকমতে গোমাতা শক্তি। বৈষ্ণবমতে গরু কেষ্টর জীব। বিবেকানন্দের 'জীব শিব' নীতি অনুযায়ী গরু শিব। আবার পৌরাণিকমতে শিবের বাহনও বটে। তা হ'লে দাঁড়াল এই, গরু মাতা, দেবতা, শিব, শিবের বাহন, শক্তি, ব্রহ্ম। এতদূর পর্য্যন্ত বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না; হিং-টিং-ছটের মতই সহজ সরল সুবোধ্য।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, বেরাল-কুকুর, ছাগল-ভেড়া, হাতী-ঘোড়া, ভালুক, গণ্ডার, জেব্রা, জিরাফ, হিপো, ক্যাঙ্গারু; এমন কি মানুষের স্বগোত্র শিম্পাঞ্জী, গরিলা, ওরাং-ওটাং এরা দেবতা নয় কেন? বেরাল-কুকুরকে দূর দূর ক'রে তাড়াই কেন? পাঁঠা আর মোষ বলি দেওয়া হয় কেন? পাঁঠা—

জনৈক শ্রোতা। পাঁঠা হ'ল অজ্ঞান, মোষ অসুর (হিয়ার হিয়ার)।

২য় বক্তা। পাঁঠা আর ভেড়া আর মুর্গী আর বুনোশূয়োর খেতে যদি দোষ না থাকে, গরু খেলেও দোষ নেই। (উপবেশন।)

সভাপতি। তৃতীয় বক্তা—

জনৈক শ্রোতা। আমি কিছু বলতে চাই।

জনৈক উদ্যোক্তা। (সভাপতির কানে কানে) ভদ্রলোক সনাতনী-সভার সেক্রেটারি।

সভা। সনাতনী যুক্তিগুলো আমরা সনাতন কাল থেকে শুনে আসছি ব'লে ভুলে যাই। তাই সনাতনী-সভার সেক্রেটারি মহাশয়কে এই সভায় বক্তৃতার সুযোগ আমরা দোব। তিনি নিশ্চিন্ত হোন। তৃতীয় বক্তা বিষয়টির অর্থনৈতিক বিচার করবেন।

৩য় বক্তা। বন্ধুগণ, যান্ত্রিক-শিল্প ও যান্ত্রিক-বাহনের প্রসারের সঙ্গে ভারবাহী জন্তু হিসাবে গরুদের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশ ক'মে আসছে।

তারা এখন দুধও দেয় কম। মানুষও দারিদ্র্যবশত ভাল খেতে পাচ্ছে না। দুধ, ঘি, মাখন, ছানা দুর্মূল্য, খুব কম লোকেরই জোটে, তাও ভেজাল-মেশানো। গোমাংস খুব সস্তা। অতএব গোমাংস খাদ্য হিসাবে পুনরায় ব্যবহার করা উচিত।

সভা। চতুর্থ বক্তা dietetics অর্থাৎ খাদ্যতত্ত্বে গোমাংসের স্থান নির্ণয় করবেন।

৪র্থ বক্তা। খাদ্যতত্ত্বে গোমাংসের স্থান অতি উচ্চে (হিয়ার হিয়ার)। খাদ্যের ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই (হিয়ার হিয়ার)। জৈব-রাসায়নিক উপাদানরূপেই খাদ্যকে বিশ্লেষণ ও খাদ্যের প্রকৃতি নির্দ্ধারণ কর্ত্তব্য। জান্তব প্রোটিন থেকে আমাদের দেশের লোকেরা বহুলাংশে বঞ্চিত। যে পরিমাণ প্রোটিন স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অপরিহার্য্য তা নিরামিষ বা নিরামিষ-প্রধান খাদ্য থেকে লাভ করতে হ'লে যে পরিমাণ খাদ্য খেতে হবে, তাতে অজীর্ণ ও স্বাস্থ্যভঙ্গ অবশ্যম্ভাবী। অথচ নিয়মিতভাবে অল্প-পরিমাণ গোমাংস খেলে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দুইই লাভ হবে। (হাততালির মধ্যে উপবেশন।)

সভা। পঞ্চম বক্তা রাজনীতিক।

৫ম। আমি রাজনীতিকও নই, বক্তাও নই।

জনৈক শ্রোতা। এই তো বেশ বলতে পারেন দেখছি।

৫ম বক্তা। জনৈক শ্রোতা আমাকে বক্তা ব'লে সম্মানিত করতে চান—

শ্রোতা। আপনি যে রাজনীতিক, তাও প্রমাণ হ'ল।

৫ম বক্তা। তিনি আমাকে রাজনীতিকের সম্মান দিতেও কুণ্ঠিত নন দেখতে পাচ্ছি। তবু আমি কিন্তু গরু সম্বন্ধে রাজনৈতিক আলোচনাই করতে চাই। রাজনীতি বড়ই ভয়ঙ্কর জিনিস।

রাজনীতি কথাটা শুনলেই কারও মাথা ঝিমঝিম করে, কারও বা নাসা কুঞ্চিত হয়; কিন্তু আমাদের রসনা ও বাক্‌যন্ত্র যুগপৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। রাজনীতি মানে—

শ্রো। আপনি রাজনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন, না গরু সম্বন্ধে?

বক্তা। দুটোর সম্বন্ধেই (হিয়ার হিয়ার)।

শ্রো। পৃথকভাবে, না একসঙ্গে?

বক্তা। একসঙ্গে। রাজনীতির ভারতীয় অর্থ হিন্দু ও মুসলমান; পাকিস্থান ও হিন্দুস্থান; গরু-খাওয়া ও গরু-না-খাওয়া (হিয়ার হিয়ার)। ভারতে গো-খাদকের সংখ্যালঘু; তাই সংখ্যাধিকেরা গোমাংস-ভক্ষণ পাপ ব'লে প্রচার করে (শেম শেম)। কিন্তু, আপনারা সকলেই জানেন, ভারতে না হ'লেও সমস্ত পৃথিবীতে, গো-খাদকেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আপনারা আরও জানেন, বর্ত্তমান রাজনীতি আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতি। রাজনীতির সংকীর্ণ জাতীয় ভিত্তি ধ'সে পড়েছে। আজ আন্তর্জ্জাতিকতার দিনে সংখ্যাগরিষ্ঠ গোখাদকের জয় অবশ্যম্ভাবী। অতএব আসুন, নিখিল-ভারত-গোখাদক-মহাসভার সভ্য-পদ অলঙ্কৃত করুন।

আমার বন্ধু ঐতিহাসিক বক্তা বলেছেন, গরুই হিন্দু-মুসলমানের ভেদ ও বিরোধের জীবন্ত প্রতীক। তাকে হত্যা ক'রে তার মাংস খেতে আরম্ভ করুন; দেখবেন, হিন্দু-মুসলমান বিরোধের অবসান ঘটেছে; ভারতব্যাপী সুদৃঢ় ঐক্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (হাততালির মধ্যে উপবেশন।)

সভা। আমি এইবার সনাতনী-সভার সেক্রেটারি মহাশয়কে বক্তৃতা দেবার জন্য সাদর আহ্বান জানাচ্ছি।

মহান জয়ধ্বনির মধ্যে সেক্রেটারি মহোদয় মঞ্চারোহণ করিয়া মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াইলেন।

সেক্রে। মাননীয় সভাপতি ও ভ্রাতা-ভগিনীগণ, (সুদীর্ঘ হাততালি) —কতকগুলি হিংস্র, অকালকুষ্মাণ্ড, (হিয়ার হিয়ার) দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী, বিজাতীয় ভাবধারায় অনুপ্রাণিত, হিন্দুকুল-কলঙ্ক, বিকৃতমনা, আত্মম্ভরী, পণ্ডিতম্মণ্য, ম্লেচ্ছাচারী, মদ্যপায়ী, মাংসভোজী, বারবনিতা-সেবী, (হিয়ার হিয়ার), আকাটমূর্খ, অবিদ্যা-বিজ্ঞান-সেবক, নাস্তিক, ভাক্তজ্ঞানী, ভারতীয়-বৈশিষ্ট্য-বিরোধী, অধার্ম্মিক, স্বেচ্ছাচারী; উচ্ছৃঙ্খল, দুর্নীতিপরায়ণ, বস্তুবাদী, আর্য্য-সংস্কৃতি-সরোবরের হিপোপটেমাস, ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম-উপবনের মদহস্তী, সনাতন-আচার-উদ্যানের ছাগপাল, হিন্দু-জাতীয়-সমাজের সারমেয়, জাতীয়-ঐতিহ্য-আঁস্তকুড়ের শূকরপাল, সনাতন-ধর্ম্ম-ভাগাড়ের গৃধ্রযূথ, ভারত-জননীর গর্ভস্রাব আপনাদিগকে গোমাংস-ভক্ষণে প্ররোচিত করিতেছেন (শেম্ শেম); আপনারা কি তাহাদিগের বাক্যে প্রলুব্ধ ও বিপ্রলব্ধ হইয়া জাতি কুল শীল, নীতি রুচি, ঐতিহ্য সংস্কার সংস্কৃতি, মান মর্য্যাদা বৈশিষ্ট্য, সত্য ও সর্ব্বোপরি ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া দেউলিয়া হইবেন? (নেভার নেভার)। আপনাদের দৃঢ়-সংকল্পের অভিব্যক্তিতে আশ্বস্ত হইলাম। আমার আর কিছু বলিবার নাই।

মঞ্চাবতরণ করিয়া নিজ আসনে উপবিষ্ট হইলেন। সভাপতির গাত্রোত্থান।

সভা। বন্ধুগণ, আপনারা আমাকে সভাপতিত্বে বরণ ক'রে সম্মানিত এবং নিজেদের উপকৃত করেছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তারা বিষয়টার সমস্ত দিকেই আলোক-সম্পাত করেছেন। আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন, গোমাংস না খাওয়াটা একটা সংস্কার মাত্র। প্রত্যেক জিনিসের যেমন একটা ভাল দিক আছে, তেমনই একটা খারাপ দিকও আছে। গোমাংস-ভক্ষণের খারাপ দিকটাও আছে। কিন্তু বন্ধুবর সনাতনবাবু গোমাংস-ভক্ষণের বিপক্ষে যে

সব যুক্তি দিলেন, তাদের সমষ্টি সপক্ষের যুক্তিগুলোর একটির চাইতেও গুরুতর নয়। এমন কি বিরুদ্ধ-যুক্তিগুলো নিজেদের গুরুত্বের জোরে সমর্থক-যুক্তিগুলোকে খণ্ডিত করা দূরে থাকুক, বিরুদ্ধ-যুক্তিদাতার অন্তর্নিহিত সংস্কারগত বিরূপতাকেই সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছে।

আমাদের ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনে বড় বড় সমস্যাগুলো কি? দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা। এগুলো ব্যাপকভাবে দূর করতে হ'লে রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন। জাতীয়তাবাদীর তথাকথিত স্বাধীনতা নয়। বিশ্ব-নাগরিকের স্বাধীনতা। এর জন্য প্রথম প্রয়োজন নিজেদের মানুষ ব'লে ভাবতে শেখা; আর কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করতে গিয়ে বিজ্ঞানের শরণ নেওয়া।

আজকের দিনে যাঁরা বৈজ্ঞানিকভাবে সমাজতত্ত্বের অনুশীলন করেন, তাঁরাই বুঝতে পারবেন, হিন্দুর মুসলমান-বিদ্বেষ মূলত গোমাংস-বিদ্বেষ। আর গোমাংস-বিদ্বেষটাকে কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তাই আমার অনুরোধ, আপনারা সবাই নিয়মিত গোমাংস ভক্ষণ করবেন।

এইবার একটি প্রস্তাব পাঠ ক'রে ভোটে দেওয়া হবে।

প্রস্তাব-পাঠক। "এই সভা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গোমাংস-ভক্ষণ সমর্থন করিতেছে।" প্রস্তাবটি যাঁরা সমর্থন করেন না, তাঁরা হল ছেড়ে বাইরে যান। যাঁরা সমর্থন করেন, তাঁরা ভিতরেই অবস্থান করুন।

হল খালি হইয়া গেল। শুধু মঞ্চোপরি সভাপতি, বক্তা ও উদ্যোক্তৃগণ রহিয়া গেলেন।

বটুক সান্যাল

অনুচ্চারিত

এস্প্ল্যানেডের স্টপে থেমে গেল ডবল-ডেকার—
নব-অনুরাগবতী পাশে ব'সে ছিলে একাসনে ;
সম্মুখ-যুবার চোখে নগ্ন-ক্ষুধা রমণী দেখার,
তোমার জলন্ত ঘৃণা ফুটিয়াছে কটাক্ষ-শাসনে।

বাঁ দিকে গড়ের মাঠ, ডান দিকে চৌরঙ্গির ভিড়—
তার মাঝে তুমি আমি পাশাপাশি ব'সে মৌনমুখ ;
মন কি আকাশে ওড়ে ? অথবা সে গড়ে স্বপ্ননীড় ?
ফোটে কি হৃদয়-পদ্ম ? কেন তবে কণ্ঠ থাকে মূক ?

ভিক্ষাপাত্র তুলে ধ'রে ভিক্ষা চায় ভিখারী-বালিকা,
'একটি আধলা দে মা' ;—অঙ্গে তার মূর্ত্ত অনশন ;
ধনীর লাঞ্ছনা দিয়ে রচা তার ম্লান দৃষ্টিশিখা,
বঞ্চনার গূঢ় ফণা কণ্ঠে তার করিছে দংশন।

'মায়ের' না হেরি দয়া ফিরাল সে মোর পানে চোখ,
কহিল করুণ কণ্ঠে, 'দে না বাবা !'—দুটি মাত্র কথা ;
কিন্তু এ কি বলিল সে ? মিলনের এ কি নবশ্লোক !
—দুটি সম্বোধন দিয়ে উচ্চারিল ভবিষ্য-বারতা !

অকস্মাৎ কি যে হ'ল, নতমুখে হাতব্যাগ খুলি
পশ্চাতে ফেলিলে ছুঁড়ে ভিক্ষাপাত্রে একটি আধুলি।

জগদীশ ভট্টাচার্য্য

শিল্প ও তাহার ক্রমবিবর্ত্তন

আচার্য্য অক্ষয়কুমারের মুখে একবার ছোট্ট একটা কথা শুনেছিলাম, "শিল্ সমাধৌ"। শিল্প কথাটার মধ্যে যে এত গভীর একটা অর্থ নিহিত আছে, তা পূর্ব্বে ভাবি নি। মানুষের জীবনের সব কাজের মধ্যেই তো শিল্পের ছড়াছড়ি, গ্রামের বাগদীদের হাতের ডালা কুলো তৈরি থেকে তাজমহল নির্ম্মাণ পর্য্যন্ত সবই তো শিল্প, তাতে আবার 'সমাধি'র প্রশ্ন আসে কোথা থেকে ? তবে এটা বেশ বোঝা যায় যে, তাজমহল তৈরিটাকে সাধনা ও সমাধির পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে, কারণ অমন একটা অতুলনীয় জিনিস নির্ম্মাণ করতে শিল্পীর একাগ্র ধ্যান ও তপস্যা না থাকলে একটা বাড়ি হতে পারে, কিন্তু সেটা 'তাজমহল' হয় না। পরে তিনি আসল ব্যাপারটি এই ভাবে বুঝিয়ে দেন যে, মানুষের সাধনা ও চিন্তার সমাধি থেকেই শিল্প বা আর্টের জন্ম হয়, পরে কার্য্যক্ষেত্রে সেটা দুটো পৃথক ধারায় চ'লে গিয়েছে, একটির নাম 'কলা' আর অন্যটির নাম 'কারু', যাকে আমরা ইংরেজীতে বলি ফাইন আর্ট এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আর্ট। বাগদীর হাতের ডালা কুলো থেকে ফোর্ডের কারখানার গাড়ি নির্ম্মাণ, বা মাস-প্রোডাক্শন হিসাবে তৈরি ফাউণ্টেন পেন পর্য্যন্ত সবই হচ্ছে ওই কারুশিল্পের পর্য্যায়ের জিনিস। যদিও এসব তৈরি করতে মানুষের মাথার বেশ একটু বুদ্ধি বা ইমাজিনেশন থাকা চাই। তারপর সেগুলো গতানুগতিকভাবে কলের মধ্যে থেকে হাজারে হাজারে বেরুতে আরম্ভ করে। তখন সেগুলো কারুশিল্প থেকে জন্মানো মাল অর্থাৎ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট হয়ে দাঁড়ায়।

ফাইন আর্ট বা কলাশিল্প জিনিসটারও ওই চিন্তার সমাধি থেকেই উৎপত্তি, কিন্তু ওর শেষ হচ্ছে ওই সমাধিতেই। এখানেই এ দুইয়ের তফাত। কারুশিল্পের জন্ম হয়েছে মানুষের সমাধি ও সাধনা থেকে, কিন্তু সেটা ঠেকেছে গিয়ে ম্যানুফ্যাক্চারে। কাজেই সেটাকে একবার চালু করতে পারলে, তা জলের মত সহজ হয়ে যায় ও দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা করে। কলাশিল্প জিনিসটা কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আদিম ও অকৃত্রিম। এর সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন সম্পর্ক নেই।

এর পরই প্রশ্ন ওঠে যে, শিল্পের বা আর্টের যদি এই অর্থ হয়, তবে সবচেয়ে উচ্চস্তরের শিল্প কোন্‌টি। এখানে একটা কথা ব'লে রাখা দরকার, আমি এখানে শিল্পের কি উদ্দেশ্য সে প্রশ্নের দিকে যাচ্ছি না, কারণ Art for Art's sake, না Art for Life's sake, কোন্‌টা যে মূল সত্য সেটা কেউ সমাধান করতে পারে না। কারণ এ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। সাধারণত শিল্প বলতে আমরা তিন-চার রকমের বিষয় ধ'রে থাকি। ইংরেজীতে এগুলোকে Three Arts অথবা Four Arts ব'লে একটি সমষ্টি ক'রে বোঝবার চেষ্টা করা হয়। এরা হচ্ছে, ১। কাব্য ও সাহিত্য, ২। চিত্র, ৩। ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য, ৪। সঙ্গীত ও নৃত্য। এর মধ্যে যিনি যেটার জন্যে তাঁর নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তিনিই তাকে বড় বলবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তাতে মূল প্রশ্নের কোন সমাধান হয় না। আর বাস্তবিকই তো, সকলের মনেই এই তুলনামূলক প্রশ্ন ওঠে যে, তাজমহলকেই বেশি সুন্দর বলব, না কালিদাসের বা রবি ঠাকুরের কাব্যকে, না উদয়শঙ্করের নৃত্যকে? কি বেশি সুন্দর? এভাবে বিষয়টিকে ভাবতে গেলে কিন্তু কোন সুরাহাই হয় না। আমাদের তাই মূল প্রশ্নে প্রবেশ করা

উচিত, অর্থাৎ যে জন্যে এই বিষয়গুলির সাধনা ও ধ্যান, যাকে আমরা বলি "ভাব প্রকাশ করবার ক্ষমতা", সেই শক্তি এদের কোন্‌টির মধ্যে সবচাইতে বেশি রয়েছে? এ কথা সত্যি যে, তাজমহল দেখলে বা পার্ক স্ট্রীটের মুখে উটরামের অশ্বারূঢ় মূর্ত্তি দেখলে অথবা উদয়শঙ্করের ইন্দ্রনৃত্য উপভোগ করলে বা কোন রাগবিশেষের মূর্চ্ছনা শ্রবণ করলে আমাদের মনে যে একটা অজানা বা অজ্ঞাত ভাবের উদয় হয়, কালিদাসের মেঘদূত কাব্য পাঠ করলে মনের ভাবটা তার চাইতে আরও অনেক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখনই আমরা বুঝতে পারি যে, ভাব প্রকাশ করবার শক্তি সবচাইতে বেশি রয়েছে সাহিত্যে, তারপর চিত্রে, তারপর ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যে, সঙ্গীত ও নৃত্যে। কথাটাকে আরও তলিয়ে দেখলে ব্যাপারটি আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে। ওপরের আলোচনা থেকেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ভাবপ্রকাশের জন্যে যার যত কম মালমসলা বা উপাদনের দরকার, সেই হচ্ছে তত উচ্চাঙ্গের কলা। এই হিসাবে প্রথমেই চোখে পড়ে, সর্ব্বোচ্চ কলা হয়েছে সাহিত্য, কারণ তাতে ভাবপ্রকাশের মালমসলা বা vehicle হচ্ছে অতি সামান্য জিনিস, কতকগুলো সমষ্টিগত বাক্য, যাকে আমরা বলি ভাষা। এই ভাষাতে যদি তেমন ভাবপ্রকাশের শক্তি থাকে, তবে তা দিয়ে জগতের শ্রেষ্ঠ শিল্প পর্য্যন্ত গ'ড়ে তোলা যায়; এই শিল্পের সর্ব্বোচ্চ প্রকাশ হয়েছে আমাদের দেশে উপনিষদে, দর্শনে আর সাহিত্যে, কারণ এই ভাবকে খেলাবার জন্যে আমাদের তখন যে শক্তিমান উপাদান বা মসলা ছিল, সেটা হচ্ছে সংস্কৃত ভাষা। এখনকার আমলে আমাদের যুগেও সেই রকম আর একটা উপাদান আমরা ভাগ্যক্রমে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের বহু চেষ্টায় ও সাধনার ফলে পেয়েছি—বাংলা ভাষা—যে মসলায় তৈরি শিল্প এখনও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলির পাশে দাঁড়াবার স্পর্দ্ধা রাখে।

সাহিত্যের পরই স্থান হচ্ছে এই হিসাবে চিত্রের। এখানে ভাব-প্রকাশের মালমসলা সাহিত্য থেকে অনেক বেশি সীমাবদ্ধ, কারণ এর জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে কাগজ, ক্যানভাস বা কোন একটা পরিষ্কার দেওয়াল বা plane surface, আর তার ওপর রেখাপাত করার তুলি বা পেনসিল ও কালি বা রং ইত্যাদি। এ থেকেই দেখতে পাওয়া যাবে, চিত্রশিল্পে ছবি আঁকবার আড়ম্বর যত কম হবে, ছবিকে ভাব-প্রকাশে তত কম বাধা দেওয়া হবে। আর যতই রং, shade বা ছায়া, তুলি, পেনসিল, কালির উৎপাত বাড়বে, ছবির ভাব ততই বাধা পাবে। কথাটা হঠাৎ শুনলে কিন্তু আমাদের অস্বাভাবিকই মনে হবে, কারণ সাধারণে বলবে, যেখানে রঙের খেলা নেই, সে আবার কোন্ নিরামিষ্ চিত্র? আসলে কিন্তু সেটাই তত উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি, কারণ চিত্রটি কোন জায়গায় এই সমস্ত আনুষঙ্গিক রং ইত্যাদির আড়ম্বরে তার ভাবপ্রকাশে অযথা বাধাগ্রস্ত হয় নি। এইজন্যেই আমাদের দেশে চিত্র জিনিসটা লাইনেই র'য়ে গিয়েছিল। রং ছিল বটে, তবে সেটা ছিল গৌণ। Shade বা ছায়া, অথবা দূরত্ব স্থূলত্বের পরিমাপ—যাকে বলে perspective—এসব জিনিস ভারতবর্ষ কখনও মনে-প্রাণে গ্রহণ করে নি। সেইজন্যে আমাদের দেশে মডেলের সাহায্যে ছবি আঁকা কোন কালে ছিল না। আর সত্যিই তো, বাস্তবকেই যদি নকল করব, তবে তাকে পার হয়ে ভাবের রাজ্যে কল্পলোক সৃষ্টি হবে কেমন ক'রে? আশ্চর্য্যের কথা এই যে, এই মূল সত্যটি আমাদের সংস্কৃত গ্রন্থে পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তার প্রথম সন্ধান দেন আচার্য্য অক্ষয়কুমার বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরমের এই শ্লোকটিতে—

রেখাং প্রশংসন্ত্যাচার্য্যাঃ বর্ত্মনাঞ্চ বিচক্ষণাঃ।
স্ত্রিয়োভূষণমিচ্ছন্তি বর্ণাঢ্যমিতরে জনাঃ॥

তবেই বোঝা যাচ্ছে, যে শিল্পে আড়ম্বর যত কম, সে শিল্প তত উচ্চস্তরের। সেইজন্যেই ভাস্কর্য্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত ও নৃত্য এগুলির ভাবপ্রকাশের উপাদানগুলি এত কঠোর যে, তা থেকে উচ্চাঙ্গের শিল্পসৃষ্টি খুব শক্তিমান ছাড়া সম্ভব হয় না। এক টুকরো নীরস পাথরে বা ধাতুতে প্রাণ সঞ্চার ক'রে কাব্য সৃষ্টি করা যে কত তপস্যার ফলে হয়, তা যাঁরা এ জিনিসে হাত দিয়েছেন তাঁরাই জানেন। আর সেইজন্যেই সাধারণ সাহিত্যিকদের চেয়ে এঁদের অনেক বেশি পরিশ্রম করতে দেখা যায়। চিত্র, ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য, এমন কি সঙ্গীত ও নৃত্য-শিল্পীদের এজন্যে জমি তৈরি বা spadework করতে হয় অনেক বেশি। তাতে জিনিসগুলো প্রথম ভিত্তিভূমি পায়। তার ওপর ভাবপ্রকাশের শক্তি প্রত্যেকের নিজ নিজ প্রতিভার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু তার জন্যে চাই সাধনা ও কঠোর তপস্যা। জার্মানদের মধ্যে একটা কথা আছে—Genius is the infinite power of taking pains; আর ওই একই সুরে টমাস এডিসনও ব'লে গেছেন, Genius means 99 p. c. perspiration and 1 p. c. inspiration; তবে সেই শতকরা এক ভাগও তার থাকা চাই, নইলে প্রতিভার জন্ম হয় না। ওই যে আমাদের দেশেই গল্প আছে, সা-রে-গা-মা শিখবে প্রথম দশ বছর। তারপর রাগিণীর কাঠামোগুলি শিখবে দ্বিতীয় দশ বছর, তারপর রাগিণীর খেলা ও 'কর্ত্তব' আরও দশ বছর। এই রকম করতে করতে যখন সঙ্গীতে দিগ্‌গজ হওয়া গেল, তখন দেখি যে, বুড়ো হয়ে গিয়েছি, আর শিখেছি যা, তা শুধু কাঠামোটাই। ওর যে মূল প্রাণটা কোথায়, শেষ পর্য্যন্ত সেটারই কোন হদিস পাওয়া গেল না। সংস্কৃত সাহিত্যে অলঙ্কার ও ব্যাকরণ শিখে কালিদাস হওয়ার আশা, এ রকমও অনেক গল্প আমাদের দেশে আছে। এ যেন অনেকটা Graph paper-এ কাঁটা কম্পাস দিয়ে ছবি আঁকা। সবই হ'ল, কিন্তু ছবি আর দাঁড়াল না।

এই সব ব্যাপার থেকে আজকাল একটা নতুন বিষয় নিয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী জোর আন্দোলন চলেছে—'সিনেমা শিল্প কি না'। বস্তুত, সিনেমা মুখ্যত কারুশিল্পের পর্য্যায়ে পড়ে, আর অত খরচ ক'রে ব্যবসা হিসাবেই যদি এর ছবি বাজারে না চলে, তবে ও ছাইপাঁশ চারুকলার

সৃষ্টি ক'রে কি হবে? সে যাই হোক, একটা জিনিস সকলেই দেখতে পাবেন যে, সিনেমা-ছবিতে শিল্পসৃষ্টির উপাদানের আর শেষ নেই;—প্রযোজক, সম্পাদক, আলোছায়া-শিল্পী, সিনেমা-তারকা, রসায়নাগার এবং ছোটখাটো আরও কত কি। এ তো গেল নির্ব্বাক ছবির আমলের কথা। সবাকচিত্রে আবার তার ঘাড়ে চেপেছে এসে আবহ-সঙ্গীত, Dialogue, monologue এবং শব্দ-সংক্রান্ত আরও অবান্তর খুঁটিনাটি অনেক কিছু। বলা বাহুল্য, এইজন্যেই সিনেমা-জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী, চার্লস্ স্পেন্সার চ্যাপ্‌লিন সবাকচিত্রের এত বিরোধী ছিলেন, কারণ তিনি জানতেন যে, সবাকচিত্র হচ্ছে for ইতরে জনাঃ, অর্থাৎ এ হচ্ছে তাদের জন্যে, যাদের চিন্তাশক্তি বা Imagination কম। অবশ্য কালধর্ম্মের ঢেউয়ে প'ড়ে তিনি নিজেই শেষে সবাকে যোগ দিয়েছেন, কিন্তু তা হ'লেও দর্শকেরা যদি তাঁর শেষ ছবি-গুলিকে নজর দিয়ে দেখে থাকেন, তবে তাঁরা দেখেছেন যে, যেখানেই তাঁর কথা বলবার প্রয়োজন হয়েছে, সেখানেই তিনি বাজে শব্দ উচ্চারণ বা আবোল-তাবোল gibberish ব'লে শব্দ জিনিসটাকে ব্যঙ্গ ক'রেই গেছেন। সত্যিই তো, অত বেশি কথা বললে চিন্তা ও সাধনা দুইই যে বাধা পায়! এ থেকেই বোঝা যায়, সিনেমাতে রূপ ও রস-সৃষ্টি করতে কত মালমসলার দরকার। আর সবচেয়ে মজা এই যে, এর প্রায় সবগুলোই শিল্পসৃষ্টির কাঁচা মাল বা raw material-এর অন্তর্গত। এদের গ'ড়ে-পিটে ঠিকঠাক ক'রে তবে শিল্পসৃষ্টি হবে। ইউনিভার্সাল চলচ্চিত্রের প্রতিষ্ঠাতা Carl Lammle একবার এক বিশ্ববিখ্যাত মনীষীকে তাঁর স্টুডিও দেখাতে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর সকল unit ও কাঠের বাড়ি-ঘর ও অন্যান্য সাজসজ্জা দেখিয়ে সেখানকার নামকরা পুরুষ ও স্ত্রী সিনেমা-তারকাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে শেষে হঠাৎ তাঁর ক্যামেরার লেন্সের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ক'রে মনীষীকে ডেকে বললেন—"Look, that's my artist! All the rest are my raw materials!" বস্তুত সিনেমাশিল্পে এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই।

এবার শিল্প জিনিসটা এই বিংশ শতাব্দীর জগতের পাল্লায় প'ড়ে যে

কোথায় এসে ঠেকেছে, সে বিষয়ে সামান্য কিছু ব'লে এই প্রবন্ধ শেষ করব। বলা বাহুল্য, এটা হ'ল কাজের ও বেগের যুগ। Speed, speed, more speed! গরুর গাড়ি থেকে ঘোড়া, ঘোড়া থেকে মোটর, মোটর থেকে এরোপ্লেন, এখন আবার stratosphere দিয়ে প্লেন চালাবার চেষ্টা চলছে যাতে দশ মিনিটে পৃথিবীটাকে ঘুরে আসা যেতে পারে। যুদ্ধেও সেই blitzkrieg-পদ্ধতি। প্রত্যেক কাজে record break করার সংবাদ। আজ যেটা record, কাল সেটা out of date বা পুরনো। অমুক সিনেমায় একটা ছবি ছ মাস চলেছে, তার পরই খোঁজ পাওয়া গেল, আর একটা শো-হাউসে আর একটা ছবি চলেছে বা চালানো হয়েছে দেড় বছর। এই যখন দুনিয়ার হালচাল, তখন এই আবহাওয়ায় কি আর ধৈর্য্য ধ'রে কলাশিল্প চলতে পারে? কলাশিল্পীরা হয়ে দাঁড়িয়েছেন কারুশিল্পী। Fine Art হয়েছে Commercial Art। আজকাল Fine Art Exhibition থেকে Commercial Art Exhibition-এর কদর বেশি, কেন না তাতে শিল্পীর পয়সা আসবে বেশি। চুলোয় যাক Fine Art, চুলোয় যাক তার মাহাত্ম্য। আজ যে ছবি দেখে লোকে ধন্য ধন্য করবে, কাল তার ছাপানো ছবির কাগজটা দিয়েই লোকে তাদের পুরনো জুতো মুড়ে রাখবে। এটা হচ্ছে Calender-এর ছবির যুগ। এমন কি আজকাল ভাল ভাল ভদ্রলোকের ঘরে গিয়েও বাঁধানো Calender-এর ছবি ছাড়া মূল কোন ছবি চোখে পড়ে না। কারণ ওটার এক বছর পরই নতুন আর একটা ছবি পাওয়া যাবে। এখানেও সেই নূতনত্বের মোহ, সেই mass praduction-এর হিড়িক। Speed, আরও Speed।

এই হ'ল যখন সারা দুনিয়ার চাহিদা, তখন সে চাহিদা মেটানোর পদ্ধতিও তদ্রূপ; তা সে ভালই হোক আর মন্দই হোক। আর ভাল মন্দই আবার কি? যে ছবি আজ দেখা গেল বা যে গান আজ শোনা গেল, সেটা তো কালই পুরনো। কাজেই যা দেবে তা দাও নতুন, সেটা একটা অতুলনীয় সুষমামণ্ডিত রূপসৃষ্টিই হোক, না হয় একটা কিম্ভূতকিমাকার Frankenstien বা Kingkong জাতীয় আজগুবি কিছু হোক। তবু তো সেটা নতুন। সেটা তো original। পূরবী রাগিণী তো

out of date। দুর্গা রাগ? হ্যাঁ, সেটা কিছু নতুন বটে। এই নূতনত্বের ঠেলায় ব্যবসাদারেরা নিজেরাই এখন আর্টের পরিবেশন করতে শুরু করছেন, তাঁদের সবাকছবি ও তার নতুন সুরওয়ালা সঙ্গীত দিয়ে। সেটাতে যে মধ্য-আমেরিকার সুর বা কাফ্রী-নৃত্যের তালের রেশ আছে, তাতে কি এসে যায়? আজ তো সেটা নতুন। কাল না হয় সেটাকে কেউ শুনবেও না। আজকালকার হুজুগই হচ্ছে—ভাঙো আর গড়ো, নতুন কিছু কর। জাহাজ বা মেট্রো প্যাটার্নের বাড়ি কর, কারণ লোকে সেটাকে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় হাঁ ক'রে দেখবে আর গাড়ি-চাপা পড়বে। কিন্তু দশ বছর পর সেটা যে কি কুৎসিত হয়ে দাঁড়াবে তা কেউ ভাবে না, আর ততদিনে তার পাশে হয়তো আর একটা এরোপ্লেন প্যাটার্নের সিনেমা-হল তৈরি হয়েছে।

এই হ'ল যুগধর্ম্ম। প্রথমত মানুষকে বাঁচতে হবে, আর আজকাল বাঁচতে হ'লেই এগিয়ে চলতে হবে। বেগে চলতে গেলেই মানুষের মাঝে মাঝে বিশ্রামের প্রয়োজন। সেই বিশ্রামের জন্যেই আজকালকার এই ধরনের শিল্পের সৃষ্টি। এই শিল্প মানুষের শিক্ষার জন্যে নয়, এ হচ্ছে তার শ্রম অপনোদনের জন্যে। যে শিল্পে মানুষকে শিক্ষা দিতে পারে না, তার চিন্তা-শক্তিকে সাহায্য করতে পারে না, সে শিল্পে মানুষের অপকারই হয় বেশি। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি, দেশে চিন্তাশীলদের মনে প্রায় সবখানেই একটা গভীর নৈরাশ্য—জনসাধারণ ক্রমে ক্রমে নীচুস্তরে নেমে যাচ্ছে। তাদের উচ্চস্তরের বিষয় উপভোগ করার শক্তি নেই। কিন্তু এই অধোগতি ঠেকাবার শক্তিও কারুর নেই; কারণ এটা হচ্ছে যুগধর্ম্ম। বোমার আঘাতে বা Blitzkrieg-এর বন্যায় পৃথিবীর সবই ওলটপালট হতে চলেছে। এর ফলে কি পৃথিবীর এই অস্বাভাবিক বেগের বন্যা রোধ হয়ে স্বাভাবিক হবে? জনসাধারণের উচ্চচিন্তাশক্তি কি আবার ফিরে আসবে? ভবিষ্যতের ইতিহাস এর উত্তর দেবে।

"পিসিয়েল"

রাজশাহী আষাঢ়ে ক্লাবের নবম অধিবেশনের সাহিত্য-বাসরে পঠিত।

ছাত্র

কাঠফাটা রোদ, চতুর্দ্দিকে অগ্নি-বর্ষণ করিতেছে। আমার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। আমার সমস্যা দেড় শত অঙ্ক এবং এক শত পৃষ্ঠা হাতের লেখা। গ্রীষ্মাবকাশের হোম-টাস্ক। থার্ড মাস্টারের রুদ্রমূর্ত্তি, রুদ্রতর ভাষণ এবং রুদ্রতম বেত্রাঘাতের কথা ছাড়া অন্য কিছু ভাবিবার অবসর নাই। আমি তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র বলিয়া আরও বেশি ভাবনা। সুতরাং নিদারুণ গ্রীষ্মকে উপেক্ষা করিয়া গৌরীশঙ্কর খুলিয়া বসিয়া আছি। হঠাৎ দ্বার ঠেলিয়া থার্ড মাস্টারই প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চেহারা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলাম, একটু ভয়ও হইল। শুষ্ক মুখ, মাথার রুক্ষ চুলগুলা খাড়া হইয়া আছে, কোটরগত চক্ষু দুইটি জলন্ত অঙ্গারের মত রক্তবর্ণ। ভাবিলাম, কুঁজো হইয়া বসিয়াছি বলিয়া হয়-তো ধমক দিবেন। তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া বসিলাম। কিন্তু সেসব কিছু না করিয়া তিনি অনুনয়পূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পারিস বাবা।

ঘরের কোণে কুঁজায় জল ছিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া এক গ্লাস আনিয়া দিলাম। ঢক ঢক করিয়া নিমেষে তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন।

আর এক গ্লাস।

দিলাম।

তাহাও নিমেষে শেষ হইয়া গেল।

আর এক গ্লাস চাই। আঃ, বাঁচালি বাবা, তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, এক ফোঁটা ঠাণ্ডা জল পাবার উপায় নেই কোথাও—। ঘুম ভাঙিয়া গেল।

স্বপ্ন।

২

বাস্তব কিন্তু আরও নিদারুণ।

পরদিন প্রখর রৌদ্র ও গেঁটে বাতকে উপেক্ষা করিয়া প্রৌঢ় আমি উত্তপ্ত বালির চড়া ভাঙিয়া তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী গঙ্গা অভিমুখে চলিয়াছি। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে স্কুলে যে থার্ড মাস্টারের নিকট পড়িয়াছিলাম, যিনি আজ প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছেন—কাল সহসা তাঁহাকে স্বপ্ন দেখিয়া আমি—আপনারা যাহা বলিবেন তাহা আমি জানি, ফ্রয়েড চার্ব্বাক আমিও পড়িয়াছি—নিজের অযৌক্তিক আচরণে নিজেই বিস্মিত হইতেছি, কিন্তু কি করিব, উপায় নাই—ঘাড়ে ধরিয়া কে যেন আমাকে লইয়া যাইতেছে।

তর্পণ আমাকে করিতেই হইবে।

"বনফুল"

———

লিমারিক

বেথুনের মিস্ বোস "হার্ডল্‌স" দৌড়ায়,
কলেজের স্পোর্টসেতে, সভাপতি ইউ. রায়।
এ দিক ও দিক দেখে,
ডান পাটি গেল ঠেকে;
[illegible]

একেরায়

সংবাদ-সাহিত্য

আমাদিগকে ধৈর্য্য ধরিতেই হইবে। ধরিবার মত যাহাদের হাতে আর কিছুই নাই, ধৈর্য্য ধারণ করিয়াই তাহাদিগকে বাঁচিতে হইবে। আমরা দীর্ঘকাল ধৈর্য্য ধরিয়া বাঁচিয়া আছি—আশা করিতেছি, আরও দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিব। বীর্য্যের অভাব, শৌর্য্যের অভাব আমরা ধৈর্য্য দিয়া পূরণ করিব।

প্রাচীন কালে নিজেদের অসহায় অবস্থা কল্পনা করিয়া যাঁহারা প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার বলে এই ধৈর্য্য-পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, আমরা আজিও তাঁহাদিগকে ঋষিজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকি। ঋষিগণ শাস্ত্র রচনা করিয়া এই বিশেষ পন্থার নাম দিয়াছিলেন—যোগ। যোগই আমাদের অবলম্বনীয়। বর্ত্তমান কালের ঋষি শ্রীঅরবিন্দ অনেক বৎসর ধরিয়া ভারতবাসীকে এই যোগ শিক্ষা দিয়া নূতন করিয়া প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন। তিনি স্বয়ং লোকচক্ষুর অন্তরালে ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া আছেন, আমরাও ধৈর্য্য ধরিয়া প্রকাশ্য কর্ম্মক্ষেত্রে একদিন তাঁহার অকস্মাৎ আবির্ভাব-আশায় উন্মুখ হইয়া আছি। মহাত্মা গান্ধী বিশেষভাবে এই যোগে যোগী; তাঁহার ধৈর্য্যধারণ-পদ্ধতির বিশেষ নাম—অসহ-যোগ। কাহার পক্ষে অসহ, অবশ্য এখন পর্য্যন্ত তাহা নির্দ্ধারিত হয় নাই। তবে ভাবে বোধ হইতেছে, এইবার এই অসহ-যোগের চরম পরীক্ষা আসিতেছে। আগামী ৭ আগষ্ট বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন বসিবে, তাহাতে ওয়ার্দ্ধা-প্রস্তাব গৃহীত হইলে, আর কাহারও না হউক, মহাত্মা গান্ধীর ধৈর্য্যের পরিমাপ সম্ভব হইবে।

যোগী-ঋষিদের কথা বেশি জানি না, আমাদিগকে কিন্তু ধৈর্য্য ধরিতেই হইবে।

* * *

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের সংস্পর্শে আসিয়া ইংলণ্ডের ইংরেজগণও এই যোগে বিশেষ পটু হইয়া উঠিয়াছেন। অন্য বহুবিধ অসুবিধা সত্ত্বে এবং অন্য সকল গুণ

নিঃশেষে খোয়াইয়াও শুধু এই ধৈর্য্যগুণে বলীয়ান যোগী ইংরেজরা এখনও ভারতবর্ষের মাটিতে সদম্ভে টিকিয়া আছেন এবং ধৈর্য্য অবিচলিত রাখিতে পারিলে হয়তো শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়াই যাইবেন। অপমান, লাঞ্ছনা ও মুহুর্মুহু ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যেই তাঁহাদের সুবিপুল ধৈর্য্যের নির্লজ্জ মহিমা সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময়োদ্রেক করিতেছে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মত ধনযোগী এবং কমরেড ষ্টালিনের মত কর্ম্মযোগী, ইংরেজের এই যোগ-প্রক্রিয়া দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেছেন—আমরা পরপদানত দরিদ্র ভারতবাসী, আমাদের বিস্ময় ও মোহের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

ভারতবর্ষের নিকট ধৈর্য্য-যোগ শিক্ষা করিয়া ইংরেজ তাহা মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশে প্রয়োগ করিয়া সফলকাম হইয়াছেন, মনে হইতেছে। আগষ্টের পর হইতে গুরু-শিষ্যে এই মাটিতে ধৈর্য্যের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে। আগামী "অপসারণ অথবা অবস্থান"-যুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত যাঁহারা ধৈর্য্যধারণ করিবেন, তাঁহারাই জয়ী হইবেন। ইংরেজের অন্য বহু অস্ত্র আছে, তাঁহারা ধৈর্য্য হারাইয়া সেগুলি প্রয়োগ করিতেও পারেন। আমাদের আর কিছুই নাই, সুতরাং আমাদিগকে ধৈর্য্য ধরিয়াই থাকিতে হইবে।

* * *

আমরা তাহাই থাকিব। পলাশীর যুদ্ধারম্ভ তারিখ হইতে জালিয়ানওয়ালাবাগে যুদ্ধবিরতির তারিখ পর্য্যন্ত আমরা নিরবচ্ছিন্ন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া ছিলাম, কিন্তু জ্ঞানত নহে। মধ্যে সিপাহীবিদ্রোহের নামে কিঞ্চিৎ অধৈর্য্য প্রদর্শন করিয়া পুনরায় ধৈর্য্যের অতলগহ্বরে ডুব দিয়াছিলাম। বাংলা দেশেও কয়েকজন অধীর "ভদ্রলোগ" স্বদেশী আন্দোলনের নামে ১৯০৫-১০ খ্রীষ্টাব্দে পঙ্ক-গহ্বর হইতে বেশ খানিকটা ভুড়ভুড়ি কাটিয়াছিলেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের হোলিখেলার পর গুরু আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাস্পর্শে আমাদের জড়-ধৈর্য্য চেতন-ধৈর্য্যে পরিণত হইতে লাগিল। বিরোধ-যোগ অসহ-যোগ হইয়া উঠিল। গত চব্বিশ বৎসরের শিক্ষা ও সাধনায় আমাদের সজ্ঞান-ধৈর্য্যের পাঠও প্রায় সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। এবারে আমরা জানিয়া শুনিয়া ধৈর্য্য ধরিব।

* * *

কারণ, ধৈর্য্য না ধরিলে আর আমাদের উপায় নাই। আমরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ছাপোষা লোক, তাঁহাদের তরফ হইতেই বলিতেছি। হাইড্রলিক প্রেসার-যন্ত্র দেখিয়াছেন? উপর হইতে খানিকটা আয়তন জুড়িয়া একটা প্রচণ্ড চাপ ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামিতেছে এবং নীচে হইতে সমপরিমাণ আয়তন জুড়িয়া অনুরূপ একটা চাপ ধীরে ধীরে ঠেলিয়া উপরের দিকে উঠিতেছে। মাঝখানে আপনি বসিয়া আছেন, পলাইবার উপায় নাই। আপনি কি করিবেন? ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকুন, দেখিবেন শেষ পর্য্যন্ত চ্যাপ্টা গুঁড়া থেঁতো হইয়া গেলেও কষ্ট পাইবেন না। নিঃশব্দে নিরুপদ্রবে গুঁড়া হইতে পারাই ধৈর্য্য। ইহাই যোগ, অসহ-যোগ। এই যোগ ভালমত সাধন করিতে পারিলে গুঁড়া হইয়াও সুখ পাওয়া যায়। যদি ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে সেই সুখ আমাদের ভাগ্যে নাচিতেছে। অতএব ধৈর্য্য ধরিব।

হাইড্রলিক প্রেসারের উপমা কেন দিলাম? আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুগুলির মূল্য হুহু করিয়া বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে; যেগুলি একেবারে দুষ্প্রাপ্য হইয়া যাইতেছে, সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের নালিশ নাই। কাজের বেলায় দেখিতেছি, এই দুষ্প্রাপ্য অবস্থার সৃষ্টি হওয়াতে আমাদের উপকারই হইতেছে। যে সকল বস্তু না হইলে কিছুতেই চলিবে না ভাবিতাম, সেই সকল বস্তু না হইলেও যে বেশ চলে, এই শিক্ষা পাওয়া আমাদের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই শিক্ষা বাইপ্রডাক্ট মাত্র। আসলে দেখিতেছি, আমাদের খরচ প্রতিদিন বাড়িয়া চলিয়াছে, আমাদের আয় প্রতিদিন কমিতেছে। এই দুর্দ্দিনে নানা-জাতীয় ট্যাক্স আমাদের স্কন্ধে চাপাইয়া গবর্মেণ্ট স্বয়ং আমাদের পরিণাম সুগম করিয়া আনিতেছেন। উপরের এবং নীচের চাপে যাঁহারা স্থির হইয়া থাকিতে পারিতেছেন, তাঁহারা ভাগ্যবান। ইহার উপর বোমার ভয়, গোরাতঙ্ক, ইভ্যাকুয়েশনজনিত সর্ব্ববিধ অসুবিধা এবং ব্যয়; স্বামী-স্ত্রীর, সন্তান-পিতার বিচ্ছেদ, সন্তানদের শিক্ষাব্যবস্থার বিপর্য্যয়, ঔষধাদির অভাবে ভোগ ও মৃত্যু, চোর-ডাকাতের অত্যাচার বৃদ্ধি, অনিশ্চয়তাজনিত নিদারুণ অশান্তি

বৃদ্ধি—ভদ্রভাবে থাকিবার কোনও আইনসঙ্গত উপায়ই নাই। ভদ্রভাবে মরিবার জন্য ধৈর্য্যের আবশ্যক। আমরা সেই ধৈর্য্যের কথাই বলিতেছি। আমাদিগকে ধৈর্য্য ধরিতেই হইবে।

ধৈর্য্য সম্পর্কে আরও কয়েকটি ভাল ভাল প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু সেগুলির উল্লেখ নিরাপদ নয়। সুতরাং ধৈর্য্য ধরিয়া রহিলাম।

—

আগামী বাইশে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠান। সেদিন সমগ্র জাতির মহাগুরুনিপাত-বৎসর সমাপ্ত হইয়া কালাশৌচ কাটিয়া যাইবে। খবর পাওয়া যাইতেছে, উক্ত দিবসে সমগ্র দেশব্যাপী সভাসমিতি-উৎসব-অনুষ্ঠান হইবে। ভাল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিকে চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য যে নিখিল-ভারতীয় আয়োজন চলিতেছিল, তাহার কি হইল? মনে হইতেছে, যুদ্ধের ধাক্কায় ইতিমধ্যেই উদ্যোক্তাদের উৎসাহে কিঞ্চিৎ ঢিলা পড়িয়াছে; যুদ্ধের চাপ সরাসরি ভারতবর্ষের বুকে আসিয়া পড়িবার পূর্ব্বেই যদি স্মৃতিরক্ষার কাজ শেষ না করা হয়, তাহা হইলে সমগ্র দেশের কাজ জনকয়েক নীরস গবেষকের হাতে গিয়া পড়িবে না তো? একটা কিছু খাড়া করিয়া যাইতে পারিলে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা অতীতের ধ্বংসস্তূপ ভেদ করিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিবার মত আশ্রয় সহজেই খুঁজিয়া পাইতেন। নিজেদের আলস্য ও গাফিলতির জন্য তাঁহাদিগকে বিপন্ন করা কোনক্রমেই সঙ্গত হইতেছে না।

* * *

আর একটি কথা, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের শেষ কয়েকটা মাস কি ভাবে কতখানি নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় আমরা একটু অতিরিক্ত পরিমাণেই পাইতেছি। নিশ্বাসের মাপে মাপে যদিও অনেক ক্ষেত্রেই মিল হইতেছে না, তথাপি এই প্রসঙ্গে আমাদের যাহা জানিবার তাহা জানা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কবি রবীন্দ্রনাথের জীবন তো রোগশয্যায় রবীন্দ্রনাথের জীবনমাত্র নয়; তাঁহার সুস্থ সবল কর্ম্মব্যস্ত প্রাণচঞ্চল ভাববিহ্বল জীবনের

সুষ্ঠু পরিচয়ই কাব্যের দিক দিয়া অধিকতর মূল্যবান। সে জীবনী রচনা করিবার চেষ্টা তো এখন পর্য্যন্ত দেখিতেছি না। সকলেই "আমি"কে লইয়া ব্যস্ত আছেন। প্রার্থনা করিতেছি, আগামী বাইশে শ্রাবণ "আমি"র পালা শেষ হইয়া "তুমি"কে আসরে আসিবার অবকাশ দেওয়া হউক। বিশ্বভারতী বুদ্ধিবিবেচনাপূর্ব্বক একটু লাগাম কষিলেই এই পরিবর্ত্তন সহজসাধ্য হইবে।

—

রবীন্দ্রনাথের বার্ষিক শ্রাদ্ধের দিন বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন হইতে 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' (মাসিক) বাহির হইবে। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত কর্ত্তব্যের ভার যাঁহারা গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা সাধু ব্যক্তি এবং সমগ্র জাতির ধন্যবাদের পাত্র তাঁহারা।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী এই পত্রিকার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সত্য ঘর-পোড়া গরুই যে সিঁদুরে মেঘ দেখিয়া ভয় পায় না, চৌধুরী মহাশয় তাহাই প্রমাণ করিলেন। 'সবুজপত্র', 'অলকা' ও 'রূপ ও রীতি'র অভিজ্ঞতাও তাঁহাকে কাবু করিতে পারে নাই; বোধ হইতেছে, তাঁহার সাহস অটুট আছে।

—

ধৈর্য্যের কথা তো খুব ঘটা করিয়া লিখিলাম, কিন্তু আসলে ধৈর্য্যরক্ষা কি সহজ? একটি "নূতন মনন ও সংস্কৃতিমূলক সাহিত্য পত্রিকা"র সম্পাদকীয় প্রবন্ধ "বেয়নেট ও লেখনী" পড়িতেছিলাম—

"দিনের পর দিন ধরে পৃথিবীময় যে অত্যুগ্র চাপা বিস্ফোরক ফোঁড়া পেকে-পেকে উঠে পৃথিবীর মানুষ-মানুষীদের অন্তরাত্মা শুষ্ক-কঠিন করে ফেলচে, তার অমানুষিক দুশ্চেষ্টা আজ স্বাচ্ছন্দ্যের সংগে তর-তর করে ছড়িয়ে পড়েচে। ব্যক্তি-সমাজের প্রত্যেকটা কোণে এবং মুহূর্তে-মুহূর্তে নতুন-নতুন ফাঁটলের রেখা টেনে তার উত্তরোত্তর বাড়তির পথও পরিষ্কার করে দিতে সাস্ত্র হয়ে পড়েচে এই বোবা দুর্বোধ পরিস্থিতি।...

"বাস্তবিকই, মানুষের চরিত্রের প্রাতিভাসিক ছায়াভাসের রূপারূপ কতোই-না

বৈচিত্র্যময় আর রহস্যময় হয়ে প্রকাশ পেতে পারে। এই যুদ্ধের জুজুতে আমাদের সকল ইচ্ছে শক্তিকে কতো-যে নতুন এবং ধূসর আলেয়ার প্রলেপের ধোঁকায় ওঠ-বোস করাচ্ছে, তার বিশদ ও শবল পর্যালোচনায় পরম অনুসন্ধিৎসু রসবেত্তার মগজ আর লেখনী সত্যিই তড়িৎশক্তি সম্পন্ন হবে।...

"বাঁচবো কি মারা পড়বো, নিজের-নিজের সৃষ্টির আনন্দের মধ্যে পর্যাপ্ত সময়ক্ষেপ করবার প্রচুর নিরংকুশ অবসর পাবো কি পাবো না, এ-উপলব্ধিতে আজ প্রলয়ংকরী ধাঁধার জ্বালাময় ঘূর্ণি অবিরত ঘুরপাক খাচ্ছে: যার তুলনী আমাদের দৈনিক পদক্ষেপের সীমানা পর্যন্ত সংক্ষেপ এবং কাঁটা বেড়ায় ঘিরে রাখার প্রলোভনে তীক্ষ্ণ প্রলোভিত করচে। আগাগোড়া সমস্ত উরোপটা ঘিরে, তুপ্পা উরেশিআয় একটা ভয়ানক করাল আতংকের ছায়া ঘনীভূত হয়ে মৃদুমন্দ আভীক্ষ্ণ্যময় আলাপের তালে দুলচে। একটা নির্বাক স্তব্ধতা, বিশাল প্রশস্ত একটা জমাট যবনিকা যেন পৃথিবীময় ইস্পাতের হুকে টাঙিয়ে একই সংগে একই ক্রূরতায় সমস্ত প্রাণীদের নিরম্বু নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে বীভৎসভাবে হত্যার উৎকট-উল্লাসে নৃত্যপর।"

পড়িয়া মনে হইল, এ "লেখনী"র পাশে "বেয়নেট" নিতান্তই ফুলশর; একমাত্র হাই একস্‌প্লোসিভ বম এই মারাত্মক লেখনীর পাশে বসিতে পারে। পড়িতে পড়িতে আমাদের "নিরম্বু নিঃশ্বাস রুদ্ধ" হইয়া আসে, "বীভৎস হত্যার উৎকট উল্লাসে" মনে হয়, লেখককে "ইস্পাতের হুকে" টাঙাইয়া সমালোচনার বুকে একটা "জমাট যবনিকা" টানিয়া দিই। কিন্তু তাহা হইবার নয় বন্ধুগণ, আইনে বাধে। সেইজন্যই ধৈর্য্যের প্রয়োজন।

—

ধৈর্য্যের সহিত শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর কবিতা পড়িতেছিলাম—

"যাঁরা প্রাতঃস্মরণীয়, যাঁরা মহাপ্রাণ
কবি যাঁরা শিল্পী যাঁরা জ্ঞানী যাঁরা
অরাজক অন্ধকারে একমাত্র আলোর ইশারা,...

তাঁদের বিনাশ এর পৈশাচিক ব্রত।...
ক্ষিপ্ত কুক্কুরের
বিষাক্ত দাঁতের মতো———"

অধৈর্য্যভাবে লাফাইতে লাফাইতে এ. আর. পি.র পোশাকে গোপালদা প্রবেশ করিলেন, মুখে-চোখে নিদারুণ উত্তেজনার ভাব, হাতে সবুজ মলাট 'কবিতা' একখানা। গোপালদা আমার দিকে লক্ষ্য না করিয়াই চেঁচাইয়া যাইতে লাগিলেন, মেরে পস্তা উড়িয়ে দেব হারামজাদার, জুতিয়ে লাস করব, চৌরঙ্গীর চৌমাথায় কাপড় খুলে নিয়ে চাবুক মারব, ষ্টিরাপপাম্প দিয়ে ধুয়ে দেব রাস্কেলকে, বালি দিয়ে কবর দেব, কিছু না পারলে কান ম'লেও দেব শেষ পর্য্যন্ত, উল্লুক, বেল্লিক, ইন্‌সিন্‌ডিয়ারি বম কোথাকার!

দেখিলাম, অবস্থা ভাল নয়। জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া চেয়ারে বসাইলাম। বলিলাম, ষাঁড়ের মত চেঁচিয়েই যে চলেছ গোপালদা, কি হ'ল ছাই বলই না।

গোপালদা ক্ষুব্ধ অভিমানাহত কণ্ঠে বলিলেন, যাঃ, বলব আবার কি, ওই নেপাটা, আমার মুখের ওপর বলে কিনা মাইকেল বাংলা জানত না, অভিধান দেখে ভাড়া-করা পণ্ডিতদের সাহায্যে বই লেখাত! এর পরেও ওকে আস্ত রাখব আমি! মারতে মারতে লালবাজার থানায় নিয়ে যাব না!

নেপা, শ্রীমান নৃপেন্দ্র, গোপালদার ভাইপো, বি. এ. পড়ে।

এরূপ উত্তেজনার একটা ব্যাপারেই গোপালদাকে সেবার কিছু দিনের জন্য রাঁচি পাঠাইতে হইয়াছিল। মনে মনে ভয় পাইলাম! শান্ত করিবার জন্য বলিলাম, না গোপালদা, এ ওর মনের কথা নয়। তুমি মাইকেল-পাগল ব'লে তোমাকে খ্যাপাবার জন্যে বলেছে।

রাগে দুঃখে গোপালদার চোখে জল আসিয়াছিল। একটু ধরা গলায় বলিলেন, আরে না ভাই, এই দেখ, নজির ধরিয়ে দিলে আমার হাতে। বুদ্ধদেব বসু নাকি ওই কথা লিখেছে। প'ড়ে দেখলাম, কিন্তু কিছু বুঝতে প্যারলাম না। বুদ্ধদেব তো আমাদের তেমন ছেলে নয়। ও নিশ্চয় অন্য কথা বলেছে, নেপা হারামজাদা বুঝতে পারে নি। দাও তো ভাই তুমি বুঝিয়ে।

'কবিতা'টি হাতে লইলাম, ১৩৪৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা, ৫২-৫৪ পাতায় বুদ্ধদেববাবুর মধুসূদন-প্রসঙ্গ। নৃপেন খানিকটা জায়গা আণ্ডারলাইন করিয়া রাখিয়াছে, তাহাই নজরে পড়িল—

"এখানে একটা প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই···। সেটা এই যে অতখানি প্রতিভা নিয়েও মধুসূদনের রচনা তাঁর গ্রন্থাবলীতেই আবদ্ধ রইলো কেন—অর্থাৎ, তিনি বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের মতো পরবর্ত্তী লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে কেন পারলেন না। তার কারণ—আমার মনে হয়—বাংলাভাষা সম্বন্ধে তাঁর অনভিজ্ঞতা। আসলে বাংলা তিনি ভালো জানতেনই না, অভিধান দেখে-দেখে ভাড়া-করা পণ্ডিতের সাহায্যে রচিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' তাই তাঁর রচনা-শক্তির একটি আশ্চর্য্য নমুনা হ'য়েই রইলো, বাঙালিজাতির মর্ম্মে প্রবেশ করল না।···বাংলাভাষায় যথেষ্ট দখল ছিলো না ব'লেই মধুসূদনের এই ব্যর্থতা, তাঁর অমিত্রাক্ষর মৌখিক ভাষার ছন্দে স্বতঃ-উৎসারিত হয় নি, তা নির্ম্মিত হয়েছে খুব বেশি যান্ত্রিক উপায়ে। এই কারণেই পরবর্ত্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব এত কম।"

গোপালদা আমার মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া ছিলেন। কি জবাব দিব? ওই পংক্তি কয়টির অন্য কোনও অর্থই যে করা যায় না। শান্তভাবে বলিলাম, বুদ্ধদেববাবু ভুল করেছেন। He is an honourable man, বুঝিয়ে দিলেই নিজের ভুল বুঝতে পারবেন।

গোপালদা খুশি হইলেন, বলিলেন, তাই দাও তো ভাই।

বলিলাম, এবারে হয় না গোপালদা, আসছে বারে দেখব চেষ্টা ক'রে। 'কবিতা'টা থাক আমার কাছে।

গোপালদা আর বসিলেন না, যাইবার মুখে বলিলেন, দেখ, নেপা তোমার কথা শোনে। ওকেও একটু বুঝিয়ে ব'লো, খ্যাপায় না যেন আমাকে আর।

গোপালদা চলিয়া গেলেন। আমি ধৈর্য্যের সহিত বুদ্ধদেববাবুর কবিতা পড়িতে লাগিলাম—

"যে-বীভৎস ইতরতা চলে বঙ্গভূমে,
সমালোচনার ছদ্মবেশে—"

মধুসূদন গৌড়জনের জন্য তাঁহার মহাকাব্য লিখিয়াছিলেন, বঙ্গজনের জন্য নয়।

—

অনেক দিন সাময়িক পত্রের সম্পাদনা করিতে করিতে মনে একটা অভিমান জন্মিয়াছিল যে, লায়েক হইয়া গিয়াছি। ও লাইনে আর কিছুই শিখিবার নাই। কিন্তু শ্রাবণের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গ" দৃষ্টে সে অভিমান ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। বুঝিতে পারিলাম, এখনও 'প্রবাসী'র চরণতলে বসিয়া দীর্ঘকাল শিক্ষা-নবিসি করিতে পারি। বিনয়-ভাব মনে জাগিতেই মনটা হালকা হইয়া গেল, ভারী আরাম পাইলাম।

মাঝে মাঝে অভ্যাসদোষে পুস্তক রচনা ও প্রকাশ করিতে হয়। আত্মীয়দের মধ্যেও দুই-একজনের লেখার বদ অভ্যাস আছে। কিন্তু এতদিন নিজেদের সম্পাদিত পত্রিকায় কিছুতেই নিজেদের অথবা নিকট-আত্মীয়দের রচিত পুস্তকের প্রশংসা ঢুকাইয়া দিবার মত কায়দা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। এবারকার "বিবিধ প্রসঙ্গে" 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয় সে কায়দা দেখাইয়া দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কায়দাটি এই। নিজের অথবা নিজের পুত্রকন্যার লিখিত কোনও পুস্তকের সম্পাদকীয় প্রশংসা করিতে হইলে সম্পাদক পুস্তকের নামমাত্র উল্লেখ করিবেন, লেখক বা লেখিকার নাম বাদ দিতে হইবে। তাহা হইলেই আত্মপ্রশংসার পাপ তাঁহাকে লাগিবে না। শ্রাবণের "বিবিধ প্রসঙ্গে" "পুণ্যস্মৃতি" শীর্ষক প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

এটি স্থূল বিজ্ঞাপন। কিন্তু ওই কার্য্যই সূক্ষ্মতর উপায়ে করা হইয়াছে "প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুবার্ষিকী দিবস"-প্রসঙ্গে। সূক্ষ্মতম চালের বশে 'পুণ্যস্মৃতি'র সঙ্গে 'নির্ব্বাণে'র নাম করিয়া সম্পাদক মহাশয় কি ভাবে ন্যায়ধর্ম্ম বজায় রাখিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার মত। পুস্তকটি 'প্রবাসী'-কার্য্যালয়ে যৎকিঞ্চিৎ

কাঞ্চনমূল্যের বিনিময়ে পাওয়া যায়, সে কথাটিও কৌশলে উহ্য রাখা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শেষোক্ত প্রসঙ্গে লিখিতেছেন—

"আমরা আগে আগে যে বলেছি, এইরূপ অনুষ্ঠানের অন্যান্য ব্যয় কমিয়ে রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী ক্রয় ও প্রচারে অধিক পরিমাণে টাকা খরচ করা উচিত, সেই পরামর্শের পুনরাবৃত্তি করছি। রবীন্দ্রনাথের ভাল জীবনচরিতও এই সময় পঠিত হওয়া উচিত—যদিও তিনি লিখে গেছেন, "কবিরে পাবে না তাহার জীবন-চরিতে।" তাঁর যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁর কোন জীবন-চরিতে নাই, তা তাঁর সম্বন্ধে লিখিত বহু প্রবন্ধে এবং "নির্ব্বাণ" ও "পুণ্যস্মৃতি" পুস্তকদ্বয়ে পাওয়া যাবে।" —পৃ. ৩৩৭।

যাক। ইট ইজ লেভার টু লেট টু লার্ন।

—

'ত্রিকাল' বাহির হইয়াছে। যাঁহাদের তিনকাল গিয়া এককালে ঠেকিয়াছে, তাঁহারা ইহাতে মজা পাইবেন না; যাঁহাদের এক কাল গিয়া তিনকাল বাকি আছে, 'ত্রিকাল' তাঁহাদেরই জন্য। মানুষের কথা বলিতেছি না, জাতির কথা বলিতেছি।

'ত্রিকাল' সর্ব্বপ্রথমে পুরুষ-নারী ভেদ ঘুচাইয়াছে। হুমায়ুন কবির ও শান্তি কবিরে লিঙ্গভেদ নাই। "উৎসর্গ" দেখুন—

"নীলিমা দেবী
শান্তি কবির
শ্রদ্ধাস্পদেষু"

'ত্রিকাল' হ্রস্ব-দীর্ঘের জ্ঞানও অনাবশ্যক মনে করে। "রবিন্দ্রনাথের দু'খানা অপ্রকাশিত ছবি" দেখিলেই ইহা বুঝা যাইবে।

'ত্রিকালে'র আদি মধ্য ও অন্ত্য আছে; ইহার আদিতে জহরলাল নেহরু, ইহার মধ্যে আবুল কাসেম ফজলুল হক (আমাদের মাননীয় গো!) এবং অন্ত্যে লিয় ট্রট্স্কি। তবে মধ্যেই মধ্যমণি। তিনিই ত্রিকালজ্ঞ। ম্যাজিক, ব্ল্যাক-আউট, মুখে ভাত, ঝাঁপ—এসব ফাউ।

কবিতাগুলি কিন্তু ফাউ নয়, বেসন-মোড়া ফাউল কাটলেটের মত, পোষ্টাইও বটে, আবার চাটও হয়। যেমন সমর সেনের—

"নীলচে চোখ, তুঙ্গ বুক, উরুর মসৃণ অন্ধকার,
দেহ স্বার্থের স্বর্গে আস্থা নেই,
ও নিরুদ্বেগ উদ্দাম বিলাস
নতুন মানুষের জন্মে॥"

আমরা তিনকাল-যাওয়া এককালের দলে, ত্রিকালের চার চোখ (মল্লাটের ছবি) দেখিয়া একটু ঘাবড়াইয়া গিয়াছি। আর কিছু নয়।

* * *

একটা চোখ একটু তির্য্যক ভঙ্গিতে পড়িয়াছে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর উপর। চৌধুরী মহাশয় প্রসবোন্মুখ 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সম্পাদক হইতে চলিয়াছেন—তাঁহার সম্বন্ধে শওকত ওসমানের আলোচনা সময়োচিত হইলেও সুহৃদয় হয় নাই। প্রমথভক্তরা নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করিবেন।

"চল্‌তি গদ্যের তিনি স্রষ্টা, নূতন ঢঙের প্রবর্তক ইত্যাদি মুখরব ঐতিহাসিক জ্ঞান ও গবেষণায় অজ্ঞ একদল চেলা-চমু গলা ফাটিয়ে জাহির করে। এই ঢক্কা-বাদকদের অনুরোধ, কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম' ও প্রমথ চৌধুরীর যে কোন প্রবন্ধ তাঁরা যেন পাশাপাশি রেখে পড়েন।...বীরবলী প্রবন্ধ ও তৎরচয়িতা—দুই-ই হাল্কা। সহৃদয় কল্পপ্রীতি(fancy)-র দীনতায় প্রমথবাবুর কোন প্রবন্ধ জাতে উঠে নি। বৈহাসিকতার জঠরেই তাদের অপমৃত্যু।...এরা চলে কিন্তু কিছু বলে না।...যে পুরোহিত মন্ত্র জানে না, সে ঘণ্টা নাড়ে বেশি—এ তো চিরদিনই সত্য।"

চৌধুরী মহাশয়ের জয়ন্তীতে যে সকল লেখককে খুব উৎসাহিতভাবে যোগ দিতে দেখিয়াছিলাম, তাঁহাদের অনেককেই 'ত্রিকালে' দেখিতেছি। তাই প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, ব্যাপারখানা কি?

—

শ্রাবণের 'ভারতবর্ষ' কবিতা-সম্পদে সমৃদ্ধ, কিন্তু টেক্কা মারিয়া গিয়াছেন শ্রীনরেন্দ্র দেব তাঁহার "মন্দ না!" কবিতায়। এত অল্প আয়োজনে যে এতখানি কাণ্ড করা যায়, না দেখিলে বিশ্বাসই করিতে পারিতাম না। যাদুকর নরেনদা, এক 'মন্দ না' লইয়াই ভেল্‌কি খেলিয়া গিয়াছেন। হাজার হোক পুরাতন হাড় তো! একটু শুনুন—

"সবাই বলে সুন্দরী সে—
আমার চোখেও মন্দ না!
রূপের দীপে দীপ্ত না হোক
দেখতে ভালই, মন্দ না!
চশমাখানির ফ্রেমটি ভাল
নূতন ঢঙের মন্দ না!
'আই-ব্রাউ' সে আপনি রচে
তুলির টানে মন্দ না!
পাতলা পেলব অধর পুটে
লালচে আভা মন্দ না!
গাল দু'টিতে দাড়িম-ভাঙা
রংটি লাগে মন্দ না!"

এবং এইরূপ আরও ত্রিশটি "মন্দ না"র পরে

কলম তোমার থামল দাদা,
থামলে লাগে মন্দ না!
কাব্যলেখার প্যাঁচটি এমন
বের করেছ মন্দ না!

কিন্তু "মিত্র সখী সচিব"কেই "মন্দ না" বলিতে বলিতেই আমাদের গিরিজা-দাদা প্যাঁচান্তরে পড়িয়াছিলেন। তাই নরেনদাকে একটু সাবধান করিতেছি।

* * *

আচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের "চরমক্ষণে" ও শ্রীআভা দেবীর "আলোকের অভিযান" শ্রাবণের 'ভারতবর্ষে' ১১৪ পৃষ্ঠায় পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে; কবিতা দুইটি পরস্পর-পরিপূরক। ডক্টর আচার্য্যের পদে উন্নীত হইয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়, কবিতাটি অনেকটা ভূতঝাড়া মন্ত্রের মত ঠেকিতেছে। আসলে কবিতাটি শিশু-সাহিত্যে স্থান পাইবার উপযুক্ত হইয়াছে। একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

"মরণ দ্রাবণ আসছে রাবণ লঙ্কাপুরীর থেকে
সেই ঘোষণা কলোচ্ছ্বাসে যাচ্ছে সাগর হেঁকে।
আজকে শুধু আসছে ভেসে কঙ্কেরি খাদ্য
শিরায় আমার নেচে বেড়ায় দুন্দুভিরই বাদ্য
লাগিয়ে দেব এ ভুবনে মহান ভূমিকম্প
যাই তো যাব জাহান্নামে দেব ভীষণ লম্ফ"

জয় বিষহরি! আচার্য্য মহাশয় এই জীবনে ভাগ্যবলে অনেক ভীষণ ভীষণ লম্ফ দিয়াছেন, আবার কেন?

—

যাঁহাদের বিশ্বাস, আমাদের ছেলেমেয়েরা আসন্ন জনযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে এবং যে বিলাস-ব্যসনের পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া দূষিত বাষ্পের প্রকোপে দমবন্ধ হইয়া তাহারা মরিতে বসিয়াছিল, সেই বিলাস-ব্যসনকে বিষবৎ বর্জ্জন করিয়া সুস্থ ও সবল হইবার সাধনা করিতেছে, তাঁহাদের অবগতির জন্য একটি অতি-আধুনিক পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"পৃথিবীতে নতুন বাতাস বইচে, চারদিকেই নতুনের ডাক আর অভিযানের সাড়া পাওয়া যাচ্চে প্রচুর। শতাব্দীর সেরা শতাব্দী হচ্চে এই বিংশ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দীর সেরা উদ্দেশ্য হচ্চে টয়লেটিং বিদ্যায় পুংখভাবে যত্নবান আর যত্নবতী হওয়া। এটিকেট-দুরস্ত হতে হলে টয়লেটিং ব্যাপারে হওয়া চাই সর্ব্ব-প্রথম সিদ্ধহস্ত। বাইরের জগতের যে দিকেই চোখ ফেরানো যায়, সে-দিকেই নজরে পড়বে সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে টয়লেটিংয়ের অনবদ্য নিদর্শন। কোন্ মহাপুরুষ নাকি তাঁর কোনো প্রখ্যাত পুস্তিকায় এক সময় তাঁর কোনো নায়িকার মুখ থেকে

বার করেছিলেন যে, সর্বপ্রথম গাত্রচর্ম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে, কারণ শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মনও প্রফুল্ল থাকবে, এমন কী প্রাণও সতেজ স্ফূর্তিবান হবে। কলেজের মেয়েগুলো অশেষ সৌন্দর্যবতী না হয়েও লাবণ্যবতী, অর্থাৎ সোণালি রঙ না হলেও সোণার আমেজ আসে টয়লেটিং-এ, আনা চলে স্বচ্ছন্দেই। রোমাঞ্চ না আসুক, অপূর্ব্ব পুলক-শিহরণ আর স্নিগ্ধতা আনে প্রচুর!"

গাত্রচর্ম্ম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবার সহজ পদ্ধতি সে-যুগের গুরুমশাইরা জানিতেন, বাপখুড়ারাও প্রয়োজন বোধ করিলে উক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া বিশেষ বিশেষ স্থলের গাত্রচর্ম পরিষ্কার করিয়া দিতেন, তাহাতে ছেলেমেয়েরা "স্ফূর্তিবান" হইত না বটে, বুদ্ধিমান হইত; পুলক-শিহরণ হইত কি না জানি না, তাহাদের রোমাঞ্চ নিশ্চয়ই হইত। কিন্তু আজকাল টয়লেটিঙের সাহায্যে "সতেজ স্ফূর্তিবান" হওয়া সত্ত্বেও দৈনিক সংবাদপত্রে, পত্রিকায় এবং 'মোহাম্মদী'তে এত বিজ্ঞাপন দেখি কেন?

—

আষাঢ়ের 'পরিচয়ে' পড়িতেছিলাম—

"পরম দুর্দিনে কেন এ দুর্বার সাহস আমার
ভয় নেই আর কোনো এজাসের উদ্ধত যৌবনে।
অগ্নিময় ট্রয়, ভোগ্যা আন্দ্রোমাকি, শুধু হেকুবার
হৃদয়েতে ধৈর্য্য কিবা অতি মত স্বপ্ন নিরসনে।"

ধৈর্য্যের কথা বটে, কিন্তু হৃদয়ের ধৈর্য্যের ব্যাপারই নয়, ইহা মগজের ধৈর্য্যের কথা। মনে পড়িয়া গেল বহুদিনবিস্মৃতা সুন্দরী হতভাগিনী কুলেণ্ডাকে, সেই তাহাকে একবার চকিতের মত ইলিসা-হাবুসের পথে দেখিয়াছিলাম, হকতুর উদ্যান-বাটিকায়। আমার পানে ম্লান দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কুলেণ্ডা প্রশ্ন করিয়াছিল, তুমি, তুমি, তুমিই কি দামিয়স? কি জবাব দিয়াছিলাম, মনে করিতে পারিলাম না। চোখ দুইটি জলে ঝাপসা হইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি পাতা উল্টাইয়া জীবনময় রায়ের "ভিজাস্যাঁতা দেশলাই কাঠি"টির সাহায্যে একটি বিড়ি ধরাইয়া

অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলাম। আর যাহাই করি, 'পরিচয়ে'র বাংলা কবিতা আর পড়িব না।

—

এ তেত্রিশ কোটির দেশে একমেবাদ্বিতীয়ম্ টিকিবার নয়, টিকিতে পারে না। এক এখানে মাটির গুণে বহু হইতে বাধ্য। 'প্রবাসী'ই কি ছাই লাগাম ধরিয়া এই বহুবাদ সামলাইতে পারিতেছে? ফাঁক পাইলেই ঘেঁটু ওলা শীতলা বানের জলের মত হুহু করিয়া আসরে ঢুকিয়া পড়িতেছে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা লইবার কালে তাঁহার পত্নী মৈত্রেয়ী দেবী তাঁহাকে কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন? শ্রাবণের 'প্রবাসী'র ৩৪৭ পৃষ্ঠা দেখুন। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখিতেছেন—

"কিমহং তেন কুর্য্যা যে নাহং মৃতা স্যাম্"

আবার ৩৭৯ পৃষ্ঠায় দেখুন, শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা লিখিতেছেন,

"যেনাহং নামৃতা স্যাং, কিমহং তেন কুর্য্যাম্?"

একজন সংস্কৃত-কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল, অন্যজন 'প্রবাসী'র সহকারী সম্পাদক। আমাদেরও বৈদিকমতে প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে—

কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম? (বানান ঠিক হইল তো?)

—

এবার আমাদিগকে ধৈর্য্যে পাইয়াছে। "ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা" 'নূতন লেখা'র বৈশাখ সংখ্যা পড়িতে পড়িতে এই অতি-আধুনিক ধৈর্য্যের অলভ্য নিদর্শন পাইয়া পুলকিত হইলাম। বেণু সরকার লিখিতেছেন—

"বনস্পতি আমি সখি, বনানীর তরুশ্রেণী মাঝে
শ্যামচ্ছায়া স্নিগ্ধ সুশীতল! আপেলের তরু তুমি,—
দুটী ফলে আনত-নিবিড়; অথবা বুকের মাঝে
বকুলের মালা,—ডুবায়ে অস্তিত্ব দেখে, মোরে চুমি'
চুষে লও বক্ষের সম্পুটে:
জল আমি সুশীতল
বিশাল দিঘীর, অর্দ্ধস্ফুট পদ্ম তুমি, তার বুকে
দোল অবিরাম, দোলাও অপরে: ভ্রমরার দল,

তোমারে ঘেরিয়া সখি করে গুঞ্জরণ—স্বপ্নলোকে
বাঁধে নীড়, চোখে স্বপ্ন আকাশ-কুসুম। হায় সখি।
তা'রা তো জানে না,—তুমি কারো নও, একান্ত আমার।"

বিশাল দীঘির সুশীতল জলে অর্দ্ধস্ফুট পদ্ম ভাসিতেছে, ভ্রমরার দল তাহাকে ঘিরিয়া গুঞ্জরণ করিতেছে। পদ্মের মালিক দীঘির জলের ভ্রূক্ষেপ নাই, সে ধৈর্য্য ধরিয়া চিত হইয়া পড়িয়া আছে এবং মিটিমিটি করিয়া মধুলোলুপ ভ্রমর-কুলের দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিতেছে, বাবাজীরা, যতই মধু খাও তোমরা, শেষ মার এই ওস্তাদের; মৃণাল ধরিয়া বসিয়া আছি, শ্রীমতীকে শেষতক এই শশার বুকেই লতাইয়া পড়িতে হইবে। এই উদার মনোভাব বাংলা দেশে ক্রমশ প্রসার লাভ করিতেছে বলিয়া সেকেলে বস্তাপচা খুনজখমগুলা আর বড় দেখিতে হয় না। এ যুগের রোহিণীরা সত্যই ভাগ্যবতী।

—

বিষ অনেকদূর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে; সপ্তকোটি কণ্ঠকে ত্রিংশকোটি কণ্ঠের কলকল নিনাদে পরিণত করাইয়া আমরা যতই আত্মপ্রসাদ লাভ করি না কেন, পশ্চিম-ভারতীয় জনাব জিন্নার পাকিস্থানী বিষ বাংলা দেশের জাতীয়তাবাদী মুসলমানদিগকেও ধীরে ধীরে জীর্ণ করিতেছে। শুধু ঘুনে-ধরা প্রাচীন 'মাসিক মোহাম্মদী'কেই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ মুসলিম ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত 'মুসলিম হল ম্যাগাজিনে'ও এই পাপ প্রবেশ করিয়াছে। সেখানেও দেখিতেছি—

"Pakistan is our deliverance, defence and destiny! We deny that we are one Nation with the Hindoos and the rest. Nothing unites us save arbitrary geographical boundary and temporary shackles of slavery. Nationality based on either of these must in its very nature be unnatural. It cannot, it will not last."

* * *

আবদুল হামিদ শেখ আষাঢ়ের 'মাসিক মোহাম্মদী'তে "ভারতীয় জাতীয়তা" প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে জন্ম নিয়েছে, তাতে ভারতে একজাতীয়তা গড়ে উঠতে পারে না, একথা আজ অস্বীকার করে লাভ নেই। হিন্দু ও মুসলমান মিঃ গান্ধী ও মিঃ জিন্নার

কথায় উঠে বসে। তার কারণ, এই দুই ব্যক্তিত্বে দু'টি বিপরীত চিন্তাধারা কাজ করছে। মিঃ গান্ধী যেমন মানবীয় পারিপার্শ্বিকতার হিন্দু-দিকটার প্রতিনিধিত্ব করছেন, মিঃ জিন্না তেমনি মুসলিম পারিপার্শ্বিকতার প্রতিনিধিত্ব করছেন।" অর্থাৎ হিন্দুরা গান্ধীবাদের আওতায় তাদের জীবন-পথ খুঁজে পেয়েছে, মুসলমানরা ইসলামের শক্তিবাদের আওতায় পথ খুঁজে পেয়েছে, আর সেই পথ দেখিয়ে দিয়েছেন মিঃ জিন্না। এই দুই নেতৃপুরুষের আওতায় হিন্দু ও মুসলমান তাদের পরস্পরের পরিপার্শ্বগত মুক্তিবোধকেই খুঁজে পেয়েছে। কাজেই পরস্পরের কর্ম্ম ও চিন্তাধারায়ও হিন্দুমুসলমান দুই জাতি। তাদেরকে একজাতিত্বের খোঁটায় বেঁধে দিলে আমাদের জাতীয় জীবনের পঙ্গুতাকেই ডেকে আনব। নিজ নিজ প্রতিভানুযায়ী আমাদের উভয় জাতিই পৃথিবীর সভ্যতার অংশ গ্রহণ করাই উচিত।...

ইস্‌লামের আদর্শ—"activity of life in all branches—physical & spiritual," আর কংগ্রেসের বা তথাকথিত হিন্দুদের আদর্শ অহিংসাবাদ বা চরকাবাদ—যাহাকে মরীচিকা বা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। কারণ অহিংসা ও মানবতা এক জিনিষ হতে পারে না। অহিংসা দেবতার জন্ম হতে পারে, যদিও ইসলামে তাহাও স্বীকার করে না। কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ মাঝে মাঝে হিংসা করে থাকেন; যেমন, তিনি অন্যায় দেখলে সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেন। নিষ্ক্রিয় শক্তি দ্বারা নহে, সক্রিয় শক্তি দ্বারাই। যেমন ভূ-কম্প, প্লাবন ইত্যাদি। কাজেই আদর্শের দিক দিয়ে কংগ্রেস তথা হিন্দুসমাজ ইসলামবিরোধী। 'Common memory' ও 'common ideal' যে কি, তাহা শিবাজী ও আওরঙ্‌জেবকে পাশাপাশি দাঁড় করালেই বুঝা যাবে। একজন হিন্দু 'ideal'-এর মূর্ত্ত প্রতীক আর একজন মুসলিম 'ideal'-এর দীনসেবক। আওরঙ্‌জেব মুসলমান সমাজে যে-জন্য

প্রিয়পাত্র ঠিক সেই কারণেই হিন্দুর কাছে ঘৃণার পাত্র ; তেমনি শিবাজীও হিন্দুর প্রিয়পাত্র এবং ঠিক সেই কারণেই মুসলমানের কাছে তস্কর ও প্রতারক। আধুনিক কালেও মিঃ গান্ধী যে-কারণে হিন্দুর কাছে প্রিয়পাত্র, মিঃ জিন্না ঠিক সেই কারণেই মুসলমানের প্রিয়পাত্র। কাজেই আমাদের এমন একটি লোক নেই যাকে হিন্দু মুসলমান সমপরিমাণে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে, এবং ঠিক সেই কারণে হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি এবং ভারতের একজাতীয়তার অস্তিত্ব কোনদিক দিয়েই দেখানো যায় না।

উপরের ইংরেজী ও বাংলা উভয় উদ্ধৃতির মধ্যে যে বিন্দুমাত্র যুক্তি বা সত্য নাই, যে কোনও সাধারণধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই তাহা বুঝিতে পারিবেন ; কিন্তু পরম-প্রপাগাণ্ডিষ্ট জিন্না সাহেবের কূট-কৌশলই এই যে, মিথ্যাকে বারংবার জোরের সহিত প্রচার করিতে করিতে সত্যের রূপ দেওয়া ; সেই ভয়াবহ প্রপাগাণ্ডা যে বাংলা দেশে বেশ আটঘাট বাঁধিয়া আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ হাতে হাতে মিলিতেছে। আমরা একটি ধ্রুব সত্য লইয়া এই কদর্য্য মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারি, আমাদের এই প্রপাগাণ্ডা সত্যের ভিত্তির উপর সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে। সে সত্য এই যে, ভারতবর্ষ এক দেশ এবং ভারতবর্ষের অধিবাসীবৃন্দ এক মহাজাতি। যাহারা সত্যসত্যই ভারতবর্ষের মঙ্গলকামী, তাহাদিগকে উঠিতে বসিতে শয়নে স্বপনে ঘরে বাহিরে উচ্চকণ্ঠে এই কথাটাই ঘোষণা করিতে হইবে যে, পাকিস্থানী মিথ্যা এই মহৎ সত্যের কাছে কিছুতেই দাঁড়াইতে পারিবে না।

একটা ভরসার কথা এই যে, 'ঢাকা মুসলিম হল ম্যাগাজিনে'র (১৯৪১-৪২) বাঙালী মুসলমান লেখকগণ বাংলা সাহিত্যের কথা বলিতে গিয়া পাকিস্থানী মিথ্যা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছেন ; তাঁহাদের সত্যকার সাহিত্যপ্রীতি ইহার কারণ হইতে পারে। এমন কি যে আবদুল হামিদ শেখের কম্বুকণ্ঠ পাকিস্থান-মহিমা-ঘোষণায় 'মাসিক মোহাম্মদী'তে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে, তিনিই ঢাকার মুসলিম ছাত্রদের পত্রিকায় "আমাদের সাহিত্য" প্রসঙ্গে অন্য কথা বলিতেছেন।

—

'শ্রীহর্ষ' মে ১৯৪২, শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের "তর্ক ও তর্কাতীত" প্রবন্ধ পড়িলাম। এ আমরা পূর্ব্বেই জানিতাম। গাড়ু ও বদনা—দুই ভিন্ন জাতীয় বস্তু একসঙ্গে দীর্ঘকাল পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়া চলিতে পারে না। দুঃখের বিষয় এই যে, দিলীপবাবু বাংলা দেশের অনেক ক্ষতি করিয়া এই শিক্ষাটা লাভ করিলেন। অনেক কষ্টে সংগৃহীত বলিয়া দিলীপবাবুর এই অভিজ্ঞতা মূল্যবান। তিনি যখন অজ্ঞান ছিলেন, তখন তাঁহারই প্রশংসাপত্র লইয়া বহু মহাপুরুষ তাঁহার আজন্ম-আকাঙ্ক্ষিত সমাজে নাসিকাগ্রভাগ প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন, আজ সজ্ঞানে দিলীপবাবু বুদ্ধের আসল স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, সমাজের লোকের কাছে তাহাও নিবেদন করিতে হইবে বইকি! দিলীপবাবু বলিতেছেন—

> বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে আমার স্বভাবের মিল প্রায় শূন্য। কিন্তু তবু ওঁর দিকে যে আমি প্রথমদিকে একটু বেশী ঝুঁকে ছিলাম, তার একটা কারণ নিশ্চয়ই ওঁর 'বন্দীর বন্দনা'র কবিত্ব, কিন্তু প্রধান কারণ ওঁর রচনার প্রাণশক্তি তথা ভঙ্গি-নৈপুণ্য, যাকে চলতি ভাষায় আমরা বলি চটক। তুমি জানো, মানুষের মন বেশী সহজে ভোলে এই সস্তা চটকের নগদবিদায়ে, এমন কি সে চটক বিষকুম্ভ-পয়োমুখ হ'লেও। বুদ্ধদেববাবুর লেখার মধ্যে জ্ঞানবত্তা বা সারবত্তা অকিঞ্চিৎকর হ'লেও তাঁর লেখার এই প্রাণবত্তার জন্যে অনেকেই প্রথমটায় তাঁর লেখার দিকে ঝোঁকে। কিন্তু ঐ "প্রথমটাই"। কারণ চটকের গাফিলিই হ'ল এই যে, সে দক্ষিণা যা দেবার দিয়ে গেল শুরুতেই, কাজেই শেষরক্ষা করতে পারে না।
>
> বুদ্ধদেববাবু আজকাল যেন একটু বেশী বেসামাল হ'য়ে পড়ছেন। কারণ এমন কি ছন্দ—যেটা 'বন্দীর বন্দনা'র যুগে তিনি জানতেন, মোটামুটি, সে সম্বন্ধেও তাঁর কান তীক্ষ্ণতা হারাচ্ছে—ফলে আজকাল ওঁর কবিতাটবিতা যে "nicely লিখা," এমন কথা ওঁর অতিবড় মিত্রও বলবে না। উদাহরণত ওঁর সদ্যোজাত "প্রণয়গাথা" কবিতাটি দেখো গত আশ্বিনের 'কবিতা'য়। মাত্রাবৃত্তর সঙ্গে স্বরবৃত্ত অক্ষরবৃত্ত মিলিয়ে সে যে এক কি অপরূপ জগাখিচুড়ি তিনি পরিবেষণ করেছেন—এমন কি মিলেরও ভুল করে স্থানে স্থানে—বিশেষ পূর্ণ পটের সঙ্গে অপূর্ণ পটের মিল দিয়ে। তবে এ পরিণতি তাঁর হ'য়ে থাকবে গদ্যছন্দের ছোঁয়াচে, "সংসর্গজা দোষগুণা ভবন্তি" বলে না? অবশ্য ওরিজিনাল

হবার উৎকট চেষ্টা এর কারণ হতে পারে। যে মেটিরিয়ালিষ্ট বলতে "আমরা বুঝছি শুধু তাদেরকে, যারা লেখে রাজ্যির যতসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে—(we mean by it that they write of unimportant things ;)—যারা প্রচুর নৈপুণ্য, প্রচুর শ্রম ব্যয় ক'রে শুধু নগণ্য ও ক্ষণিক রঙচঙকে খাঁটি ও শাশ্বতের চেহারা দিতে (that they spend immense skill and immense industry making the trivial and the transitory appear the true and the enduring)…।" কিন্তু করলে হবে কি ভাই, মানুষের মূল্যজ্ঞান যাবে কোথায় বলো। তাই—বলছেন শ্রীমতী [ভার্জিনিয়া উল্‌ফ] প্রথমটায় আমরা যতই কেন না মনকে চোখ ঠারি, শেষটায় হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে দীর্ঘশ্বাসের নীড়ে এই সকরুণ প্রশ্ন রণিয়ে উঠেই উঠে: "এসবের মজুরি পোষায় কি? এরা কিই বা চায় বলতে? (We drop the finished novel on the crest of a sigh—'Is it worth while? What is the point of it all?)" বুদ্ধদেববাবুর অত্যাধুনিক গদ্যছন্দ প্রভৃতির অক্লান্ত অন্তঃসারশূন্য গবেষণা দেখে কার না প্রতিধ্বনি করতে ইচ্ছে হয় এই গভীর প্রশ্নটির? কার মনে না আক্ষেপ জাগে যে এতখানি পরিশ্রম ও নৈপুণ্য কারু যদি অলীক চটকের মোহে না প'ড়ে আত্মনিয়োগ করত অন্তরাত্মার পরম আনন্দ ও আকূতিতে প্রকাশ করতে চেয়ে! তা না করে চাই শুধু বড়কে ছোট করতে—যেমন ঋষি বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রবাণীকে বুঝতে না চেয়ে শুধু সস্তা ব্যঙ্গ করা।

দেখিতেছি প্রসঙ্গান্তরে গোপালদাকে ভুল বুঝাইয়াছি, বড়কে ছোট করাই এই বেঁটে ভদ্রলোকের স্বভাব!

—

'দি টেলিগ্রাফ রিভিউ' পত্রিকার জুলাই সংখ্যায় দেখিলাম, আলিপুরের গবর্মেণ্ট টেলিগ্রাফ ষ্টোর্স ও ওয়ার্কশপ কলিকাতা হইতে অন্যত্র বরাবরের জন্য স্থানান্তরিত হইতে চলিয়াছে দেখিয়া সেখানকার কর্ম্মচারীগণ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছেন। যুদ্ধের দরুন সাময়িকভাবে সকল ব্যবস্থায়ই অদলবদল হইতে পারে এবং সব অসুবিধা সত্ত্বেও সকলেই এই সাময়িক পরিবর্ত্তনজনিত অসুবিধা ভোগ করিতে রাজি; ষ্টোরের কর্ম্মচারীরাও সাময়িক ব্যবস্থায় গররাজি ছিলেন না। কিন্তু অভ্যস্ত ও পরিচিত পরিবেশকে অকারণে অথবা কর্ত্তৃপক্ষের নিতান্ত খামখেয়ালিতে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যাইতে যদি

তাঁহারা রাজি না থাকেন এবং নিখিল-ভারত টেলিগ্রাফ ইউনিয়নে যদি ইহা লইয়া আন্দোলনও হয়, তাহা হইলে সমগ্র দেশের লোকই এই আন্দোলন সমর্থন করিবে, আমরাও করিতেছি।

কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধৈর্য্যহীন হইলে চলিবে না। ধৈর্য্য চাই। যাঁহারা আমাদিগকে দোহন ও নিষ্পেষণ করিবার জন্যই নিজেদের সামাজিক সম্পর্ক ও অর্থনৈতিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া, যাতায়াতের ব্যয়ভার স্বীকার করিয়া এবং অন্যান্য বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করিয়া সাতসমুদ্র তেরোনদী পার হইয়া এই মশা-ম্যালেরিয়ার দেশে আসিয়াছেন তাঁহারা যদি সহানুভূতির সহিত আমাদের এই সকল সমস্যাকে না দেখেন, তাহা হইলে আমাদিগকে ধৈর্য্য ধরিয়া সকল অসুবিধা সহ্য করিতে হইবে বইকি! ধৈর্য্য ধরিতে ধরিতে আমরা যথাকালে এমন একটি সীমায় আসিয়া পৌঁছিব, যেখানে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের যুক্তিহীন অত্যাচার উপেক্ষা করা সহজ হয়, চোখরাঙানিকে আর ভয় থাকে না। আশা করি, ছোটরা সেই সীমায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বড়রা অবহিত হইবেন।

—

বাংলা দেশে দেখিতেছি প্রত্যেক প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে এক একজন বুদ্ধিমান ঘোষ আসিয়া জুটেন, তাঁহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত সামলাইতে চট্টোপাধ্যায়রাই কাহিল হইয়া উঠেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁহার বাল্যসুহৃৎ মন্যপ গণেশ ঘোষ জুটিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ঘোষ, পদবী আর একটু বাড়াইয়া ঘোষালরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; এখন দেখিতেছি শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কাঁধে শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ আসিয়া চাপিয়াছেন। এই ঘোষ-পুঙ্গব 'বাংলা গদ্যে চার যুগ' নামক যে গবা-গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আত্মবিস্মৃত হইয়া শ্রাবণের "বিবিধ প্রসঙ্গে" তাহার জয়গান করিয়াছেন, বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে 'প্রবাসী'-সম্পাদক মহাশয়ের উক্তি আপ্তবাক্য বলিয়া গ্রাহ্য না হইলেও এমন বহু লোক আছেন, যাঁহারা চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রতি বিশ্বাসবশত প্রতারিত হইবেন, তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমরা আগামী বারে বাংলা গদ্যে এই ঘোষযাত্রার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিব।

—

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গত সতর বৎসর ধরিয়া 'প্রবাসী' 'মডার্ন রিভিউ', 'ক্যালকাটা রিভিউ', 'বঙ্গশ্রী', 'দেশ', 'আনন্দবাজার' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় রামমোহন রায় সম্পর্কে বহু নূতন তথ্য আবিষ্কার ও প্রকাশ করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই যে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার *Rajah Rammohan Roy's Mission to England* পুস্তক বাহির হইয়াছিল, তাহার পর তিনি রামমোহন সম্পর্কে আর কোনও পুস্তক বা পুস্তিকা প্রকাশ করেন নাই। ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত তাঁহার প্রবন্ধগুলিতে যে মূল্যবান ও অপরিহার্য্য উপাদান ছিল, তাহা একরূপ বিস্মৃতির

গর্ভেই তলাইয়া যাইতেছিল। এরই মধ্যে তাঁহারই ব্যবহৃত উপাদানগুলি লইয়া দুই-এক-জন ভাগ্যবান ব্যক্তি বৃহদাকার পুস্তক প্রকাশের দ্বারা নূতন আবিষ্কারের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছেন।

বিশেষ আনন্দের বিষয় ব্রজেন্দ্রবাবু এতদিনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের "সাহিত্যসাধক-চরিতমালা"র অন্তর্ভুক্ত করিয়া তাঁহার 'রামমোহন রায়' বাহির করিলেন। এই ক্ষুদ্র জীবনীটি আকারে ছোট, কিন্তু ইহাতে রামমোহন-জীবনীর এখন-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত সকল উপাদানই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে; ইহার অতিরিক্ত কথা বৃহৎ বৃহৎ জীবনীগুলিতে তো নাইই, ইহাতে এমন অনেক তথ্য আছে, যাহা অন্য কেহ দিতে পারেন নাই। ইহা সম্ভব হইয়াছে—ব্রজেন্দ্রবাবু গদগদ উচ্ছ্বাসের পক্ষপাতী নহেন বলিয়া। ব্রজেন্দ্রবাবু এই পুস্তকের ভূমিকায় রামমোহন-সম্পর্কিত তাঁহার যাবতীয় প্রবন্ধের একটি তালিকা দিয়া অধিকতর অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সহায়তা করিয়াছেন। যাঁহারা রামমোহনের স্বরূপ জানিতে চাহেন তাঁহাদিগকে এই পুস্তকখানি সংগ্রহ করিতেই হইবে।

তথাপি, রামমোহনের মত অত বড় একটি মহৎ জীবনের এই অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে আমাদের মন ভরে না, শুধু তথ্যই নয়, বিস্তৃত কাহিনী জানিবার জন্য আমাদের মন ব্যাকুল হয়। ব্রজেন্দ্রবাবু রামমোহন লইয়া যেরূপ একনিষ্ঠ পরিশ্রম করিয়াছেন, বাংলা দেশে সেরূপ আর কেহ করেন নাই। আমরা আশা করি, তিনি রামমোহনের একটি বৃহৎ জীবনী রচনা ও প্রকাশ করিয়া রামমোহন-সম্পর্কে বাঙালীচিত্তের স্ফূর্ত্তিবৃত্তি করুন।

—

দুঃখের বিষয়, আমাদের পুস্তক-সংগ্রহের সর্ব্বনাশা লোভ আবার আমাদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে। একবার এই পাট চুকাইয়া দিয়াছিলাম, লোভে লোভে আবার অনেককে প্রতিশ্রুতি দিয়াছি, কিন্তু এবারে স্থানাভাবে পুস্তক-প্রসঙ্গ লিখিয়াও প্রকাশ করা গেল না। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে অর্থাৎ পূজার পূর্ব্বে ও-পর্ব্ব শেষ বারের মত চুকাইয়া নাকখৎ দিব। ভবিষ্যতে সমালোচনার্থ পুস্তক দিয়া আমাদিগকে কেহ বিপন্ন করিবেন না।

———

সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস সহঃ সম্পাদক—শ্রীঅমূল্যকুমার দাশগুপ্ত
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা এককালে বাংলার মাসিক-সাহিত্য-পাঠকদের বড় প্রিয় ছিল—আজ সেই সাময়িক সাহিত্য হইতে অপসৃত হওয়ায় তাঁহার কবিতার পাঠকসংখ্যাও কমিয়াছে। তাঁহার জনপ্রিয়তার যে দুইটি কারণ ছিল, তাহার একটি এই সাময়িকতা,—তিনি সাময়িক সাহিত্যের উপযোগী, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাহাকে topical বলে, সেই বিষয়ক কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন; সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা অবলম্বনে উদ্দীপনাময় কবিতা সদ্য সদ্য রচনা করিয়া সংবাদপত্র-পাঠক বাঙালীর কাব্যপিপাসা উদ্রেক করিতেন। অপর যে গুণ তাঁহার কবিতার প্রতি পাঠকসাধারণের অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহা তাঁহার আশ্চর্য্য ছন্দনির্ম্মাণকৌশল। এই দুই গুণে তিনি তাঁহার জীবদ্দশায় রবীন্দ্রোত্তর কবিগণের মধ্যে সমধিক যশস্বী হইয়াছিলেন।

এই দুই গুণের প্রথমটির—অর্থাৎ সাময়িকতার মূল্য স্থায়ী হইতে পারে না, তাই সে গুণের এখন আর তেমন আকর্ষণ নাই। কিন্তু দ্বিতীয় গুণটির—ছন্দচাতুর্য্যের—আকর্ষণ পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও তেমনই থাকিবার কথা, এবং সেই কারণেই সত্যেন্দ্রনাথ আজিও সম্পূর্ণ খ্যাতিভ্রষ্ট হন নাই।

উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতে মনে হইবে, কবিহিসাবে সত্যেন্দ্র-নাথের কৃতিত্ব খুব বেশি নয়—কাব্যবস্তুর সাময়িকতা বা সাংবাদিকতা, এবং ছন্দগৌরব,—ইহার কোনটাই উৎকৃষ্ট কবিশক্তির নিদর্শন নয়;

পাঠকসাধারণের পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত কাব্য-রসিকের নিকট [illegible] নয়। কিন্তু আমাদের দেশে সেইরূপ রসিকের সংখ্যা আধুনিক কালে আরও কম; অতএব, এক্ষণে কোন কবির কবিখ্যাতি এইরূপ লক্ষণের উপরেও নির্ভর করিতে পারে। অতি-আধুনিক কালে তাহারও প্রয়োজন হয় না, কারণ, এক্ষণে কবিতা হইতে ছন্দ একেবারে বিতাড়িত হইয়াছে, এবং বিষয়বস্তুও হাসপাতাল ও বাতুলাশ্রম হইতে আমদানি না করিলে পাঠকের চমক লাগে না। অতএব, সত্যেন্দ্রনাথের ওই দুই গুণ ব্যতীত আর কিছু আছে কি না, এ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কাহারও মনে কোন সন্দেহই জাগে নাই। সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্ব সম্বন্ধে আধুনিক অনেক কাব্যরসিক ব্যক্তিকে নাসাকুঞ্চিত করিতে দেখিয়াছি; এবং তাঁহার কবিতার প্রতি যাঁহাদের এখনও কিছু অনুরাগ আছে—ওই ছন্দ, এবং তাঁহার কাব্যের স্বাজাত্য-প্রেরণাই তাহার কারণ বলিয়া মনে হয়।

এ কথা অস্বীকার করি না, এবং যে কেহ তাঁহার কবিতারাশির সহিত সম্যক পরিচিত তিনিও স্বীকার করিবেন যে, এই ছন্দকলাকুতূহল তাঁহার অধিকাংশ কবিতার কাব্যস্ফূর্ত্তির প্রধান প্রেরণা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে, ছন্দবৈচিত্র্য সৃষ্টি করিবার আগ্রহ, বা বাংলাভাষার ধ্বনিসম্পদকে নানা ভঙ্গিতে লীলায়িত করিয়া তাহার শক্তি পরীক্ষা করাই তাঁহার অনেকগুলি কবিতার একমাত্র অভিপ্রায় বলিয়া মনে হইলেও, সত্যেন্দ্রনাথের কবিকীর্ত্তি কেবল তাহাতেই পর্য্যবসিত হয় নাই। তাঁহার রচনার অজস্রতার মধ্যে, ছন্দের সহিত ভাষা, ভাব ও অর্থের সম্মিলন বহু কবিতায় ঘটিয়াছে; অর্থাৎ, ছন্দই তাঁহার প্রকাশভঙ্গির একটি প্রধান অঙ্গ হইলেও, কবিহিসাবে তাঁহার একটি বাণী ছিল—সে বাণীর কল্পনাগৌরব যেমনই হউক, তাহার একটা বৈশিষ্ট্য আছে।

ছন্দের প্রতি তাঁহার এই পক্ষপাত একটি অ-কবিসুলভ রচনাবিলাস না হইয়া সত্যকার কবিপ্রকৃতিগত একটা লক্ষণ হইতেও পারে। প্রত্যেক কবিরই কবি-প্রেরণা বিভিন্ন হইয়া থাকে—যে সুন্দর-বোধের আতিশয্যে মানুষের মধ্যে কবিত্ব-ব্যাধি দেখা দেয়, সেই সৌন্দর্য্যের নানা দিক ও নানা চেতনা আছে। সৃষ্টি-সুষমার মূল যে সুরসঙ্গতি, তাহা কবিচিত্তে বহুবিধ রূপে সঞ্চারিত হয়;—বাক্য-অর্থের অতীতরূপে যাহা সঙ্গীত, বাক্য-অর্থ-বর্জ্জিত নিছক রূপ-রং-রেখার সঙ্গীতিরূপে তাহাই চিত্রাদি কলাশিল্প, এবং সৃষ্টির যাবতীয় রূপের যে বাঙ্ময়ী সুষমা, তাহাই কাব্য-কলা। এই শেষোক্ত কবিপ্রেরণা একান্তভাবে বাক্যেরই অনুগত; বাক্যের যে দুই প্রাথমিক উপাদান—ধ্বনি ও অর্থ, কবি সেই দুইয়েরই উপরে তাঁহার সৃজনীশক্তি বা শিল্পকৌশল প্রয়োগ করেন; ছন্দ—ধ্বনির, এবং কল্পনা—অর্থের লাবণ্য বৃদ্ধি করে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় কবিধর্ম্মের এই মূল প্রবৃত্তি প্রবলভাবে কার্য্যকরী হইয়াছে,—ছন্দের আনন্দ ও অর্থের চমৎকারিত্ব এই দুইই তাঁহার কাব্যে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান; অতএব তিনি যে একজন সত্যকার কবিশিল্পী, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহাতে আশা করি কোন তর্কের অবকাশ নাই—সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের বহির্গত লক্ষণ এবং সেই লক্ষণে তাঁহার যে কবিশক্তির প্রমাণ আমি গ্রাহ্য করিয়াছি, তাহাতে কোনও গুরুতর সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু বাক্য ও অর্থের, এবং ধ্বনি ও ছন্দের যে শিল্পকলা, তাহাই বিশিষ্ট কবিকীর্ত্তি বলিয়া গণ্য হইলেও, যে ভাব ও ভাবোদ্ভূত রস—বাক্য ও অর্থের বন্ধন স্বীকার করিয়াই, তাহাকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করে, তাহার কোন্ রূপ সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ধরা দিয়াছে?—কারণ, একটা কোন রস-রূপ অবশ্যই তাহাতে আছে—তাহা উৎকৃষ্ট রস-রূপ কি না, সে কথা স্বতন্ত্র।

সত্যেন্দ্রনাথ জগৎকে যে দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, তাহা উৎকৃষ্ট রসদৃষ্টি কি না, সে বিচার অপেক্ষা, তিনি যাহাতে আনন্দ পাইয়াছিলেন এবং সেই আনন্দই প্রকাশ করিবার জন্য বাগর্থের এমন সাধনা করিয়াছিলেন —সে আনন্দ যে নিশ্চয়ই একটি সত্যকার আনন্দ তাহাই স্বীকার করিয়া, তাঁহার সেই দৃষ্টির ভঙ্গি ও তাহার বিষয়টিকে যতদূর সম্ভব বুঝিয়া লইতে পারিলেই, তাঁহার কবিতা আমরা আরও যথার্থভাবে উপভোগ করিতে পারিব।

সত্যেন্দ্রনাথ মুখ্যত যাহাকে তাঁহার কাব্যে বাক্যে ও ছন্দে রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞানগোচর বুদ্ধিগোচর জগৎ—রহস্য-সংশয়ের জগৎ নয়, বস্তুভেদী ভাবকল্পনার জগৎ নয়। ইহাই সর্ব্বাগ্রে বুঝিয়া লইতে হইবে। বর্ত্তমান প্রত্যক্ষ-বাস্তব যে কত সত্য—অতীত তাহার সাক্ষ্য দিতেছে; সমাজ রাষ্ট্র-নীতি ও ধর্ম্ম, কাব্য ও শিল্পকলা, মানুষের যে পরিচয় যুগে যুগে অভিব্যক্ত করিয়াছে, তাহাতে মানুষের শক্তি ও প্রতিভার নিঃসংশয় প্রমাণ আছে; জীবনের যে আদর্শ স্থির হইয়া গিয়াছে, তাহাকেই দৃঢ়তার সহিত অবলম্বন করিয়া ভবিষ্যতের জয়যাত্রায় অগ্রসর হইতে হইবে; মানুষের অন্তরের জ্ঞান ও বহিঃপ্রকৃতির নিয়ম এই দুইয়ের মধ্যে বিরোধ নাই—সৃষ্টিবিধানের মূলে কোনও উন্মাদ-কল্পনা বা অবিচারী বুদ্ধি নাই;—পিতামহ অক্ষয়কুমার দত্তের এই বিজ্ঞানবাদী মনোভাব পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথে সংক্রামিত হইয়াছিল; একজনের চিত্তে যাহা তত্ত্বরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, অপরের চেতনায় তাহাই ভাবাবেগে মণ্ডিত হইয়া কাব্যকলার বিষয়ীভূত হইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনা—বস্তু ও তথ্যকে, ইতিহাস ও বিজ্ঞানকে, লোকব্যবহার ও চরিত্রনীতিকে, ব্যক্তি সমাজ ও জাতির যুক্তিসঙ্গত কল্যাণকে অতিক্রম করিয়া কোন অপ্রত্যক্ষ জগৎ বা দূর-দুর্লভ

আদর্শের ভাব-মোহে আবিষ্ট হয় নাই। মানুষের ভাষায় যাহা সুস্পষ্টরূপে ধরা দেয়, পুরাণে ইতিহাসে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যাহার সুঠাম প্রতিমা ভাবুক ও মনীষীর চক্ষে—জ্ঞানবুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন পুরুষের চিত্তে—নিত্য উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তাহারই বন্দনায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ ভাষা ও ছন্দের, উপমা ও অলঙ্কারের, যুক্তি ও দৃষ্টান্তের সকল উপকরণ পুঞ্জীভূত করিয়াছিলেন; সেই জ্ঞানের আনন্দ, সেই আত্মপ্রত্যয়ের আবেগ শব্দ ও অর্থের মণি-কাঞ্চন-মিলনে বিচ্ছুরিত হইয়াছে। সাধারণত তাঁহার চক্ষে স্বপ্নের ঘোর ছিল না, বরং অতিজাগ্রত চেতনার বশে তাঁহার বিস্ফারিত চক্ষু বস্তুর বাস্তবমূর্ত্তি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিত, এবং মনোজগতের সহিত বহির্জগতের সাদৃশ্যও যেমন আবিষ্কার করিত—অর্থাৎ, বাহিরের দৃশ্যরূপের মধ্যেই যেমন অন্তরের ভাবচিন্তার প্রতিবিম্ব দেখিয়া চমৎকৃত হইত, তেমনই, বিচিত্র ও বিক্ষিপ্ত বস্তুরাশির মধ্যেও রূপ-রং-রেখার সাদৃশ্যরীতি—বৈষম্যের মধ্যেও ঐক্য আবিষ্কার করিয়া, সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সুনিয়ম সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইত।

কবিমানসের এই প্রবৃত্তি, কাব্যের এই আদর্শ নূতন নয়—আমাদের দেশে তো নহেই। জীবন ও জগৎকে একটি সুস্থির সুনিয়ন্ত্রিত, বুদ্ধি ও বিবেক-সম্মত আদর্শে অনুভাবনা করিয়া, কাব্যে তাহাকেই শব্দ ও অর্থের সুস্পষ্ট আকারে, অতিশয় বোধগম্য অথচ চিত্তগ্রাহী-রূপে প্রতিফলিত করাই সকল প্রাচীন কবির অভিপ্রায় ছিল—ইহাকেই কাব্যের ক্লাসিক্যাল আদর্শ বলে। এই আদর্শ যে এককালে উৎকৃষ্ট কাব্যসৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছিল, তাহাতেই প্রমাণ হয় যে, ভাবকল্পনার দিক দিয়া ইহা মিথ্যা নহে। পরে যখন সেই ভাবদৃষ্টির মৌলিক প্রেরণা আর রহিল না—প্রাচীন কবিগণের কাব্যপ্রেরণার পরিবর্ত্তে সেই কাব্যের বহির্গত রচনাকৌশলই কবিগণের উপজীব্য হইয়া উঠিল—কাব্যকলা যখন

ব্যাকরণের পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়িল, তখনই এই আদর্শ কাব্যরসিকের শ্রদ্ধা হারাইল। এই আদর্শের বিরুদ্ধে যে নূতন আদর্শের অভ্যুদয় পরবর্ত্তী কালের কাব্য-সাহিত্যে ভাবকল্পনার বিপর্য্যয় ঘটাইয়াছে—তাহাতে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেকের শাসন অগ্রাহ্য হইয়াছে, তথ্যের বা বস্তুর বাস্তবরূপের নিঃসংশয় আধিপত্য আর নাই; সামাজিক ন্যায়ধর্ম্ম ও নীতির উপর ব্যক্তির ব্যক্তিচেতনার মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—সৃষ্টির মধ্যে যে কোনও মানবীয় সংস্কারের মঙ্গল-অভিপ্রায় অথবা সুনির্দ্দিষ্ট গন্তব্যযুক্ত গতিধারার অনুসরণ আছে, তাহার নিশ্চয়তা নাই; এক কথায়, অন্তর ও বাহিরের মধ্যে কোনও নীতি বা যুক্তির সৌষম্য নাই; বরং, ব্যক্তির স্বতন্ত্র কামনায়, তাহার নিজস্ব আধ্যাত্মিক পিপাসার প্রয়োজনে, স্বতস্ফূর্ত্ত প্রেরণার দিব্য আবেশে যে রহস্য উপলব্ধি হয়, তাহা অপেক্ষা সত্য আর কিছুই নাই; এবং সে সত্যও যুক্তিবিচারের সত্য নহে। এজন্য আধুনিক সকল শ্রেষ্ঠ কবির জীবনদর্শন স্বতন্ত্র; তাঁহাদের কাব্যে ছন্দ অপেক্ষা সুর বড়, বাক্য-অর্থের পরিস্ফুটতা অপেক্ষা ভাব-ব্যঞ্জনার অসীমতাই অধিকতর উপাদেয়।

সত্যেন্দ্রনাথ এ যুগের কবি হইয়াও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হন নাই; এইজন্যই, আধুনিক রুচি ও রসবোধের দরবারে তাঁহার কবি-প্রতিভা সমুচিত সম্মানে বঞ্চিত হইয়াছে। কিন্তু কাব্য ও কবিকে কেবল যুগের আদর্শে বিচার করিলেই সুবিচার করা হয় না; এবং কবিমানস যেমন যুগ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, তেমনই মানুষের ভাব-চিন্তার এমন একটা স্তর আছে, যাহা কোন যুগেই লুপ্ত হইতে পারে না। কাব্যের যে প্রবৃত্তিকে ক্লাসিক্যাল বলা হইয়া থাকে, তাহার মূল প্রেরণা মানুষের স্বাভাবিক সমাজধর্ম্মনিষ্ঠার মধ্যেই আছে; একটা কিছুকে স্থায়ী ও দৃঢ় বলিয়া প্রত্যয়—নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল সদ্যধ্বংসী জগতের একাংশে

একটা স্থির সত্তার আশ্বাস মানুষ চায়। প্রবল স্রোতোমুখে যে বিশৃঙ্খল রূপরাশি অবিন্যস্ত কুসুমদামের মত দৃষ্টিগোচর হইয়া পলকে অদৃশ্য হইতেছে, তাহাকে মনের গ্রন্থিসূত্রে মাল্যরূপে সুবিন্যস্ত করার প্রয়াস যেমন মানুষেরই ধর্ম্ম, তেমনই অপর দিকে সেই স্রোতোবেগের উন্মাদনার অজুহাতে, সকল বহির্গত শৃঙ্খলার মূল্য অস্বীকার করিয়া যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের উল্লাস, তাহাও মানুষের প্রতিভাকে নবসৃষ্টির দুঃসাহসে গৌরবান্বিত করিয়াছে। কাব্যসাহিত্যে মানবচিত্তের এই দ্বিবিধ আকাঙ্ক্ষাই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে; বরং, সাধারণ মানবীয় রসপিপাসা পূর্ব্বোক্ত প্রবৃত্তিরই অনুকূল—অঘোরপন্থী তান্ত্রিক অপেক্ষা, যোগী সন্ন্যাসী অপেক্ষা, সমাজ ও গৃহধর্ম্মের গুরুকেই মানুষ অধিকতর শ্রদ্ধা করিয়াছে। বাস্তবের কঠোর শাসন হইতে মুক্তিলাভের আনন্দ যে কাব্য হইতে যত অধিক লাভ করা যায়, তাহাই উৎকৃষ্ট কবিকল্পনা বলিয়া স্বীকার করিলেও, সেই মুক্তিলাভের অবকাশ জীবনে সর্ব্বদা ঘটে না বলিয়া—এবং প্রত্যক্ষ বাস্তবের সঙ্গেই অহরহ সম্পর্ক করিতে হয় বলিয়া, যে কাব্য এই বাস্তবকেই একটি সহজ বুদ্ধি ও সরল কারুকলার দ্বারা মণ্ডিত করিয়া আমাদের স্বাভাবিক নীতিজ্ঞান ও হৃদয়বৃত্তিকে চরিতার্থ করে, সেই কাব্যই আমরা আরও আগ্রহের সহিত উপভোগ করি; এবং হিসাব করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, জগতের কাব্যসাহিত্যে কবিকল্পনার এই ভঙ্গিই মানুষের কাব্যপ্রীতির উদ্রেক করিয়াছে। অতএব সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাও যদি এই জাতীয় হয়, তবে কবিহিসাবে তাঁহার অগৌরবের কারণ নাই।

২

উপরে সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-প্রকৃতি এবং কবিমানস—দুইয়েরই কিছু পরিচয় দিয়াছি, এক্ষণে তাঁহার কবিতার পরিচয় দিব। যাঁহারা

কবিতার একটি বিশেষ আদর্শ ধরিয়া কাব্যবিচার করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, যেহেতু কাব্য মানুষের মনের সৃষ্টি—এবং সেই মনে রসের অনুভূতি অশেষ প্রকারে হইয়া থাকে, অতএব তাহার প্রকাশের রূপও বহুবিধ হইবার কথা। উৎকৃষ্ট কাব্য বলিতে আমরা কি বুঝি, তাহা বলা সহজ নয়, কাব্যের একটা সংজ্ঞা যেমন করিয়াই নির্দ্দেশ করি না কেন, দেখা যাইবে, শেষ পর্য্যন্ত সেই সংজ্ঞার বাহিরে এমন বস্তুও থাকিয়া যায়, যাহা আমাদের অন্তরে কোন এক প্রকার রসোদ্রেক করিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বে রোমান্টিক ও ক্লাসিক্যাল—কাব্যের যে দুই প্রকৃতির কথা বলিয়াছি, তাহাতেও কাব্যের সকল পরিচয় নিঃশেষ হয় নাই; খুব বড় কল্পনা যে কাব্যসৃষ্টি করে, তাহার রসপ্রেরণা রসিকের চিত্তে নিষ্ফল হইবার নয়, অতএব সেখানে কোন প্রশ্নই উঠে না। কিন্তু কাব্য বলিতে আর একটি বস্তুও বুঝায়, তাহার নাম—শব্দার্থের চমকপূর্ণ বাণী। আমি কেবল বাক্‌চাতুরির কথাই বলিতেছি না—বিশিষ্ট ভাবসম্পদ এবং অর্থগৌরবযুক্ত ছন্দোময় বাণীর কথাই বলিতেছি। এরূপ কাব্যকে আমরা মনঃপ্রধান বলিতে পারি, কিন্তু তবুও তাহা কাব্য; কারণ সেইরূপ রচনায়, ভাবের জগৎ না হইলেও—একটা বাণীর জগৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে—শব্দের মার্জ্জিত মুকুরে বস্তুর বস্তুরূপ, এবং ভাবের অর্থ-শ্রী উজ্জ্বল ও স্ফুটতর হইয়া উঠে। ইহাও প্রতিভাসাপেক্ষ, ইহাও কবিকর্ম্ম। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলি ধীরভাবে পাঠ করিলে স্বীকার করিতেই হয় যে, তাহাতে যে সাধনা ও শক্তির পরিচয় রহিয়াছে, তাহা সামান্য নয়; সেই বাগর্থের নিপুণ যোজনা, ভাষার বৈভব, ও ছন্দের বৈচিত্র্য বাংলা সাহিত্যের যে অভাব-পূরণ করিয়াছে, তাহা আর কাহারও দ্বারা হইত না।

কিন্তু এরূপ বিচার-বিতর্ক অপেক্ষা কবিতার সহিত একেবারে

সাক্ষাৎ পরিচয় করাই ভাল, কারণ, 'Example is the best definition।' আমি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য হইতে কয়েক অঞ্জলি ফুলপল্লব' তুলিয়া সকলের সম্মুখে ধরিব,—একটু সাজাইয়াও লইব, কারণ সত্যেন্দ্রনাথের কবিতার বৈচিত্র্যও অল্প নয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে সামান্য একটু ভূমিকার প্রয়োজন হইবে।

সত্যেন্দ্রনাথের মন ছিল চোখ দুইটির একেবারে ঠিক পিছনেই, এবং কানও ছিল অতিশয় প্রখর; অর্থাৎ, সমস্ত মনখানি ছিল বহির্জগতের দিকে উন্মুখ। এজন্য আমরা তাঁহার কবিতায় দুইটি জিনিস নানা ভঙ্গিতে প্রকাশ হইতে দেখি,—দেখার আনন্দ ও শোনার আনন্দ। যাহা ভিন্ন দেশের ও ভিন্ন কালের, তাহার জন্যও তাঁহার মনের ক্ষুধা অল্প ছিল না; তাই প্রকৃতির চিত্রশালা এবং পণ্ডিতের পুথিশালা দুইই ছিল তাহার সমান আশ্রয়। এই যে জানিবার ক্ষুধা এবং জানার আনন্দ—প্রধানত এই দুইয়ের তাগিদে তিনি সরস্বতীর আরাধনা করিয়াছিলেন। বিহারীলালের 'সারদা' ও রবীন্দ্রনাথের 'লীলাসহচরী জীবনদেবতা' সত্যেন্দ্রনাথের মানসে আর এক মূর্ত্তিতে আর এক রূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। মানুষের ইতিহাসে, তাহার জ্ঞান প্রেম শক্তি ও পৌরুষের যেমন একটি আদর্শ যুগ হইতে যুগে স্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে, তেমনই, বহির্জগৎও একই ছন্দে আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিচর্য্যা করিতেছে—ইহা কল্পনা নয়, ইহা ভাবাবেশের দুর্জ্ঞেয় উপলব্ধি নয়। সৃষ্টির বিকাশ-ধারা ও ছন্দের এই বহুবিচিত্র রূপ বাণীতে বাঁধা পড়িয়া যে সর্ব্ববিদ্যাবার্ত্তাবিধির রূপ গ্রহণ করিতেছে—সত্যেন্দ্রনাথ তাহারই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে 'মহাসরস্বতী' নামে আবাহন করিয়া বলিতেছেন—

উদ্ভাসিছে সত্যলোক নির্নিমেষ ও তব নয়ন,
তপোলোক করিছে চয়ন
নক্ষত্র-নূপুর-চ্যুত জ্যোতির্ম্ময় পদরেণু তব,
জনলোকে তোমারি সে জনম-কল্পনা নব নব
পুরাতনে অবীয়ান;—নব নব সৃষ্টির উন্মেষ!
মহীয়ান মহলোক লভি তব মানস-উদ্দেশ—
ব্যাপ্ত-পরিবেষ।
স্বর্গলোকে স্বেচ্ছা-সুখে জাগ' তুমি গীতে
দেবতার চিতে।

ভূলোকে ভ্রমর-গর্ভ শুভ্র-নীল পদ্ম-বিভূষণা,
হংসারূঢ়া—ময়ূর-আসনা!
তুমি মহাকাব্য-ধাত্রী! মহাকবিকুলের জননী!
কখনো বাজাও বীণা, কভু দেবী! কর শঙ্খধ্বনি,—
উচ্চকিয়া উদ্দীপিয়া; চক্র শূল ধর ধনুর্ব্বাণ;
হল-বাহী কৃষকের ধরি' হল কভু গাহ গান,—
পুলকি' পরাণ!—
সর্ব্ব-বিদ্যা-বার্ত্তা-বিধি দেখিতে দেখিতে
গড়ি' উঠে গীতে!

—'মহাসরস্বতী' (অভ্র-আবীর)

সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় জ্ঞানের শুভ্র আলোক—মহাসরস্বতীর সেই জ্যোতি—ভাবে ও রূপে বর্ণময় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের অতীত সাধনায় মানুষের যে গৌরব—সেই গৌরবের গর্ব্ব, এবং সেই জাতিরই বর্ত্তমান অধঃপতনের তীব্র গ্লানিবোধ—ইহাই তাঁহার কবিতার ভাবের দিক; কিন্তু জ্ঞানের সেই শুভ্র আলোক যে অনুভূতির আবেগে রঙিন হইয়া উঠিত, তাহাও জাগ্রত অনুভূতির আবেগ—স্বপ্নকল্পনার রং নয়। কবি বলিতেছেন—

শুভ্র তোমার অঙ্গবিভা অগাধ শূন্যে মূর্চ্ছা পায়,
রঙীন সে হয় তবেই যবে অশ্রু আমার কূল ছাপায়।

—এই অশ্রুই বাংলা কবিতায় শব্দের মুক্তামালা হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার কবিতার আর এক দিক—ধরণীর রূপ-রং-রেখার দিক—পঞ্চেন্দ্রিয়-সাক্ষী প্রকৃতির বহুবর্ণের ঘাগরী, এবং তাহার নৃত্যচপল চরণ-যুগের মঞ্জীর-ধ্বনি। সত্যেন্দ্রনাথ এই রূপের সন্ধান সর্ব্বত্র করিয়াছিলেন—যেমন শিল্পে, তেমন নিসর্গে; এবং শব্দের "মণিরতনের সঙ্গে মনোযতন" মিলাইয়া ভাষার যে কলাকৌশলে তাহাকে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাও বাংলা কাব্যের একটি সম্পদ হইয়া আছে। এক দিকে যেমন—

জলের কোলে ঝোপের তলে
কাঁচপোকা-রং আলোক জ্বলে,

তেমনিই, আর এক দিকে 'তাজমহলে'র ভিত্তিগাত্রে—

সিংহলী নীলা, রাঙা আরবী প্রবাল,
তিব্বতী ফিরোজা পাথর,
বুন্দেলী হীরা-রাশি, আরাকানী লাল,
সুলেমানী মণি থরে থর,
ইরানী গোমেদ, মরকত থাল থাল
পোখরাজ, বুঁদি, গুল্‌নর;

চার-কো পাহাড়-ভাঙা মসী-মর্ম্মর,
চীনা তুঁতী, অমল স্ফটিক,
যশল্‌মীরের শোভা মিশ্র-বদর
এনেছ চুঁড়িয়া সব-দিক;
মধুমৎস্বিষ, মণি দুধিয়া পাথর
দেউলে দেওয়ালী মণি-শিখ।

—'তাজ' (অভ্র-আবীর)

রং ও রূপের সন্ধানে যেমন তাঁহার চোখের ক্লান্তি নাই, তেমনিই কানেরও কি পিপাসা! এই শেষেরটির সম্বন্ধে আশা করি কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই। এই নেশা ক্রমে এমনই প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল যে, শেষে সত্যেন্দ্রনাথের সরস্বতী কবিকে ঘুম পাড়াইয়া কানের সেই উৎকণ্ঠা চিরতরে নিবারণ করিয়াছিলেন। এইবার আমি

সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য হইতে পংক্তিরাশি উদ্ধৃত করিব,—তাহাতে, উপরে যাহা বলিয়াছি এবং পরে যাহা বলিব, তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলিবে।

৩

(১) প্রথমেই কবির পূজাগৃহের স্তোত্রপাঠ ও আরতির মন্ত্র একটু শুনাইব; এ সকলের ভাষায় ও ভাবে সত্যেন্দ্রনাথের স্টাইল অতিশয় শুচি, শুভ্র ও সংযত—ইহা তাঁহার রচনার একটি বিশেষ স্তর।

অনাদি অসীম অতল অপার
আলোকে বসতি যার,—
প্রলয়ের শেষে নিখিল-নিলয়
সৃজিল যে বারবার,—
অহঙ্কারের তন্ত্রী পীড়িয়া
বাজায় যে ওঙ্কার,—
অশেষ ছন্দ যার আনন্দ
তাহারে নমস্কার।

ভাবের গঙ্গা শিরে যে ধরেছে
ভাবনার জটাভার,—
চির-নবীনতা শিশু-শশী-রূপে
অঙ্কিত ভালে যার,—
জগতের গ্লানি-নিন্দা-গরল
যাহার কণ্ঠহার,—
সেই গৃহবাসী উদাসী জনের
চরণে নমস্কার।

—'নমস্কার' (কুহু ও কেকা)

বসন্তের এই মৌলি-মণি আমের মউল-পুঞ্জ নে,
মৌন আমার মুখর হ'ল মৌমাছিদের গুঞ্জনে!
এই নে আমার আশার স্বপন,
এই নে ব্যক্ত, এই নে গোপন,
এই নে আসল, এই নে ফসল, এই ফসলের উঞ্ছ নে।

দুপুরবেলার বৈকালী হায় এই নে আমার আঁখির লোর,
সাঁঝ না হ'তেই সন্ধ্যামণি ফুটল এবার কুঞ্জে মোর,
পলাশ যখন লাল আলোকে
জমছে তিমির আমার চোখে,
শাঙন অভ্র নামছে—যখন কুঞ্জে আবীর রঙের ঘোর।

এই নে আমার অঞ্জলি গো এই নে আমার অঞ্জলি,
বীণায় যে গান ধরেছিলাম হয় তো এ তার শেষ কলি,
"আবির" "আবির" মন্ত্র-রাবে
কর্ গো সফল আবির্ভাবে
অশ্রু-হাসির অভ্র-আবীর আঁখির আলোয় উজ্জ্বলি'।

—'অঞ্জলি' (অভ্র-আবীর)

(২) ভাব-কল্পনা বা ভাবুকতার সৌন্দর্য্য; ইহাও সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্বের এক দিক।

বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্ত ভগীরথ ভগ্ন-মনোরথ
বৃথা বাজাইল শঙ্খ, নিলে বেছে তুমি নিজ পথ,
আর্য্যের নৈবেদ্য, বলি, তুচ্ছ করি' হে বিদ্রোহী নদী!
অনাহুত—অনার্য্যের ঘরে গিয়ে আছ সে অবধি!

সেই হ'তে আছ তুমি সমস্তার মত লোক মাঝে,
ব্যাপৃত সহস্র ভুজ বিপর্য্যয় প্রলয়ের কাজে!
দম্ভ যবে মূর্ত্তি ধরি' স্তম্ভ ও গুম্বজে দিন রাত
অভ্রভেদী হ'য়ে ওঠে, তুমি না দেখাও পক্ষপাত

তার প্রতি কোনোদিন, সিন্ধু সখী! হে সাম্যবাদিনী!
মূর্খে বলে কীর্ত্তিনাশা, হে কোপনা! কল্লোলনাদিনী!
ধনী দীনে একাসনে বসায়ে রেখেছ তব তীরে,
সতত সতর্ক তারা অনিশ্চিত পাতার কুটিরে,

না জানে সুপ্তির স্বাদ, জড়তার বারতা না জানে,
ভাঙনের মুখে বসি' গাহে গান প্লাবনের তানে,
নাহিক বাস্তুর মায়া, মরিতে প্রস্তুত চিরদিনই!
অয়ি স্বাতন্ত্র্যের ধারা! অয়ি পদ্মা! অয়ি বিপ্লাবিনী!

—'পদ্মার প্রতি' (কুহু ও কেকা)

'গম্' ধাতু তোর দেহের ধাতু 'গঙ্গাহৃদি' নামটি গো,
গতির ভুখে চলিস রুখে, বাংলা! সোনার তুই মৃগ।
গঙ্গা শুধুই গমন-ধারা তাই সে হৃদে আঁকড়েছিস,—
বুকের সকল শিকড় দিয়ে গতির ধারা পাকড়েছিস।
সংহিতাতে তোমায় কভু করতে নারে সংযত,
বৌদ্ধ নহিস, হিন্দু নহিস—নবীন হওয়া তোর ব্রত।
চির-যুবন-মন্ত্র জানিস চির-যুগের রঙ্গিণী,
শিরীষ ফুলে পান-বাটা তোর, ফুল্ল কদম-অঙ্গিনী!
হেসে কেঁদে সাধিয়ে সেধে চলিস, মনে রাখিস নে,
মনু তোরে মন্দ বলে,—তা তুই গায়ে মাখিস নে।
কীর্ত্তিনাশা স্ফূর্ত্তি তোমার, জানিস নে তুই দীর্ঘ শোক,
অপরাজিতা-কুঞ্জে নিতি হাসছে তোমার কাজল-চোখ।

—'গঙ্গাহৃদি-বঙ্গভূমি' (অভ্র-আবীর)

আমি 'স্বর্গদ্বারে' খোলা দেখি আজ
স্বর্গের সব দ্বার,
ওগো হের 'আনন্দ- বাজারে' হেথায়
দেবতা দেছেন 'বার'!
জাতি-পাঁতি-কুল মূল খোয়াল রে,
প্রেমে হ'ল একাকার!

ওই নীল-বিভ্রমে আকাশের আলো
দিকে দিকে 'দশা' পায়,
আর 'ভ্রমি' যায় বায়ু, আয়ুহীন সম
মুহু মুহু মূরছায়,
ব্যাপি' ক্ষিতি অপ অপ্সরা সব
সরে যায়, ফিরে চায়!

ওরে কারা পিয়ে আজো মদের মদিরা?
কে পিয়ে মোহের ভাঙ?
ওই আদি-মৃদঙ্গ বোলে তরঙ্গ
'ধিক্ তান্' 'ধিগে তান্'!
দেবতার দ্বারে কে দ্বিজ শূদ্র?
কিবা সোনা? কিবা রাঙ?

—'স্বর্গদ্বারে' (অভ্র-আবীর)

(৩) কল্পনা-বিলাস বা কারু-কল্পনা; সত্যেন্দ্রনাথের ভাবুকতা, তত্ত্ব ও নীতিচিন্তার অপর দিক। শিল্পী-মনের এই ক্রীড়াশীলতা, সত্যেন্দ্রনাথের কবি-প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ। ইহা খাঁটি কল্পনার রসাবেশ নয়—সজ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তির কারুকুশলতা; এ সম্বন্ধে আমি পরে বলিব।

আমি চেয়ে থাকি অবাক নয়নে
বসি' পাথরের স্তূপে,
সৃষ্টিক্রিয়ার মাঝখানে যেন
পশেছি একেলা চুপে!
হাজার নদের বন্যা স্রোতের
নিরিখ যেখানে রয়,—
লক্ষ লোকের দুঃখ সুখের
হয় যেথা নির্ণয়,—
মেঘেরা যেখানে দূর হ'তে শুধু
বৃষ্টি মারে না ছুঁড়ে,—
পাশাপাশি হাঁটে মানুষের সাথে,—
প'ড়ে থাকে সানু জুড়ে;—
কখনো দাঁড়ায় ভঙ্গী করিয়া
কীর্ত্তনিয়ার মত,—
কেহ মৃদঙ্গে করে মৃদু ধ্বনি,
কেহ নর্ত্তনে রত!
কখনো আবার মেঘের বাহিনী
ধরে গো যোদ্ধ বেশ,—
মৃত্যুতে যেন মর্ত্ত্য-প্রেতের
কলহ হয় নি শেষ!
কৌতুকে মিহি চাঁদের সুতারে
ওড়না ওড়ায় কেহ,
তারি ভারে তবু পলে পলে যেন
ভাঙিয়া পড়িছে দেহ!
আমি ব'সে আছি এ সবার মাঝে
এই দূর মেঘলোকে,
নিগূঢ় গোপন বিশ্ব-ব্যাপার
নিরখি চর্ম্ম-চোখে!

—'মেঘলোকে' (কুহু ও কেকা)

কতই কথা লিখছে সাগর, লিখছে বারো মাস,
উতলা ঢেউ লিখছে সাগর-মথন-ইতিহাস,
দেখছি আমি মুহুর্মুহু জাগছে দিকে দিকে
সাপের রশি—সাপের ফণা চিহ্নিত স্বস্তিকে;
উঠছে সুধা, ফুটছে গরল, যাচ্ছে যেন চেনা
আঢ়ক-হাতে লক্ষ্মী!—সাথে লক্ষ্মী-কড়ি ফেনা।
ছন্দে ওঠে মন্দ ভালো;—চলছে অভিনয়
দেবাসুরের দ্বন্দ্ব-লীলা দুরন্ত দুর্জ্জয়।
ঝড়ের বেগে ঝাণ্ডা নিশান ওঠে এবং পড়ে—
নীল-জাঙিয়া নীল-আঙিয়া অসুরগুলো লড়ে!
হঠাৎ হ'ল দৃশ্য বদল, উল্‌টে গেল পট
যাযাবা ঘোরায় কোন্ মোহিনী মাথায় সোনার ঘট!
তারে ঘিরে অপ্সরীরা তয়ফা নেচে যায়
ফেনার চারু চিকণ কারু দুল্‌ছে পায়ে পায়।
—'পুরীর চিঠি' (অভ্র-আবীর)

বাহুপাশে বাঁধা বাহু গৌরী ও কৃষ্ণা!
কোলাকুলি করে একি তৃপ্তি ও তৃষ্ণা!
কালোচুলে পিঙ্গলে একি বেণীবন্ধ!
ঘুচে গেল কালো-গায় গোরা-গায় দ্বন্দ্ব!
সখী-সুখে মুখে মুখে দুহুঁ নিঃসঙ্গা!
জয়তু যমুনা জয়! জয় জয় গঙ্গা!
দেহ প্রাণ একতান গাহে গান বিশ্ব!
অমা চুমে পূর্ণিমা! অপরূপ দৃশ্য!
চুয়া মিলে চন্দনে! বর্ণ ও গন্ধ!
চির-চুপে চাপে বুকে শতরূপা-ছন্দ!
অঞ্জন-ধারা সাথে চলে অকলঙ্কা!
জয়তু যমুনা জয়! জয় জয় গঙ্গা!
অপরূপ! অপরূপ! আনন্দ-মল্লী!
অপরাজিতার হারে পারিজাত-বল্লী!
দ্রবময় দর্পণে হরিহর-মুরতি!
অপরূপ! দ্রব-ধূপ দ্রব-দীপে আরতি!
মন হরে! জয় করে সঙ্কোচ শঙ্কা!
জয়তু যমুনা জয়! জয় জয় গঙ্গা!
—'যুক্তবেণী' (বেলা শেষের গান)

(৪) ভাব ও ভাষার আলঙ্কারিকতা (Rhetoric)। সত্যেন্দ্রনাথের রচনায়, নিছক শব্দার্থের কারুকলা প্রায় সর্ব্বত্র দেখা যাইবে, এবং তাহাতে প্রাচীন কাব্যরীতির সেই রসসৃষ্টি অনেক স্থলেই জয়যুক্ত হইয়াছে। এখানে আমি, কেবল শব্দার্থঘটিত নয়—আলঙ্কারিক রস-প্রেরণার আরও যে নিদর্শন উদ্ধৃত করিতেছি, তাহা সকল কবি-মনের একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।

ওগো বিধাতা আমায় এমন করেছে,—
দুষ্কর ব্রতে করেছে ব্রতী,
তাই পুষ্কর মেখে মজে আছে মন,
নাই সে পুষ্করিণীর প্রতি।
—'চাতকের কথা' (কুহু ও কেকা)

অগ্নিহোত্রী মিলেছে হেথায় ব্রহ্মবিদের সাথে,
বেদের জ্যোৎস্না-নিশি মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে,
—'বারাণসী' (কুহু ও কেকা)

রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে আজ ধ্রুবতারার প্রতিবাসী,
—'রবীন্দ্রনাথের "নোবেল প্রাইজ" পাওয়াতে' (অভ্র-আবীর)

একটি চিতায় পুড়ছে আজি আচার্য্য আর পুড়ছে লামা,
প্রোফেসার আর পুড়ছে ফুঙি, পুড়ছে শমস্-উল্-উলামা,
পুড়ছে ভট্ট, সঙ্গে তারি মৌলবী সে যাচ্ছে পুড়ে।

একত্রে আজ পুড়ছে যেন কোকিল, 'কুকু', বুল্‌বুলেতে,—
দাবানলের একটি আঁচে নীড়ের পিঠে পক্ষ পেতে;
পড়ছে ভেঙে চোখের উপর বর্ত্তমানের বাবিল্-চূড়া,
দানেশ মন্দী তাজ সে দেশের অকালে আজ হচ্ছে গুঁড়া।
—'শ্মশানশয্যায় আচার্য্য হরিনাথ দে' (কুহু ও কেকা)

চৌদ্দ প্রদীপে চৌদ্দ ভুবন উজল করি,
বিস্মৃত শত অমা-যামিনীর কাজল হরি;
কল্পনা দিয়ে করি গো সৃজন কল্প-লতা,—
অশ্রু-হিমানী-জড়িত আকাশে অতীত-কথা!

চৌদ্দ প্রদীপে সপ্ত ঋষিরে স্মরণ করি,
ত্রিশঙ্কু আর বিশ্বামিত্রে বরণ করি,
বাল্মীকি আর কালিদাস কবি জাগিছে মনে,
দোলাইয়া শিখা নমিছে প্রদীপ দ্বৈপায়নে।

ভীষ্মের স্মৃতি উজলিছে দীপ হৃদয়-লোকে,—
সারা ভারতের পিতামহ সেই অপুত্রকে।
জাগে বিক্রম অভিনব নব রত্নে ধনী,
যবনী রাণীর বক্ষে জাগিছে মৌর্য্যমণি।

কোলাকুলি আজ তিমিরে দোলায়ে আলোর দোলা!
চৌদ্দ যুগের চৌদ্দ হাজার স্বরোখা খোলা!
এপারে প্রদীপ, উল্কা ওপারে উলসি' ওঠে,
পিতৃযানের মাঝখানে আজ বার্ত্তা ছোটে,
আনাগোনা আজ জানা যেন যায় আকাশ 'পরে,
পিতৃগণের পদ-রেণু আজ আঁধারে ঝরে!
আঁধারপাথারে আকুল হৃদয় পেয়েছে ছাড়া,
চৌদ্দ প্রদীপে চৌদ্দ ভুবনে জেগেছে সাড়া।
—'চৌদ্দ প্রদীপ' (কুহু ও কেকা)

জিত মরণের বুকে গাড়িয়া নিশান,
জয়ী প্রেম তোলে হের শির,
ধবল বিপুল বাহু মেলি চারিখান
ঘোষে জয় মৌন গভীর,
চিরসুন্দর 'তাজ' প্রেমে নিরমাণ
শিরোমণি মরণ-ফণীর!
—'তাজ' (অভ্র-আবীর)

(৫) বাক্-চাতুরী ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য (Epigram, Wit, Satire)—সত্যেন্দ্রনাথের রচনা সম্বন্ধে ইহারও একটু পৃথক উল্লেখ আবশ্যক। পূর্ব্বে তাঁহার কবি-প্রবৃত্তির যে লক্ষণগুলি দেখাইয়াছি—এই লক্ষণটি মূলে সেই একই প্রকৃতির পরিচায়ক হইলেও, এ বিষয়ে সত্যেন্দ্রনাথের শক্তি যেন তাঁহার কবি-স্বভাব অপেক্ষা জাতি-স্বভাবের অনুগত বলিয়া মনে হয়। এখানে তিনি ঈশ্বরগুপ্ত-প্রমুখ কবি ও কবিওয়ালাগণের

বংশধর;—অথবা, আরও প্রাচীন কাল হইতেই রাঢ়দেশের বাঙালী-সমাজে যে এক ধরনের চটুল ও মুখর রসিকতা ভাষার সাহায্যে বড় উপভোগ্য হইয়া আসিতেছে, সত্যেন্দ্রনাথ সেই সমাজ ও সেই ভাষার কবি হিসাবে, সেই রসিকতাই যেন সহজাত শক্তির মত লাভ করিয়াছিলেন।

বল্‌ব ভাবি—'প্রিয়া' 'প্রাণেশ্বরী',
ছেড়ে দিয়ে 'শুন্‌ছ?' 'ওগো!' 'হ্যাঁগো',
বল্‌তে গিয়ে লজ্জাতে হায় মরি,
ও সম্বোধন ওদের মানায় নাকো।—
ওসব যেন নেহাৎ থিয়েটারী
যাত্রা-দলের গন্ধ ওতে ভারি,
'ডিয়ার'টাও একটু ইয়ার-ঘেঁষা,
'পিয়ারা' সে করবে ওদের খাটো;—
এর তুলনায় 'ওগো' আমার খাসা,—
যদিও,—মানি—একটু ঈষৎ মাঠো।

ঈষৎ মাঠো এবং ঈষৎ মিঠে
এই আমাদের অনেক দিনের 'ওগো',
চায়ের ভাতে সদ্য ঘিয়ের ছিটে
মন কাড়িবার মস্ত বড় Rogue ও!
ফুল-শেষে সেই 'মুখে-মুখের' 'ওগো!'
রোগের শোকের দুঃখ-সুখের 'ওগো!'
সব বয়সের সকল রসে ঘেরা,—
নয় সে মোটেই এক-পেশে এক-চোখো,
বাংলা ভাষা সকল ভাষার সেরা
স্নিগ্ধ মধুর ডাকের সেরা 'ওগো'।
—'ওগো' (কুহু ও কেকা)

বর্ষার মশা বেজায় বেড়েছে,
খালি শোন শন্ শন্,
ক্ষুদে-ক্ষুদেগুলো যায় বা থামিয়ে
ভ্রমরের গুঞ্জন!
* *

বিশ্রাম নাই, 'পঙ্' 'পিঙ্' 'পাঁই'
রব করে ফিরে ঘুরে,
"মোরাও ভোমরা" ভণিতা করিয়া
ভণে যেন নাকী সুরে!

* *

হেসে বাণী কন্—"কেন্ উন্মন্
কমল-লোভন, ওরে!
ঘোলাটে রাতের অপচার ওরা,
প্রভাতেই যাবে স'রে।

হবে অদৃশ্য, তাড়াতে হবে না
কিটিঙের গুঁড়া দিয়া,
হবে না তা ছাড়া, মশার কামড়ে
ভোম্‌রার ম্যালেরিয়া।"
—'বর্ষার মশা' (বিদায়-আরতি)

আগ বর্ণধর্ম্মে করি' অবহেলা
দেবতারও নাহি অব্যাহতি,
হেঁ হেঁ ফ্যাল্‌ফ্যালাইয়া কি দেখিছ বাপু?
বোসো ঐখানে শুনিবে যদি।
ঐ ঘুঁটিঙের চুন চেয়ে সাত গুণ
রং ছিল মহেশের সাদা রে!
তিনি করিলেন বিয়ে হলুদ-বরণা
উমারে,—গ্রহের ফের দাদা রে!
তাহে কি যে অঘটন ঘটিল, শ্রবণ
কর যদি থাকে কর্ণ, আহা!
হ'ল পার্ব্বতীসুত লম্বোদরের
চূণে-হলুদিয়া বর্ণ ডাহা!
—'পাতিল-প্রমাদ' (বিদায়-আরতি)

ডিগ্‌বাজী খায় ছাপার হরফ,
ডিগ্রনারী গেল তল,
রসের কুঞ্জে চাষ দিতে আসে
পন্নাপারের দল!

শব্দ ধুনিয়া ধাঁই ধাঁই করে—
কারদানী বিস্তর;
গৌড়-বঙ্গ হাঁ করিয়া শোনে
'পূর্ব্ব' মানে যে 'পর'!
অর্থ শব্দ হয়েছে জব্দ
বেফাঁস বাক্য-জালে,
পূর্ব্বরাগের মানে সেই রাগ
ঘটে যাহা পরকালে।
নাপ্পি-খোরের পড়শীরা নোনা-
মাছ গেঁথে বঁড়শীতে,
করে বাহাদুরী গুম্ফ মুরি'
নাপ্পি-নায়িকা-প্রীতে!

* *

বাজাইয়া ধামী রজকিনী রামী
কহিছে চণ্ডীদাসে,
'চল বড়, রসতত্ত্ব শিখিব
পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট ক্লাসে!
তুমি যে রামীর পূর্ব্বপুরুষ
সন্দেহ তার নাই,
পরপুরুষে ও পূর্ব্বপুরুষে
হয়ে গেছে এক জাই!
'পূর্ব্ব' মানে যে 'পিছন' হে বঁধু!
সেই কথা পাকা কথা,
ফক্কিকা-কৃত ব্যাখ্যান এ যে,
নাহি মিলে যথা-তথা!
পন্নাপারের প্রতিভা-চেরাগে
নব বাণী লহ প'ড়ে,
পূর্ব্ব-বঙ্গ মানে সে বঙ্গ
পিছিয়ে যে রয় প'ড়ে।
যাদের কথার টানে সাড়া দেয়,
ডিশিন নিশিন পাড়া,
তাদের সদনে তত্ত্ব শিখিব,
চল বড়, কর তাড়া।'
—'নাপ্পি-পীরিতি-কথা' (বেলা শেষের গান)

(৬) চিত্রাঙ্কণ ; শব্দচিত্র—বর্ণ, রূপ ও রেখা।

কার বহুড়ি
বাসন মাজে ?—
পুকুর ঘাটে
ব্যস্ত কাজে ,—
এঁটো হাতেই
হাতের পোঁছায়
গায়ের মাথায়
কাপড় গোছায় !

* *

গ্রামের শেষে
অশথ-তলে
বুনোর ডেরায়
চুল্লী জ্বলে ;
টাট্‌কা কাঁচা
শাল-পাতাতে
উড়ছে ধোঁয়া
ফ্যান্‌সা ভাতে।

—'পাখীর গান', (কুহু ও কেকা)

বজ্রহাতের হাততালি সে বাজিয়ে হেসে চায়,
বুকের ভিতর রক্তধারা নাচিয়ে দিয়ে যায়,
ভয় দেখিয়ে হাসে আবার ফিক্‌ফিকিয়ে সে,
আকাশ জুড়ে চিক্‌মিকিয়ে চিক্‌মিকিয়ে রে।

* * *

বাদল হাওয়ায় আজ কে আমার পাগলি মেতেছে,
ছিন্ন কাঁথা সূর্য্যশশীর সভায় পেতেছে।

—'বর্ষা' (কুহু ও কেকা)

ফিরোজা রং আকাশ হেথা মেঘের কুচি তায়,
গরুড় যেন স্বর্গপথে পাখ্‌না ঝেড়ে যায়!

—'দার্জ্জিলিঙের চিঠি' (কুহু ও কেকা)

মেঘের সীমায় রোদ জেগেছে,
আল্‌তা-পাটি শিম।

—'ইল্‌শে গুঁড়ি' (অভ্র-আবীর)

কালো মেঘের কোলটি জুড়ে আলো আবার চোখ চেয়েছে
মিশিরজমী জমিয়ে ঠোঁটে শরৎ-রাণী পান খেয়েছে!

* * *

হাওয়ার তালে বৃষ্টিধারা সাঁওতালী নাচ নাচতে নামে,
আবছায়াতে মূর্ত্তি ধরে, হাওয়ায় হেলে ডাইনে বামে,
শূন্যে তারা নৃত্য করে, শূন্যে মেঘের মৃদং বাজে,
শাল-ফুলেরি মতন ফোঁটা ছড়িয়ে পড়ে পাগল নাচে।

—'চিত্রশরৎ' (অভ্র-আবীর)

পালান্‌-ছোঁয়া শাঁওলা ঘাসে বাছুর গরু চরছে পালে,
নাড়িয়ে ছ'কান তাড়িয়ে মাছি লোটন-ল্যাজের ছেপ্‌কা-তালে,
দীঘির জলে রূপোর ঝিলিক দেখছে ব'সে মাছরাঙা সে,
ঢল-নামা জল ধিতায় গাঙের,—যায় ঘাথা তার পাড় ভাঙা যে।

—'আলোর পাথার' (বিদায়-আরতি)

উষার আভাস জাগল কিরে ?—দিনমণির খুল্‌ল মণি-কোঠা ?
শুকতারাটির শিউলি-ফুলে লাগ্‌ল ফিরে অরুণ-রঙের বোঁটা ?
পূব-তোরণে চিড় খেল কি দিগ্‌বারণের নিবিড় দন্তাঘাতে ?
ধুংরো-ফুলের ডালি মাথায় তুষার-গিরি জাগছে প্রতীক্ষাতে !
মুক্তা-ফলের লাবণ্য কি আমেজ দিল মুক্ত নীলাম্বরে ?
দিগ্‌বধূরা চামর করে আকাশ-আলোর বিরাট হরিহরে ?

* * *

হোরার কালো চুলের রাশে কোথায় থেকে ধূপের ধোঁয়া লাগে।
বন্‌-কপোতের গ্রীবার নীলে জাফ্‌রাণী নীল মিলায় অনুরাগে।

* * *

পারিজাতের দল ছিঁড়ে বে' ছোট্ট মুঠায় ছড়ায় গগন হ'তে
দেও-ডাঙাতে টিপ রাঙাতে আনন্দে দুধ-গঙ্গাজলের স্রোতে,
কোন্‌ ব্রত আজ গৌরী করেন রজতগিরির ভালে সিঁদুর দিয়ে,
হেম হ'ল গা শঙ্করের ওই হৈমবতীর পরশ-পুলক পিয়ে!

—'সিঙ্কলে সূর্য্যোদয়', (বিদায়-আরতি)

(৭) ইতিহাস-রস—

এই বারাণসী কোশল দেবীর বিবাহের যৌতুক,—
দেখিতেছি যেন বিম্বিসারের বিস্মিত স্মিতমুখ !

নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পঁইঠায়,
শ্রমণগণের আশীর্ব্বচনে প্রাণ মন উথলায়।
সমুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শত জনমের রূপ।
চিকণচারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্ম্মাশোকের মৈত্রীকরুণ অনুশাসনের লিপি!
মহাচীন হ'তে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,—
স্তূপের গাত্র চিত্র করিছে সূক্ষ্ম সোনার পাতে।
জয়! জয়! জয় কাশী!
তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র,—মূর্ত্ত ভকতি রাশি।

—'বারাণসী' (কুহু ও কেকা)

কত বীর, হায়, পূজিল তোমায়,
ভজিল তোমায়, মজিল রূপে,
অন্তিমে শেষ বিছাল ও-বুকে
দেশী ও বিদেশী কত না ভূপে।
নব-গ্রহের নয়-মঞ্জিল
কোনো সুলতান স্থাপিল হেথা,—
ভাঙি' তেত্রিশ ঠাকুর-দুয়ারা
একের দেউল—কোনো বিজেতা।
কেহ রাজপুত বীরের মুরৎ
দ্বারপাল করি' রাখিল দ্বারে,
হিন্দুরে কেহ বন্ধু মানিয়া
আধা-রাজকাজ স'পিল তারে!
দিবালোকে তুমি "আরব-রজনী,"
খেয়ালীর চিরধাত্রী তুমি,
কত মিঞা আবু হোসেনে ক্ষেপালে
কৌতুকময়ী স্বপন-ভূমি!

* * *

কোথা কাশ্মীরী বেগম? কোথায়—
ইস্তাম্বুলী? কান্দাহারী?
কোথা যোধপুরী? কোথা মরিয়ম্?
কোথা উদিপুরী? রাকিয়া নারী?
কোথা নুরজাহাঁ? কোথা মমতাজ?
দিল্‌রাস্‌বানু আজ কোথায়?

কোথায় দারার প্রেয়সী নাদিরা?
হামিদা, মাহম কোথায়? হায়!
কোথা জাহানারা? শম্প-শয়ান!
কোথা রোশিনারা? রৌদ্রে দহে!
কিশোরী সুরিয়া, কোথায় জিনৎ?
কেবা জানে হায়, কে তাহা কহে?
যমুনা দেখিতে উচ্চ মীনারে
চড়িতে যাহারা কই গো তারা?
কই দিল্লীর আদিম রাণীরা?
তোর ধূলিতলে হয়েছে হারা।

—'দিল্লী-নামা' (বেলা শেষের গান)

৪

সত্যেন্দ্রনাথের রচনার যে পরিচয় দিলাম, তাহাতে দেখা যাইবে যে, তাহার ভাববস্তু—নিছক কল্পনা তো নহেই—অনেক স্থলে বুদ্ধি, বিদ্যা, ভাবনা ও সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশক্তির ফল। বস্তু এবং চিন্তা উভয়ের সম্পর্কেই তাঁহার এক প্রকার ভাবগ্রাহিতা ছিল—ভাববিলাসও ছিল, তাহাকেই তিনি শব্দার্থের কৌশলে যেমন অর্থবান তেমনই সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে পারিতেন; অনেক স্থলে ছন্দ বাদ দিলেও কেবল শব্দ ও ভাষার কারিগরিতে তাহা এক ধরনের রস-রচনা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানসের যে পরিচয় দিয়াছি, তাহাতে তাঁহার কবিতা এইরূপ গদ্যধর্ম্মী হওয়া বিচিত্র নয়; কিন্তু ইহাও সত্য যে, ছন্দ তাঁহার রচনার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ,—কবি যে ছন্দের সাহায্য বিনা লিখিতেই পারিতেন না, ইহা নিশ্চিত। ইহার কারণ কি? ছন্দ তাঁহার ভাষার নিত্যসঙ্গী, এমন কি, সেই ভাষাকে শক্তি ও মূর্ত্তি দিয়াছে ওই ছন্দ। তাঁহার সকল চিন্তার ও ভাববস্তুর মূলে নিশ্চয় এমন একটা কিছু আছে, যাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে বাক্যকে ছন্দের

পক্ষযুক্ত করিতে হয়। এই বস্তুটি কি? কেবল জানা বা কেবল দেখা নয়, কেবল জিজ্ঞাসার যথোচিত জবাব পাওয়াই নয়, কেবল সংশয় নিবারণ নয়,—সেই সঙ্গে যে তৃপ্তি ও যে আশ্বাস—প্রাণে যে স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয়—তাহাতেই বাণী এমন ছন্দোময় হইয়া উঠে, ভাষায় বিদ্যুৎ-সঞ্চার হয়। সত্যেন্দ্রনাথ জ্ঞান-বুদ্ধির যে সাধনা করিয়াছিলেন, তাহার মূলেও একটা প্রবল আবেগ ছিল, সেই আবেগের বশে মনের দীপ্তিকে তিনি ভাষায় প্রতিফলিত করিয়াছিলেন। এইজন্য সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায় ছন্দের একটা বিশেষ মূল্য আছে।

উপরি-উদ্ধৃত পংক্তিরাশির অনেক স্থলে সত্যেন্দ্রনাথের কবিত্বের একটি প্রধান লক্ষণ বার বার দেখা দিয়াছে। ইংরেজীতে কবিমানসের একটি বৃত্তিকে Fancy বলে—ইহা ঠিক Imagination নয়। Imagination-কে আমরা বাংলায় যেমন 'সৃষ্টি-কল্পনা' বলিতে পারি, তেমনই এই Fancy-কে কবি-মনের একরূপ লীলাবিলাস বা 'খেয়ালী-কল্পনা' বলা যাইতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের এইরূপ কল্পনা বেশি মাত্রায় ছিল। তাঁহার উপমাগুলিতে এই 'খেয়ালে'র উৎকৃষ্ট পরিচয় আছে; এমনও বলা যাইতে পারে যে, তাঁহার মনে যেন সর্ব্বদাই এই 'খেয়ালে'র ক্রিয়া চলিত—কোন বস্তুকে বর্ণনা করিবার সময়ে, এমন কি, কোন ভাব বা চিন্তাকেও ব্যক্ত করিবার ছলে, তাঁহার মনের এই যে বিলাস—তাহাই বিচিত্র উপমা-চিত্রে চিত্রিত হইতে চাহিত; অনেক সময়ে ইহাকে মুদ্রাদোষে পরিণত হইতেও দেখা যায়। নিরন্তর নানা তথ্য-সংগ্রহ—ইতিহাস ও বিজ্ঞানের নানা সংবাদ—তাঁহার মনে যে ভিড় করিয়া দাঁড়াইত, তাহাদিগকে এক একটি সূত্রে, এক একটি প্রসঙ্গে গাঁথিয়া যেমন একটি বিশেষ ভাব বা অর্থের আবিষ্কার করিতে তিনি ভালবাসিতেন, তেমনই প্রকৃতির গ্রন্থে যাহা কিছু পাইতেন, তাহা যত

বিভিন্ন বিচিত্র হউক—পাশাপাশি ধরিয়া তাহাদিগের মধ্যে রূপ-রেখার সাদৃশ্য আবিষ্কার করার নেশাও তাঁহার অল্প ছিল না; এই শেষের খেয়ালটি তাঁহার কবিতায় সমধিক সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দনির্ম্মাণ-লীলার পরিচয় দিতে হইলে একটি পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন, এখানে সে অবকাশ নাই। তথাপি সে সম্বন্ধেও এখানে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দকে যে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী করিয়াছেন, তাহা শুধু ছন্দের ঐশ্বর্য্য নয়—কাব্যেরও অঙ্গীভূত; সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ভাষার ধ্বনিকে আর এক যন্ত্রে ধুনিয়া তাহার নিছক উচ্চারণ-(accent)-সৌন্দর্য্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা করিয়াছেন। বাংলা শব্দরাশির অর্থ-সামর্থ্য যেমন তিনি বহু রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, তেমনই সেই শব্দের অক্ষরগুলিকেও অশেষরূপে বাজাইয়া তিনি নিজেরই আর এক পিপাসা মিটাইয়াছেন। শব্দের সঙ্গে যেমন অর্থ, তেমনই ওই দুইয়ের সঙ্গে ছন্দ যুক্ত করার কারণ পূর্ব্বে বলিয়াছি; কিন্তু তাহাই সব নয়। সত্যেন্দ্রনাথের অতিজাগ্রত মানস-বুদ্ধির অন্তরালে আর একটি মানস ছিল, সেইখানে তিনি প্রত্যক্ষ-বাস্তবের যত কিছু প্রেরণা ও প্ররোচনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া কেবল সুরের স্রোতে অবগাহন করিতেন; এই একটি মোহ তাঁহার ছিল। আমার মনে হয়, তাঁহার চিত্তে বিশুদ্ধ রসাবেশের একমাত্র প্রমাণ ওই সুর-প্রধান কবিতাগুলিতেই আছে। আমরা যখন এই নিছক ছন্দ-ঝঙ্কারময় কবিতাগুলি পড়ি, এবং কবির প্রতি একটু কৃপাপরবশ হইয়া বুদ্ধিমানের মত মন্তব্য করি—'ছন্দ ভিন্ন ইহাতে আর কি আছে?'—তখন, প্রকৃত রসগ্রাহিতার পরিচয় দিই না। গীতিকবিতার ভাবই আসল বস্তু বটে, কিন্তু, কবিতা যখন এমন প্রবল ছন্দের সুরে বাজিয়া উঠে, তখন তাহাকে কবিতা না বলিয়া একরূপ ছন্দ-গীতি হিসাবে

উপভোগ করাই উচিত। কারণ, ওই ছন্দও ভাবের একটা রূপ—উহাও একটা সৃষ্টি; উহার মূলে কবি-প্রাণের আর এক-জাতীয় সুন্দর-সংবেদনা আছে। এইরূপ কবিতা পড়িবার কালে কানের ভিতর দিয়াই প্রাণে এক প্রকার রসসঞ্চার হয়—যেমন সঙ্গীতের দ্বারা হইয়া থাকে। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, সর্ব্বত্র ছন্দের কেরামতিকে এইরূপ মূল্য দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথের কবিকর্ম্ম ও কবিপ্রকৃতি ভাল করিয়া অনুধাবন করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই সকল কবিতায় কবির প্রাণের রসপিপাসা হইতেই বাক্যার্থের অতীত এক অনির্ব্বচনীয় মাধুরীর সৃষ্টি হইয়াছে। এই ধরনের একটি কবিতার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

পারব না একলাটি আজ ঘরে পারব না রইতে!
চাঁদ ডাকে পাপিয়াকে দুটো কথা কইতে!
নিরালার কোল-ভরা, ফুল জাগে আলো-করা
যেচে কার খুন্‌সুড়ি সইতে!
অথই পাথার-পারা জোছনায় মাতোয়ারা
দিশেহারা হ'ল হাওয়া চৈতে।

* * *

জাগল রে নিদ্‌-ঘরে পাখী, আজ নারে নিদ্‌ সইতে!
আঁখি হ'ল অনিমেষ আলো-থইথইতে!
শোন্ সখী শোন্ মুহু কুহু কুহু কুহু
বুক-ভরা সুখ্ নারে বইতে!
সে সুরের মনোহরে জোছনার সরোবরে—
শত তারা এলো জল-সইতে!

* * *

নিশি নিশি জাগো, চাঁদ! নিরালায় নিতি নিরখি!
হারানো ছবির মালা জপ কর কি?
কত আঁখি কত যুগে কত দুখে কত সুখে
আঁখি তব গেছে পুলকি',
ছাই হয়ে গেছে যারা তারা অতীতের তারা,
একাকী তাদের স্মর কি?

* * *

চৈতী এ জোছনায় একি হায় কুয়াশার কান্না!
কান্নার হাহা-হাওয়া, গান না রে গান না!
আকাশের পরকোলা কাদের নিশাসে ঘোলা?
তারালোকে খোলা যত জাল না!
ভরা নয়নের কোলে মুকুরের মুখ দোলে,
ঠোঁটে চুনি, চুলে তার পান্না!

* * *

ঝঙ্কারে রিমঝিম্ ঝিঁঝি গায়, আজ না রে আজ না!
তনু ভরি' মরি মরি নূপুরেরি বাজনা!
আজ নয়, আজ নয়, আজ কোনো কাজ নয়,—
অপরূপ! ভোর না, এ সাঁঝ না!
যে দূরে, যে আছে কাছে সবারি হৃদয় যাচে
জোছনায় অলখেরি সাজনা!

—'কয়েকটি গান' (বেলা শেষের গান)

ইহারই সঙ্গে আর একটি ছন্দ-গীতির কয়েকটি কলি তুলিয়া দিলাম, তাহাতে কবির শুধুই কণ্ঠের গুনগুন নয়—হাতের তুড়ি-দেওয়ার শব্দও শুনা যাইবে।

আহা, ঠুকরিয়ে মধু-কুল্‌কুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুলবুলি;
টুলটুলে তাজা ফলের নিটোলে
টাট্‌কা ফুটিয়ে ঘুল্‌ঘুলি!

* * *

হের, কুল্ কুল্ কুল্ বাস-ভরা
সুরু হ'য়ে গেছে রস-ঝরা,
ভোমরার ভিড়ে ভীমরুলগুলো
মউ খুঁজে ফেরে বিল্‌কুলই!

* * *

ওই নিঝুম নিথর রোদ খাঁ খাঁ
শিরীষ-ফুলের ফাগ-মাখা,
ঢুলঢুলে কার চোখ দুটি কালো
রাঙা দুটি হাতে লাল রুলি!

* * *

ওগো, কে চলেছে ঢেলা-বন ঠেলে
বুলবুলি-খোঁজা চোখ মেলে,
জামরুলী-মিঠে ঠোঁট দুটি কাঁপে,
তাপে কাঁপে তনু জুঁইফুলী !

'জ্যৈষ্ঠী-মধু' (বিদায়-আরতি)

কিন্তু বাংলা সাহিত্যে সত্যেন্দ্রনাথের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান—ভাষার বাক্‌পদ্ধতির দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা, ও তাহার সমৃদ্ধিসাধন। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যগুলিতে বাংলা ভাষার যেন একটি সম্পূর্ণ রূপ প্রকাশ পাইয়াছে; এ ভাষার যত স্তর আছে,—অতিশয় প্রাচীন কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ভাষার ভাণ্ডারে যত শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছে, যে সকল শব্দ অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল—কিংবা প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও সাহিত্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই, এবং "rare word-jewels of ancient authors"—তিনি এই সকলকেই এমন অর্থগৌরব ও ধ্বনিসৌষ্ঠব সহকারে তাঁহার রচনারাশিতে ব্যবহার করিয়াছেন, এবং ভাষার প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এমন সব নূতন শব্দও সৃষ্টি করিয়াছেন যে, সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী যেন বাংলা বুলির একটি রত্নাকর হইয়া আছে। ভাষার রীতি বা idiom-কেও তিনি যে ভাবে উদ্ধার করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে জাতির একটি মহা উপকার হইয়াছে; সে উপকার আজিকার এই জাতি-জন্ম-ভাষা-নাশের দারুণ দুর্দ্দিনে কেহ বুঝিবে না, তথাপি আমার বিশ্বাস, সত্যেন্দ্রনাথ এদিক দিয়া যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বাংলাভাষার জাতি, কুল ও কৌলীন্যের পরিচয়টি অতঃপর আর সহজে লুপ্ত হইতে পারিবে না।

সত্যেন্দ্রনাথের কবি-পরিচয় ও তাঁহার কবি-কীর্ত্তির মূল্য-বিচার শেষ করিবার পূর্ব্বে আর একবার সংক্ষেপে কিছু বলিব।

সত্যেন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিকের মত জীবনের সর্ব্বত্র তথ্যের সত্য

খুঁজিয়াছিলেন; তাঁহার পিতামহের জ্ঞানপিপাসা তিনিও পাইয়াছিলেন,—কাব্যসাধনাতেও তাহাই ছিল তাঁহার প্রধান প্রেরণা। কবি নিজেও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন—তিনি সেই স্বর্গত পিতামহের উদ্দেশে বলিয়াছিলেন—

"হে আদর্শ জ্ঞানযোগী! হে জিজ্ঞাসু, তব জিজ্ঞাসায়
উদ্বোধিত চিত্ত মোর;—গরুড় সে জ্ঞানপিপাসায়।"

সত্যেন্দ্রনাথের কল্পনা অন্ধকারে পক্ষবিস্তার করিত না—অপ্রকাশ বা অপ্রত্যক্ষের আরাধনা তিনি পছন্দ করিতেন না। তিনি যেন কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতই 'কল্পনা'র উদ্দেশে বলিতে পারিতেন—

বিধাতার এ সংসারে, যারে না তুষিতে পারে,
যে কবির মহতী কামনা,
সে কবি করিবে, দেবি! তব উপাসনা।
তোমার মুকুর 'পরে,
সে হেরে হরষভরে
ছায়া তার,—কায়া নাই যার;
তত লোকাতীত নয় বাসনা আমার,
লক্ষ্য মম সামান্য এ সত্যের সংসার।

যাহাকে যুক্তির নিক্তিতে ওজন করা যায়—যাহা পায়ের তলায় কুশাঙ্কুরের মত বিঁধিয়া আপন অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে, তাহাতেই তাঁহার বিশ্বাস ছিল, এবং তাহাকেই জয় করিয়া তিনি আনন্দ পাইতেন। সেজন্য, একদিকে যেমন অতীতের অমানিশায় তিনি দীপহস্তে বিচরণ করিতে ভালবাসিতেন, তেমনই বর্ত্তমানের জগৎব্যাপী জীবনযজ্ঞে হবিঃশেষ-ভোজনের আশায় তিনি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের সম্মুখে তাঁহার প্রাণের পিপাসার পাত্রখানি তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

৫

সর্ব্বশেষে আর একবার সেই প্রশ্ন তুলিব—সত্যেন্দ্রনাথের মত মনোধর্ম্মী, যুক্তিবাদী, নীতিপরায়ণ, প্রত্যক্ষ বাস্তবের পূজারীকে সত্যকার

কবিসমাজে কোন্ আসন দেওয়া যাইতে পারে? আমি অতি-আধুনিক প্রগতিবাদীদের আপত্তির কথা বলিতেছি না; কারণ, তাহাদের আপত্তি কাব্যের আদর্শ লইয়া নহে; তাহারা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য সহ্য করিতে পারে না অন্য কারণে—ভূত যেমন রাম-নাম সহ্য করিতে পারে না। তাহাদের নিকটে সত্যেন্দ্রনাথের অপরাধ অনেক,—প্রথমত, তিনি খাঁটি বাংলাভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন; দ্বিতীয়ত, তাঁহার শব্দযোজনা যেমন গভীর ভাষাজ্ঞান এবং ঐকান্তিক সাধনাসাপেক্ষ, তেমনই তাহা অতিশয় অর্থপূর্ণ; তৃতীয়ত, তাঁহার কবিমানসে চারিত্র ও পৌরুষ বড় অধিক প্রকট হইয়া আছে; চতুর্থত, তাঁহার ছন্দজ্ঞান ও ছন্দবোধ অতিশয় অসুখকর; সর্ব্বোপরি, তাঁহার রচনায় একপ্রকার সুতীক্ষ্ণ রসবোধের আত্যন্তিক সদ্ভাব রহিয়াছে। অতএব, অধুনা যে একদল সত্যেন্দ্রনাথের নামে নাসিকাকুঞ্চিত করিয়া থাকে, তাহাদের আপত্তি সম্পূর্ণ অবান্তর।

আমি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য হইতে যে পরিমাণ কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছি, সত্যেন্দ্রনাথ কবি কি না, এবং কোন্ জাতীয় কবি, তাহা বুঝিবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট হইবে—যদি পাঠকের একটুও সাহিত্যিক সংস্কার এবং রসবোধ থাকে। সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যপ্রকৃতি কোন্ অর্থে ক্লাসিক্যাল তাহা বলিয়াছি; কেবল ইহাই বলিতে বাকি আছে যে, খাঁটি 'ক্লাসিক'হিসাবেও তাঁহার রচনার মূল্য আছে কি না। সত্যেন্দ্রনাথের মেধা, তাঁহার জ্ঞানপিপাসা ও বাণীসাধনার নিষ্ঠা তাঁহার রচনাবলীর ছত্রে ছত্রে জাজ্জ্বল্যমান হইয়া আছে। তাঁহার চক্ষু ও কর্ণের পিপাসা,—দৃষ্টি ও শ্রুতির আনন্দ কেমন শব্দের দ্বারা চিত্র রচনা এবং ছন্দের দ্বারা সঙ্গীত রচনা করিয়াছে—তাহাও দেখিয়াছি; তাঁহার ভাবানুভূতি ও ভাবুকতা কেমন Fancy বা 'খেয়ালী-কল্পনা'য় রঙিন

হইয়া উঠিত—উপমাগুলিও শুধু অলঙ্কার নয়, সেগুলির মধ্যে খেয়ালী-কল্পনার কবিত্ব প্রায় সৃষ্টি-কল্পনার সমান হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও লক্ষণীয়। ইহাও আমরা দেখিয়াছি যে, ছন্দের খেলায় শুধু অসাধারণ কারিগরিই নয়—গভীর সুর-ব্যঞ্জনাও তাঁহার নিছক 'ছন্দ-গীতি'-মূলক কবিতাগুলিকে কোন্ কাব্যভূমিতে তুলিয়া ধরিয়াছে। এই সকল লক্ষণের দৃষ্টান্ত-সহ উল্লেখ ও আলোচনা আমি করিয়াছি, এবং ইহা যে কতবড় বাণীশিল্পীর কাজ, তাহা স্বীকার করিয়াছি। কিন্তু এ সকল সত্ত্বেও সত্যেন্দ্রনাথের প্রতিভায় একটা ব্যক্তিগত বা চরিত্রগত বাধা ছিল, যাহার জন্য তিনি ক্লাসিক্যাল হইয়াও 'ক্লাসিক' হইতে পারেন নাই—এত বড় বাণীশিল্পী হইয়াও, মানবচিত্তের গভীর ও গাঢ়, ব্যাপক ও সুসংযত ভাবরাজির রূপকার হইতে পারেন নাই। একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য সমালোচক, 'ক্লাসিক' (Classic), বা, সাহিত্যে উচ্চ ও স্থায়ী আসনের অধিকারী যে লেখক, তাহার সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গিয়া কয়েকটি যথার্থ কথাই বলিয়াছেন—

> An author who has discovered some moral and not equivocal truth; or revealed some eternal passion in that heart where all seemed known and discovered; who has expressed his thought, observation, or invention, in no matter what form, only provided it be broad and great, refined and sensible, sane and beautiful in itself; a style which is found to be also of the whole world, a style new without neologism, new and old, easily contemporary with all time.

আমি সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের উৎকর্ষ-বিচারে এত বড় মাপকাঠি ব্যবহার করিতে চাহি না; কারণ, সত্যেন্দ্রনাথ যে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি, সে দাবি আমি করিতেছি না। কিন্তু রোমান্টিক কাব্যের গুণ-দোষ যেমনই হউক, যাহাকে আমরা ক্লাসিক্যাল হিসাবেই উপভোগ করিয়া থাকি, তাহার সবচেয়ে বড় গুণ এই যে,—তাহাতে "eternal

passion"-এর অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি না থাকুক, তাহাতে "some moral and not equivocal truth" থাকা চাইই ; অর্থাৎ, সে বাণীর মধ্যে এমন সত্যের প্রকাশ থাকিবে, যাহা স্বপ্রতিষ্ঠ, যাহাতে সংশয়ের দ্বিধা নাই ; এবং যাহা তেমন 'broad and great' না হইলেও 'refined and sensible' হইবে,—যেমন, ইংরেজ কবি Pope-এর রচনা। বোধ হয় সেইরূপ কবিতার কথা মনে করিয়াই উপরি-উক্ত সমালোচক আরও বলিয়াছেন—

"It should above all include conditions of uniformity, wisdom, moderation, and reason, which dominate and contain all the others." "It is here evident that the part allotted to classical qualities seems mostly to depend on harmony and *nuances* of expression on graceful and temperate style."

এবং শেষে এমনও বলিয়াছেন যে,

"In this sense, the pre-eminent classics would be writers of a middling order, exact, sensible, elegant, always clear, yet of noble feeling, and airily veiled strength."

সত্যেন্দ্রনাথের রচনায় ইহার অনেকগুলি বিদ্যমান থাকিলেও, তাঁহার সবচেয়ে বড় দোষ এই যে, তাহা সব সময়ে 'refined' নয়, এবং অধিকাংশ স্থানে 'sane' বা 'sensible' নহে। উপরে যে গুণগুলির উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে প্রধান এবং অত্যাবশ্যক যেগুলি—সেই uniformity, wisdom ও moderation,—রচনার সর্ব্বাঙ্গীণ সমতা, ধীরবুদ্ধি, ও সংযম—সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যের বিশিষ্ট গুণ নহে ; তাঁহার ভাবাবেগ যেমন প্রায়ই 'sensible' নয় ; তেমনই, তাঁহার ভাষার বাক্-সমৃদ্ধি ও শব্দ-নৈপুণ্য অনন্যসুলভ হইলেও, style সর্ব্বত্র temperate নহে। ইহার কারণ সত্যেন্দ্রনাথের ব্যক্তি-চরিত্রের মধ্যেই নিহিত ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ এত পড়াশুনা করিয়াছিলেন—শিল্প ও সাহিত্যের এত অনুশীলন করিয়াছিলেন, তাঁহার মেধা এমন তীক্ষ্ণ ছিল,—তথাপি তাঁহার চরিত্র ছিল বালকের মত অপরিণত ; তিনি বালকের মতই উত্তেজনা-প্রবণ, বালকের মতই কৌতূহলী, এবং বালকের মতই সরল ও অকপট ছিলেন। বিশ্বাসের সাহস, অবিশ্বাসের অসহিষ্ণুতা, এবং পক্ষপাতের উগ্রতা—এই তিন দোষই তাঁহার মানস-প্রকৃতিতে কিছু অধিক পরিমাণে ছিল, এবং তাহার ফলে তিনি কোন ভাব বা চিন্তাকে একটি বিচার-সঙ্গত শান্ত-শ্রী দান করিতে পারিতেন না। আবার, পরীক্ষা দিবার সময়ে, মেধাবী অধ্যয়নশীল বালক, যেমন তাহার অধীত বিদ্যার পরিচয় একটু বেশি করিয়া দিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারে না—তেমনই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহার রচনায়, কারণে ও অকারণে, পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে এমনই অধীর হইতেন যে, তাহাতে যেমন তাঁহার অনেক কবিতা নষ্ট হইয়াছে, তেমনই, বহু সুকবিতাও ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। বালকের মতই তাঁহার এক প্রকার হুজুগপ্রিয়তা ছিল, সাময়িক ঘটনায় তিনি অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠিতেন—তাহা হইতেই তাঁহার অধিকাংশ সাময়িক কবিতার জন্ম হইয়াছে ; সে সকল কবিতায় জনমনোভাবের প্রাবল্যই বেশি, এজন্য সেগুলি অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল। অতিশয় তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি দুরন্ত বালক যেমন প্রতিপক্ষের সহিত বিবাদ ঘটিলে, তাহাকে যেমন করিয়া হউক পরাস্ত করিয়া পরম আত্ম-সন্তোষ লাভ করে, সত্যেন্দ্রনাথও তেমনই, কোন দল বা ব্যক্তির সহিত মতবিরোধ ঘটিলে, তাহার লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া ছাড়িতেন ; অস্ত্র-প্রয়োগের তীক্ষ্ণতা ছাড়া আর কোন দিকে তাঁহার দৃষ্টি থাকিত না। তাঁহার কৌতূহলও ছিল বালকের মত প্রবল ; বস্তু বা বিষয়ের মূল্য যেমন হউক, বিচিত্র ও অভিনব হইলেই হইল—তাঁহার সারা মনপ্রাণ

সেই দিকেই আকৃষ্ট হইত। এইজন্যই তাঁহার বহু কবিতার বিষয়-গৌরব অপেক্ষা, ঘটনা, বস্তু, বা চরিত্রের অসাধারণত্বই কবি-প্রেরণার কারণ হইয়াছে। এইজন্যই তিনি যে সকল বিদেশী কবিতা অনুবাদ করিয়াছেন—সেগুলির নির্ব্বাচনে সাহিত্যিক রসবোধ অপেক্ষা সাহিত্যিক কৌতূহলই জয়ী হইয়াছে। যে সকল কবিতা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ, সেগুলিকে তেমন আদর না করিয়া, অপরিচিত দেশের, অপরিচিত ভাষার, অপরিচিত কবির কবিতার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছেন; অথবা, সুকবিতার সংখ্যা অপেক্ষা কবিদের নামের সংখ্যা বাড়াইতে চাহিয়াছেন—যাহাতে তাঁহার অধ্যয়নের পরিধি কত বিস্তৃত তাহাই প্রমাণিত হয়। ছন্দের প্রতি তাঁহার আত্যন্তিক আসক্তিও বালকের ক্রীড়াসক্তির মত; এখানেও তাঁহার মূল্যজ্ঞানের অভাব লক্ষিত হয়। এই সকল দোষ এবং তাহার যে কারণ আমি নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহার জন্যই সত্যেন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট কবিকীর্ত্তির অধিকারী হইতে পারেন নাই; তাঁহার বিরুদ্ধে আর যে সকল আপত্তি, তাহা মিথ্যা।

তথাপি আশা করি, আমি সত্যেন্দ্রনাথের কবিকর্ম্ম ও কবিপ্রতিভার যে পরিচয় দিয়াছি তাহাতে, বাংলা কাব্যসাহিত্যে তাঁহার যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। সর্ব্বশেষে, আবার সেই কথাই বলি,—সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যবিচার-কালে, এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই যে, মানুষের মনে রসের অনুভূতি যেমন অনেক প্রকারে হইয়া থাকে, তেমনই তাহার প্রকাশের রূপও বহুবিধ হওয়াই স্বাভাবিক, এবং—

"There is more than one chamber in the mansions of my Father"; that should be as true of the kingdom of the beautiful here below, as of the kingdom of heaven."

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

পিশাচ

(১) প্রিন্স মহেন্দ্র

কাল দ্বিপ্রহর, চৈত্রের রৌদ্রে দগ্ধ মাটি চটিয়া ফাটিয়া খানখান হইয়া গিয়াছে। আকৃতি তাহার কুষ্ঠরোগীর চর্ম্মের মত। ভীতিপ্রদ আশঙ্কা আসিয়া উপস্থিত হয়, হয়তো বা উহার সংস্পর্শে আসিলে উলঙ্গ পা দুইটা ফাটিয়া কুষ্ঠের মত দেখাইবে।

দূরে—বহুদূরে বাষ্প ও বালুকণার ধূসর আবরণ, তাহারই অন্তরালে বিলীন হইয়া গিয়াছে আকাশ ও ভূমির সীমান্ত-রেখা। সীমান্তের সঙ্গমস্থলে তরুবেষ্টিত সুপ্ত গ্রাম। মাঝে মাঝে দুই-একটি অস্পষ্ট কুটীর আলাদাভাবে দেখা যায়।

এমনই একটি স্থানের মধ্য দিয়া পথিক চলিয়াছে একেলা। মুখের চারিত্রিক আকর্ষণ কঠোর, বর্ণ, গৌর ঝলসিয়া গলিত তাম্রের মত দেখাইতেছে। শরীর ঋজু, কিন্তু সাংঘাতিকভাবে দৃঢ়। মাংসপেশী সম্পূর্ণ মেদবর্জ্জিত, শুষ্ক চেলা-কাঠের মত মোটা ও মজবুত হাড়গুলিকে নিবিড়-ভাবে জড়াইয়া আছে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করায় কপাল হইতে বৃষ্টির ধারার মত ঘাম ঝরিতেছে। পদতলে অগ্ন্যুত্তপ্ত ধরণী তৃষ্ণার্ত্তের মত নরদেহ-নির্ঝরিত বারিবিন্দু শোষণ করিয়া ফেলিতেছে। জনমানবহীন এমন একটি আবেষ্টনীর ভিতর দিয়া কাহাকেও চলিতে দেখিলে মন অনুসন্ধিৎসু হইয়া উঠে—পথিকের রহস্যময় প্রকৃতি ও গম্যস্থলটি জানিবার জন্য।

পথিক রামগড়ের প্রিন্‌স মহেন্দ্র পাল। রাজবংশের শেষ কুলপতি বলিয়া সরকার তাহাকে প্রিন্‌স মহেন্দ্র বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকেন এবং যৎসামান্য মাসোহারাও দেন।

মহেন্দ্রের জীবনে এমন সব ঘটনা ঘটিয়াছে, যাহা ফৌজদারী আদালতের নথিতে লিপিবদ্ধ না করিয়া আইন-রক্ষকরা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। গ্রামের লোক মহেন্দ্রের নাম শুনিলে শিহরিয়া উঠে। এমন কি, হালে বাহাল দারোগাবাবু পর্য্যন্ত, আশেপাশে চার-পাঁচটি কন্‌স্টেবল না থাকিলে নিজের এলাকায় পাইয়াও মহেন্দ্র পালের সহিত সাক্ষাৎ আলাপে দোমনা হইয়া থাকেন। কারণ মানুষটি কখন কি কারণে চটিয়া উঠিবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই; এবং চটিয়া উঠিলে কি ঘটিবে না, বলা শক্ত।

মানুষ-গুমি ইত্যাদি কারণে সরকার দুই-দুইবার মহেন্দ্রকে শ্রীঘর দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রমাণাভাবে কিছু করিতে পারেন নাই। কেবল প্রিন্‌স দুশ্চরিত্র বলিয়া নজরবন্দীর খত স্বাক্ষরে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই বিচারের বিরুদ্ধে সে আপীল করে নাই।

মহেন্দ্র নজরবন্দী হইবার পর হইতে একবেলা থানায় হাজিরা দিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোন পার্থক্য ঘটিয়াছে বলা চলে না। পুরাতন দারোগাবাবুর কথা এখনও গ্রামের লোক বলাবলি করিয়া থাকে—আহা, বেচারা দারোগাবাবু কর্ত্তব্য করিতে আসিয়া চাবুক খাইয়া হাসপাতালে ভুগিতেছে!

কিছুদিন আগের কথা, মানুষ-গুমির অপরাধে দারোগাবাবু মহেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়া অযাচিত কতকগুলি উপদেশ বর্ষণ করিয়াছিলেন। দুশ্চরিত্রকে চরিত্রবান করিবার জন্য অনেকেই মহেন্দ্রকে প্রয়োজনের অপেক্ষা না রাখিয়া উপদেশ দিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছে।

উপদেশ শুনা মহেন্দ্রের সহিয়া গিয়াছে, কিন্তু দারোগাবাবু উপদেশ ছাড়া আর কিছু বলিয়াছিলেন, যাহাতে তালব্য শয়ের সহযোগে একটি ঘনিষ্ঠ

প্রিন্‌স মহেন্দ্র

সম্বন্ধ পাতাইবার স্পষ্ট আভাস ছিল। মহেন্দ্রের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে গিয়া প্রিন্‌সের পূর্ব্বপুরুষদেরও টান মারিয়াছিলেন এই বলিয়া—অকেজো

বাপ না হইলে মহেন্দ্রের মত পুত্র জন্মায়? মহেন্দ্রের ভগ্নী নাই এবং থাকিলেও দারোগার মত একজন সাধারণ চাকরের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়া যে অসম্ভব, তাহা বুঝাইবার জন্য মহেন্দ্র দারোগার উপদেশের উত্তর দিয়াছিল একেবারে শঙ্করমাছের চাবুক কষাইয়া। মহেন্দ্রকে বাধা দিবে কে? চাবুকের পর চাবুক খাইয়া বেচারা দারোগার দেহ ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। একটি কন্‌স্টেব্‌ল মহেন্দ্রের সৎকার্য্যে বাধা দিতে আসিয়াছিল, মহেন্দ্র তাহাকে চাবুক মারিল না বটে, কিন্তু একটা কান দেহ হইতে নিরবচ্ছিন্ন দৈহিক শক্তির দ্বারা টান মারিয়া মাথা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল, তাহার পর অকস্মাৎ পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিয়া দারোগাকে বলিল, আমার পায়ের তলায় হামাগুড়ি দাও, জুতা পরিষ্কার করিয়া দাও। তাহার পর হঠাৎ আদেশ করিল, না, সোজা হইয়া দাঁড়াও। ভরা পিস্তল হাতে লইয়া যদি একটা মূষিকও আদেশ করে তো তাহা মানিতে হয়। দারোগা সোজা হইবার চেষ্টা করিল। সামান্য গেঁয়ো দারোগা, সে আর কত সোজা হইতে পারে বিশেষ করিয়া মহেন্দ্রের সামনে। মহেন্দ্রের হাতে মিহি করাতের মত চাবুক লিকলিক করিতেছিল। সে নিজেকে সংযত করিতে পারিল না, দারোগার মুখের উপর সপাং করিয়া এক ঘা বসাইয়া দিল। ডানদিকের চিবুকটা গভীর হইয়া কাটিয়া গেল। এই বাজে একটা লোক তাহার ভগ্নীপতি হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে কেমন করিয়া, তাহা মহেন্দ্র ভাবিতে পারিতেছিল না। এত বড় উচ্চ আকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত পুরস্কার এখনও দেওয়া হয় নাই ভাবিয়া বলিল, আমার জুতাটা চাটিয়া পরিষ্কার করিয়া দাও। জুতা-চাটা অপেক্ষা মৃত্যুকে বরণ করা দারোগা অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিল, মহেন্দ্রের আদেশ মানিল না। স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার পর বলিল, তোমার আত্মসম্মানবোধ

এখনও আছে দেখিতেছি। আর ছোট করিতে চাহি না, তবে বাকি তিনটা কন্‌স্টেব্‌লের একটু শিক্ষা হওয়া দরকার, তোমার কথা উহারা শুনিয়াছে। তোমার অধীনে কাজ করিলে সাধুভাষা আরও উহাদের শুনিতে হইবে, কানগুলা নোংরা ভাষায় আস্তে আস্তে পচিতে থাকিবে। তার আগে উহাদের একেবারে কালা করিয়া দিই। কথা শেষ হইবার পর এক মুহূর্ত্ত সময় কাটে নাই। চক্ষের পলক না পড়িতে মহেন্দ্র পোশাক-পরিহিত দুইজন কন্‌স্টেব্‌লের গলা মুখামুখিভাবে একসঙ্গে চাপিয়া ধরিল, জাপানী কুস্তিতে নাকি এই কায়দায় ধরাকে জোড়-কাঁচি বলে। বোধ হয় এক মিনিটের বেশি সময় যায় নাই, ইহারই মধ্যে দেখা গেল, উভয় কন্‌স্টেব্‌লের নাক দিয়া ঝরঝর করিয়া রক্ত ঝরিতেছে। মহেন্দ্র ছাড়িয়া দিতে উভয়েই কানে হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। নাক দিয়া রক্ত ঝরিতেছে সেদিকে লক্ষ্য নাই, কানের ব্যথায় তাহারা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। জাপানী প্যাঁচের অদ্ভুত মহিমা! এই ঘটনার পর চতুর্থ কন্‌স্টেব্‌ল হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। মহেন্দ্র দারোগাকে বলিল, মহাশয়, পেশা আপনার মানুষ ধরা, অকারণ আমার পূর্ব্বপুরুষদের বিরক্ত করিতে গিয়াছিলেন কেন? জীবিকা উপার্জ্জন গোলামির উপর, উন্নতিলাভ খোশামোদ অথবা বয়স বাড়াইয়া করিয়া থাকেন। আমার পিতা স্বর্গে গিয়া থাকিলে—গত রাত্রের বিলাসের পর আমেজে আছেন, নরকে গিয়া থাকিলে ঘানি টানিতেছেন। সোজা কথায়, বসিয়া নাই। ভবিষ্যতে, আশা করি, ভদ্রসন্তানকে ধরিতে আসিলে প্রয়োজন অপেক্ষা বেশি কথা বলিবার চেষ্টা করিবেন না। এখন চলুন থানায়। চালান দিতে হইবে তো। দারোগাকে থানায় যাইতে হইল না। রামগড় হইতেই গ্রামের জমিদার তাঁহাকে নিকটবর্ত্তী হাসপাতালে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কন্‌স্টেব্‌লগুলিও তাঁহাকে অনুসরণ করিল এবং

মহেন্দ্রকেও সঙ্গে লইয়া গেল। আদালতে যখন মকদ্দমা উঠিল, তখন চারটি কন্‌স্টেব্‌ল ও তৎকালীন উপস্থিত কয়েকজন গ্রামের লোক সাক্ষী দিল, তাহারা একেবারেই কিছু জানে না; এবং কন্‌স্টেব্‌লরা বলিল, দারোগার সহিত মহেন্দ্রকে গ্রেপ্তার করিতেও যায় নাই। হাকিম সাক্ষীদের উক্তি বিশ্বাস করিলেন না; রায়ে লিখিলেন, প্রিন্‌স মহেন্দ্র দুশ্চরিত্র, প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইতেছি—আমার নিজের বিশ্বাস, দারোগার কর্ত্তব্যে প্রিন্‌স মহেন্দ্রই বলপূর্ব্বক বাধা দিয়াছে। যাহা হউক, আজ হইতে এক বৎসর মহেন্দ্রকে নিজ বাড়িতে নজরবন্দী হইয়া থাকিতে হইবে। মহেন্দ্র ছোট হাকিমের হুকুম মানিয়া লইয়াছিল। এই ঘটনার পর কন্‌স্টেব্‌লরা চাকরি ছাড়িয়া নিজ নিজ দেশে চলিয়া গিয়াছে। যাহাতে বাকি জীবনটা চাকরি না করিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা মকদ্দমা আদালতে উঠিবার আগেই কেমন করিয়া হইয়া গিয়াছিল।

লোকে কানাঘুষা করে, মহেন্দ্র নিশ্চয় পালরাজাদের গুপ্তধনের সন্ধান রাখে, তাহা না হইলে সকলের জবানবন্দী একেবারে উল্টা হইয়া গেল কেমন করিয়া? কত টাকাই না জানি খাইয়াছিল, তাহা না হইলে চাকরির মায়া ছাড়িয়া তাহা মিছা কথা বলে? গুপ্তধনের কথা প্রকাশ্যে কেহ বলিতে সাহস পায় না; কি জানি, যদি সাক্ষী করিয়া ধরিয়া লইয়া যায়, দ্বিতীয় কারণ লোকেদের দৃঢ় ধারণা জন্মাইয়াছে, মহেন্দ্রের অমানুষিক শক্তি আছে, সে নাকি পিশাচসিদ্ধ। রাত্রিতে প্রাসাদের প্রকাণ্ড ছাদহীন বড় ঘরটায় কত লোকে দেখিয়াছে, একরাশ মানুষ ঘোরাঘুরি করে। পাথরের উপর উঁচু হইতে অগুনতি টাকা ফেলার কথাটাও নাকি সত্য। যেসব মানুষ মহেন্দ্রের সহিত ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা মানুষের মত চলিলেও ঠিক মানুষ বলা চলে না—বেশভূষা কেমন অদ্ভুত ধরনের।

যাহারা মহেন্দ্রের ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ লইয়া কথা বলে, তাহারা সকলেই ঘটনাগুলির বৃত্তান্ত শুনিয়াছে, কেহ দেখে নাই। ভূতুড়ে কাণ্ড চাক্ষুস আর কে দেখিতে চায়? এইভাবে পালরাজাদের গুপ্তধন ও মহেন্দ্রের পৈশাচিক ক্রিয়ার বিবরণ প্রায় স্বতসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে, গল্প বলিয়া উড়াইয়া দিবার কোন ওজুহাত নাই।

বংশ-পরিচয়টার আজকাল তেমন চলন নাই। মানুষের আদিপুরুষ ঠিক বাঁদর ছিল কি না, তাহারই গবেষণা করিতে পণ্ডিতরা দিবারাত্র খাটিয়া মরিতেছেন। মনস্তত্ত্বের বিজ্ঞানে চরিত্রগঠন সম্বন্ধে নানা ব্যাখ্যা আছে। পূর্ব্বপুরুষের চারিত্রিক দোষ অথবা গুণ অনেক স্থলে পুত্র, পৌত্র, এমন কি প্রপৌত্রের উপর আসিয়া পড়ে—ইহা অনেকের মতে মনোবিজ্ঞানের একটি খাঁটি সিদ্ধান্ত। মহেন্দ্রের চরিত্রে আর যাহাই থাকুক, সে যে একজন প্রিন্‌স, এ কথা সে কিছুতেই ভুলিতে পারে না। আদেশ করাটা তাহার স্বভাবে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। ইহাই মহেন্দ্রের নিজের এবং তাহার বংশের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

রামগড় প্রাচীন পালরাজাদের গড়-বাড়ি, অর্থাৎ একটি ছোটখাট দুর্গের মত। মধ্যস্থলে বিরাট প্রাসাদ। তাহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া আছে নাতিবৃহৎ পাকা গাঁথুনির খাল; মাঝে মাঝে তোলা পোল। শত্রু নিকটবর্ত্তী হইলে পোল তুলিয়া লওয়া হইত। খালের গহ্বরটি এখন আছে, কিন্তু জল শুকাইয়া গিয়াছে। পোলের জীর্ণ অবস্থা অতীতের ইতিহাস ঘোষণা করিতেছে। আসল রাজা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে হইলে প্রত্নতাত্ত্বিকের কল্পনার উপর নির্ভর করিতে হয়।

খালের খাপদপূর্ণ ইটের পাঁজা জীবন্ত অবস্থায় হাঁটিয়া পার হইতে পারিলে অনেকটা খালি জমি দেখিতে পাওয়া যায়। নানা আগাছা জন্মাইয়া স্থানটি ছোট ছোট ঝোপে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিশেষভাবে

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, ধসা কামানের টুকরা হইতে আরম্ভ করিয়া কারুকার্য্যখচিত তরবারি, বল্লম, ছোরা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, অধিকাংশই প্রায় সমাধিস্থ। কোন সময় পরিত্যক্ত স্থানটি যে রণভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ উঠে না। যোদ্ধর দল প্রাণ উৎসর্গ করিয়া পৌরুষকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গিয়াছে।

প্রাসাদসম অট্টালিকা এখন পর্ব্বতসম ভগ্নস্তূপে পরিণত। প্রবেশ-পথের দ্বারগুলি বেশির ভাগই অগম্য, হয় কব্জা খুলিয়া কবাট এমন ভাবে হেলিয়া পড়িয়াছে যে, তাহা পাশ কাটাইয়া কোন মানুষ ভিতরে ঢুকিতে পারে না, নয় গাছের শিকড়ের পরিধি বাড়িয়া এমন আকার ধারণ করিয়াছে, যাহার ভিতর দিয়া রাস্তা করিয়া লইতে হইলে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর দেহের প্রয়োজন হয়। প্রাসাদের অন্তিম দক্ষিণ কোণে কেমন করিয়া একটি ঘর টিকিয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র এই ঘরটিতে বাস করে।

মহেন্দ্র উত্তরাধিকারী-স্বত্বে নগদ টাকা গহনা ইত্যাদি যাহা পাইয়াছিল, তাহা নিঃশেষিত হইবার পর যাহা ছিল, তাহা ভগ্নস্তূপ ও তৎসহিত অনেকগুলি পাসমুক্ত আগ্নেয় অস্ত্র, একরাশ টোটা এবং পালদীঘির জঙ্গল। জঙ্গলটির চৌহদ্দি দীর্ঘ পরিধি লইয়া বিস্তৃত। সোজা কথায় বাংলার হাঁপানি ও হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্ত কলেজে-পড়া অতি-আধুনিক তরুণতরুণীর দল এখানে বনভোজন করিবার সুবিধা পায় না। কারণ জঙ্গলের সর্ব্বত্রই ভয়ঙ্কর শার্দ্দূল হইতে আরম্ভ করিয়া বিষধর সর্প পর্য্যন্ত ইচ্ছামত বিচরণ করিয়া থাকে। মহেন্দ্র চলিয়াছে এই জঙ্গলের দিকে।

সরকার হইতে মহেন্দ্র যে তঙ্কা পায়, তাহা দ্বারা এক পক্ষের অধিক কোন সুস্থ মানুষের অন্ন-সংস্থান হইতে পারে না। জীবনধারণের জন্য বাকি অবশ্য-প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি কি ভাবে সংগৃহীত হয়, এখন কেহ

জানিতে পারে নাই। লোকে বলে, মহেন্দ্র নাকি সন্ধ্যার পর মিহি শান্তিপুরী কোঁচানো ধুতি ও অতি-মিহি ঢাকাই মস্‌লিনের গিলা-করা পাঞ্জাবি পরিয়া থাকে। প্রত্যহ ধোপদুরস্ত কাপড় ও পাঞ্জাবি কে কুঁচাইয়া ও গিলা করিয়া দেয়, জানিবার কৌতূহল অনেকের থাকিলেও অনুসন্ধান করিবার সাহস কাহারও হয় নাই। কি জানি, অনুসন্ধান করিতে গিয়া কোন্ বিপদে কে পড়িয়া যাইবে! মহেন্দ্রের কারবার তো শুধু মানুষের সহিত নয়।

চলিতে চলিতে মহেন্দ্র একবার দাঁড়াইল। প্রখর রৌদ্রের ঝলক চোখে আসিয়া পড়িতেছিল, ভ্রূর উপর তালুর আড়াল দিয়া বহুদূরে দৃষ্টি চালাইয়া দিল, জঙ্গল এখনও দৃষ্টির বাহিরে, তবে ঘোষপাড়ার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে। ঘোষপাড়া একটি ছোট গ্রাম। নলিন স্বর্ণকারের বাসা গ্রামের গোড়াতেই। রাসমণি নলিনের তৃতীয় পক্ষের পত্নী। ভাবিল, রাসমণির এখানে খানিকটা জিরাইয়া লইলে মন্দ হইত না; কিন্তু ঠিক এই সময়টিতেই রায়দের ছোটকর্ত্তা নিয়মিত বিশ্রাম করিতে আসে। আসুক না, তাহাতে অসুবিধার কি থাকিতে পারে? ছোকরাকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিবে কি? কিন্তু বল-প্রয়োগে জমিদার-ছোকরাকে বাহির করিয়া দিবার অসুবিধা আছে অনেক। রাসমণির ছোকরাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বহুবার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। হয়তো চেঁচামেচি করিয়া হাট বসাইবে। এই কারণে ছোকরা মাত্রেই মহেন্দ্রের চক্ষুশূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মহেন্দ্র ভাবিল, দুইবার তো দুইটিকে জঙ্গল দেখাইয়াছি, না হয় ছোটকর্ত্তা আর একজন হইবে। তাহার পর ভাবিল, না, ক্রন্দন-সহ সোহাগ মহেন্দ্রের পোষায় না। ঠিক করিল, সোজা জঙ্গলে চলিয়া যাইবে; কিন্তু দৈহিক ক্লান্তি মহেন্দ্রকে কাবু করিয়াছিল, একটু বিশ্রাম না লইলে আর চলে না।

সে মাঠের মাঝপথেই বসিল। পুরাতন গ্ল্যাড্‌স্টোন ব্যাগটি নামাইয়া তাহার ভিতর হইতে একটি রূপার সামরিক ধরনের জলপাত্র বাহির করিয়া মাত্র এক চুমুক জল খাইল, তাহার পর পাত্রটি উপুড় করিয়া অনেকটা জল জুতাজোড়া খুলিয়া তাহার ভিতর ঢালিয়া দিল। হঠাৎ কি মনে পড়ায় ভিতরের সমস্ত জিনিসপত্র তচনচ করিয়া ফেলিল; যাহা খুঁজিতেছিল, তাহা পাওয়া গেল না। পকেট হাতড়াইল, সেখানেও নাই; অস্থির হইয়া উঠিতেছিল, দৈবক্রমে কোমরবন্ধে হাত পড়ায় স্বস্তির নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল। বস্তুটি একটি অতি বৃহদাকারের চাবি। চাবি পূর্ব্বস্থলে ভাল করিয়া গুঁজিয়া আবার ব্যাগের ভিতর হাত পুরিয়া দিল। এবার যাহা বাহির করিয়া আনিল, তাহার দৃশ্য ভয়াবহ। একেবারে অতি-আধুনিক ধরনের অটমেটিক পিস্তল। অস্ত্রটি প্রয়োজনবোধে এক মুহূর্ত্তে বাঁট পরাইয়া রাইফেলের মত ব্যবহার করা চলে।

মহেন্দ্র একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা দেখিয়া লইল, কেহ কোথাও নাই। গ্রাম অতি নিকটে, তথাপি কাকের দল পর্য্যন্ত নিঝুম মারিয়া গিয়াছে।

মহেন্দ্র উঠিল, জুতার ভিতর পা দিতেই খানিকটা জল উপচাইয়া পড়িল। উত্তপ্ত মাটি দেখিতে দেখিতে তাহা শোষণ করিয়া ফেলিল।

মহেন্দ্র চলিতে লাগিল, প্রত্যেকটি পদবিক্ষেপে পুরাতন স্মৃতি যেন সজোরে আঘাতপ্রাপ্ত হইতেছিল। যে জল মহেন্দ্র পদতলে ব্যবহার করিয়াছে, সেই জলেরই অভাবে একদিন এক তৃষ্ণার্ত্ত ছোকরা তাহার সামনে 'জল জল' করিয়া চলিয়া গিয়াছে। মহেন্দ্র নিজেকে সান্ত্বনা দিল, তাহার তো দোষ ছিল না। রাসমণির সন্দেহ-বাতিক বাড়িয়া না উঠিলে এ রকমটি কখনও ঘটিত না, সেই তো ছোকরাকে লেলাইয়া দিয়াছিল। ছেলেটার অদ্ভুত সাহস, জঙ্গল পর্য্যন্ত পিছু লইয়াছিল, ভাগ্যে সময়মত সন্দেহ আসিয়াছিল, তাহা না হইলে ছোকরা সিন্দুকের খবর

লইয়া ফিরিয়া আসিত। না ভালই করিয়াছে যে, বাঁচিয়া থাকিলে অকারণ বিপদকে পুষিয়া রাখা হইত। কথাতেই আছে—রোগের শেষ রাখিতে নাই। ছেলেটাকে চিরকালের জন্য সরাইয়া ভালই করিয়াছে। রাসমণি তাহার দরদের কথা আর বলিবে না। আমি কি রাসমণিকে প্রাণ ভরিয়া চাই নাই? চাওয়ার প্রতিদানে কি পাইয়াছিলাম? ওই ছোকরাগুলার গুণকীর্ত্তন—ছেলেটা দেখিতে কি সুন্দর, কি মিষ্ট কথা, কত ভদ্র ব্যবহার! ছোকরা হইলেই সব তাহার সুন্দর। রাসমণিকে মহেন্দ্র কি বলপ্রয়োগে পাইবার চেষ্টা করিয়াছিল? সে তো আপনিই ধরা দিয়াছিল। ভালবাসার ভান না দেখাইলে সে কি ওর মত একটা মেয়ের পিছনে ঘুরিত, না টাকা খরচ করিত? তাহার অনুমান দারোগা জঙ্গলের খবর রাসমণির নিকটই পাইয়াছিল। রাসমণি বলে কিনা—মহেন্দ্রই ওর চরিত্র নষ্ট করিয়াছে! এক হাতে নাকি তালি বাজে! চুলায় যাক, মহেন্দ্র ঠিক করিল, রাসমণির সহিত আর কোন সম্বন্ধ রাখিবে না। হরিদাসীর কাছেই যাইবে। কিন্তু এখন তাহার কাছে যাইতে হইলে অনেকটা পথ ঘুরিতে হয়। এইরূপ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে মহেন্দ্র রাসমণির আটচালার প্রায় সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল। অজ্ঞাত আকর্ষণ তাহাকে এই পথে টানিয়া আনিয়াছে। মহেন্দ্র সামনের দিকে মুখ তুলিতে দেখিল, রাসমণি বিপরীত দিকে চাহিয়া অন্যমনস্কভাবে দরজায় দাঁড়াইয়া আছে। দেহাভরণ যথেষ্ট শ্লথ হওয়ায় গঠনের রেখাগুলি চুম্বকের মত আকর্ষণী শক্তি পাইয়াছে। নধর নিটোল বক্ষ প্রায় অনাবৃত, পাতলা ঠোঁট দুইটি রৌদ্রের ছটায় শাণিত ছোরার মত চকচক করিতেছে। ডাগর দুইটি চোখ, দৃষ্টি তাহাদের স্বভাবতই উদাস, কিন্তু আক্রমণের উপযুক্ত পাত্র পাইলে ক্ষণিকে মারাত্মক হইয়া উঠে। যেন বশীকরণ-শক্তি লইয়াই উহারা জন্মাইয়াছে। সংক্ষেপে রাসমণির গঠন যেন ওস্তাদ ভাস্কর একটি গোটা কালো পাথর কাটিয়া বাহির করিয়াছে। চিত্রশিল্পীর ঝাপসা রঙের হেঁয়ালির এখানে স্থান নাই। রূপকার কেবল রেখার ছন্দ দিয়া রাসমণিকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বাঁধিয়াছে। মহেন্দ্র রাসমণিকে প্রাণ ভরিয়া দেখিল। দর্শনকালীন প্রত্যেকটি অঙ্গ যেন দৃষ্টিদ্বারা স্পর্শ করিতেছিল।

রাসমণি মুখ ঘুরাইতেই মহেন্দ্র তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া গেল। চিবুকটি নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আছ? এ কয়দিন আসতে পারি নি, রাগ কর নি তো? যুবতীর দেহস্পর্শে মহেন্দ্রের নেশা ঘোরাল হইয়া আসিতেছিল। রাসমণির আরও নিকটে আসিবার চেষ্টা করিতেই সুন্দরী বাধা দিল, আঃ ছি, কর কি, ও যে ঘরে রয়েছে! মহেন্দ্র থমকিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর বলিল, ঘোষেদের ছোট ছেলেটা নাকি? শ্লেষ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিত হয় নাই ভাবিয়া আবার বলিল, ও, সেই জমিদারপুত্র আরাম করছেন বুঝি? পালকি দেখছি যে! কথাটা শেষ করিয়াই মহেন্দ্র রাসমণির স্কন্ধে হাত রাখিতে গিয়াছিল। রাসমণি পিছাইয়া গেল, তাহার পর ক্ষিপ্রগতিতে ঘরে ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

মহেন্দ্র এতটা প্রত্যাশা করে নাই। কিছুক্ষণ নিস্তব্ধভাবে দরজার সামনে দাঁড়াইয়া রহিল। নানা চিন্তা মনে আসিতেছিল, তবে কি গুজবটা একেবারে সত্য? সত্য যদি হয়, তাহা হইলে রাসমণিরও শিক্ষার প্রয়োজন আছে। দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া মহেন্দ্র কি একটা সিদ্ধান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল, মনোভাবের প্রতিবিম্ব মুখের প্রত্যেকটি রেখায় প্রতিফলিত হইয়া উঠিল,—পিশাচ যেন তাহার সাধনার উপকরণের সন্ধান পাইয়াছে। মহেন্দ্র ফিরিল, তৃষ্ণায় তালু শুকাইয়া গিয়াছে, তথাপি এক বিন্দু জলের জন্যও অপেক্ষা করিল না। কিন্তু জলের প্রয়োজন অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ভাবিল, একবার হরিদাসীর ওখানে যাইলে কেমন হয়? কিন্তু যাওয়া উচিত হইবে না। সেও তো কিছুদিন ধরিয়া মহেন্দ্রকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করিতেছে। ঘটনাগুলি মহেন্দ্রের নিকট গোলমেলে হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে পূর্ব্বসিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া গন্তব্য পথের দিকে দ্রুত পা চালাইয়া দিল। সন্ধ্যার মধ্যে আবার থানায় হাজিরা দিতে হইবে। তৎপূর্ব্বে কিছু অর্থ সংগ্রহ হওয়াও একান্ত দরকার।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

সরোজিনী

১৪

পরদিন বিকালে দারোগাবাবু গ্রামের ও ইউনিয়ন বোর্ডের অধীনস্থ অন্যান্য গ্রামের গণ্য-মান্য ব্যক্তিদিগকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। যথা-সময়ে হাজির হইয়া দেখিলাম, ইহার মধ্যেই সকলে উপস্থিত হইয়াছেন। এক পাশে বসিয়া রাধানাথ ও গাঙুলী মশায়, দোলগোবিন্দ এবং আমাদের পাড়ার আরও অনেকে, আর এক পাশে মণীন্দ্র, বীরু আচার্য্যি, আজিজ সাহেব ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং বিভিন্ন গ্রামের আরও অনেক ভদ্রলোক, মাঝখানে চেয়ারে বসিয়া দারোগাবাবু। মুশকিলে পড়িলাম। কোন্ পক্ষে বসিব? গাঙুলী মশায় চক্ষের ইঙ্গিতে তাঁহার পাশে বসিবার জন্য ডাকিলেন; মণীন্দ্র হাঁকিল, এদিকে এস হে মাস্টার—বলিয়া আর সকলকে ঠেলাঠেলি করিয়া জায়গা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। দারোগাবাবু মুশকিল আসান করিলেন, একজন কন্‌স্টেবলকে ডাকিয়া একটা চেয়ার আনাইয়া তাঁহার পাশেই বসিতে বলিলেন। বসিতেই রাধানাথ মুখ ভার করিল, মণীন্দ্র স্পষ্টভাবেই বলিয়া উঠিল, হাকিম।

দারোগাবাবু তাঁহার বক্তব্য বলিতে শুরু করিলেন, এস. ডি. ও. সাহেব আগামী রবিবারে আসবেন, এ কথা বোধ হয় আপনারা অনেকেই শুনেছেন। আমাদের মহামান্য সম্রাট বাহাদুর জার্মান দস্যুদের জব্দ করবার জন্যে যুদ্ধ করছেন। আমাদের সকলেরই উচিত এই যুদ্ধে তাঁকে দৈহিক ও আর্থিক সাহায্য করা! যাঁদের ক্ষমতা আছে, তাঁরা সৈন্যদলে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করুন, (শ্রোতৃমণ্ডলী সকলেই একযোগে 'না'-সূচক ঘাড় নাড়িল) আর তা না করলে টাকা দিয়ে সাহায্য করুন। (শ্রোতৃমণ্ডলী ঘাড়-নাড়ার পরিবর্ত্তে মুখ গম্ভীর করিল।)

দারোগাবাবু গাঙুলী মশায়ের উদ্দেশে কহিলেন, আপনি, রাধানাথবাবু, ইত্যাদি যাঁরা অবস্থাপন্ন ব্যক্তি, তাঁরা আপনাদের অবস্থানুযায়ী যে যা

পারেন তা তো নিশ্চয়ই দেবেন, তা ছাড়া আপনার ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসাবে একটি কাজ করা উচিত; অবশ্য আমার বলবার কোন অধিকার নেই, তা হ'লেও আপনাদের বন্ধুহিসাবে বলছি; ইউনিয়ন বোর্ডের তহবিল থেকে অন্তত একশো টাকা দেওয়া উচিত। ওই টাকাটা পরে ট্যাক্স আদায় করবার সময়ে সকলের কাছ থেকে আপনি আদায় ক'রে নেবেন।

গাঙুলী মশায় নীরব রহিলেন, কিন্তু প্রতিবাদ করিল রাধানাথ, তা হ'লে আমরা যা দোব ট্যাক্সের সঙ্গেই দোব।

দারোগাবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, আপনার যা ইচ্ছে হয় করবেন।

মণীন্দ্র বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া কহিল, ট্যাক্সের সঙ্গে আর কত আদায় হবে? দু-চার আনা ক'রে হয়তো। যাদের জমি-জমা তেজারতি-মহাজনি দোকান-দানি আছে, তারাও যদি টাকা না দেয় তো সম্রাট বাহাদুর যুদ্ধ বন্ধ ক'রে দেবেন, তখন বুঝবে সব মজাটা জার্মানদের গুঁতো খেয়ে।

দারোগাবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, মণীন্দ্রবাবু, চুপ করুন।

তারপর কহিলেন, এস. ডি. ও. সাহেব আমাকে যা বলতে ব'লে পাঠিয়েছেন, তাই বললাম। এর পর যা ইচ্ছে হয় আপনারা করবেন। এস. ডি. ও. সাহেব রবিবার চারটের সময়ে এখানে এসে পৌঁছুবেন। আপনারা সকলকে জানিয়ে দেবেন যে, সকলে যেন সেই দিন বেলা তিনটের সময়ে এখানে এসে হাজির হয়। এখানের কাজ শেষ ক'রে তাঁকে আবার অন্য কাজের জন্যে অন্যত্র যেতে হবে।—বলিয়া রাধানাথ ও গাঙুলী মশায়ের মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। তারপর গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিলেন, বেশ, তা হ'লে আপনারা সেদিন ঠিক সময়ে এখানে এসে হাজির হবেন, আর যত পারেন নিজের নিজের গাঁয়ের লোকদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবেন, মোট কথা—আপনাদের সকলের যে এ বিষয়ে খুব উৎসাহ আছে, এটা যেন এস. ডি. ও. সাহেব বেশ বুঝতে পারেন।—বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

গাঙুলী মশায়, রাধানাথ ও অন্যান্য সকলে দারোগাবাবুকে নমস্কার

করিয়া বিদায় লইলেন। আমিও গাঙুলী মশায়ের সঙ্গে যাইবার উপক্রম করিতেই দারোগাবাবু কহিলেন, বসুন না একটু, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

গাঙুলী মশায় কহিলেন, ব'স ভায়া তুমি, আমরা চলি। রাধানাথ প্যাচার মত মুখ করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইল।

দারোগাবাবু বসিয়া কহিলেন, বসুন, কি কাজ এখন আছে? একটু গল্প-সল্প করা যাক। আমি, মনুদা, আজিজ সাহেব ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি যে কয়জন ছিলাম, বসিলাম। দারোগাবাবু আমার দিকে তাকাইয়া আজিজ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্রকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, ওঁকে চেনেন?

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, না।

দারোগাবাবু কহিলেন, উনি আজিজ সাহেবের ভাইপো, নাম—আবদুল সত্তর, এখানে থাকেন না। আসানসোলে ওঁর মামার মস্ত বড় চামড়ার কারবার। উনিই তার একমাত্র উত্তরাধিকারী। তাই সব দেখা-শোনা করবার জন্যে ওখানেই থাকেন। মৃদু হাস্য সহকারে কহিলেন, একটা বিশেষ কাজের জন্যে এখানে এসেছেন।—বলিয়া সত্তর সাহেবের দিকে তাকাইলেন। তারপর আমাকে উদ্দেশ করিয়া সত্তর সাহেবকে কহিলেন, ইনি এ গাঁয়ের স্কুলের হেডমাস্টার।—বলিয়া আমার নাম, পদবী ও বিশ্ববিদ্যালয়-প্রদত্ত ডিগ্রীর উল্লেখ করিলেন।

আমি মুখে সৌজন্যসূচক হাসি ফুটাইয়া সত্তরকে নমস্কার করিলাম, কিন্তু সে গম্ভীরমুখে গ্যাঁট হইয়া বসিয়া রহিল।

দারোগাবাবু কহিলেন, আপনাদের ইউনিয়নে এত ভাল ভাল লোক থাকতে আপনারা যে কেন গাঙুলী মশায়ের মত একটা লোককে স্কুলের সেক্রেটারি করছেন, তা বুঝতে পারি না। না জানে লেখাপড়া, না দেয় একটা পয়সা। আজিজ সাহেব রয়েছেন, সত্তর সাহেব রয়েছেন, এঁদের করলেই তো পারেন।

কহিলাম, আজিজ সাহেব তো স্কুল-কমিটিতে রয়েছেন, চেষ্টা করুন না।

মণীন্দ্র ধমকের সুরে কহিল, শুধু 'চেষ্টা করুন না' বললে হবে না,

তোমাকেও চেষ্টা করতে হবে। এদিকে মুখে ভালমানুষি দেখিয়ে ভেতরে ভেতরে যে ওদের দলে থাকবে, তা হবে না। তোমাকে তো চিনি।

দারোগাবাবু হাসিয়া কহিলেন, মণীন্দ্রবাবুর স্পষ্টাস্পষ্টি কথা, মুখে-পেটে আলাদা কিছু নেই।

মনে মনে মণীন্দ্রের মুণ্ডপাত করিয়া কহিলাম, আমার আর দলাদলি কি? মাস্টার মানুষ, সব দলেই আছি। যিনিই সাহায্য চাইবেন, সাধ্যমত সাহায্য করব।

আজিজ সাহেব কহিলেন, ইউনিয়ন বোর্ড দখল না করলে কিছু হবে না। এস. ডি. ও. সাহেব তো আশা দিয়েছেন, দেখা যাক আসছে বারে।

সত্তর সাহেব চুপ করিয়া থাকিয়া শিস দিবার ভঙ্গিতে অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া রহিল।

সত্তর সাহেবের বয়স প্রায় পঁচিশ, গায়ের রং তামাটে; পরিধানে লংক্লথের পায়জামা, গায়ে আদ্দির চুড়িদার পাঞ্জাবি ও তাহার নীচে রঙিন গেঞ্জি; পায়ে পেটেন্ট-লেদারের পাম্পশু; দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করিয়া কামানো, গাল বসা, চোখ ছোট ও চোখের কোলে সুস্পষ্ট কালো দাগ; নাকটা আগার দিকে খানিকটা চ্যাপ্টা, ঠোঁটের কোণ দুইটা ডাক্তারি ছুরির অগ্রভাগের মত নীচের দিকে বাঁকানো। মোট কথা, ইহার মুখ ও চোখ দেখিলেই মনে হয়, ইহার বুদ্ধি নাই, বিচার নাই, দয়া-মায়া নাই, বিনয়ের লেশমাত্র নাই এবং নারীদেহের উপরও ইহার লালসার অন্ত নাই।

কর্কশকণ্ঠে সত্তর কহিল, দখল করতে চাইলে ঠেকায় কে, টাকা ঢাললে সব বেটাই ভোট দেবে। আমাকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, কি মাস্টারবাবু, দেবে না?

আমি জবাব দিলাম না। দারোগাবাবু কহিলেন, সে কথা এখন থাক। এখনও দেরি আছে। তবে চেষ্টা করতে হবে এখন থেকে। আর মাস্টার মশায় হাতে থাকলে চেষ্টা সফল হবে ব'লেই মনে হয়।

সত্তর সাহেব কহিল, মাস্টারকে হাত করবার আমি ব্যবস্থা ক'রে

দোব। তার জন্যে ভাবনা নেই। হাসিয়া কহিল, মাস্টারই হোক, আর যেই হোক, পয়সা পেলে—

আজিজ সাহেব বাধা দিয়া কহিলেন, ওসব কথা বাদ দাও। আমরা তা হ'লে চলি. দারোগাবাবু, অনেকটা রাস্তা যেতে হবে, রাস্তাও ভাল নয়।—বলিয়া উঠিয়া পড়িল।

উহারা চলিয়া যাইবার পর, দারোগাবাবু কহিলেন, অশিক্ষিত কিনা, কথার কোন মাত্রা নেই। মাস্টার মশায়, কিছু মনে করবেন না। খোঁচা খাইয়াও জবাব দিই নাই, পিঠে হাত বুলাইবার চেষ্টাতেও জবাব দিলাম না।

মণীন্দ্র হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, চল হে মাস্টার, যাবে তো, অনেক কাজ বাড়িতে। নমস্কার দারোগাবাবু।—বলিয়া আমার অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল। আমিও দারোগাবাবুকে নমস্কার করিয়া মন্থদার সঙ্গ লইবার জন্য ছুটিলাম।

নাগাল পাইতেই হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিলাম, রেস দিচ্ছ নাকি? কি অত কাজ শুনি? মণীন্দ্র ঝাঁজের সহিত কহিল, যাও যাও। হাকিম মানুষ তোমরা। আমাদের মত লোকের সঙ্গে কেন? বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, কি হ'ল? ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মণীন্দ্র কহিল, কি হ'ল? আমরা বসলাম বেঞ্চিতে, আর তুমি গিয়ে বসলে কিনা দারোগাবাবুর পাশে চেয়ারে? একটু সমীহ হ'ল না?

কহিলাম, কি করব? দারোগাবাবু বসতে বললেন যে। মুখ ভেংচাইয়া মণীন্দ্র কহিল, বসতে বললেন যে! লাটসাহেব কিনা! ওর জন্যে চেয়ার রিজার্ভ ক'রে রেখেছিলেন! আর এতবড় একটা এস্টেটের ম্যানেজার বসল বেঞ্চিতে! মুরোদ বুঝে কাজ ক'রো মাস্টার, না হ'লে অপমান হবে ব'লে দিচ্ছি। কড়া গলায় কহিলাম, দিনের বেলাতেই আজ টেনেছ নাকি? না, টাকা পয়সা নেড়ে মাথা ঘুরে গেছে, মণীন্দ্র কিছু দমিয়া গিয়া কহিল, মানে?

মানে আর কি? ভাবছ, সবাই তোমার প্রজা আর খাতক। ভদ্রতার বালাই তোমার কোন দিন ছিল না, এখন আবার পুরোদস্তুর জানোয়ার হয়ে গেছ, তোমার সঙ্গে ভদ্রলোকের আর কথাই বলা

চলে না।—বলিয়া গটগট করিয়া আগাইয়া চলিলাম। মণীন্দ্র পিছন হইতে পিঠে হাত দিয়া কহিল, ভায়া যে একেবারে রেগে টং হয়ে গেলে! অভদ্র, জানোয়ার, গেঁজেল—এক নিশ্বেসে কত কি ব'লে দিলে! লেখাপড়া শিখলে মুখখ্যু দাদাগুলোর খাতির বুঝি আর করতে নেই? রাগত স্বরে কহিলাম, দাদা মুখখ্যুই হোক, আর পণ্ডিতই হোক, দাদার মত ব্যবহার না করলে খাতির পাবে কি ক'রে?

জোর করিয়া আমাকে থামাইয়া মণীন্দ্র কহিল, দাদার মত ব্যবহার করি না আমি? তোমার যে কত জায়গায় কত সুখ্যাতি করি, তার ঠিক-ঠিকানা আছে? বলি, আমার এক ভাই—এম. এ পাস, মস্তবড় বিদ্বান, এ তল্লাটে এমন ইংরিজী কেউ জানে না।

প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ির কাছে উপস্থিত হইলাম। বাড়ির পিছনের জমিটা পরিষ্কার করিয়া তিনকড়ি টর্চলাইট সমিতির জন্য ব্যায়াম-সমিতি স্থাপন করিয়াছে। কাছে আসিতেই দেখিতে পাইলাম, জন দুই প্যারালেল বারের উপর দুলিতেছে, জন চার ডন ফেলিতেছে, তিনকড়ি ও আর একজন মুগুর ভাঁজিতেছে, এবং বাকি কয়েকজন খালি ওঠা-বসা করিতেছে। আমাকে দেখিয়া তিনকড়ি মুগুর-হস্তেই কাছে আসিয়া কহিল, কিসের মীটিং ছিল আজ?

মণীন্দ্র ভারিক্কী স্বরে কহিল, সে গোপন ব্যাপার। তোমরা ছেলে-মানুষ, ওসব জানবার দরকার নেই।—বলিয়া পাশ কাটাইয়া বাড়িতে ঢুকিবার চেষ্টা করিতেই বাকি ছেলেগুলা আসিয়া আমাদের দুইজনকে ঘিরিয়া ফেলিল। মণীন্দ্র হাঁকিয়া কহিল, ভারী সাহস তো তোদের দেখছি! যার শিল, যার নোড়া, তারই ভাঙি দাঁতের গোড়া! আমিই আখড়া খুলে দিলাম, আর আমারই ওপর শক্তির পরীক্ষা!

তিনু দৃঢ়কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, আমরা শুনলাম, যুদ্ধের চাঁদা আদায় করবার জন্যে নাকি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এখানে সভা করবেন? কহিলাম, কে বললে তোমাদের?

শুনেছি আমরা।

বেশ তো! তাতে তোমাদের আপত্তি কি?

তিনু কহিল, আমাদের আপত্তি এই—যুদ্ধে চাঁদা দিতে মহাত্মা

গান্ধী নিষেধ করেছেন। তাঁর আদেশ কারও অমান্য করা উচিত নয়।

কহিলাম, মহাত্মা গান্ধী নিজের বিশ্বাসমতে যা বলবার বলেছেন। তাতে দেশের অনেক বড় লোক সায় দেন নি, এমন কি কংগ্রেসের অনেক নেতাও তাঁকে সমর্থন করেন নি। তা ছাড়া মহাত্মা গান্ধীর আদেশ সরকার-বাহাদুর মানতে বাধ্য নন। যুদ্ধের চাঁদা আদায় করবার তাঁদের ন্যায্য অধিকার আছে।

পাঁচু এতক্ষণ ডন করিতেছিল, কাজেই বুক চিতাইয়া ঘুষি বাগাইয়া, আগাইয়া আসিয়া কহিল, কিসের অধিকার?

কহিলাম, রাজার অধিকার। তোমরা তাঁদের প্রজা, তাঁদের আদেশ মানতে তোমরা আইনত ও ধর্মত বাধ্য।

সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, আমরা মানব না।

মণীন্দ্র হাঁকিয়া কহিল, মাস্টার! তর্ক থামাও দেখি। আমি বলছি। ছোকরাদের উদ্দেশ করিয়া কহিল, তা তোমরা কি করতে চাও বল দেখি, অ্যাঁ?

তিনু দুই হাতে মুগুর দুইটা খাড়া করিয়া ধরিয়া নাচাইতে নাচাইতে সবিক্রমে কহিল, আমরা বাধা দোব, আমাদের দেহের শেষ বিন্দু রক্ত পর্য্যন্ত ঢেলে দিয়ে আমরা বাধা দোব।

ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিলাম, মারামারি করবে নাকি?

না, আমরা বক্তৃতা করব, আপনাদের সভার পাশেই আমরা সভা ক'রে লোককে চাঁদা দিতে নিষেধ করব।

আশ্বস্ত হইলাম। বাঙালী তথা ভারতবাসী স্বদেশী যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত এত বক্তৃতা দিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকটির যদি তিলমাত্র শক্তি থাকিত, তাহা হইলে বক্তৃতাপুঞ্জের পুঞ্জিত শক্তির আঘাতে ভারতে ইংরেজ-শাসনদণ্ড এতদিন গুঁড়া হইয়া যাইত।

মণীন্দ্র রুখিয়া উঠিয়া কহিল, রাস্তা ছেড়ে দাও বলছি, বিরক্ত ক'রো না।

ছেলেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, না।

আগে প্রতিজ্ঞা করুন, চাঁদা দোব না।

মণীন্দ্র চীৎকার করিয়া কহিল, দেখ তিনু, এই সব বেয়াড়া ছেলেদের সঙ্গ যদি না ছাড় তো ভাল হবে না বলছি।

কে বলিয়া উঠিল, ওরে বাবা! ধমকায় যে! কি করবে শুনি?

মণীন্দ্র আন্দাজে বক্তার অবস্থান নির্ণয় করিয়া সেই দিকে চোখ ফিরাইয়া মিনিট পাঁচেক অনল বর্ষণ করিয়া কহিল, কি করব? ফুন্টির বিয়ে দোব না ওর সঙ্গে।

কে একজন বলিল, তবে তো ব'য়ে গেল! মেয়ের দুর্ভিক্ষ পড়েছে নাকি?

গোলমাল শুনিয়া বাড়ির দরজায় মন্থর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা আসিয়া ভিড় করিল। তাহাদের দেখিয়া মণীন্দ্রের বীরত্ব চাগিয়া উঠিল; সে আস্ফালন করিয়া কহিল, দুর্ভিক্ষ পড়েছে কি না দেখাব একবার। তারপর ডান হাত অর্দ্ধ-প্রসারিত করিয়া ও তর্জ্জনী তিনুর ঠিক নাকের সামনে তুলিয়া নাড়িতে নাড়িতে প্রশ্ন করিল, তিনু, তোমারও ওই মত তো? ঠিক বল, এর পর কিন্তু—

তিনু বাধা দিয়া কহিল, হ্যাঁ, আমারও তাই মত। ফুন্টিকে বিয়ে ক'রে সংসার করবার আগে দেশের জন্যে জেলে যাওয়াকে আমি আমার কর্ত্তব্য ব'লে মনে করি।

মণীন্দ্র কহিল, ওসব বক্তৃতা আমি বুঝি না, ফুন্টিকে বিয়ে করতে চাও না, এই কথা বলছ তো?

তিনু দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, হ্যাঁ।

মণীন্দ্র ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, শুনছ হে মাস্টার! মুখের কাছে হাত তুলে বলছে খাব না, আর ওদিকে—

ছেলেরা চীৎকার করিয়া উঠিল, বন্দে মাতরম্।

হঠাৎ দ্বারে দণ্ডায়মান ছেলেমেয়েগুলা বাড়ির ভিতরে ছুটিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভিতর হইতে একটা সোরগোল শোনা গেল। মিনিট খানেক পরেই মন্থর বড় ছেলে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, বাবা, দিদি মূর্চ্ছা গেছে।

মণীন্দ্র আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিল, সে কি রে!—বলিয়া সকলকে ঠেলিয়া বাড়ির ভিতরে ছুটিল, তাহার পিছু পিছু ছুটিল তাহার

ছেলে ও তাহার পিছনে ছুটিলাম আমি, এবং আমার সঙ্গে তিনুও তাহার দলবল লইয়া ছুটিল।

ভিতরে ঢুকিয়া দেখিলাম, উঠানে পড়িয়া ফুন্টি হাত পা ছুঁড়িতেছে, এবং তাহাকে ঘিরিয়া মণীন্দ্রের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েগুলা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে। সরোজিনী কাছে-পিঠে কোথাও নেই। মণীন্দ্র ছুটিয়া ফুন্টির পায়ের কাছে উবু হইয়া বসিয়া, তাহার পা দুইটা চাপিয়া ধরিল। আমি সকলকে চুপ করাইবার জন্য ধমক দিলাম। তিনু পাংশু মুখে থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহাকে কহিলাম, দাঁড়িয়ে থেকো না তিনু, হাত দুটো ধর দেখি।

মণীন্দ্রও কহিল, হ্যাঁ বাবা তিনু, দাঁড়িয়ে থেকো না, তোমার কথা শুনেই মরতে চলেছে, ভাল ক'রে চেপে ধরলে হয়তো ফিরতে পারে।

তিনু ফুন্টির মাথার কাছে বসিয়া হাত দুইটা চাপিয়া ধরিল।

মণীন্দ্রের স্ত্রী কান্নার সুরে কহিল, ও মাগো, চোখ মেলে দেখ, কে তোর হাত ধরেছে, দেখ গো।

কিন্তু ফুন্টির বুদ্ধি ও চাতুর্য্যের সম্বন্ধে আমার ধারণা ক্রমে উঁচু পর্দ্দায় উঠিতেছে। মাসখানেক মাত্র বিদ্যা-চর্চ্চা করিয়াই সে প্রেমপত্র-লিখন-প্রণালী রপ্ত করিয়াছে; এবং সরোজিনীর কাছে মাত্র একবার দেখিয়াই সে মূর্চ্ছা ও পতন-প্রক্রিয়াটি বেশ আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। শুধু আয়ত্ত করিয়াছে নয়, প্রয়োগ-কৌশলে সরোজিনীর চেয়ে উন্নতি সাধন করিয়াছে। কারণ সরোজিনী শুধু শান্তভাবেই পড়িয়াছিল, কিন্তু ফুন্টি ঘন ঘন হাত পা ছুঁড়িতেছে এবং কৌতূহলের বিষয় এই যে, পায়ের চেয়ে হাত বেশি ছুঁড়িতেছে।

মণীন্দ্র ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞাসা করিল, তোদের পিসীমা কোথায়?

ছেলেমেয়েগুলা প্যানপেনে গলায় সমস্বরে বলিয়া উঠিল, পিসীমা ওষুধ আনতে গেছে বাবা।

মণীন্দ্রের স্ত্রী ক্রন্দন-জড়িত স্বরে কহিল, ও বাবা তিনু, মুখে আঙুল দিয়ে দেখ দেখি, দাঁতটা ছাড়াতে পার কি না। দাঁতগুলো ভেঙে গেলে ফোকলা হয়ে যাবে যে!

তিনু চট্ করিয়া মুখে আঙুল ঢুকাইয়া দিয়া দাঁত ছাড়াইবার চেষ্টা

করিতে লাগিল, এবং হঠাৎ 'উঃ' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সকলে সমস্বরে প্রশ্ন করিল, কি হ'ল ?

তিনু যন্ত্রণা-কুঞ্চিত মুখে কহিল, আঙুলে কামড়ে দিয়েছে, ছাড়ছে না।—বলিয়া আঙুলটা ছাড়াইবার জন্য টানাটানি করিতে শুরু করিল। মণীন্দ্র তাহাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য কহিল, বেশি হেঁচকা-হেঁচকি ক'রো না বাবা। দাঁতে লাগবে।

সরোজিনী আসিয়া হাজির হইল, হাতে অ্যামোনিয়ার শিশি। কহিলাম, দাও দাও, আমার হাতে। শিশিটা লইয়া প্যানাকে দিয়া কহিলাম, ধর দেখি নাকের কাছে। প্যানা ছিপি খুলিয়া নাকের কাছে ধরিতেই ফুন্টি বার কয়েক নাকের আগাটা কুঁচকাইল, তারপর একবার গভীর নিশ্বাস লইয়াই, আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর চোখ মেলিয়া চাহিয়া, তিনুকে দেখিয়াই উঠিয়া বসিতে গেল।

মণীন্দ্র বলিয়া উঠিল, উঠিস নি। তিনুকে কহিল, চেপে ধর তিনু, উঠতে দিও না।

তিনু তাহার সদ্যমুক্ত আঙুলটিতে ফুঁ দিতেছিল। মণীন্দ্রের আদেশ পাইবামাত্র ফুন্টিকে চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ফুন্টি জোর করিয়া উঠিয়া বসিয়া চোখে আঁচল দিয়া কাঁদিতে শুরু করিল।

সরোজিনী কহিল, কাঁদছিস কেন ? আবার মূর্চ্ছা হবে যে।

ফুন্টি মাথা নাড়িয়া কহিল, হোক, আমি মরব, আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা, আমাকে মরতে দাও।

ফুন্টির মা কহিল, মরবি কিসের দুঃখে, চেয়ে দেখ, তিনু তোর কাছে ব'সে।

ফুন্টি নির্লজ্জার মত কহিল, ও যে জেলে যাবে বলছে বক্তিতে ক'রে ; আমি মরব ; এতে না মরলে কুয়োয় ঝাঁপ দিয়ে মরব।—বলিতে বলিতে আবার নিশ্বাস বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়িবার উপক্রম করিতেই প্যানা অ্যামোনিয়ার শিশি তাহার নাকের কাছে ধরিল। ফুন্টি আবার চাঙ্গা হইয়া উঠিয়া সুর করিয়া কাঁদিতে শুরু করিল।

সরোজিনী তিনুকে সস্নেহে কহিল, বাবা তিনু, তুমি নিজের মুখে বল যে, বক্তৃতা করবে না।

তিনু নতমুখে কহিল, বলছি, বক্তৃতা করব না।

ফুন্টি কহিল, পিসীমার পা ছুঁয়ে বলুক, না হ'লে শুনব না।

কহিলাম, তাই বল হে তিনু।

উঠিয়া আসিয়া সরোজিনীর পাদস্পর্শ করিয়া তিনু বলিতে লাগিল, আমি বক্তৃতা করব না, জেলে যাব না, যত শীঘ্র সম্ভব বিয়ে করব।

ফুন্টি কান্না থামাইয়া, চুপ করিয়া তিনুর কথা শুনিতে লাগিল, এবং তিনু থামিতেই আবার কান্না শুরু করিয়া কহিল, শুধু ও বললে হবে না, ওর সঙ্গীদের সবাইকে বলতে হবে।

সঙ্গীরা একসঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, বাঃ রে ! আমরা কেন পা ছুঁয়ে বলতে যাব ? আমরা তো আর বিয়ে করতে যাচ্ছি না !

ফুন্টির আবার মূর্চ্ছার উপক্রম হইতেই সরোজিনী সকলকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, আমি তোমাদের গুরুজন, আমি তোমাদের অনুরোধ করছি, একটা মেয়ের জীবনের জন্যে, তোমরা, ও যা বলছে, কর ; তাতে তোমাদের কোন লজ্জা নেই, অপমান নেই।

প্যানা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আচ্ছা, বলছি আমরা। তিনুদার ভাবী স্ত্রীর জীবনের জন্যে আমরা যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত, আপনার পায়ে ধ'রে প্রতিজ্ঞা করা তো সামান্য কাজ।—বলিয়া সরোজিনীর সামনে আসিয়া পাদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ করিল, আমি বক্তৃতা করব না, জেলে যাব না, যত শীঘ্র সম্ভববিয়ে—। বলিয়াই জিব কাটিয়া কহিল, না না, তা নয়, যত শীঘ্র সম্ভব তিনুদার বিয়ে দোব। তারপর একে একে সকলেই আসিয়া সরোজিনীর পা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা-বাক্য উচ্চারণ করিল।

ফুন্টিও তারপর মূর্চ্ছা সংবরণ করিয়া কান্না থামাইয়া আঁচলে চোখ মুছিতে মুছিতে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

১৫

রবিবার সকালে সার্কল-অফিসার আসিয়া হাজির হইয়া গাঙুলী মশায়কে জানাইলেন, আজ বিকেলে থানার সামনে সভার আয়োজন করতে হবে ; একজন বক্তা সাহেবের সঙ্গে আসবেন ; তিনি সভাতে

যুদ্ধ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন, গ্রামের সকলেই যেন বক্তৃতা শোনবার জন্যে সভায় হাজির থাকে। গাঙুলী মশায় একজন ডোমকে ডাকিয়া ঢোল পিটাইয়া এই বার্ত্তা সারা গ্রামে প্রচার করিতে আদেশ দিলেন। সভাজনদের বসিবার জন্য স্কুল খালি করিয়া চেয়ার বেঞ্চি থানাতে পাঠানো হইল, এবং সেগুলিকে সাজাইবার জন্য চৌকিদারদের আদেশ দেওয়া হইল।

বেলা চারটার আগেই থানায় গিয়া হাজির হইলাম। থানার সামনে প্রকাণ্ড ময়দানে সামিয়ানা টাঙাইয়া সভার ব্যবস্থা করা হইয়াছে; স্কুলের চেয়ার ও বেঞ্চিগুলি যথাবিধি সাজানো হইয়াছে; গাঙুলী মশায়, দারোগাবাবু ও সরকারী পোশাক-পরা চৌকিদার ও কনস্টেব্‌লরা বিনা কাজেই ব্যস্ত-সমস্তভাবে ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছে; আমাদের হুজুর সাহেব একটা চেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতেছেন; পাশে দাঁড়াইয়া আজিজ সাহেব ও তাহার ভাইপো বিনীতভাবে হুজুরের সহিত আলাপ করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বেঞ্চিগুলি ভরিয়া উঠিল এবং চারিদিকে ভিড় জমিয়া উঠিল। দেখিলাম, অন্ধ, খঞ্জ, রোগী, শিশু ও টর্চলাইট সমিতির সভ্যবৃন্দ ছাড়া গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ সকলেই, এমন কি বাউরী-বাগ্দীদের জনকয়েক প্রৌঢ়া ও বালিকা, সভায় সমুপস্থিত। সামনের বেঞ্চিতে বসিয়া বালকেরা ঠেলাঠেলি মারামারি ও চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাদের পিছনে বসিয়া বয়োজ্যেষ্ঠরা তাহাদিগকে উচ্চকণ্ঠে শাসন করিতে লাগিল; চারিদিকে ভিড় করিয়া দণ্ডায়মান বাউরী, বাগ্দী ও অন্যান্য অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকগুলা কোলাহল-সহকারে আলাপ ও আলোচনা করিতে লাগিল, এবং উচ্চ-নীচনির্ব্বিশেষে সমগ্র জনতার সমবেত ধূমপানের ফলে সমস্ত সভা-মণ্ডপ গাঢ় কুহেলিকা-জালে আবৃত হইয়া উঠিল।

হঠাৎ মোটরের শব্দ শোনা যাইতেই, যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা রাস্তার দিকে ছুটিতে লাগিল, বালকেরা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং বয়োবৃদ্ধেরা উঠি-উঠি করিতে লাগিল। দারোগা নিজে আসিয়া সকলকে শান্তভাবে বসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিলেন এবং কনস্টেব্‌লরা ছুটাছুটি ও

গুঁতাগুঁতি করিয়া ধাবমান জনপ্রবাহকে রোধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

গাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। দারোগাবাবু, সার্কল-অফিসার, পিছু-পিছু গাঙুলী মশায়, ও ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বাররা, ছুটিয়া গাড়ির কাছে গিয়া হাজির হইলেন। এস. ডি. ও. সাহেব প্রথমে গাড়ি হইতে নামিলেন এবং তাহার পরেই নামিলেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, খুব সম্ভব বক্তা। এস. ডি. ও. সাহেবের পরিধানে খাকী জিনের হাফ-প্যাণ্ট, সাদা টুইলের হাফ-হাতা শার্ট, মোজা ও বুট-জুতা। দেখিতে মোটেই সুশ্রী নহেন, কিন্তু তাঁহার মত স্বভাবত ভদ্রলোক হাকিমদের মধ্যে খুব অল্পই দেখা যায়। সকলের সহিত এমন মিষ্ট ব্যবহার করেন যে, উনি যে হাকিম, তাহা কাহারও মনে থাকে না। বক্তা ভদ্রলোকটির দেহ শীর্ণ ও খর্ব্ব, মেটে রঙ; মুখটি লম্বা ধরনের; মাথায় স্বল্প চুলে কাইজারী প্যাটার্নের টেরি; খাড়া নাকের নীচে টাঙ্গির মত গোঁফ ঠোঁটের উপর পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে; দাড়ি পরিষ্কার করিয়া চাঁছা; চুল ও গোঁফ দুইয়েই বেশ পাক ধরিয়াছে; চিবুক সূক্ষ্মাগ্র; কপালে ও সারা মুখে বয়স ও সাচ্ছল্য-হীন জীবনযাত্রার গভীর বিদারণ-রেখা; পরিধানে ধুতি ও গলাবন্ধ কোট, পায়ে অ্যালবার্ট জুতা ও হাতে রূপার পাত দিয়া মাথাটি বাঁধানো একটি মোটা বেতের লাঠি।

এস. ডি. ও. সাহেব হ্যাট হস্তে সকলের সহিত হাস্যমুখে আলাপ করিতে লাগিলেন ও বক্তা মহাশয়কে সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। আমি সকলের পিছনে ছিলাম। আমাকেও ডাকিয়া বক্তার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন এবং দুই এক কথায় স্কুলের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর সকলে সভামণ্ডপে আসিয়া হাজির হইলেন। উপবিষ্ট সভ্যবৃন্দ জায়গা হারাইবার ভয়ে গ্যাঁট হইয়া বসিয়াই রহিল। এস. ডি. ও. সাহেব টেবিলের সম্মুখের চেয়ারটায় বসিয়া বক্তা মহাশয়কে পাশের চেয়ারে বসাইলেন এবং আমাকেও কাছেই একটা চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করিলেন। দেখিতে দেখিতে চেয়ারগুলি সব ভর্ত্তি হইয়া গেল। শুধু রাধানাথ জায়গা না পাইয়া চেয়ারে উপবিষ্ট চাষী-কৈবর্ত্ত জাতীয় একজন ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারকে টানাটানি করিতে

লাগিল। মেম্বার মহোদয় চেয়ার আঁকড়াইয়া বসিয়া রহিল, অগত্যা রাধানাথ বেঞ্চিতেই ঠেলাঠেলি করিয়া বসিবার জায়গা করিয়া লইল। মণীন্দ্র ইতিপূর্ব্বেই আজিজ সাহেবের পাশে একটা চেয়ার দখল করিয়াছিল। দারোগাবাবু না বসিয়া চৌকিদার ও কন্‌স্টেবল-সহযোগে সভায় শান্তিরক্ষা করিতে লাগিলেন।

এস. ডি. ও. সাহেব প্রথমে উঠিয়া স্বল্প কথায় সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বক্তাকে সকলের সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন, এবং বক্তার বক্তৃতা মনোযোগ সহকারে শুনিবার জন্য সকলকে অনুরোধ করিলেন। বক্তা মহাশয় লাঠিটি সাবধানে চেয়ারের গায়ে ঠেসাইয়া রাখিয়া আগাইয়া আসিলেন; ডান হাত দিয়া একবার চুল ও গোঁফ ঠিক করিয়া লইলেন; দুই হাত যুক্ত করিয়া সামনে ঝুলাইলেন এবং তারপর সকলকে সচকিত করিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন, ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ! এই ক্ষীণ ও খর্ব্ব দেহ হইতে যে ওইরূপ গুরুগম্ভীর আওয়াজ বাহির হইবে আশা করি নাই, যেন একখণ্ড নেহাত নিরীহ ফিকা সাদা রঙের মেঘ হইতে সহসা বজ্রধ্বনি হইয়া উঠিল। মহোদয়গণ, যাহাদের অধিকাংশ খালি গায়ে বেঞ্চিতে বা চেয়ারে উবু হইয়া বা চৌকস হইয়া বসিয়া ছিল, মেরুদণ্ড খাড়া করিয়া সজাগ হইয়া উঠিল, এবং মহোদয়াগণ, অর্থাৎ বাউরী ও বাগ্দীদের জনকয়েক প্রৌঢ়া ও বালিকা ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইতে লাগিল।

বক্তা বলিতে লাগিলেন, ইউরোপে আবার যুদ্ধ বেধেছে। দুরাত্মা জার্মানরা, যারা গতবারের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল এবং মহাত্মা ইংরেজদের অনুগ্রহে একেবারে ধরাপৃষ্ঠ হতে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, তারাই আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাদের নেতা বর্ব্বর, পাষণ্ড, হীনমতি হিট্‌লার, সে চায় সমস্ত পৃথিবীকে পদদলিত করতে, ধরণীর যত ধন-সম্পদ নিজেদের করায়ত্ত করতে, মানুষের মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে। সে তাদের জার্মানি থেকে শ্রেষ্ঠ মানবদের নির্ব্বাসিত করেছে, জাতির মানবিকতাকে দাবিয়ে দিয়ে তার দানবিকতাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। সেই উন্মত্ত দানবদের দণ্ডাঘাতে পোলাণ্ড, বেল্‌জিয়াম, হল্যাণ্ড এমন কি ফ্রান্স ভূলুণ্ঠিত হয়েছে; শুধু

মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সেই বীরাগ্রগণ্য ইংরেজজাতি, যাদের মাথা আজ পর্য্যন্ত কেউ নামাতে পারে নি, নামাতে পারবে না। সেই ইংরেজজাতি, পৃথিবীর নির্য্যাতীত নিপীড়িত মানবদের মুক্তির জন্যে একা এই দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। এই যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনাদের কোন ধারণা নেই।

এই সময়ে দোলগোবিন্দ কাসিতে আরম্ভ করিল, সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, থামুন থামুন। কিন্তু দোলগোবিন্দর থামিবার কোন লক্ষণই নাই, চেয়ারের হাতল চাপিয়া ধরিয়া সে কাসিয়াই চলিয়াছে। বক্তা চুপ করিয়া গিয়া ভুরু কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাধানাথ লাফাইয়া আসিয়া দোলগোবিন্দকে বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য টানাটানি করিতে লাগিল; দোলগোবিন্দ অবশেষে সামলাইয়া লইয়া ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে কোথাও যাইবে না, কাসিতে কাসিতে তাহার মৃত্যু হইলেও সে যুদ্ধের বক্তৃতা শুনিবেই। রাধানাথ অগত্যা ফিরিয়া গিয়া বেঞ্চিতে বসিল। আবার বক্তৃতা শুরু হইল, এই যুদ্ধ সম্বন্ধে আপনাদের কোন ধারণা নেই। এ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ নয় যে, বাঁশের কঞ্চি দিয়া ধনু শরকাঠি দিয়ে তীর ও কাঠ দিয়ে গদা তৈরি করলেই যুদ্ধ চলবে; প্রতিদিন বহু কোটি টাকা খরচ। এক কোটি কত জানেন? একশো হাজারে এক লাখ, একশো লাখে এক কোটি, এই রকম বহু কোটি (সকলে চক্ষু বড় করিয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিল) টাকা দিন খরচ। হাজার হাজার লোক দিন প্রাণ দিচ্ছে, হাজার হাজার সংসার থেকে রোজ মর্ম্মভেদী কান্না উঠছে। পুত্রহারা মাতা-পিতা, স্বামীহারা স্ত্রী ও পিতৃহারা সন্তানদের ক্রন্দনধ্বনি সহ্য করতে না পেরে নিষ্ঠুর ভগবানও কান চেপে ধরেছেন।

দম লইয়া কিঞ্চিৎ মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, এখন আমাদের কি করা উচিত? যে ইংরেজ আমাদের পিতার মত পালন করছেন, রক্ষা করছেন, আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ-সাধন করছেন, হাত ধ'রে আমাদের স্বাধীনতার পথে অগ্রসর ক'রে দিচ্ছেন, তাঁদের এই বিপদে আমাদের কি করা উচিত? বলিয়া বিস্ফারিত চক্ষের দৃষ্টি এপাশ হইতে ওপাশ পর্য্যন্ত বুলাইয়া দিলেন। যাহাদের চাঁদা দিবার ক্ষমতা আছে, তাহারা মুখ

নামাইল, যাহাদের নাই, তাহারা বেপরোয়া তাকাইয়া রহিল। বক্তা বলিতে লাগিলেন, কি উচিত বলুন ?

বলিয়া আমাদের পাশের গ্রামের লক্ষ্মণ মণ্ডলের দিকে তাকাইতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া যুক্তহস্তে কহিল, হুজুর, আমরা ছেলেমানুষ, কি বুঝি বলুন, যা উচিত আপনি—

বক্তব্য শেষ না করিতেই তাহার পাশের লোকেরা তাহাকে টানিয়া বসাইয়া দিল। কিন্তু ওদিকে লক্ষ্য না করিয়া বক্তা বলিতে লাগিলেন, আমাদের উচিত জন দিয়ে, জান দিয়ে এ বিপদে মহামান্য সম্রাট বাহাদুরকে সাহায্য করা। (দণ্ডায়মান বাউরী ও বাগ্দী যুবকদের দিকে তাকাইয়া) আপনাদের মধ্যে যাদের স্বাস্থ্য আছে, শক্তি আছে, মনের জোর আছে, আসুন আপনারা, দলে দলে যুদ্ধে যোগ দিন। আসুন, এই মুহূর্ত্তে আসুন, সৈন্যদলে নাম লেখান।

এই সময়ে বাউরী ও বাগ্দীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। মেয়েদের গলা শোনা যাইতে লাগিল, ওরে পালিয়ে আয় রে, পালিয়ে আয়, ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছে।

বক্তা বলিতে লাগিলেন, প্রমাণ করুন যে, ভারতবাসী ভীরু নয়, কাপুরুষ নয়, ক্লীব নয়, স্বাধীন দেশের লোকের মতই তারা মরতে জানে। মিনিট কয়েকের মধ্যে চারিদিকের লোকের ভিড় সূর্য্যালোকের তাড়নায় কুয়াশার মতই কোথায় অন্তর্হিত হইল। বক্তা বলিতে লাগিলেন, অনেকদিন যুদ্ধ না ক'রে আপনাদের দেহে ও মনে জড়তা এসেছে, অস্ত্রে মরচে ধরেছে। সেই জড়তাকে পরিহার করুন, অস্ত্রকে শান দিয়ে আবার শানিত ক'রে তুলুন।

বেঞ্চিতে উপবিষ্ট প্রৌঢ় ও বৃদ্ধরা আপন আপন যুবক পুত্র ও পৌত্রদের সরাইয়া ফেলিতে শুরু করিল।

বক্তা বলিতে লাগিলেন, যারা তা পারবেন না, তাঁরা অর্থ দিয়ে সাহায্য করুন। বিলাসে দিন কাটানো আর চলবে না। মনে করুন, আমাদের রাজ-জাতির নরনারীরা, যাঁদের বিলাস ও বৈভবের অন্ত ছিল না, অর্দ্ধাহারে স্বল্প-পরিচ্ছদে দিন কাটাচ্ছেন, রাত্রির পর রাত্রি মূষিকের মত মাটির নীচে তাঁদের থাকতে হচ্ছে। আমাদেরও ক্লেশ সহ্য করতে

হবে ; অশন-বসনের ব্যয় সংক্ষেপ করতে হবে ; এবং উদ্বৃত্ত অর্থ যুদ্ধের জন্যে দান করতে হবে। তারপর, এই যুদ্ধে যখন ইংরেজজাতি জয়লাভ করবেন, শত্রুকে ধ্বংস ক'রে যখন এক নতুন জগতের সৃষ্টি করবেন, সেই জগতে তাঁরা আমাদের অন্যান্য সুসভ্য জাতিদের সঙ্গে সমান আসনে বসিয়ে দেবেন। বক্তৃতা শেষ করিয়া বক্তা যখন আসন গ্রহণ করিলেন, আমরা জনকয়েক হাততালি দিলাম। কিন্তু পিছনের বেঞ্চির লোকগুলা সুসভ্য জাতিদের সঙ্গে সমান আসনে বসিবার লোভ সংবরণ করিয়া একে একে সরিয়া পড়িতে লাগিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুধু স্কুলের ছেলেগুলি ছাড়া বেঞ্চিতে আর কেহ রহিল না। যাহারা কাছাকাছি চেয়ারে বসিয়া ছিল, তাহারা পলাইল না বটে, কিন্তু তাহাদের মুখে নিদারুণ অস্বস্তি ফুটিয়া উঠিল।

মণীন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইয়া এস. ডি. ও. সাহেবকে নমস্কার করিয়া যুক্তহস্তে কহিল, হুজুর, গ্রামের জমিদার শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর—

পিছন হইতে প্রতিবাদ হইল, কে বললে জমিদার ?

মণীন্দ্র এক মুহূর্ত্তে যুক্তহস্ত মুক্ত করিয়া প্রসারিত বাম হাতের করতলে মুষ্টিবদ্ধ ডান হাত দিয়া কিল মারিয়া কহিল, আলবৎ জমিদার !

দারোগাবাবু কহিলেন, ওসব কথায় কান দেবেন না মণীন্দ্রবাবু, যা বলতে চান বলুন।

মণীন্দ্র একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া কহিল, এই যে বলছি, গ্রামের জমিদার শ্রীমতী সরোজিনীর পক্ষ থেকে যুদ্ধ-ফণ্ডে দুশো টাকা চাঁদা দিচ্ছি।—বলিয়া পুনরায় নমস্কার করিয়া পকেট হইতে দুইখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া এস. ডি. ও. সাহেবের হাতে দিয়া আর একবার নমস্কার করিল। এস. ডি. ও. সাহেব তাহা লইয়া প্রশংসাসূচক হাততালি দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আজিজ সাহেব, দারোগাবাবু এবং মণীন্দ্র নিজে সজোরে হাততালি দিতে লাগিল। গাঙুলী মশায় ও তাঁহার দলের সকলেই নির্ব্বিকার বসিয়া রহিল। তারপর আজিজ সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া পঞ্চাশ টাকা এবং তাহার পরেই সত্তর সাহেব পঞ্চাশ টাকা দিলেন।

তারপর গাঙুলী মশায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া একটি টাকা-ভর্ত্তি ছোট

থলিয়া এস. ডি. ও. সাহেবের হাতে দিয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন, আমি আমাদের ইউনিয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে একশো টাকা দিচ্ছি।' এবার এস. ডি. ও. সাহেবের সঙ্গে গাঙুলী মশায়ের দলের সকলে হাততালি দিল। কিন্তু মণীন্দ্র বেপরোয়া বসিয়া রহিল।

দারোগাবাবু কহিলেন, আপনি নিজে কি দিচ্ছেন?

গাঙুলী মশায় মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিলেন, আমার যা দেবার ঐসঙ্গেই দিয়েছি।

এস. ডি. ও. সাহেব হাসিয়া বলিলেন, তা কি হয়? আপনাদের মত লোকেরা এ কথা বললে চলবে কেন?

গাঙুলী মশায় যুক্তহস্ত হইয়া কহিলেন; হুজুর, আমি যা পারি পরে দোব।

হঠাৎ লছমন সিং চড়া গলায় বলিয়া উঠিল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন রাধানাথবাবু?

ফিরিয়া তাকাইতেই দেখিতে পাওয়া গেল, রাধানাথ দ্রুতপদে দূরে মাঠের মধ্যে একটা পুকুরের দিক লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। লছমন সিং দৌড়িয়া গিয়া রাস্তা আটকাইতেই রাধানাথ একবার পেটে হাত দিয়া কি বলিয়া আবার দ্রুতবেগে ছুটিতে শুরু করিল।

লছমন সিং ফিরিয়া আসিয়া কহিল, পেটের বেমার বলছেন। এস. ডি. ও. সাহেব, বক্তা মহাশয়, আমাদের হুজুর পর্য্যন্ত হাসিয়া উঠিলেন।

এস. ডি. ও. সাহেব প্রশ্ন করিলেন, কে উনি?

গাঙুলী মশায় সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, হুজুর, রাধানাথ গাঙুলী। আমাদের গাঁয়ে বাড়ি। পয়সা আছে বিস্তর, তবে কিনা—(কণ্ঠস্বর মৃদুতর করিয়া) ভারী কৃপণ।

মণীন্দ্র শুনিতে পাইয়া কহিল, ওরও বিস্তর পয়সা হুজুর, ভাল কাজে দিতে হ'লেই মাথা চুলকোয়।

স্কুলের ছেলেগুলা এবং আরও অনেকে হাসিয়া উঠিল। দারোগাবাবু ধমক দিয়া তাহাদের হাসি থামাইলেন। গাঙুলী মশায় মণীন্দ্রর দিকে

একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাইলেন এবং পরক্ষণেই একেবারে নিরস্ত দৃষ্টিতে এস. ডি. ও. সাহেবের দিকে তাকাইয়া বোকার মত হাসিলেন।

সভা ভঙ্গ হইলে এস. ডি. ও. সাহেব আজিজ সাহেবকে কহিলেন, চলুন, সেইটার তদন্ত করা যাকগে।

মণীন্দ্র শুনিবামাত্র কাছে আসিয়া যুক্তহস্তে কহিল, হুজুর, চলুন।

বাড়ি পর্য্যন্ত গাড়ি যাবে?

মণীন্দ্র কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

বেশ, চলুন, তা হ'লে গাড়িতেই যাওয়া যাক।—বলিয়া গাড়ির দিকে চলিলেন। আমরা তাঁহার পিছুপিছু চলিলাম। এস. ডি. ও. সাহেব, আজিজ সাহেব, সত্তর সাহেব ও বক্তা মহাশয়, একে একে গাড়িতে উঠিয়া পিছনের সীটে বসিলেন। আমাদের হুজুর ইউনিয়ন বোর্ডের কাজের অছিলায় যাইতে রাজি হইলেন না।

মণীন্দ্র ড্রাইভারের পাশে বসিয়া আমাকে ডাকিয়া কহিল, তুমিও এস হে মাস্টার, হেঁটে যাবে কেন?

আমার নাম শুনিতেই এস. ডি. ও. সাহেব বলিলেন, মাস্টার মশায় আসুন।—বলিয়া নিজেই দরজা খুলিলেন।

আমি কহিলাম, থাক, ওখানে আপনাদের কষ্ট হবে, আমি এখানে বসছি।—বলিয়া মণীন্দ্রের পাশে বসিলাম।

প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ি পৌঁছিতে পাঁচ মিনিটের পরিবর্ত্তে আধ ঘণ্টা লাগিয়া গেল। কারণ, গাড়ি ছাড়িবামাত্র যাহারা দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা, ইতরভদ্রনির্ব্বিশেষে তেমনই দ্রুতবেগে ফিরিয়া আসিয়া গাড়িটাকে ঘিরিয়া ফেলিল। একে রাস্তা ভাল নয়, তার উপর চারিদিকে এই ভিড়; কাজেই বিবাহের শোভাযাত্রায় বরের গাড়ি যেমন রাস্তার দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান উৎসুক দর্শকদিগকে বর দেখাইতে দেখাইতে মন্দগতিতে চলে, ঠিক তেমনই ভাবে আমাদের গাড়িও চলিতে লাগিল। রাস্তার দুই পাশের বাড়ির দরজায় ছেলেমেয়েরা দাঁড়াইয়া পরিচিত আমাকে ও মণীন্দ্রকে দেখাইয়া আঙুল বাড়াইতে লাগিল, এবং একস্থানে একটি নারীকণ্ঠ তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট স্বরে সকলকে শুনাইয়া কহিল, মন্থ চক্রবর্ত্তীর বোনের বর যাচ্ছে লো, দেখে আয় সব গিয়ে।

গাড়ি আসিয়া প্রবোধ গাঙুলীর বাড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং পানা-ভরা পুষ্করিণীতে যেমন দুই হাতের কসরৎ করিতে করিতে স্নান করিতে হয়, এখানেও তেমনই দুই হাতে ভিড় ঠেলিয়া ঠেলিয়া কোনমতে গেটের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। মনু যুক্তহস্তে এস. ডি. ও. সাহেবকে অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানার মধ্যে লইয়া গেল। বৈঠকখানার মধ্যে ঢুকিয়াই দেখিলাম, সরোজিনী ইহার মধ্যেই সম্মানার্হ অতিথির যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়াছে। বৈঠকখানার দেওয়াল ও মেঝে ঝাড়িয়া-মুছিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। মেঝেতে শতরঞ্জি পাতা হইয়াছে। মাঝখানে একটি বড় টেবিল, বিচিত্র রঙের রেশমী সুতার কাজ করা দামী টেব্রিল-ক্লথ দিয়া ঢাকা। টেবিলটি ঘেরিয়া সাত-আটখানি চেয়ার। তিনু ও তাহার সাঙ্গোপাঙ্গ অতিথিদের আপ্যায়নে নিযুক্ত।

এস. ডি. ও. সাহেব হাসিয়া কহিলেন, মনুবাবু যে ঠিক বরযাত্রীর আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছেন।

মণীন্দ্র বিনয়হাস্য-বিকশিত মুখে কহিল, হুজুর, সে কি কথা! আপনার মত লোকের পায়ের ধুলো কি আমাদের মত লোকের বাড়িতে সহজে পড়ে! কিছুই করতে পারি নি হুজুর, তবে বিয়ে একটা এ বাড়িতে হবে শিগগির, আমার মেয়ের, তখন হুজুরকে পায়ের ধুলো দিতে হবে।

এস. ডি. ও. সাহেব গম্ভীরভাবে চেয়ারে বসিয়া কহিলেন, তা হ'লে কাজ আরম্ভ করা যাক।

ইতিমধ্যে দারোগাবাবু বাই-সাইকেলে চড়িয়া হাজির হইয়াছিলেন। তিনি মণীন্দ্রকে কহিলেন, আপনি বলুন, কি বলবার আছে আপনাদের।

মণীন্দ্র যুক্তহস্তে কহিল, যা বলবার, আমার বোনই বলবে, ডেকে আনছি তাকে।

এস. ডি. ও. সাহেব সোৎসুককণ্ঠে কহিলেন, তিনি এখানে আসবেন?

মণীন্দ্র কহিল, আসবে বইকি হুজুর। আপনি হাকিম, পিতৃতুল্য, আপনার কাছে আসবে না?—বলিয়া মণীন্দ্র চলিয়া গেল। সকলেই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। এস. ডি. ও. সাহেব সকলের অলক্ষ্যে দুই হাত

দিয়া টানিয়া টানিয়া হাফ-প্যান্টের ঝুলটা নীচের দিকে নামাইবার এবং মোজা দুইটা উপর দিকে তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং কিছুই সম্ভব না হওয়ায়, আদুড় হাঁটু দুটাকে টেবিলের নীচে ঢুকাইয়া ফেলিলেন; বক্তা মহাশয় ডান হাত দিয়া চুল ও গোঁফ ঠিক করিয়া লইলেন; সত্তর সাহেব খাড়া হইয়া দুই চক্ষের দৃষ্টি শাণিত ও উদ্যত করিয়া বসিল; আজিজ বারকয়েক দাড়িতে হাত বুলাইল; দারোগাবাবু বাহিরে গিয়া ঘন ঘন পায়চারি করিতে শুরু করিলেন; এবং আমি—আমার যে শোচনীয় সাজ-সজ্জা একদিন সরোজিনী দেখিয়া আসিয়াছে, তাহার পর বর্ত্তমানে কেশ ও বেশের কিঞ্চিৎ পারিপাট্য সাধন করিয়া তাহার মনে নূতন করিয়া কোন সৌন্দর্য্যানুভূতি সৃষ্টি করিতে পারিব না স্মরণ করিয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া রহিলাম।

আসুন আসুন, নমস্কার। কেমন আছেন?—দারোগাবাবুর কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইতেই সকলে দরজার দিকে মুখ ফিরাইলেন, সত্তর সাহেব একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সরোজিনী কক্ষে প্রবেশ করিল। পুরাপুরি বিধবার বেশ, সাদা থান, সাদা ব্লাউজ, মুখখানি স্বামীবিচ্ছেদজনিত শোকে ম্লান ও গম্ভীর, মাথার চুলে প্রসাধনের চিহ্নমাত্র নাই; অর্থাৎ সরোজিনী স্বীয় আবির্ভাবকে হিন্দুবিধবাসুলভ সুপবিত্র ও সুমহান মহিমা দান করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে। সরোজনী যুক্তকর কপালে ঠেকাইয়া এস. ডি. ও. সাহেবকে তথা অন্যান্য সকল অতিথিগণকে নমস্কার করিল। এস. ডি. ও. সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া কহিলেন, আসুন আসুন। বসুন। দারোগাবাবু প্রায় হাতে ধরিয়া সরোজিনীকে এস. ডি. ও. সাহেবের পাশের চেয়ারে বসাইয়া দিল।

উঠানে সমাগত জনতা কোলাহল শুরু করিল। দারোগাবাবু ছুটিয়া গিয়া তিনু ও তাহার দলবলের সাহায্যে তাহাদিগকে সরাইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং অপারক হইয়া কহিলেন, যে এই গেটের ভেতরে পা দেবে, তাকেই বেঁধে নিয়ে গিয়ে জেলে দোব। এক মুহূর্ত্তে সকলে ঠেলাঠেলি করিয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইল। দারোগাবাবু একজন চৌকিদারকে (ইতিমধ্যে ইহারা আসিয়া পৌছিয়াছিল) আদেশ দিলেন,

এখানে দাঁড়িয়ে থাক, কাউকে আসতে দিবি না, কেউ এলে আমার কাছে ধ'রে নিয়ে আসবি।

এস. ডি. ও. সাহেব কহিলেন, সরকার-বাহাদুরের পক্ষ থেকে আপনার দানের জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

সরোজিনী মুখ নামাইয়া কোমল ও মিহিসুরে কহিল, আমাকে লজ্জা দেবেন না, সামান্য কিছু দিয়েছি। এস. ডি. ও. সাহেব কহিলেন, আপনার শাশুড়ীর বেনামী একটা দরখাস্ত হয়েছে, আপনার দরখাস্তও আমরা পেয়েছি। এ সম্বন্ধে আপনার শাশুড়ীর বক্তব্য আমার জানা দরকার।

সরোজিনী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আসুন, আমার সঙ্গে বাড়ির ভেতরে, আপনি নিজে তাঁকে জিজ্ঞাসা করবেন।—বলিয়া আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, দাদা, আপনি ওঁকে নিয়ে আসুন, আমি মাকে খবর দিইগে।—বলিয়া গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল। সত্তর সাহেব আমার দিকে বিস্মিতনয়নে তাকাইয়া কহিল, আপনার বোন? আমি ঘাড় নাড়িয়া 'হাঁ' জানাইয়া এস. ডি. ও. সাহেবকে সঙ্গে লইয়া বাড়ির ভিতরে চলিলাম।

বারান্দায় বাম দিকের ঘরের সামনে পাশাপাশি দুইটি চেয়ার পাতা ছিল। দরজার কাছেই বৃদ্ধা একটা মাদুরে বসিয়া ছিলেন। আমরা চেয়ারে বসিলাম। সরোজিনী ভিতরে গিয়া শাশুড়ীকে ডাকিল, মা! স্নেহসিক্ত কণ্ঠে উত্তর আসিল, কি মা?

এস. ডি. ও. সাহেব এসেছেন আপনার কাছে। টানিয়া টানিয়া বৃদ্ধা কহিলেন, তিনি কে?

সরোজিনী কহিল, আমাদের জেলার হাকিম।

আমার কাছে কেন?

ছোট মামা দরখাস্ত করেছেন কিনা, আমার কাছে আপনার কষ্ট হচ্ছে।

বৃদ্ধা নীরস সুরে কহিলেন, অনুকূল এই কথা লিখেছে? কে বলেছে তাকে? চিরকাল অনুকূলের ওই রকম, পরের মুখে ঝাল খেয়ে নেচে বেড়ায়।

সরোজিনী কহিল, আমার নাকি আচার-আচরণ মন্দ।

বৃদ্ধা রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, যারা এই সব কথা মিথ্যে ক'রে অনুকূলকে বলেছে, আমি বলছি বউমা, তাদের ভাল হবে না। তুমি মনে কিছু দুঃখ ক'রো না মা। সতী সাবিত্রীর অপমান ভগবান সহ্য করেন না।—বলিয়া উত্তেজনায় ঘাড়টি নাড়িতে লাগিলেন।

এস. ডি. ও. সাহেব কহিলেন, আপনি তা হ'লে আপনার বউমাকে ছেড়ে যেতে চান না। বৃদ্ধা কণ্ঠে যতদূর সম্ভব জোর দিয়া কহিলেন, না, কেন যাব? বউমা আমাকে হাতের তেলোয় ক'রে রেখেছে, নিজের মেয়ে এত যত্ন-আত্তি করে না। ওসব মিথ্যে কথা তুমি বিশ্বাস ক'রো না বাবা।

এস. ডি. ও. সাহেব কহিলেন, ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতেও চান না আপনি?

বৃদ্ধা কহিলেন, দেখা? অতি দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিলেন, এ জীবনে আর কি কাউকে চোখে দেখতে পাব বাবা! সে যে আমাকে কানা ক'রে দিয়ে গেছে।—বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তারপর সামলাইয়া লইয়া চোখ মুছিতে মুছিতে অশ্রুজড়িত স্বরে কহিলেন, তবু ভাই তো। দেখতে না পাই, কাছে বসিয়ে গায়ে মাথায় হাত বুলোতে ইচ্ছে করে। ভাই হ'লেও অনেক ছোট, কোলে কাঁকে ক'রে মানুষ করেছি। তারপর অশ্রু-মুক্ত কণ্ঠে কহিলেন, তবে জান কি বাবা, ফহেশ (মহেশের অপভ্রংশ) গাঙুলী কারও বাড়ি ব'য়ে দেখা করতে যেতে পারবে না। পরাণই বল, আর রাধানাথই বল, গাঙুলীদের আগে কারও কিছু ছিল না, আমরাই এ গাঁয়ের জমিদার। তবে উনি অনেক ঘুচিয়ে অল্প বয়সে চ'লে গেলেন, ছেলেও দেশে বাস করলে না, তাই সবাই মিলে হ'রে-হ'য়ে নিয়ে কিছু করছে আজকাল। না হ'লে ফহেশ গাঙুলীর কাছে খত লিখতে হ'ত সবাইকে, এই সেদিনও তো রাধানাথ এক হাজার টাকা ধার করেছে, প্রবোধ বলেছিল আমাকে।

সরোজিনীকে কহিলাম, তাই নাকি?

সরোজিনী স্মিত মুখে কহিল, হ্যাঁ, তাই। গাঙুলী বঠ্ঠাকুরও অনেক কিছু লুকিয়ে খাচ্ছেন। বীরু আচায্যির ঘর-বাড়ি পর্য্যন্ত বাঁধা, আরও কত লোকের কত খত-দলিল আছে। সেগুলো সব হাত করতে

পেলেন না ব'লেই তো এত রাগ। না হ'লে দেখুন না—। বলিয়াই চুপ করিয়া গেল। আমরাও নীরব রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে সরোজিনী কহিল, উনি যখন এমন ক'রে ভাসিয়ে দিয়ে চ'লে গেলেন—সরোজিনীর কণ্ঠস্বর কান্নায় ভাঙিয়া গেল, কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যে সামলাইয়া লইয়া ধরা গলায় কহিতে লাগিল, তখন আর ইচ্ছে হয় নি যে সংসারে থাকি। গুরুদেব বললেন, যে সংসার ভগবান তোমার ভেঙে দিয়েছেন, সেখানে আর থেকো না, আশ্রমে থেকে ভগবানের নাম ক'রে এ জীবনটা কাটিয়ে দাও। আমি বললাম, আমার সে বাঁধন এখনও কাটে নি বাবা। শাশুড়ীকে কোথায় রাখি? গুরুদেব বললেন, ওঁকেও আশ্রমে নিয়ে এস। উনি রাজি হলেন না।

বৃদ্ধা একমনে শুনিতেছিলেন, এই সময় কহিলেন, না মা। যাঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছি, তিনিই আমার মাথায় থাকুন, (দুই হাত জোড় করিয়া মাথায় ঠেকাইলেন) আর এ বয়েসে নতুন ক'রে গুরু করতে পারব না। আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন আমার কাছে থাক, ম'রে গেলে যেখানে ইচ্ছে যেও।

সরোজিনী স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল, তাই ফিরে এলাম। ভাবলাম, যাই হোক, ওঁর নিজের দেশ, এখানে উনি জন্মেছিলেন, কতদিন কাটিয়েছিলেন, এখানে সুখে দুঃখে ওঁর স্মৃতি বুকে নিয়ে জীবনটা কাটিয়ে দোব, কিন্তু পা দিতে না দিতেই কুকুরের মত সব কাড়াকাড়ি করতে চেষ্টা করলে, না পেরে কলহ শুরু করলে। দারোগাবাবু গাঁয়ে না থাকলে বোধ করি এতদিন গাঁ থেকে চ'লে যেতে হ'ত। বড় ভাইয়ের কাজ করেছেন উনি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, রোগে ডাক্তার পাওয়া যায় না, এমনই গাঁ—

এস. ডি. ও. সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, তার মানে?

আমার অসুখ হয়েছিল দিন কয়েক আগে। গাঁয়ের ডাক্তারবাবু একবার বাড়িতে পা পর্য্যন্ত দিলেন না, এমন মন্ত্র কানে ওঁর দিয়েছে ওরা।

এস. ডি. ও. সাহেব রোষ-গম্ভীর মুখে কহিলেন, আচ্ছা, এর ব্যবস্থা আমি করব।

সরোজিনী দুই হাত জোড় করিয়া মিনতির সুরে কহিলেন, আমার কিন্তু একটি নিবেদন আছে।

এস. ডি. ও. সাহেব শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, ও রকম ক'রে ব'লে আমায় লজ্জা দেবেন না। কি করতে হবে বলুন?

সরোজিনী কহিল, আপনাকে দেখে মনে যেন একটা সাহস পাচ্ছি, নিজের দাদাকে দেখলে যেমন হয়, মনে হচ্ছে, গাঁয়ে হয়তো বাস করতে পারব।

এস. ডি. ও. সাহেব দৃঢ়কণ্ঠে কহিলেন, নিশ্চয় পারবেন। আপনার কেউ যাতে কোন ক্ষতি করতে না পারে, তার ব্যবস্থা আমি করব।

সরোজিনী আবদারের সুরে কহিল, আমার আর একটি অনুরোধ।

এস. ডি. ও. সাহেব সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, কি?

ছোট বোনের বাড়িতে কিছু খেয়ে যেতে হবে।

সন্দেহমুক্ত সহজ কণ্ঠে এস. ডি. ও. সাহেব কহিলেন, বেশ, তাতে আর কি! আমরা বসছি বাইরে, আপনি খাবার পাঠিয়ে দেন।—বলিয়া উঠিয়া বৃদ্ধাকে কহিলেন, আপনার কোন চিন্তা নেই। আপনার বউমার কাছেই থাকুন আপনি। গ্রামের লোক আর যাতে বিরক্ত করতে না পারে, তার ব্যবস্থা করব আমি।

ক্রমশ

শ্রীঅমলা দেবী

ভাবী কাল

(জেম্‌স পাওয়েলের 'To the Future' কবিতার অনুবাদ)

কামনার কল্পলোক—অনাগত ওগো ভবিষ্যত !
বল বল, অভ্রভেদী দুরারোহ সে কোন্ পর্ব্বত—
ভাতিবে নয়নে যার তুঙ্গ শৃঙ্গে করি আরোহণ
তোমার বিরামকুঞ্জ পরিশ্রান্ত-চিত্ত-বিমোহন,
স্বর্ণশস্যে ঝলমল ক্ষেত্র তব দিগন্তপ্রসারী,
সুখমগ্ন গৃহগুলি, উচ্চচূড় সৌধস্তম্ভসারি,
সৌরকর-সমুজ্জ্বল—নভচুম্বী শিখরে শিখরে
অস্তাচল বিচ্ছুরিত স্বর্ণচ্ছটা ঠিকরিয়া পড়ে ?
মনে হয়, সেথা হতে স্বর্গলোক নহে যেন দূর,
হয়তো শ্রবণে পশে স্বরগের সঙ্গীতের সুর ?

বর্ত্তমান বারিধির বক্ষ হতে তরঙ্গ উদ্দাম
তব তীর লক্ষ্য করি অন্ধবেগে ধায় অবিরাম
হে ভবিষ্য মহার্ণব ! কিন্তু তব শান্ত তট 'পরে
নিঃশব্দে সৈকত চুমি ঊর্ম্মীদল লুটাইয়া পড়ে।
আন্দোলিত বর্ত্তমান যে ঝটিকা প্রলয়হিন্দোলে
দখিনা বাতাস সম সেই পুন ফুটাইয়া তোলে
তব কুঞ্জে পুষ্পদল। আমাদের উন্মত্ততা যত
তব চিত্তে জাগি রয় নিশীথের দুঃস্বপন মত।
আমাদের কোলাহল, চলমান চরণের ধ্বনি,
বিচিত্র এ কলরব মুখরিয়া মোদের বিপণি,

তিক্ততম অভিশাপ বক্ষে তব নিঃশব্দে লুটায়
স্নেহ-স্নিগ্ধ মাতৃবক্ষে ব্যথাতুর সন্তানের প্রায়।

নিপীড়িতা ধরিত্রীর ক্ষীণকণ্ঠ হৃদয়-বিদার
তোমারেই লক্ষ্য করি আর্ত্তস্বরে মাগে প্রতিকার।
তুমি তারে শান্ত কর স্মিতহাস্যে অভয় আশ্বাসি,
ভগ্ন বুকে জাগে আশা, শীর্ণমুখে ফুটে তার হাসি।
ভয়-ত্রস্ত অত্যাচার কম্পান্বিত তোমা পানে চাহি,
অলঙ্ঘ্য নিয়তি হতে জানি মনে পরিত্রাণ নাহি ;
শঙ্কিত বিষণ্ণ চিত্তে আপনার পরিণাম স্মরি
ফিরে নিজ গৃহপানে রক্তরথ সভয়ে সম্বরি।
নিরখিয়া জগতের দুঃখ দৈন্য দুঃসহ দহন
নিপীড়িত চিত্তে কবি তোমা পানে ফিরায় নয়ন ;
আশার হিল্লোল পুন ভগ্নবুকে লাগে তরঙ্গিতে,
কুণ্ঠিত কবির বীণা বেজে ওঠে আনন্দ-সঙ্গীতে।
তোমার উদার বক্ষে ধনী-দীন ক্ষুদ্র ও মহান
বিস্মরি বিদ্বেষ-ঘৃণা অবিভেদে লভে সবে স্থান।
তোমার আনন্দলোক কামনার চিরশান্তিধাম,
ক্ষান্ত রণ-কোলাহল তব অঙ্কে লভিয়া বিরাম।
প্রেম সেথা নহে পণ্য—অমরার পুণ্য অবদান,
লাভে তার নাহি লিপ্সা, ক্ষোভে তাহা নহে মুহ্যমান।
দেবতার আবির্ভাবে মানবতা হবে মহীয়ান,
দারিদ্র্যের সিংহাসনে মহত্ত্বের মহা অধিষ্ঠান।
ব্রতের বেদিকামূলে যে বীর আপনা দিল বলি,
তোমার বিশাল বক্ষে একদিন উঠিবে উজলি

অলক্ষিত কীর্ত্তি তার আপনার দীপ্ত মহিমায়।
নব যুগ বার্ত্তাবহ দাঁড়াইয়া যুগান্ত-সীমায়
অভিনব বাণী যবে বিশ্বজনে বিঘোষিয়া কহে,
না বুঝিয়া মর্ম্ম তার মানবতা সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে
আগন্তুক-মুখপানে চেয়ে রয় বিহ্বলের মত ;
উদাসীন উপেক্ষায় ঋষি-চিত্ত বেদনা-আহত
চাহিয়া তোমার পানে উন্মুখ আগ্রহে রহে জাগি
সে জীবন-স্বপনের সুমঙ্গল সার্থকতা লাগি।

উদ্ধত শাসনদণ্ড তব করে দুষ্কৃত-দমনে,
পেলব প্রহারে তার পাপী কিন্তু ভাবে মনে মনে
এ তো নহে প্রতিহিংসা—প্রীতিভরা এ যে গো শাসন!
আত্মঘাতী অত্যাচার অনুতাপে ত্যজে শরাসন।
দুর্ব্বলের বক্ষরক্তে কলঙ্কিত আপন কৃপাণ
সমুদ্যত তব করে হেরি জয়ী ভয়ে কম্পমান ;
কণ্ঠের বিজয়মাল্য সর্প হয়ে দংশে বুকে তার,
উদার উত্তরকাল মার্জ্জনার মূর্ত্ত-অবতার।
তোমার নিক্ষিপ্ত শর নহে মাত্র শস্ত্রের প্রহার,
দুষ্কৃতির দুষ্ট ক্ষতে আরোগ্যের অস্ত্র-উপচার।
হে অলীক সুখ-স্বপ্ন! দগ্ধ এই ধরাতল ছাড়ি
কোন্ দূর কল্পলোকে মোরে ল'য়ে দিতে চাও পাড়ি
ইন্দ্রধনু-সপ্তবর্ণে বিচিত্রিত পক্ষ-ভরে তব?
তাপিত অধর-ওষ্ঠে অমরার আনন্দ-আসব
সাদরে তুলিয়া ধরি কেন রূঢ় পরিহাস করা,
স্বপনের স্বর্ণদ্বার বন্ধ কর বন্ধ কর ত্বরা।

চিররাত্রি মেরুদেশে কেন ক্ষণ-অরোরার আলো!
তার চেয়ে অন্তহীন অবিচ্ছিন্ন অন্ধকার ভালো।
বেদনার্ত্ত বর্ত্তমান নিত্য যেথা অশ্রুজলে ভাসে,
মূঢ় সেথা মুগ্ধ হয় অনিশ্চিত ভবিষ্য-আশ্বাসে ;
দুঃখের দুর্য্যোগ-নিশা গাঢ়তর হয়ে আসে যত,
আত্মার অমিত তেজ জ্ব'লে ওঠে জ্যোতিষ্কের মত।
যেথা দুঃখ যেথা দৈন্য, ওরে কবি, সেথা তোর স্থান,
সেথায় বসিয়া তোর বাঁশরীতে গেয়ে চল গান,
ব্যথাতুর বিশ্বজনে বিতরিয়া সান্ত্বনা অভয়,
সত্যের বিজয় ঘোষি, প্রেমে দিয়া জীবন অক্ষয়।

শ্রীজগদানন্দ বাজপেয়ী

মনে রাখা

ভুলে থাকা অতীব সহজ
মনে রাখা সেই তো কঠিন,
ধরণীর রাজপথে বায়ুভরে উড়ে পদরজ,
পাথরের বুকে শুধু মহতের থাকে পদচিন্।

আমরা যে জনতা পথের
আমরা যে অতি সাধারণ,
জঞ্জাল সরায় কাল মুহুর্মুহু এই জগতের,
মিশরের পিরামিড কার লাগি কে করে গঠন!

আমাদের মনে রাখিয়ো না,
আমাদের ভুলে যেন যাও,
তবেই সহজ হবে বৃহতের স্মৃতি-আরাধনা,
তবেই বজায় রবে এ ধরার বাজারের ভাও।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

সেমেলি

আচ্ছা, আমি এখানে কেন? প্রসাধন-টেবিলের সম্মুখে আবক্ষ অনাবৃত নিজের মূর্ত্তির দিকে চেয়ে মেয়েটি আপন মনে বলছে, শ্রোতা তার স্বচ্ছ মুকুরে স্বীয় প্রতিবিম্ব।

মর্ম্মরশুভ্র কোল্ডক্রীম তর্জ্জনীতে তুলে গণ্ডে মার্জ্জনা করতে করতে মেয়েটি ব'লে যাচ্ছে, আচ্ছা, আমি এখানে কেন? কেন আমি এই সাঁওতাল পরগণার অখ্যাত ছোট শহরে? আমার স্কুল প'ড়ে রয়েছে সুদূর কলকাতায়। আমি কেন এই পাড়াগাঁয়ে গভীর রাত্রে ব'সে নীলার ড্রেসিং-টেবিল ব্যবহার করছি?

বাহিরে অন্ধকার সমুদ্রের মত সীমাহীন। ঝড়ের বেগে হাওয়া ঝাউ-গাছকে আঘাত ক'রে যাচ্ছে।

জানি, তুমি পালিয়ে এসেছ। তুমি ব'লে আস নি, তুমি ঠিকানা দিয়ে আস নি।—আয়নায় প্রতিফলিত মূর্ত্তি কম্পিত অধরে বললে।

না, আমি এসেছি স্বাস্থ্য-পরিবর্ত্তনের জন্যে। আমার অসুখ করেছে, আমি অসুস্থ। দিনের আলোতে চেয়ে দেখো আমার দিকে। চোখের দৃষ্টি আমার নিষ্প্রভ, মালিন্য আমার ত্বকে। যৌবন-লালিত্য আমার বাইশ বৎসরের দেহে খুঁজে পাওয়া যায় না। দেখছ না বিশীর্ণ করাঙ্গুলি? আমি অসুস্থ।—শিথিল অঞ্চল তুলে মেয়েটি সতেজে প্রতিবাদ করলে।

কিন্তু অসুখটা করেছে কেন? পালিয়ে থাকবার জন্যে নয়? ডাক্তারের শিশি শিশি ওষুধ গলাধঃকরণ করলে রোগ সারে না।—ছায়া অর্থপূর্ণভাবে হাসল।

অসুখ তো কলকাতা থেকেই, পালানো কথাটার মানে কি?

আয়নার মেয়েটি আবার হাসল, পালানো তো সেখান থেকেই আরম্ভ হয়েছিল।

আমার অসুখ ভাল হচ্ছে না কেন? সত্যিই আমি বড় অসুস্থ। এ হৃদয়ঘটিত দুর্ব্বলতার জন্যে প্রবাস নয়, বাধ্য হয়ে প্রাণের দায়ে। তাই তো অসময়ে স্কুল থেকে দীর্ঘ দিনের ছুটি পেলাম। পড়াতে আর পারতাম না, কবে পারব জানি না।

বয়স্থা কুমারীদের এ রকম শখের অসুখ হয়, না?

শখের অসুখ? আচ্ছা, দেখ।—মেয়েটি দেহ হ'তে অঞ্চল নামিয়ে দিলে। সম্মুখের প্রতিচ্ছবির শুভ্র গাত্রে দেখা গেল অসংখ্য চক্রাকার স্ফীতি, সারা দেহে যেখানে সেখানে। সমস্ত চর্ম্মের উপর রক্তিম আভায় সেগুলি বিষদহনের পীড়া দিচ্ছে।

দেখ, আমার শখের অসুখ! জান না এর যন্ত্রণা? একে বলে 'আর্টিকেরিয়া'। পিত্তচাকার অশ্বস্তি জান? সারা দেহে সেই অসংখ্য, মনে হয়, আগুন জ্ব'লে উঠেছে। সতীরা কি সহমরণের অগ্নিদাহ এর চেয়ে বেশি অনুভব করেছে? ওঃ, কি নিদারুণ যন্ত্রণা! সমস্ত শরীর যেন পুড়ে ছাই হয়ে যায়! অসংলগ্ন, ব্যগ্র করাঙ্গুলিতে মেয়েটি স্ফীতি-গুলিকে সবেগে পীড়ন করতে লাগল পাগলের মত। নখর-লাঞ্ছিত স্থানে ফুটে উঠল রক্তচিহ্ন।

ডাক্তার বলেছে, 'ইন্‌টেস্টাইনাল অ্যালার্জি', তাই এই সব। তাই তো আহারাদির পর অসহ্য ব্যথা ওঠে হৃৎপিণ্ডের নীচে থেকে। সে ব্যথা অবশ ক'রে দেয়। আর সহ্য করতে পারি না, আর সহ্য করতে পারি না।

নীলা কবি, আমি কবি নয়। নিজের অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা কবিতায় ছন্দোবদ্ধ করবার পৈশাচিক বিলাস আমার হ'ত না কবি হ'লেও। স্বামীর চাকুরি-স্থল এই জঙ্গলে প'ড়ে থাকলেও নীলার কবিতার হাত নষ্ট হয়ে যায় নি। তার প্রমাণ শোন—

বেদনার সিন্ধুতলে ডুবে যাই আমি,
প্রতি অঙ্গে জড়িমার মন্দ আন্দোলন,
পদতল আকুঞ্চিত হয় ক্ষণে ক্ষণে,
বেদনায় কেশমূলে বাজে শিহরণ।

অঙ্গুলির বৃন্ত যেন নিষ্ক্রিয়, নিঃসাড়—
অর্দ্ধচন্দ্র নখরেতে অগ্নির প্রদাহ,
অধর বিশুষ্ক আর কম্পিত ব্যথায়,
দূরে গেছে দৈনন্দিন জীবন-উৎসাহ।

বক্ষ জলে অনির্ব্বাণ খাণ্ডব-দাহনে,
অস্ত্র যেন বর্শাবিদ্ধ বেদনার রণে,
কণ্ঠ হয় শ্বাসহীন ; বৃশ্চিকের জ্বালা
শত শত অনুভূত দেহ-কণ্ডুয়নে।

বেদনার সিন্ধুতলে অচেতন আমি—
ভাল কেহ বাস যদি দেখ সিন্ধুজলে,
যে তনুতে অমৃতের পরম প্রকাশ,
বিষের সাগর আজ ওঠে পলে পলে।

আমারই শারীরিক যন্ত্রণার বর্ণনা। আমাকে লক্ষ্য ক'রে দেখে, আমার কাছে শুনে নীলা লিখেছে। কেমন, এখন বিশ্বাস হ'ল আমার রোগের কাহিনী? জানি, কাব্য ক'রে বললে বলবার কথার মূল্য অনেক বেড়ে যায়।

হয়তো ভাল হব না, এই রোগজীর্ণ দেহ টেনে টেনে ক্লান্তির চরম সীমায় অপেক্ষা করতে হবে মৃত্যুর জন্যে। ভাল হব না, সুস্থ শরীর কাকে বলে জানব না। ধ্বংস আমার সমাগত।

না না, ভাল আমি হবই। আমার কিছু হয় নি। সামান্য সাময়িক অসুখ মাত্র। ভাল আমাকে হতেই হবে। আবার ফিরে যাব নগরীর উন্মত্ত জীবনযাত্রায়। প্রমাণ করিয়ে দোব, প্রেম আমাকে ধূলাশায়ী করে নি।

প্রেমের সঙ্গে সম্পর্ক কি? সম্পর্ক নেই। আমি এসেছি আমার মাসতুতো বোনের কাছে শরীর সারাতে। নীলা আমাকে যথেষ্ট যত্ন করছে, জায়গাটি ভাল। তবু ভাল হচ্ছি না।

প্রেম কর, তাই হচ্ছে তোমার বয়সী কুমারীর লিভারের পক্ষে শ্রেষ্ঠ 'টনিক'। ভালবাসা পাও নি বুঝি?

ভালবাসা পাইনি? অত ভালবাসা স্বপ্নেও কেউ কল্পনা করে নি। শিশুকাল থেকে প্রেমের যেসব উপাখ্যান প'ড়ে লুব্ধ হয়েছি, তাদের মলিন ক'রে দিয়ে কি জ্যোতির্ম্ময় আবির্ভাব হয়েছিল! নিঃসঙ্গচিত্তে

দেবরূপ ধারণ ক'রে এসেছিল প্রেম—বাসনাবিহ্বল, কামনাপুলকিত। আজও একাকীশয্যা আমার স্মৃতিমন্দির।

কোথায় ছিলাম আমি? একটা বাড়িতে—চার নম্বর কলুটোলা স্ট্রীট আজ কত দূরে? আমার সেই একা শোবার সেকেলে প্যাটার্নের খাট, মাথার কাছে একটা কাঠের পরী ক্ষোদিত। আমার কালো কাঠের আলমারি, বইগুলি অপেক্ষা ক'রে থাকত কখন আমার অবকাশ হবে। সেসব এক মাসেই স্বপ্নের মত কোথায় মিলিয়ে গেছে। আছে সত্য হয়ে এই পাহাড়ী দেশের রক্তধূলি আর নীলার প্রসাধন-টেবিল।

জুপিটার! জুপিটার! কেন আমার জীবনে তুমি এলে অকস্মাৎ? কেন আমি তোমার নিজমূর্ত্তি দেখতে চাইলাম? সেমেলি, তাই আজ ভস্ম তোমার অবশেষ।

তোমাকে সে প্রথম দিন বলেছিল, পড়ানোর লাইনটা আপনার কেমন লাগে?

তুমি উত্তর দিয়েছিলে, ভাল। নইলে নোব কেন?

তরবারি সহসা কোষমুক্ত হতে দেখেছ? শুভ্র দন্ত—যেন দংশন করবার জন্যে তাদের সৃষ্টি হয়েছে, পরে বহুদিন দেখেছিলে তাদের সক্রিয়তা খাদ্যগ্রহণের সময়ে। তখনই মনে হ'ত, হয়তো কিছু নিষ্ঠুরতা আছে কোথাও অন্তরালে। হেসে উঠেছিল জুপিটার। তারপরে কলমদানি থেকে লাল-নীল পেন্সিলটি নিয়ে লোফালুফি করেছিল সহাস্যে। কি ছেলেমানুষ! প্রৌঢ় পুরুষের অত ছেলেমানুষি!

তোমার অখ্যাত কর্ম্মস্থল নবীন শিক্ষায়তনটির সে ছিল সেক্রেটারি। দেখা করতে গিয়েছিলে তার বাড়িতে মেয়েদের নাটক-অভিনয় সম্পর্কে কথাবার্ত্তার জন্যে। নূতন শিক্ষয়িত্রী তুমি, উৎসাহ ছিল প্রবল।

বসবার ঘরে দেখা হ'ল নির্জ্জন বড় বাড়িতে। সারি সারি পরিচারকদের মধ্যে দিয়ে বাহিত হ'লে লাল কাপড় মোড়া চৌকি যেখানে।—বলিদানের রক্তময় বেদী যেন।

সে দেখা দিলে বিদেশী পোশাকে। রৌদ্রের আলোতে ললাটের পার্শ্বে দুই-একটি রূপার চুল। অধরোষ্ঠ পুরুষের পক্ষে বেশি আরক্ত, নয়নে রাত্রির গভীর তমিস্রা। দীর্ঘ গৌর দেহ, প্রশস্ত স্কন্ধের ওপরে

প্রকাণ্ড মাথা—রাজকীয় মূর্ত্তি। অধরে তার কতশত প্রেমের নিষ্ঠুর পরিতৃপ্তির ছায়া, নয়নে তার জীবনের বেদনার সুর। চিহ্নিত ললাটে অভিজ্ঞতা আর গাম্ভীর্য্য, যৌবনের খর দীপ্তি নেই, আছে তবু উত্তাপ। তোমার জুপিটার, সেমেলি।

যে নাটক তোমরা অভিনয় করতে চেয়েছিলে, সে তা আগে পড়ে নি। আপনি সময় ক'রে প'ড়ে শোনাবেন? নইলে মতামত দোব কেমন ক'রে, করা উচিত কি না? আপনি যখন অভিনয়ের ভার নিয়েছেন, এটা আপনার কর্ত্তব্য। নিজে আমি কখনই প'ড়ে উঠতে পারব না। আসবেন?

সদ্য কলেজ-ফেরত তুমি। বাইশ তোমার বয়স। কোন কিছুই অসঙ্গত লাগে না তোমার। বিপত্নীক পিতা অর্থ পাঠান। কাকার বাড়িতে থেকে চাকরি নিয়েছ সম্প্রতি। সুতরাং তুমি স্বাধীনা।

পরের দিন সকালে এক ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বের হ'লে। স্কুলে যাবার পথে তার প্রাসাদে গিয়ে উঠলে। মনে ঈষৎ গর্ব্বের ভাব ছিল, সেক্রেটারি নিজে ডেকেছেন।

প'ড়ে গেলে তুমি নীচু চৌকিতে ব'সে। মার্বেলের ত্রিপদীতে হাত রেখে এক দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল তোমার মুখের দিকে, তোমার আন্দোলিত অধরের দিকে। ছোট নাটক, তাও পড়া শেষ হ'ল না। পরের দিন সন্ধ্যাতে সে সময় দিলে।

সকালের দিকে আমার 'ডিরেক্টরদের মিটিং', বুঝেছেন? সন্ধ্যায় 'ফ্রী' হব। আবার তাড়াতাড়ি না শুনে নিলে ওদিকে 'প্লে' তৈরি করতেও যে আপনাদের দেরি হয়ে যাবে।

পরের দিন। আধো অন্ধকারে টেবিল-ল্যাম্পের আলো। দীর্ঘ, উজ্জ্বলগৌর দেহ তার ধুতি-পাঞ্জাবি-মণ্ডিত, অর্দ্ধশয়ান। আলস্যের জড়িমাশিথিল দেহ, যেন কত কষ্টে সংযত হয়ে আছে। প্রদীপ্ত দৃষ্টি তোমার অন্তস্তল দেখে যাচ্ছে, তোমার বস্ত্রাবরণ, তোমার রক্তমাংস সব কিছুর পেছনে তার গতি। সহস্র সূর্য্যের উত্তাপ তার দৃষ্টিতে। দেহ তোমার উষ্ণ হয়ে উঠেছিল সন্ধ্যার আবছায়া আলোতে।

কে যেন তোমাকে আলিঙ্গন করেছে! ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ এতই সাংঘাতিক।

মনে ঘোর লেগেছিল। অনেকদিন আশ্চর্য্য লেগেছে তোমার অত তাড়াতাড়ি প্রৌঢ়ের প্রেমে ব্যাকুল হবার জন্যে। সে প্রেম-নিবেদন করবার পূর্ব্বেই তৃতীয় সাক্ষাতে তুমি তাকে ভালবেসেছিলে কেন সহসা? না, আজ তোমার বিস্ময় নেই। কটাক্ষে, ব্যবহারে সে তোমাকে প্রেম জানিয়েছিল, তোমাকে মোহিত করবার প্রচেষ্টা ক'রে চলেছিল একটি কথাও না ব'লে। তুমি সে প্রেম গ্রহণ করেছিলে মাত্র।

গর্ব্ব হয়েছিল মনে, মোহ তাকে বলা চলে? শোন, আজ সত্য কথা স্বীকার কর।—আয়নার ছায়া নীরবে তিরস্কার করলে। নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে অহরহ তুমি চেষ্টা করেছ সারা জীবন ধ'রে। যে চিন্তা মনে অস্বস্তি আনত, সে চিন্তা তুমি একেবারে ত্যাগ করতে, জানি। সত্যের সম্মুখীন হবার সাহস তোমার ছিল না। মুখোমুখি কোন কিছুর প্রকৃত রূপ চোখ মেলে দেখা তোমার প্রকৃতির বিপক্ষে। নানা কথা ব'লে নিজের মনকে শিশুর ঘুমপাড়ানি ছড়ার প্রথায় ভুলিয়ে রাখতে ক্রমাগত। যে সব বিষয়ে পূর্ব্বাহ্ণে চিন্তা আবশ্যক, পরে ভেবে দেখবে ব'লে সে সমস্ত ধারণা এক কোণে ঠেলে দিতে। কর্ম্মভীরু কেরানীর মত কখনই তোমার হিসাবের খাতা মেলাবার অবকাশ হ'ত না কিন্তু। সেদিন নিজেকে ভুলিয়েছিলে ব'লে আজ তোমার এই পরিণতি। আজও আবার নিজেকে ভোলাচ্ছ তোমার অসুখটা শারীরিক ব'লে।

Torentill লেখা, চ্যাপ্টা ছোট শিশি থেকে বাসন্তী বর্ণের একটি বড়ি বের ক'রে মেয়েটি জলের সাহায্যে গলাধঃকরণ করলে। পাশের টেবিলে ঝি হর্লিক্সের পেয়ালা রেখে গেছে।

মুখে পাত্র ধ'রে আয়নার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি আবার বললে, অসুখ নেই আবার? অসহ্য যন্ত্রণা শরীরে, তা তো মিথ্যা নয়।

যন্ত্রণা কেন জান?—ছায়া উত্তর দিলে, অসুখ কেন জান? মন যা চাচ্ছে, জোর ক'রে শরীরকে তার থেকে নিবৃত্ত করবার জন্যে। যাও,

ফিরে যাও সেই কামনা-ব্যাকুল বাহুবন্ধনের মধ্যে, লাগুক তোমার অধরে তার শাণিত অধরোষ্ঠ। পালিয়ে এসেছ, আবার ভান করছ অসুখ সারাতে এসেছ ব'লে। পালিয়ে আসবার প্রয়োজন ছিল না, আকর্ষণকে প্রতিহত করার শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তোমার।

সেই ম্লান বিজলী-আলোতে প্রেমের জন্ম হ'ল তোমার জীবনে, তোমার হৃদয়ে। সমস্ত কথা তোমার ধীরে ধীরে সে জেনে নিলে, তুমি কিছুই জানলে না সেদিন। নির্জ্জন বাড়ি, বয়স্ক পুরুষ—বিবাহিত কি না বারে বারে প্রশ্ন উঠল চিত্তে। বারে বারে সে প্রশ্ন চাপা দিলে অনিশ্চিততার ভীতিতে। থাক আমার সুখস্বর্গ মনে মনে, যতক্ষণ তার পরমায়ু। নির্ম্মম সত্য শুনতে চাই না।

দরিদ্রকন্যা তুমি। বাড়ি, গাড়ি, আসবাব তোমার চোখ ঝলসে দিলে। প্রতাপশালী প্রৌঢ় পুরুষ, তোমার কর্ম্মস্থলের এবং বহুর দণ্ডকর্ত্তা বিধাতা। সে তোমাকে অকপটে পছন্দ করেছে! সে তোমাকে রবিবারে চায়ের নিমন্ত্রণ করলে! তোমাকে—নগণ্য স্কুল-শিক্ষয়িত্রীকে, যৌবন ভিন্ন যার কোন সম্পদ নেই!

মোহ হয়েছিল তার অসামান্যতায়, গর্ব্ব হয়েছিল তোমার কাছে সে সহজপ্রাপ্য ব'লে। ভেবেছিলে, অথবা নিজের মনকে স্তোক দিয়েছিল এই ভাবনা দিয়ে—স্কুলের সেক্রেটারি উনি। ওঁর সুনজরে থাকলে আমার অনেক লাভ হবে। ওঁকে সন্তুষ্ট রাখা আমার অবশ্য-কর্ত্তব্য।

না, আজ স্বীকার কর, প্রৌঢ় পুরুষের আকাঙ্ক্ষা তোমার মনে কৌতূহল জাগিয়েছিল। আগুন নিয়ে খেলা করতে গিয়েছিলে তুমি। এখন সেই আগুনে পুড়ে মর। ওই যে তোমার দেহে অগ্নিদহনের জ্বালাময় অসংখ্য মাংসপিণ্ড, সে জুপিটারের বজ্রাগ্নির চিহ্ন, 'আর্টিকেরিয়া' নয়।

রবিবার সন্ধ্যায় গিয়েছিলে, চায়ের পক্ষে সময়টা বিলম্বিত। সেই রক্তিম সোফা-সেটি, ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে মলিন আলোক। হলদে পাত্রে সোনালী চা, চুলের সুরভি, চুরুটের আগুন, আর নির্নিমেষ দৃষ্টি-সমাহিত জুপিটার!

আমার স্ত্রীর স্বাস্থ্য খারাপ। ছেলেমেয়েকে নিয়ে উনি এখন আছেন কার্শিয়ং।

অবশেষে চরম কথাটা তুমি শুনলে। বিবাহিত। যন্ত্রণায় মনে হ'ল মৃত্যু হয়েছে। নিজের আসন ছেড়ে উঠে এল সে, তোমার আসনের দুই হাতলে ভার রেখে ঝুঁকে পড়ল তোমার সামনে—তাতে কোন্ ক্ষতি হয়েছে আমার স্ত্রী আছে ব'লে?

লাভক্ষতির প্রশ্ন তখন ওঠে না। সে অন্ধ আকর্ষণে তোমাকে যতদূর সে যেতে চায় টেনে নেবেই—রসাতলে পর্য্যন্ত!

প্রথম চুম্বন সেই দিনেই।

যার স্ত্রী আছে, তাকে ভালবাসা কি উচিত? কি হবে এই ভালবাসায়, যার কোন পরিণতি নেই? এসব প্রশ্ন মাঝে মাঝে খোঁচা দিত মনে। কিন্তু তখনই তা চাপা দিতে। যা ভাল লাগে না, কেন ভাবব? যা ভাল লাগছে কেন ক'রে যাব না? ভবিষ্যৎ ভাববার নিদারুণ কষ্ট সহ্য করতে না তুমি, বর্ত্তমানকে উন্মাদের ব্যগ্রতায় ব্যবহার ক'রে যেতে ক্রমাগত। যা হয় হোক, দিন কেটে যাচ্ছে আনন্দে। এ আনন্দ কেন নোব না? যা হয় হবেই। মিথ্যা ভেবে ভেবে আগের চেয়ে কষ্ট পাই কেন?

তার স্ত্রী অসুস্থ অবস্থায় বিদেশে। তাঁর ওপরে কি অবিচার করা হচ্ছে না? ওসব কথা ভাবতে পারতে না, বুকে যেন ব্যথায় মোচড় লাগত। তাই ভাবতে না ইচ্ছে ক'রে। যেন তার স্ত্রী বায়ুর মতন একটা অনুভূতিগ্রাহ্য পদার্থ মাত্র, কোন বস্তুতান্ত্রিক রূপ তাঁর নেই; এই ভাবে চলতে তুমি। তার ছেলেমেয়ে? ছেলে আছে, আশ্চর্য্য! এই প্রেমিকের সন্তান আছে, সে পিতা! বেসুরেতে সব কিছু বেজে উঠত তোমার। তাই ভুলে থাকতে তার প্রবাসী সন্তানদের কথা, সেও ভুলেও তার পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলত না। শবাধারে নিহিত আবৃত শবের মত তোমাদের মধ্যে সে জীবন প্রোথিত থাকত। প্রেতমূর্ত্তি ধ'রে কখনও তোমাকে পীড়ন করে নি। কি প্রথায় প্রেম করতে হয়, জুপিটারেরা তা জানে।

দীর্ঘ মোটরভ্রমণ, নৈশ-আলাপন, চিত্রগৃহে—চায়ের দোকানে একত্র

সমাগম, বসবার ঘরে ক্রমশ-চুম্বন—দিনগুলি নেশায় কেটে যেতে লাগল। অবশেষে একটি বিন্দুতে তোমার সমগ্র জীবন এসে স্পর্শ করল—সে।

মনকে ভোলাতে খেলা করছ তুমি, যখন খুশি তখন এ খেলাঘর ভাঙলে চলবে। কিন্তু খেলা শুধু সহস্রবল্লভ জুপিটার জানে; সেমেলি কখনও খেলা শেখে নি, শুধু শিখেছিল প্রণয়ীকে সর্ব্বতোভাবে পাবার চেষ্টা। তাই গ্রীক পুরাণে সেমেলি ভস্ম হয়েছিল। সেও তোমারই মত দেবশ্রেষ্ঠ জুপিটারকে ভালবেসেছিল। জুপিটার তাকে নিজমূর্ত্তি গোপন ক'রে কোমল মাধুর্য্যে ধরা দিয়েছিলেন। জুপিটার-পত্নী জুনোর ঈর্ষামন্ত্রণায় সেই সেমেলি প্রণয়ীর নিজমূর্ত্তি দেখতে চাইলে। দেবতা এলেন বজ্র-অগ্নি নিয়ে। সেমেলি দগ্ধ হ'ল। এ অখ্যায়িকাতে জুনো অদৃশ্য। কিন্তু সেমেলি, তোমার পরিণতি ওই ভস্ম।

কাকীমা বিরক্ত হতেন, কাকা রাগ করতেন, কিন্তু তোমার অভিভাবকত্বের ভার তাঁদের হাতে ছিল না। যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করলেও এসব কথা কিছু কিছু বোঝা যায়। তোমার আরক্ত কপোল, উজ্জ্বল নয়ন, লোলুপ অধর ধরিয়ে দিত তোমার প্রেমের ইতিহাস। সহকর্ম্মিণীরা বক্র পরিহাস করতেন, কোন কোন বর্ষীয়সী কুমারী ঈর্ষ্যাকুল হতেন। তোমার জগতে কিন্তু আর কিছুই ছিল না—ছিল জুপিটারের মানবাতীত প্রেম। দেহ তোমার হয়ে উঠেছিল বিকচ-কদম্ব, মন অলস। দেহের সামান্যতম অনুভূতি হয়েছিল তীব্র, মানসিক জড়তা কিন্তু চিত্তকে ভাবনার অবকাশ দিত না। চিন্তা না করতে করতে চিন্তার শক্তিও নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল।

সে স্বপ্নজগৎ ভেঙে গেল তোমারই নির্বুদ্ধিতায়, তোমারই মূঢ় কৌতূহলে, সেমেলি তুমি। যে জগৎ স্বপ্ন দিয়ে সৃজন করেছিলে, তার সঙ্গে বাস্তবের বিষম পার্থক্য দেখলে। কাচের বাসনের মত তোমার প্রেম ঝনঝন ক'রে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ল। সহ্য করতে পারলে না, মোহভঙ্গে পলায়ন করলে। আর দেখা করতে না, টেলিফোন ক'রে নানা অজুহাত দেখাতে। নিজের হৃদয় নিয়ে নিঃশব্দে স'রে থাকতে, রোগ হ'লে যা স্বাভাবিক। দীর্ঘ ছুটি নিয়ে

পলায়ন করলে। জুপিটারের মানবাতীত, আশ্চর্য্য প্রেম তোমার সহ্য হ'ল না।

সেই দিনটি! ডায়মণ্ডহারবারের 'পিক্‌নিক' সেরে সন্ধ্যায় তোমরা গিয়েছিলে জুপিটারের গৃহে। মদির প্রেমাবেশের মধ্যে কেন জানি না ব'লে উঠলে, তোমার নিজের শোবার ঘরটা আজ দেখব। কোন দিন দেখি নি।

তার জীবনের কোণগুলি পর্য্যন্ত তোমার আয়ত্তে আনা চাই, না? নিঃসঙ্গ শয্যায় শুয়ে তাকে তুমি কল্পনা করতে চাও আরও অন্তরঙ্গ পরিবেষ্টনীতে, যেখানে সে রাত্রি যাপন করে, যে শয্যায় জাগ্রত জুপিটারেরও নয়নে নিদ্রাবেশ আসে, কি বল?

সে মুখ তুলে তোমার দিকে চেয়ে হাসল। আবার সেই নিষ্ঠুর দন্তশ্রেণী যেন হিংস্র আনন্দে উন্মোচিত দেখলে—শেষবার।

দেখাব। তবে আজ থাক।

যতটুকু সে দিয়েছিল, তাতে কেন সন্তুষ্ট রইলে না? কেন তার স্বকীয়তার চরমসীমা দেখতে চাইলে, নির্ব্বোধ?

তুমি জোর করতে লাগলে আবদার ক'রে, না, আজই। আমি বুঝি তোমার শোবার ঘর দেখব না? এতদিন যে কেন মনে হয় নি!

সে লঘুস্বরে উত্তর দিলে, আগে ঘর তোমার দেখার উপযুক্ত করি, তারপর। চাকরদের হাতে রয়েছি, কোন কিছুই ঠিক সাজানো থাকে না।

তুমি অনুযোগ করলে, আমি বুঝি তোমার পর যে, ঘর সাজিয়ে দেখাতে হবে?

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে জুপিটার সহাস্যে তোমার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তোমার আবদার আর ছেলেমানুষি দেখে যেমন সে চেয়ে থাকে।

দেহ উত্তপ্ত হয়ে উঠল সে দৃষ্টি-সম্মোহনে। আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠলে; আচ্ছা দাঁড়াও, আমি নিজেই যাচ্ছি। ওপরে যে ঘরটায় লাইব্রেরি, তার পাশেরটা তো? চললাম।

হাত নেড়ে তাকে উত্তেজিত ক'রে দ্রুতচরণে, দ্রুতধাবনে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলে। তোমার লীলায়িত গতিভঙ্গির দিকে চেয়ে জুপিটার ভুলে গেল তার মনে যা ছিল। তোমাকে ধরবার জন্যে ব্যগ্রবাহু প্রসারণ ক'রে তোমার পেছনে সেও প্রধাবিত হ'ল। হাস্যকলরোলে সিঁড়ি মুখরিত হয়ে উঠল।

প্রবেশ করলে জুপিটারের নিভৃত-নিকেতনে। শুভ্র শয্যা আস্তৃত, দুজনের মত পালঙ্কে। পাশে ছোট রেলিং-দেওয়া খাট, দুইটি প্রবাসী শিশুর নৈশনিদ্রাস্থল। চকিত চরণ তোমার স্তব্ধ হয়ে গেল। আয়নার পার্শ্বে সুন্দরী তরুণীর আপাদমূর্ত্তি। সযত্নবিন্যস্ত কেশপাশ থেকে পায়ের উচ্চহিলের জুতা পর্য্যন্ত তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির যে পরিচয় তাতে লেখা রয়েছে, সেমেলি, সে তোমার জগতে স্বপ্নেরও অতীত। পরিপূর্ণ নারীমূর্ত্তি, নয়নে সন্ধানী কটাক্ষ, হাসি তার অভিজ্ঞ, বাসনা-জড়িত। এই জুনো, স্বর্গসাম্রাজ্ঞী জুনো, জুপিটারের উপযুক্ত সঙ্গিনী। আর তুমি? তার কাছে তুমি! অন্য পার্শ্বে যুগলমূর্ত্তি—সেই তরুণী আর তোমার জুপিটার, অর্দ্ধ-আলিঙ্গনে উভয়ে প্রেমবিহ্বল। ছোট ত্রিপদীর উপরে দুটি শিশুমূর্ত্তির চিত্র—নিষ্পাপ, কোমল পুষ্পের মত সুকুমার। তাদের স্ট্যাণ্ডে-রাখা ছবির নীচে খোলা অবস্থায় চাপা দেওয়া রয়েছে একখানা চিঠি। সদ্য এসেছে, তাড়াতাড়িতে মালিক পড়া শেষ ক'রে ওই ভাবে রেখে গেছেন। শিশু হস্তের বড় বড় অক্ষরে আঁকাবাঁকা লেখা, পড়তে তোমার কষ্ট হ'ল না, পড়তে তুমি দ্বিধা করলে না। এক নিমেষে তোমার পড়া হয়ে গেল—

বাবামণি,

কেন তুমি এতদিন আসছ না? মায়ের খুব রাগ হয়েছে তোমার ওপরে। এবারে এলে তোমার সঙ্গে মা কথা বলবে না, জান? কবে তুমি আসবে শিগগির লিখো। আমাদের বাগান শেষ হয়ে গেছে, সেবারকার মত তোমায় কিন্তু ঘোড়া হতে হবে। আমরা তোমার পিঠে চড়ব।

তুমি মাকে যেমন একটা ভেল্‌ভেটের থলে দিয়েছিলে, তেমনই দুটো আমাদের জন্যে আনবে। আমরা পাথর কুড়িয়ে রাখব। আমরা ভাল আছি। তুমি চিঠি পেয়েই চ'লে আসবে।

তোমার বাবুল, রুবি

এই জুপিটারের নিজ আবেষ্টন। এই জুপিটারের স্বকীয় মূর্ত্তি। জুপিটারের নিজ মূর্ত্তি দর্শনে সেমেলি ভস্মীভূত হয়ে গেল।

এই তো আমার গল্প, আর নেই। তা হ'লে সমস্ত জান তুমি? প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, শুনলে তো? ছাই হয়ে গেছি। জীবনে জুপিটারকে ভুলতে পারব না।

কিন্তু আমি জানি, তুমি ভুলে যাবে। আমি জানি, যে তোমার জীবন-ইতিহাস লিখছি, সে তুমি একদিন ভুলে যাবে। গ্রীক-পুরাণকার শুধু ভস্মস্তূপ দেখেছিলেন। ভস্ম থেকে জাত 'ফিনিক্স' তাঁদের চোখে পড়ে নি। ভস্মের শেষ ভস্মই নয় সেমেলি। আমি জানি, নূতন প্রেম তোমার দিগন্ত-সীমায় আবার দেখা দেবে। আমি জানি, তুমি ভুলে যাবে।

শ্রীমতী বাণী রায়

সোফী

না জামাল! সরাইওয়ালী বললে, সোফীকে আমি এর চেয়ে সস্তায় দিতে পারব না।

জামাল হোসেন হিসেব করতে লাগল, সোফীটা সিঁটকে। ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকে ওর জন্যে কুড়ি রেয়াল (টাকা) পাব। তা দিয়ে কিনব দুটো উট। আর যদি আদিস আবেবায় বিক্রি করি, এক কুড়ি লাল বিলিতী মদের বোতল পেতে পারি। একটু ভেবে বললে, কিন্তু এই হাবশী মেয়েরা খায় যে বড্ড বেশি! তা হ'লে তো সেই মাগগিই দাঁড়াল।

এ তুমি কি বলছ? দেখ, আমি তোমাকে কফি কত সস্তায় দিয়েছি! সরাইওয়ালী হিসেব দিতে লাগল, চামড়াগুলোও দিয়েছি বালির দরে। আর ছোলাও দিয়েছি খুব সস্তায়। এই মেয়েটার বেলাতেই কি তোমার কাছ থেকে বেশি দাম নোব?

বাধা পেয়ে জামাল হোসেন ক্ষেপে গেল, চেঁচিয়ে ব'লে উঠল, তুই মাগী, ঠক।

সরাইওয়ালীও কম নয়। সে উঠল তেড়ে, তুই তবে ডাকাত।

দুজনে লেগে গেল ধস্তাধস্তি। গোলমালে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উঠে পড়লাম।

সোফী আমার খাটিয়ার কাছে মেঝেতে ব'সে ছিল, ঠিক গয়ার পাথরের মূর্তির মতন। রঙ মিশকালো হ'লেও তার গড়ন ছিল চমৎকার; যে কোনও দেশের সুন্দরী মেয়েদের হিংসে হ'ত ওকে দেখলে। মুখে কথা না বললেও তার সমস্ত শরীর থেকে একটা সজীবতা যেন উছলে উঠছিল। চোখ দুটির মধ্যে ছিল গভীর আকর্ষণ।

আমার মনে হ'ল, এই সৌন্দর্য্য কি শেষে পিশাচের ভোগে লাগবে! জিজ্ঞেস করলাম ওর ইতিহাস। সে জবাব দিলে না, তা ছাড়া জবাব দিলেই বা বুঝবে কে! তার ভাষা ছিল আলাদা।

ছাড়া পেলে কোথায় যাবি? জামালকে দিয়ে প্রশ্ন করালাম ওকে।

আদিস আবেবা।

সেখানে কেন?

মায়ের কাছে যাব।

জামাল হোসেন বললে, আরে, ও আবার কি কথা! যেখানে ইচ্ছে নিয়ে গেলেই হ'ল। মুর্গী-ছাগলকে আবার জিজ্ঞেস করতে হয় নাকি?

তোকে মায়ের কাছে পৌঁছে দোব। সোফীকে কথা দিলাম।

পঁচিশটা টাকা, একটা উট আর বিস্কুটের একটা খালি কৌটো নিয়ে সরাইওয়ালী শেষ পর্য্যন্ত ওকে আমার হাতে দিতে রাজি হ'ল। জামাল নিলে পাঁচ টাকা আর দু বোতল মদ বকশিশ।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম দানাকিলের পথে আদিস আবেবার দিকে।

২

হয়তো খুব রাগের বশে প্রকৃতি সৃষ্টি করেছে এই প্রদেশ। সেই রুক্ষ পাহাড়ের তীক্ষ্ণাগ্র শৃঙ্গগুলো রাক্ষসের দাঁতের মতই হিংস্র আর বিকট। অন্ধকার এমন গাঢ় যে দিনদুপুরে দেখলেও ভয় হয়।

আকাশে একটি পাখিও নেই। সম্ভবত তীক্ষ্ণাগ্র পাহাড়শৃঙ্গে আশ্রয়ের সন্ধান না পেয়ে দূরে উড়ে গেছে। এখানে মানুষের কীর্ত্তির চিহ্ন কোথাও নেই। আমার চোখ বিশ্রাম খুঁজছে।

সোফী ঘামে নেয়ে উঠেছে। বালির কণা ঘামের সঙ্গে মিশে ওর মুখে আটকে গেছে। সূর্য্যকিরণে বালুকণা চকচক করছে। মনে হচ্ছে, যেন কেউ ওকে কনে সাজিয়েছে। ওর মুখের সৌন্দর্য্য হয়ে উঠেছে অদ্ভুত। বেশিক্ষণ দেখা যায় না, চোখ ঠিকরে আসে।

শূন্য মরুতে ওর আবির্ভাব সম্ভব হ'ল কি ক'রে?—আশ্চর্য্য হয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করি। যে শুষ্ক রুক্ষ মরুপ্রদেশের ভেতর দিয়ে আমাদের অভিযান, সেখানে প্রকৃতির এই কমনীয় কীর্ত্তি অসম্ভব ব'লে মনে হয়। কিন্তু সেই কমনীয়তার মধ্যেও এসেছে অস্থিরতা।

স্ফূর্ত্তিতে আছে শুধু আমাদের ক্যারাভান-নেতা জামাল হোসেন। উটের পিঠে দুলতে দুলতে বেশ এগিয়ে চলেছে সে। মাথায় আছে

তার সবুজ রঙের পাগড়ি। দাড়িতে মেখেছে লাল রঙের মেহেদী। থেকে থেকে তুলে নিচ্ছে এক হাতে পোকায় খাওয়া কোরানশরীফ, অন্য হাতে একটা মালা। যেমনই সে পাগড়িটা ঢিলে করে, অমনই মাথার ঘাম ওর পাকা চুল বেয়ে দাড়ির ঘনতার মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়। সে এক অপরূপ দৃশ্য।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও বকুনি তার থামে না। সোফীর ওপর আমার নজর দেখে সে বললে, আরে ছ্যা! ওটা কি দেখবার জিনিস! কি আছে ওতে? মানুষ তো নয়, পাঁকাটি। ছুঁলেই ভেঙে যাবে। সামনের সরাইয়ে আমি তোমাকে বেশ মোটাসোটা দেখে একটা যোগাড় ক'রে দোব। আরে, সেখানকার সরাইওয়ালীই তো রয়েছে, যেন পিপেটি। দাম লাগবে বেশি। সংসারে এমন জিনিসই নেই, যা সেখানে না পাওয়া যায়। উট, নুন, জল, খেজুর, যা চাও। সেখানকার জানোয়ারই বল আর মেয়েমানুষই বল সবাই-ই বেশ হৃষ্টপুষ্ট। আরে, মাংস না থাকলে কি আবার সুন্দর! তা সে মুর্গী, ছাগল, মানুষ, যাই হোক না কেন। বিশেষ ক'রে মেয়েমানুষের গায়ে মাংস না থাকলে কি বিশ্রীই যে দেখায়! আমি সিটকে মাগীদের দু চক্ষে দেখতে পারি না। তোমার এই সোফীর চেয়ে বরং খেজুরগাছও ভাল।

সে প্রমাণ ক'রে দিলে যে, স্থূলত্বই স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য্যের মাপকাঠি। সঙ্গে সঙ্গে তার মাপকাঠিতে অপরূপ সুন্দরীদের সঙ্গে তার যৌবনের প্রণয়কাহিনী শোনাতে লাগল আমাকে।

আমার কাছে থাকত সবচেয়ে সুন্দর উট আর টাট্টু। মেয়েরা দেখবার জন্যে জড় হ'ত। লোহা আর টিনের চকচকে গয়না দিয়ে আমি ওদের বশ করতাম। কেরোসিন তেলের এসেন্স দিতাম ফাউ। আমার সুখ্যাতি ওদের মুখে আর ধরত না। কজন হিংসুটে শুয়োরের তা সহ্য হ'ত না। আমাকে বলত ডাকাত। কিন্তু সে হারামজাদারাও শেষ পর্য্যন্ত আমার সুখ্যাতি না ক'রে থাকতে পারত না। তারা বলত, আরে কোন্ জামাল হোসেন? সেই তো যে নিজের উট এক বোতল মদের সঙ্গে বদলাবদলি করে? কিন্তু পাজিরা আসলে মিথ্যা কথা বলত। বদলাবদলি আমি কখনই করতাম না। লুট করতাম। আঃ!

যৌবনে আমি কি না লুট করেছি আর কি না ভোগ করেছি! উট তো আমি দিনের বেলাতেই যে কোনও লোকের কাছ থেকে কেড়ে নিতাম, আর মেয়ে লুট কম করি নি। তাদের সঙ্গে এক গেলাসেই মদ খেতাম। কিন্তু জান? সে পাজি মাগীরা জলে লঙ্কা গুলে ঘাসের মত রুটি দিয়ে খায়, আর নুনই বা খায় কত! তোবা, তোবা! তাই হারামজাদাদের মুখ সব সময়েই তেতো থাকে। তোবা, তোবা!

সে থু-থু করতে লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর তুমি তো তাদেরই চুরি করতে?

চুপ শয়তান! সে হঠাৎ রেগে উঠে বললে, হাবশী মেয়ে চুরিকে কি চুরি বলে? জামাল হোসেন নিজের মনগড়া দর্শনশাস্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করলে, নিকে, তালাক আর চুরি সে তো আরবী মেয়েদের জন্যে, তাই ব'লে হাবশী মেয়েদের পক্ষেও কি এই কানুন নাকি? হ্যাঁ, মিশরী মেয়েদের কখনও বিরক্ত করিস নি, করলে ওদের গ্রাম থেকে নিরাপদে বেরোতেই পারবি না। সেখানকার রেওয়াজ বড়ই খারাপ। সোফীর মতন তাদের কেনাবেচা করা যায় না।

সোফী নিজের নাম শুনে জানি না কি বুঝলে। তার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল।

৩

আমাদের পায়ের তলায় স্লেট-পাথর। তার ওপরে উট আর টাট্টুর পা করে টলমল। আমরাও টলমল করছি।

রোদে আগুনের চেয়েও বেশি তাপ।

ভয়ানক জলতেষ্টা পেয়েছে। সঙ্গে আর জল নেই। আমাদের দলে সবচেয়ে বেশি শুকিয়েছে সোফীর চেহারা। সে ছটফট করছে, ঠিক বলির জন্যে বাঁধা ছাগলের মত।

ওখানে জল আছে। জামাল হোসেন দূরের একটা ঝোপ দেখিয়ে বললে, কিন্তু ওখানে দানকালীরা থাকে। আমাদের দেখতে পেলেই বর্শায় বিঁধে ফেলবে।

তেষ্টায় মারা যাওয়ার চেয়ে বর্শাবিদ্ধ হয়ে মারা যাওয়াটাই তখন

কাম্য মনে হচ্ছিল। সেই ঝোপের ধারের ঝরনায় গিয়ে আমরা জল খেলাম আর বিশ্রাম করতে লাগলাম। জামাল-পরামর্শ দিলে, আরে, খোদার ওপর বিশ্বাস রাখ আর উটের পায়ে দড়ি দাও বেঁধে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

সোফীর মুখে আবার হাসি দেখা দিল।

৪

চারিদিকে তাকাই। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু ছাই রঙের মাটি। কোথাও এক বুক, কোথাও বা মানুষভোর সব গর্ত্ত। জ্বালামুখী পাহাড়ের পাথরকে এমনই ভাবে খোঁড়া মানুষের কাজ নয়। হয়তো এখানে প্রকৃতির ওপর সৃষ্টি ও প্রলয়ে চলেছিল লড়াই, আর তারই চিহ্নস্বরূপ তৈরি হয়েছে এই গহ্বর। প্রলয়েরই বিজয় হয়েছে নিশ্চয়।

আমরা সকলেই ক্লান্ত। কারও চোখে ঘুম নেই গরমের চোটে আর দানকালীর ভয়ে। সে ভয় যে ভূতের ভয়েরও বাড়া। অন্য দেশের কোন লোককে ওরা ওদের দেশে ঢুকতে দেয় না, আর বিদেশীকে দেখলেই তেড়ে আসে।

মাঝরাত্রে গোলমাল শুরু হ'ল। আমার সঙ্গীরা চেঁচাচ্ছে, 'দানকালীরা আক্রমণ করেছে। ওই খলিফাকে বর্শায় বিঁধে দিলে।' খলিফার চীৎকার শোনা যাচ্ছে। অন্ধকারে কিছুই দেখবার জো নেই। আমি রাইফেল চাইলাম।

সোফী শুনতে পেল। জানি না, সে কি বুঝল। সে দানকালীদের দিকে তাক ক'রে গুলি ছুঁড়ল। দানকালীদেরও চীৎকার শোনা গেল। তারা পালাতে লাগল।

সোফী, জামাল চেঁচিয়ে উঠল, তুই সর্ব্বনাশ করলি! এবারে দানকালীরা আমাদের কাঁচাই চিবিয়ে খাবে।

দানকালীদের সঙ্গে আপস হওয়া দরকার। জামাল ওদের লক্ষ্য ক'রে চেঁচিয়ে বললে, তোমরা আমাদের এখান থেকে চ'লে যেতে দাও। যাবার পথ দেখিয়ে দাও। তোমাদের যে লোক মারা গেছে, তার গুনোগার হিসেবে আমরা দুটো উট আর দু বস্তা ছোলা দোব।

পৃথিবীর এই অঞ্চলে মানুষের প্রাণের চেয়ে উট আর ছোলার দাম অনেক বেশি। দানকালীরা রাজি হ'ল, কিন্তু এ ছাড়া আমাদের রাইফেলও চাইলে তারা। রাজি না হয়ে উপায় ছিল না।

খানিকটা পথ এগিয়ে জামাল আমাদের সতর্ক ক'রে দিলে, সাবধান দানকালীরা শয়তান। ওদের মত নিষ্ঠুর আর হিংস্র মানুষ আর নেই। প্রতিশোধে আমাদের একজনের প্রাণ ওরা নেবেই।

৫

যাত্রার শেষ শিবির। দানকালীরা রাইফেল, উট আর ছোলা নিয়ে ফিরে গেল। অন্য দিকে দূরে ইউক্যালিপ্টাস গাছের ফাঁক দিয়ে সাদা সাদা বাড়ি দেখা গেল। ওদিকে তাকিয়ে সোফী ব'লে উঠল, আদিস।

ওর কণ্ঠস্বরে ছিল সঙ্গীত। হঠাৎ শুনলে বিশ্বাস হয় না। ওর দিকে চাইলাম। ওই তো ভঙ্গুর পাকাটির মত চেহারা! ওর চোখের ওই আকর্ষণীশক্তি কোথা থেকে এল?

তুই কত সুন্দর!—ওকে বললাম।

আমার মনের অবস্থা বুঝতে না পেরে হাসল সোফী।

সেদিন ঘুমোবার আগে সোফীর মূর্ত্তি অনেকক্ষণ আমার চোখের সামনে নৃত্য করতে লাগল।

৬

ঘুম ভাঙল। এই যাত্রায় রোজই উঠে সোফীর মুখ দেখতাম। সে এনে দিত জল, বিস্কুট, আর তারপরে ঘোড়ার লাগাম। আজ কোথায় গেল সে।

পালিয়েছে, জামাল বললে, হাবশী মেয়েরা এমনই ফাঁকি দেয়। আর কারুর সঙ্গে পালিয়েছে।

বিশ্বাস হ'ল না। চাকরদের পাঠালাম তার খোঁজে। তাদের দেরি হচ্ছে দেখে নিজেই বেরোলাম। একটা পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। একলুপ্টসের জঙ্গল থেকে সূর্য্য উঠছে, ঠিক রক্তের রং।

ওখানে কি? এক অশ্বত্থগাছের দিকে চেয়ে জামালকে জিজ্ঞেস করলাম।

ভূতের আস্তানা। দানকালীরা ওখানে পূজো করে।

সেখানে কারা যেন টিন বাজাচ্ছিল। চেঁচামেচিও কম হচ্ছিল না।

এত চেঁচাচ্ছে কেন? জিজ্ঞেস করলাম।

হয়তো বলি চড়াবে।

দেখলাম, সত্যই গাছের তলায় একটি মেয়েকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। ভাল ক'রে তাকে দেখা যাচ্ছিল না।

ধম্‌···আমারই রাইফেলের আওয়াজ।

ধোঁয়া। রক্ত। চীৎকার।

জামাল উদাসভাবে বললে, দানকালীরা প্রতিশোধ নিয়েছে।

৭

ছুটলাম ভূতের আস্তানার দিকে। পৌঁছোবার আগেই দানকালীরা পালিয়ে গেছে। কোন্ দিকে, যদি জানতে পারতাম!

রক্তাক্ত ধুলো মেখে শিবিরে ফিরলাম। আমার গা থেকে ভিজে মাটি আর একলুজ্‌টসের গন্ধ বেরোচ্ছে। সব গুছিয়ে নেবার হুকুম দিলাম।

ঘোড়ায় চেপে সঙ্গীদের বললাম, খোদা হাফিজ!

না না, এ ঠিক হ'ল না। জামাল বললে, কিছু স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাও।

বকশিশ। বকশিশ। অন্যেরাও চেঁচাতে লাগল। আমার মনে হ'ল, ওরা যেন জহ্লাদ। নিজের সমস্ত সম্পত্তি ভাগ ক'রে নিতে বললাম ওদের। তারা লাফিয়ে পড়ল জিনিসগুলোর ওপর। তাদের দিকে আর না তাকিয়েই এগিয়ে গেলাম।

শেষ বারের মত বললাম, খোদা হাফিজ!

কেউ উত্তর দিলে না।

শ্রীসত্যনারায়ণ

ইতিহাস

অনেক অনুসন্ধান করিয়া প্রকৃত ইতিহাস অবগত হইয়াছি। সংক্ষেপে তাহা এই। গল্পাকারে বলিতেছি।

একদা জনৈক সর্ব্বহারা নিষাদ ইতস্তত পরিভ্রমণ করিতে করিতে তমসা-তীরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। এই নিষাদ এখন যদিও সর্ব্বহারা, কিন্তু একদিন তাঁহার সব ছিল। বহু পত্নী, বহু গাভী, বহু বৃষ, বহু মেঢ্র, বহু কুক্কুর, বহু আরণ্য-সম্পত্তি কিছুরই তাঁহার অভাব ছিল না। বস্তুত ইনিই একদা তরক্ষু-রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি সর্ব্বহারা—ধনুর্ব্বাণ ছাড়া আর কিছুই নাই।

সহসা মনে হইতে পারে যে, অত্যাচারী আর্য্যগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়াই বুঝি ইনি দুর্দ্দশা-সাগরে নিপতিত হইয়াছেন। তৎকালে আর্য্যগণ অনার্য্যগণকে লাঞ্ছিত করিয়া হর্ষ-বোধ করিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই নিষাদ ভদ্রলোকের সহিত তাঁহাদের সদ্ভাব ছিল। এমন কি, এইজন্যই অন্যান্য নিষাদগণ তাঁহাকে আর্য্যপদলেহী গৃহশত্রু বলিয়া সন্দেহ করিতেন এবং এইজন্যই সম্ভবত তাঁহার পত্নী গদ্‌গদা শবররাজ কিংকুর প্রতি অনুরাগিণী ছিলেন। গদ্‌গদা এবং কিংকু উভয়েরই স্বজাতিপ্রীতি অসাধারণ ছিল।

প্রকৃত কারণ যাহাই হউক, গদ্‌গদা এবং কিংকুর ষড়যন্ত্রেই তরক্ষুরাজ বিপন্ন হইলেন। শেষে এমন অবস্থা দাঁড়াইল যে, ধনুর্ব্বাণ মাত্র সম্বল করিয়া তাঁহাকে রাজ্যত্যাগ করিতে হইল। চিরাচরিত প্রথানুসারে তরক্ষুরাজ শ্মশানচারী যাদুকর চেম্বার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। চেম্বার অভিমত, বুদ্ধিভ্রংশই তাঁহার অধঃপতনের কারণ। পুনরায় বুদ্ধিমান হইবার উপায়ও চেম্বা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু অভীষ্ট বস্তুটি কিছুতেই মিলিতেছে না। এতদিন কত কান্তারে, কাননে, প্রান্তরে, নদীতটে

তিনি পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কই—হিংসা নিষাদের চক্ষুর্দ্বয় প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল।

ওই তো এক জোড়া কাম-ক্রীড়া-পরায়ণ কোঁচ বক!

তৎক্ষণাৎ নিষাদ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং ধনুতে শর-যোজনা করিয়া কামোন্মত্ত পুংবকের হৃদয়-দেশ বিদীর্ণ করিয়া সোল্লাসে লাফাইয়া উঠিলেন। বকী উড়িয়া গেল।

চেম্বার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হইবার নহে।

রতিক্রীড়াপরায়ণ পুংবকের মাংস ভক্ষণ করিবামাত্র নিষাদের সুপ্ত বুদ্ধি যেন জাগরিত হইয়া উঠিল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া প্রতাপশালী আর্য্যগণের দ্বারস্থ হইলেন। আর্য্যগণ চিরকাল আশ্রিত-বৎসল ও ন্যায়পরায়ণ। সুতরাং তাহারা শবররাজের বিরুদ্ধে ন্যায়-যুদ্ধ ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না।

ভয়াবহ যুদ্ধ হইল। শতযোজন ব্যাপিয়া দিবারাত্রি যুদ্ধ। আকাশে বাতাসে কেবল কাড়া-নাকাড়া-দামামা-ভেরীর শব্দ; চতুর্দ্দিকে ছিন্ন মুণ্ড, কর্ত্তিত হস্ত, বিচ্ছিন্ন পদ, বিদীর্ণ উদর, বিকৃত কবন্ধের স্তূপ; গ্রামে গ্রামে প্রজ্জলিত গৃহ, পথে-বিপথে পলায়নপর নরনারী, ধাবমান সৈন্যসামন্ত, ক্রন্দনে কলরবে দিঙ্‌মণ্ডল পরিপূর্ণ।

তরক্ষুরাজ-কণ্ঠেই বিজয়লক্ষ্মী বরমাল্য দান করিলেন।

রণক্ষেত্রে কিংকুর চক্ষু উৎপাটন ও হৃদয় বিদারণ করিয়া নিষাদের প্রতিহিংসা কথঞ্চিৎ শান্ত হইল। গদ্‌গদার ব্যবস্থা গৃহে হইবে। রথারোহী হইয়া তিনি নিষ্কণ্টক রাজ্যে সদম্ভে পুনঃপ্রবেশ করিলেন—রথের পশ্চাতে গদ্‌গদার চুলের ঝুঁটি বাঁধা। প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তরক্ষুরাজ গদ্‌গদাকে একটি ন্যগ্রোধ বৃক্ষের কাণ্ডে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলেন এবং তৎপরে তাহার অনাবৃত দেহে শঙ্কর-মৎস্যোৎপন্ন কশাদ্বারা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৫

এবারের শারদীয়-সম্ভাষণ

১৩৪৯ সালের মনে কি আছে জানি না, তথাপি কোনরূপে আশ্বিনে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। দেশের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, এবং ক্রমশ যে কঠিনতর অবস্থা আসন্ন হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে গতানুগতিকভাবে কোন কাজই করিতে পারা বা করিতে ইচ্ছা করা—স্বাভাবিক নহে। প্রতিমাসে ইহাই মনে হয়, সাহিত্য-সেবার প্রয়োজন কি এখনও আছে? যদি সে অবকাশ মনে বা প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় কাহারও থাকে, তাহা হইলেও বাহিরে তাহার পরিচয় প্রচার করার কি কোন হেতু আছে? সে কি অপর সকলের উপরে একটা হৃদয়হীন অভদ্র উপদ্রব নয়? দেশে যখন দিন দিন অন্নাভাব ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে, যখন প্রাণের আশঙ্কা পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন সাহিত্যের তত্ত্ব বা তথ্য সম্বন্ধে আগ্রহ করিবে কে? আমি না হয় কোনরকমে সর্ব্বভয় ও সর্ব্বভাবনা হইতে কিছুক্ষণের জন্যও নিজেকে মুক্ত রাখিয়া কিঞ্চিৎ সাহিত্য-চিন্তা করিলাম, কিন্তু যখন তাহা হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াই, তখন নিজেকে—নির্ম্মম না হইলেও—নির্ব্বোধ বলিয়া ধিক্কার দিই। তখন আমাদের এক কবির সেই লাইনগুলি মনে পড়ে—

হাঁকে বৃদ্ধ, 'ডাব, কচি ডাব?'—
পাগল! আজি এ সাঁঝে
সঙ্কীর্ণ গলির মাঝে
উদরে উদরে অন্নাভাব;—
সেইখানে এই শীতে
কি বাতিক প্রশমিতে
কে তোমার খাবে কচি ডাব?

আমার অবশ্য 'কচি ভাব' নয়—[illegible]রিকেও ; কিন্তু অবস্থা আমার প্রায় একই। না, হাসির কথা নয় ; সাহিত্য-চর্চ্চা এক্ষণে লেখক ও পাঠক উভয়ের পক্ষেই বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

তবু একটা কৈফিয়ৎ আছে। নিকট ভবিষ্যৎ যেরূপ অন্ধকার হইয়া উঠিতেছে, দূরতর ভবিষ্যৎও যেরূপ অনিশ্চিত, তাহাতে বর্ত্তমানের যেটুকু সময় হাতের মুঠায় ধরিতে পারা যায়, তাহার শেষ সদ্ব্যবহার করিলে ক্ষতি কি? অনেক কাজ করিবার ছিল, অনেক কথা বলিবার ছিল—হয়তো সহসা তাহার সকল উপায় ছিন্ন হইয়া যাইবে। অতএব ইহারই মধ্যে যতটুকু লিখিয়া রাখা যায়, এই বিষম অবস্থাতেও যেটুকু শান্তির অবসর এখনও অবশিষ্ট আছে, তাহাতেই যতটুকু সম্ভব দুই-একটি কথা শুনাইবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়। তাই কালবৈশাখীর প্রহর-গণনার সময়ে যেমন, আজ এই আশ্বিনে-ঝড়ের প্রতীক্ষা-কালেও তেমনই, কিছু বলিবার উদ্যম করিতেছি।

* * *

কিন্তু কি বলিব? বলিবার অনেক আছে, কিন্তু সময় বড় অল্প ; কোন বড় বিষয়ে কিছু লিখিবার ভরসা পাই না ; প্রতিমাসেই মনে হয়, এই বুঝি পত্রিকার শেষ সংখ্যা—এক সংখ্যায় আরম্ভ করিয়া পরে আর শেষ করিতে পারিব না। বর্ত্তমান সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'র শারদীয়া সংখ্যা। বাংলার যে ঋতু সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর—অতিরিক্ত বর্ষার দেশ বলিয়া আমাদের দেশে শরতের যে অপূর্ব্ব শ্রী বিকশিত হয়—সেই শ্রী ও সৌন্দর্য্যের পূজাই শারদীয়া পূজা—বাঙালী-জাতির জাতীয় উৎসব। অতএব এই সংখ্যায়—এক দিকে বিল্ববৃক্ষমূলে বোধনের যে চণ্ডীপাঠ এবং অপর দিকে পূজামণ্ডপতলে সানাইয়ের যে সুর-মূর্চ্ছনা—তাহারই সূচনা করা উচিত। কিন্তু বাঙালীর সে জীবন আর নাই, বহুদিন

তাহাতে জরা প্রবেশ করিয়াছে। গ্রাম গিয়াছে, নদী মজিয়াছে, দীঘির জল শুকাইয়াছে, খাল-বিল শীর্ণ ও শুষ্কপ্রায়। আমি বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের কথা বলিতেছি, যে বঙ্গের ভাগীরথীকূল বারাণসীসমতুল বলিয়া একদিন সারা হিন্দু-বাংলার তীর্থভূমি ছিল। শুধু তীর্থভূমি নয়,—হিন্দু-বাঙালীর আধুনিক সংস্কৃতি,—অর্থাৎ প্রায় পাঁচ শত বৎসরেরও অধিক কালের ধর্ম্ম, সমাজ, ভাষা ও সাহিত্য, এবং শেষে ইউরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার সারবস্তু—সে সভ্যতার জীবনীয় অংশ—এই ভূমিতেই বাঙালীর মনীষা ও প্রতিভায় কর্ষিত হইয়া সারা বাংলা দেশ ও বাঙালী-জাতিকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস যাহাই হউক—এই কালে তাহার হিন্দু-সংস্কৃতি নানা কারণে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে, সে-সমাজে শক্তি, সাহস, হৃদয়-বল ও মনীষার কখনও অসদ্ভাব না ঘটিলেও, খাঁটি হিন্দু-আচার ও হিন্দু-সংস্কার এবং খাঁটি হিন্দু-মনোভাব রক্ষা করা অনেক কারণে দুরূহ হইয়াছে। যে সকল কারণ একদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা আজ অতিমাত্রায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। আজ এমনও আশঙ্কা হইতেছে যে, হিন্দু-বাঙালীর জাতি-ধর্ম্ম, মান-ইজ্জত বজায় রাখিতে হইলে তাহাকে বাস্তু-বদল করিতে হইবে—কারণ, বাংলা দেশ এক্ষণে স্পষ্টই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া উঠিয়াছে ; এ ভাগ পূর্ব্বেও ছিল—রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক কারণে তাহা প্রকট হইয়া উঠে নাই। আজ তাহাকে আর ঢাকিয়া রাখা যাইতেছে না ; ফলে, হিন্দু-বাঙালীর বড়ই অবস্থাসঙ্কট ঘটিয়াছে। হিন্দুর জমিদারি-স্বত্ব ও মুসলমানের জমি-স্বত্ব এই দুইয়ের বিরোধ যেমন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে—তেমনই, হিন্দুর সামাজিক অবস্থাও অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছে। এ অবস্থায় হিন্দু-বঙ্গ ও মুসলমান-বঙ্গ এই দুই ভাগ রোধ করা যাইতেছে না। এবং সম্প্রতি যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা হইতে

হিন্দুর ভবিষ্যৎচিন্তা নূতন করিয়া করিতে হইবে—গতানুগতিক মনোভাব বা বাস্তু-প্রীতির অতিরিক্ত সেন্টিমেন্ট দমন করিয়া এ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে, এবং সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষার উপায় চিন্তা করিতে হইবে।

বাংলা দেশের হিন্দু-মুসলমান সমস্যা যে ভারতের অন্য দেশের তুলনায় অতিশয় বৃহৎ ও জটিল, তাহা অস্বীকার করিলে—নানা নূতন মতবাদের সাহায্যে ইহাকে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে—কোন পক্ষেরই কল্যাণ হইবে না। বাঙালী মুসলমান যখন হিন্দু-বাঙালীর সঙ্গে ঘর করিবে না স্থির করিয়াছে, এবং পূর্ব্বপ্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে সমুদয় বাঙালীর উপরে আধিপত্য দাবি করিতেছে, তখন বর্ত্তমানে কোনরূপ আপোস মীমাংসাও সম্ভবপর নহে।

এসব কথা খোলাখুলি আলোচনা করিবার সময় আসিয়াছে—যদিও সকল সমস্যাই হয়তো মন্বন্তরের মুখে আপনা-আপনি সমাধান হইয়া যাইবে; কোথাকার জল যে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। তথাপি বর্ত্তমানের রূপ যতদিন না পরিবর্ত্তন হইতেছে, ততদিন এ সমস্যা গুরুতরই বটে। সংস্কার-কৈঙ্কর্য্য সকল বিষয়েই সমান অহিতকর—এক্ষেত্রেও বহুদিনের বংশগত সংস্কারকে সবলে উৎপাটন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দু-বাঙালীকে স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইবার উপায় করিতে হইবে। যে-বিরোধ ভূমিগত, এবং যে-বৈষম্য জন-সংখ্যাজনিত তাহা দূর করিয়া একত্র বসবাস অসম্ভব নয়; কিন্তু কত কালে দেশে সেই শাসন-ব্যবস্থার উদ্ভব হইবে, তাহা এখনও একরূপ অনিশ্চিত বলিলেই হয়।

আমার এ কথায় অনেকে মনে করিবেন, আমি বাংলা দেশে পাকিস্থানের প্রস্তাব করিতেছি; পাকিস্থান কি বস্তু, তাহা কি করিয়া

সম্ভব হইতে পারে, সে বিষয়ে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই; যাহা শুনিতে পাই তাহাতে মনে হয়, উহা আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃগণের এক প্রকার 'সব-পেয়েছির দেশ'। তাঁহাদের সেই স্বপ্ন সফল হউক বা না হউক, আমি বাংলা দেশে সকল 'বাঙালী'র জন্যই এক শাসন-ব্যবস্থা কামনা করি। কেবল, ধর্ম্ম, সমাজ ও বাস্তুঘটিত বিবাদ নিবারণের জন্য—উভয় সম্প্রদায়ের যতদূর সম্ভব পৃথক্-বাস বাঞ্ছনীয় মনে করি; তাহাও এইজন্য যে, পূর্ব্ববঙ্গে এই দুই সমাজের বসতি-বৈষম্য বড় বেশি—এ ভূমি মুখ্যত মুসলমানের বাসভূমি হইয়াই আছে। যদি কোনরূপে এই বসতি-বৈষম্য দূর করিতে পারা যায়, তাহা হইলে, একদিন এক শাসন-ব্যবস্থার ফলে, উভয় সম্প্রদায়ের সর্ব্ববিষয়ে ন্যায্য অধিকার লাভ, এবং তাহা ভোগ করা, দুইই সম্ভব হইতে পারিবে। অন্তত, ধর্ম্ম ও সমাজ লইয়া বিবাদের সম্ভাবনা কমিবে; এবং এখনই শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যবিধান সুসাধ্য হইয়া উঠিবে।

আমি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালী-সমাজের কথা বলিতেছিলাম—এবং তাহারই প্রসঙ্গে, পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর অবস্থা-সঙ্কটের উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গও তো মৃতপ্রায়—ভাগীরথীর দুই কূল বিদেশী বণিকরাজের কল ও কুলীরাজ্যে পরিণত হইয়াছে, ভদ্র বাঙালীর বাস উঠিয়াছে। তাহারও বাহিরে—হিন্দুর সেই পল্লীসমাজ আর জীবিত নাই; গ্রামের পর গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইয়া, ভগ্ন ইমারতের ইষ্টকস্তূপ ও জঙ্গলে আচ্ছন্ন হইয়াছে; মাঝে মাঝে দুই-একটি গ্রাম হয়তো কোন কারণে এখনও বসতিহীন হয় নাই; কিন্তু অধিকাংশই জনহীন, এমন কি কৃষকহীন হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, ধর্ম্মিষ্ঠ ও কর্ম্মিষ্ঠ মানুষ সেখানে আর বাস করে না—সমাজবন্ধন

একেবার ভাঙিয়া গিয়াছে। সমাজের যাহারা ভিত্তিস্বরূপ সেই কৃষি ও শিল্প-জীবী বৈশ্যসমাজ লোপ পাইয়াছে—সমাজ নাই, সমাজপতিও নাই; যাহারা আছে তাহারা সেই পূর্ব্বসমাজের কঙ্কাল মাত্র—নড়িবার শক্তি নাই বলিয়াই পড়িয়া আছে। পশ্চিমবঙ্গের যে স্থানগুলি মুখ্য ছিল, তাঁহাদের অবস্থা এই। অর্থাৎ, হিন্দু-বাঙালীর বাস্তু-সমস্যা এখানেও আর এক রূপে ভয়াবহ। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরাই বা আবশ্যক হইলে, পশ্চিমবঙ্গের কোথায় আশ্রয় লইবে? তথাপি, উপায় মানুষের হাতে, চাই বুদ্ধি ও সাহস, চাই সংঘবদ্ধতা ও ঈর্ষাবর্জ্জন—সমগ্র জাতির শুভানুধ্যান। আজ হিন্দু-বাঙালীর মহাপরীক্ষার দিন উপস্থিত—ফাঁকি দিয়া, উচ্চভাবের ভণ্ডামি করিয়া, পৃথকভাবে আত্মস্বার্থ সাধন, অথবা দল কিংবা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া—জেলাগত কিংবা বিভাগীয় মনোভাব (local patriotism) রক্ষা করিয়া আজ আর বাঙালী বাঁচিতে পারিবে না। এ সত্য সকলেই স্বীকার করিবেন—ইহা আজ আর কাহারও অবিদিত নাই। কিন্তু মনে নয়—প্রাণে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, এবং কেবল মুখে নয়, অন্তরের অন্তরে যদি শুচি হইতে পারি, তবেই আমরা বাঙালী ও হিন্দু হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে পারিব; নতুবা প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে আমরা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইব—যাহারা বাঁচিবার কৌশল জানে, তাহারাই শেষ পর্য্যন্ত টিকিয়া থাকিবে, এবং তাহাদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতিকে গ্রাস করিবে, কেবল উচ্চতর সংস্কৃতির জোরেই কোন জাতি জাতিহিসাবে বাঁচিয়া থাকে না।

* * *

কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, আজ কিছুতেই কোন একটা বিশেষ চিন্তার ধারা ধরিয়া চলিতে পারিতেছি না। সময় অল্প—কথা অনেক; তবু ভাবিতেছিলাম, একটা সাহিত্য-প্রসঙ্গকেই সাময়িক-

রূপে আলোচনার বিষয় করিব। কিন্তু ভিতর হইতে তেমন সাড়া পাইতেছি না। সাময়িক বলিতে বাহিরের যে ব্যাপার বুঝায়, তাহার আলোচনা নিরাপদ নয়, বোধ হয় লাভজনকও নয়। ভিতরের অবস্থা—আসন্ন বিনাশের আশঙ্কা বা মৃত্যুভয়। শাস্ত্রে বলে—মৃত্যু যখন চুলের মুঠি ধরিয়াছে, তখন ধর্ম্ম আচরণ করিবে; অতএব এক্ষণে ধর্ম্মাচরণই সাময়িক। আমরা সাহিত্যজীবী—আমাদের 'আচরণ' প্রায় সবটাই 'চিন্তা'। মৃত্যুভয় নিবারণ হয় যাহাতে, তাহাই চিন্তা করা-আমাদের কর্ত্তব্য। কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুযুৎসু সেনার সম্মুখে ভগবান অর্জ্জুনকে যে ধর্ম্ম-উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা মুখ্যত আত্মজয়ের, অথবা মৃত্যুজয়ের 'উপদেশ' হইলেও, সেই উপদেশের ফাঁকে ফাঁকে 'তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত' বলিতে তিনি বিরত হন নাই। বড়ই অদ্ভুত কথা! মৃত্যুভয়-নিবারণ অর্থে আমরা বুঝি—মৃত্যুর পর পরলোকে সদ্গতিলাভের উপায় করা; সেইজন্যই তো আমরা এত কষ্ট করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চাই; কেন না, বাঁচিয়া না থাকিলে সেইরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিব কেমন করিয়া? কিন্তু শ্রীভগবান বলিতেছেন, 'যুদ্ধ কর'—তাহার অর্থ, এখনই জীবলীলা শেষ কর। ভয়ানক কথা! অর্জ্জুন অবশ্য ভয় পান নাই, কারণ যুদ্ধ করাই তাঁহার ব্যবসায়; তবু সেই অর্জ্জুনকেও দেহের মমতা ত্যাগ করাইবার জন্য ভগবানকে কি পরিশ্রম না করিতে হইয়াছে! "বাসাংসি জীর্ণানি" হইতে আরম্ভ করিয়া "ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া" পর্য্যন্ত প্রায় গলদ্‌ঘর্ম্ম ব্যাপার! সর্ব্বশেষে অবশ্য যেই জিজ্ঞাসা করিলেন—

কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়। ১৮।৭২

অমনই অর্জ্জুনও কেমন চটপট উত্তর দিলেন!—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব। ১৮।৭৩

* * *

আসল কথা, গীতা কৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদরূপে মানুষকে যে অভয়বাণী শুনাইয়াছে—তাহা সাধারণ মৃত্যুভয়ের ঔষধ নয়; সে 'মরিবার' ভয় নয়, 'মারিবার' ভয়; অর্জ্জুনের ন্যায় বীর-পুরুষের জীবসংস্কারঘটিত কোন ভয় দূর করিবার জন্য নয়—তাঁহার আত্মিক মোহ—'অজ্ঞান'-সুলভ অনুকম্পা দূর করিবার জন্যই, শ্রীভগবান অর্জ্জুনের নিকটে জগৎ-রহস্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং 'জীবন-বাদ' নয়, 'জীবন-মুক্তি'র তত্ত্ব ও তাহা উপলব্ধি করিবার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমাদের সমস্যা অর্জ্জুনের সমস্যা নয়; আমরা জীবনকে তেমন করিয়া অস্বীকার করিতে পারি না; আমরা বাঁচিতেই চাই। আমরা, "অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা"—এই সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষকে সুদৃঢ় বৈরাগ্য-শস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া, সেই পরমপদের অন্বেষণ করিতেছি না—"যস্মিন্‌গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ"—যেখানে পৌঁছিলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। আমরা এ যুগের মানুষ, আমরা সম্পূর্ণ পৃথক জ্ঞান ও ভাবমার্গে শিক্ষিত, দীক্ষিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছি; এই মর্ত্ত্যলোক, এই সংসারই আমাদের কাম্যস্থান—জীবনযজ্ঞের বেদী; ইহাকে পরম দুঃখের 'আলয়' বুঝিয়া এখান হইতে চিরতরে প্রস্থান করিবার যে কামনা, এবং তাহাতে সিদ্ধিলাভ করার যে পরমপুরুষার্থ তাহা আমাদিগকে, প্রাচীন বা মধ্যযুগের যোগী-পুরুষদের মত, শ্রদ্ধান্বিত করে না। ইহার কারণ কেবল ইহাই নহে যে—আমরা দেহসংস্কারযুক্ত সহজ-প্রবৃত্তিপরায়ণ জীব, আমরা ইন্দ্রিয়সুখলোলুপ স্বার্থমোহমুগ্ধ অধঃপতিত মানব। অন্য কারণ এই যে, এ যুগের, অর্থাৎ আধুনিক কালের মানব-সাধনা ভিন্নমুখী; এ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধ্যান-ধারণা, ভাবনা-কামনা—অন্যবিধ পুরুষার্থকে আমাদিগের আদর্শ পুরুষগণেরও বরণীয় করিয়াছে। আমরা এই জীবন ও জগৎকে একটা বড় মূল্য দিয়া থাকি। প্রবৃত্তিকে শোধন

করিয়া যে আত্মশুদ্ধির সাধনায় আমরা বিশ্বাস করি, তাহাতে প্রকৃতিকে উচ্ছেদ করিতে চাই না—ত্রৈগুণ্যের অতীত হইবার প্রয়োজন বোধ করি না। আমরা জীবনকেই ভোগ করিতে চাই—মানুষের মত, পুরুষের মত, সুখ ও দুঃখদায়ক মাত্রাস্পর্শ বা ইন্দ্রিয়ার্থ প্রভৃতিকে আমরা আত্মার অস্পৃশ্য করিতে চাই না; অর্থাৎ, আমরা আমাদের ব্যক্তি-সত্তার বিনাশ কামনা করি না। গীতায় এই সকল বিষয়েরই উৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা ও সাবধানবাণী আছে; কিন্তু উহা যে-যুগের মানুষের পক্ষে উপযুক্ত ঔষধ বা উপাদেয় পথ্য ছিল, আমরা সে যুগের মানুষ নহি। গীতায় 'জীবনবাদ' নাই—'মোক্ষবাদ' আছে। এইজন্যই বোধ হয়, গীতাধর্ম্ম যখন ভারতে প্রবল হইয়াছিল, তখন হইতেই, 'কর্ম্মসন্ন্যাস' সাধনার নামে শেষে অতিশয় দুর্ব্বল কাপুরুষোচিত বৈরাগ্য বা অস্বাস্থ্যসুলভ 'নৈষ্কর্ম্ম্য' এই জাতিকে জীবন-ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছে। গীতার ভাগবত-ধর্ম্ম—উপনিষদে আত্ম-তত্ত্ব ও হীনযানী বৌদ্ধদিগের অনাত্মবাদ—এই দুইয়ের মধ্যে যে রফা করিয়াছিল—প্রকৃতি ও পুরুষের উপরে একটি 'পুরুষোত্তম' স্থাপনা করিয়া বৈরাগ্যসাধনার মধ্যেই যে ভক্তিপ্রেরণার উপায় করিয়াছিল—যাহাকে জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির মহাসমন্বয় বলা হইয়া থাকে, এবং যাহা বোধ হয় আদি ভাগবত-ধর্ম্মরূপে সে যুগে একটা বড় উপকার করিয়াছিল,—যাহার প্রভাবে বৌদ্ধ-মত মহাযান-পন্থায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল,—তাহা শেষ পর্য্যন্ত 'সমন্বয়' রক্ষা করিতে পারে নাই; এক দিকে দারুণ সন্ন্যাস ও অপর দিকে দারুণতর বৈষ্ণবভক্তিরস এই দুই বিপরীত নিষ্ঠা প্রায় সকল ধার্ম্মিক পুরুষকে গ্রাস করিয়াছিল; যাহারা সাধারণ মানুষ—সেই সামাজিক গৃহস্থগণ এই দোটানার মধ্যে যে-জীবন যাপন করিয়াছে, তাহা একরূপ ভীতত্রস্ত, পুরুষকার-কুণ্ঠ জীবন—শাস্ত্র ও সংহিতাশাসিত ইহলোক-পীড়িত ও

পরলোক-প্রবঞ্চিত জীবন। গত সহস্র বৎসরের যে অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট ইতিহাস আমরা যেটুকু পাই, তাহাতে দেখি—আমাদের দেশের মানুষ মানুষ-হিসাবে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছে; এক দিকে বিষয়-লালসা ও অপর দিকে পরলোকভীতি, এই দুইয়ের মধ্যে সাম্যরক্ষার প্রয়োজনে তাহারা সত্যভ্রষ্ট হইয়াছে; পাপ ও পুণ্যের দুইটি পৃথক খাতা খুলিয়া—হিসাব পৃথক রাখিয়া—পরম নিশ্চিন্ত মনে, অর্থাৎ, ঘোর তামসিক অবস্থায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। অতএব, গীতাই হউক বা পরবর্ত্তী আর যে-কোন ধর্ম্মমতই হউক—সকলই যে জাতির জীবন-সাধনার পক্ষে নিষ্ফল হইয়াছে, ইহা মানিতেই হইবে; সে দোষ প্রকৃতিপুঞ্জের উপরে চাপাইলে হইবে না; নূতন নূতন আখড়া খুলিয়া নূতন নূতন ভাষ্য-রচনা ও প্রচার করিয়া এই সত্যকে চাপা দেওয়া যাইবে না। যাহা ঘটিয়াছে তাহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়াই ঘটিয়াছে। তাহার মূলে কার্য্য-কারণের কোনরূপ বিচ্যুতি নাই; কাল বা মানুষের ইতিহাসই এস্থলে সর্ব্বাগ্রে গণনীয়,—আখড়ার আখড়াই-বিচার নিতান্তই নিরর্থক।

* * * *

আজ জগৎব্যাপী মহামন্বন্তরের মুখে দাঁড়াইয়া, এসকল কথার আবৃত্তি বা আলোচনা নিতান্তই নিষ্ফল। আজ মৃত্যুর বিরাট উদ্যত মুষ্টির আঘাত আমাদের রুদ্ধ জীবন-গৃহদ্বারে আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে—সকল মিথ্যা, সকল অসত্য, সকল সুখকর আত্মপ্রবঞ্চনা, ও দুঃখকর প্রাণধারণ-চেষ্টা—আত্মার সফল বা নিষ্ফল ভিক্ষা-চর্য্যা ঘুচিবার দিন আসিয়াছে। মৃত্যুকে রোধ করা যাইবে না; দুই খাতার হিসাব আজ মিলাইয়া 'বুঝ' দিবার লগ্ন আসিয়াছে। সেই লগ্নেও কি আমরা একবার

চোখ মেলিব না—ঘুমন্ত অবস্থাতেই কি এই এত মমতার দেহ ত্যাগ করিব?

এই স্থানে, ঠিক এই লগ্নে, গীতার উপদেশ বড় কাজে লাগিবে—জীবনযাপন-বিধির যে তত্ত্ব গীতা প্রচার করিয়াছেন, তাহা যেমন সাধারণ মানুষের স্বভাব-অনুকূল নহে, তাহা অসাধারণের উপযোগী বলিয়াই নিষ্ফল হইয়াছে; তেমনই, গীতায় মৃত্যু-সম্বন্ধীয় উপদেশ যে অসাধারণ স্থান-কাল ও ঘটনা উপলক্ষ্যে শ্রীভগবানের মুখে নিঃসৃত হইয়াছে—তাহা আজ আমাদের পক্ষেও বড় উপযোগী; কারণ, আজ আমাদের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ অসাধারণ; আমরা এক মহাকুরুক্ষেত্রে মহাকালের মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিতেছি। এমন কি, অর্জ্জুনের মত দিব্যদৃষ্টি লাভ না করিয়াই, মহাকালের বিশ্বরূপ দর্শন করিতেছি। আমরাও দেখিতেছি—

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনি পাল সঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ।
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
(১১-২৬।২৭)

আমরাও আর্ত্তস্বরে বলিতে পারি—

দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো!।

... ...

দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ! জগন্নিবাস!।

—এখানে তো কোন তফাত নাই। অতএব, যদি উপদেশ লইতে হয়, তবে আজ গীতার উপদেশই একমাত্র উপদেশ। সে উপদেশ লইবার যোগ্যতা কি আমাদের আছে? আমরা কি অর্জ্জুনের ন্যায় সুস্থ, আমাদের কি সেই বাহুবল, সেই বীর্য্য আছে? না; কিন্তু, তথাপি আমরা মানুষ, আমাদের এই সুপ্ত মনুষ্যত্বেরই অন্তর্গহনে সেই বস্তু আছে, যাহা আজিকার এই ঘোর অন্ধকার আকাশের বজ্রানলস্পর্শে মুহূর্ত্তের জন্যও জাগিয়া উঠিতে পারে। সেই বস্তু সহজে জাগে না, আমাদের মত জীবনমৃত জাতির পক্ষে সে ঘটনা আরও অসম্ভব। কিন্তু ইহা তো আমাদের শক্তি নয়! জাগিবার শক্তি নয়, জাগাইবার শক্তিই তো আসল! আজ মহাকাল সেই শক্তি প্রয়োগ করিতেছে—তাই তুচ্ছ তৃণও আজ জ্বলিয়া উঠিতেছে। একদিন আমাদের কবি যে গাহিয়াছিলেন—

যে-পথে অনন্ত লোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সে পথপ্রান্তের
এক পার্শ্বে রাখো মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগ-যুগান্তের।

আজ তাহা সত্য হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, আজ গীতার উপদেশ আমাদের পক্ষেও অসাধ্য নহে। সেই উপদেশ কি? মৃত্যু যখন আসন্ন, এবং প্রায় নিশ্চিত—তখনও 'মামনুস্মর যুধ্যচ'। এই 'যুধ্যচ' অর্থে ইহাই নয় যে, সকলে অস্ত্রধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে ছুটিবে। শ্রীভগবানও অর্জ্জুনকে সেই কথাই বলিতেছেন না—কারণ, এই যুদ্ধ করিতে হইবে—'সর্ব্বেষু কালেষু'। অতএব এখানে 'মামনুস্মর' কথাটাই বড়। 'আমাকে অনুস্মরণ কর', ইহাই তো দুরূহ কাজ—ইহাই যুদ্ধ; কারণ তাহা করিতে হইলে সর্ব্বপ্রকার ভয়, স্বার্থচিন্তা, মোহ ও প্রমাদকে বশে

রাখিতে হইবে, তাহার মত যুদ্ধ আর কি আছে? 'সর্ব্বেষু কালেষু' আমরা তাহা পারি না, এবং পারি নাই বটে, কিন্তু আজ? আজ তাহাই পারিতে হইবে—অন্তকালেও যদি তাহা করিতে পারি, তবে মৃত্যুভয় থাকিবে না। কারণ,—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয়! সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥ (৮-৫।৬)

ইহার বেশি বলিবার, বা আরও ব্যাখ্যা করিবার সময় নাই; বরং প্রত্যেকেই ইহার ব্যাখ্যা, নিজ নিজ অবস্থায়, আপন বুদ্ধিমত করিয়া লইবেন, ভগবদ্বাক্যের ব্যাখ্যা সেইরূপ করাই উচিত।

আজ এই ১৩৪৯ সালের আশ্বিন মাসে "শারদীয়া পূজার" বোধন-বেদীতলে বসিয়া, আমার এই অতি দুর্গত ও মোহাচ্ছন্ন জাতির কল্যাণ-কামনা করিয়া এই কয়টি কথামাত্র কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই উদ্দেশে নিবেদন করিলাম—যিনি সর্ব্বলোকের সর্ব্বজীবের—

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।

———

চিত্রগুপ্ত

চিত্রগুপ্ত ওৎ পেতে ব'সে আছে,
মরিয়াও নাই নিস্তার তার কাছে;
অস্ত-অচলে ডুব দিল রাঙা রবি—
রাতের আঁধারে ফেউ লাগে তার পাছে।
অরণ্যে ওঠে সোমপায়ীদের গান,
সোনার স্বদেশে পুড়িয়ে করে শ্মশান
রবির কাহিনী—আলোকের জীব জানে
মাঝখানে পড়ে শনি হয় সাবধান।

ছিন্নমস্তা

ভৈরবী বেশে দেখিয়াছি তোরে,—আজি যে খড়্গহস্তা !
মহাবিদ্যার সর্ব্বনাশিনী তুই কি ছিন্নমস্তা ?
শিবের বক্ষ সবলে দলিয়া সেজেছিলি তুই কালী,
দেখেছি সে রূপ চিতার আলোকে, কপালিনী কঙ্কালী ;
ধূমে ধূমাবতী ধূসর ধরণী রাঙায়ে রক্তপাতে
আজি তোর দেখা, ছিন্নমস্তা, পাই এ প্রলয়-রাতে !

রুধিরসিন্ধু পার হয়ে যদি এলি ভারতের কূলে,
চেয়ে দেখ তোর ভোলানাথ ভয়ে চরণে পড়েছে ঢুলে !
বলির রক্তে কুলায় না আর, তাই কি ভয়ঙ্করী,
আপন মুণ্ড আপনি কাটিস নিজ হাতে খাঁড়া ধরি ?
কমলা কোথায় লুকাল তরাসে, তারারে কে আজি তারে ?
ভুবনেশ্বরী লুপ্ত সাগরে এ ঘোর অন্ধকারে !

ভুলে-ভরা এই ধরারে ডুবায়ে শোণিতসিন্ধুজলে
নূতন সৃষ্টি চাস কি করিতে ও রাঙা চরণতলে ?

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

শ্যামাদাসের মৃত্যু

শ্যামাদাসবাবু রোগশয্যায় শায়িত ছিলেন—মৃত্যু-রোগশয্যা। সে কথা তিনি জানেন। গভীর-চিন্তাশীল বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক তিনি, এ কথা তাঁহার কাছে অবিদিত ছিল না। লোলচর্ম্মের আবরণীর অভ্যন্তরে কালজীর্ণ মধুশূন্য মধুচক্রের মত অসংখ্য কোটি কোষচক্র-গুলির স্বরূপ তাঁহার কাছে প্রত্যক্ষ ; তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি সেগুলির ক্রম-জীর্ণতা দীর্ঘকাল ধরিয়া লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। গভীর প্রশান্ত দৃষ্টিতে খোলা জানালার ভিতর দিয়া তিনি দেখিতেছিলেন, গাঢ় নীল আকাশ—অসীম রহস্যময় শূন্যমণ্ডল।

দুইটি জিনিসকে জানিবার জন্য ছিল তাঁহার অসীম আগ্রহ, অপরিমেয় কৌতূহল ; তাঁহার সমস্ত জীবনটাই কাটিয়াছে সেই সাধনায়, কঠোর অক্লান্ত, ক্লৈব্যহীন সাধনা। জীবনরহস্য আর মরণরহস্য জানিবার সাধনায় সমস্ত জীবনটাই তাঁহার কাটিয়া গেল। আরম্ভ করিয়াছিলেন বাইশ বৎসর বয়সে, আজ তাঁহার বয়স সত্তর, কিন্তু—। শ্যামাদাসবাবুর মুখে বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল, জীবনরহস্য জানা হয় নাই, জানিবার আর সময়ও নাই। সেজন্য তাঁহার আক্ষেপ নাই, তাঁহার শিষ্য, শিষ্যের শিষ্য, তাহার শিষ্য, তাহাদের উপরই রহিল তাঁহার অসমাপ্ত সাধনা সমাপ্ত করিবার ভার। তিনি এখন নিজে ধীরে ধীরে এক গভীরতর রহস্যের সহিত মুখোমুখি দাঁড়াইতে চলিয়াছেন, দূরত্ব ক্রমশ কমিয়া আসিতেছে।

পৃথিবীর স্বাদ গন্ধ ধ্বনি বর্ণ সমস্ত কিছুর উপর ক্রম-ঘনায়মান কুয়াশার মত একটা লুপ্তির রহস্য ঘনাইয়া আসিতেছে—ওই তার পদ-ধ্বনি। দেহের অভ্যন্তরে, কোষচক্রের অভ্যন্তরে জীবনীমধুর দ্রুত

আবর্ত্তন—প্রোটোপ্লাস্‌মকে তিনি জীবনীমধু বলেন—ক্রমশ গতিহীন স্থির হইয়া আসিতেছে,—ধাতুবহ্নি নিবিয়া যাইতেছে সে তিনি জানেন; কিন্তু তাহারও অতিরিক্ত কিছু জানিবার আগ্রহ তাঁহার।

কুড়ি বৎসর পূর্ব্বের কথা মনে পড়িয়া গেল।

মাসখানেকের মধ্যেই সংসারে দুইটি মৃত্যু ঘটিয়া গিয়াছিল। তাঁহার ছোট ভাই দুর্গাদাস এবং তাঁহার নিজের স্ত্রী কৃষ্ণভামিনী মাসখানেক আড়াআড়ি মারা গিয়াছিলেন।

* * *

দুর্গাদাস ছিলেন উকিল, অল্প বয়সেই তিনি হাইকোর্টে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দুই ভাইকে লক্ষ্য করিয়া লোকে বলিত, ইন্দ্র-চন্দ্রের মত দুই ভাই। কথাটা অতিরঞ্জন সন্দেহ নাই, কিন্তু দুই ভাইয়ের কৃতিত্ব সত্যই ছিল গৌরবের বস্তু। শ্যামাদাসবাবু নিজে বিজ্ঞানশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি, মেডিকেল কলেজের বায়োলজির অধ্যাপক। একটা মামলা লইয়া দুর্গাদাস মফস্বলে গিয়াছিলেন, টাইফয়েডে আক্রান্ত হইয়া ফিরিলেন। মারা গেলেন বত্রিশ দিনের দিন, অজ্ঞান অবস্থায় চীৎকার করিতে করিতে তিনি মারা গেলেন। শ্যামাদাসবাবু অবিচলিত ধৈর্য্যে ভাইয়ের বিছানার পাশে বসিয়া ছিলেন, সব শেষ হইলে তিনি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখের হাসি হাসিলেন, বার বার—বার বার তিনি দুর্গাদাসকে বলিতেন, অন্তত জলটা গরম ক'রে খাবে।

দুর্গাদাস তাঁহার কথা উপেক্ষা করিতেন এমন নয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ছিল না বলিয়াই সতর্ক হইবার মত ব্যগ্রতা তাঁহার ছিল না; চাকরকে বলিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন। ফলে বৈজ্ঞানিক সত্য আপনাকে সপ্রমাণ করিল অতি নিষ্ঠুরভাবে; মেঘের আড়ালে অদৃশ্য

শত্রুবিমান-নিক্ষিপ্ত বোমার স্প্লিন্টারের আঘাতে অসতর্ক পথচারীর মতই দুর্গাদাস মারা গেলেন।

কৃষ্ণভামিনীর মৃত্যু ধ্রুব—এ কথা তিনি কল্পনা না করিলেও, আঘাত অনিবার্য্য এটা তিনি সেই সময়েই জানিয়াছিলেন। দুর্গাদাসের ব্যাধিটা টাইফয়েড়—এ কথা অণুবীক্ষণের দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়িতেই শ্যামাদাস-বাবু বাড়ির প্রতিটি জনকে টি-এ-বি ভ্যাক্‌সিন ইন্‌জেক্‌শন লইতে বাধ্য করিলেন। বাধ্য করিতে পারিলেন না কৃষ্ণভামিনীকে। দুর্গাদাসের স্ত্রী পর্য্যন্ত ভাশুরের কথায় অবনত মুখে নীরবে হাতটি বাড়াইয়া দিলেন, কিন্তু কৃষ্ণভামিনী বলিলেন, আর জ্বালিও না বাপু, ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে জ্বর-যন্ত্রণা ভোগ করতে পারব না আমি।

শ্যামাদাসবাবু অনুরোধ করিলেন, অনুনয় করিলেন, অবশেষে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, তবে মর।

হাসিয়া কৃষ্ণভামিনী বলিলেন, তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। তোমার আশীর্ব্বাদ সফল হোক। তোমাদের সকলের বালাই নিয়ে যেন যাই আমি। তা হ'লে আমার মত ভাগ্যিমানী কে?

ও রকম ভাগ্যিমানী হিন্দুর সংসারে ঘরে ঘরে, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে। হিসেব করতে হ'লে চিত্রগুপ্তের খাতা চাই। ইংরেজ আমলের আগে জন্মমৃত্যু রেজেষ্ট্রির নিয়ম ছিল না। যাক, এখন ইন্‌জেক্‌শন নেবে কি না?

না।

দুর্গাদাসবাবু মারা গেলেন, কৃষ্ণভামিনী বিছানায় শুইতে বাধ্য হইলেন।

শ্যামদাসবাবু বলিলেন, এইবার ওষুধ খাবে তো?

অসুখ করলে ওষুধ না খেলে চলবে কেন ?

ইন্‌জেক্‌শন ?

কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া কৃষ্ণভামিনী হাসিলেন—সে এক বিচিত্র হাসি। বলিলেন, ডাক্তার কি বলছে ? আমি বাঁচব না ?

শ্যামাদাস বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ডাক্তারে তা বলতে পারে না।

কৃষ্ণভামিনী বলিলেন, ঠাকুরপো চ'লে গেলেন, আমার বাঁচবার জন্যে ইন্‌জেক্‌শন নিতে লজ্জা হয়। কিন্তু মরণ যদি না হয় ? তবে মিছি-মিছি রোগের ভোগ বাড়িয়ে তো কোন লাভ নেই। আমার কষ্টের কথা বলছি না, গোটা বাড়িটা কষ্ট পাবে। তোমার কষ্ট হবে। তখন ইন্‌জেক্‌শনও দরকার হ'লে নিতে হবে বইকি। নেব।

তবে ? তখন নিলেই তো হ'ত।

তুমি ব'কো না বাপু ; ইন্‌জেক্‌শন নিলেই নাকি অসুখ আমার হ'ত না ! কপালের দুর্ভোগ যার যা থাকে, সে যাবে কোথায় ?

কপাল ? দুর্ভোগ ?—হাসিয়া শ্যামদাস সে দিন বলিয়াছিলেন, সে তোমার নয়, আমার। অবশ্য মনে মনে বলিয়াছিলেন, প্রকাশ্যে বলিলে আর রক্ষা থাকিত না। জীর্ণ দেহে রোগশয্যায় শুইয়া দীর্ঘকাল পরেও শ্যামদাস সে কথা মনে করিয়া আজ হাসিলেন।

মুহূর্ত্ত পরে আবার তিনি হাসিলেন, সে হাসি অন্য হাসি।

দুর্ভোগ তাঁহারই বইকি ?

জীবনে তাঁহার ও কৃষ্ণভামিনীর মিলনের মধ্যে বিরোধের সংস্থান অদ্ভুত। জীবন-পথে তাঁহাদের যাত্রা ঠিক একটি অন্তহীন সরলরেখার দুইপ্রান্ত অভিমুখে,—ক্লান্তিতে, বিশ্রামে, অবসাদে কখনও পাশাপাশি বসিবার সুযোগ মিলে নাই।

কৃষ্ণভামিনীর যাত্রা ছিল পাপ-পুণ্যের, ধর্ম্ম-অধর্ম্মের, মায়ামোহে

বিচিত্র মর্ত্ত্যলোক পার হইয়া জন্মজন্মান্তরের পথে—পরলোকেরও পরপারে স্বর্গলোক অভিমুখে। তারও পরে আছে নাকি এক পরম আনন্দলোক।

শ্যামাদাসের যাত্রা বিপরীত মুখে। তাঁহার পৃথিবী—অত্যুত্তপ্ত ফুটন্ত ধাতবীয় এক পরিমণ্ডলের উপর বারিধিমণ্ডলবেষ্টিত কঠিন স্তরময়ী এই পৃথিবী ; এই পৃথিবীর বুকে জীবজীবনের বিবর্ত্তন-পথে—এক কৌষিক দেহ হইতে বহু কৌষিক দেহে, উপাদান হইতে অবয়বের পথে, অবয়ব হইতে শক্তির পথে, শক্তি হইতে গতির পথে, শ্রীর পথে ; চেতনা হইতে বোধের পথে, বোধ হইতে বাসনার পথে, ইচ্ছা হইতে মনের পথে ; মন হইতে বুদ্ধির পথে, জ্ঞানের পথে, বিজ্ঞানের পথে তাঁহার যাত্রা।

কৃষ্ণভামিনী যখন পূজার আসনে বসিয়া ধ্যানস্তিমিত চিত্তে মনশ্চক্ষে দেখিতেন আকাশমণ্ডলের বুক চিরিয়া অদৃশ্যপথে নামিয়া আসিতেছে এক অপূর্ব্ব-গঠন জ্যোতির্ম্ময় রথ, সেই রথের মধ্যে জ্যোতির আকর তাঁহার ইষ্টদেবতা, তখন শ্যামদাসবাবু তাঁর লাইব্রেরি ঘরে বসিয়া রাশি রাশি বই লইয়া মনের দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতেন সৌরমণ্ডলের শূন্য-লোকের মধ্যে এক বাষ্পলোক। বিভিন্ন বাষ্পের আলোড়ন সংমিশ্রণ সেখানে। পৃথিবীর বুক হইতে ক্রমশ উর্দ্ধে উঠিয়া চলিয়া যাইতেন আর এক মণ্ডলে—স্ট্রাটোস্‌ফিয়ারে।

এ কি ? অকস্মাৎ সেদিন নজরে পড়িয়াছিল, দুইটা গিনিপিগ বাগানের পথে ছুটিয়া একটা ঝোপের দিকে পলাইতেছে। এ কি ? ও দুইটা খাঁচা হইতে বাহির হইল কি করিয়া ? বই ফেলিয়া চিন্তা ছাড়িয়া তাঁহার গবেষণাগারে আসিয়া শ্যামাদাস স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলেন—খাঁচার ভিতর বাটিতে দুধ, ভিজা ছোলা ! কে দিল ?

যে দিয়াছে, খাঁচা খুলিবার সময় তাহারই অসাবধানতাবশত ও দুইটা পলাইয়াছে। শ্যামাদাস বরাবরই অত্যন্ত কঠোরচিত্ত লোক। কঠিন ক্রোধে তিনি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কয়েকটা গিনিপিগকে অনাহারে রাখিয়া বিভিন্ন অবস্থায় তাহাদের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত কোষচক্রগুলির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

গবেষণাগার হইতে বাহির হইয়া আসিয়া তিনি চাকরটাকে ডাকিয়াছিলেন। শ্যামাদাসবাবুর মূর্ত্তি দেখিয়া সে শুকাইয়া গিয়াছিল, হাতজোড় করিয়া সভয়ে সে নিবেদন করিয়াছিল, সে কিছুই জানে না।

শ্যামাদাস অন্য কোন শাস্তি দেন নাই, তাহাকে তৎক্ষণাৎ জবাব দিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, এক মাসের মাইনে তোমার বাকি আছে, সেও তুমি পাবে না।

লোকটা অনেক দিনের পুরানো চাকর, সে আবার কাকুতি করিয়া বলিয়াছিল, আমি কিছু জানি না হুজুর; তবে বড় বউমা—

কি?

আজ্ঞে, তিনি একবার চাবি নিয়েছিলেন ঘরের।

বড় বউ চাবি নিয়েছিল?

হ্যাঁ। আমিই নিয়েছিলাম চাবি। কৃষ্ণভামিনীর বয়স তখন সবে পঁচিশ কি ছাব্বিশ; কৃষ্ণভামিনী নির্ভয়ে আসিয়া ক্রুদ্ধ শ্যামাদাসের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

জরাগ্রস্ত মৃত্যুসমীপবর্ত্তী শ্যামাদাসের চোখের উপর আজও সে মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। সদ্যস্নাতা কৃষ্ণভামিনীর চুল হইতে নখ পর্য্যন্ত সব মনে পড়িল। তন্বী দীর্ঘাঙ্গী কৃষ্ণভামিনীর পরনে সেদিন ছিল লালপাড় শাড়ি। আয়ত চোখে নির্ভীক দৃষ্টিতে চাহিয়া আজও যেন তিনি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

হ্যাঁ, আমিই নিয়েছিলাম চাবি।

তুমি?

হ্যাঁ। আমিই দুধ দিয়েছি, খাঁচা খুলতে দুটো পালিয়েও গিয়েছে।

তুমি? তুমি দুধ দিয়েছ?

হ্যাঁ, আমি। বার বারই তো বলছি।

শ্যামাদাস ক্রোধের উপর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলেন।

কৃষ্ণভামিনীকে নিত্য নিয়মিত তিনি বিজ্ঞান পড়াইতেন। বিবাহের পর হইতে তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন তাঁহার জীবনের সত্যকারের অর্থে কৃষ্ণাকে সঙ্গিনী করিয়া তুলিবার জন্য। অসীম আগ্রহ, কৌতূহল এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কৃষ্ণভামিনী তো সবই শুনিতেন। অণুবীক্ষণ-যন্ত্রের মধ্য দিয়া চক্ষুর অগোচর সৃষ্টিবৈচিত্র্য-রহস্য দেখিয়া তাঁহার বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টি দেখিয়া শ্যামাদাসের আনন্দের তৃপ্তির আর অন্ত থাকিত না। সেই কৃষ্ণভামিনী এই কাজ করিয়াছে! এ কথায় তাঁহার বিস্ময়ের আর অবধি থাকিত না।

কৃষ্ণভামিনী বলিয়াছিলেন, এমনই ক'রে অনাহারে তিলে তিলে দগ্ধে তুমি জীবগুলোকে মারবে, শুধু তাই নয়, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা চালাবে, ওদের কাটবে, সে পাপ আমি হতে দেব না—কিছুতেই না।

শ্যামাদাস আর আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই, বলিয়াছিলেন, বাজে ব'কো না কৃষ্ণা, সেন্টিমেন্টাল ফুলের মত।

সেন্টিমেন্টাল ফুল? কৃষ্ণভামিনীর আয়ত কালো চোখ দুইটা বিদ্যুৎস্ফুরিত রাত্রির মেঘের মত ঝকমক করিয়া উঠিয়াছিল।

শ্যামদাস এজন্য প্রস্তুত ছিলেন না। আজও তিনি শিহরিয়া উঠিলেন—জীর্ণ দেহ লইয়াও তিনি ঈষৎ চঞ্চল হইয়া পড়িলেন।

কে ডাকিল, বাবু!

চাকরটা ডাকিতেছিল, রুগ্ন শ্যামদাস বলিলেন, বাইরে যা, বাইরে যা তুই।

সেদিনও তিনি কৃষ্ণার মূর্ত্তি দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া চাকরটাকেই সর্ব্বাগ্রে বলিয়াছিলেন, যা যা, বাইরে যা তুই।

চাকরটা চলিয়া যাইবামাত্র কৃষ্ণভামিনী বলিয়াছিল, জান, তোমার ওই পাপে আমার সংসার শূন্য হয়ে রইল। সন্তান থেকে ভগবান আমায় বঞ্চিত করলেন; আমাকে দিলেন না তিনি। পরমুহূর্ত্তেই বিদুদ্দীর্ণ মেঘের বর্ষণের মত অনর্গল ধারায় কৃষ্ণভামিনীর চোখ হইতে জল ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

শ্যামদাস মাথা নীচু করিয়া চলিয়া আসিয়াছিলেন। এত বড় আঘাত তিনি জীবনে পান নাই। সেদিনের পূর্ব্বেও না, পরেও না। আপন গবেষণাগারে আসিয়া তিনি সেদিন অর্দ্ধেকটা দিন ক্রমাগত মাথা হেঁট করিয়া পায়চারি করিয়াছিলেন। কৃষ্ণভামিনীর অভিযোগের জন্য নয়; কৃষ্ণভামিনী নিজেই জানিতেন, তাঁহার বন্ধ্যাত্ব তাঁহার নিজের দেহাভ্যন্তরের কোন সূক্ষ্ম ত্রুটির জন্য; বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফল তিনি বার বার বহু প্রশ্ন করিয়া বুঝিয়া লইয়াছিলেন। শ্যামাদাসের ক্ষোভ দুঃখ তাঁহার দাম্পত্য-জীবনের ব্যর্থতার জন্য। কৃষ্ণভামিনীকে তিনি সহধর্ম্মিণী করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণভামিনী প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলেন, সত্যকে অস্বীকার করিলেন। মর্ম্মান্তিক আক্ষেপে তিনি একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন, সে কথাটি পর্য্যন্ত শ্যামাদাসের মনে পড়িল।

আজও তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মনে হইল, সেদিন বাকি গিনিপিগগুলাকে ছাড়িয়া দিলেই হয়তো ভাল হইত। সেদিনও সে কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল।

রুগ্ন শ্যামাদাসের স্তিমিতদীপ্তি হরিদ্রাভ নিষ্প্রভ চোখ দুইটি ক্ষীণ দীপ্তিতে মুহূর্ত্তের জন্য যেন জলিয়া উঠিল। সেদিন মুখে তাঁহার এক ক্ষুরধার হাসি খেলিয়া গিয়াছিল। কতবার তিনি কৃষ্ণভামিনীকে বুঝাইয়াছিলেন জীবন-মৃত্যুর অবিরাম দ্বন্দ্বের কথা; জীবন-সৃষ্টির দিন হইতেই অহরহ নিরবধি সে দ্বন্দ্ব চলিয়া আসিতেছে,—হয় জীবনের বিলুপ্তিতে তাহার সমাপ্তি হইবে, নয় মৃত্যুকে জয় করিয়া তাহাকে পঙ্গু করিয়া জীবন এ দ্বন্দ্বের মহাকাব্যের শেষে পূর্ণচ্ছেদ টানিবে।

গাঢ় নীল আকাশের দিকে চাহিয়া শ্যামাদাসের মনশ্চক্ষে সেই অনন্ত মহাদ্বন্দ্বের প্রতিচ্ছবি ভাসিয়া উঠিল—অণুবীক্ষণের দিব্যদৃষ্টির মধ্য দিয়া দেখা ছবি। দেহের অভ্যন্তরে পেশী স্নায়ু অস্থির মধ্যে আপাদমস্তক কোষে অণুকোষে সর্ব্বাঙ্গব্যাপী নিরবধি অবিরাম এক সংগ্রাম। জীবনীমধুরসে টলমল কোষচক্রগুলি মৃত্যুর আক্রমণে জীর্ণ হইয়া ধ্বংস হয়, জীবন আবার করে নূতন সৃষ্টি, জন্মলাভ করে নূতন কোষচক্র।

কল্পনা নয়, প্রত্যক্ষ করা সত্য। অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়া কৃষ্ণভামিনী এ দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, শ্যামাদাস আপনার অন্তর উন্মুক্ত করিয়া তাঁহার অনুভূতির রাজ্যে কৃষ্ণভামিনীকে প্রবেশাধিকার দিয়াছিলেন, কৃষ্ণভামিনী তবু তাঁহার উপলব্ধ সত্যকে—সাধনার ফলকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, আকস্মিক জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য যেমন দুর্ব্বল জীবন গ্রহণ করিতে পারে না। কৃষ্ণভামিনী সেই দিন হইতেই তাঁহার কাছে মরিয়াছিলেন।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত কৃষ্ণভামিনী—যেন মৃত্যুরূপিণী হইয়া তাঁহাকে ক্ষয় করিয়া জয় করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণভামিনীকে হার মানিতে হইয়াছে। শ্যামাদাস জীবনের একটা দিনও তাঁহার গবেষণায় ক্ষান্ত হন নাই।

না, না। কৃষ্ণভামিনীও তাঁহার কাছে হার মানেন নাই—কোন দিন না। তিনিও যেমন তাঁহার গবেষণায় ক্ষান্ত হন নাই, কৃষ্ণভামিনীও তেমনই কোন দিন মুহূর্তের জন্য আপনার স্বতন্ত্র ধর্মসাধনায় বিরত হন নাই।

মনে পড়িল—স্বতন্ত্র শয্যার কথা।

কৃষ্ণভামিনী বলিয়াছিলেন, বাড়ি এসে কাপড় যেমন ছাড় তুমি, তেমনই স্নানও করা উচিত।

কেন?

ল্যাবরেটারির ওইসব কাণ্ডের পরে তোমার স্নান করা উচিত নয়? নিজে তুমি অশুচি বোধ কর না?

না।

না নয়, তোমাকে স্নান করতে হবে।

সাবান দিয়ে হাত-পা আমি ধুয়ে থাকি। যতটুকু প্রয়োজন বোধ করি, তার অতিরিক্ত কিছু করব না আমি।

কৃষ্ণভামিনী আর তাঁহাকে কিছু বলেন নাই, কিন্তু সেই দিনই তাঁহার শয্যা রচনা করিয়াছিলেন খাট ছাড়িয়া মেঝের উপর, ঘরের বিপরীত প্রান্তে।

অথচ একটি দিনের জন্য তাঁহার পরিচর্য্যার ব্যবস্থায় এক বিন্দু ত্রুটি কৃষ্ণভামিনী হইতে দেন নাই। মুর্গীর ডিম, মাংস পর্য্যন্ত নিজের হাতে তিনি রান্না করিয়া দিতেন। তাহার পর ছিল কৃষ্ণভামিনীর স্নানের নিয়ম।

শ্যামদাস বিছানায় শুইয়া সদ্যস্নাতা কৃষ্ণভামিনীর দিকে চাহিয়া দেখিতেন; কৃষ্ণভামিনী নিস্পন্দ মূর্ত্তিতে ধ্যান করিতেন।

কৃষ্ণভামিনী তাঁহার কাছে হার মানেন নাই।

অকস্মাৎ রুগ্ন শ্যামাদাসের চোখের দৃষ্টি কেমন হইয়া উঠিল। জীবন-মৃত্যু জ্ঞান-বিজ্ঞান সব তিনি যেন ভুলিয়া গেলেন। মনে পড়িয়া গেল এক দিনের কথা। প্রদীপের মিটমিটে আলোর সম্মুখে কৃষ্ণভামিনী সেদিন এক অপরূপ রূপে অসামান্যা হইয়া উঠিয়াছিলেন। ম্লান আলোর সম্মুখে কৃষ্ণভামিনীকে দেখিয়া শ্যামাদাসের অকস্মাৎ মনে পড়িয়াছিল একটা লাইন—

"Oh she doth teach torches to burn bright!"

শ্যামাদাস বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছিলেন। শীতের রাত্রি। আকাশে পাণ্ডুর চাঁদ খোলা জানালা দিয়া দেখা যাইতেছিল। বৈজ্ঞানিক শ্যামাদাসের শীত গ্রীষ্ম বারো মাস বিছানার পাশের জানালা খোলা থাকে। পাণ্ডুর চাঁদের মরা জ্যোৎস্নার দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আবার তিনি চাহিয়াছিলেন কৃষ্ণভামিনীর দিকে। মনের মধ্যে আবার গুঞ্জন করিয়া উঠিয়াছিল—

"Arise, fair sun, and kill the envious moon,
Who is already pale and sick with grief
That thou her maid art far more fair then she."

কৃষ্ণভামিনীর পিঠের উপর এলানো একরাশ ভিজা চুল, ভ্রমরের সারির মত কোঁকড়ানো কালো চুল; মোমে-মাজা সাদা সুতার মত সিঁথি, মসৃণ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছোট কপালটির মধ্যখানে সিঁদুরের টিপ, আধ-মুদিত ডাগর দুইটি চোখ;—সেদিনের কৃষ্ণভামিনী অসামান্যা।

শ্যামাদাস বিছানা হইতে নামিয়া আসিয়া কৃষ্ণভামিনীর পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন।

কৃষ্ণভামিনী পদশব্দে বঙ্কিমদৃষ্টিতে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া শুধু বলিয়াছিলেন, হুঁ। অর্থাৎ সরিয়া যাও।

না, শ্যামাদাস সেইখানেই বসিয়া পড়িয়াছিলেন। বাঁ হাতটা মাটির

উপর রাখিয়া ডান হাত তিনি প্রসারিত করিয়াই অকস্মাৎ চকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাঁ হাতে কোন কিছুর স্পর্শে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে একটা চকিত সঙ্কুচন-শিহরণ খেলিয়া গিয়াছিল। হাতের, বুকের, উরুদেশের পেশীগুলি অকস্মাৎ মুহূর্ত্তে সঙ্কুচিত হইয়া লাফাইয়া উঠিয়াছিল, মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলীতে খেলিয়া গিয়াছিল, যেন বিদ্যুতের প্রবাহ। আপনাকে সংযত করিয়া শ্যামাদাস হাত তুলিয়া দেখিলেন, তাহার পর চাহিয়া দেখিয়াছিলেন মাটির দিকে। দেখিলেন, হাতের তালুতে আলপিনের মাথার মত এক বিন্দু স্থান সাদা, মাটির উপর ধূপকাঠির মাথার স্তিমিত অগ্নিবিন্দুটিও ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই নিবিয়া গেল।

কৃষ্ণভামিনীও ব্যাপারটা দেখিয়াছিলেন, ধ্যানস্তিমিত মুখেই মৃদু হাসি তাঁহার ঠোঁটের উপর খেলিয়া গিয়াছিল।

শ্যামাদাসের মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনিও হাসিয়াছিলেন—ওই সাদা জায়গাটার ভিতরের কোষচক্রটা অগ্নিস্পর্শে মরিয়া গেল, তাহারই অনুভূতি।

আকস্মিক মৃত্যুর মধ্যে একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা আছে। সেটা যেমন ক্ষণিক, তেমনই সেটা প্রচণ্ড।

গিলোটিনে অথবা বন্দুকের গুলিতে বা বজ্রাঘাতে যাহাদের মৃত্যু হয়, তাহাদের কথা তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। ধীরে ধীরে তিনি উঠিয়া আসিয়া খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই চিন্তায় তাঁহার সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গিয়াছিল।

এই প্রচণ্ড মূর্ত্তি মৃত্যুর কিন্তু বিকৃত রূপ—অকস্মাৎ তপোভঙ্গে বহ্নি-স্ফুরিতনেত্র শিবের রূপের মত। তাহার স্বরূপ শান্ত, গতি ধীর; তিনি নিজে বেশ অনুভব করিতেছেন। লোলচর্ম্ম হাতখানি তুলিয়া তিনি আপনার চোখের সম্মুখে ধরিলেন। পরমুহূর্ত্তেই হাসিলেন। দৃষ্টি

অস্বচ্ছ, পরিপূর্ণ পরিষ্কার দৃষ্টির সম্মুখে আবরণ পড়িতে শুরু করিয়াছে। হাত দিয়া স্পর্শ করিয়াও কিছু বুঝা যাইবে না। স্পর্শানুভূতিও ক্ষীণ হইয়াছে; লোলচর্ম্মের অন্তরালে পেশীস্নায়ুর পরিবর্ত্তন হইতেছে মৃত্যুর স্পর্শে, পেশীস্নায়ুর মধ্যে কোষ-অণুকোষগুলি বোধ হয় মরণোন্মুখ। ক্রমে ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল অসাড় হইয়া পড়িবে, স্মৃতি বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া আসিবে, সদ্যোজাত শিশুর অস্ফুট অবসাদ-সুখের মত এক আচ্ছন্নতার মধ্য দিয়া পরিপূর্ণ বিলুপ্তিতে হইয়া যাইবে সমস্ত কিছুর অবসান।

দুর্গাদাস বড় চীৎকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুটা অনেকটা আকস্মিক; শেষের দিকে মস্তিষ্কের মধ্যে রোগ প্রবেশ করিয়াছিল। ক্ষুদ্র অন্ত্রপ্রদেশের সূক্ষ্ম কারুকার্য্যময় নলযন্ত্রটি ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছিল, গিলা-করা মসলিনের মত অতি সূক্ষ্ম কুঞ্চনে কুঞ্চিত শ্লৈষ্মিক ত্বকখানি জীর্ণ করিয়া দুষ্ট ক্ষত উদ্গার করিয়াছিল বিষবাষ্প; সেই বাষ্পাচ্ছন্ন মস্তিষ্কে সে কি যন্ত্রণা—সে কি দুরন্ত বিকার! কিন্তু বড় মর্ম্মস্পর্শী প্রলাপ বকিয়াছিলেন দুর্গাদাস।

কে বাঁধলে? আমার বাক্স বিছানা কে বাঁধলে? আঃ—ছি-ছি-ছি! আমি যেতে পারব না বলছি। কি বিপদ দেখ দেখি!

কৃষ্ণভামিনীই চমকিয়া উঠিয়া বলিয়াছিলেন, ঠাকুরপো! ঠাকুরপো! কি বলছ?

রক্তচক্ষু মেলিয়া দুর্গাদাস তাঁহার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া চিনিয়া বলিয়াছিলেন, বউদি!

কি বলছ?

কিছু না।

ওই যে বাক্স বিছানা ব'লে কি বলছ?

শ্যামাদাস বিরক্ত হইয়া ধমক দিয়াছিলেন, কেন ওকে বিরক্ত করছ? ডিলিরিয়াম হয়েছে, দেখছ না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওরা বলছে, আমায় যেতেই হবে। আমি পারব না বলছি। কিছুতেই শুনবে না। আঃ—ছি-ছি-ছি! আমি যাব না। যাব না।

মৃত্যুর কয়েক মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্তও অস্ফুট গোঙানির মধ্যেও তিনি বলিয়াছিলেন, না, না, না। আঃ—ছি-ছি-ছি!

রোগ টাইফয়েড শুনিয়া দুর্গাদাস মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়াছিলেন, জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুর আশঙ্কার দ্বন্দ্ব—বিকারের প্রভাবে বিশৃঙ্খল মন এমনই ভাবেই প্রকাশ করিয়াছিল। বাঁচিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল দুর্গাদাসের।

কৃষ্ণভামিনী কি মরিতে চাহিয়াছিলেন? আজও সে প্রশ্নের মীমাংসা শ্যামাদাস করিতে পারেন নাই। মৃত কৃষ্ণভামিনীর মুখ মনে পড়িল—প্রশান্ত হাসিমুখ। কৃষ্ণভামিনীর শবদেহ দেখিয়া সেদিন শ্যামাদাসের বৈজ্ঞানিক তথ্য মনে পড়ে নাই; মনে পড়িয়াছিল রোমিও-জুলিয়েটের কয়েকটা লাইন—

"Death, that hath sucked the honey of thy breath
Hath had no power yet upon thy beauty—
Thou art not conquered"

কৃষ্ণভামিনীর মরণ তাঁহার কাছে আজও বিস্ময়। সংসার সম্পদ সুখ, এ সমস্ত পিছনে ফেলিয়া কেমন করিয়া এমন হাসিমুখে মৃত্যুর সঙ্গে মুখামুখি দাঁড়াইলেন তিনি? তাই তাঁহার আজও মনে হয়, গোপন অন্তরে বোধ করি কৃষ্ণভামিনী মরিতে চাহিতেন। তাঁহাকে হয়তো সে—। কিন্তু সে কথা শ্যামাদাস মনে মনেও উচ্চারণ করিতে পারিলেন না।

রাত্রি বারোটায় কৃষ্ণভামিনীর মৃত্যু হইয়াছিল। সন্ধ্যা হইতেই নাড়ী কাটিতেছিল; ডাক্তার ইন্‌জেক্‌শন দিলেন, শ্যামাদাস নিজে কৃষ্ণভামিনীর হাতখানি হাতে লইয়া বসিয়া ছিলেন। অনুভব করিতেছিলেন, আঙুলের অগ্রভাগগুলি ক্রমশ হিম হইয়া আসিতেছে।

কৃষ্ণভামিনী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, পারলে না? বাঁচাতে পারলে না?

বিবর্ণমুখে শ্যামাদাস বসিয়া ছিলেন, হাস্যমুখী কৃষ্ণার এ করুণ প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন নাই।

মরতে আমার ইচ্ছে ছিল না, তোমাকে রেখে বৈকুণ্ঠে গিয়েও তো আমার শান্তি নেই। কিন্তু কি করব বল?

এবার শ্যামাদাস আত্মসম্বরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, বেশি কথা ব'লো না। কি বাজে বকছ!

বাজে? হাসিয়া কৃষ্ণভামিনী বলিয়াছিলেন, না, বাজে নয়। আমি বুঝতে পারছি।

কেন? কি হয়েছে তোমার?

কি হবে আর? খুব ভাল লাগছে।

সে তো ভাল। ঘুমোও দেখি একটু।

না। তোমার সঙ্গে কথা ব'লে নিই। তোমার কাজ সেরে যেতে কত দেরি, তা তো জানি না। কতদিন তোমার সঙ্গে কথা বলতে পাব না!

শ্যামাদাস অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

না, তুমি এমন ক'রে থেকো না। তোমার মত জ্ঞানী লোক—ছি! আবার তো দেখা হবে দুজনে। নাও, তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে আমার মাথায় দাও। সিঁদুর-কৌটো থেকে সিঁদুর নিয়ে পরিয়ে দাও।

তারপর বলিয়াছিলেন, ছোট বউ কই, ছোট বউ? ডাক, তাকে ডাক।

সদ্যবিধবা দুর্গাদাসের স্ত্রী কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই বলিয়াছিলেন, আমি তো যাচ্ছি ছোট বউ, ঠাকুরপো সেখানে আছেন; বল, আমায় ব'লে দে, তোর কি বলবার আছে ব'লে দে।

মৃত্যুর পঁচিশ মিনিট পূর্ব্বে বোধ হয় বিকার অথবা চিত্তবিভ্রম ঘটিয়াছিল।

অকস্মাৎ কৃষ্ণভামিনী বলিয়াছিলেন, ছোট বউ, ছোট বউ, স'রে দাঁড়া, দরজা থেকে স'রে দাঁড়া। আসতে দে।

বাহিরে কেহ ছিল না। শ্যামাদাস ডাকিয়াছিলেন, কৃষ্ণা! কৃষ্ণভামিনী!

ঠাকুর এসেছেন, ঠাকরুণ এসেছেন, মা এসেছেন, বাবা এসেছেন, ছোট বউকে দরজা থেকে স'রে দাঁড়াতে বল।

কি বলছ তুমি?

হাসিয়া কৃষ্ণভামিনী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়াছিলেন, ভুল বকি নি আমি। আমিও আসব তোমাকে নিতে। দেখো তুমি, ঠিক আসব।

* * *

চিত্তবিভ্রম? হাঁ, চিত্তবিভ্রমই। চিত্তবিভ্রম, দৃষ্টিবিভ্রম।

বার বার আপনাকেই কয়দিন ধরিয়া শ্যামদাস ওই প্রশ্ন করিলেন, নিজেই ওই উত্তর দিলেন। চিত্তবিভ্রম ঘটে। মৃত্যুর পূর্ব্বে ওটা একটা লক্ষণ। মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের দ্বন্দ্বে জীবনের ক্ষয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে বহু কোটি বৎসরের বিবর্ত্তন-পথে জীবনের সাধনার সঞ্চয় একে একে ক্ষয় হইয়া লয় হয়। একে একে চৈতন্য, বুদ্ধি, মন, ইচ্ছা, বোধশক্তি—সর্ব্ব অন্তর্লোক আচ্ছন্ন হইয়া আসে, বাহিরে শ্রীর উপরে পড়ে কালিমা,

শক্তির নিঃশেষে হয় ক্ষয়, পড়িয়া থাকে শুধু দেহ, অবয়ব তাহার মধ্যে পার্থিব উপাদান।

শ্যামাদাসের ঘুম আসিতেছিল।

একটা অতি ক্ষীণ সূক্ষ্ম কিছুর স্পর্শে মৃদু বেদনা অনুভব করিয়া তিনি জাগিয়া উঠিলেন। কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শীতের শেষরাত্রির কুয়াশাচ্ছন্ন চন্দ্রালোকের মধ্যে তাঁহার যেন ঘুম ভাঙিয়াছে। কিছুক্ষণ পর ভোর হইল। আলো ফুটিয়া উঠিতেছে। অস্পষ্ট শব্দ কানে আসিল। কোথায় দূরে কেহ কথা বলিতেছে।

কেমন আছেন?—দূর হইতে কে প্রশ্ন করিল।

চারিদিক চাহিয়া শ্যামাদাস দেখিলেন, পাশে দাঁড়াইয়া কেহ, ক্রমশ তাহাকে চিনিলেন, সে ডাক্তার। ক্রমে দৃষ্টিগোচর হইল, ডাক্তারের হাতে ইন্‌জেক্‌শন সিরিঞ্জ। ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, ইন্‌জেক্‌শন দেবেন?

ইন্‌জেক্‌শন দিয়েছি।

বারোটা বাজতে কত দেরি?—বিচিত্র হাসি হাসিয়া শ্যামাদাস প্রশ্ন করিলেন।

ডাক্তার সে কথার উত্তর দিলেন না, বলিলেন, কোন কষ্ট হচ্ছে আপনার?

কষ্ট? না। তবে—

কি বলুন?

কিছু না।—শ্যামদাস চোখ বন্ধ করিলেন।

স্তিমিত আচ্ছন্ন একাগ্রতার মধ্যে সমস্ত পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন শ্যামাদাসবাবু। একটা অসীম শূন্যতা। শীতের সন্ধ্যা বোধ হয় হইয়া আসিল। অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বলিলেন, সূর্য্যাস্ত হয়ে গেছে? চাঁদ ওঠে নি?

আবার বলিলেন, আকাশে তারা ফুটেছে ?

আবার কিছুক্ষণ পর বলিলেন, সে আসে নি ? সে ? সে ?

বলিতে বলিতেই তিনি যেন নীরব হইয়া গেলেন। আচ্ছন্ন হইয়া নিদ্রিতের মত পড়িয়া রহিলেন। ঘণ্টাখানেক পর চোখ মেলিয়া চাহিলেন, এবার যেন তিনি অনেকটা আচ্ছন্নতাবিমুক্ত, চারিদিক চাহিয়া বলিলেন, ডাক্তার ?

বলুন।—মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাক্তার উত্তর দিল।

আর দেরি নেই। কিন্তু—

বলুন।

কিন্তু সে কই ? সে ?

কে ?

সে।—শ্যামদাস ঘরের চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, বহুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া খোলা জানালার উজ্জ্বলতর আলোকাভাস অনুভব করিয়া বাহিরের পথে আকাশ অনুসন্ধান করিলেন, চারিদিকে শীতের রাত্রির কুয়াশা, চাঁদটাও যেন অস্তাচলশায়ী, কুয়াশার স্তর অবলম্বন করিয়া অন্ধকার আত্মপ্রকাশ করিতেছে। অতি ক্ষীণ হতাশ কণ্ঠে শ্যামাদাস বলিলেন, সে—সে এল না ? আসব বলেছিল, এল না ?

ডাক্তার বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া রহিলেন, আর কোন প্রশ্ন করিলেন না, উত্তরও দিলেন না।

তা হ'লে—?

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

নাথিং মোর ? আর নেই ? সে আর নেই ?

জরাজীর্ণ বৃদ্ধ মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল অধীর হইয়া উঠিলেন। শেষবারে একবার শুধু ডাকিলেন, মা !

স্থির দৃষ্টি, নিষ্পলক চোখ দুইটির চোখের পাতা ডাক্তার হাতের চাপ দিয়া নামাইয়া দিলেন। হাত দুইটি তুলিয়া দেখিলেন, দুই হাতের তালুতে দুই বিন্দু জল।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

খাদ্য-বিজ্ঞান

তর্কের চোটে আগুন ছুটিয়াছে, এমন সময় রামজয় খুড়ো ঠুকঠুক করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ললিত মাস্টার বলিল, তোরা এবার থাম বাপু, খুড়ো এসে গেছেন, মীমাংসা ক'রে দেবেন।

একজন তাড়াতাড়ি গিয়া ঘরের ভিতর হইতে একটা চেয়ার আনিয়া দিল। লাঠিটা চেয়ারের পিঠে আটকাইয়া দিয়া বসিতে বসিতে খুড়ো প্রশ্ন করিলেন, কথাটা কি ? তামাক আনতে ব'লে দে শিবকালী।

শিবু বলিল, সে বলতে হবে না, তোমায় আসতে দেখেই ব'লে পাঠিয়েছি। কথাটা কিছু নয়, খাবারের সঙ্গে মনের কোন সম্বন্ধ আছে কি না, মানুষের মেজাজটা তার আহারের অনুযায়ী হয় কি না—মানুষই হোক বা ইতর জীবই হোক, যেমন ধর—

খুড়ো বলিলেন, হয়, আবার হয়ও না, যেমন—

গোবিন্দ বলিল, ও রকম দু-তরফা রায় দিও না খুড়ো, ওইটি তোমার কেমন একটা রোগ।

খুড়ো বলিলেন, হয় না এইজন্যে বলছিলাম, তোরা যেমন লাগিয়েছিস দেখলাম, তাতে মনে হয়, সবাই এক-একটা বুনো মোষ জলখাবার ক'রে এসেছিস, কিন্তু তা তো করিস নি ! হয় এইজন্যে বলছিলাম, যত দিন দাঁত ছিল, পাঁঠাটা-আসটা খেতাম, হাঁকডাক ছিল, সবাই তাঁবেতে থাকত। ডিস্পেপ্‌সিয়া ধরেছে, মুগের ডাল বরাদ্দ, তোদের খুড়ীর নাকঝামটার কাছে দাঁড়াতে না পেরে গুটি গুটি স'রে পড়তে হ'ল।

ললিত মাস্টার বলিল, ওদিকে খুড়ী আবার তোমার ভাগেরটাও টানছে কিনা—

ছেলের দল একটু মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

তামাক আসিল। খুড়ো হুঁকাটা একবার টানিয়া দেখিলেন, জল খানিকটা ফেলিয়া দিয়া আবার কলিকাটি সযত্নে বসাইয়া দুইটা টান দিয়া বলিলেন, খাবারের সঙ্গে মেজাজের সম্বন্ধ আছে বইকি, কে বলছিস নেই?

শিবু বলিল, আমি বলছিলাম। বেশ, তা হ'লে দুর্ব্বাসা মুনি কি খেতেন বল?

গোবিন্দ বলিল, ফল খেতেন। তাহার পর হাত নাড়িয়া মুখটা একটু বিকৃত করিয়া বলিল, কিন্তু আজকালকার তোমা হেন শৌখিন বাবুদের মত ফলের আসল জিনিসটুকু বাদ দিয়ে শুধু নরম নরম শাঁসটুকুই খেতেন না। যেটা খেতেন, সেটার মধ্যে ভাইটামিনটুকু ষোল আনা বজায় থাকত। বাজে ব'কো না।

শিবু আর তাহার তরফের দুই-একজন 'রেখে দে তোর ভাইটামিন' বলিয়া উগ্রতরভাবে আরম্ভ করিতে যাইতেছিল। খুড়ো বলিলেন, তোরা থাম, দেবতা-ঋষিদের আর এসব আসরে টেনে এনে কাজ নেই। কি খেলে ওঁদের ওপর কি রকম প্রভাব হ'ত, আমাদের মাথায় ঢুকবে না। রমা তাঁতীকে দেখেছিস তো, সন্ধ্যের সময় ছটাকখানেক ধেনো চড়িয়ে এসে কি কাণ্ডটাই করে চোপর রাত!...দেবতারা অষ্টপ্রহর অমৃত গিলছেন, বেদই বল, রামায়ণই বল, মহাভারতই বল, কোনখানে কাউকে একটা বেফাঁস বলতে দেখেছিস? ওঁদের ছেড়ে দিয়ে যাদের বুঝব তাদের কথা ধরা যাক। আহারের সঙ্গে শরীরের মনের আছে সম্বন্ধ; আজকালকার সায়েন্সও বলছে, আগেকার ইতিহাস-কিম্বদন্তীও বলছে। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলার কথা জানিস সব?

শিবু গোঁজ হইয়া বসিয়া ছিল, বলিল, না, বাঙালীর ছেলে—কপালকুণ্ডলার কথা জেনে কাজ কি?

খুড়ো বলিলেন, গুমরের কথা নয়, কপালকুণ্ডলার তাবৎ ঘটনা কেউই জানে না। জানত এক বঙ্কিম, আর জানত বঙ্কিম যার কাছে শুনেছিল। বঙ্কিমও নেই, সেও নেই; এখন আর কেউ জানে না।

শিবু মুখটা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, তুমি জান নাকি?

খুড়ো বলিলেন, আমার জানা আমার ছোটঠাকুদ্দার কাছে। তিনি অবশ্য খোদ সেই লোকের কাছে শুনেছিলেন, যে বঙ্কিমকে বলে। আমি এতদিন আমল দিই নি কথাটায়, ছোটদাদু বললে তো বললে, শুনে গেলাম। তারপর এই সেদিন কোথায় একটা কার চিঠিতেই হোক বা কোন বইয়েই হোক, দেখলাম, বঙ্কিমের যখন মেদিনীপুরে পোষ্টিং, সেই সময় একজনের মুখে এক কাপালিকের গল্প সে শোনে, তাই থেকেই কপালকুণ্ডলার জন্ম। তখন মনে হ'ল, তবে তো ছোটদাদু কিছু খেলাপ বলে নি।

গোবিন্দ বলিল, তা বঙ্কিম কপালকুণ্ডলা লিখলে তো ওটুকু বাদ দিলে কেন? তুমি ঠিক একটি আজগুবি কিছু ছাড়বার যোগাড় করছ খুড়ো।

খুড়ো বলিলেন, যা পেয়েছিল, তার মধ্যে থেকে যেটুকু তার উপন্যাসের জন্যে দরকার, সেটুকু নিয়ে বাকিটুকু বাতিল ক'রে দিয়েছিল, রসিক লোক তো। গাছে আমায় পাকা আমটি দিলে, তাই ব'লে আমায় নির্ব্বিচারে আঁশ, আঁটি, খোসা সব পেটে পুরতে হবে?

শিবু গোবিন্দের পানে কটাক্ষ হানিয়া বলিল, ভাইটামিন আছে বলে?

গোবিন্দ মুখটি গোঁজ করিয়া লইল। খুড়ো তামাক টানিতে

লাগিলেন। ললিত মাস্টার বলিল, তা তোমার কপালকুণ্ডলার সেই অলিখিত অধ্যায়টা কি বলই না হয়, তুমি যে আবার দর বাড়াতে আরম্ভ করলে খুড়ো।

খুড়ো বলিলেন, সবই ওরা আজগুবি ব'লে উড়িয়ে দিতে চায় ব'লে খেলো হতে মন চায় না। অধ্যায়-টধ্যায় নয়, ওই যে বললাম, কপালকুণ্ডলার আসল ব্যাপারের সঙ্গে তার কোন সম্বন্ধ নেই, বঙ্কিমও তাই সে কথা তোলে নি। খাবারের সঙ্গে মনের সম্পর্কের কথাটা উঠল ব'লে আমার মনে প'ড়ে গেল পুরনো কথাটা, এ নিয়মের অত ভাল উদাহরণের কথা আমার আর জানা নেই কিনা। যে সময় কাপালিক-নবকুমারের দেখা হয়, কাপালিকের মনের অবস্থা তখন অত্যন্ত খারাপ। তার আশ্রমে ভয়ানক একটা অনাচার ঢুকেছে, কাপালিক টের পেয়েছে এর ফল ভাল নয়, তার এত দিনের সাধনা ঠিক যখন সিদ্ধির মুখে, বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল। তার মনের অবস্থা ঠিক পাগলের মত। কিসে দোষটা কাটিয়ে উঠবে, তাড়াতাড়ি সেই ফিকিরে সে ছুটোছুটি করছে, এমন সময় নবকুমার এসে পড়ল হাতের কাছে। কাপালিক ভাবলে, যাক, বোধ হয় দেবী সদয় হলেন, যা খুঁজছিলাম পাওয়া গেল বোধ হয়। নবকুমারকে প্রশ্ন করলে, কস্তম্ জাত্যা? শাক্ত বৈষ্ণবো বা? অর্থাৎ তুমি জাতিতে শাক্ত না বৈষ্ণব? নবকুমার উত্তর করলে, শাক্তোঽহম্। তখন আদেশ হ'ল, অনুগচ্ছস্ব, অর্থাৎ পেছনে পেছনে এস। না যদি নবকুমার বলে কথাটা, অত কাণ্ড হয় না। গেরো আর কাকে বলে! দেখলে, লোকটা রক্তাম্বর-পরা কাপালিক; ভাবলে, শাক্ত কি আর শাক্তের অনিষ্ট করবে? এই পরিচয়ই দিই। ভেতরে যে এদিকে কি কাণ্ড হয়েছে, কাপালিক যে একটা আঁটো-সাঁটো নধরকান্তি শাক্তই খুঁজে বেড়াচ্ছে, তা তো আর জানত না বেচারী। বললে, শাক্তোঽহম্।...অনুগচ্ছস্ব...বেশ, চল।

শিবু বলিল, কপালকুণ্ডলায় তো এ ধরনের কথাবার্ত্তা নেই খুড়ো।

খুড়ো উত্তর করিলেন, কিন্তু হয়েছিল এই ধরনেরই কথাবার্ত্তা। সবটা শোন, তা হ'লেই বুঝতে পারবে।...নবকুমার পেছনে পেছনে এসে দেখলে, যা ভেবেছিল তাই বটে, শ্মশানকালীর বেদী, পূজোর চারিদিকে বীরোপচার, আসনের পাশেই কারণপূর্ণ নরকপাল, সবই যা ভেবেছিল। তবে একটা ব্যাপার দেখে সে একেবারে হকচকিয়ে গেল। দেখলে, আসন থেকে অল্প একটু দূরে এক প্রায় বারো-তেরো হাতের বাঘ। কাপালিক বুঝেছিল, ভয় পেয়ে যাবে; বললে, নিঃশঙ্কো অনুসরস্ব। প্রথমটা ভয়ই পেয়েছিল—তুমিও পেতে, আমিও পেতাম, কিন্তু একটু কাছে আসতে ভয় গিয়ে তার জায়গায় ভয়ানক আশ্চর্য্য ভাব এসে পড়ল নবকুমারের মনে; বাঘই—জলজ্যান্ত, তেরো হাতের একটি চুল কম নয়; কিন্তু এ কি, সে চাউনিই বা কোথায়? সে গোঁফ-ফোলানোই বা কোথায়? সে গর্জ্জনই বা কোথায়? কাপালিক আসতে একবার চোখ তুলে চাইলে—সে চাউনি হরিণের চোখকেও হার মানায়; কুঁইকুঁই ক'রে দুবার আওয়াজ করলে—যেন কুকুরবাচ্চা মাই খাবার জন্যে ধাড়ীর পেছন নিয়েছে। তারপর আরও দু পা এগুতে যা দেখলে, তাতে তার যাও একটু বুদ্ধি ছিল লোপ পাবার দাখিল হ'ল। দেখলে, বাঘের মুখটি দুটি থাবার ওপর রাখা, আর একটি থাবায় একটা বেশ মোটা তুলসী-কাঠের মালা জড়ানো।

সকলে একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, খুড়ো! ললিত মাস্টার বলিল, আজকালকার কচি ছেলের কাছেও এমন গাঁজাখুরি বের করা চলে না খুড়ো।

খুড়ো বলিলেন, তা হ'লে থাক, করব না বের। একটু কাজও আছে আবার দরকারী।—বলিয়া লাঠিটা লইয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেই

শিবু লাঠিটা ধরিয়া ফেলিল। বলিল, চা করতে বলেছি খুড়ো, তোমার নাম করা চা খেয়ে কে পাপের ভাগী হবে বল?

খুড়ো বসিয়া ধীরে ধীরে তামাক টানিতে লাগিলেন। আগ্রহে সবাই মরিয়া যাইতেছিল, কিন্তু কচি ছেলেরও অধম হইবার ভয়ে কেহ আর সেটা প্রকাশ করিবার সাহস করিতেছে না। অবশেষে গোবিন্দ বলিল, গাঁজাখুরি-টাজাখুরি বুঝি না, আমার আবার আধকপালে রোগ আছে, শেষ কর খুড়ো, যখন ফেঁদেছ; ওষুধ-গেলা ক'রেও আমায় শুনতে হবে।

শিবু বলিল, না খুড়ো, তুমি বল, আমি মন্ত্রশক্তি বিশ্বাস করি, তা ছাড়া মন্ত্রশক্তি না থাক, উইল-পাওয়ার আছে, হিপ্‌নটিজ্‌ম আছে, মেস্‌মেরিজ্‌ম আছে—

অপর কে একজন বলিল, আর এ তো অ্যাফ্রিকার সোমালিল্যাণ্ডের জঙ্গলের কথা হচ্ছে না, হচ্ছে ভারতের এক তপোবনের কথা—কাপালিকেরই হোক বা বৈষ্ণবেরই হোক, তাতে যায় আসে না।

শিবু একটু অধৈর্য্যভাবে খুড়োকে আগাইয়া দিল, দেখলে, থাবায় একটা মোটা তুলসী-কাঠের মালা জড়ানো। তারপরে? গিয়ে নিশ্চয় থাবা ছুঁয়ে একটা প্রণাম করলে?

চা আসিল। যে আনিয়াছিল, তাহারই হাতে হুঁকাটা দিয়া খুড়া চা-টা শেষ করিলেন, তাহার পর আবার গোঁফজোড়াটা মুছিয়া হুঁকাটি লইয়া বলিলেন, অথচ একটা দিন আগে পৌঁছুলে নবকুমার বাঘের চেহারা দেখত বিলকুল অন্য রকম। গর্জ্জনের চোটে আশ্রমের ত্রিসীমানার মধ্যে আসে কার সাধ্যি! অষ্টপ্রহর দৌড়োদৌড়ি, লাফালাফি; এক্ষুনি এ জানোয়ারটাকে তাড়া ক'রে নিয়ে গেল তো, একটু পরেই একটা

অন্য জানোয়ার মেরে ঘাড়ে ক'রে নিয়ে হাজির। দিন নেই, রাত্তির নেই, এক ভাব, আশ্রমে কান পাতবার জো নেই।

শিবু বলিল, আমি ভেবেছিলাম ওই রকম একটা কিছু। আফিঙের দলাটলা খাইয়েছিল তো কাপালিক? কিন্তু খুড়ো, আমাদের কথা হচ্ছিল খাবার নিয়ে, খাবার আর নেশার মধ্যে যে বিস্তর তফাত আছে, এটা—

খুড়ো বলিলেন, তোরা বাগড়া দিস নি বাপু পদে পদে, বাঘের অমন নিরীহ অবস্থা দেখেই ব'লে কাপালিকের ঘুম ছুটে গেছে কোন অনাচার-টনাচার হয়েছে ভেবে, সে আবার তার ওপর আফিং খাওয়াতে যাবে! সেসব কিছু নয়, কাপালিক যে বাঘের ধকলটা কেন সহ্য করত, আর বাঘ ও রকম মিইয়ে যেতে কেনই বা নার্ভাস হয়ে উঠল, সেটা জানতে হ'লে তন্ত্রবাদের গোড়ার কথাটা বোঝা দরকার। তোরা বুঝিস না সুঝিস না, তান্ত্রিক দেখলেই মুখ ফেরাস, মনে করিস, সব পঞ্চমকার আঁকড়ে ব'সে আছে। আসলে কিন্তু তা নয়, পঞ্চমকার ত্যাগ করবার জন্যেই ওদের সাধনা। ওদের কথা হচ্ছে—দুর্ব্বলতাকে পায়ে মাড়িয়ে শক্তিকে লাভ করতে হয়, দুর্ব্বলতাকে এড়িয়ে শক্তিকে লাভ করা চলে না। পায়ে মাড়াও, সেগুলো তোমার চরণের দাস হয়ে থাকবে। এড়িয়ে যাও, বাঘের পেছনে ফেউয়ের মত তোমার পিছু নিয়ে তোমায় উত্তম-কুত্তম ক'রে মারবে। মানুষের সবচেয়ে বড় রিপু, যা আদি রিপু, কারণ-বারি ইত্যাদি সব রকম আনুষঙ্গিক জুটিয়ে দেহ-মনকে সব রকমে সেই রিপুর অনুকূল ক'রে নিয়ে ওরা সেই রিপুর সামনাসামনি হয়, তারপর আত্মাশক্তির পায়ে মনকে সমর্পণ ক'রে ওরা সেই রিপুকে, সঙ্গে সঙ্গে তার সাঙ্গোপাঙ্গ সব রিপুগুলোকেই জয় করে। এই হ'ল তন্ত্রসাধনা, এই হ'ল আত্মাশক্তির বেদীতে পশুবলি, এ বলি না পেলে তিনি ধরা দেন না। শুঁটকো শুঁটকো ছাগলগুলোকে প্রতিমার সামনে

ঝপাঝপ কোপ মেরে মদের চাট করলেই সে তন্ত্রসাধনা হ'ল, তা নয়। যাক; দুর্ব্বলতার কথা হচ্ছিল,—ছটা রিপুর ওপরেও আবার কতকগুলো দুর্ব্বলতা আছে মানুষের, একটা দুর্ব্বলতা হচ্ছে ভয়, দয়াও আবার একটা দুর্ব্বলতা। এটা ললিত মাস্টার বুঝবে, দয়া ক'রে যদি রোজ পিটতে পিটতে ছেলেগুলোকে বেঞ্চির নীচে গড়াগড়ি না দেওয়ায় তো বড় হয়ে—

ললিত মাস্টার বলিল, বাস্, একটু যদি কুটুস ক'রে কামড় দেবার সুবিধে পেলে তো—

খুড়ো বলিলেন, একটা উদাহরণ দিলে বোঝে ভাল। কি বলছিলাম, হ্যাঁ, ভয়ের কথা। ভয়ের যে এই উৎকট আয়োজন, একটা গোটা বেঙ্গল টাইগার আশ্রমটার মাঝে দাপাদাপি ক'রে বেড়াচ্ছে, সাধনার একটু ব্যতিক্রম হ'লেই ঘাড়টি মটকাবে, কাপালিকের পক্ষে ছিল এটাও একটা সাধনার অঙ্গ। বাঘের এই দাপটের মধ্যে মনকে ঠিক রেখে সাধনমার্গে সে আর এক ধাপ উঠে যেতে চাইছিল। এমন সময় ওই ব্যাপারটুকু হ'ল, ওতে বাল্মীকি ঋষি খুশি হতেন আর একটি বাঘ আশ্রমধর্ম্মে কন্‌ভার্টেড হ'ল মনে ক'রে; কিন্তু কাপালিক হ'ল না।

যেদিনকার কথা, সেদিন তিথিটা অমাবস্যা, তায় শনিবার, তন্ত্রশাস্ত্র-মতে একটা দুর্লভ যোগ। সন্ধ্যে থেকে আকাশ ঘেরে মেঘ ক'রে এসেছে, উপচার-টুপচার সব ঠিক ক'রে কাপালিক যখন আসনে বসল, অল্প অল্প ক'রে বেশ জোরে বর্ষা নামল। তোমাদের মত নিরীহ ভাল-মানুষদের পক্ষে যেমন পূর্ণিমা-রাত মলয়-হাওয়া, তান্ত্রিকদের পক্ষে সেই রকম অমাবস্যা, শনিবার, আর এই রকম দুর্যোগ—পেলে মেতে ওঠে একেবারে। তার ওপর আবার বছরের ওই সময়টা সোঁদরবনের কাপালিকদের একটা মরসুম। যত আনাড়ি সব দেশ-বিদেশ থেকে

সঙ্গমস্নান করতে আসে, একটু যদি দল ছেড়ে ছিটকে পড়ল তো নির্ঘাত ওদের কারুর না কারুর হাতে। কাপালিকের কপালে সেবার দুটো জুটে গেছল, পরে নবকুমার নিয়ে তিনটে। দিন তিনেক আগে একটাকে বলি দিয়েছিল। একটা জীয়নো আছে, চমৎকার যোগ, কাপালিক ঠিক করছে, আজ এটিকে উচ্ছুগ্‌গু করবে। আর এমন একটা রাতে দেবীর পায়ে উচ্ছুগ্‌গু করবার জিনিসও বটে। এই দীর্ঘ গৌরকান্তি চেহারা, সাত্ত্বিক মানুষ, শরীর থেকে পুণ্যের জ্যোতি যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে, শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান, আর অত তেজেও চক্ষু দুটি করুণায় ভরা। কাপালিক যখন ছলনা ক'রে নিয়ে এল, একটু চাঞ্চল্য নেই মনে। শুধু জিজ্ঞেস করলে, বামাচারী কৌলোঽসি? কাপালিক উত্তর দিলে, এবমেব।...অস্তু, শাস্ত্র বিচারং যাচ্‌ঞামি। তার মানে—বেশ, তর্কে আমায় পরাস্ত কর, তারপর তোমার যেমন অভিরুচি ক'রো, আপত্তি নেই। কথাটা সে রোখ দেখিয়ে বললে, তা নয়। সে যুগের ওটা রেওয়াজই ছিল,—বিদ্যের গুমর ছিল মানুষের; শাস্ত্র-বিচারে হারা মানেই মরা, তারপর তুমি যা কর। কাপালিক কোণঠাসা হয়ে চ'টে উঠল, বললে, অসার তর্ক আমার অস্ত্র নয়, আমার যা অস্ত্র তার পরিচয় তুমি যথাসময়েই পাবে, ততক্ষণ ধৈর্য্য ধ'রে থাক। ব'লে পিঠমোড়া ক'রে বাঁধতে যাবে, ব্রাহ্মণ শান্তভাবে হেসে বললে, আমায় বাঁধবার কোনই দরকার নেই। আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, তৃণাদপি তুচ্ছ, আমার এই নশ্বর শরীরের দ্বারা তোমার দেবীর যদি সন্তোষ-বিধান হয় তো স্বচ্ছন্দেই এবং সানন্দেই তা অর্পণ করব। বন্ধন নিতান্ত কর, তাতেও রাজি আছি, কিন্তু তার কোন প্রয়োজন নেই; চল, তোমার পূজার পাশে, তোমার দেবীর বেদীমূলে আমি গিয়ে বসছি। এ যত ঠাণ্ডা করতে চায়, কাপালিক ততই গরম

হয়ে ওঠে—পুজোই বল, যাই বল, আসলে খুনের নেশায় রক্ত মাথায় উঠেছে তো। বললে, ব্রাহ্মণ, তুমি অতি প্রগল্‌ভ, তোমার পরিচয় দাও। ব্রাহ্মণ সেই রকম শান্তভাবেই বললে, কি করবে পরিচয় নিয়ে? মানুষ সৃষ্টির মধ্যে এতই নগণ্য যে, তার ঐহিক মর্য্যাদা আকাশচুম্বী হ'লেও সে তৃণের চেয়েও সুনীচ, আমি অমুক জায়গার মঠধারী, ভগবানের সামান্যর চেয়েও সামান্য যে সেবক, তার আমি দাসানুদাস। ও যত নীচু হচ্ছে, এ ততই যাচ্ছে খেপে, খানিকক্ষণ পরে বললে, ওসব ধাপ্পাবাজি চলবে না। তোমার দিকে আমার মন প'ড়ে থাকবে, আমি দেবীর চরণে মন বসাতে পারব না; অথবা যদি পারিই, দেবীর অনুগ্রহ হয়, তুমি আমার সেই সমাধিস্থ অবস্থার সুযোগ নিয়ে চম্পট দেবে;—অকৌলং নাতি বিশ্বসেৎ—যারা অতান্ত্রিক তাদের বেশি বিশ্বাস করা শাস্ত্রসম্মত নয়। তোমার ভীরু কাতর দৃষ্টিতে শক্তির পূজায় ব্যাঘাত হতে পারে, তাই তোমায় বদ্ধ অবস্থায় এইখানেই ফেলে রাখছি; রজনীর তৃতীয় যামে আজ দেবী বলিদান গ্রহণ করবেন, সেই সময় তোমায় নিয়ে যাব, মনকে তুমি প্রস্তুত ক'রে রাখ। কিঞ্চিৎ আহার্য্য চাও? মঠধারীর একটুও রাগ নেই, একটু দ্বেষ নেই, একটুও হিংসে নেই, বললে, তোমার দাসানুদাসের প্রতি করুণাপরবশ হয়ে যদি দাও, আপত্তি নেই; আহার্য্যের আস্বাদনের জন্যে বলছি না, তোমায় আধার ক'রে গোবিন্দ যে করুণা বিতরণ করছেন, সেইটুকুর জন্যে বলছি, নিয়ে এস।

বলে—চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। কাপালিক ওসব কথায় কান দেবে কেন? ওর পক্ষে সবই তো ভেঁপোমি। তা ছাড়া পূজোর সময়ও হয়ে আসছিল, আর মেলা বাক্যব্যয় না ক'রে মঠধারীকে পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে ফেললে, তারপর একটা বেশ বড় সরা ক'রে এক সরা ফল

কেটে সামনে রেখে বললে, চতুষ্পদের মত শুধু মুখের সাহায্যেই এগুলি ভক্ষণ করবে। আর একটা কথা, এই পুণ্য শক্তি-আশ্রমের প্রহরী এক ব্যাঘ্র। সে একটু কানন-বিহারে গেছে, এল ব'লে। সাবধান, পালাবার চেষ্টা ক'রো না। এস, বরং আরও দু-এক পাক ক'ষে দিই। মঠধারী বললে, অস্থি, মেদ, অন্ত্রের শত পাক দিয়ে শরীর আত্মাকে বেঁধে রাখতে পারে না, রজ্জুর শত পাক দিয়ে আপনি এই নশ্বর শরীরকে কতক্ষণ বেঁধে রাখবেন? কাপালিক রেগে কটমটিয়ে একবার মঠধারীর দিকে চাইলে। জিজ্ঞেস করলে, এ রহস্যের অর্থ? ঠিক এই সময় আশ্রম কাঁপিয়ে বাঘটা লাফিয়ে এসে পড়ল। কাপালিক কড়া চোখ মঠধারীর ওপর ফেলে বললে, সাবধান, আমি চললাম, ওই তোমার প্রহরী সমাগত।...শিবু, কলকেটাতে আর কিছু নেই, আর একবার সেজে দিয়ে যেতে বল।

শিবকালী বলিল, তুমি থেমো না খুড়ো, বাঘটাকে ঠিক জায়গায় এনে ফেলে—এও তোমার একটি রোগ। আমি অলরেডি আর একটা কলকে ভর্ত্তি করতে ইশারা ক'রে দিয়েছি, এল ব'লে।

খুড়ো বলিলেন, গোড়াতেই বলেছি, কাপালিক সে রাত্তিরে খুব তোড়জোড় ক'রে পূজোয় বসল। আসনেও বসল আর ওদিকে বৃষ্টিও নামল। সোঁদরবনের গভীর জঙ্গল, অমাবস্যার রাত, শনিবার, তায় আকাশে ওই রকম দুর্য্যোগ, তার ওপর দেবীর পূজোর সবচেয়ে বড় উপচার নরবলি। সিদ্ধি হাতের মুঠোর মধ্যে। কাপালিক প্রাণ ঢেলে দিলে পূজোর মধ্যে। যোগাযোগের মধ্যে যদি কিছু বাকি ছিল তো সেটা পুরো ক'রে দিলে বাঘটা। সে রাত্রে কি তার লম্ফঝম্ফ! কি গর্জ্জন! দুদিন আগে যে মানুষটাকে বলি দেওয়া হয়েছিল, সেটাকে গিলে ম্যান-ইটার হয়ে গেছে কিনা, একটা নেশা চ'ড়ে গেছে মানুষের

জন্যে, একেবারে হন্যে হয়ে উঠেছে। তারপর এসে দেখে, আর একটা হাজির। বন তো সে তোলপাড় ক'রে ফেলতে লাগল।

এত সুযোগ, এদিকে কিন্তু এক কাণ্ড হচ্ছে, কাপালিক কোন-মতেই পূজোতে মন বসাতে পারছে না। যতই চেষ্টা করছে, কারণের ওপর কারণ চড়িয়ে মনটাকে টেনে রাখতে চেষ্টা করছে, মনটা ততই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। রাত্রি তৃতীয় যাম যখন হয়ে গেছে, বলি দেবার সময়, কাপালিকের তখনও পূজোর গোড়ার অঙ্গগুলিই শেষ হয় নি। এমন বিঘ্ন হ'লে তান্ত্রিকদের যা হয়, সব বিভীষিকাগুলো—শনিবার, অমাবস্যা, দুর্যোগ, বাঘের গর্জ্জানি, ওদিকে বলিপ্রার্থী দেবীর সাঙ্গোপাঙ্গ সব ডাকিনী-যোগিনী কারণের নেশায় সব চতুর্গুণ ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠছে তার মনশ্চক্ষুর সামনে। ভয়ে তার মন্ত্রে ভুল হয়ে যাচ্ছে, পদ্ধতিতে গোলমাল হচ্ছে, মাথা ক্রমেই যাচ্ছে গুলিয়ে, আর যতই গুলিয়ে যাচ্ছে, ততই সে সেটাকে এক্তিয়ারে আনবার জন্যে কারণের ওপর কারণ চাপাচ্ছে। এই করতে করতে এক সময় আর নিজেকে সামলাতে পারলে না, চরম নেশার উত্তেজনার পরই ঝিমিয়ে আসনে গড়িয়ে পড়ল।

যখন চোখ খুলল, তখন অনেকটা বেলা হয়েছে। প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলে না, কোথায় আছে, কি বৃত্তান্ত, কিছুই না। তারপর আস্তে আস্তে জ্ঞান হ'ল। পূজোর সরঞ্জাম যেমন তেমনই প'ড়ে আছে, শুধু কারণের পাত্র একেবারে শূন্য। আস্তে আস্তে রাত্তিরের সব কথা মনে ফিরে এল—মঠধারী, তার সঙ্গে তর্ক, পূজোয় বিঘ্ন, বাঘের অতিরিক্ত দৌরাত্ম্যি। বাঘের কথা মনে হতেই তার খেয়াল হ'ল, কই, বাঘের শব্দ তো একেবারেই নেই! কাপালিক আসন ছেড়ে উঠে রাত্তিরে যেখানে মঠধারীকে বেঁধে ফেলে রেখেছিল, সেইখানে এল।

...চক্ষু চড়কগাছ—নো মঠধারী। কাকস্য পরিবেদনা! প্রথমটা ভাবলে, বাঘে সাবড়ে দিয়েছে। কিন্তু বাঘ তো তা করবে না। এর আগের বলি তিন দিন ওই বাঘের হেফাজতে ছিল, গায়ে আঁচড়টি পর্য্যন্ত দেয় নি; সেই থেকেই কাপালিক বুঝেছে, বাঘের মধ্যে রক্ষিকা-ডাকিনী কাজ করছে, সে দেবীর বলি চেনে। কিন্তু বাঘই বা কোথায়? খোঁজ, খোঁজ; শেষে পাওয়া গেল বাঘকে। আশ্রমের এক পাশ দিয়ে একটা কালো জলের সুঁতি ব'য়ে গেছে, তার ধারেই একটা তমালগাছ। সেই গাছের তলায় দুটি থাবার ওপর মুখ রেখে বাঘ চুপ ক'রে প'ড়ে আছে, ডান থাবায় একটি মোটা তুলসী-কাঠের মালা জড়ানো, পরম ভক্তিভরে জিব দিয়ে আস্তে আস্তে সেটা চাটছে। আর সেই যে ফলের সরাটা মঠধারীকে দেওয়া হয়েছিল, সেটা বাঘের বাঁ থাবার নীচে, কয়েক টুকরো ফল তখনও প'ড়ে রয়েছে সরায়। পূজো দিলে ফলে সন্দেশে যেমন সিঁদুর লেগে থাকে, সেই রকম সিঁদুরের দাগ ফলে সরায় লেগে রয়েছে।

কাপালিক একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। বুঝলে, এ সেই কপটাচারী মঠধারী বাবাজীর কাজ। যখন সে বললে, বন্ধনের দ্বারা তার নশ্বর শরীরকে আবদ্ধ রাখা যাবে না, তখনই কাপালিকের সন্দেহ হয়েছিল—সে যাদুবিদ্যা জানে, তারই বলে সে নিজেকে মুক্ত করেছে, তারপর বাঘটাকে মন্ত্রপূত ফল খাইয়ে নির্বীর্য্য ক'রে দিয়ে সটকে পড়েছে। কাপালিক বাঘটার সামনে এসে বললে, উত্তিষ্ঠ। আমাদের পোষা কুকুরে যেমন দু-একটা কথা বোঝে, বাঘটাও কাপালিকের সেই রকম দু-একটা কথা বুঝত, মেনেও চলত। এবারে কিন্তু 'উত্তিষ্ঠ' বলতে আরও নীচু হয়ে কুঁইকুঁই ক'রে পায়ের কাছে মুখ দিয়ে গড়িয়ে, ল্যাজ নেড়ে একশা ক'রে দিলে। কাপালিক ঘেন্নায় পিঠে দুটো লাথি বসিয়ে গেল মঠধারীর খোঁজে, মন্দিরে গিয়ে বলির খাঁড়াটা হাতে ক'রে নিয়ে এল।

তন্নতন্ন ক'রে খুঁজলে সমস্ত দুপুর—দেবভাষায় যতটা গালাগাল দেওয়া চলে—ভণ্ড, কপটাচারী, কাপুরুষ, যদি কিছুমাত্র মর্য্যাদা জ্ঞান থাকে তো অবিলম্বে সম্মুখীন হবি, তুই সিংহকে কুকুরে পরিণত করেছিস, আয় এক্ষণে তোকেও আমি কুকুরের মতই বধ করব।

কার আসতে ব'য়ে গেছে?

খুড়ো একটু বেদম হবার জন্যই হোক বা যে জন্যই হোক, চুপ করিয়া হুঁকায় মন দিলেন।

শিবু বলিল, এও প্রায় তোমার সেই আফিং খাওয়ানোর মতনই হ'ল খুড়ো। ফল মন্ত্রপূত ক'রে খাওয়ালে বাঘ ভেড়া হয়ে গেল, এতে স্বাভাবিক খাবারের সঙ্গে স্বাভাবিক মনের সম্বন্ধ—

খুড়ো হুঁকায় একটা সুখটান দিয়া বলিলেন, শেষে একটেরেয় একটা খালের ধারে মঠধারীর সন্ধান পাওয়া গেল। সমস্ত জায়গাটা রক্তে মাখামাখি, আর গোটাকতক টাটকা হাড় এদিক ওদিক ছড়ানো রয়েছে। কাপালিক থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বাঘটাকে আবার বাঘ ক'রে ফেলবার বিস্তর চেষ্টা করলে, তুকতাক, পূজো, মানসিক—উঁহুঃ, সে মঠধারী বৈষ্ণবের মাংস খেয়েছে—পঞ্চাশ বছরের একটা পাকা বৈষ্ণব, আর কখনও হিংসের দিকে যেতে পারে সে? আর সে লম্ফঝম্ফ দিতে পারে? আর সে উৎকট হুঙ্কার তার আসে?

অনেক ভেবে চিন্তে কাপালিক বেরুল একটা শাক্ত বলির খোঁজে। নবকুমারকে পেলে, পেয়েই জিজ্ঞাসা করলে, কস্তম্? শাক্ত বৈষ্ণবো বা? ...আর একবার চা দিতে বল, গলা শানিয়ে তবে তোদের খুড়ীর দিকে এগুতে হবে।

খানিকক্ষণ চুপচাপের পর ললিত মাস্টার বলিল, খুড়ো, আজ তুমি চরম ক'রে দিলে বাবা, একেবারে মালা জপিয়ে পর্য্যন্ত ছাড়লে—

খুড়ো বিস্মিত হইয়া বলিলেন, বাঃ, তা আবার কখন বললাম? তোমরা যদি ধ'রে নাও—! ঘাড় মটকে খাবার সময় মালাটা কি ক'রে থাবায় জড়িয়ে গিয়ে থাকবে। অনেক সঙ্গতিপন্ন বৈষ্ণবেরা তখন আবার সোনায় তার ক'রে মালা গাঁথত, ছিঁড়তে পায় নি। রক্ত লেগেছিল, চাটছিল। নাঃ, তোমাদের কাছে গল্প ক'রে সুখ নেই, নিজেই কালিদাস হব, আবার নিজেই মল্লিনাথ হতে হবে?

এর পর সরার সিঁদুর মাখানো ফলের কথাটা কেহ আর তুলিতে সাহস করিল না।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

আমরা

মস্ত মস্ত জায়গা যত ভরাট করা সহজ কত
মস্ত মস্ত লোকের মত হাত-পা যদি ছড়িয়ে থাকি;
কুঁড়ে-ঘরে আমরা থাকি সাড়ে তিন হাত জায়গা ঢাকি
যা জোটে সব সেথায় রাখি ভরাট করি জায়গা যত।
সেইটুকুতে দিলে নজর আমরা যদি দেখাই ওজর
লাথির চোটে ভাঙে পাঁজর মস্ত মস্ত লোকের লাথি।
মস্ত মস্ত লোকের লাথি দেশ জুড়ে হয় মাতামাতি
এবং দমে-মোদের ছাতি, সে দিকে কেউ দেয় না নজর।
সাড়ে তিন হাত জায়গা নিয়ে অনেক কষ্টে জান বাঁচিয়ে
মস্ত মস্ত জায়গা দিয়ে মস্ত মস্ত লোকের হাতে,
মস্ত মস্ত লোকের হাতে রেলে কলে কারখানাতে
জীবন দিয়ে দি শেষটাতে সাড়ে তিন হাত জায়গা নিয়ে।

আধুনিকা

মেয়েটি সত্যই আধুনিকা।
ভাব-ভঙ্গিতে চাল-চলনেই নয় কেবল,
মনে প্রাণেও।
পোশাক-পরিচ্ছদে পছন্দ করে না
বিদেশী নকলের সস্তা চাকচিক্য,
অপরের মনে ঈর্ষা উদ্রেক ক'রে
গয়না-কাপড় ঝকমকিয়ে বেড়ায় না কখনও,
যখন-তখন যেখানে-সেখানে
নিজের বিদ্যাবুদ্ধি জাহির ক'রে
আসর জমাবার প্রবৃত্তিও নেই।
[illegible]ল দিয়ে কথা বলে না,
এমন কি
ইংরেজীতে প্রথম শ্রেণীর অনার্স পেয়েছে যে সে,
তা বোঝবার উপায় নেই,
ইংরেজী বুকনি মুখ দিয়ে বেরোয় না কখনও।
যেসব জিনিস থাকলে
অহঙ্কারে মটমট করা স্বাভাবিক,
সেসব জিনিস থাকা সত্ত্বেও
তার অহঙ্কার নেই।
বরং তার সঙ্কোচ হয়।
মনে হয়, এগুলো বাধা।
বিদ্যা, বুদ্ধি, রুচি, ঐশ্বর্য্য
চারটে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর যেন
আড়াল ক'রে রেখেছে তাকে,
বঞ্চিত করেছে আর পাঁচজনের সঙ্গ থেকে।
সত্যিই লজ্জা করে তার।

এই লজ্জা জিনিসটা তার মজ্জাগত
বাইরে প্রকাশ নেই।
আপাত দৃষ্টিতে তাকে নির্লজ্জ ব'লেই মনে হয়।
জিব কেটে
ঘাড় হেঁট ক'রে
মুচকি হেসে
লাল হয়ে
ঘোমটা টেনে
লজ্জা বস্তুটাকে নয়নলোভন দৃশ্য ক'রে তুলতে
আরও বেশি লজ্জা করে তার।
সুতরাং তার জীবন
নীরব এবং নিঃসঙ্গ।
বেশি কথা বলতে পারে না,
মিলতে পারে না কারো সঙ্গে প্রাণ খুলে।
তার সঙ্গে মেশবার সুযোগই দেয় না সে কাউকে।
দিলেও যে খুব বেশি লোক জুটত,
মনে হয় না তা।
কারণ যে জিনিসটি থাকলে
পুরুষরা মেয়েদের সঙ্গে মেশবার উৎসাহ পায়,
সে জিনিসটির অভাব আছে তার।
রূপসী নয়।
স্বাস্থ্যবতী অবশ্য।
কেরিজ, পায়োরিয়া, চশমা কিচ্ছু নেই,
নিখুঁত টিউব,
নীরোগ অ্যাপেন্ডিক্স,
মজবুত কব্জি,
পুষ্ট পেশী,
ফিট হয় না।
টেনিস খেলা

বাইক চড়া
ড্রাইভ করা
সমস্তই পারে অনায়াসে।
কিন্তু রূপ নেই,—
দুধে-আলতা রং
পটল-চেরা চোখ
তিল-ফুল নাসা
মেঘবরণ চুল
শুধু যে নেই তা নয়,
নেই ব'লে দুঃখও নেই ;
যৌবন আছে।
কিন্তু সে যৌবনকে
শাড়ি-কাঁচুলির কৌশলে উদ্রগ্র ক'রে
লোক-লোচনবর্ত্তী করবার প্রবৃত্তি
মোটেই নেই তার।
সুতরাং সে যৌবনও অপ্রকাশিত।
মাথায় চুল 'বব' ক'রে ছাঁটা
ঢিলে পাজামা পরার শখ আছে,
বাইক চড়ার সময় ব্রিচেস পরে,
হঠাৎ দেখলে পুরুষ ব'লেই ভ্রম হয়।
প্রণয়ী জোটে নি সুতরাং—
সাহস নয়, প্রেরণাও পায় নি অনেকে।

প্রণয়ী না জুটলেও
বিবাহার্থী জুটেছিল একাধিক।
কালো, সাদা,
বেঁটে, লম্বা,
সুরূপ, কুরূপ,
ফোঁপরা, শাঁসালো,

বিদ্বান, মূর্খ,
বোকা, বুদ্ধিমান,
নানা রকম।
ভাল চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখলে
প্রার্থী আসে যেমন ঝাঁকে ঝাঁকে,
ঠিক তেমনি।
একমাত্র কন্যা সে
বিপত্নীক ধনী পিতার।
বিশাল বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী।
কিন্তু গোল বাধল।
এতগুলি ভদ্রসন্তানের
অরূপ-সাধনার অন্তরালে
যে সহজিয়া মনোভাব প্রচ্ছন্ন ছিল,
তা সহজেই প্রকট হয়ে পড়ল।
পিতা দেখলেন,
তাঁর কন্যাটিকে সকলেই চাইছেন
সহধর্ম্মিণী হিসাবে ততটা নয়,
তাঁর লোহার সিন্দুকের চাবি-হিসাবে যতটা।
পুত্রী দেখলেন,
স্বামী হিসেবে লোভনীয় নয় একজনও।
মোটা, রোগা, বোকা, চালিয়াত,
ন্যাকা, হাঁদা, ধূর্ত্ত, ধড়িবাজ,
উদ্ধত, মিনমিনে
নানা জাতীয় আবর্জ্জনা
টাকা-ঘূর্ণির টানে
নৃত্য ক'রে বেড়াচ্ছে তার চতুর্দ্দিকে।
ভাল ছেলে জুটল না।
দেশে যে একেবারে ভাল ছেলে নেই তা নয়,
কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়—

বিবাহ-ক্ষেত্রে অধিকাংশ ভাল ছেলেরা
কিংবা তাহার অভিভাবকেরা
বেশি মর্য্যাদা দেন
সেই দুটো জিনিসকেই,
যা স্বকীয় সাধনায় অর্জ্জন করা অসম্ভব,
যা ভাগ্যবলে দৈবাৎ মেলে—
রূপ এবং বংশ-গৌরব।
স্বোপার্জ্জিত বিদ্যা অথবা অর্থ
লোভনীয় নয় মোটেই এঁদের কাছে।
সদ্বংশের সুন্দরী পাত্রী চান এঁরা।

বাবা মারা গেলেন হঠাৎ একদিন।
শোকে-তাপে
আত্মীয়-স্বজনদের অভ্যাগমে
শ্রাদ্ধ-ব্যাপারে
কাটল কিছুদিন।
আত্মীয়-স্বজনেরা চমকে গেলেন
শ্রাদ্ধের নূতনত্ব দেখে।
প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ করা কামরায়
এলেন বেদজ্ঞ পুরোহিত
কাশী থেকে ;
ভারতবর্ষের নানা স্থান থেকে এলেন
দ্বাদশজন ব্রাহ্মণও—
জাত-ব্রাহ্মণ নয়,
গুণ-ব্রাহ্মণ—
অধ্যাপক, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, শিল্পী।
তার মধ্যে ছিলেন
দুইজন বৈদ্য এবং একজন কায়স্থও।
অকৃত্রিম শ্রদ্ধা সহকারে

অভ্যর্থনা করলে সে গুণীদের,
শ্রাদ্ধান্তে দক্ষিণা দিলে
স্বর্ণমুদ্রা, পট্টবস্ত্র, মাল্য-চন্দন এবং গ্রন্থ।
স্থানীয় লোকেরাও বাদ গেলেন না,
আপামরভদ্র সবাই
যোগ দেবার সুযোগ পেলেন একদিন
বিরাট ভূরিভোজনের মহোৎসবে।

বছরখানেক কাটল।
কর্ত্তব্য বোধেই সম্ভবত
আত্মীয়-স্বজনেরা আর একবার এলেন,
চেষ্টা করলেন বিয়ের।
সে সংক্ষেপে বললে,
বিয়ে করব না আমি।
কেন ?
রুচি নেই।
রুচিবিকার-সংশোধনে অসমর্থ ব'লে নয়,
লক্ষাধিক টাকার মালিক
বি. এ.-পাস এই মেয়েটা
তাঁদের শাসনসীমা-বর্ত্তিনী হতে
রাজি হ'ল না ব'লে
নিরস্ত হলেন তাঁরা।
আধুনিক শিক্ষাকে গাল পাড়তে পাড়তে
মুক্তকচ্ছ কম্পিতগুম্ফ হিতৈষীর দল
একে একে
অন্তর্দ্ধান করলেন আপন আপন বিবরে।

কাটল আরও বছর দুই।
অন্য কেউ হ'লে

এম. এ. দেবার চেষ্টা করত হয়তো,
নিতান্ত পক্ষে কিংবা
সময় কাটাবার জন্যেও অন্তত
শিক্ষয়িত্রীগিরি যোগাড় ক'রে নিত একটা।
এ কিন্তু করলে না কিছুই।
নোট-বই প'ড়ে
বাঁধা-ধরা নিয়মের পরীক্ষা পাস করাকে
চিরকালই সে
খোঁটায় বাঁধা গরুর
তৃণ-ভোজনের সঙ্গে উপমিত করেছে,
হাস্যকর নিয়মের খাঁচায় বন্দী হয়ে
মাস্টারি করার ছুতোয় তোতাগিরি করাটাও
চিরকাল অপছন্দ তার,
তাই ওসব করলে না কিছুই।
পড়া-শোনা অবশ্য বন্ধ রইল না।
তার 'মিণ্টো' বুক-কেসগুলোতে
ওয়ালনাট-টেবিলে
মেহগিনি-আলমারির তাকে তাকে
জমতে লাগল নানা বই নানা ধরনের।

কিন্তু—
হ্যাঁ,
স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল ক্রমশ
মস্ত বড় একটা 'কিন্তু'।
মন ভরে না কেবল বই প'ড়ে
উপন্যাস যত ভালই হোক,
ক্লান্তিকর শেষ পর্য্যন্ত।
উপন্যাস ছেড়ে ধরল ইতিহাস—
ভারতের, চীনের, জাপানের,

রোমের, গ্রীসের, জার্মানীর, ইংলণ্ডের,
রাশিয়ার।
নাঃ,
মরা মানুষের মরা কাহিনী সব—
কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা মিথ্যা
তাও অনিশ্চিত।
কিনলে সহজবোধ্য বিজ্ঞানের বই
কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স, বায়োলজি, জুওলজি;
ভাল লাগল না।
কাণ্ট, হেগেল, এমার্সন,
রামায়ণ, মহাভারত, জাতক,
গীতা, উপনিষদ—
তাও বিস্বাদ।
পাঞ্চ, স্ট্যাণ্ড, নেচার,
লিটারারি ডিজেস্ট, প্যারেড,
ধর্ম্মতত্ত্ব, কাব্যতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব,
অর্থনীতি, রাজনীতি; সমাজনীতি
কিছুই ভাল লাগে না আর,
এমন কি
হার মানলেন
হ্যাভ্‌লক এলিস, বাৎস্যায়ন পর্য্যন্ত।

নানা রকম ক্যাটালগ ওলটাতে ওলটাতে একদিন
উদ্দীপ্ত হ'ল কল্পনা—
ফলে
হাজার কয়েক টাকা বেরিয়ে গেল।
ক্রোমিয়মের ডিনার-সেট,
অদ্ভুতাকৃতি চেয়ার টেবিল,
বাসন নানা রকম দামী চীনেমাটির,

নতুন মডেলের
কার, ক্যামেরা,
রেফ্‌রিজারেটার, রেডিও,
অভিনব খাঁচায়
অভিনব বর্ণের ক্যানারি এক ঝাঁক,
অভিজাত বংশের
অ্যাল্‌সেশিয়ান, স্প্যানিয়েল, পুড্‌ল।
কাটল কিছুদিন।
মনে হ'ল তারপর
কেন এসব? কার জন্য?
মনের ক্ষুধা তো মিটল না!

ছবি আঁকবার চেষ্টা করলে,
কিন্তু সার হ'ল সরঞ্জাম কেনাই।
তুলি, রং, কাগজ পেলেই হয় না শুধু,
প্রতিভা চাই।
ছবি হ'ল না।
ছেলেবেলায় একবার
কণ্ঠ এবং যন্ত্র-যোগে রীতিমত
প্রাণপণ চেষ্টা করেছিল
সঙ্গীত-বিদ্যা আয়ত্ত করবার,
সফলকাম হয় নি।
সেদিক দিয়েও গেল না সুতরাং।

মনে হ'ল একদিন,
বাগান বানালে কেমন হয়?
ফুল নিয়ে কবিত্ব করার শখ
কোন দিনই তার ছিল না অবশ্য,
ফুল-চাঁদ-মলয়-মেঘ-মূলক কবি-বৃত্তিকে

প্রশ্রয় দেয় নি সে কোন দিনই।
আকাশের চাঁদ দেখে সে যতটা না মুগ্ধ হ'ত,
তার চেয়ে ঢের বেশি মুগ্ধ হ'ত
বৈদ্যুতিক টেবিল-বাতিটা দেখে।
কি উজ্জ্বল আলো তার,
গঠনে কি বর্ণ-বৈচিত্র্য—শোভা!
বেশি আবিষ্ট করত তার মনকে
সিনেমার দৃশ্য
প্রাকৃতিক দৃশ্যের চেয়ে,
গহন বনের সৌন্দর্য্যের চেয়ে
বেশি অভিভূত করত
বিরাট ফ্যাক্টরির সৌন্দর্য্য।
সেকেলে কবিদের নকল ক'রে
যন্ত্রকে—
মানব-প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকে
দানব ব'লে উপহাস করতে
সঙ্কুচিত হ'ত সে।
মনে হ'ত
ওই জাতীয় উক্তির পেছনে লুকিয়ে আছে
পলায়নী মনোবৃত্তি,
অক্ষমতার শূন্য আস্ফালন।
তাই তার বাগানের শখ
মূর্ত্ত হ'ল
নানা রকম সারে, যন্ত্রে,
নানা রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়।
ফুল ফুটল নানা রকম দেশী, বিদেশী,
ফসলও ফলল বহুবিধ
শাক-সবজি তরি-তরকারির,
বামন গাছ

অর্কিড,
সিজন-ফ্লাওয়ার হরেক রকমের,
হরেক রকমের পরীক্ষা
গাছেদের বর্ণ-সঙ্করত্ব নিয়ে,
পরাগ-বিনিময়
কলম-তৈরি
বাকি রইল না কিছুই।
তবু কিন্তু মন ভরে না।
মনে হয় ক্ষুধিত আছি,
মনে হয় আসল জিনিস পাওয়া যায় নি,
যাবেও না কখনও বোধ হয়।
ক্ষতি কি হয়েছে তাতে?
মনকে জোর ক'রে বোঝাতে হয়,
সুখেই তো আছ;
জোর ক'রে মানতে হয়,
হ্যাঁ, সুখেই আছি।
কিন্তু ওই ছোট কুঁড়েঘরে
মালীর সদ্যোজাত শিশুটা যখন কেঁদে ওঠে,
তখন ঝন ঝন ঝনাৎ ক'রে
আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠে
মনের সমস্ত তারগুলো যেন।
এ কি অত্যাচার!
মাতৃত্ব কামনা করি ব'লে
ধরা দিতেই হবে পুরুষের বাহুপাশে?
ফুলকে তো ধরা দিতে হয় না,
সমীরণের তরঙ্গে তরঙ্গে
পতঙ্গের পাখায় বাহির হয় সৃষ্টির বীজ।
মানুষ এখনও এত বর্ব্বর?

জলের কুঁজোটাকে বিয়ে না করলে
পিপাসার জল পাব না?

নিঃশব্দে পাখা ঘুরছে।
নিঃশব্দে জ্বলছে সুদৃশ্য-ডোমে-ঢাকা বিদ্যুৎ-বাতিটা,
সামনের থাবা দুটোয় মুখ রেখে
নিঃশব্দে ব'সে আছে স্প্যানিয়েলটা,
সে পদ-চারণা ক'রে চলেছে নিঃশব্দে।
ভাবছে, অশোভন হবে কি
ডাক্তারের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করাটা?

সব শুনে বললেন ডাক্তার,
বিয়ে করতে আপনার আপত্তি কেন?
রুচি নেই।
রুচি বদলান।
বদলাবার ইচ্ছে নেই,
নিজের আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ করতে চাই না
একদিনের জন্যেও;
কিন্তু ছেলে চাই,
উপায় নেই কোন?
উপায় আছে বইকি,
টেস্ট টিউব বেবি—
বিজ্ঞানের যুগ এটা
সবই সম্ভব।

সম্ভব হ'লও।
প্রত্যক্ষ-ভাবে পুরুষ-সংস্রবে না এসেও
সন্তান-সম্ভবা হ'ল সে।

গভীর রাত্রে হঠাৎ একদিন
ঘুম ভেঙে গেল তার।
ম্যুরিলোর আঁকা
ইম্‌ম্যাকুলেট কন্‌সেপ্‌শন ছবিখানা
স্বপ্নে যেন দেখতে পেল স্পষ্ট সে।
অনন্ত আকাশের বুকে
দাঁড়িয়ে আছেন কুমারী জননী,
পদ-প্রান্তে সরু একফালি চাঁদ,
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে শিশুরা সব—
দেবশিশুরা
ভিড় ক'রে আছে চারিদিকে
কেউ স্পষ্ট, কেউ অস্পষ্ট।
মনে পড়ল কুন্তীর কথা
জবালার
সীতার
দ্রোণের,
মনে পড়ল ইসাডোরা ডান্‌কান—
টং ক'রে একটা বাজল।
অস্পষ্ট ঘর্ঘরধ্বনি ভেসে এল যেন কোথা থেকে—
বিমান-পোতে কে আসছে এত রাত্রে!

বার্ত্তা চাপা রইল না বেশিদিন।
যথানিয়মে
হিতৈষী আত্মীয়েরা এলেন অনাহূতভাবেই।
যথানিয়মেই
ফুসফুস-গুজগুজও হ'ল,
ধাত্রী-বিদ্যা-পারঙ্গম মহাপুরুষও একজন সম্ভব হলেন
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়।
টলল না কিন্তু সে;

বললে স্থিরকণ্ঠে,
পাপ করি নি কিছু,
নারীজীবনের চরম-সার্থকতা যে মাতৃত্বে
তাই অর্জ্জন করিতে যাচ্ছি
আধুনিক পদ্ধতিতে
অভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের পরামর্শ নিয়ে
আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রেখে।
আপনারা আমাকে রেহাই দিন।

টাকা আছে প্রচুর,
রেহাই দিতে হ'ল সুতরাং।

দু মাস কাটল।
ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন একদিন,
চমকে গেলেন:
আর একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা
আগে লক্ষ্য করেন নি তিনি;
পেল্‌ভিস ভয়ানক ছোট
স্বাভাবিক প্রসব অসম্ভব।
অপরিণত শাবকটিকে ধ্বংস না করলে
মায়ের জীবন-সংশয়।
মুখ শুকিয়ে গেল তাঁর।
অন্য কোন উপায় নেই?
আছে—সিজারিয়ান সেক্‌শন।

পেট কেটে ছেলে বার করা যেতে পারে,
কিন্তু তাতে বিপদের সম্ভাবনা।
সে বিপদের সম্মুখীন হবে—
আত্মরক্ষা ও আত্মবিনোদনই আধুনিকতা নয়,
দুর্জ্জয়কে জয় করাবার সাহসই আধুনিকতা।

অবশেষে এল সেই দিন।
ঠিক করাই ছিল সব—
রবার-প্যাড দেওয়া অপারেশন-টেবিল,
আরও দুটো টেবিলে
তোয়ালে, ক্যাথিটার, কাঁচি, লোশন,
টাওয়েল, ফর্‌সেপ্‌স্‌,—সারি সারি ওষুধ।
জল গরম করবার ইলেক্‌ট্রিক স্টোভ,
সদ্যোজাত শিশুর প্রথম স্নানের টব,
ইলেক্‌ট্রিক রেডিয়েটার একটা,
হাই-পাওয়ার বাল্‌ব চারটে,
ত্রুটি ছিল না কিছু।
ফোন করবার সঙ্গে সঙ্গেই
এসে পড়লেন ডাক্তারেরা
একজন সার্জন—দুজন সহকারী।
নার্স দুজন আগেই এসেছিল
প্রাক-অপারেশন ব্যবস্থা করবার জন্যে।
ডাক্তারদের সঙ্গে এল
গোটা চারেক বড় বড় ড্রাম,

কোনটাতে যন্ত্রপাতি
কোনটাতে ব্যাণ্ডেজ, গজ, তুলো
কোনটাতে ডাক্তারদের পোশাক
স্টেরিলাইজ্‌ড আধুনিক পদ্ধতিতে।
স্পাইনাল অ্যানিস্‌থিসিয়া দেওয়া হ'ল।
ডাক্তাররা হাত ধুলেন,
পরলেন তাঁদের অদ্ভুত অটোক্লেভ্‌ড পোশাক—
লম্বা গাউন পা পর্য্যন্ত,
নাক-মুখের আচ্ছাদন,
মাথায় টুপি,
হাতে রবারের দস্তানা।

চুপ ক'রে শুয়ে রইল সে মুখ বুজে,
মুখের একটি পেশীও বিচলিত হ'ল না।

জ্ব'লে উঠল নিঃশব্দে
চারটে হাজার-ক্যাণ্ডেল-পাওয়ারের বাতি।
একটা আর্‌গট ইন্‌জেক্‌শন দেবার পর
শুরু হ'ল অপারেশন।
করকর ক'রে ছুরি বসল পেটের চামড়ায়,
ইউটেরাস দেখা গেল একটু পরেই,
সেটাকে
ভল্‌সেলাস দিয়ে ধরলেন বাগিয়ে সহকারীরা,
ছুরি বসালেন তাতে সার্জন।

ফিনিক দিয়ে রক্ত ছুটল,
সার্জনের গাউনে এক পিচকিরি রং দিলে যেন কেউ।
কট কট কট—
আর্টারি ফর্‌সেপ্‌স চেপে ধরল ছিন্ন শিরার মুখ
নিঃশব্দ দ্রুতগতিতে কাজ চলতে লাগল।

বাইরেও তখন ফিনিক ফুটছিল জ্যোৎস্নার।
চন্দ্রমল্লিকার স্তবকে স্তবকে
রজনীগন্ধার গুচ্ছে গুচ্ছে
চামেলী-কুঞ্জে
যূথিকা-বনে
ঝিল্লির অশ্রান্ত একটানা সঙ্গীতে
জ্যোৎস্না-ধবল মেঘমালায়
মূর্ত্ত হয়ে উঠছিল সেই চিরন্তন সত্য—
সৃষ্টি কি সুন্দর!

সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের ক্রন্দনে
সচকিত হয়ে উঠল চতুর্দ্দিক।
সামাজিক, নৈতিক, শারীরিক
সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে
প্রবেশ করল আধুনিক জগতে
চির-পুরাতন চির-নূতন শিশু।

"বনফুল"

সরোজিনী

১৬

দিন দুই পরে বিকালবেলায় গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে গিয়া দেখিলাম, তিনি ও রাধানাথ বৈঠকখানায় গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। জুতার শব্দ শুনিতে পাইয়াই রাধানাথ হাঁকিয়া উঠিল, কে? জবাব না দিয়া দরজার সামনে উপস্থিত হইতেই গাঙুলী মশায় তাকাইয়া আমাকে দেখিয়া কহিলেন, ওঃ, তুমি! এস ভায়া। পাশে গিয়া বসিলাম। গাঙুলী মশায় প্রবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, শুনেছ? ঘাড় নাড়িয়া 'না' জানাইয়া প্রশ্ন করিলাম, কি?

এস. ডি. ও. ব্যাটা আমাদের দরখাস্তটা নাকচ ক'রে দিয়েছে। উল্টে হুকুম দিয়েছে, সরোজিনী দেবীর—মানে ঐ মাগীর ওপর কেউ জোর-জবরদস্তি করে কি না, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে। বিপদ দেখ দেখি! মাগী যে লোক ভাল নয়, জান তো। যদি জানতে পেরে থাকে সরকার থেকে এই হুকুম হয়েছে, তা হ'লে নিজেই কোন বিপদ বাধিয়ে আমাকে ফ্যাসাদে ফেলবে।

রাধানাথ কহিল, যাকে বলছেন, সেই এখনই ব'লে দেবে গিয়ে। যা দহরম-মহরম, একদিন ওর বাড়ি না গেলে ভাত হজম হয় না।

চুপ করিয়া রহিলাম, প্রতিবাদ করিলেন গাঙুলী মশায়, পাগল নাকি! ও সে রকম লোক নয় হে রাধানাথ।

রাধানাথ রুক্ষকণ্ঠে কহিল, নয় তো দিনরাত আড্ডা দেয় কেন?

ভারী গলায় কহিলাম, তোমার মত দিনরাত আড্ডা দিয়ে বেড়ানো আমার কাজ নয়—

রাধানাথ মুখ ভেংচাইয়া কহিল, আড্ডা দিয়ে বেড়ানো আমারই কাজ নাকি? যাকে এতগুলো দোকান চালাতে হয়, তার যে কত সময়, তা সবাই জানে।

কহিলাম, বলে তো সবাই, বাউরীপাড়ায় সারারাত—

রাধানাথ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, দেখ মাস্টার, মুখ সামলে কথা বলবে বলছি।

কহিলাম, কেন? বাউরীপাড়ায় রাত্রে আড্ডা দাও না?

তোমাদের মত অধার্ম্মিক লোকেরাই ঐ কথা বলে। রাত দুটো পর্য্যন্ত খোল-করতালের শব্দ, কীর্ত্তনের শব্দ পাও না? না, কালা হয়েছ?

শুনতে তো পাই, তবে—

রাধানাথ তাহার মুখটা আমার মুখের সামনে আনিয়া কড়া গলায় কহিল, কি তবে?

গাঙুলী মশায় কহিলেন, থাক থাক, বাজে কথায় ঝগড়া ক'রো না, মুর্গীটাকে কি ক'রে জব্দ করা যায়, একটা উপায় ঠিক কর দেখি।

রাধানাথ সরিয়া বসিয়া কহিল, উপায় বাতলালেই বা কি হবে? ঘরের বিভীষণদের না তাড়ালে কিছু হবে না।

কহিলাম, তার মানে?

মানে তো বুঝতেই পারছ। হয় ওদের ছাড়, না হয় আমাদের এখানে এসো না।

সাভিমানে গাঙুলী মশায়কে কহিলাম, আপনারও কি তাই মত? গাঙুলী মশায় চুপ করিয়া রহিলেন। বলিলাম, বেশ, তা হ'লে আমি উঠি, আপনারা পরামর্শ করুন। উঠিবার উপক্রম করিতেই গাঙুলী মশায় হাতে ধরিয়া বসাইয়া কহিলেন, আরে ব'স না ভায়া। রাধানাথের আজ রাগ হয়েছে, ওর কথা ছেড়ে দাও।

কহিলাম, সব কথা ছেড়ে দিলে চলে না। ওর মাত্রাজ্ঞান বড় কম। সেদিন দেখুন না, থানাতে কি কাণ্ডটাই করলে! আপনাদের যে দরখাস্ত নাকচ হয়েছে, বলতে গেলে ওর দোষেই হয়েছে। আপনার মত তো বললেই পারত, পরে দোব, ও রকম ক'রে পালিয়ে যাবার কি দরকার ছিল?

রাধানাথ তীক্ষ্ণকণ্ঠে কহিল, আমার অবস্থায় পড়লে সব অধমকেই পালাতে হ'ত। কি রকম পেটের অসুখ! ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করগে না!

গাঙুলী মশায় কহিলেন, এস. ডি. ও. সাহেব কিছু বলছিলেন নাকি?

গম্ভীরভাবে কহিলাম, হ্যাঁ, ঐ ধরনের কথাই বলছিলেন। আর

সত্যি কথাই তো, সরকারের ওপর দরদ না দেখালে, সরকারই বা দরদ দেখাবেন কেন?

গাঙুলী মশায় চিন্তিতমুখে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, সত্যি। কথাটা উল্টাইবার জন্য রাধানাথ কহিল, বুড়ীটার কপালে অনেক দুঃখ আছে দেখছি, শুধু ইহকালে নয়, পরকালেও।

কহিলাম, ইহকালের দুঃখ তো তিনি স্বীকার করেন না দেখলাম।

মানে?

নিজের মুখেই তো বললেন, খুব সুখে আছেন, কোথাও যেতে চান না।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, তাই নাকি? এত দেখে শুনেও বুড়ীর জ্ঞান হচ্ছে না?

রাধানাথ কহিল, বুড়ী কি দেখতে শুনতে পায় যে, বুঝবে? ভাবছে, ভারী সুখে আছি, ওদিকে যে পরকাল ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে মুসলমানীর হাতে জল খেয়ে।

প্রতিবাদ করিলাম, ও কি কথা! ভদ্রমহিলার নামে যা-তা ব'লো না রাধানাথদা।

রাধানাথ মুখ ভেংচাইয়া কহিল, ওঃ, দরদের সীমা নেই দেখছি যে! দারোগা সাহেবের সঙ্গে নটখটির কথা কে না জানে গাঁয়ে? দিনরাত— আটটা বাজতে না বাজতে ওর বাড়িতে যাওয়া, রাত এগারোটা পর্য্যন্ত আড্ডা দেওয়া, গাঁয়ে কে না দেখেছে? দারোগা সাহেবের স্ত্রী পর্য্যন্ত শুনেছে সেই কথা।

কহিলাম, তাই নাকি?

রাধানাথ কহিল, শুনবে না? বাউরী মেয়েগুলো ওদের বাড়িতে চাকরানীর কাজ করে, তারা সব শুনে বলেছে গিয়ে।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, দারোগাবাবুকে কিছু বলে নি?

চোক ডাগর করিয়া রাধানাথ কহিল, বলে নি আবার! রাতদিন ঝগড়া কচকচি চলছে বাড়িতে। একটা কিছু কাণ্ড না হয়ে যায়। আমাদের হিন্দু স্ত্রী তো নয় যে, সব মুখ বুজে সহ্য করবে। দৃঢ়কণ্ঠে

কহিলাম, কিন্তু এ কথা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা। ধমকের সুরে রাধানাথ কহিল, দেখ মাস্টার! বেশি চালাকি ক'রো না, সব জান তুমি।

সব জানি ব'লেই বলছি, সরোজিনী চতুর হতে পারে বটে, কিন্তু তার চরিত্রের কোন দোষ নেই।

গাঙুলী মশায় ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন যে, তিনি আমার সহিত একমত নহেন। রাধানাথ, গাঙুলী মশায়ের সমর্থনে উৎসাহিত হইয়া কহিল, চরিত্রের দোষ নেই! তাই একজনে শানছে না, আর একজনকে জুটিয়েছে! সকৌতুকে কহিলাম, সে আবার কে?

রাধানাথ নাক উঁচাইয়া কহিল, কেন? আজিজ সাহেব। সেও যে জুটেছে আজকাল। শেষে শুম্ভ-নিশুম্ভর লড়াই বেধে না যায়।

কহিলাম, আজিজ সাহেব একদিনই তো ওর বাড়িতে এসেছিল এস. ডি.ও. সাহেবের সঙ্গে। তাও নিজে আসে নি, এস. ডি.ও. সাহেব ধ'রে নিয়ে এসেছিলেন।

ঘাড় নাড়িয়া মুখ বিকৃত করিয়া রাধানাথ কহিল, আজ্ঞে না, তার পরদিন তো এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, নেমন্তন্ন!

ঘাড় কাত করিয়া চোখ মুদ্রিতপ্রায় করিয়া রাধানাথ কহিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, নেমন্তন্ন। তোমাদের শ্রীল শ্রীযুক্তা সরোজিনী দেবী শুম্ভ নিশুম্ভ দুজনকেই নেমন্তন্ন খাইয়েছিলেন। ঘাড় সোজা করিয়া মুচকি হাসিয়া কহিল, তিনকড়ের দলের ছেলেরা বলে, শ্রীমতী সরোজিনী দেবী—

কটমট করিয়া তাকাইয়া কহিল, দেবী থেকে যেদিন বেগম সাহেবা বলবে, সবার চোখ ফুটবে সেদিন।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, কাল নাকি মাগীটা আজিজ সাহেবের বাড়ি পাল্কি ক'রে বেড়াতে গিয়েছিল।

রাধানাথ উপরে ও নীচে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হ্যাঁ তো। আজিজ সাহেব পাল্কি পাঠিয়ে দিয়েছিল। শুধু মাগীই যায় নি, মনুর মেয়েটাও গিয়েছিল।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, যেটাকে তিনকড়ের ঘাড়ে চাপাচ্ছে?

রাধানাথ কহিল, হ্যাঁ, আজিজ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে নাকি ধর্ম্ম-মা,

পাতানো হচ্ছে। হাসিয়া কহিল, ধর্ম্মনাশ হ'লেই মা হবে, তারই গোড়াপত্তন আর কি। আর ওদিকে যিনি ধর্ম্ম-জামাই হবেন, তিনি যদি ধর্ম্ম-শাশুড়ীকে ধ'রে টানাটানি করেন, তখন বুঝবে মজাটা।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, কে?

রাধানাথ কহিল, আজিজ সাহেবের ভাইপো, ঐ যে সেদিন সভায় এসেছিল। কি রকম চোয়াড়ে চেহারা দেখলেন ওর? সব পারে ও। ওর সঙ্গেই আজিজ সাহেবের মেয়ের বিয়ের সব ঠিকঠাক যে।

গাঙুলী মশায় বিষাদগম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, আমরা বেঁচে থাকতেই গাঁয়ের এই অধঃপতন আরম্ভ হ'ল, আমরা ম'রে গেলে কি যে হবে, কে জানে!—বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

রাধানাথ সান্ত্বনার সুরে কহিল, কি করবেন, গাঁয়ের যে একতা নেই। না হ'লে দেখুন না, ওদের জব্দ করবার জন্যে একঘরে করা হ'ল তো গাঁয়ের ছোকরারা ওদের ধারে দাঁড়াল, মাস্টারের মত গণ্যিমান্যি লোক, ওদের সাহায্য করতে লাগল। গাঁয়ে একতা থাকলে একঘরে হয়েও মনু চক্রবর্ত্তী মেয়ের বিয়ে দিতে পারে, না ঐ মাগীটা চোখের সামনে যা-তা করতে সাহস করে?

গাঙুলী মশায় চিন্তাকুল মুখে কহিলেন, সত্যি।

রাধানাথ সক্ষোভে বলিতে লাগিল, এই দেখুন না, আপনার কথামত তিনের দলের ছোঁড়াগুলোর বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে ওদের বাপ-জ্যেঠাদের বলতে গেলাম, তিনের বিয়েতে ছেলেগুলোকে খেতে মানা ক'রে দাও, না হ'লে সব একঘরে হতে হবে তা সবাই কি বললে জানেন? বললে, ছেলেরা কোথায় কি করছে, তা সমাজের দেখবার দরকার কি? বললাম, ছেলেগুলি তো কচি খোকা নয়, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, সামাজিকভাবে মনু চক্রবর্ত্তীর বাড়িতে খেলে সামাজিক দণ্ড নিতে হবে।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, কি জবাব দিলে সব?

জবাব দিলে, ঠক বাছতে গাঁ উজোড় হবে, তখন তোমরাই একঘরে হয়ে যাবে।

গাঙুলী মশায় মুখ কালো করিয়া আর একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

১৭

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় গাঙুলী মশায়ের বাড়ি গেলাম না। যাইতে ইচ্ছা করিল না। রাধানাথ নিশ্চয়ই এতক্ষণে জুটিয়াছে সেখানে, দেখিবামাত্র ঝগড়া শুরু করিবে। কাজেই, যে আধ-পাকা রাস্তাটি পুরা পাকা রাস্তা হইতে বাহির হইয়া আমাদের স্কুলের সামনে দিয়া রাঙামাটি পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। অচিরে গ্রাম ছাড়াইয়া বাহিরে আসিলাম। আসিতেই চোখে পড়িল, দুই পাশে সদ্য-কর্ষিত মাঠের শ্রেণী দিগন্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত; এই এক-টানা ধূসরতার মধ্যে মাঝে মাঝে সবুজের ছোপ, চাষারা ধানের চারা তৈয়ারি করিয়াছে; সামনের দিকে দূরে পাশাপাশি ছোট ছোট গ্রামগুলি—চাঁদাই, চপাই, মান্দারবুনি। চপাই গ্রামে আজিজ সাহেবের বাড়ি আমাদের গ্রাম হইতে তিন মাইল।

সন্ধ্যার পরেই ফিরিলাম। হাতল-হীন সোনার কাস্তের মত শুক্লা চতুর্থীর চাঁদ পশ্চিম-আকাশে উঠিয়াছে। তাহারই ম্লান আলোকে আকাশ, প্রান্তর, দূর দিগন্ত-রেখা, গ্রামান্তের সারি সারি বাঁশের ঝাড়, দীঘির পাড়ে তালগাছের শ্রেণী, রহস্যময় রূপ ধারণ করিয়াছে। দেখিয়া বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। হঠাৎ মনে হইল, জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কৈশোরে ও যৌবন-প্রারম্ভে কত কর্ম্মহীন মধ্যাহ্নে ও নিদ্রাহীন নিশীথে কল্পনার তুলি দিয়া মনের পটে ভাবী জীবনের যে বিচিত্রবর্ণ ছবি আঁকিয়াছিলাম, বাস্তব জীবনের সঙ্গে তাহার বিন্দুমাত্র মিল হইল না; মানসী প্রিয়ার বদলে মাত্র স্ত্রী, উচ্চ রাজপদের বদলে মাস্টারি, দেশব্যাপী খ্যাতি ও সম্মানের বদলে একটি নেহাত পল্লীগ্রামে চাষাভূষাদের মধ্যে স্বল্প প্রতিপত্তি। তবু এই লইয়াই তো জীবনের অর্দ্ধেকটা কাটাইয়া দিলাম। প্রথম প্রথম মাঝে মাঝে অসন্তোষের কাঁটা ফুটিত, ভাগ্য ও ভগবানের বিরুদ্ধে মনে বিদ্রোহ জাগিত; আজকাল মন অনেকটা পোষ মানিয়াছে, ডাইনে ও বামে বাড়ির

আঘাত খাইয়া খাইয়া নিরীহ শান্ত বলদের মত বাঁধা রাস্তা ধরিয়া চলিতে শিখিয়াছি। হঠাৎ সামনে কড়া ও চড়া কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল, কে? থমকিয়া দাঁড়াইয়া চাহিয়া দেখিলাম, দুইটা লোক আমার দিকে আসিতেছে। গ্রামের সীমানার মধ্যে ঢুকিয়াছি, কাজেই চোর-ডাকাত যে আক্রমণ করিবে, তাহার ভয় নাই; করিলেও সঙ্গে মূল্যবান কিছুই নাই, তাহা ছাড়া হাঁকাহাকি করিলে লোকজন আসিয়া পড়িবে। কাজেই সাহসের সহিত দাঁড়াইয়া রহিলাম। লোক দুইটা কাছাকাছি আসিতেই দুই চক্ষের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করিয়া তাহাদিগকে চিনিতে চেষ্টা করিলাম। সামনের লোকটা কাছে আসিয়াই কহিল, কে? মাস্টারবাবু? চিনিলাম, আজিজ সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র সত্তর সাহেব। পরিধানে গাঢ় লাল ও নীল রঙের ঘর-কাটা লুঙ্গি, গায়ে রঙিন গেঞ্জি। আমাকে দর্শন-দান করিল কেন? হাত করিবার বিদ্যাটা এখনই প্রয়োগ করিতে শুরু করিবে নাকি?

জবাব দিলাম, হ্যাঁ।

সত্তর একেবারে গা ঘেঁষিয়া আসিয়া, দুই হাতে গলা জড়াইয়া ধরিয়া শিথিল কণ্ঠে কহিল, আপনাকে যে গরু-খোঁজা করছিলাম এতক্ষণ, কোথায় ছিলেন বলুন দেখি?—বলিয়া ঠিক মুখের সামনে মুখটা আনিয়া স্থির করিয়া দিল।

মুখ হইতে মদের তীব্র গন্ধ নাকে ঢুকিয়া পেটের ভিতরটা পাক দিয়া উঠিল। গলা হইতে হাত দুইটা ছাড়াইতে চেষ্টা করিয়া কহিলাম, বেড়াতে গিয়েছিলাম।

ডান হাত তুলিয়া লইয়া বাম হাত দিয়া গলাটা আরও ঘনভাবে সাপটাইয়া ধরিয়া সঙ্গী লোকটাকে সম্বোধন করিয়া টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিল, বে রমজান! আমার কথাই ঠিক তো? তুই বলছিলি কোথায় ফুর্ত্তি করতে গেছে, এই সাঁঝ রেতে। তা আবার পারে? মাস্টারবাবু যে!—বলিয়া ঠোঁট দুইটায় চাড়া দিয়া হাসিবার ভঙ্গি করিল।

কহিলাম, ছেড়ে দিন, রাত হয়ে গেল, বাড়িতে কাজ আছে আমার।

শুনিয়া সত্তর হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল, যেন ভারী একটা রসিকতা করিয়া ফেলিয়াছি।

একটু পরেই হাসি থামাইয়া, ঘাড়টি ডাইনে বামে নাড়িয়া, চোখ দুইটাতে চাড়া দিয়া কহিল, আমারও তো কাজ আছে মাস্টারবাবু। না হ'লে এই সন্ধ্যে রেতে কেউ একটা মন্দ মাস্টারের কাছে আসে, অ্যাঁ?—বলিয়া আমার কাঁধের উপর ডান হাতটা আবার চাপাইয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া আবার পূর্ব্ববৎ হাসিবার ভঙ্গি করিল। হাত দুইটা একটু আলগা মনে হইতেই চট করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া লইয়া কহিলাম, কি কাজ আছে বলুন, আমার সময় নেই।

সত্তর নিজের হাত দুইটা কোমরের দুই পাশে রাখিয়া বুক চিতাইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, কি বললে? সময় নেই? আমারও সময় নেই মাস্টারবাবু। কত ফুর্ত্তি মাঠে মারা যাচ্ছে বল দেখি, অ্যাঁ?

কহিলাম, তা হ'লে বাজে কথায় সময় নষ্ট না ক'রে কাজের কথাটা ব'লে ফেলুন।

সত্তর চোখ দুইটা একবার বুজিল, ঠোঁট দুইটায় একবার চাড়া দিল, তারপর কহিল, বলছি, কিন্তু এখানে নয়, আর একটু এগিয়ে চলুন।

লোকটার মতলব কি? কোন খুন-জখম করিবে নাকি? কিন্তু জানত কোন অপরাধ করিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ভীতকণ্ঠে কহিলাম, আবার এগিয়ে যাওয়া কেন? এইখানেই বলুন না।

সত্তর শিথিলকণ্ঠে টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিল, প্রাণের কথা কি যেখানে সেখানে বলা যায়, মাস্টারবাবু? একটু গোপনে বলতে হয়। সঙ্গের লোকটাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, এই বে রমজান, একটু আগিয়ে একটা নিরিবিলি জায়গা দেখ না। কদমগাছের তলা হ'লে সবসে ভাল।—বলিয়া বেয়াড়া সুরে গাহিয়া উঠিল, কদম্বতলে বসিয়া বিরলে (বিন্দে) বলিব প্রাণেরই কথা।

কহিলাম, ও আবার কি হচ্ছে?

সত্তর কহিল, বুঝতে পারছ না মাস্টারবাবু? তোমাদের কেষ্ট বিন্দেদূতীকে বলছে, সখী গো! ঐ কদমগাছের তলায় ব'সে আমার প্রাণের কথা বলিগে চল। আমার কাঁধে থাবা মারিয়া কহিল, তুমি

বিন্দেদূতী। নিজের বুকে চাপড় মারিয়া কহিল, আমি কেষ্ট। ডান হাতটা তুলিয়া কহিল, আর তোমার—

বাধা দিয়া কহিলাম, বুঝেছি, কিন্তু আমি কোথাও যাব না, যা বলবার এখানেই বলুন।

সত্তর হাঁক দিল, রমজান! মাস্টার যায় না যে। আয় তো-চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে যাই।

রমজান কাছে আসিয়া আমার দিকে চোখ ঠারিয়া কহিল, চলুন না বাবু, কিছু ভয় নেই আপনার। কি বলবেন শুনেই চ'লে আসবেন।—

পদব্রজে যাওয়াই শ্রেয় মনে করিলাম। সত্তর ও রমজান আমার পিছু পিছু আসিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটা সাঁকোর কাছে আসিয়া পৌছিলাম, রাস্তার দুই পাশ ইট ও সিমেণ্ট দিয়া উঁচু করিয়া বাঁধানো। কহিলাম, এইখানে বসলে হয় না?

সত্তর কহিল, এখানে কদমগাছ কই?

কহিলাম, কদমগাছ নেই এ তল্লাটে।

সত্তর ধমকের সুরে কহিল, কে বললে নেই? রমজান!

রমজান কহিল, ঠিক বলেছেন উনি, এইখানেই বসুন।

তাই বসি, তা হ'লে তুই স'রে যা এখান থেকে। রমজান দূরে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দুইজনে পাশাপাশি বসিলাম। সত্তর কহিল, সেদিন সেই যে মেয়েটিকে দেখলাম, ও আপনার বোন, নয়?

কহিলাম, নিজের বোন নয়, এমনই 'দাদা' ব'লে ডাকে।

ও, পাতানো। তা হোক, চোখ মটকাইয়া কহিল, বেশ দেখতে, নয়? যেমন রঙের জৌলুস, তেমনই আঁটসাঁট বাঁধন, বয়সও কাঁচা। চুপ করিয়া রহিলাম। সত্তর ভ্রূ দুইটা কুঁচকাইয়া মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল, তা মেয়েটার আজিজ সাহেবের সঙ্গে এত দহরম-মহরম কেন বল দেখি? সাদি করবে নাকি ওকে?

জবাব দিলাম, জানি না।

সত্তর কড়া গলায় কহিল, জান না? কিন্তু এই কথাটা জেনে রাখ, ওসব চলবে না। আমি জল-জীয়ন্ত বেঁচে থাকতে, আমার চোখের সামনে ঐ পঞ্চাশ বছরের বুড়ো যে ঐ বসরাই গোলাপকে

ছিঁড়ে নিয়ে গলায় পরবে, তা হবে না।—বলিতে বলিতে উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল, তারপর দুই মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়া বুকে একসঙ্গে এক জোড়া কিল মারিয়া কহিল, বরং জান দোব, তবু যাকে প্রাণ চায়, তাকে পরের হাতে তুলে দিতে পারব না।—বলিয়া বাম হাত বুকে রাখিয়া, ডান হাতটা তুলিয়া, আমার দিকে কটমট করিয়া তাকাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আমিও উঠিয়া দাঁড়াইবার উপক্রম করিলাম। করিতেই আমার দুই কাঁধে দুই হাতে চাপ দিয়া আমাকে বসাইয়া কহিল, যাচ্ছ কোথা? আরও কথা আছে আমার।—বলিয়া হাত দুইটা পিছনে ঝুলাইয়া ও যুক্ত করিয়া পায়চারি করিতে শুরু করিয়া দিল। আমি ভয়ে ভয়ে কহিলাম, আর কি বলবার আছে বলুন, রাত হয়ে গেল যে।

থমকিয়া দাঁড়াইয়া সত্তর কহিল, একটা কাজ করতে পার?

কহিলাম, কি?

সত্তর হাতছানি দিয়া ডাকিয়া কহিল, এখানে এস।

বসিয়া রহিলাম। কড়া গলায় ডাকিল, এস। উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কহিল, কাছে এস। ভয়ে ভয়ে কাছে গেলাম। যাইতেই আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া, উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া সত্তর কহিতে লাগিল, মাস্টার! আমার প্রেয়সীর পাতানো দাদা, প্রাণের মাস্টার! আমার বুকের ভেতরটা জ্ব'লে যাচ্ছে মাস্টার, তাকে না দেখতে পেলে আমি বাঁচব না মাস্টার।—বলিয়া আমার কাঁধে মাথা রাখিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কি করিয়া এই মাতালের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব, তাহার উপায় সম্বন্ধে আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। কহিলাম, ছেড়ে দিন উপায় বাতলে দিচ্ছি।

ছাড়িয়া দিয়া সত্তর কহিল, কি উপায় বল মাস্টার। আজই তাকে একটি বার দেখবার উপায় আমাকে বাতলে দাও। তুমি যত টাকা চাও, আমি দোব।

কহিলাম, দেখা তো আজ হবে না।

আঁতকাইয়া উঠিয়া সত্তর কহিল, দেখা হবে না? আর্তকণ্ঠে ডাক দিল, রমজান! রমজান কাছে আসিতেই কহিল, শুনছিস, কি বলছে

মাস্টার? বলছে, দেখা হবে না আজ। তা হ'লে আমি বাঁচব? রমজান ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, বাঁচিবে না। সত্তর দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিল, তবে মাস্টার? হিন্দু মুসলমানের প্রাণের দুঃখ বোঝে না ব'লেই আমাদের এত রাগ তোমাদের ওপর, তাই এত দাঙ্গা-হাঙ্গামা, এত মারামারি, বুঝলে? চুপ করিয়া রহিলাম। সত্তর বলিতে লাগিল, আমি মুসলমান কিনা, তাই আমার ওপর দরদ হচ্ছে না তোমার। সেদিন কোথাকার কে একটা হাকিমকে হিন্দু ব'লেই সরাসরি অন্দরে ঢুকিয়ে দিলে। এই একচোখোমি যতদিন না তোমাদের যাবে, ততদিন হিন্দু-মুসলমানে মিল হবে না।—বলিয়া চোখ বুজিয়া মাথাটা বার দুই নাড়িল, তারপরে চোখ খুলিয়া রাগত স্বরে কহিল, আজিজ সাহেবের বাড়ি পাঠিয়ে দাও, আর আমার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিতে পারবে না? আমার এই চাঁছা-পোঁছা চেহারার চেয়ে ওর ভালুকের মত চেহারা তোমাদের পছন্দ হ'ল?

কহিলাম, দেখা হ'লে কি করবেন আপনি?

কি করব? থপ করিয়া আমার হাত ধরিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিল, হাত ধ'রে আমার প্রাণের ব্যথা তাকে জানিয়ে আসব। (হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া) এমনই ক'রে ব'সে, (আমার করতল চুম্বন করিয়া) এমনই ক'রে চুম খেয়ে বলব, পিয়ারী! আমার প্রাণ, মান, ধন, সম্পত্তি, আমার চামড়ার কারবার পর্য্যন্ত, সব তোমার পায়ে সঁপে দিচ্ছি, তুমি আমার হও।—বলিয়া আমার মুখের দিকে ঢুলু-ঢুলু চোখে চাহিয়া রহিল।

হঠাৎ বুদ্ধি খেলিল, কহিলাম, উঠুন, আমি যা বলি শুনুন। ঐসব যদি ইচ্ছে থাকে তো আমাকে দিয়ে হবে না। মেয়েটি মনু চক্রবর্ত্তীর নিজের বোন, ওর কথা ও খুব শোনে, মরতে বললে মরে, বাঁচতে বললে বাঁচে, ওকে গিয়ে ধরুন। ওই সব ব্যবস্থা ক'রে দেবে। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সত্তর কহিল, মনু চক্রবর্ত্তী কে? আমি কহিলাম, ঐ যে ভদ্রলোক মেয়েটির পক্ষ থেকে সেদিন যুদ্ধের চাঁদা দিলে, আপ্যায়িত ক'রে সবাইকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল, বাড়ির ভেতর থেকে মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে এল।

ভ্রূ নাচাইয়া সত্তর কহিল, তাই তো, আমার ওর কথা মনে পড়ে

নি। মিথ্যে একটা বাজে লোকের সঙ্গে সময় নষ্ট করলাম। কড়া গলায় কহিল, এতক্ষণ না ব'লে চুপ ক'রে ছিলে কেন? কেন মিথ্যে এতক্ষণ সময় নষ্ট করলে?—বলিয়া রুখিয়া আসিবার উপক্রম করিতেই রাস্তার মাঝখানে সরিয়া দাঁড়াইয়া রমজানের দিকে তাকাইলাম। সে কহিল, বাবুর বোধ হয় মনে পড়ে নি, ওকে ছেড়ে দিয়ে চক্রবর্ত্তীর ওখানেই চলুন। আমাকে কহিল, চক্রবর্ত্তীর বাড়ি আমাদের দেখিয়ে দেবেন চলুন।

সত্তর লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল। আমি ও রমজান পিছু পিছু যাইতে লাগিলাম। সত্তর কতকটা আগাইয়া যাইতেই রমজানকে কহিলাম, রমজান, কাজটা ভাল হচ্ছে কি?

রমজান কহিল, কি করব বাবু? এখন কি কিছু হুঁশ আছে, একদম পাগল। সারাদিন মদ গিলেছে আজ। কোন কথা বললে শুনবে না, উল্টে মারধর করতে আসবে।

কহিলাম, কিন্তু এটা ভদ্রলোকের বাড়ি তো। মামলা-মকদ্দমায় প'ড়ে যাবে শেষে।

রমজান ভীতভাবে কহিল, সত্যি, কি করব বলুন দেখি?

কহিলাম, ভুলিয়ে-শুলিয়ে বাড়ি নিয়ে যাও।

রমজান হাঁক দিল, শুনছেন?

সত্তর থমকিয়া দাঁড়াইয়া সাড়া দিল, কি? পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া কহিল, তাড়াতাড়ি আয় না, পিছিয়ে পড়ছিস কেন?

রমজান কহিল, একবার শুনুন, কি বলছেন ইনি।

সত্তর কহিল, কি বলছে?

রমজান কহিল, বলছেন, চক্রবর্ত্তী আজ বাড়িতে নেই, আজিজ সাহেবের সঙ্গে জেলায় গেছে।

সত্তর রাস্তার উপরেই বসিয়া পড়িল। কাছে যাইতেই কহিল, আজ বুড়ো জেলায় গেছে, নয়?

রমজান ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, হ্যাঁ।

আমার দিকে তাকাইয়া সত্তর কহিল, চক্রবর্ত্তী যে ওর সঙ্গে গেছে, তা জানলে কি ক'রে?

কহিলাম, আমি নিজের চোখে দেখেছি।

লাফাইয়া উঠিয়া তাড়িয়া আসিয়া কহিল, দেখেছ তো বল নি কেন, অ্যাঁ?

রমজান সামলাইয়া লইয়া কহিল, কি করবেন উনি, মনে ছিল না বোধ হয়।

টকটকে লাল চোখের তারা দুইটা চরকির মত ঘুরাইয়া, মুখ ভেংচাইয়া সত্তর ধমকের সুরে কহিল, মনে ছিল না! মনে থাকে না কেন? মাস্টারি কর কি ক'রে?

রমজান কহিল, তবে আর দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে? বাড়ি চলুন আজ। কাল চক্রবর্ত্তী ফিরলে ব্যবস্থা করা যাবে। আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, চ'লে যান আপনি।—বলিয়া চোখের ইঙ্গিত করিল। আমি দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করিলাম এবং কতকটা রাস্তা আসিয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলাম, রমজান সত্তরকে পাকা রাস্তা হইতে নামাইয়া মাঠের দিকে ধরিয়া ধরিয়া লইয়া যাইতেছে।

দেহ ও মন দুইয়ের অবস্থা অত্যন্ত কাহিল হইয়া উঠিয়াছে। ডলাই-মলাইয়ের চোটে মাথা হইতে কোমর পর্য্যন্ত পাকা ফোড়ার মত টনটন করিতেছে; কাঁধের কাছে জামাটা চোখের জলে ও মুখের লালায় ভিজিয়া গিয়াছে; সারা দেহে মদের তীব্র গন্ধ। বাড়িতে গিয়া গৃহিণীর কাছে কি কৈফিয়ৎ দিব, তাহা ভাবিয়া কূল-কিনারা পাইতেছি না। তা ছাড়া ঐ পাষণ্ডটার উপরে রাগে ও ঘৃণায় মনের ভিতরটা জ্বালা করিতেছে। কি পাপিষ্ঠ বলুন দেখি! একজন ভদ্রমহিলার প্রতি পাশবিক মনোভাব একজন ভদ্রলোকের কাছে প্রকাশ করিতে তো বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয়ই নাই, তাহার উপর ঐ দুষ্কর্ম্মে সাহায্য করিবার জন্য তাহাকে টানাটানি, অপমান ও ভয়-প্রদর্শন! কি মনে করে ইহারা? হিন্দুর মেয়ের মান-মর্য্যাদা মাটির মূল্যে নামিয়া গিয়াছে নাকি? না, মা-বোন ও স্ত্রীদের সম্ভ্রম ও সতীত্ব রক্ষা করিবার সামর্থ্য বাঙালী হিন্দু হারাইয়া ফেলিয়াছে? সরোজিনীর উপর রাগ হইল। কেন সে নিজেকে এত সুলভ করিতেছে? আজিজ সাহেবের বাড়ি যাইবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল? যাহাদের মন হইতে নারীদেহের প্রতি পশু-সুলভ নির্ব্বিচার লোভ শিক্ষা ও সংস্কৃতির জারক-রসে এখনও

নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় নাই, তাহাদের সামনে দাঁড়াইবার তাহার কি প্রয়োজন? লেখাপড়া শিখিয়া আপ-টু-ডেট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া কি? যদি নিপীড়ন করে, ধর্ষণ করে, আত্মরক্ষা করিতে পারিবে কি? তাহার পুরুষ আত্মীয় ও বন্ধুরা, মনু চক্রবর্ত্তী, তিনু ও তাহার দলবল তাহার মর্য্যাদাহানির প্রতিশোধ লইতে পারিবে কি? পারিবে না। সকলে দিন কয়েক হৈ-চৈ করিবে, বাহ্বস্ফোট ও বাগাড়ম্বর করিবে, পুলিস ডাকিবে, সরকারের কাছে দরবার করিবে ও কান্নাকাটি করিবে। কিন্তু একজন অসভ্য, অশিক্ষিত সাঁওতাল পুরুষের মত নারীর প্রতি অপমান ও অত্যাচারের নিজের হাতে প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া ছুটিবে না। আমি কি করিলাম? লেখাপড়া শিখিয়া সভ্য হইয়াছি, সুনাম রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া আছি, তাই ঐ পাষণ্ডটাকে সঙ্গে সঙ্গে চড় কষাইয়া দিয়া তাহার অন্যায় চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতে পারিলাম না, চুপ করিয়া ভয়ে ভয়ে পলাইয়া আসিলাম। শুধু আমারই কি এই অবস্থা? শিক্ষিত, সভ্য সমগ্র হিন্দু-সমাজের পুরুষদের এই অবস্থা। প্রতিদিন হিন্দুনারীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিয়া বা তাহার কাহিনী সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া আমরা ক্রোধে ও ক্ষোভে আগুন হইয়া উঠি। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। পরমুহূর্ত্তেই প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাসে অন্তর্বাষ্প বিমুক্ত করিয়া দিয়া সিগারেট ধরাইতে বসি অথবা কর্ম্মান্তরে বা প্রসঙ্গান্তরে প্রস্থান করি। আমাদের মধ্যে যাহারা 'আমরা তরুণ, আমরা সবুজ' বলিয়া আস্ফালন করে, পায়জামা ও হাত-কাটা হাফ-কোট পরিয়া কমরেড সাজিয়া, 'বিশ্বের যুবক এক হোক, বিশ্বের শ্রমিক এক হোক, বিশ্বের ছাত্র এক হোক' ইত্যাদি বুলি বলিয়া হুঙ্কার ছাড়ে, তাহারাও তাই। ইহারা কুঠিতে ও কারখানায়, কলেজে ও স্কুলে, অকারণে বা স্বল্পকারণে ধর্ম্মঘট করিয়া বা করাইয়া, তারুণ্য-কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি করে, কর্ত্তৃপক্ষদিগকে মারধর করিয়া বা করিবার ভয় দেখাইয়া, মাস্টার ও প্রফেসারদের অপমান করিয়া, কর্ত্তব্য ও নিয়ম-নিষ্ঠ সহকর্ম্মী বা সহতীর্থদের নির্য্যাতন করিয়া বীরত্ব প্রদর্শন করে, কিন্তু মা-বোনদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার কালে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়া নির্ব্বিকার দাঁড়াইয়া থাকে। না হইলে, দিনের পর

দিন ধর্ষিতা নারীর ক্রন্দন বাংলার আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে, আদালত-গৃহ হইতে হাকিমের চক্ষের সম্মুখে, পাষণ্ডের দল পশুর মত হতভাগিনী-দের ছিনাইয়া লইয়া গিয়া মাংসপিণ্ডের মত লোফালুফি ও কাড়াকাড়ি করিতেছে, তাহা শুনিয়া ও দেখিয়া তাহাদের তরুণ রক্ত তিলমাত্র তাতিয়া উঠে না তো। কাজেই যে সমাজের পুরুষরা মেষ হইতেও ভীরু, পাষাণের চেয়েও প্রাণহীন, সেই সমাজের মা-বোনদের সতর্ক হইয়া চলা উচিত। তাহাদের বোঝা উচিত, এদেশে সম্ভ্রম, সতীত্ব ও ধর্ম্ম আমরণ বজায় রাখিতে হইলে পুরুষ-মুখাপেক্ষিতা ছাড়িয়া, হয় তাহারা নিজেরা শক্তিময়ী হইয়া উঠুক, না হয় অন্দরের ভিতরে অন্দর গাঁথিয়া সেখানে লুকাইয়া থাকুক, অথবা বোরখার উপরে বোরখা আঁটিয়া নিজেদের দুর্নিরীক্ষ্য করিয়া তুলুক।

১৮

দিন চার পরে—সকালবেলায় বৈঠকখানার সামনে হাঁক শোনা গেল, মাস্টার, ও মাস্টার, বেরোও না হে!

তাতাতাড়ি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, মণীন্দ্র। আমাকে দেখিয়া কহিল, ওহে, তোমার সঙ্গে একটা দরকার আছে, শোন দেখি।

কহিলাম, এখানে দাঁড়িয়ে কেন? ঘরে এসে ব'সে যা বলবার বল। হাতের ছাতাটা লাঠির মত উঁচাইয়া মণীন্দ্র কহিল, মাস্টার কিনা, সময়ের মূল্য তো বোঝ না, অনেক কাজ আমার—

কহিলাম, যত কাজ তোমার, জানা আছে, এস তো।—বলিয়া ঘরের ভিতরে আসিয়া বসিলাম।

মাস্টারি করলে যে বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকে না—লোকে বলে, মিথ্যে নয়। আমার কাজ নেই তো গাঁয়ে কার কাজ আছে, শুনি? এত বড় একটা এস্টেটের ম্যানেজারি, তার ওপর মাথার ওপরে মেয়ের বিয়ে।—বলিতে বলিতে মণীন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া চেয়ারে বসিয়া টেবিলে পা দুইটা তুলিয়া দিয়া কহিল, এক কাপ চা খাওয়াতে পার? খাই নি যে তা নয়। তবে বৌমার হাতের চায়ের মত মিষ্টি চা গাঁয়ে আর কেউ তৈরি করতে পারে না, সরোজিনী পর্য্যন্ত না। বাড়িতে ঢুকিয়া চায়ের জন্য বলিয়া ফিরিয়া

আসিয়া দেখিলাম, মন্থদা চেয়ারে ঠেস দিয়া ঢুলিতেছে। তন্দ্রা না ভাঙিয়া আবার বাড়ির ভিতরে গেলাম এবং চা লইয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন মন্থদার রীতিমত নাক ডাকিতে শুরু করিয়াছে। চায়ের পেয়ালাটি টেবিলে নামাইয়া মন্থদাকে নাড়া দিতেই সে দুই রক্ত-চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া রুক্ষস্বরে কহিল, কি? কহিলাম, চা খাবে না, ঘুমুচ্ছ যে এই সকালবেলায়? মন্থদা সোজা হইয়া বসিয়া মাথা নোয়াইয়া চায়ে চুমুক দিয়া কহিল, আঃ! ভারী ভাল লাগছে ভায়া। প্রশ্ন করিলাম, কাল রাত্রে ঘুমোও নি নাকি? মণীন্দ্র জবাব না দিয়া প্লেটে চা ঢালিয়া কয়েক প্লেট খাইয়া কহিল, না।

কেন?

গরুর গাড়িটা চাল-ডাল-নুন-মসলা-তরিতরকারি-হাঁড়ি-বেড়ি-কড়াই-গামলাতে এমনই ঠাসাই হয়েছিল যে, সোজা হয়ে ব'সে থাকাই যায় না তো ঘুমুব কি?

মানে?

আরে, ফুটির বিয়ের জন্যে জিনিসপত্র কিনতে গিয়েছিলাম যে, কাল রাত্রে গরুর গাড়িতে ক'রে সব নিয়ে ফিরলাম।

কবে বিয়ে?

আজই রাত্রে। তাই তো নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছি, আর তোমার মত অকর্ম্মার পাল্লায় প'ড়ে আটকে গেছি। আজ রাত্রে তোমার নেমন্তন্ন সরোজের ওখানে। ঐখানেই বিয়েটা হচ্ছে কিনা। তবে একেবারে খাবার জন্যেই যেও না, একটু সকাল-সকাল যেও। আমার অবশ্য লোকের অভাব নেই, দারোগাবাবু আর আজিজ সাহেবের কৃপায় সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তা হ'লেও একটু দাঁড়িয়ে দেখো-শুনো আর কি।

আর কাকে কাকে নেমন্তন্ন করলে?

ভ্রূ নাচাইয়া মণীন্দ্র কহিল, কেন? গাঁয়ের সবাইকে। আমার কর্ত্তব্যে আমি ত্রুটি করব কেন? যার ইচ্ছে হয় যাবে, না হয় না যাবে। খাওয়ার লোকের অভাব নেই। তবে খাবারের যা ফিরিস্তি দিয়েছি, অনেকেই যাবে ব'লে মনে হচ্ছে। ওঃ, তোমাকে দেওয়া হয় নি, না?—

বলিয়া ফতুয়ার পকেট হইতে একটি মোড়ক-করা লাল রঙের চিঠি বাহির করিয়া আমার হাতে দিয়া কহিল, তোমার চিঠি।

কহিলাম, ওরে বাবা! বিয়ের চিঠি ছাপিয়েছ দেখছি যে!

দুই চোখ বড় করিয়া মণীন্দ্র কহিল, ছাপাব না? যে সে লোকের মেয়ের বিয়ে নাকি? পাঁচশো চিঠি ছাপিয়েছি। গাঁয়ের সবাইকে এক-একখানা ক'রে দিয়েছি, প'ড়ে দেখ না।

খুলিয়া পড়িতে লাগিলাম। সর্ব্বোপরি লেখা রহিয়াছে, প্রজাপতয়ে নমঃ, তাহার নীচেই একটি প্রসারিতপক্ষ প্রজাপতির ছবি, তারপর সবিনয়ে নিবেদন করা হইয়াছে। গঙ্গাধর চট্টরাজের পুত্র তিনকড়ি চট্টরাজের সহিত মণীন্দ্র চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী ফুল্লরা দেবীর শুভ-বিবাহ হইবে। তারপর সবান্ধবে সকলকে বিবাহে যোগদান করিতে অনুরোধ করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে জানানো হইয়াছে যে, লৌকিকতার পরিবর্ত্তে কন্যা-জামাতার জন্য আশীর্ব্বাদই নিমন্ত্রণকর্ত্তার প্রার্থনীয়।

মণীন্দ্র এতক্ষণ একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকাইয়া ছিল, পড়া শেষ হইতেই কহিল, উল্টো পিঠটা পড়। উল্টাইয়া দেখিলাম, ভোজ্য ও পেয়ের লম্বা ফিরিস্তি দেওয়া হইয়াছে। লবণ ও জল হইতে আরম্ভ করিয়া লুচি পোলাও, মাছ মাংস, সন্দেশ রসগোল্লা, মিহিদানা সীতাভোগ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মণীন্দ্র মুচকি হাসিয়া কহিল, কি রকম দেখছ? কেউ না গিয়ে পারবে? ঘাড় নাড়িয়া কহিল, সব নাক ডুবিয়ে খেয়ে আসবে, দেখো। ভারী গলায় কহিলাম, আমি কিন্তু খেতে পারব না।

মণীন্দ্র পরম বিস্ময়ের সহিত কহিল, সে কি হে? তোমার আবার এসব—। বাধা দিয়া কহিলাম, আমি বিয়েতে যোগ দোব, যা করতে-কর্ম্মাতে বলবে করব, কিন্তু—। বাধা দিয়া মণীন্দ্র কহিল, দেখ মাস্টার, বোকামি ক'রো না। এ তোমার পাড়াগাঁয়ের ভোজ নয়, আর সদী পদী দামী ক্ষেমী যার-তার হাতের রান্নাও নয়। সব জিনিস শহর থেকে আনা হয়েছে, আর হালুইকর রাঁধুনীও এসেছে সেখানে থেকে। যদি না খাও তো পস্তাবে শেষে।

চুপ করিয়া রহিলাম। মণীন্দ্র ঝাঁজের সহিত কহিল, বাড়িতে যে

কি খাও, তা জানা আছে। জীবনে একবার আমার ঘাড় দিয়ে মুখটা একবার বদলে নিতে পারতে, তবে অদৃষ্টে আবার থাকা চাই তো! না হ'লে এমন সুযোগ পেয়েও এমন মতিচ্ছন্ন!

বাধা দিয়া দৃঢ়কণ্ঠে কহিলাম, যাই খাওয়াও, আমি আজ খেতে পারব না। দলাদলিতে কোন পক্ষে থাকা আমার উচিত নয়। আজ যেমন তোমার বাড়িতে খাচ্ছি না, সেদিন তেমনই গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে খাই নি। অন্যদিন বল তো ডাল-ভাত খেয়ে আসতে পারি।

মণীন্দ্র কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল, তাই ক'রো। মোদ্দা আজ কিন্তু যাওয়া চাই, না হ'লে সরোজিনী দুঃখু করবে। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, বেশ, আজ না খাও, পরশু খেতে তো আপত্তি নেই?

কহিলাম, পরশু আবার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপার আছে নাকি?

মাথায় ঝাঁকানি দিয়া মণীন্দ্র কহিল, তা আর নেই? বড় বড় লোক সব খাবে পরশু—এস. ডি. ও. সাহেব, দারোগাবাবু, আজিজ সাহেব আর তার হবু জামাই সত্তর সাহেব।

কহিলাম, আজিজ সাহেবদের আবার কেন?

বা রে! আজিজ সাহেবকে নেমন্তন্ন করব না? কি সাহায্য করেছে বল দেখি! ও না থাকলে এস. ডি. ও. সাহেব কি এত খাতির করত? তা ছাড়া বিয়েতেও কম সাহায্য করে নি। জিনিসপত্তর কিনে দিয়েছে, আনবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। যত মাছ লাগবে, সব নিজের পুকুর থেকে ধরিয়ে দিচ্ছে।—বলিয়া কিছুক্ষণ দম লইয়া কহিল, তা ছাড়া নতুন আত্মীয়তাও হয়েছে ওর সঙ্গে যে। বিস্ময়ের ভান করিয়া কহিলাম, সে আবার কি?

কেন? জান না তুমি? আজিজ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে সরোজ ধর্ম্ম-মেয়ে পাতিয়েছে।

গম্ভীর মুখে কহিলাম, দেখ মনুদা, মুসলমানদের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠতা করা ভাল হচ্ছে কি?

কপাল কুঁচকাইয়া মণীন্দ্র কহিল, মন্দটা কি শুনি? আপাতত ত্রিশ-চল্লিশ টাকার মাছ পাওয়া যাচ্ছে। তা ছাড়া লোকজনের সুবিধে।

পরে আরও কত উপকার পাওয়া যাবে ওর কাছ থেকে। ওহে, তোমাদের মত হেঁজি-পেঁজি লোক নয়, হাকিমরা একেবারে ওর মুঠোর মধ্যে।—বলিয়া ডান হাতটা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আমার নাকের কাছে ধরিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ওসব তোমাদের মাস্টারী মাথায় আসবে না। সাত চাল ভেবে কাজ করে মনু চক্রবর্ত্তী। তার একটা চালের তাৎপর্য্য বুঝতে তোমাদের মত রামা-শ্যামাদের আধ-কপালে ধ'রে যাবে।

দম লইয়া কহিল, চলি তা হ'লে, অনেক কাজ; তোমার পাল্লায় প'ড়ে অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেল। মোদ্দা যেও কিন্তু। তারপর চোখ মটকাইয়া কহিল, সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে না হয় লুকিয়ে ব'সে এক পাত খেয়ে আসবে এখন, কি বল?—বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

বিকালে স্কুল হইতে ফিরিবার পর পত্নী কহিলেন, আজ পদ্ম এসে কান্নাকাটি করছিল।

কহিলাম, কেন?

পত্নী কহিলেন, কি করবে? ছেলে ঝগড়া করছে দিনরাত।

সবিস্ময়ে কহিলাম, কে, প্রকাশ?

স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, হাঁ।

কহিলাম, প্রকাশ তো ও রকম ছেলে নয়, ছেলে তো ভাল।

কিন্তু সরোজিনীর পাল্লায় পড়েছে কিনা।

মানে?

সেই যে দুদিন মূর্চ্ছার সময়ে সরোজিনীকে দেখতে গিয়েছিল, তারপর থেকেই কেমন ওর মন বিগড়ে গেছে। মেয়েটা মন্ত্র-তন্ত্র কিছু জানে বোধ হয়, না হ'লে তোমার মত—

বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম, প্রকাশ করছে কি?

দিন দুবেলা সরোজিনীর বাড়ি যাচ্ছে। পদ্ম কত মানা করেছে, দিব্বি দিয়েছে, গালাগালি দিয়েছে, পায়ে মাথা পর্য্যন্ত ঠুকেছে, কিছুতেই শুনছে না। আজ ঐ নিয়ে মা-বেটায় ধুম ঝগড়া হয়ে গেছে।

কহিলাম, গেলেই বা, তাতে পদ্মর অত ঝগড়া করবার কি আছে?

তুমি বলবে বইকি; একই পথের পথিক কিনা! যাকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি, সে যদি অগ্রাহ্যি করে, তাতে মেয়েমানুষের যে কি হয়, তা তারাই বোঝে। তোমরা বুঝবে না। এই ধর, পদ্ম যখন তিনকড়ির বিয়েতে যেতে মানাই করেছে, তখন প্রকাশের যাবার দরকার কি?

কহিলাম, তা হ'লে তিনকড়ির বিয়েতে যাওয়ার জন্যেই আজকের ঝগড়া?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হুঁ, তাই তো।

কহিলাম, পদ্মর ভারী অন্যায়। বন্ধুর বিয়েতে যোগ না দিয়ে কেউ পারে?

স্ত্রী ধমক দিয়া কহিলেন, বন্ধুর জন্যে নয়, একদিন চাঁদমুখ না দেখে থাকতে পারেন না, তাই।

সবিস্ময়ে কহিলাম, কার? সরোজিনীর?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, না।

অধিকতর বিস্ময়ের সহিত কহিলাম, তবে কার? ফুন্টির?

পত্নী এবারও ঘাড় নাড়িয়া জানাইলেন, না।

বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া কোনমতে কহিলাম, তবে?

পত্নী মুচকি হাসিয়া কহিলেন, মিন্টার।

আকাশ হইতে পড়িয়া কহিলাম, সত্যি?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, হ্যাঁ সত্যি, বাউরীপাড়ার সবাই চোখে দেখেছে।

ওরা দেখবে কি ক'রে?

ঐ দিকেই যে রোজ রাত্রে বেড়াতে যায় দুজনে। হাত-ধরাধরি ক'রে সাতঘেটে পুকুরের পাড়ে পাশাপাশি ব'সে থাকে; মিন্টা নাকি আবার গান গায়।

কহিলাম, দূর, ওসব মিথ্যে গুজব।

পত্নী গম্ভীর হইয়া কহিলেন, মিথ্যে, না সত্যি, পরে টের পাবে। হাত-ধরাধরি ক'রে বেড়িয়ে আর গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সেই তো ওরা নিরস্ত হবে না, একটা কিছু অঘটন ঘটাবেই। তখন জানতে পারবে সবাই। চুপ করিয়া রহিলাম। পত্নী কহিতে লাগিলেন, পদ্ম

সরোজিনীর পেছনে লেগেছিল ব'লেই বোধ হয় ও শোধ নিচ্ছে। কিন্তু কড়ুই-রাঁড়ীর একমাত্র ছেলেকে কেড়ে নিয়ে যে শোধ নিতে পারে, সে মেয়েমানুষ নয়, রাক্ষুসী।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, পদ্মর কান্না যদি আজ দেখতে তো চোখের জল রাখতে পারতে না। চুপ করিয়া থাকিয়া উচ্ছ্বসিত করুণার আলোড়ন কিঞ্চিৎ সামলাইয়া কহিলেন, বলছে, গাঁয়ে থাকবে না, একে তো টেঁকি মেয়ে, সবাই যে মুখের সামনে ঠাট্টা-টিটকিরি করবে, তা ও সহ্য করতে পারবে না।

ওর আবার যাবার জায়গা কোথায়? শ্বশুরঘর তো দামোদরের গর্ভে।

পত্নী নাকী সুরে কহিলেন, ওর যে এক ভাশুর আছে, সোনামুখীর কাছে কোন্ এক গাঁয়ে এসে বাস করছে, সেইখানে থাকবে বলছে।

প্রকাশ মত দিয়েছে?

খুব। বলছে, যেখানে ইচ্ছে চ'লে যাও, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তোমার। তাই তো পদ্মর দুঃখ, যে ছেলে আজ পর্য্যন্ত মায়ের আজ্ঞা ছাড়া জল পর্য্যন্ত খায় নি, এক পা কোথাও যেতে হ'লে মাকে জিজ্ঞাসা করত, মার কাছে ছাড়া আজ পর্য্যন্ত কোথাও শোয় নি, সেই ছেলের মুখে ঐ কথা! যাদু না জানলে কেউ অমন ক'রে মন বিগড়ে দিতে পারে? তাই তো ভয় হচ্ছে, তুমি যে রকম—

বাধা দিয়া কহিলাম, বীরু আচায্যি জানে?

পত্নী ঠোঁট উল্টাইয়া কহিলেন, কে জানে? একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, ওরা তো মেয়ে-বেচা ঘর। প্রথম বার বিয়ে দিয়ে নগদ হাজার টাকা পেয়েছিল। তার ওপর বিধবা মেয়েকে ঘরে আটকে গয়না-গাঁটিগুলোও সব হাতিয়েছে। নগদ দাম পেলে আর একবার বিয়ে দিতে ওর আপত্তি কিসের?

কহিলাম, প্রকাশ হাজার টাকা দেবে? পনরো টাকা মাসে মাইনে পায়—

টাকা দেবে তোমার সরোজিনী। গাঙুলী বুড়োকে জব্দ করবার জন্যে দুশো টাকা যুদ্ধের চাঁদা দিলে, আর পদ্মকে জব্দ করবার জন্যে

টাকা খরচ করবে না? তা ছাড়া নগদ টাকাই বা খরচ করতে হবে কেন? বাড়ি-বন্ধকী দলিলটা যদি ফিরিয়ে দেয় তো বীরু আচায্যি শুধু বিধবা মেয়েটাকে কেন, আইবুড়ো ছোট মেয়েটাকে সুদ্ধ ফাউ ধ'রে দেবে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তুমি এত খবর জানলে কি ক'রে?

মুচকি হাসিয়া পত্নী কহিলেন, সব জানি। বাড়িতে আটক থাকলে কি হবে, বাইরে কোথায় কি হচ্ছে, কে কি করছে, সব খবর আমাদের কানে এসে পৌছয়।

কৃত্রিম ভয়ের সহিত কহিলাম, লোকের মনের খবরও টের পাও নাকি?

পত্নী ঘাড় নাড়িয়া সহাস্যে কহিল, হুঁ, সব টের পাই। বিশেষ ক'রে তোমার মনের খবর। যখনই কারও কথা ভাব, তখনই বুঝতে পারি। গম্ভীর হইয়া কহিলেন, তাড়াতাড়ি নাও, আমাকে একবার যেতে হবে।

প্রশ্ন করিলাম, কোথায়?

গোবিন্দ-ঠাকুরঝি এসে অনেক ক'রে ব'লে গেল, বর বেরোবার সময় একবার যেতে। রাত্রে আজ রান্না-টান্না করব না, তোমার তো নেমন্তন্ন আছে।

কহিলাম, থাকলেই বা, আমি গিয়ে বিয়ে দেখেই ফিরে আসব।

বিস্ময়ের সহিত পত্নী কহিলেন, কেন? হরেক রকমের খাবারের আয়োজন করেছে, খেয়ে আসবে না? গাঁয়ের সবাই খাবে।

দৃঢ়কণ্ঠে কহিলাম, না। আমি এত পেটুক নয় যে, যাকে সমাজ থেকে পতিত করা হয়েছে, তার বাড়িতে সামাজিকভাবে খেয়ে আসব।

গৃহিণী মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিলেন, সামাজিকভাবে খেতেই বুঝি দোষ, এমনই যখন তখন খেতে দোষ নেই?

কহিলাম, না।

গৃহিণী ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিলেন, কিন্তু সরোজিনী কি ছেড়ে দেবে তোমাকে? এত ভালবাসা।

কহিলাম, ভালবাসা নয়, ভক্তি।

ঘাড় নাড়িয়া পত্নী কহিলেন, ভালবাসা গাঢ় হ'লেই ভক্তি। তা যাই হোক, ও যদি খেতে বলে?

বীরত্বব্যঞ্জক স্বরে কহিলাম, তা হ'লেও খাব না, স্পষ্ট ব'লে দোব, খাওয়া চলবে না।

পত্নী হাসিয়া কহিলেন, তা তুমি পারবে না। মুখ ফুটে বলা দূরে থাক, সরোজিনী যদি ইশারায় একবার বলে তো শুধু খাওয়া কেন, এঁটো পাত চাটতে ব'সে যাবে তুমি।

সতেজে কহিলাম, পাগল হয়েছ নাকি? কি মনে করেছ তুমি? সরোজিনী পায়ে ধরলেও খাব না আমি।

পত্নী মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেই লাগিলেন। কাজেই ভারী গলায় কহিলাম, ওসব বাজে কথা যাক, রাতের খাবার তৈরি ক'রে তবে যেখানে হোক যেও। মুড়ি-টুড়ি গিলতে পারব না আমি।

পত্নী আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, আজ্ঞে হুজুর, খাবার তৈরি করা হয়েছে, তুমি যে ওখানে খাবে না, তা আগেই জানতাম।

কি ক'রে জানলে?

সকালে মনু চক্রবর্ত্তীকে বলছিলে, শুনেছিলাম যে।

সব কথা শুনেছিলে?

মৃদু হাস্য সহকারে ঘাড় নাড়িয়া পত্নী কহিলেন, হুঁ, সব কথা।

বিকালে গাঙুলী মশায়ের বাড়িতে হাজির হইলাম। চিন্তিত মুখে গালে হাত দিয়া বসিয়া ছিলেন। অবস্থাটা অনেকটা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষভাগে দুর্য্যোধনের মত দেখাইল। আমাকে দেখিয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। কাছে যাইতেই কহিলেন, মনু চক্রবর্ত্তীর ওখানে নেমন্তন্ন নেই?

বসিয়া কহিলাম, আছে।

জিজ্ঞাসা করিলেন, যাবে না?

কহিলাম, যাব একবার দেখতে, খাব না।

হুঁ।—বলিয়া গাঙুলী মশায় প্রচণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, রাধানাথকে দেখছি না?

ক্ষুব্ধকণ্ঠে গাঙুলী মশায় কহিলেন, আসে নি দুদিন, কি মতলব কে জানে? হয়তো ভেতরে ভেতরে—। বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে কহিলেন, ওর ভগ্নীপতিটি ও দলের মস্ত চাঁই কিনা। ওই নাকি রিয়ের পুরোহিত।

সান্ত্বনা দিয়া কহিলাম, না, ইচ্ছে থাকলেও চক্ষুলজ্জায় পারবে না। তা ছাড়া মাতুল মশায়টি তো এখনও ওর বাড়িতেই রয়েছে।

কিঞ্চিৎ উৎসাহিত হইয়া গাঙুলী মশায় কহিলেন, সে কথা আর ব'লো না। এখান থেকে নড়তে চাইছে না। চব্য-চোষ্য আহার চলছে দুবেলা, দিন দুসের দুধ, সিকি তোলা আফিং। জমিদারির ভাগ বসাতে গিয়ে রাধানাথ বেশ ফ্যাসাদে পড়েছে।

কহিলাম, রাধানাথ স্পষ্ট ব'লে দিক না—আসল কাজই যখন হ'ল না, এবার স'রে পড়ুন।

তা বলতে পারছে কই? লোভটা একেবারে ছাড়তে পারছে না কিনা। তা ছাড়া বুড়ো অনেক ধাপ্পা মেরেছে, বড় বড় জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ওর ছাত্র, ওর কথায় সব ওঠে বসে, তাই তাড়াতে সাহস করছে না, পাছে কোন ফ্যাসাদে ফেলে দেয়।

কহিলাম, প্রবোধ গাঙুলীর ভাগনেকে আসবার জন্যে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার কি হ'ল?

বিরক্তিতে সারা মুখ কুঁচকাইয়া গাঙুলী মশায় কহিলেন, সে বেটা ম'রে গিয়েছে মাসখানেক আগে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ভায়া! পড়তা যখন খারাপ চলে, তখন পাকা গুটিও কেঁচে যায়।

উঠিয়া দাঁড়াইতেই গাঙুলী মশায় কহিলেন, ওখানেই যাচ্ছ নাকি?

কহিলাম, আজ্ঞে হ্যাঁ।

গাঙুলী মশায় কহিলেন, খেও-দেও না, কি দরকার গোলমালের মধ্যে গিয়ে? দেখে শুনেই স'রে প'ড়ো, আর পাড়ার কে কে খেলে একটু নজর রেখো।

রাস্তায় ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা হইল। বেশ সাজিয়া-গুজিয়া চলিয়াছেন, পরিধানে ধোপদুরস্ত ধুতি ও পাঞ্জাবি, পায়ে পাম্প-শু। সঙ্গ লইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় চলেছেন মশায়?

ডাক্তারবাবু কহিলেন, এই যে! মনু চক্রবর্ত্তীর বাড়ি; ওঁর মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছেন কিনা।

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিলাম, বলেন কি? মনু চক্রবর্ত্তীর নিমন্ত্রণে চলেছেন? বন্ধুবিচ্ছেদ হবে না তো?

ডাক্তারবাবু ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, তার মানে? বন্ধু আবার কে? কেন রাধানাথ?

ডাক্তারবাবু সক্ষোভে কহিলেন, দেখুন মাস্টার মশায়, আপনার কাছ থেকে এ কথা শুনব আশা করি নি। আমি বিদেশী, তার ওপর ডাক্তার। আমার এখানে বন্ধুও কেউ নেই, শত্রুও কেউ নেই, আপনারা সকলেই আমার কাছে সমান।

কহিলাম, না না, এমনই ঠাট্টা ক'রে বলছিলাম।

ডাক্তারবাবু গম্ভীর মুখে বলিতে লাগিলেন, ঠাট্টাই করুন আর যাই করুন, ডাক্তারের পক্ষে এ বড় দুর্নাম। এই দেখুন না, মনুবাবুর বোনের মূর্চ্ছার সময় নিজে যেতে পারলাম না, নিজের তখন হাড়ভাঙা ডেঙ্গুজ্বর, নড়তে-চড়তে পারি নি কদিন, তাতেই বিবেক রাতদিন মনের গায়ে দাঁত বসাচ্ছে।—বলিয়া মুখে এমনই ভাব প্রকাশ করিলেন, যেন এখনও বিবেক-দংশন চলিতেছে।

মনুর বাড়িতে পৌঁছিতেই, ডাক্তারবাবুকে দেখিয়া সকলে হৈ-হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল, প্রকাশ সর্ব্বাগ্রে এবং তাহার পিছু পিছু মণীন্দ্র ও নিমন্ত্রিতদের অনেকে। যতই হোক, সরকারী চাকুরে তো। তা ছাড়া আজকার অনুষ্ঠানে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র সরকারের প্রতিনিধি। মনু কহিল, এই যে, এসেছেন সময় ক'রে। ভাবলাম—

ডাক্তারবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, বিলক্ষণ! আসব না? আপনার মেয়ে আর আমার মেয়ে কি আলাদা?

মণীন্দ্র গর্ব্বে ও আত্মপ্রসাদে মুখ হাঁড়ি করিয়া সকলের দিকে তাকাইয়া নিজের পদমর্য্যাদা সমঝাইয়া দিতে লাগিল। প্রকাশ রাস্তা দেখাইয়া কহিল, আসুন। তাহার পিছু পিছু ডাক্তারবাবু চলিলেন। আমিও বিনাবাক্যব্যয়ে অনুসরণ করিলাম, কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। একটা কথা বলিয়াও কেহ আপ্যায়িত করিল না। যাহার

মেয়ের বিয়েতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিয়াছি, সরকারী চাকুরের আওতায় পড়িয়া, তাহার কাছেও নগণ্য হইয়া গেলাম। নিজের লোক, আমাকে আপ্যায়ন করিবার আবশ্যক কি?—বলিয়া মনকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে প্রবোধ না মানিয়া অভিমানী বালকের মত মুখভার করিয়া রহিল।

বৈঠকখানার বারান্দায় একটা চেয়ারের উপরে সকলে ধরাধরি করিয়া ডাক্তারবাবুকে বসাইয়া দিল। প্রকাশ একটা খোলা সিগারেটের টিন হইতে সিগারেট দিল। কে একটা ছেলে একটা থালায় করিয়া পান আনিয়া হাজির করিল। আমিও একটা পান তুলিয়া মুখে পুরিলাম, একটা সিগারেট চাহিয়া লইয়া ধরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চারিদিকের ব্যাপারটা দেখিতে লাগিলাম। বৈঠকখানার ভিতরে একটা শতরঞ্জির উপরে গালিচা পাতা, তাহার ঠিক মাঝখানে পিঠে তাকিয়া ও দুই পাশে মখমলের বালিশ লইয়া তিনু খাড়া হইয়া বসিয়া আছে, এবং তাহাকে ঘেরিয়া তাহার অনুচরবৃন্দ কেহ বসিয়া আছে, কেহ বা শুইয়া পড়িয়াছে। উঠানের দিকে তাকাইতেই দেখিতে পাইলাম, রাধানাথ ও গাঙুলী ছাড়া পাড়ার আর কেহ আসিতে বাকি নাই, এবং প্রত্যেকে শুধু নিজে আসে নাই, পুত্রকন্যাসমেত আসিয়াছে, নেহাত নিমন্ত্রণ-পত্রে বিশদভাবে লেখা ছিল না বলিয়া, স্ত্রীটিকে লইয়া আসিতে পারে নাই। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাহারা বালক-বালিকা পর্য্যায়ে পড়ে, তাহারা উঠানে ছুটাছুটি, মারামারি ও চেঁচামেচি করিতেছে; এবং যাহারা নেহাত শিশু, তাহারা কেহ পিতৃক্রোড়ে, কেহ বা মাটিতে বসিয়া কান্না শুরু করিয়াছে। মনু চক্রবর্ত্তী উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছে এবং তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া কতকগুলা লোক গভীর মনোযোগের সহিত বক্তৃতা শ্রবণ করিতেছে। ভাল করিয়া কান পাতিয়া শুনিতে পাইলাম, মণীন্দ্র দুই হাতের করতল প্রসারিত করিয়া বলিতেছে, মিষ্টি দশ রকম, বোঁদে, রসগোল্লা, পানতুয়া, মতিচুর, মিহিদানা, সীতাভোগ, মণ্ডা, জিলিপি, ক্ষীরমোহন, চমচম।

শ্রোতাদের মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল, মিহিদানা কি খাস বর্দ্ধমান থেকে আমদানি? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর হইল, হ্যাঁ গো। খাস বর্দ্ধমানের,

লোক পাঠিয়ে আনানো হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা! যার-তার বাড়ির কাজ নয়।

সকলে সমস্বরে সমর্থন করিল, সত্যি।

কে আবার প্রশ্ন করিল, পোলাওয়ে মাংস, না মাছ দেওয়া হয়েছে?

মণীন্দ্র উত্তর দিল, মাংস। ইয়া বড় পাঁঠা কাটা হয়েছে।—বলিয়া দুই হাত দিয়া পাঁঠার দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, আর এত বড় দাড়ি।—বলিয়া নিজের চিবুকের নীচে ডান হাত রাখিয়া দাড়ির দৈর্ঘ্য নির্দ্দেশ করিল।

শ্রোতৃমণ্ডলী একসঙ্গে মুখভার করিয়া ছলছল নেত্রে বলিয়া উঠিল, দেড়েল পাঁঠা! মাংস যে বড় কড়া হয়ে যাবে, দাঁত বসানো যাবে না।

মনু চক্রবর্ত্তী হাত নাড়িয়া অভয় দান করিল, কোন ভয় নেই। শহর থেকে দুখু চাটুজ্জেকে এনেছি। পাঁঠা কেন, হাতী সেদ্ধ ক'রে দেবে।

আবার কে প্রশ্ন করিল, মাছ নেই?

মণীন্দ্র মুখ উপর দিকে তুলিয়া ঠোঁট দুইটা ছুঁচলো করিয়া কহিল, প্রচুর। ডান হাতের তর্জ্জনী ও মধ্যমা প্রসারিত করিয়া কহিল, দু মণ। আজিজ সাহেবের ফকির-বাঁধের বড় বড় মাছ, তারই কালিয়া তৈরি হয়েছে, নাক ডুবিয়ে খাবে সব।

হঠাৎ বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইল দোলগোবিন্দ, কি যেন চিবাইতেছে। মনুকে হাঁকিয়া কহিল, ফাঁষ্ট কেলাস হয়েছে বাবাজী। এমনটি কখনও কেউ খায় নি।

সকলে পিছন ফিরিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া সাগ্রহে কহিল, কি?

দোলগোবিন্দ কহিল, পোলাও, সবাই চাখতে বললে, ওস্তাদী মুখ জানে কিনা, মায় বউমা পর্য্যন্ত।

সকলে একসঙ্গে ঢোক গিলিয়া প্রশ্ন করিল, কেমন হয়েছে?

দোলগোবিন্দ দুই হাতের করতল চিত করিয়া দিয়া কহিল, চমৎকার! তারপর ডান হাত নাড়িয়া কহিল, জীবনে এমনটি কখনও খাও নি। নুন, ঝাল, মিষ্টি যেন নিক্তিতে তৌল ক'রে দিয়েছে, এক

তিল এদিক-ওদিক হয় নি। আর গন্ধ যা বেরিয়েছে, তাতে অগ্নিমান্দ্য রোগীরও পেটে আগুন জ্ব'লে উঠবে।

সকলে ঠোঁট চাটিতে শুরু করিল।

মন্থর মাথায় হাত দিয়া দোলগোবিন্দ কহিল, বেঁচে থাক বাবা মন্থ। একটা কাজের মত কাজ করলে বটে।—বলিয়া কাসিতে শুরু করিতেই সকলে সন্ত্রস্তভাবে সরিয়া দাঁড়াইল। দোলগোবিন্দ কাসি শেষ করিয়া একদলা কফ মাটিতে ফেলিল।

হাঁকিয়া কহিলাম, দাদা মশায়! এখানে এসে বসুন।

আমার দিকে চাহিয়া দোলগোবিন্দ কহিল, এই যে, ভায়া এসেছ? বেশ করেছ। কাছে আসিয়া কহিল, রেখো আর পরাণের যত দুষ্ট বুদ্ধি! কি করব গাঁয়ে দলাদলি ক'রে? সবাই আত্মীয়-স্বজন মিলে মিশে এক-সঙ্গে থাকাই তো ভাল। ডাক্তারবাবুর দিকে তাকাইয়া কহিল, কি বলেন ডাক্তারবাবু?

ডাক্তারবাবু সিগারেট টানিতে টানিতে ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন।

দোলগোবিন্দ একটা চেয়ারে উবু হইয়া বসিয়া কহিল, যা খাবার আয়োজন করেছে মন্থ, বড় বড় লোকের বাড়িতেও এমনটি হয় না। ডাক্তারবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, তা মন্থ সিগারেটেরও ব্যবস্থা করেছে নাকি? বাকি কিছু রাখলে না দেখছি। প্রকাশকে ডাকিয়া কহিল, তোর হাতে ওটা কিসের টিন র‍্যা?

প্রকাশ কাছে আসিয়া কহিল, সিগারেট, নেবেন নাকি একটা?

দে, খেতে কি পারব? এখুনিই কাসিয়ে মারবে।—বলিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া, মুঠা করিয়া ধরিয়া টানিতেই কাসিতে শুরু করিল।

১৯

একদিন পরে। রবিবার, সকালে বৈঠকখানায় বসিয়া ছিলাম; হঠাৎ সমস্বরে গোঙানির শব্দ শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিতেই দেখিলাম, কতকগুলা লোক একটা পাল্কি কাঁধে লইয়া আসিতেছে। কাজেই যাহা গোঙানির শব্দ বলিয়া মনে হইয়াছিল, তাহা প্রকৃতপক্ষে বেহারাদের চিরাচরিত ঐক্যধ্বনি। শব্দ শুনিয়া পত্নী ও ছেলেমেয়েরা

ছুটিয়া আসিল। পাল্কিটা সামনে আসিতেই দেখিলাম, পাল্কির মধ্যে বরবেশী তিনকড়ি বসিয়া, ও তাহার কোলের কাছেই লাল রঙের বেনারসী-পরা, আবক্ষ-ঘোমটা-টানা ফুটি। পত্নী কহিলেন, কি ভাই তিনু, ফিরছ বউ নিয়ে?

তিনু আমাদের দিকে একবার তাকাইয়া লজ্জায় মুখ নত করিল।

পত্নী কহিলেন, বেশ মানিয়েছে দুটিকে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, দেখলে কবে?

কাল সন্ধ্যেবেলায় গিছলাম যে, সরোজিনী ডেকে পাঠিয়েছিল অনেক ক'রে। কাল তোমাকে দেখলাম না ওখানে?

বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিলাম, আমি রোজই ওখানে যাই নাকি?

তাই তো শুনি। কালই যাও নি, আগে থেকে জানতে পেরেছিলে বোধ হয়।

সন্ত্রস্তভাবে কহিলাম, তোমার দিব্যি বলছি, না।

পত্নী সন্দিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, অত দিব্যি-দিলেশা করছ কেন বল দেখি? ডুবে ডুবে জল-টল খাচ্ছ নাকি?

উল্টা প্যাঁচে আটকাইয়া গিয়া ঘাবড়াইয়া উঠিলাম, কহিলাম, পাগল হয়েছ নাকি? নিজের বোনের মত—

পত্নী পরিহাসের সুর পরিত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন, আমারও তাই মনে হ'ল কাল, তোমাকে নিজের দাদার মতই দেখে। কাল কত দুঃখ করছিল, তুমি না খেয়ে, না দেখা ক'রে চ'লে এসেছ ব'লে।

কথাবার্ত্তার আসল ধরনটা ঠিক ধরিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

পত্নী কহিলেন, খেলেই হ'ত। সবাই তো খেয়েছে শুনলাম। তোমার যত বাহাদুরি!

কহিলাম, তা কি হয়? সকলের সামনে প্রতিজ্ঞা ক'রে তা ভাঙব কি ক'রে?

যা ইচ্ছে কর বাপু। কিন্তু আমার তো মেয়েটাকে ভাল ব'লেই

মনে হ'ল। আমাকে দেখে যেন কাল হাতে স্বর্গ পেল, কোথায় বসাবে, কি খাওয়াবে, তা নিয়ে যেন অস্থির হয়ে উঠল।

তুমি খেলে বুঝি?

বাঃ রে! খাব না কেন? তুমি যখন তখন খেয়ে আসছ, আমারই দোষ? তা ছাড়া ও যা অপরাধ করেছে, তার চেয়ে অনেক গুরুতর অপরাধ পাড়ার অনেকে করেছে, বলতে গেলেই কথা বাড়ে, না হ'লে কারও অজানা কিছু নেই।

মনু চক্রবর্ত্তীর গলা শোনা গেল, আছ নাকি হে?

পত্নী দ্রুতবেগে অন্দরের মধ্যে অন্তর্দ্ধান করিলেন।

কহিলাম, আছি, এস।

মনু আসিয়া বসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া কহিল, যাক, বাঁচা গেল। কন্যাদায় থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। এখন, ভিন্টের একটা ব্যবস্থা হ'লেই, বাস্। তারপর বাকি ছেলেমেয়েগুলোর ব্যবস্থা ভিন্টের ঘাড়ে।

কহিলাম, মেয়ে-জামাই জোড়ে গেল, দেখলাম যে—

মুখ ও চোখ আনন্দে বিস্ফারিত করিয়া মনুদা কহিল, দেখলে? বেশ মানিয়েছে, নয়?

কহিলাম, হুঁ। তা তোমাদের সব বিয়ের গোলমাল মিটে গেল তো?

মুখ চিন্তাকুল করিয়া মনুদা কহিল, কোথায় আর মিটেছে! আসল গোলমালই তো বাকি। এস. ডি. ও. সাহেব, দারোগাবাবু, এঁদের সব খাওয়াতে হবে।

কবে?

আজই বিকেলে। পাঁচটার সময়ে সাহেব আসছেন।

কে কে খাবে?

এস. ডি. ও. সাহেব, দারোগাবাবু, আজিজ সাহেব আর তার ভাইপো, তুমি, আর—

কহিলাম, আমাকে আবার কেন?

লাফাইয়া উঠিয়া মণীন্দ্র ডান হাতের তর্জ্জনী তুলিয়া নাড়িতে

নাড়িতে সতেজে কহিল, খবরদার মাস্টার! সেদিন ফাঁকি দিয়েছ। আজ না খেলে তোমার আর মুখদর্শন করব না, বলছি। চুপ করিয়া রহিলাম।

মনুদা টেবিলে দুই হাত চাপড়াইয়া সামনে ঝুঁকিয়া, আমার মুখের কাছে মুখ আনিয়া মিনতির সুরে কহিল, সত্যি যেও, না হ'লে সরোজি রাগ করবে। সেদিন তো তুমি খাও নি শুনে প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল। তোমাকে—

বাধা দিয়া কহিলাম, আচ্ছা যাব, তুমি ব'স। মণীন্দ্র বসিল। কহিলাম, আর কে কে বলছিলে?

চোখ মটকাইয়া মনুদা কহিল, আর তোমার গাঙুলী মশায়, রাধানাথ।

সবিস্ময়ে কহিলাম, সত্যি?

ঘাড় নাড়িয়া মণীন্দ্র কহিল, গিয়ে দেখবে মাস্টার, মুসলমানের পাশে ব'সে তোমাদের বকধার্ম্মিকরা পাঁঠার হাড় চুষছে।

বিকালে পাঁচটার সময়ে সরোজিনীর বাড়িতে হাজির হইলাম। দেখিলাম, হৈ-চৈ পড়িয়া গিয়াছে। মনু, প্রকাশ, তিনুর সাঙ্গোপাঙ্গ, ডান কব্জিতে হরিদ্রাবর্ণের সূতা-বাঁধা তিনু পর্য্যন্ত ছুটাছুটি করিতেছে। আমাকে দেখিয়া মনুদা কহিল, ভায়া এসেছ? সাহেব এসে গেছেন থানায়। ইউনিয়ন বোর্ডের খাতাপত্র দেখছেন। কি রকম হয়েছে, দেখ দেখি।—বলিয়া আমাকে হাত ধরিয়া টানিয়া বৈঠকখানার ভিতরে লইয়া গেল। দেখিলাম, চেয়ার-টেবিল সরাইয়া দিয়া আসনের বদলে একটা শতরঞ্জি ভাঁজ করিয়া লম্বালম্বি পাতা হইয়াছে; তাহার সামনে প্রত্যেক নিমন্ত্রিতের জন্য এক-এক সেট করিয়া থালা, বাটি, গেলাস সাজানো রহিয়াছে।

কহিলাম, সাহেব আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে খেতে পারবেন?

মনুদা কহিল, সাহেবই তো বললেন, টেবিল-চেয়ারে খাব না। আসনপিঁড়ি হয়ে ব'সে ডাল-ভাত খাওয়াতে পারেন তো যাব। তারপর আমার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, কেমন, ঠিক হয় নি?

ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম, ঠিক হইয়াছে।

মন্নুদা কহিল, গাঙুলী বুড়ো আর রেধো দুজনকেই সাহেব টেনে নিয়ে আসবেন। ওদের বদমায়েসি সব বলেছি কিনা।

কহিলাম, রাধানাথকে পাবেন কোথায়?

কেন, থানায়। সেদিন পালিয়েছিল টাকা দেবার ভয়ে। শুনেছে, হাকিম চ'টে গেছেন তার ওপরে। আজ নিজে সেধে টাকা দিতে ছুটেছে। বাবা! জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে চালাকি চলে? তা ভায়া, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করবার সময় নয় এখন। একবার থানায় যাই, তুমি বরং বাড়ির ভেতরে কতদূর কি হ'ল একবার দেখ গিয়ে।

বাড়ির ভিতরে ঢুকিতেই সরোজিনীর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, তুই ছেড়ে দে মিণ্টা, পারবি না, কেন প্রকাশের সময় নষ্ট করছিস?

আর একটি নারীকণ্ঠ, নিশ্চয়ই মিণ্টার, আবদারের সুরে কহিল, হ্যাঁ, ভারী তো! দেখে যান না। ওঁর চেয়ে ভাল হয়েছে।

একটি পুরুষ-কণ্ঠ মোটা সুরে কহিল, হ্যাঁ, সত্যি, মন্দ হয় নি। এই প্রথম চেষ্টা তো। দিন কয়েক অভ্যাস করলেই হাত ওতরাবে।

ভিতরে যাইয়া দেখিলাম, রান্নাঘরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া সরোজিনী, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, মুখে হাসি, আমাকে দেখিয়াই গম্ভীর হইয়া মুখ ফিরাইল। বুঝিলাম, অভিমান হইয়াছে। অভিমানের পশ্চাতে সুনিশ্চিত স্নেহের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলাম, অথচ প্রভাতের রৌদ্রঝলমল আকাশের মত হাস্যোজ্জ্বল মুখটি যে এক মুহূর্তে অভিমানের মেঘে ম্লান হইয়া গেল, তাহার জন্য মনে অনুশোচনাও হইল। কাজেই মুখে আবার হাসি ফুটাইবার জন্য কহিলাম, তোমার আয়োজন সব শেষ হ'ল?

মুখ ফিরাইয়া কৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত সরোজিনী কহিল, ওমা! আপনি! আমি বলি কে আবার—! আপনি যে আমার বাড়িতে পা দেবেন, তা আশা করি নি।

কহিলাম, সেদিন শরীরটা খারাপ ছিল, সকালেই মন্নুদাকে তো—

বাধা দিয়া ডাগর চোখ দুইটি আরও ডাগর করিয়া সরোজিনী কহিল, আমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে গেলে শরীরটা আপনার আরও খারাপ হয়ে যেত? কণ্ঠে অশ্রুর আভাস লাগিল।

ব্যস্ত হইয়া কহিলাম, তা নয়, তুমি ব্যস্ত ছিলে, ভাবলাম, মিছিমিছি এ সময়ে—

মাথায় ঝাঁকানি দিয়া অশ্রুজড়িত কণ্ঠে সরোজিনী কহিল, হয়েছে! বোনের ওপর ভাইয়ের দরদ! বোনই কেবল ভাইয়ের জন্যে মরে।

কৃতার্থ হইলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, মন্নুদা আমাকে সঙ্গে লইয়া শহরে যাইবার কথা বলায় সরোজিনী নাকি একদিন বলিয়াছিল, যাকে-তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার দরকার নেই। মনটা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেই বুঝাইলাম, ঝুটা-আসল বিচার না করিয়া, যাহা জুটিতেছে, তাহা লইয়াই সন্তুষ্ট থাক। কোন হরিণ-নয়নার নয়ন হইতে তোমার জন্য খাঁটি অশ্রু ঝরিবে, এমন ভাগ্য করিয়া দুনিয়াতে আসিয়াছ নাকি?

মুখ বাড়াইয়া কহিলাম, প্রকাশ, কি করছিস রে?

জবাব দিল সরোজিনী, রান্না করছে।

সবিস্ময়ে কহিলাম, তাই নাকি! প্রকাশকে উদ্দেশ করিয়া কহিলাম, এসব বিদ্যে শিখেছিস নাকি?

প্রকাশ কহিল, হ্যাঁ, কলকাতায় শিখেছিলাম। যে ডাক্তারবাবুর কাছে থাকতাম, তিনি সব রকম মাংস রান্না খুব ভাল জানতেন।

সরোজিনী প্রশংসার সুরে কহিল, সত্যি, ভারী চমৎকার তৈরি করছে, দাদা চেখে দেখে খুব প্রশংসা করলে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, মিণ্টা কি করছে তবে?

সরোজিনী কহিল, মেয়েমানুষ যা করে, পুরুষের কাজে বিঘ্ন করছে।

মিণ্টা কহিল, তা বইকি! দেখুন না কেমন করেছি, প্রকাশদাদার চেয়ে অনেক ভাল হয়েছে।

কাছে গিয়া দেখিলাম, তোলা উনুনের সামনে উবু হইয়া বসিয়া, মিণ্টা মাংসের কাট্‌লেট ভাজিতেছে, প্রকাশ পাশে দাঁড়াইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। মিণ্টাকে অনেকদিন পরে ভাল করিয়া দেখিলাম, রং ধবধবে ফর্সা নয়, কিন্তু শ্যামবর্ণ বলিতেও মন চাহে না, মুখের ও চোখের

গঠন চমৎকার, সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া যৌবনের প্রাচুর্য্য; আগুনের আঁচে মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে; সামনের রুক্ষ চুলগুলি স্বেদসিক্ত।

পদ্ম যাওয়ার পর হইতে প্রকাশ তাহা হইলে সরোজিনীর বাড়িতেই আড্ডা গাড়িয়াছে। মিণ্টা তো শুনিয়াছি সারাদিন এইখানেই কাটায় এবং বিবাহ উপলক্ষ্যে বোধ হয় রাত্রিটাও এইখানেই কাটাইতেছে। কাজেই অবিরত ও অব্যাহত সাহচর্য্যের ফলে তাহাদের মধ্যে প্রণয়-সূত্রটি দিন দিন মোটা ও মজবুত হইয়া উঠিতেছে। সরোজিনীর যে এ ব্যাপারে সম্মতি ও সাহায্য দুই ই আছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল না। কিন্তু কাজটি সরোজিনী ভাল করিতেছে না। শহরে লোকারণ্যের মধ্যে যাহাই হউক, পল্লীসমাজে এই অসামাজিক প্রেম কোনমতে আশ্রয় পাইবে না। বিরোধ চারিদিকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে; কুৎসা কালি ছিটাইতে থাকিবে; কলহ ও কোলাহলের অন্ত থাকিবে না। এবং শত-করা নব্বইজন বাঙালী যুবকের মত প্রকাশ যদি শেষ মুহূর্ত্তে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে, তাহা হইলে মিণ্টাকে প্রাণ কিংবা মান দিয়া এই প্রেমের দাম চুকাইতে হইবে।

মোটরের শব্দ শুনিতে পাইয়া বাহিরে আসিলাম। অবিলম্বে মোটর আসিয়া পৌঁছিল। এস. ডি. ও. সাহেব, মণীন্দ্র, আজিজ সাহেব ও তদীয় গুণধর ভ্রাতুষ্পুত্রটি একে একে গাড়ি হইতে নামিল। ভ্রাতুষ্পুত্রের পোশাক-পরিচ্ছদ পূর্ব্ববৎ, মুখে পূর্ব্ববৎ দুরন্ত ও দুর্ব্বিনীত ভাব; আমাকে দেখিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। সকলকে আদর-আপ্যায়ন করিয়া বারান্দায় চেয়ারে বসানো হইল। কিছুক্ষণ পরে দারোগাবাবু, রাধানাথ ও গাঙুলী মশায় হাঁটিয়া আসিলেন। গাঙুলী মশায় ও রাধানাথ দুইজনেরই মুখ শুষ্ক ও চিন্তাকুল।

মণীন্দ্র যুক্তহস্তে নিবেদন করিল, সব প্রস্তুত, দয়া ক'রে হাত-মুখ ধুয়ে বসলেই হয়।

সকলে সোৎসাহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শুধু গাঙুলী মশায় গালে এবং রাধানাথ পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বসিয়া রহিল। দারোগা-বাবু তাহাদের দিকে তাকাইয়া সোৎসুক কণ্ঠে কহিলেন, কি হ'ল আপনাদের?

গাঙুলী মশায় যন্ত্রণা-কুঞ্চিত মুখে কহিলেন, দাঁতের বেদনা—সেই যে একবার হয়েছিল।

রাধানাথ মুখে যথাসাধ্য যন্ত্রণার ভাব ফুটাইয়া কহিল, পেটটা মোচড় দিচ্ছে, কাল থেকে পেটের অসুখ, প্রায়ই হয় কিনা এমনই—আজ বালি খেয়ে আছি।

এস. ডি. ও. সাহেব তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলেন, কি হ'ল এঁদের?

দারোগাবাবু মুচকি হাসিয়া কহিলেন, অসুখ হয়েছে বলছেন, এক-জনের দাঁতের, আর একজনের পেটের—খাবেন না।

মণীন্দ্র কহিল, ওসব ভান, হুজুর।

গাঙুলী মশায় ও রাধানাথ সমস্বরে কহিল, ভান নয় হুজুর, সত্যি; বাড়িতে জিজ্ঞেস ক'রে পাঠান।

এস. ডি. ও. সাহেব গম্ভীর মুখে কহিলেন, বেশ, রেহাই দিচ্ছি; কিন্তু আরও একশো টাকা ক'রে যুদ্ধে চাঁদা দিতে হবে আপনাদের। দিতে পারেন তো বাড়ি গিয়ে এনে দিন।

দাঁত ও পেটের যন্ত্রণা ভুলিয়া দুইজনে হাতজোড় করিয়া বলিয়া উঠিল, না হুজুর, যা দিয়েছি, তার বেশি এক পয়সা দিতে পারব না।

এস. ডি. ও. সাহেব গম্ভীর মুখে কহিলেন, তা হ'লে খেতে হবে। —বলিয়া একেবারে চূড়ান্ত রায় প্রকাশ করিয়া বৈঠকখানার ভিতরে ঢুকিলেন, তাঁহার পিছু পিছু ঢুকিল আজিজ সাহেব ও তস্য ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সর্ব্বশেষে ঢুকিলেন গাঙুলী মশায় ও রাধানাথ, ফাঁসির আসামীর মত মুখ করিয়া। দারোগাবাবু তখনও মুখ-হাত ধুইতে লাগিলেন।

আজিজ সাহেব ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এক পাশে বসিল, তাহাদের পাশেই বসিলেন, এস. ডি. ও. সাহেব, একখানা আসন বাদ দিয়া গাঙুলী মশায় ও রাধানাথ পর পর বসিল। মনুদা আমাকে ডাকিয়া কহিল, মাস্টার, তুমিও ব'সে যাও না এই সঙ্গে। লবণ ও লেবুর থালাটা তুলিয়া লইয়া কহিলাম, পরে খাব এখন।

মনুদা গজ্জিয়া উঠিল, পরে আবার কেন? এখন কি হ'ল?

ত্রস্তভাবে কহিলাম, পাগল নাকি! একসঙ্গে সবাই বসলে চলে? —বলিয়া চোখের ইঙ্গিত করিলাম।

মণীন্দ্র শান্ত হইয়া কহিল, আচ্ছা, একসঙ্গে খাব দুজনে।

ইতিমধ্যে দারোগাবাবু মুখ-হাত ধুইয়া আসিয়া এস. ডি. ও. সাহেব ও গাঙুলী মশায়ের মাঝখানের আসনটিতে বসিয়া আচারনিষ্ঠ ও আচারভ্রষ্ট দুই শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিলেন। প্রকাশ, তিনু ও তাহার দলবল খাদ্যদ্রব্য বহন ও পরিবেশন করিতে লাগিল। মণীন্দ্র যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। আমি মুরুব্বিয়ানা করিতে লাগিলাম, এবং রাধানাথ ক্ষণে ক্ষণে আমার দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কাসিতে কাসিতে দোলগোবিন্দ আসিয়া হাজির হইল। আমার দিকে তাকাইয়া কহিল, কি ব্যাপার আজ? মোটর দেখলাম—

কাছে গিয়া চাপা গলায় কহিলাম, এস. ডি. ও. এসেছেন, খাচ্ছেন ওখানে।

দোলগোবিন্দ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া করিল, তাই নাকি! হুজুর খেতে এসেছেন? মনু আচ্ছা কাণ্ড করলে যা হোক। আর কে কে?

কহিলাম, গিয়ে দেখুন না।

দোলগোবিন্দ উঠিয়া গিয়া গলবস্ত্র হইয়া দরজার সামনে দাঁড়াইয়া যুক্তহস্তে ভক্তি-গদ্গদ স্বরে কহিল, হুজুর, নমস্কার।

এস. ডি. ও. সাহেব খাইতে খাইতেই প্রতি-নমস্কার করিলেন।

তারপর গাঙুলী মশায় ও রাধানাথের দিকে তাকাইয়া দোলগোবিন্দ দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া কহিল, বাবাজীরাও ব'সে গেছ দেখছি।

তিনু কাছে গিয়া ফিসফিস করিয়া কহিল, ওখানে দেখুন গিয়ে। বলিয়া জানালার দিকে মুখের ইশারা করিল।

দোলগোবিন্দ জানালার কাছে আসিয়া দেখিয়া কহিল, অ্যাঁ, ভাই সাহেবরা পর্য্যন্ত! দাঁড়াও, একবার আসি ভাই।—বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

তারপর পাড়ার প্রৌঢ় ও বৃদ্ধেরা একে একে আসিয়া হাজির হইতে

লাগিল। প্রত্যেকে এস. ডি. ও. সাহেবকে নমস্কার জানাইয়া, একবার ভোজনরত গাঙুলী মশায় ও রাধানাথকে এবং জানালার কাছে গিয়া আজিজ সাহেব ও তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে দেখিয়া লইয়া প্রস্থান করিতে লাগিল। রাধানাথ ও গাঙুলী মশায়কে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তাঁহারা যেন কণ্টকাসনে বসিয়া তপ্ত অঙ্গার চিবাইতেছেন।

আহারাদি শেষ হইলে এস. ডি. ও. সাহেব মণীন্দ্রকে কহিলেন, যাঁর এত খেলাম, তাঁকে একবার ধন্যবাদ না জানিয়ে বিদায় নিলে নেমক-হারামি হবে। মনুবাবু, একবার খবর দিন মিসেস গাঙুলীকে।

মণীন্দ্র কহিল, আজ্ঞে, এখুনি ডেকে আনছি।

অচিরে দরজার সামনে শ্রীমতী গাঙুলীর আবির্ভাব ঘটিল, ইতিমধ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া বিধি-সঙ্গত সাজসজ্জা করিয়াছে, মাথায় স্বল্প অবগুণ্ঠন। এস. ডি. ও. সাহেবের আজ আর হাফ প্যাণ্টের হাঙ্গাম ছিল না। ভদ্র বাঙালীর বেশ—ধুতি, পাঞ্জাবি, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের লপেটা। নমস্কার করিয়া কহিলেন, খুব খাইয়েছেন, ধন্যবাদ।

সরোজিনী লজ্জিত হাস্যে মুখখানি অপরূপ করিয়া তুলিল। সত্তর সাহেবের দুই চোখে ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ের দৃষ্টি জ্বলিয়া উঠিল। আজিজ সাহেব হাসিল, কিন্তু দাড়ির সুনিবিড় মেঘ ভেদ করিয়া সে হাসি বাহিরে ফুটিল না। দারোগাবাবু ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকিয়া হাত কচলাইতে লাগিলেন। রাধানাথ ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে আকাশের দিকে এবং গাঙুলী মশায় চিন্তাব্যাকুল মুখে ভূপৃষ্ঠের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

এস. ডি. ও. সাহেব কহিলেন, আপনার কথা আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের পত্নী শ্রীমতী মিত্রকে বলেছি। তিনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। তা ছাড়া আরও অনেকে চান। চলুন না একদিন ওখানে।

সরোজিনী বাম পায়ের বুড়া আঙুল দিয়া মাটি খুঁটিতে খুঁটিতে নত মস্তকে কহিল, যাব একদিন, কাজও একটু আছে। গেলে আপনাদের শ্রীমতীদের সঙ্গে নিশ্চয় দেখা ক'রে আসব।—বলিয়া একবার মুখ তুলিয়া পরমুহূর্ত্তেই নামাইল।

এস. ডি. ও. সাহেব বিদায় লইলে একে একে সকলে বিদায়

লইলেন, গাঙুলী মশায় ও রাধানাথ সর্ব্বাগ্রে, তারপর দারোগাবাবু, তারপর আজিজ সাহেব ও সত্তর সাহেব। আমি ও মণীন্দ্র বাড়ির ভিতরে ঢুকিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময়ে সত্তর সাহেব আবার ফিরিয়া আসিল।

মণীন্দ্র আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিছু ফেলে গেছেন নাকি?

ঘাড় নাড়িয়া সত্তর কহিল, না, একটু দরকার আছে এখানে।—বলিয়া আমার দিকে তাকাইতেই, আমি মুখ ফিরাইয়া লইয়া অন্যমনস্কতার ভান করিলাম।

মণীন্দ্র ব্যস্ত হইয়া কহিল, কি দরকার, বলুন?

সত্তর কহিল, আপনার বোনকে একবার ডেকে দিন দেখি।

মণীন্দ্র ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, কেন? তার সঙ্গে আপনার—মানে, সে তো—

সত্তর ধমকের সুরে কহিল, জরুরী দরকার আছে। শিগগির ডেকে দিন। সন্ধ্যে হয়ে আসছে।

মণীন্দ্র ভয়ে ভয়ে কহিল, কি দরকার শুনতে পারি না?

সত্তর কহিল, খুব পারেন, একটা উপহার দিতে চাই।

মণীন্দ্র একবার আমার দিকে তাকাইল, তারপর তাহার দিকে তাকাইয়া আমতা আমতা করিয়া কহিল, উপহার! তাকে?

সত্তর ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, যে মেয়েটির বিয়ে হ'ল তাকে।

বিস্ময় ও আনন্দে চোখ ও মুখ বিস্ফারিত করিয়া মণীন্দ্র কহিল, ওঃ, ফুন্টিকে। তাই বলুন।

দক্ষিণ করতল প্রসারিত করিয়া কহিল, তা দিয়ে যান আমাকে, আমারই তো মেয়ে।

এবার সত্তর সাহেব ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল, আপনার মেয়ে নাকি? তবে যে—

মনু কহিল, এ বাড়িতে বিয়ে হ'ল, এই তো? আমার বোনই আমার মেয়ের বিয়ে দিলে কিনা।

সত্তর কহিল, ওঃ, তাই। আমি ভেবেছিলাম—

ভেবেছিলেন, আমার বোনের মেয়ে। ঠিকই ভেবেছিলেন। আমার মেয়েকে আমার বোন মায়ের মতই ভালবাসে। তা আপনার যা দেবার আছে দিয়ে ফেলুন, দেরি ক'রে লাভ কি? ওদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে!

সত্তর সাহেব পকেটে হাত ঢুকাইয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

মণীন্দ্র কহিল, আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ভাবছেন, মেরে দোব, মেয়েকে দোব না। বেশ। ওই তো মাস্টার রয়েছে, ও তো সাক্ষী থাকছে। তা ছাড়া, বাপ হয়ে মেয়ের জিনিস কেউ মেরে দিতে পারে মশায়?

এই সময়ে তিনু বাড়ির ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। তাহাকে ডাক দিয়া মণীন্দ্র কহিল, এস তো বাবা তিনু, একবার এখানে। তিনু কাছে যাইতেই মণীন্দ্র কহিল, একে দিন।

সত্তর ঘাড় নাড়িয়া দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, ওকে দোব না।

মণীন্দ্র দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল, ওকেও দেবেন না? ও যে আমার জামাই, ওই দেখুন, ডান হাতে হলদে সুতো বাঁধা রয়েছে।

সত্তর সাহেব অগত্যা পকেট হইতে একটি নীল রঙের ছোট বাক্স বাহির করিয়া তিনুর হাতে দিয়া কহিলেন, আংটি, দেবেন আপনার বউকে, আমার নাম ক'রে।—বলিয়া পিছন ফিরিয়া গটগট করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মণীন্দ্র বাক্সটা তিনুর হাত হইতে লইয়া, খুলিয়া আংটিটি বাহির করিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়া কহিল, সোনার, ভাল জিনিস, ফুন্টির আঙুলে বড় হবে ব'লে মনে হচ্ছে, তা তুমিই প'রো বাবাজী।

আগামীবারে সমাপ্য

শ্রীঅমলা দেবী

মৃত্যুভয়

কাল রাতে মৃত্যু দেখিলাম,
মৃত্যু নহে—মৃত্যুর স্বপন।
নিস্তব্ধ নির্জ্জন ঘর একা সঙ্গীহীন,
রাত্রি প্রায় শেষ,
স্রস্ত কেশ বিস্রস্ত বসন,
নিদ্রাশ্লেষ-পীড়ন-মর্দ্দিত
নিক্ষিপ্ত করিয়া ভূমে উপাধান দুটি,
মুষ্টিতল-পিষ্ট করি শয্যা-আস্তরণ,
চমকি জাগিয়া উঠিলাম,
জাগিলাম বিহ্বল-পরাণ,
আড়ষ্ট শীতল স্পর্শে ভয়ে স্পন্দহীন,
দ্রুতবেগস্পন্দিত-হৃদয়,—
নিশি-ভোরে মৃত্যু দেখিলাম।

জাগ্রত জীবনে কেহ জানিয়াছ বাসনার শেষ?
মধুমুগ্ধ স্বৈরগতি ভ্রমরের মত
ভ্রমিয়াছ কামনার ফুলে?
বিক্ষুব্ধ হৃদয়তলে যত ক্ষুধা আছে
আশা শঙ্কা ভয় দ্বেষ ঈর্ষা ব্যভিচার
অনুযোগ অভিযোগ মোহ ও বিকার,
সহসা পলকপাতে কভু
রূপান্তর লভেছে কি বর্ণান্তর-যোগে?
—উত্তরিতে জীবনের তীরে
ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত দূর অলকাপুরীতে,
যার পরে নাহি আর বাসনার রেশ!

পূরেছে কি সর্ব্ব মনস্কাম,
দেখেছ তাহারে?
বিরহিণী যক্ষপ্রিয়া নহে—
পাণ্ডুক্ষাম-বদন-মলিন,
শীর্ণতনু রুক্ষকেশ ক্বচিৎ-জীবিত,
ফুল দিয়ে দিন গুণে যে কাটায় কাল।
ঈষৎ-রক্তিমা-মেশা মধুবর্ণ-দ্যুতি
স্ফুরিত অধরদলে মূর্চ্ছিতেছে মধুময়ী নেশা,
জীবনের সাম্রাজ্ঞী যেথায়—
পান করিতেছে হেসে বাসনা-আসব,
আনন্দ-উচ্ছ্বাসে তনু মধুর বিবশ,
সেথা কি গিয়াছ কেহ—দেখিয়াছ অপূর্ব্ব বিলাস?
অতি সূক্ষ্ম চন্দ্র-রশ্মিরেখা
চন্দ্রলোকে তরণী-বিহার,
অণুপরমাণু হতে পরম মহৎ
ইচ্ছামত নিবাস যাহার,
চঞ্চল অগ্নির শিখা মন্দ-মধু-বায়ে
শতলক্ষ পতঙ্গের প্রাণ-সঞ্জীবিত
দীপ্তিময়ী,—দেখেছ কি তারে?—
আমি তারে দেখিয়াছি কাল রাতে স্বপনের মাঝে!

কাল রাতে দেখিনু স্বপন—
বহু-নদী-দেশ-মালা অতিক্রম করি
পঁহুছিনু ক্লান্ত-গতি শৈলপাদমূলে
ভারগ্রস্ত পশুর সমান,
ন্যুব্জ দেহ সাধ্য নাই ঋজু করিবার,
প্রাণে শুধু অন্ধ ইচ্ছা পথ চলিবার।
বালুকীর্ণ শৈলপিঠ 'পরে
প্রোথিত চরণযুগ,—প্রাণপণে তবু

উত্তরিনু শৈলশিরে।
নিম্নে বসুন্ধরা,
ঊর্দ্ধাকাশে জ্বলিতেছে অগণ্য তারকা
নিবাতনিষ্কম্প স্থির প্রদীপপ্রচয়
আজ্ঞাবাহী স্থিত যেন সেবকের দল,
আর কেহ নাই,—
জনহীন বিশ্বভূমি—জাগ্রত আমিই,
আমি ভোক্তা ভোগ্য আর সব,
বলিলাম মনে মনে যা চেয়েছিলেম
সকলি পেয়েছি আজ;
ঊর্দ্ধে নীচে পূর্ব্বে ও পশ্চিমে
উত্তরে দক্ষিণে সবি অধীন আমার।
আমি ছাড়া আর কিছু নাই।
ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী এই আশ্চর্য্য প্রকৃতি
মোর করতলগত বদরিকা প্রায়,—
তৃপ্তি-সুখ-আনন্দ-উল্লাসে
হাসিলাম উন্মত্ত বিহ্বল।

সহসা মিলাল ছবি দূরে,—
চমকিত চেয়ে দেখিলাম,
সমস্ত ভুবন যেন তরলিত হয়ে
গলিয়া পড়িছে ক্ষীণ অঙ্গুলির ফাঁকে।
জোরে—আরো—আরো জোরে মুষ্টিতল চাপি
রাখিতে চাহিনু তারে,
সমগ্র দেহে ও মনে যত বীর্য্য ছিল
সবি এনে করতলে করিনু অর্পণ,
তবু মানিল না বাধা।
দৃষদ্-কঠিন দৃঢ় মুষ্টিতল হতে
ছায়াময় শরীরীর মত

নিঃশেষে ঝরিয়া গেল সমস্ত ভুবন—
সর্ব্ব-সুখ সর্ব্ব-আশা আনন্দ ভরসা—
নিষ্পলক চেয়ে দেখিলাম,—
দেখিলাম স্থাণুর মতন।

কাঁদিবারে চাহিলাম যেন,
শুষ্ক চক্ষু কণ্ঠ তালু ব্যাকুত বদন,
আচ্ছন্ন মানস মুখে ভাষা কিছু নাই,
জ্বর-গ্রস্ত বিকারীর প্রায়
অর্থশূন্য দৃষ্টি মেলি চেয়ে দেখিলাম,
চারিপাশ হতে মোর শতলক্ষ রাঙা প্রজাপতি
উঠিতেছে মিলিতেছে মহাশূন্যে অতল আঁধারে,
সম্মুখে খেলিছে শুধু বহুবর্ণ বিচিত্রিত পাখা
সন্ধ্যার মেঘের মত, ক্ষণেকের তরে
সাধ্য নাই স্পর্শ করি তারে।
তবু যেন সর্ব্ব সত্তা বাসনা-আকারে
ফিরিতে চাহিছে পিছু তার।
স্বপ্ন-গ্রস্ত দুরাশা-বিকার,
শুধু শূন্যে লক্ষ্যহীন হস্ত-আস্ফালনে
ধরিতে চাহিছে মিথ্যা অলীক কায়ারে।

চকিতে আপন সত্তা ফিরিয়া পেলাম।
বলিলাম মৃদুমন্দ স্বরে,
ভুবন হারায়ে গেল যাক সে হারায়ে,
তবু আমি আছি,
আমি আছি আর আছে এই অনুভূতি,
আর কিসে প্রয়োজন মোর?
সর্ব্ব-দিক্-দেশ-কাল-অবিচ্ছিন্ন আমি,

আপনাতে আপনি মহান।
জয়ধ্বনি করিলাম তৃপ্তি সান্ত্বনার।

জয়ধ্বনি নহে,
শ্রবণ বিদারি কাঁদে আর্ত্ত-কণ্ঠস্বর,
চারিদিকে নিচ্ছিদ্র আঁধার
সহসা জমাট বেঁধে এল,
কঠিন শীতল স্পর্শ লাগিল এ দেহে,
হিমশ্বাসে নাসারন্ধ্র হ'ল অন্ধপ্রায়,
কণ্টকিত আড়ষ্ট শরীর,
কি শঙ্কায় অধীর হৃদয়!
কি শঙ্কা সে বলিতে পারি না,—
যেন কোন আদিম বর্ব্বর
বন্যজন্তু অন্ধকার জিহ্বার লেহনে
গ্রাসিতে চাহিল ভীত মোরে।
আঁধারের অতল গহ্বরে
ডুবিয়া গেলাম আমি।
—যত ডুবি তত তল নাই,
প্রাণপণে উঠিবার যত চেষ্টা করি
তবু যেন উঠিতে পারি না,
মুষ্টি-ধৃত বালুসম খ'সে খ'সে যায়
যাহা কিছু ধরিবারে যাই;
—সে অন্ধকারের
তল নাই মাথা নাই সীমা নাই কোন,
গুরুপরিমাণ তবু তরল মসৃণ,
নেমে যেতে বাধা লাগে তবু বাধা নাই;—
আরো—আরো—আরো ডুবি যত—
কোথা তল—কোথা তল—কোথা তল খুঁজি,
উপরে ওঠার আর আর নাই কোন বাসনা হৃদয়ে,

—তবু তল কোথা!
দীপ্তিহীন চক্ষু মোর স্পর্শহীন ত্বক,
অবরুদ্ধ নাসারন্ধ্র শুষ্ক কণ্ঠ তালু,
বধির শ্রবণযুগ; স্খলিত উপল—
শুধু নীচে নেমে যাই নীচে নামি শুধু।
—বুঝিলাম মনে মনে এই মৃত্যু মোর,
এই মৃত্যু! যাহা এতকাল শুধু শুনিয়াছিলাম।
মুহূর্ত্তের মাঝে
মৃত্যুভয় জাগিল মানসে।
শঙ্কাহত উন্মাদ অন্তর
বলিবারে চাহিলাম অধীর আগ্রহে—
মৃত্যু নাহি চাই,—
মৃত্যু নহে মৃত্যু নহে—অনন্ত জীবন।
অনন্ত জীবন চাই অনন্ত কালের,
বাসনামণ্ডিত রাঙা সোনার জীবন।
ঘনীভূত অবরুদ্ধ অন্ধকার-পাশ
নির্ম্মম নখর-অগ্রে বিদীর্ণ করিয়া
হিমপ্রায় দেহ হতে টেনে খুলে দিতে
প্রয়াস করিনু কত,—নিষ্ফল প্রয়াস!
—ঘুম ভেঙে গেল।—
চৌদিকে দেখিনু চেয়ে বিহ্বল-পরাণ,
—নির্জ্জন নিস্তব্ধ ঘর একা সঙ্গীহীন,
রাত্রি প্রায় শেষ,
অদূরে শয্যার পাশে জ্বলিতেছে মাটির প্রদীপ
নিঃশেষ সলিতা ধূম-উদ্গার-বহুল,
ম্লান ছায়া কাঁপিতেছে দেয়ালের গায়ে,
ছায়া ছায়া ঘোর ঘোর বসনের স্তূপ,
স্বেদসিক্ত শয্যা-আস্তরণ।
স্পন্দহীন শয়ান শরীর,

অবসন্ন মন ভয়-ভাবনা-নিশ্চল,—
বুঝিতে পারি না নিজে মৃত কি জীবিত !
সেই গৃহ সেই শয্যা সেই দীপাধার,
পুরাতন পরিবেশ সেই নিত্যকার,
তবু যেন কোনখানে ছিদ্র রচিয়াছে
বহির্দ্দেশে সন্ধানী দৃষ্টির ;—
চিরাভ্যস্ত পরিচয় তারি মধ্য দিয়া
গলিয়া মিশিয়া গেছে অনন্ত নিশীথে
চিরকাল তরে,—শুধু আমি জেগে আছি
নিদ্রাহীন তৃষ্ণাহীন ক্ষুধাহীন আমি,
নিরালম্ব আলম্বন পিপাসা-কাতর,
ছায়াময় অমূর্ত্ত শরীর,
পৃথিবীর স্পর্শগন্ধশব্দরূপরস
কিছুই আমার তরে নহে।
এই গৃহ এই শয্যাধার
এও মোর অধিকারচ্যুত।
ভয়ঙ্কর ভয়হীন ছায়ামূর্ত্তি শুধু
বাতাসে করিয়া ভর মিশিবে আকাশে,
এই স্বল্প-পরিসর বদ্ধ-বায়ু ত্যেজি
অনন্ত—অনন্ত শূন্যে নিস্তব্ধ নিশীথে,
দূর দূর—বহুদূর—কে জানে কোথায় !
উন্মুক্ত জানালা দিয়া ম্লান নভঃস্থলে
দেখিনু একটি তারা দপদপ জলে,
রাত্রি-শেষ-স্নিগ্ধ বায়ু বাতায়ন-পথে
প্রবেশ লভিল ঘরে,
বুলাল শীতল স্পর্শ অবসন্ন দেহে।
—তরাসে চমকি চাহিলাম—
এই স্পর্শ এই তবে মোর দেহ বুঝি !
স্পর্শ-শক্তি-বান দেহ জীবিত নিশ্চয়,

তবে আমি বাঁচিয়া রয়েছি !
আলোড়িত অন্তঃস্থলে জাগিল উল্লাস,
জীবনের উৎকট উল্লাস।
বিচিত্রা মধুরা ধরা আজো তবে নিতান্ত আপন।
কণ্ঠলগ্ন-প্রিয়জন-স্পর্শ-রসাপ্লুত
আনন্দ-আবেগে দ্রুত স্খলিত-বচন
তপ্তরবিকর কাল ভুঞ্জিব প্রভাতে।
বিচিত্র কুসুমপুঞ্জ ফুটিলে কাননে
বৃন্তদল ক্লিষ্ট করি করিব চয়ন,
যারে ইচ্ছা হয় দেবো তারে।
সুখ-দুঃখ-কণ্টকিত জানি এ জীবন
তবুও সীমা কি তার আছে মাধুর্য্যের ?
সেই মাধুর্য্যের
পসরা বহিব নিজ হাতে ;
আকণ্ঠ করিব পান অপর্য্যাপ্ত সুখে,
বিলাব সকল জনে তাহা,
বিলাব সকল জনে আমি প্রাণবান।
এই মৃত্যু মৃত্যু নহে মোর,
ভাবিলাম মনে,
এই মৃত্যু মৃত্যু নহে মোর,
জানি নিশীথের মাত্র ভঙ্গুর স্বপন।
আনন্দ-বাষ্পের বেগে নেত্র ছলছল
বারে বারে বলিলাম কম্পিত-হৃদয়,
এ শুধুই স্বপ্ন, স্বপ্ন মৃত্যু নহে—মৃত্যু নহে মোর,
এ শুধুই মৃত্যুর স্বপন।

সত্য কি এ স্বপ্ন শুধু আর কিছু নহে ?
বিকল শয্যার পাশে খোলা বাতায়ন—
প্রদীপ নিভিয়া গেল হঠাৎ বাতাসে,

—দূরে দেখিলাম,—
স্থির তরুশিরে আঁকা পঞ্চমীর চাঁদ
পাণ্ডুর পঞ্চমী-চাঁদ বিমর্ষ আকাশে
ক্রমে ক্রমে নিভে আসে।
ঘন অন্ধকার—
সেই ঘন অন্ধকার পটভূমিকায়—
ক্রমশ উঠিল ফুটে দৃশ্য খরতর।
স্পষ্ট দেখিলাম
মৃত্যুভয়ত্রস্ত জীব সারি সারি ছুটিয়াছে বেগে,
কোথায় জানে না কেহ।
আদি নাই অন্ত নাই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশূন্য ব্যোম
ব্যাপিয়াছে শুধু মৃত্যুভয়;
লক্ষশত প্রাণ
নিভিতেছে জ্বলিতেছে নক্ষত্রের মত,
মৃত্যু হানিতেছে ওষ্ঠে শীতল চুম্বন।

আহা এত প্রীতি-প্রেম-স্নেহ-ভালবাসা
কোথা রেখে যাবে তারা?
জীবনের মাঝে
যাহারা উঠেছে ফুটে সরল শোভায়
ছোটখাটো সুখ দুখ হাসি অশ্রু সাথে
কোথায় মিলাবে তারা?
বুক-চেরা যতনের ধন
সম্ভোগ-আনন্দ-তৃষা-ব্যথিত জীবন
এ কি শুধু ক্ষণিক বিলাস!
তারপর আর-কিছু নাই,—
আছে শুধু মহাব্যোম-ব্যাপী মৃত্যুভয়
কৃষ্ণ ভয়ঙ্কর।

কে না জানে জীবনের অনন্ত পিপাসা!
কে না জানে জীবনের নিত্য পরিণাম!
ভয়ত্রস্ত যেতে যেতে তাই
কিছু রেখে দিয়ে যাই অমৃতের আশে,
গ'ড়ে তুলি সংসার সমাজ।
দেহের পুনরাবৃত্তি জন্মদ্বার দিয়ে
আনে শুধু জীবনের অখণ্ড স্পন্দন।

তবু হায় নিস্তার কোথায়?
পশ্চাতে ফিরায়ে মুখ যতদূর চাই
নাই—নাই—কোনো কিছু নাই,
শত রাজ্য ভাঙে গড়ে হৃদয় হারায়,
শত ফুল ফোটে ঝরে নির্ম্মম ধরায়,
সহস্র চূর্ণিত আশা দিকচক্রবালে
মরীচিকাময়ী শুধু হানে বিভীষিকা
নিরন্তর ত্রস্ত আঁখিযুগে।
সেই বিভীষিকা
যত মোরা ছুটে চলি তত পিছু আসে।
যত মোরা এড়াইতে চাহি—
তত ঘোর ছায়া ফেলে শূন্য ব্যোমতলে।
তারপর দেখি—
চলিবার পথ আর নাহি,
চারিদিকে ঘেরিয়াছে অন্ধ-অন্ধকার,
পশ্চাৎ হইতে টানে কৃষ্ণ অষ্টাপদ
বিষাক্ত বাহুর ঘেরে করিয়া বেষ্টন।
সে ভীম কবল হতে মুক্তি লভিবারে
যত ছুটে চলি আগে—তত ভয়ঙ্কর
প্রসারিত করে দীর্ঘ কর,
কঠিন বেষ্টন তার তেমনি ভয়াল

তবু শেষ নাই,—
অন্তহীন আকাশেরো শেষ নাই কোথা !
—সহসা সম্মুখে নামে নিশ্চল-বিস্তার
—জীবনের মরণের মাঝে—
মৃত্যুভয়-যবনিকা নিস্তরঙ্গ স্থির,
পটভূমিকায়
শুধু ভাসে ছায়া-ছবি ভাসে ও মিলায়,
অনন্ত শর্ব্বরী-কোলে তারকার মত,
এই কৃষ্ণ যবনিকা রহস্যমণ্ডিত
এই মৃত্যুভয়।

এই মৃত্যুভয় তারে জানাই প্রণাম !
বলিলাম স্থিরকণ্ঠে এই মৃত্যুভয়
যতকাল আছে আমি আছি,
হোক দেহ হোক তাহা মন
হোক তাহা ভিন্ন আরো কিছু।
এই মৃত্যু ভয়—তাই দেহের দেউলে
প্রাণপণ করি আরাধন
দেবতা-দর্শন লাগি,
যেথায় সে নিয়ত আসীন
দেহ হতে দেহ সৃজি দীপ হতে দীপে
চিরকাল মধুর আরতি,
আমার সন্তানমাঝে চির-আয়ুষ্মান
চিরকাল-ব্যাপী সেথা মোর জাগরণ।
এই মৃত্যুভয়—তাই মানসের ছায়ানীল তটে
মোর ছবিখানি
রেখে যেতে চাই শুধু গীতে ও গাথায়,
বর্ণের বিন্যাসে আর সুরের বিলাসে।
সবাকার সুখে দুখে মোর অনুভূতি

চিরকাল দোলা দেয় আনন্দে ব্যথায়
চিরকাল রই আমি বেঁচে।
এই মৃত্যুভয়—তাই খুঁজি সত্তা তার,
জ্যোতিষ্মান চির-রূপময়,
জড়দেহ গতিশীল মন হতে বিশিষ্ট যেজন,
খুঁজি তারে তমসার পারে
তার মৃত্যুহীনতায় জাগে মোর বাঁচিবার সাধ।
এই মৃত্যুভয়—তারে জানাই প্রণাম,—
যার লাগি বীজ-ধ্বংসে অঙ্কুরের জাগে সম্ভাবনা
কায় হতে কায়ান্তরে রঙিন বাসনা,—
মহাকাল নির্ম্মম কঠিন
যতকাল আছে আমি আছি ;—
যতকাল মৃত্যুভয় ততকাল আমিও অমর।

কাল রাতে দেখিনু স্বপন—।
—নিস্তব্ধ নির্জ্জন ঘর একা সঙ্গীহীন,
রাত্রি প্রায় শেষ,
পূর্ব্বাকাশে মিশিতেছে আলো আঁধারের
যুগল বাহুর ঘন মুগ্ধ আলিঙ্গন,—
তারি পানে নিষ্পলক চাহি
বলিলাম নিস্তরঙ্গ মন,
—এও শুধু স্বপ্ন স্বপ্ন—সত্য কিছু নহে
—নিশিভোরে মৃত্যু দেখিলাম।

উমা দেবী

পিশাচ

রাসমণি

রাসমণি কবে এবং কোথায় জন্মাইয়াছিল, কেহ জানে না। দীর্ঘকাল প্রবাসে বাস করার পর হঠাৎ একদিন রাসমণির পিতা গ্রামে ফিরিয়া আসিল। ভগ্ন কোঠাবাড়িটাকে রাজমিস্ত্রীর দল বাসোপযোগী করিবার জন্য পরম উৎসাহে কাজে লাগিয়া গিয়াছে। সাময়িক বসবাসের জন্য রামু গোয়ালা তাহার আটচালা ছাড়িয়া দিয়াছে। এত বৎসরের একত্রিত খাজনা নবীন স্যাকরা (রাসমণির পিতা) নাকি এক দিনে সব টাকা দিয়া জমিদার ছোটকর্ত্তার সহিত বোঝাপড়া করিয়া লইয়াছে। অল্পদিনের ভিতরেই পরিত্যক্ত কোঠাবাড়িটি চকচকে ঝকঝকে হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে নবীন প্রচার করিয়া দিয়াছে, সঙ্গের মেয়েটি তাহার কন্যা। কন্যার মাতা বিদেশে মারা গিয়াছেন।

কোঠাবাড়ির নূতন ছাঁদ দেখিয়া সকলেই বুঝিল, নবীন বেশ পয়সা করিয়াছে। কারণ শুধু সে বাকি খাজনা চুকাইয়া দেয় নাই, এক লপ্তে চার শত বিঘা আবাদী জমি ইজারা লইয়াছে, আট জোড়া বলদ কিনিয়াছে, কামার-বাড়িতে নূতন হালের ফরমাশ দেওয়া হইয়াছে, বাস্তুভিটার পিছনদিককার ছোট পুকুরটাও আরও বড় করিয়া কাটানো হইতেছে।

বৎসর না পার হইতেই নবীন স্যাকরা গ্রামে একটি গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিল। সামান্য ঘনিষ্ঠতার পরই গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিরা চিনিয়া ফেলিল, রাসমণি কে। মুখটি তাহার হুবহু ক্ষান্তর মত হইয়াছে, রং পাইয়াছে বাপের মত, একেবারে পালিশ-করা আবলুস কাঠ। ক্ষান্তই যে রাসমণির মা, তাহাতে কাহারও সন্দেহ থাকিল না।

ক্ষান্ত, বাঁড়ুজ্জেদের সেই সোমত্ত বিধবা মেয়েটা, যাহার চরিত্রের জ্বালায় পাড়ার লোকদের কোথাও মুখ দেখাইবার উপায় ছিল না। ওই ধিঙ্গী মেয়েটাই তো নবীন স্যাকরার সহিত পলাইয়াছিল। উহাদের দেখা-শুনা বন্ধ করিবার জন্য চণ্ডীমণ্ডপে কত রকম আলোচনা ও আয়োজন

হইয়াছিল, কেহই উহাদের সাক্ষাৎ ঠেকাইতে পারে নাই। তাহার পর কেলেঙ্কারি আর যখন লুকাইবার কিছু থাকিল না, তখন বাঁড়ুজ্জে মহাশয় চীৎকার করিয়া ক্ষান্তর নাম ধরিয়া বলিয়াছিলেন, তুই যদি বাড়ি থেকে বেরিয়ে না যাস তো আমার মাথা খাস। তুই আর এক দিন যদি এখানে থাকিস, আমি গলায় দড়ি দোব। যতই ঢাকিবার চেষ্টা করুক, ক্ষান্তর দৈহিক গঠনের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা আর লুকানো যায় না। মায়ের প্রায় বৃদ্ধ বয়সে সন্তানসম্ভাবনা হইয়াছে, তিনি একই কারণে কন্যার জন্য মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছেন। মোটা লালপেড়ে শাড়ি পরিয়া থান-পরিহিতা পূর্ণযুবতী কন্যাকে বলিলেন, তুই এ কি কাণ্ড করলি, আমার মুখ দেখাবার কিছু রাখলি না! কন্যা কোন প্রতিবাদ করে নাই, কেবল মাতা ও নিজের দেহের তুলনা করিয়াছিল। এই ঘটনার পরের দিন ক্ষান্ত ও নবীনকে গ্রামে খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

নবীন গ্রামে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই বাঁড়ুজ্জে মহাশয় গত হইয়াছেন। তাঁহার স্ত্রী ভিন্নগ্রামে ভ্রাতার একান্নবর্ত্তী পরিবারে রাঁধুনীর কাজও করেন, ভ্রাতুষ্পুত্রদের দেখাশুনাও করিয়া থাকেন। সে অনেকদিন হইয়া গেল। ক্ষান্ত, নবীন ও বাঁড়ুজ্জে মহাশয়ের কথা এখন বড় একটা কেউ বলে না। কেলেঙ্কারি পুরাতন হইলে তাহার ঝাঁজ কাটিয়া যায়। ঝাঁজ না থাকিলে কেচ্ছার আলোচনায় তেমন আরাম পাওয়া যায় না, সেই কারণেই উহাদের কথা সকলে ভুলিয়াছে।

রাসমণি-সহ নবীন ফিরিয়া আসিতে দুই-চারিজন দিন কতক কানা-ঘুষা করিয়াছিল। কিন্তু বাড়ি, জমি ইত্যাদি দেখিয়া বুদ্ধিমানরা এ বিষয়ে আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল। রাসমণি তখন কিশোরী—যৌবন সবে হানা দিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিন্তু সে তাহা ঠিক বুঝিয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে সব কিছুর ভিতরই কেমন একটা নূতনের সাড়া পাইতেছিল মাত্র—কিন্তু নূতনকে সম্পূর্ণ অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই।

পিতামাতার একমাত্র সন্তান, গোড়া হইতেই একটু বেশি রকম আদর পাইয়াছিল, অর্থাৎ সে নিজের ইচ্ছামত চলিত। গাছে উঠিয়া পেয়ারা খাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া সমবয়স্ক ছেলেদের সহিত সে বালকের

মত ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ইচ্ছামত বাড়িয়া উঠার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা না থাকিলেও দুঃসাহসিকতা ছিল। নিজের উচ্ছ্বাস সে দমন করিতে পারিত না। এই বয়সে অপর মেয়েরা অপরাহ্ণে নিয়মিতভাবে প্রসাধনের নিমিত্ত গুরুজন-স্থানীয়াদের নিকট দেহ সমর্পণ করিয়া থাকে। চুলের গোছা লইয়া যখন পিসীমা, খুড়ীমা অথবা জননী পিছন হইতে প্রাণপণ শক্তিতে টান মারেন, তখন যন্ত্রণা উৎকট হইয়া উঠিলেও সহ্য করাটাই প্রসাধন-সাফল্যের অপরিহার্য্য ধর্ম্ম। কোন মেয়েই এই সময়টিতে অবাধ্য হইতে সাহস পায় না, সৌন্দর্য্যের টীকা সুনিশ্চিত করিবার জন্য। রাসমণির চুল বাঁধিয়া দিবার জন্য কেহ ছিল না। তাহার যে-দিন ইচ্ছা হইত চুল বাঁধিত, যেদিন ইচ্ছা হইত না ধূলায় ভরা এলো চুলে ঘুড়িয়া বেড়াইত। কোন বকাটে ছেলে রাসমণির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া একদিন 'পাগলী' বলিয়া হাসিয়াছিল, রাসমণি বাম হস্তে অর্দ্ধভুক্ত কামড়-দেওয়া পেয়ারাটা লইয়া দক্ষিণ হস্তটা ব্যবহার করিয়াছিল একটি ভাল রকমের চড় কষাইবার জন্য।

চড় খাইয়া ছেলেটি ঘুরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। তাহার পর সে রাসমণির ত্রিসীমানায় আসে নাই। রাসমণি এই ভাবে একটা উগ্রগন্ধযুক্ত বনফুলের মত বাড়িয়া উঠিতেছিল।

অল্প সময়ের ভিতর বনফুলের তীব্র গন্ধ অনেকের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল। ফুলটি কণ্টকপূর্ণ, কেহ নিকটে আসিতে সাহস পাইল না। কিন্তু গন্ধটা যে চড়া, তাহা রসিকমাত্রেই মনে মনে স্বীকার না করিয়া পারিল না।

উপযুক্ত সময়ে নব-প্রস্ফুটিত বনফুলের বার্ত্তা বায়ুতে বহন করিয়া আনিল নলিন স্বর্ণকারের নিকট। নলিন স্বর্ণকার জাতব্যবসায়ী; সোনা-রূপার গহনার দোকান আছে, এবং পুরাতন গহনার ব্যবসায়ের সহিত তেজারতির কারবারও চলে। ঋণীর দল আসল দিতে আসিলে বলে, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন মশাই, এ তো ঘরের কথা, অসুখ আছে, বিসুখ আছে, আপনাদের টাকার প্রয়োজন কত, আমি কি আপনাদের পর? সামান্য যা সুদ হয়েছে, সেইটুকু দিলেই চলবে। ঋণ-গ্রস্তরা সবই বুঝিত, তথাপি একসঙ্গে অতগুলি টাকা ঘর হইতে বাহির

করিয়া দেওয়া সোজা কথা নয়। নলিনের উপদেশ মানিয়া লইত; সুদের ক্রমবৃদ্ধিতে নলিন হৃষ্ট হইয়া উঠিত।

নলিন লোকটা মোটের উপর মন্দ নয়। ব্যবসায়ী বুদ্ধি একটু বেশি রকম কড়া না হইলে সকলেই প্রাণ খুলিয়া বলিত, লোকটা চরিত্রের দিক দিয়া আদর্শ পুরুষ। কিন্তু গ্রামের গণ্যমান্য অনেকেই নলিন সরকারের নিকট ঋণগ্রস্ত, সুতরাং প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। নলিন সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলেই ধারের কথা আগে মনে আসে।

অর্থ সম্বন্ধে যতই দুর্ব্বলতা থাক, নলিন যে চরিত্রের দিক দিয়া আদর্শ মানুষ—এ কথা সকলেই অকপটে স্বীকার করে। এত ভাল চরিত্র যে, বাড়িতে একটি সোমত্ত বয়সের ঝি পর্য্যন্ত রাখে না। এমন একটি মহাপুরুষের নিকট হইতে যখন রাসমণির সহিত বিবাহের প্রস্তাব আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাসমণির পিতা তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সাহস পাইল না। নলিন ইতিমধ্যে দুই দুই বার পাণিগ্রহণের অবশ্য-কর্ত্তব্য সারিয়া ফেলিয়াছে। রাসমণির সহিত বিবাহের প্রস্তাব তৃতীয় বারের পালা। নলিনের পূর্ব্ববিবাহের ইতিহাস আছে, তাহা উপাদেয় না হইলেও এই গল্পের সহিত জড়িত।

প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে নলিনের পিতা খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে যাহারা বিবাহ করিত, তাহাদের মতামতের কোন প্রয়োজন হইত না; অভিভাবকরা বিবাহ দিয়া দিতেন। নলিনের বেলায় এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বিবাহের কিছুদিন পরেই গৃহস্থালির সমস্ত ভার নলিন ও বউমার উপর চাপাইয়া নলিনের পিতা ইহলোক ত্যাগ করিলেন। লোকে বলিল, বউটা সুলক্ষণা নয়, ঘরে না আসিতেই শ্বশুরকে খাইল। ইহা প্রথম পক্ষের বধূ শুনিয়াছিল। অভিযোগ করিবার কিছু নাই; কারণ সে জানিত, সনাতনপন্থীর বিচারে বাড়ির প্রাচীন অকর্ম্মণ্য ছাগলটি মরিলেও দোষ পড়িত বউয়ের উপর।

বিবাহের পর ছয় মাস কাটিয়া গিয়াছে। উভয়ে উভয়কে জানিবার সুযোগ ইতিমধ্যে যতটুকু পাইয়াছিল, তাহাই উভয়ের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল। গৃহস্থের বউ হইলেও তাহারও

একটা সহ্যের সীমা আছে। এই সীমা একদিন অতিক্রম করিল। প্রথম পক্ষ বলিয়া ফেলিল, এ সংসারে বাঁচার চেয়ে মরণ ভাল। আমি গেলেই সকলের হাড় জুড়বে। যাচিত ঘটনাটি ঘটিতে বেশি দিন সময় লাগিল না। নলিনের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া প্রথম পক্ষ গলায় দড়ি দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। কতটা যন্ত্রণা পাইয়া সে মৃত্যুকে বরণ করিয়াছিল, তাহা সাধারণের নিকট অজ্ঞাত থাকিয়া গেল। সকলে বলিল, অলুক্ষণে বউ গেছে, বাঁচা গেছে। পুরুষমানুষের বিয়ের ভাবনা!

আদালতে যথাসময়ে মামলা উঠিল, দারোগা হইতে সকলেই বলিলেন, নলিনের মত সৎচরিত্রের মানুষ দেখা যায় না। নলিন নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি পাইল। হাকিম রায় দিলেন—আত্মহত্যায় মৃত্যু; কারণ অজ্ঞাত।

এই ঘটনার পর মাত্র তিনটি মাস নলিন ধৈর্য্যকে ঠেকা দিয়া রাখিয়াছিল। ঘটকদের ঘন ঘন গতায়াত চলিতেছিল। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া একদিন কন্যাদায়গ্রস্ত একটি প্রপীড়িত পিতাকে নলিন উদ্ধার করিয়া ফেলিল। বিবাহ এবার নিজের পছন্দমত হইয়াছিল। সবল সুস্থ বউ ঘরে আসিল। গৃহস্থালির কাজ ভালই চলিতেছিল; কিন্তু স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পায় নাই। নলিন আলদা ঘরে শুইত। এই অকারণ ব্যবধানের প্রশ্ন মেজবউয়ের অন্তরকে কণ্টকের মত বিঁধিতেছিল, কিন্তু কখনও সে অভিযোগ করে নাই। বুক ফাটিয়া গিয়াছে, কারণটি জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া লজ্জার কশাঘাতে বিধ্বস্ত হইয়া স্বামীর সামনে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। নিজেকেই প্রশ্ন করিয়াছে, কেন এমনটি ঘটিল? কেন তাহার নিজের স্বামীর নিকট যাইবার অধিকার নাই? যে মানুষ দিনের বেলা ভাষার আদরে উদ্‌ব্যস্ত করিয়া তোলে, সেই মানুষই রাত্রির অধিকতর সুযোগ পাইয়া এই অস্বাভাবিক দূরত্ব সৃষ্টি করে কেন? স্বামীর আচরণ স্ত্রীর নিকট রহস্যময় হইয়া উঠিতেছিল। ক্রমে তাহা অসহনীয় হইয়া উঠিল। মনের সহিত দেহের সম্বন্ধ অতি নিকট, ধীরে ধীরে মেজবউ হিষ্টিরিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িল।

নলিনের ভাগ্যে ঘটনাচক্র সাংঘাতিকভাবে ঘুরিতেছিল। নলিন একদিন দোকান হইতে ফিরিয়া দেখিল, মেজবউ আঁস্তাকুড়ে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া আছে। অনেকক্ষণ বোধ হয় হাত-পা ছুঁড়িয়াছিল। খানিকটা জায়গা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। মেজবউ পাতকুয়ায় মাছ ধুইতে আসিয়াছিল, একটি বড় কই কাঁটা সহ হাতের মুঠার ভিতর নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে। কাঁটাগুলি তখনও হাতের নরম তালুতে বিদ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত বাহির হইয়া শুকাইয়া গিয়াছে। নলিন পোদ-পিসীকে ডাকিয়া আনিল—পুরুষ কাহাকেও তো ডাকা চলে না, অঙ্গবস্ত্র স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে। উভয়ে মাথায় বুকে জল দিতে আস্তে আস্তে জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। পোদ-পিসীকে সামনে দেখিয়া মেজবউ মাথায় ঘোমটা টানিয়া দিল। সমস্ত দেহ ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছিল। পোদ-পিসী জিজ্ঞাসা করিল, জল খাবে? মেজবউ মাথা নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল। নলিন জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েছিল বউ?

মেজবউ পোদ-পিসীর কানের নিকট মুখ লইয়া বলিল, আমি এইখানে বড়দিকে দেখেছিলাম, আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিলেন, সাদা কাপড় প'রে ওইখানটায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, ওই যে ওইখানটায়।—এতটা বলিয়া আলো-আঁধারিতে গোয়াল-ঘরটার দিক তর্জ্জনীর দ্বারা দেখাইয়া দিল। নলিন ও পোদ-পিসী উভয়েই সেদিকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল, কিছুই নাই, কেবল ঝুনু গোয়ালার ছেঁড়া কাপড়টা লম্বা-লম্বি ঝুলিতেছে। কাপড়টি একটি বাঁশের উপর হইতে যে ভাবে নামিয়া আসিয়াছিল তাহাতে অন্ধকারে হঠাৎ দেখিলে ঘোমটা-দেওয়া নারী-মূর্ত্তির মতই লাগে বটে। কাপড়টা তুলিয়া আনিয়া নলিন মেজবউকে দেখাইল। কাপড় দেখিয়া মেজবউ একটু হাসিল, পোদ-পিসীর কাঁধে ভর দিয়া ঘরে আসিয়া বসিল। পিসী কাপড় দেখিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই। কানের কাছে মুখ আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ছেলেপিলে হবে নাকি রে? মেজবউ মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। পিসী বিশ্বাস করিল না, গালে ছোট্ট একটি ঠোনা মারিয়া বলিল, মা হবি, তাতে লজ্জা কিসের বউ? উত্তরে মেজবউ প্রতিবাদ করিবার জন্য আরও জোরে

মাথা নাড়িয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। পিসী নিজের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া বলিল, ছি, এ অবস্থায় সন্ধ্যেবেলা আঁস্তাকুড়ে একলা যেতে আছে বাছা, তার ওপর আবার সঙ্গে মাছ নিয়ে গেছিস! আর ওখানে একলা যাস নি। আড়ালে নলিনকে ডাকিয়া বলিল, বারদোষ লেগেছে, তার ওপর অপঘাত কিনা—দেখো, যেন বড়বউ ভর না ক'রে বসে। সন্তান সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া পিসী চলিয়া গেল।

নলিন রোয়াকটায় বসিয়া ছিল, মেজবউ তাহার নিকটে আসিয়া কম্পিত গলায় বলিল, আমাকে কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দাও। এখানে সমস্ত দিন একলা থাকি, বড্ড ভয় করে। বড়দিকে এর আগেও দু-একবার দেখেছি, ঠিক তুমি যে রকম চেহারা বলেছিলে, সেই রকম। তখন কিন্তু আমাকে ডাকেন নি। আজ ওখানে মাছ ধুতে গিয়েই দেখলাম, গোয়াল-ঘরের দরজার সামনে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন এবং আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। তারপর আমার মনে হ'ল, তিনি বলছেন, দে না, গলায় দড়ি দে, আমার কাছে চ'লে আয়, তোর সব দুঃখু ঘুচে যাবে। আরও হয়তো কিছু বলিবার ছিল, কিন্তু বলিতে পারিল না, নিতান্ত অসহায়ার মত নলিনের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিল, আমাকে বাবার ওখানে পাঠিয়ে দেবে? নলিন একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে দুপুরবেলায় দাওয়ায় মেজবউ আপন মনে বসিয়া ছিল, হঠাৎ তাহার গলায় দড়ি দিবার কাতর আহ্বান মনে পড়িল। পরক্ষণেই অনুভব করিল, বড়বউ অদৃশ্যভাবে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন এবং ফিসফিস করিয়া বলিতেছেন, আর কতকাল ভুগবি, সোমত্ত বয়েস নিয়ে আর কতদিন ভুগবি, গলায় দড়ি দে, তোর সব দুঃখু কেটে যাবে, আয় আয়, আমার কাছে চ'লে আয়।

মেজবউ উঠিল, দৃষ্টি তাহার সম্মোহিতের মত। যে ঘরে বড়বউ আত্মহত্যা করিয়াছিল, তাহার ঠিক মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল। শূন্য দৃষ্টিতে প্রত্যেকটি দেওয়াল দেখিল; আর দেখিল যেখান হইতে বড়বউ ঝুলিয়াছিল সেখানটা। অনুমানে মেজবউ অতীতের সব ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিতেছিল। ওই তো সেই দড়ি, এখনও তাহার খানিকটা অংশ

বাঁশের সহিত আটকাইয়া আছে। কে বলিবে, উহা দড়ি নয়, উহা ঝুল, আবর্জ্জনা পরিষ্কারের অভাবে নিজের অস্তিত্ব গড়িয়া তুলিয়াছে। মেজবউ দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া কি কামনা করিল, তাহার পর জ্ঞান হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। পরের দিন নলিন নিজে অনাহূতভাবে মেজবউকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি উপস্থিত হইল। একটি গ্রামের পরেই নলিনের শ্বশুরালয়। নলিন না বলিলেও মেজবউয়ের পিতামাতা সব খবরই রাখিতেন। অসুস্থতার কারণ যখন অহেতুক জানিতে পারিলেন, তখন উভয়েই কন্যার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন—সোমত্ত মেয়ে, কিছু যদি ঘটিয়া যায়!

কিছুদিন সহজভাবে কাটিয়া যাওয়ায় পিতামাতা উভয়েই নিশ্চিন্ত হইয়া আসিতেছিলেন, রোগটা তাহা হইলে হয়তো সারিয়া যাইবে। অনেকদিন পর বাপের বাড়িতে আসিতে পাইয়া মেজবউ বেশ সুস্থ বোধ করিতেছিল। এই কারণে তাহাকে আগলানোর সাবধানতাও শ্লথ হইয়া আসিতেছিল। ভবিতব্যের উপর কাহারও হাত নাই। মাতা সেদিন কিছু আগে ঘাটে বাসন লইয়া গিয়াছিলেন, পিতাও তখন কর্ম্মস্থলে। এমনই সময় দেখা গেল, মেজবউয়ের বাপের বাড়িতে আগুন লাগিয়া গিয়াছে, হেঁসেলঘরের ছাউনি দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে। ক্ষণিকের ভিতর অগ্নি দিগ্বিদিক জ্ঞান-শূন্য হইয়া ছুটিয়াছে গৃহস্থের আশ্রয়কে গ্রাস করিতে। গৃহদাহের বার্ত্তা অগ্নি নিজেই বহন করিয়া চলিল দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে। পাড়ার লোক ছুটিয়া আসিল বালতি ঘটি, যে যাহা সামনে পাইল, তাহাই লইয়া।

মেজবউয়ের মাতা পুকুরঘাট হইতে চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, আমার কি হ'ল গো, মেয়েটা যে ঘরের ভেতর রয়েছে! চীৎকার শুনিয়া দুই একটি সাহসী ছেলে হেঁসেলঘরে ঢুকিয়া পড়িল—মেজ-বউ একেবারে উনানের উপর উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে, সব কাপড়ে তখনও আগুন লাগে নাই, কিন্তু পেটটা একেবারে ঝলসিয়া গিয়াছে। যখন মেজবউকে ঘর হইতে বাহির করিয়া আনা হইল, তখন তাহার দেহ প্রাণহীন অসাড়। সকলের চেষ্টায় আগুন নিবিয়া গেল। খবরটি

যথাসময়ে নলিনের নিকট আসিয়া পৌছাইল। নলিন কাঁদিল না, স্তব্ধ হইয়া সংবাদটি গ্রহণ করিল। লোক সংগ্রহ করিয়া গরুর গাড়িতে গমন করিল। চিতার সর্ব্বগ্রাসী অগ্নি মেজবউয়ের বাকি অংশটুকুও উপযুক্ত সময় পুড়াইয়া দিল।

শ্মশানযাত্রীর দল ফিরিয়া আসিয়া নলিনকে পরামর্শ দিল, ঘরটা ভাঙিয়া ফেল, তাহার পর ত্রিরাত্রি ওখানে আগুন জ্বালাইয়া রাখিলে দোষ কাটিয়া যাইবে। একটা লোহার পেরেক দরকার, সেইটাই ডাইনীর কুনজর হইতে রক্ষা করিবে। নলিন এবার নিজেই একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিল, কি জানি, গত দুইজনেই যদি তাহাকে তাহাদের পথ অনুসরণ করিতে বলে! শ্মশানযাত্রীদের মধ্যে একজনকে তাহার সহিত বাকি রাত্রিটা থাকিতে বলিল। একজনের পরিবর্ত্তে সকলেই থাকিয়া গেল, কারণ পান এবং অনুপান উভয়েরই বন্দোবস্ত প্রচুর পরিমাণে ছিল। সমস্ত রাত্রিটা নলিন বাদে সকলে মিলিয়া হুল্লোড় করিয়া মেজবউয়ের জন্য শোক প্রকাশ করিল।

দুই বৎসর হইতে চলিল, মেজবউ মরিয়াছে। রাসমণির বাড়ন্ত গঠনের কথা হাওয়ায় উড়িতেছিল—যথাসময়ে তাহা নলিনের নিকট আসিয়া পৌছিল। ভোজনপ্রিয় হিতৈষীর দল উৎসাহিত হইয়া নলিনকে প্রায় উত্তেজিত করিয়া তুলিল, আরে বাপু, কালো হ'ল তো কি হ'ল? অমন আগলা-শ্রী মেয়ে দেখেছ কোথাও? চেহারাটাই লক্ষ্মীমন্ত। হিতোপদেশের বোঝা ক্রমশ বাড়িয়াই চলিয়াছিল। অবশেষে নলিন ঠিক করিয়া ফেলিল, রাসমণিকে সে বিবাহ করিবে।

নলিনের মত একটি আদর্শ পুরুষ পরোপকারার্থ বিবাহে সম্মতি দিয়াছেন জানিতে পারিয়া রাসমণির পিতা শুভকার্য্যে কালবিলম্ব করিলেন না। বিবাহে স্ত্রী-আচার হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি অবশ্য-পালনীয় অনুষ্ঠান ছিল, সবেতেই জামাই এবং শ্বশুর প্রাণ ভরিয়া খরচ করিল। বরপক্ষ উদর পূর্ণ করিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গেল, বার বার তিনবার, এবার টিকে যাবে।

রাসমণি ফুলশয্যায় সমবয়স্কাদের সহিত প্রাণ খুলিয়া হাসিয়াছিল, খেলিয়াছিল, ফুল ছুঁড়িয়া নিজের বরকেই মারিয়াছিল। ইহা লইয়া

বরপক্ষের দুই-একজন প্রাচীনা নিজেদের মধ্যে অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করিতে ছাড়েন নাই। রাসমণির কানে খবরটি আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল, কিন্তু ভব্যতার সব আইন তাহার জানা ছিল না; ভাবিল, উহা হয়তো এক রকমের রসিকতা। কয়েকটি বলিষ্ঠা মেয়ে রাসমণিকে শূন্যে উত্তোলন করিয়া নলিনের ক্রোড়ে বসাইয়া দিল। রাসমণি কিছুমাত্র বাধা দিল না। রাসমণিকে তাহার সমবয়স্কারা চিনিত, কানে কানে কি বলিল। রাসমণি হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর বলিল, কি, আমি পারি না? এই দেখ।

"এই দেখ" বলিয়া যাহা সে করিল, তাহা পাশ্চাত্য সমাজে অধুনা চলন হইলেও দেশী কোন নববধূ স্বামীর সহিত প্রথম সাক্ষাতে সকলের সামনে তাহা করিতে পারিত না। রাসমণি বরের গাল টিপিয়া একটি গোটা চুম্বন করিয়া ফেলিল। চুম্বনের পরেই একজন সখীকে ডাকিয়া কানে কানে বলিল, ভাই, ওর মুখে বিচ্ছিরি গন্ধ। নলিন বহুদিন হইতে পাইওরিয়ায় ভুগিতেছিল। দাঁতের বেদনা অনুভব করিলেও গন্ধের খবর সে নিজেই জানিত না। কিশোরীর অর্থহীন চুম্বন প্রৌঢ় নলিনকে প্রেম-মদিরায় নিমজ্জিত করিয়া দিল। নলিনও হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। রাসমণিকে হৃদয়ের বাহির ও অন্তর স্পর্শ করাইয়া গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিল। সার্কাসের ক্লাউন যেন নূতন খেলা আমদানি করিয়াছে। সকলেই বুড়া বরের কাণ্ড দেখিয়া হাসিয়া লুটাপুটি। সকলের হাসির সহিত নলিনও যোগ দিল, যেন তারের যন্ত্রগুলি একসুরে বাঁধা হইয়া গিয়াছে, একের ঝঙ্কারে অপরে বাজিতেছে।

রাত্রির গভীরতার সহিত ক্রমে আমোদের ঝঙ্কারও কমিয়া আসিতে লাগিল। অবশেষে দুইটি প্রাণী থাকিয়া গেল দুইজনের সহিত চিরপরিচিত হইবার জন্য।

নলিন উঠিয়া আলোটা কম-জোর করিয়া দিল। অভিজ্ঞতা তাহাকে অনেক কিছু শিখাইয়াছিল। বিবাহের পর প্রথম রাত্রি অসুবিধা ওত পাতিয়া থাকে। দরজার উপর কান পাতিয়া অনেকক্ষণ শুনিল, কেহ আড়ি পাতিতেছে কি না। নলিন নিশ্চিন্ত হইল, কেহ

নাই। ফিরিয়া আসিয়া রাসমণিকে বুকের কাছে টানিয়া লইল। মুখে, গালে, কপালে চুম্বনে ভরাইয়া দিল। রাসমণির অদ্ভুত বোধ হইলেও ভাল লাগিতেছিল; কেবল মুখটা অতি নিকটে আসিলেই গন্ধটা পছন্দ করিতেছিল না। নলিনের আদর পূর্ণ রূপ গ্রহণ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে, এমন সময় রাসমণি বলিয়া ফেলিল, তোমার মুখে অত বিচ্ছিরি গন্ধ কেন? বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই প্রশ্নটি অপ্রত্যাশিত, আকস্মিক ও কাল এবং পাত্র হিসাবে অশোভনীয়। নলিনের সমস্ত প্রেমোদ্যম এক মুহূর্তে চুরমার হইয়া গেল। ক্ষণকাল পূর্বে যে দেহ ও মন উৎসর্গ করিয়াছিল, তাহার মুখে এ কি বাণী! তাহার প্রেমোচ্ছ্বাসের বিনিময়ে এ কি প্রতিদান! নলিন কোন উত্তর দিতে পারিল না। ছোটদের সহিত হুড়ামুড়ি করিতে গিয়া প্রায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। উঠিয়া নিজেই এক গ্লাস জল ঢালিয়া খাইল। তাহার পর বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

রাসমণির চোখে তখনও ঘুম আসে নাই। একলা ঘরে সে বসিয়া আছে, অপরিচিত পুরুষের পাশে। ঝিমানো আলোতে যে আবেষ্টনী সৃষ্টি করিয়াছিল, রাসমণির কাছে তাহা নূতন অভিজ্ঞতা। নূতনের ভিতর কেমন একটা মাদকতা ছিল, রাসমণি তাহার বিশ্লেষণ করিতে পারে নাই; কিন্তু তাহার প্রভাব সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করিতেছিল। তাহারও উচ্ছ্বাস আসিতে লাগিল, কিন্তু উপযুক্ত প্রকাশ তাহার জানা ছিল না। গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন নলিনের গোঁফটা একটু টানিয়া দেখিল। মুখের কাছে আসিয়া কি করিতে যাইতেছিল, দুর্গন্ধের কথা মনে পড়িতেই নিজেকে সংযত করিয়া লইল। রাত্রি আরও গভীর হইয়া আসিতেছিল, প্রেমোন্মত্তার নিকট নিস্তব্ধতা প্রাণবান হইয়া উঠিয়াছে, রাসমণি আবার নলিনের চিবুকে হাত বুলাইল। নলিনের তখন নাক ডাকিতেছে।

নলিনকে তাহার ভাল লাগিল, মনে মনে ভাবিল, এ আমার বর, আমার নিজের বর। অন্তরে উপলব্ধি করিল, এ দাবিতে কেহ ভাগ বসাইতে আসিবে না। উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আর একবার নলিনের গালে হাত দিয়া তাহারই পাশে, অতি নিকটে শুইয়া পড়িল।

বিবাহের পর দীর্ঘ আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, রাসমণি এখন পূর্ণ যুবতী। কিন্তু সন্তানের মা হইবার সৌভাগ্য এখনও সে পায় নাই। পোদ-পিসী, রামুর মা ইত্যাদি পাঁচু-ঠাকুরের মাদুলি হইতে আরম্ভ করিয়া পীরবাবার দাওয়াইয়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু রাসমণি কোনটাই ব্যবহার করে নাই। সে জানিত, ঔষধ ব্যবহারে কোন লাভ নাই।

যতই যৌবন রাসমণিকে চারধার হইতে ঘিরিতে আরম্ভ করিল, ততই নলিন বধূকে খুশি করিবার জন্য নিত্য নূতন পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে থাকিল। ভাষাও নিত্য নবরসে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। সংক্ষেপে রাসমণির জন্য আদরের ভাষা লইয়া নলিন সর্ব্বদাই, প্রস্তুত বলিব না, তটস্থ হইয়া থাকিত। নলিন যতই উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রাণের কথাকে নানা রূপ দিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করে, ততই সে অনুভব করিতে থাকে, তাহার মনোভাব প্রকাশ হইতেছে না, কোথায় কিসের অভাব থাকিয়া যাইতেছে, যে অভাব পূর্ণ করিবার শক্তি তাহার নাই।

এই ভাবে রাসমণি ও নলিনের দিন কাটিয়া যাইতেছিল। রাসমণি এখন মনকে আবরু দিয়া বেড়ায়। সাবধানতার দৃঢ় দেওয়াল আবরুকে অভেদ্য করিয়া রাখিয়াছে। নলিন জানিতেও পারে না, তাহার প্রেম-নিবেদনের উৎকোচ রাসমণি আড়ালের পিছন হইতে কি ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিতেছে।

রাসমণি খোলা বাতাসের জন্য হাঁপাইয়া উঠিতেছিল। পাড়া ঘোরা তাহার অভ্যাস নাই। দীর্ঘকাল সে স্বামীগৃহে আটক পড়িয়াছে, অথচ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ এতই অস্বাভাবিক যে, গৃহ এখন পিঞ্জরের মতই অস্বস্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। নেহাৎ সংসারধর্ম্মের ফাঁকা কর্ত্তব্যগুলাই এখন তাহার নিকট জীবনযাপনের অবলম্বন। সন্তরণপটুতায় রাসমণি এককালে গ্রামের মধ্যে নাম করিয়াছিল। বহুদিন সাঁতার কাটে নাই; ভাবিল, সাঁতারের অছিলায় অন্তত কিছুক্ষণ যদি গৃহের বাহিরে থাকিতে পারে, হয়তো কিছু শান্তি পাইবে।

নলিনকে বাবুদের পুকুরে স্নানের আবেদন জানাইল। নলিন আপত্তির কোন কারণই খুঁজিয়া পাইল না, বরং আনন্দিত হইয়া রাসমণিকে উৎসাহিত করিয়া তুলিল।

রাসমণির একঘেয়ে জীবনযাত্রায় নূতন সুরের সাড়া পাওয়া গেল বাবুদের পুকুরঘাটে, তুচ্ছ কয়েকটি সূত্র অবলম্বন করিয়া।

বেলা পড়িয়া আসিলে রাসমণি একলাই এখানে স্নান করিতে আসিত। নানাভাবে সাঁতার কাটিয়া পুকুরটাকে তোলপাড় করিয়া ফেলিত। কখনও চিত, কখনও বুক, কখনও এড়োভাবে সাঁতার কাটিয়া অদ্ভুত কৌশলে এপার হইতে ওপারে চলিয়া যাইত এবং এতটুকু বিশ্রাম না করিয়া ফিরিয়া আসিত। কখনও পুকুরের মধ্যস্থলে হস্তপদ চালনা বন্ধ করিয়া কাষ্ঠখণ্ডের মত অচল অবস্থায় পড়িয়া থাকিত। সন্তরণ-পারদর্শিতায় রাসমণি নিজেই খুশি হইয়া উঠিত। বয়সের কথা ভুলিয়া যাইত, ভুলিয়া যাইত—সে একজনের পত্নী এবং স্থানটি শ্বশুরবাড়ির পার্শ্বে, এখানে ছেলেমানুষি করিলে লোকে নিন্দা করিবে।

রাসমণি জানিত না, তাহার সন্তরণপটুতার তারিফ করিবার জন্য আর একজন দর্শকও সেখানে উপস্থিত থাকিত, এবং অন্তরাল হইতে শুধু তাহার সাঁতারের তারিফ করিত না, অঙ্গসঞ্চালনে দেহের লীলায়িত রেখাগুলিও সমস্ত মন দিয়া উপভোগ করিত। দর্শক রসিক ও ঘোরতর বাস্তববাদী। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছু ভোগ করা যায়, তাহা সে প্রাণ ভরিয়া পাইতে ভালবাসিত। নীতিবদ্ধ সংস্কার কখনও এই ভোগ-লিপ্সায় বাধা সৃষ্টি করিতে পারে নাই। সত্ত্বগুণ আয়ত্ত করিবার নিমিত্ত মাটির রজ ও তমোগুণকে চাপিয়া মারে নাই। তাহার আত্মতুষ্টির মহামন্ত্র ও সাধনাই ছিল যাচিত বস্তুটি পাওয়া এবং ইচ্ছামত ভোগ করা। দর্শক আমাদের প্রিন্স মহেন্দ্র। জলকেলির প্রদর্শনী দেখিয়া মহেন্দ্র মুগ্ধ হইয়াছিল। তাহার পেশাই সুন্দরীকে দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া এবং সব বাধা অতিক্রম করিয়া তাহাকে পাওয়া। মহেন্দ্র রাসমণিকে পাইবার জন্য তাহার জাল পাতিয়া অপেক্ষা করিতেছিল।

কিছুদিন বাদে দর্শক অদৃশ্য স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিল। সর্ব্বশরীর সিক্ত করিয়া রাসমণি যখন সিঁড়ির চাতালে স্বচ্ছ বস্ত্র সংযত করিত, সেই সময় শুনিত আমগাছটার নিকট হইতে ছোট্ট একটি কাসি। শব্দ অনুসরণ করিলেই রাসমণি দেখিতে পাইত, মহেন্দ্র গাছের গোড়ায় ঠেসান দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

মুখে কূট হাসি—সে হাসির অর্থ বিশ্লেষণ করিবার চেষ্টা করিলে পাশবিক কিংবা প্রাণস্পর্শীও মনে হইতে পারে,—অর্থগ্রাহীর সাময়িক মনের অবস্থার উপরই তাহা নির্ভর করে।

হাসির কেন্দ্র ছাড়াইয়া চোখের দিকে তাকাইলে মনে হয়, মহেন্দ্রের দৃষ্টি একান্তভাবে নিবদ্ধ রাসমণির গঠনের উপর। চাহনির তীব্র লালসাপূর্ণ মারণোন্মুখ সঙ্কেত অস্বস্তিকর হইলেও ঠিক অবাঞ্ছনীয় বলা চলে না। কাসির শব্দ রাসমণির মনে যে প্রকারেরই প্রতিধ্বনি তুলুক না কেন, বাহ্যিক প্রকাশে কোনরূপ অসমর্থন ছিল না।

কাসির সঙ্কেত যখন একটি নির্দ্দিষ্ট দিকে ঝুঁকিতেছিল, সেই সময় রাসমণি সংস্কারের খোঁচা খাইয়া কিছুদিনের জন্য পুকুরঘাটে স্নান করা বন্ধ করিয়া দিল। এই ঘটনার পর রাসমণি নিজের শক্তিকে শ্রদ্ধা করিবার অবসর পাইয়াছিল। কিন্তু মনের গুপ্ত কোণ যে জালের প্যাঁচে জড়াইয়া গিয়াছিল, তাহা বেশিদিন রাসমণির নিকট অজ্ঞাত থাকিল না।

বিবাহের পর দীর্ঘ আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, কই, এই ধরনের চাঞ্চল্য কখনও তো সে অনুভব করে নাই! পুকুরঘাটে যাইবার জন্য সে অস্থির হইয়া উঠিতেছে কেন? পুরুষের মুখশ্রী কঠোর, তথাপি উহা পুরুষোচিত এবং সুন্দর। মহেন্দ্রের দীর্ঘ ও সুঠাম গঠন রাসমণির সত্যই ভাল লাগিয়াছিল। এই ভাল-লাগাকে অস্বীকার করিবার জন্য সে স্বামীগৃহে নিজেকে আবার বন্দিনী করিয়া ফেলিল, মনের চতুষ্পার্শে নীতির বেড়া দিয়া নিজেকে আগলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। যে আবেষ্টনীতে সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, তাহাকেই পুনরায় বরণীয় করিয়া লইতে চাহিল।

ক্রমশ

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

নো তে দিবসাঃ গতা

সে দিন বহিয়া গেল হে বন্ধু,
সে দিন মোদের গত,
সেই চঞ্চল মুখর নয়ন
আজিকে মৌন নত।
ভরা উৎসাহে উৎসুক বুক,
সব পথে পথে চেনা হাসিমুখ,
কোরকে কোরকে অরুণের আলো,
ফুলে ফুলে মধুব্রত।

২

পিয়াল রেণুতে গোটা বসন্ত,
মদিরা পিকের ডাকে,
আসি বর্ষার হর্ষ-জোয়ার
লাগে কদম্বশাখে।
কণ্টক হতে সাড়া দিত কেয়া,
দীর্ঘ 'ময়ূরপঙ্খীর' খেয়া,
জীবন-নদীর মরকত-তটে
আঁট দিত প্রতি বাঁকে।

৩

সব বিহগের কণ্ঠে কাকলী
রৌদ্র উঠান-ভরা,
নভ ঘন নীল, সমীরণে মধু
মধুর বসুন্ধরা।
আজ ঝিঙাফুল ফুটিয়াছে হায়,
ঢাকে অঙ্গন পাণ্ডু ছায়ায়,
বায়স তাদের সান্ধ্য-কুলায়
উড়িয়া যেতেছে ত্বরা।

৪

কোথা পুচ্ছের গৌরব তার
কলাপী ভুলেছে কেকা,
ঘন বর্ষার সমারোহ হেরে
পিঞ্জরে বসি একা।
যূথী-পরিমল মালতীর বাস,
আনে সে সুদূর দিনের আভাস,
কাঁদায় তাহারে রামধনুকের
সপ্ত রঙের রেখা।

৫

সেই ক্ষীর সর নবনীর দিন
আর ফিরিবার নয়,
তমালের ডালে তোলা হিন্দোলা
সেও সেই কথা কয়।
গোষ্ঠে যাবার বনপথ, মরি,
কাঁটা ও গুল্মে দিয়াছে আবরি
কালো কালিন্দী কানুর বাঁশীর
ভুলে গেছে পরিচয়।

৬

সে দিন বহিয়া গিয়াছে বন্ধু,
সে-দিন মোদের গত,
হের সুমুখের শ্যাম তালীবন
তেমনি সমুন্নত।
স্নিগ্ধ উজল প্রিয় দিনগুলি,
পারে নাই ধরা রাখিতে আগুলি,
পোষা শুক সারী অকূলেতে পাড়ি
দিল এবারের মত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

প্রসঙ্গ কথা

'ব্রাহ্ম' বনাম 'হিন্দু'

শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়াছেন বহুদিন; তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। ধর্ম্মের প্রখর পিপাসা যাঁহাদের আছে, যাঁহারা আত্মাকে পরমাত্মার সঙ্গে যুক্ত করিয়া আত্মসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে ব্যাকুল হন, তাঁহারা অনাত্মময় পৌত্তলিক সমাজ ত্যাগ করিয়া অতিশয় পবিত্র পর-ব্রহ্মের উপাসনা করিবার জন্যই সর্ব্বপ্রকার অপবিত্রতা পরিহার করেন। ব্রাহ্মগণ সর্ব্বত্র 'একে'র প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নপর হইয়া থাকেন। রামানন্দবাবুও খাঁটি ব্রাহ্ম, এজন্য 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' মন্ত্রে সকলই শোধন করিয়া লন। কিন্তু সম্প্রতি কিছুকাল যাবৎ রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞানগবেষণায় এই পরমপবিত্র ঐকতত্ত্ব একটু দ্বৈত-দোষাশ্রিত হইয়াছে; এতদিন তিনি ঐতিহাসিক গবেষণায় রামমোহনকেই বাঙালীর 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরিত্রাতারূপে ঘোষণা করিতেছিলেন, সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথও 'নিরাকার' হইয়া যাওয়ায়, রামমোহনের সহিত রবীন্দ্রনাথও যুক্ত হইয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে রামানন্দবাবুর এই দ্বৈত-বিলাস সুলক্ষণ নয়। সংসারে তাঁহার নিজের যে বহুত্ব ঘটিয়াছে, তাহাতে অবশ্য তিনি 'একোঽহংবহুস্যাম্'—এই শ্রুতিবাক্যের চাক্ষুষ প্রমাণ হইয়া আছেন;—এমন 'বহু'র মধ্যে 'একে'র আত্মবিস্তার সংসারে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। সে যেন সত্যই—'ন ত্বহং তেষু, তে ময়ি'। শ্রুতি যে কেন বলিয়াছেন—'পিতা নোঽসি', তাহার এমন 'শারীরক ভাষ্য' ক্বচিৎ মিলিবে।

* * *

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম। রামানন্দবাবু পৈতা ফেলিয়া এবং জাতিভেদ প্রভৃতি হিন্দুয়ানি ত্যাগ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছেন। হউন, তাহাতে হিন্দুর কোন দুঃখ নাই, কোন আপত্তি নাই, কোন হা-হুতাশ নাই। হিন্দুর গঙ্গা বহিয়া চলিয়াছে—কত জায়গায় চর পড়িতেছে, কত জায়গায় ভাঙন ধরিতেছে, তবুও "সেই চির কলতান উদার গঙ্গা

বহিছে আঁধারে আলোকে।" হিন্দুর কোন ভয় নাই, কিন্তু রামানন্দবাবুর ভয় আছে, পাছে ওই ক্ষুদে 'চর'খানি আবার কখন ভাঙিয়া ভাসিয়া যায়। তিনি সাভারকরের হিন্দু মহাসভায় যোগ দিয়াছিলেন—জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, ব্রাহ্ম সকলেই 'হিন্দু', এই আশ্বাসে। এখন সহসা সে বিশ্বাসে ঘুণ ধরিয়াছে। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে কেবল 'হিন্দু' ও 'মুসলমান', এই দুই ভাগের কথাই উল্লেখ হইয়া থাকে—যেন তাহাদের মধ্যে মিল হইলেই সব সমস্যার অন্ত হইবে! রামানন্দবাবু বলিতেছেন, কথাটা ভাল নয়! ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টান প্রভৃতি কি ভাসিয়া আসিয়াছে? "আইন-সভা আদিতে আসন, মন্ত্রিমণ্ডলে আসন এবং চাকরির বাঁটোয়ারা বা শিক্ষায়" তাহারা কি সম্প্রদায়ভেদে গণনীয় হইবে না? এখানে রামানন্দবাবু শুধু 'হিন্দুসভা'র 'হিন্দু'সংজ্ঞার বিরুদ্ধে নয়, খ্রীষ্টানদিগেরও পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন; অর্থাৎ, হিন্দুসভার সংজ্ঞা অনুসারে 'হিন্দু' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে তিনি আর রাজি নহেন; তিনি 'হিন্দু' নহেন—'ব্রাহ্ম', এবং অপর অ-হিন্দুদের সহিত এক স্বার্থ-সূত্রে বদ্ধ থাকিতে চান। এই পৃথক থাকার দাবি কেন করেন, তাহাও খোলাখুলি বলিয়াছেন, যথা—"কিন্তু সংজ্ঞা (হিন্দুসভার হিন্দুর) অনুসারে যাই হোক, কার্যতঃ এরা হিন্দু ব'লে স্বীকৃত হয় না ব'লে আমরা তাদের আলাদা উল্লেখ করছি।" ('প্রবাসী', শ্রাবণ, "বিবিধ প্রসঙ্গ" দ্রষ্টব্য)। রামানন্দবাবুর এই দাবির মধ্যে কোন হীন ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি নাই—অতিশয় মহদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়াই তিনি এই দাবির কথা তুলিয়াছেন। তিনি ভারতের রাষ্ট্রিক প্রভৃতি যাবতীয় কল্যাণকে পূর্ণতর করিবার জন্যই, খুব "বড় এবং সর্ব্বব্যাপক একতা"র জন্যই এই পার্থক্য বজায় রাখিতে চান; তাই ব্রাহ্ম রামানন্দবাবু 'হিন্দু' হইতে রাজি নহেন। দেশের কল্যাণ—মহাজাতির কল্যাণ যে তাহা না হইলে বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে! দেখ, যদি পৃথকভাবে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দিকে লক্ষ্য রাখা না হইত, তাহা হইলে ভারতের এই স্বাধীনতা-সংগ্রামও কি এতদূর অগ্রসর হইতে পারিত? যদি তোমরা কেবল হিন্দুর দিকে তাকাইয়া থাকিতে, তাহা হইলে ব্রাহ্ম আনন্দমোহন বসু এবং ব্রাহ্ম সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ অথবা পারসী দাদাভাই নৌরজী ও পারসী

ফিরোজশাহ মেহতা কি কংগ্রেসের সভাপতি হইতে পারিতেন? যদি না হইতেন, তবে কি সর্ব্বনাশ না হইত! তবেই দেখ, যদি এইরূপ কোনও যোগ্য ব্যক্তি ভারতের উপকার করিতে চায়, এবং তুমি যখন তাহাকে ব্রাহ্ম বা পারসী বলিয়া ডাকিলে না, সে-ও ব্রাহ্ম ও পারসী হিসাবেই সেই কাজ করিবে, অন্যথা যদি না করে, তখন ভারতের কত বড় ক্ষতি হইতে পারে! কারণ, সকল ব্যক্তিরই স্ব স্ব সম্প্রদায়-চেতনা থাকা উচিত; যে ব্রাহ্ম সে আগে ব্রাহ্ম, পরে ভারতীয়; এইরূপ সকলেই যদি না হইল, তবে কেবল হিন্দু বা ভারতীয় মহাজাতি হওয়ার অর্থ কি?—একতা সর্ব্বব্যাপক হইল কোন্ অর্থে?

* * * *

কিন্তু রামানন্দবাবু এই ঐক্যতানবাদন করিতে করিতে শেষে প্রায় বুঁদ হইয়া গিয়াছেন—ভয়ানক ব্রাহ্ম হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার ভাবটা এই। ব্রাহ্ম কিসে কম! ব্রাহ্মকে ব্রাহ্মহিসাবে পৃথক গৌরব তোমরা দিবে না? যদি না দাও, যদি ব্রাহ্মসমাজের পৃথক মহিমা স্বীকার না কর, তবে কি হইতে পারে ভাবিয়া দেখিও। বাংলা সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত কর; যদি কেবল হিন্দুই সে সাহিত্যের সেবা করিবার অধিকারী হইত, তবে খ্রীষ্টান মধুসূদন দত্তকে পাইতে? তাহাতেও না হয় তত বড় ক্ষতি হইত না, কিন্তু আরও কত বড় সর্ব্বনাশ হইত!—"রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত ব্রাহ্ম সাহিত্যিকদের সেবা থেকে (বাংলা সাহিত্য) বঞ্চিত হ'ত।" আমি বলিয়াছি, রামানন্দবাবু বুঁদ হইয়া গিয়াছেন; কিন্তু আসলে বোধ হয় তাঁহার জ্ঞান আরও 'টনটনে' হইয়া উঠিয়াছে, অজ্ঞানেও যেমন আবেশ হয়, পরম জ্ঞানেও তেমনই আবেশ হইয়া থাকে, কেন না—"Extremes meet" কারণ, কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই তৎক্ষণাৎ নিজেই বলিতেছেন, "কিন্তু সুখের বিষয় এ রকম নিয়ম কোনকালে ছিল না এবং এ রকম নিয়ম চালাবার ক্ষমতাও কারো ছিল না, থাকতে পারে না, ও নাই।—থাকিলে এবং থাকা সম্ভব হইলে, রামানন্দবাবু খুবই সুখী হইতেন; কিন্তু যখন তাহা নাই, তখন কি আর করিবেন? অগত্যা একটি অতিশয় অর্থহীন, বুদ্ধিহীন এবং সত্যহীন উক্তি করিয়াছেন, যথা—

"কেবল বা প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমানের কথা ভাবায় দেশ নানা দিকে অহিন্দু ও অমুসলমান যোগ্য লোকের সেবায় বঞ্চিত হচ্ছে।" এ কথার আর কোন টীকাভাষ্য করিবার প্রয়োজন নাই—ইহার অন্তরালে কোন্ মনোবৃত্তির ক্রিয়া রহিয়াছে, তাহা বুদ্ধিমান পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন; ইহাকে নিশ্চয় কেহ ভীমরতি বলিবেন না।

* * *

কিন্তু এ প্রসঙ্গের অবতারণা সে জন্য নয়—রামানন্দবাবুর ধর্ম্ম, কর্ম্ম এবং কথা সবই যে কিরূপ একনিষ্ঠ, তাহা 'প্রবাসী' ও 'Modern Review' মারফতে কাহারও জানিতে বাকি নাই। আমরা ভাবিতেছি ওই রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথের কথা। তাই প্রসঙ্গের প্রথমেই রামানন্দবাবুর 'অদ্বৈত'-নাশের আশঙ্কায় কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছিলাম। ব্যাপারটা কিন্তু দাঁড়াইতেছে অন্যরূপ। এতদিন রামমোহনকে প্রাণপণে জাপটাইয়া ধরিয়া ('রাজা'র প্রায় শ্বাসরোধ করিয়া) তিনি পর-ব্রহ্মের মান-ইজ্জত রক্ষা করিতেছিলেন; এক্ষণে রবীন্দ্রনাথেরও ব্রাহ্মত্বকে ধ্বজার মত তুলিয়া ধরিয়া এইরূপ আস্ফালন করা কি রবীন্দ্রনাথের আত্মার পক্ষে প্রীতিকর হইবে? আমরা ভুল করিয়াছিলাম,—পরব্রহ্ম, দুই ভাগ কেন তিন ভাগও হইতে পারেন—'পিতা', 'পুত্র' এবং 'পবিত্র ভূত'; ওই তিনের একটি (কোন্‌টি তাহা বলা দুরূহ) রামানন্দবাবুর মধ্যেই অবতীর্ণ হওয়া অসম্ভব নয়; ভক্ত সাধকের প্রয়োজনে পরব্রহ্মের এইরূপ 'ত্রিভঙ্গ' হওয়া বোধ হয় অন্যায় বা অসঙ্গত নয়। তাই, দুই কেন—আমরা তিন-কেও মানিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু 'তেত্রিশ কোটি'র উপাসক বলিয়া আমরা গণনায় যেমন দক্ষ, তেমনই গনিবার জন্য সাকার বস্তু চাই। যদি কেহ চোখ বুজিয়া বলে, ওই দেখ, কিন্তু খোলাচোখে তাহা দেখিতে না পাই, তাহা হইলে, আমাদের জবান তেমন দুরস্ত বা সভ্য হয় না বলিয়া, সে ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী বলিয়া থাকি। রামানন্দবাবু রামমোহনকে 'ব্রাহ্ম' বলেন কোন্ সংজ্ঞা অনুসারে? রামমোহন কোন্ অর্থে রামানন্দবাবুর সম্প্রদায় বা সমাজভুক্ত? রামমোহনের জীবদ্দশায় তাঁহাকে তো কেহ সমাজত্যাগী ধর্ম্মত্যাগী বলিয়া জানিত না, ধর্ম্মবিষয়ক মতামত বা কোন কোন কার্য্যের

জন্য তাঁহাকে যতই আক্রমণ করুক। রামমোহন কি পৈতা ত্যাগ করিয়াছিলেন? তিনি কি তাঁহার পরিবারে সকল হিন্দুসংস্কার উঠাইয়া দিয়াছিলেন? তিনি কি বিধবাবিবাহ চালাইবার বা জাতিভেদ তুলিয়া দিবার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন? নিজের পরিবারেও কি তিনি সেরূপ কোন ব্যবস্থা পাকা করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ পাচক ও গঙ্গাজল প্রভৃতির শুচিতা কি তিনি অমান্য করিয়াছিলেন? তিনি যে ধর্ম্মান্দোলন চালাইয়াছিলেন, তাহা হিন্দুসমাজের ভিতরে দাঁড়াইয়া, না বাহিরে দাঁড়াইয়া? এই প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটির উত্তর আমরা রামানন্দবাবুর নিকটে দাবি করি। তিনি বহুদিন ধরিয়া রামমোহন সম্বন্ধে বহু সত্য-মিথ্যার সমর্থন ও প্রচারে সহায়তা করিতেছেন, আমরা তাঁহার নিকটে এই কয়টি প্রশ্নের সোজা জবাব—'হাঁ' কিংবা 'না'—পাইতে চাই; যদি ইহার প্রত্যেকটি 'না' প্রমাণ করিতে অসমর্থ হন, তবে তিনি মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইবেন, দোষ আমাদের নয়।

* * *

এখন রবীন্দ্রনাথের কথা। রবীন্দ্রনাথ জন্মিয়াছিলেন ব্রাহ্ম হইয়াই, অর্থাৎ—যেমন সকলেই জন্মায়—একটা না একটা সমাজে; কিন্তু সকলের মতই তিনি কি সেই গণ্ডির বন্ধন গলায় পরিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন? তিনি কি রামানন্দবাবুর মত ব্রাহ্মই থাকিয়া গিয়াছিলেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার ঘরে জন্মিয়াছিলেন,—তিনি কি পাঁচন-বাড়ি হাতে করিয়াই কুরুক্ষেত্রে পার্থ-সারথির কাজ করিয়াছিলেন? তা ছাড়া, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ব্যক্তি-জীবনে না হয় ব্রাহ্মই ছিলেন; কিন্তু যে রবীন্দ্রনাথকে গান্ধীজি "গুরুদেব" বলিয়া ডাকিতেন, সে রবীন্দ্রনাথ কি রামমোহনশিষ্য রবীন্দ্রনাথ? গান্ধীজি তো রামমোহনকে ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-গুরুদের সমকক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন না—তাহার জন্য, একবার রামানন্দবাবু কি করিয়াছিলেন, তাহা তো আমরা আজও ভুলি নাই। রবীন্দ্রনাথ যদি হিন্দু না হইয়া কেবল ব্রাহ্মই হন, তাহা হইলে তিনি যে ভারতের কেহই হন না! কারণ একমাত্র হিন্দু হইলেই তাঁহার গণ্ডিদোষ কাটে, নতুবা তিনি যে বড় ছোট হইয়া যান। ধর্ম্মের সহস্র পন্থা, সহস্র আখড়া ওই এক হিন্দু নামে ডুবিয়া এক হইয়া আছে। স্বর্গীয়

ব্রাহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সেইজন্য নিজেকে 'হিন্দু' বলিয়া ঘোষণা করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই—'ঈশাপন্থী হিন্দু' বলিয়া নিজের পরিচয় দিতেন। এই হিন্দুত্ব-বোধই তো এ যুগের সকল শ্রেষ্ঠ ভারত-সন্তানের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের কারণ। ছি, ছি! রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হিন্দু না হইয়া হইবে ব্রাহ্ম! আমি সেই রবীন্দ্রনাথের কথা বলিতেছি, যে রবীন্দ্রনাথ ভারতের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে বরণীয় ও পূজ্য হইয়াছেন। রবীন্দ্রনাথকেও রামানন্দবাবুর মাপে মাপিতে হইবে? হা কপাল! রামানন্দবাবুর উক্তিটির ভাবার্থ এই যে, রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের মূলে ব্রাহ্মত্ব আছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য, কবিত্ব ও কাব্যপ্রেরণা সম্বন্ধে রামানন্দবাবুর মত রসিক সুজনের সঙ্গে তর্ক করিব না, লোকে হাসিবে; কেবল কয়েকটি কথা বলিব। রবীন্দ্রনাথ বাল্যে কোন্ প্রতিবেশের মধ্যে মানুষ হইয়াছিলেন? তাঁহার পরিবারের কি সকলেই ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন? রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্য-সংস্কার ঘটিয়াছিল যাঁহার সাহায্যে, সেই বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্য কি হিন্দু সাহিত্য না ব্রাহ্ম সাহিত্য ছিল? তিনি কেবল রামমোহনের বেদান্ত-গ্রন্থ পড়িয়া বাংলা শিখিয়াছিলেন? তাঁহার আদি সাহিত্যগুরু বিহারীলাল ও বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ জাতির লোক ছিলেন? তিনি যে 'গীতাঞ্জলি'র জন্য নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যে সুরটির সন্ধান পাইয়া ইউরোপ মুগ্ধ হইয়াছে, সে সুর প্রাচীন হিন্দু সাধনার বাউল-বৈষ্ণবের সুর কি না? যদি তাহা না হয়, তবে কোন্ পরব্রহ্ম সেই সুরের জন্মদাতা? রবীন্দ্রনাথের রচনাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অংশগুলি হিন্দু জীবনের ও হিন্দু ঐতিহ্যের উপকরণপুষ্ট কি না? কালিদাসের কবিতা ও বৈষ্ণব পদাবলী তাঁহার কবিপ্রতিভার উদ্বোধনে সাহায্য করিয়াছে কি না? হিন্দুর রামায়ণ ও মহাভারত—তাঁহার ঋষিত্ব না হউক, কবিত্বের একটা বড় আদর্শ ছিল কি না? না, এসব কিছুই সত্য নহে—রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম ছিলেন বলিয়াই বাংলা সাহিত্যের এমন সেবা করিতে পারিয়াছিলেন—বাঙালীও হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে তাঁহার কাব্য পড়িয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিতেছে এবং দলে দলে ব্রাহ্ম হইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। অতএব রামানন্দবাবুর জয়জয়কার!

* * * *

সাহিত্য-সাধনার প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রেরণা কিরূপ ব্রাহ্ম-ভাবাপন্ন ছিল, তাহার একটি অতিশয় সুলভ প্রমাণ—'কড়ি ও কোমলে'র "কাঙালিনী" কবিতাটি। মধ্যযুগে তিনি কিরূপ ব্রাহ্ম ছিলেন, তাহার প্রমাণ স্বদেশী-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের যোগদান। তাহার পূর্ব্বেই তিনি ব্রাহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রায় শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন; তিনি হিন্দু-জাতীয়তার চারণ-কবিরূপে অজস্র গান রচনা করিয়াছিলেন; তিনি তখন বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ও কীর্ত্তিপূত 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতই সেই জাতীয়তা-ধর্ম্মের প্রবন্ধকার; তখন তিনি 'নৌকাডুবি' উপন্যাস লিখিতেছেন; এবং কন্যার বাল্যবিবাহেরও পক্ষপাতী। একটি প্রমাণ স্বয়ং রামানন্দবাবু গত আশ্বিন সংখ্যা 'প্রবাসী'র ৬৫৬-৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করিয়াছেন। সেখানে ত্রিপুরার মহারাজকুমার শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা বাহাদুরকে লিখিত একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

> ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় সমাজের অভাব হইয়াছে—দুর্গতির আক্রান্ত হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়া পড়িয়াছি এই দুই সমাজকে উদ্ধার করিতে পারিলেই—ভারতবর্ষ পুনরায় লজ্জা লাভ করিতে পারিবে। আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। বৈশাখের (১৩০৯) বঙ্গদর্শনে আমার "নববর্ষ" প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিয়ো। তাহা ব্রাহ্মণের মনের কথা।

হিন্দু না হইলে যে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, আশা করি এই মোটা যুক্তিটা রামানন্দবাবুও বুঝিবেন।

এই রবীন্দ্রনাথেরই পদতলে সমগ্র হিন্দু বাঙালী সমাজ লুটাইয়া পড়িয়াছিল। শেষ-জীবনে ব্রাহ্ম রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মেরই মহিমা কীর্ত্তন করিবার কালে রামানন্দবাবুর মত ব্রাহ্মগণকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কিছু উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিলাম।

> রামমোহন রায় তাঁহার চারিদিকের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে যত উচ্চেই উঠিয়াছেন সমস্ত হিন্দুসমাজকে তিনি তত উচ্চেই তুলিয়াছেন। একথা কোনো মতেই বলিতে পারিব না যে তিনি হিন্দু নহেন,—কেন না, অন্যান্য অনেক হিন্দু তাঁহার চেয়ে অনেক নীচে ছিল এবং নীচে থাকিয়া তাঁহাকে গালি পাড়িয়াছে। কেন বলিতে পারিব না? কেন না, একথা সত্য নহে। কেন না তিনি যে নিশ্চিতই হিন্দু ছিলেন—অতএব

তাঁহার মহত্ব হইতে কখনই হিন্দুসমাজ বঞ্চিত হইতে পারিবে না—হিন্দুসমাজের বহুশত লক্ষ লোক যদি এক হইয়া স্বয়ং এজন্য বিধাতার কাছে দরখাস্ত করে তথাপি পারিবে না।

* * * *

আমি জানি, এ কথায় ব্রাহ্মসমাজের কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া বলিবেন,—না, আমরা ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজের সামগ্রী বলিতে পারিব না, তাহা বিশ্বের সামগ্রী। বিশ্বের সামগ্রী নয় তো কি? কিন্তু বিশ্বের সামগ্রী তো কাল্পনিক আকাশ-কুসুমের মতো শূন্যে ফুটিয়া থাকে না—তাহা ত দেশ কালকে আশ্রয় করে, তাহার ত বিশেষ নামরূপ আছে। * * পৃথিবীতে সকল জাতিরই ইতিহাস আপনার বিশেষত্বের ভিতর দিয়া বিশ্বের ইতিহাসকেই প্রকাশ করিতেছে। নহিলে তাহা নিছক পাগলামি হইয়া উঠিত,—নহিলে একজাতির সিদ্ধি আর একজাতির কোনোপ্রকার ব্যবহারেই লাগিতে পারিত না। * *

হিন্দুর ইতিহাসেও সে চেষ্টার বিরাম নাই। বিশ্বসত্যের প্রকাশ-শক্তি হিন্দুর ইতিহাসেও ব্যর্থ হয় নাই; সমস্ত বাধা বিরোধও এই শক্তিরই লীলা। সেই হিন্দু-ইতিহাসের অন্তরে যে বিশ্বচিত্ত আপন সৃজনকার্য্যে নিযুক্ত আছেন ব্রাহ্মসমাজ কি বর্ত্তমান-যুগে তাহারই সৃষ্টিবিকাশ নহে? ইহা কি রামমোহন রায় বা আর দুই একজন মানুষ আপন খেয়ালমত আপন ঘরে বসিয়া গড়িয়াছেন? * * মানুষের ইতিহাসকে আমি ত এমন খামখেয়ালীর সৃষ্টিরূপে সৃষ্টিছাড়া করিয়া দেখিতে পারি না। ব্রাহ্মসমাজকে তাই আমি হিন্দুসমাজের ইতিহাসেরই একটি স্বাভাবিক বিকাশ বলিয়া দেখি। আমরা কয়জনে দল বাঁধিয়া ঘিরিয়া লইয়া ইহাকে আমাদের বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের বিশেষ একটা গৌরবের জিনিষ বলিয়া চারিদিক হইতে তাহাকে অত্যন্ত স্বতন্ত্র করিয়া তুলিব এবং মুখে বলিব এইরূপেই আমরা তাহার প্রতি পরম ঔদার্য্য আরোপ করিতেছি একথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারিব না।—"আত্মপরিচয়"—'পরিচয়', পৃ. ৫৩-৫৬।

বজ্জাতক-কথা

তখন আমরা মালদহে ছিলাম। বয়স অল্প, সবে দীনু পণ্ডিতের পাঠশালা ছাড়িয়া জিলা-স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছি। একদিন দেখিলাম, শহরে হৈ-হৈ ব্যাপার, রৈ-রৈ কাণ্ড! স্থানীয় ডিষ্ট্রিক্ট-ইঞ্জিনীয়ারের হাতে হাতকড়ি পড়িয়াছে। ভদ্রলোক নাকি, ইঞ্জিনীয়ারিং তো দূরের কথা সামান্য ওভারসিয়ারিও পাস করেন নাই, অথচ দীর্ঘ উনিশ বৎসর কাল নির্ব্বিবাদে জাল নামে জাল উপাধির জোরে ডিষ্ট্রিক্ট-ইঞ্জিনীয়ারের গুরুদায়িত্ব পালন করিয়া আসিয়াছেন। এতদিনে ধরা পড়িয়া জেলে যাইতেছেন। আমাদের শিশুমনে আমরা তখন তাঁহার অপরাধের গুরুত্বটা বুঝিতে পারি নাই; বরঞ্চ ইহাই ভাবিয়াছিলাম, না হয়

ভদ্রলোক পাসই না করিয়াছেন, কিন্তু উনিশ বৎসর কাজটা কৃতিত্বের সহিত চালাইয়া আসাও তো কম কথা নয়। এরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়া গুরুজনদের ধমক খাইয়াছিলাম স্মরণ আছে।

পরে হেতমপুর কলেজের এক প্রিন্সিপ্যাল সম্পর্কেও অনুরূপ ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম; ভদ্রলোক শুধু নাম আর উপাধিটাই না হয় জাল করিয়াছিলেন, কিন্তু অধ্যক্ষতার কৃতিত্ব তো জাল করা যায় না! শুনিয়াছিলাম, জালিয়াৎ ব্যক্তি কৃতী অধ্যক্ষ ছিলেন। আসলে এগুলি আমাদের সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থারই দোষ। যাঁহারা সত্যকার গুণী ব্যক্তি, তাঁহারা অনেক সময় সামান্য কারণে উপাধির গৌরব হইতে বঞ্চিত হন, তাহাতেই এই সকল বিস্ময়কর গোলযোগ ঘটে।

কিন্তু একজিকিউটিব ব্যাপারের এই সকল যুক্তি সাহিত্য-ব্যাপারে খাটে না; কারণ, সাহিত্য অন্তরের সম্পদ। একজনের চিন্তাধারা অন্যে মারিয়া দিলে সাহিত্যক্ষেত্রে জুয়াচুরির চরম হয় এবং সে অপরাধের শাস্তি শূল। শূল দেওয়ার প্রথা বর্ত্তমান সভ্যজগতে উঠিয়া গিয়াছে। তবে ভগবান ন্যায়পরায়ণ; শূল-বেদনা বর্ত্তমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

বুদ্ধদেববাবুরও কৃতিত্ব আছে স্বীকার করিতে হইবে। তিনি দীর্ঘ পনরো বৎসর ধরিয়া যে সাহিত্যিক জালিয়াতি চালাইয়া সাহিত্যখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, ধরা-না-পড়ার মধ্যেই তাহার কৃতিত্ব! অথচ আসল ও নকল সকলেরই হাতের কাছেই ছিল। এবারে আর একটা দৃষ্টান্ত দিই। Aldous Huxley তাঁহার *Crome Yellow* পুস্তকখানা প্রথম ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রকাশ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেববাবুর 'রডোডেনড্রন-গুচ্ছ' ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ওই নবেম্বর মাসেই বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সাহায্য ব্যতিরেকে কোনও উপন্যাস, প্রবন্ধ বা গল্প-পুস্তকের নাম দেওয়ার মত মৌলিকত্বও যাঁহার নাই, তাঁহার সম্বন্ধে লোকের পূর্ব্ব হইতেই অবহিত হওয়া উচিত ছিল। যাহা হউক, এখন ব্যাপারটা দেখুন।

গল্প

Crome Yellow—Denis কবি, ভালমানুষ। নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে ট্রেনে করিয়া আসিল। পাঠরতা Priscilla-র সহিত তাহার দেখা

হইল। তারপর চায়ের আয়োজন। বাড়ির মেয়ে Anne-কে Denis ভালবাসে, কিন্তু Anne তাহাকে বন্ধুর পর্য্যায়ে ফেলিয়াছে এবং treats him as a child। Denis ক্ষুব্ধ। অন্য অতিথি Gombauld quite smart এবং efficient। Denis তাহাকে ঈর্ষা করে। Denis কবিতা লেখে এবং waste-paper-basket-এ ফেলিয়া দেয়। Ivor আসে। রাত্রে উদ্যান-ভ্রমণ, প্রেম। Denis-কে রচনা-কার্য্য সম্বন্ধে Mr. Barbecue-Smithএর উপদেশ। Denis-এর হতাশ প্রণয়। Mary approached him but nothing doing। Ivor kissed Mary and made love to her। Denis utterly dejected—sent home by Mary। Stroy ends।

'রডোডেনড্রন-গুচ্ছ'—সুমিত্রা ট্রেনে করিয়া নীলিমাদের বাড়ি আসিল। পাঠরতা শীলার সহিত তাহার দেখা হইল। চায়ের আয়োজন। পুরন্দর কবি, ভাল মানুষ। নীলিমাকে ভালবাসে। নীলিমা তাহাকে শিশুর মত মনে করে। বীরেন Gombauld ও Ivor-কে পাঞ্চ করিয়া প্রস্তুত—পুরন্দর তাহাকে ঈর্ষা করে। পুরন্দর কবিতা লিখিয়া বাতাসে উড়াইয়া ফেলিয়া দেয়। রাত্রে সকলের উদ্যান-ভ্রমণ। প্রেম। পুরন্দরকে রচনাকার্য্য সম্বন্ধে ধীরাজের উপদেশ। পুরন্দরের হতাশ প্রণয়। সুমিত্রার 'overtures' বিফল। বীরেন kissed সুমিত্রা এবং made love to her। পুরন্দর ব্যাকুল। শীলা তাহাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিল। গল্পের শেষ।

চরিত্র

Gombauld + Ivor

a good looking black-haired young corsair of thirty, with flashing teeth and lumjnous large dark eyes. Denis looked at him enviously—envied Gombauld his looks, his vitality, his easy confidence of manner..... Came leaping, laughed as he saw them. He was the hero of more amorous successes than he can remember...irresistible.

বীরেন

চেহারা ছিল সুন্দর—কালো চুল আর চোখ, সুসম্বদ্ধ দাঁতের সারি...কালো চোখের ঝলসানি।...পুরন্দর ওকে ঈর্ষা করে ওকে অনুকরণ করে। বীরেন লাফিয়ে গাড়ী থেকে নামে, যার সঙ্গে দেখা হয় আগে হাসে...এক একটি নূতন মেয়ে ওর গৌরবের মালায় এক একটি নূতন মুক্তো... মেয়ে ভুলোনো কৌশল তার আছে।

Crome Yellow

Suddenly she [Mary] was caught by an extended arm and brought to an abrupt halt "Well" said Ivor as he tightened his embrace—she made an effort to release herself···He laughed··· he kissed her.

* * *

He [Denis] felt tremendously large and protective....She leaned against him....He was the master... A wave of courage swelled through him...."I'll carry you," Denis offered...on the cinema it always looked an easy piece of heroism.... Good heavens, what a weight !... he had to deposit his burden suddenly.

Anne's faint amused, malicious smile...

* * *

Mary to Denis—"What have you been writing lately ?"

Mr. Scogan, "You have been writing prose ?"

Denis. "Yes."

Mr. S. "Not a novel ?"

Denis. "Yes."

'রডোডেনড্রন-গুচ্ছ'

হঠাৎ তার [সুমিত্রার] দেখা হয়ে গেল বীরেনের সঙ্গে। কোনো কথা না বলে বীরেন তার একটা হাত ধরে ফেললো, তারপর দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখ নিজের মুখের কাছে টেনে আনলো। ছাড়া পাবার চেষ্টা করতে করতে···। বীরেনের কালো চোখে হাসির আভাস জ্বলে উঠলো।

[তারপর চুম্বন]

* * *

আমি [পুরন্দর] ওকে [নীলিমাকে] বুঝিয়ে ছাড়ব···তার অব্যর্থ পৌরুষই সে এবারে প্রয়োগ করবে। দস্তুর মতো হীরো হবে সে;···সিনেমায় তো, এ-রকম জিনিষ প্রায়ই দেখা যায়···ঐরকম পাঁজা-কোলা করে' তুলে' নিতে পারলেই তো হয়—।···নীলিমা মোটেও ছোটখাটো নয়, মাথায় তো প্রায় তার সমান···নীলিমার কি খেয়াল হয়েছিলো, পুরন্দরের কাঁধের ওপর খানিকক্ষণ মাথা রেখেছিলো···

নীলিমার ঠোঁটের কোণে সেই ক্ষীণ হাসি।

* * *

'নতুন আর কোনো বই লিখছো নাকি ?'

পুরন্দর। 'হ্যাঁ···'

নটরাজ। 'উপন্যাস ?···'

পুরন্দর। 'বইটা—'

Mr. S. "I'll describe the plot for you. Little Percy, the hero, ...lives among the artists....Writes a novel of dazzling brilliance; he dabbles delicately in Amour... Denis blushed scarlet.

* * * *

Crome Yellow—Chapter VI

Mr. Barbecue-Smith—writer,... rather fat and complacent.... He could not control his interior satisfaction....Fat white hands and fingers. While talking he jabbed at Denis with his fingers...

"The secret of writing," he said is inspiration...That his my secret, ...I give it you freely...It came quite suddenly...I was hypnotized. I lost cosciousness....I pop off. Two or three hours later I wake up again, and find that inspiration has done its work. Thousands of words, comforting, uplifting words lie before me.

[Inspiration-এ রচিত কয়েকটি লেখা পড়িলেন এবং শেষে বলিলেন]

"That last one, is particularly subtle and beautiful, don't you think ?"

* * *

নটরাজ। 'তোমার একখানা উপন্যাস আমি পড়েছি...একদল প্রেমিক-প্রেমিকার কথা লিখেছো;...সবাই—সাহিত্যিক না হ'লেও সাহিত্য-ঘেঁষা,...পাতার পর পাতা এরা শুধু কথাই কইলো...আমার অবিশ্যি মনে হয়েছে—কেন এই তর্কাতর্কি? ভালোবাসার উপায় তো একই।

পুরন্দর অনুভব করলো, তার কান গরম হয়ে উঠছে।

* * *

'রডোডেন্ড্রন-গুচ্ছ' ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—

ধীরাজপ্রসন্ন মহলানবীশ—লেখক; স্থূলকায়—আত্মপ্রীত, মোটা লোমশ একটা আঙুল...কথা বলিতে বলিতে তিনি পুরন্দরের কাঁধে টোকা দিলেন..."শোনো, ইন্সপিরেশনই হচ্ছে সমস্ত কবিতার উৎস।... তোমাকে আমার সিক্রেট বলে দিচ্ছি। সিক্রেট আর কিছুই নয়—ইন্সপিরেশন। হঠাৎ এক-এক সময় ইন্সপিরেশন আসে... আমি যেন অসীম শূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, আমার চার দিককার বস্তু-জগৎ লোপ পেয়ে গেছে।...তখন কাগজ-কলম হাতে নিয়ে টেবিলে বসি—বসেই অজ্ঞান হয়ে যাই। তারপর কী হয় আমি আর জানি নে। মূর্চ্ছা যখন ভাঙে, দেখি, কাগজের ওপর সম্পূর্ণ একটি কবিতা লেখা হয়ে গেছে।"

[ধীরাজপ্রসন্ন "ইন্সপিরেশনে" রচিত একটা কবিতা আবৃত্তি করিয়া বলিলেন]

"আমার কলম থেকেও ও-রকম কোনো কবিতা এর আগে বেরোয় নি।... এরকম মিল আর কেউ দিয়েছে?"

* *

এই রকম মিল আর কেহই অবশ্য দিতে পারে নাই এবং এমন আদর্শবাদী "ইন্সপিরেশনে"র খেলাও ইতিপূর্ব্বে বাংলা দেশে আর দেখা যায় নাই। কিন্তু আসলে ইহা বদ্ বা অন্ধকারাচ্ছন্ন জাতক-যুগের কথা। এই জন্মের মূল বুদ্ধদেব তপস্যাশেষে শান্তিনিকেতন-বাস্তুতে আবির্ভূত হইবেন-হইবেন করিতেছেন। এতদিন পর্য্যন্ত যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে মারের খেলা আছে; মার Huxley, মার Arlen, মার Lawrence, মার Rossetti, মার Browning—কত মারের নাম করিব? কেহ মনে না করেন, মারের নাম করিয়া আমরা মারামারিতে প্ররোচিত করিতেছি। সেরূপ প্রবৃত্তি আমাদের নাই। এযুগে ইংরেজকে ভাঙিয়া ও ভাঙাইয়া যে কেহই কিছু করিতে পারিয়াছেন ও পারিতেছেন, তিনিই যথার্থ স্বদেশপ্রেমিক, সুতরাং আমাদের নমস্য। বুদ্ধদেববাবুকেও আমরা নমস্কার জানাইতেছি।

পুঃ। আমাদের গতবারের বুদ্ধপ্রশস্তি পাঠে কাচিৎ মহিলা সাহিত্যিক বসু মহাশয়ের বিদেশী নামের বাংলা রূপান্তর বিষয়ে কিঞ্চিৎ দোষ ধরিয়াছেন, আমরা তাঁহার প্রেরিত সংশোধনীটি নিম্নে যথাযথ মুদ্রিত করিলাম।—

বুদ্ধদেব বসুকৃত উচ্চারণ	ঠিক উচ্চারণ
মরিস্ ডেকেব্রা—	মোরিস্ ডেকোব্রা—(Maurice Dekobra)
বদ্‌লেয়ার—	বোদেলেয়ার—(Baudelaire)
টিশিয়ান—	টিশ্যেন—(Titian)
মিকায়েলেঞ্জেলো	মাইকেলেঞ্জিলো—(Michelangelo)
ফ্রী লিপ্‌পো লিপ্পি—*	ফ্রা ফিলিপ্পো লিপ্পি (আসল নাম) অথবা ফ্রা লিপ্পো লিপ্পি (Browning-এর অনুসরণে—)
মোনা লিসা—	মোনা লিজা—(Mona Lisa)
দা ভিঞ্চি—	দা ভেঞ্চি—(da Venci)

* Browning called him 'Fra Lippo Lippi' in one of his poems, 'Lippo' being the popular contraction of 'Fillippo.' But Huxley calls 'Fillippo', which is right of course, Browning's poem being a satire.
—লেখিকা।

বুদ্ধদেব বসুকৃত উচ্চারণ	ঠিক উচ্চারণ
কনষ্টেবল—	কান্‌ষ্টেবল্—(Constable)
রাফায়েল—	রাফাইল—(Raphael)
শারলট্ ব্রণ্টি—	শারলৎ ব্রণ্টে (Charlotte Bronte)

বুদ্ধদেববাবু কোনো স্থানে পাশাপাশি চারজন চিত্রকরের নাম তালিকার মত ব্যবহার করেছেন। দুঃখের বিষয় চারটিই ভুল উচ্চারণে লেখা হয়েছে। যথা—

করেজ্জো—	করেড্‌জো—(Correggio)
রুবেন্স—	রুবীন্স্—(Rubens)
রেম্‌ব্রাণ্ড—	রেম্‌ব্রাণ্ট (Rembrandt)
ভেলাক্—	ভেলাথ্‌কেথ (Velazquez)*

গল্পঘটিত জীবনী

ভারতীয় সভ্যতা যে অতীব উচ্চাঙ্গের, তিনটি বস্তুর দ্বারা আধুনিক সভ্যজগতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে—এক, কড়া পাকের সন্দেশ; দুই, স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ; এবং তিন, গল্পঘটিত ইতিহাস অথবা জীবনী। অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন সভ্যতাগুলি জ্ঞানে-বিজ্ঞানে যতই উন্নতি করুক, আজিও সভ্যতার এই তিনটি গৌরীশঙ্কর-চূড়ায় আরোহণ করিতে পারে নাই। হয়, ভারতবর্ষ হইতে এগুলি ইউরোপ-আমেরিকায় চালান হইতেছে, অথবা ভারতবর্ষের অনুকরণে ইউরোপ বা আমেরিকায় প্রস্তুত হইতেছে। অনেকে আজিও অবগত নহেন যে, মানিকতলার কড়া পাকের সন্দেশ বিলাতে অবিকৃত অবস্থায় চালান দিবার জন্যই আধুনিক রিফ্রিজারেটার-যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশবাসীরা দুগ্ধকে ভাঙাইয়া বহু চিত্তচমৎকারী পদার্থ উৎপাদন করিলেও দুধ-সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় যে ছানা, আজিও তাহার বিশদ ও সঙ্গত ব্যবহার করিতে শেখে নাই; ফলে কেকাদি বহুবিধ পেস্ট্রি সত্ত্বেও পাশ্চাত্য

* এই সবগুলি নামই Lawrence অথবা Huxley-র বইয়ে উল্লেখ করা আছে। বুদ্ধদেববাবুর নিজের হয়তো কখনো বইয়ে লেখা ভিন্ন এদের উল্লেখ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে নি। তাই উচ্চারণ এত ভুল। বাঙালীর পক্ষে বিদেশী উচ্চারণ সঠিক না জানা কিছুমাত্র লজ্জার নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি ক্রমাগত বাঙালীদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করেন এবং 'সিয়ারিয়াস' ও 'ট্রেইন্' ইত্যাদি লেখেন, তাঁর পক্ষে এটি গর্হিত অপরাধ।—লেখিকা।

রসনা তেমন তৃপ্তিলাভ করিতেছে না এবং তত্রত্য দুর্ভাগ্য অধিবাসীদের সারা দুনিয়ায় দাপাদাপি করিয়া ফিরিতে হইতেছে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই যে কেন শ্বেতাঙ্গদের প্রিয়, প্রশ্নিত হইলে সঠিক জবাব তাঁহারাও হয়তো দিতে পারিবেন না; কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশ এবং বাংলা দেশের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে কলিকাতা এবং কলিকাতার মধ্যে হেদুয়ার ধারটাই (ডাকের আমল হইতে) যে তাহাদের কেন সমধিক পছন্দ, ইহার সম্যক বিচার করিলে আমরা ওই কড়া পাকের সন্দেশে গিয়া উপস্থিত হইব। দুই নম্বর, স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজের কথা আর কি বলিব? এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ভারতবর্ষ হইতে জার্মানির মার্ক কোম্পানি উহা প্রস্তুত করিতে শিখিয়া গিয়াছিল বলিয়াই বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে জার্মানির বুক আজও দমিয়া যায় নাই। অনেকই হয়তো জানেন না, স্বয়ং হিট্‌লার হিঞ্চেশাক অনুপানে প্রত্যহ দুআনি পরিমাণ মকরধ্বজ সেবন করিয়া এই অবস্থাতেও মাথা ঠিক রাখিতেছেন। যাক, আমাদের আজিকার প্রসঙ্গ ভারতীয় সভ্যতার তৃতীয় তুঙ্গ-গৌরবটিকে লইয়া—গল্পঘটিত ইতিহাস লইয়া। আর দুইটির মত এটিও একান্ত ভারতীয় এবং অতি প্রাচীনকাল হইতেই আরব-পারস্যের পথে এই মহামূল্য বস্তুটি পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। 'পুরাণ-প্রবেশ'কার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র-শেখর বসু মহাশয় সাক্ষ্য দিবেন ভারতবর্ষীয় পুরাণ-উপপুরাণগুলি কি জাতীয় খাঁটি ইতিহাস। আজ প্রাচীনকালের মহিমা লইয়া উল্লাস প্রকাশ করিবার আমাদের সময় নাই, তবে এ কথা আমরা সকলেই জানি ভারতবর্ষের যে ইতিহাস এখন পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পুরাপুরিই গল্পঘটিত। মকরধ্বজে যেমন স্বর্ণ নিজে সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকিয়া ক্যাটালিটিক এজেন্টের কাজ করে, এই সকল ইতিহাসেও তেমনই গল্পগুলি নিছক গল্প থাকিয়াও ক্যাটালিটিক এজেন্টের কাজ করে, দানাদার রসসিন্দূরের মত ইতিহাস স্বতই প্রকাশ পায়। এ এক বিচিত্র ভারতীয় কাণ্ড। তবে ইতিহাসের কথা এখন থাক।

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদ হইতে বাংলা দেশে গল্পঘটিত জীবনী একটা বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিতে থাকে। নানা অলৌকিক ও লৌকিক

গল্পরূপ ক্যাটালিটিক এজেন্ট যোগে এক-একজন মহাপুরুষের জীবনী যা খাড়া হইয়া উঠিতে থাকে, প্লুটার্ক ও হিরোডোটাস তাহা দেখিলে বিস্ময়াভিভূত হইয়া পড়িতেন, এবং জীবনী ও ইতিহাস রচনার পক্ষে historical precision বস্তুটি যে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের রচিত জীবনী ও ইতিহাসগুলি পুনর্লিখনে ব্যস্ত হইতেন। একদিনে মধ্যাহ্ন-আহারের পূর্ব্বে একজন বালকের সম্পূর্ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠ, পিতার ধর্ম্মমতে লজ্জিত হইয়া তেরো বৎসরের বালকের পদব্রজে তিব্বত যাত্রা, মাতৃ-ভক্তিপরায়ণ সন্তানের বর্ষায় দুকূল প্লাবিত দামোদর সন্তরণ, গঙ্গা পার হইতে গিয়া মকরবাহিনী গঙ্গাকে দর্শন ইত্যাদি গল্পব্যঞ্জন যোগে এক-একজন মহাপুরুষ কেমন করিয়া সাধারণের সহজপাচ্য হইয়া উঠিলেন, ইহার কায়দা ও কানুন মাত্র আমরাই জানি। এই গল্পঘটিত জীবনীর গৌরীশঙ্কর-চূড়া ছিল এতদিন ভাইপো শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত খুড়ো বঙ্কিমের জীবনী—অবশ্য হাস্তেম তাই, গিরিশচন্দ্র, কথামৃত প্রভৃতি ধর্ম্মজীবনগুলি বাদ দিতেছি। কিন্তু সম্প্রতি শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম খণ্ড' প্রকাশিত হওয়াতে শচীশচন্দ্রের গৌরীশঙ্কর-চূড়া আড়ালে পড়িয়াছে, হেমেন্দ্রনাথের এভারেস্ট (জোড়া) শৃঙ্গই এখন জলজল করিতেছে—গল্পঘটিত জীবনীর এটি যেন মধ্যাহ্ন-সূর্য্য !

বঙ্কিম-জীবনীর সবে আদি পর্ব্ব শুরু হইয়াছে, কিন্তু হইলে কি হয়, এই আদি পর্ব্বেই লেখকের অনাদি মহিমা প্রকাশ পাইয়াছে ; একমাত্র "উদ্দীপক" শ্রীযুক্ত শতঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের মহিমার নিকটই যদি বা তাহা হার মানে ! ক্যাটালিটিক এজেন্টের সহিত এই উদ্দীপন-শক্তি যুক্ত হইয়া যে কি কাণ্ড ঘটাইয়াছে, বিস্ফোরণ না হইলে কেহ তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন না। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি বলিয়াই মজিয়াছি।

কিন্তু আমাদের একটু আপত্তির কারণ ঘটিয়াছে। মাতাল যখন মাতলামি করিতে থাকে, তখন গায়ে বা গুষ্টিতে হাত না পড়া পর্য্যন্ত বেশ লাগে, কিন্তু প্রলাপের মধ্যে হঠাৎ সে যদি পাতঞ্জলীয় যোগদর্শন আওড়াইতে থাকে, তখন মাথায় প্রবল একটা ঝাঁকানি লাগে বইকি !

ঠাকুরমার ঝুলির গল্প শুনিতে শুনিতে হঠাৎ যদি মাঝখানে শুনি—"তখন ১৮৫৬ সাল, ভারতবর্ষে সিপাহী বিদ্রোহের রক্তগঙ্গা বহিতে আরম্ভ হইয়াছে", তখন প্রথমটা একটু থতমত খাইলেও সামলাইয়া লইয়া বলিতে হয়, বাপু হে, বেশ তো গল্প বলিতেছিলে, আবার সাল কেন ? আর সালই যদি বল, ওটা ১৮৫৭ সাল, ৫৬ নয়। হেমেন্দ্রবাবুর গল্প-ঘটিত জীবনীতেও ওইরূপ আঘাত মাঝে মাঝে খাইতে হইয়াছে এবং বলিতে ইচ্ছা হইয়াছে, বেশ তো হইতেছিল স্যার *, আবার ইতিহাস কেন ? তাহা যখন করিবার উপায় নাই, তথ্যগুলি তিনি যাহাতে দ্বিতীয় সংস্করণে সংশোধন করিয়া লইতে পারেন, সেইজন্য অনেক ঐতিহাসিক অসঙ্গতির মধ্যে সামান্য দুই-চারিটি প্রদর্শন করিতেছি। তবে এ কথাও তাঁহাকে সুস্থ শরীরে বহাল তবিয়তে জানাইয়া দিতেছি যে, এই গল্পঘটিত অসঙ্গতিগুলি দোষ নয়, গুণ ; এইরূপ অসঙ্গতির সংখ্যা যত বেশি থাকে, জীবনী ততই সরস ও সুখপাঠ্য হয়। তাঁহারটিও হইয়াছে। তিনি যে "ভূমিকা"য় লিখিয়াছেন—

> আজ যে এতদিন পরে এই ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীতে সেই বিরাট পুরুষের জীবনী বাহির হইল, তাহাও সেই মহান্ "অদৃশ্য শক্তির" সহায়তাই হইয়াছে। ভগবান কাহাকে দিয়া কি কাজ সম্পন্ন করান একমাত্র তিনিই জানেন, তাঁহারই কৃপায় পঙ্গুও পর্ব্বত লঙ্ঘন করে। ছিলাম উকীল, হইলাম চাকুরীজীবী।...কিরূপে জীবনচরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম, সে কাহিনীও বিস্ময়কর।

যাঁহারা তাঁহার জীবনী পড়িবেন, তাঁহাদের কিছুই বিস্ময়কর বোধ হইবে না ; ভগবানের যে রসবোধ আছে, ইহাকে তাঁহারা তাঁহারই একটি সদ্দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিবেচনা করিবেন। এরূপ জীবনীলেখক শুধু ভগবানের দয়াতেই হওয়া যায়, অন্য কোনও কোয়ালিফিকেশন প্রয়োজন হয় না। যাহা হউক—

পৃ. ১৫৭। উনিশ বৎসর বয়সে গুপ্তকবি সাপ্তাহিক 'প্রভাকর' পত্রিকা বাহির করেন (১৮৩০)।

---

* স্যার সুবিধা পাইলেই একটা ডি-লিট ডিগ্রীও নাকি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে সেটা বড়শে-বেহালা ইউনিভার্সিটির না গোবরডাঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়ের, পাশে ব্র্যাকেটে তাহার উল্লেখ থাকে না।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আর একটু সদয় হইলে এই "পঙ্গু" এবং "উকীল" লেখক জানিতে পারিতেন যে, 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি তারিখে প্রথম প্রকাশিত হয়।

পৃ. ১৫৭। ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালে 'পাষণ্ডপীড়ন' নামক আর একখানি পত্রের সৃষ্টি করেন। ইহা ব্রাহ্মরা যে হিন্দুদের উপর তীব্র কটাক্ষপাত করিতেন তাহার প্রতিবাদ স্বরূপ প্রথমে বাহির হয়।

দেখিতেছি, ডি-লিট ডক্টর সাহেব কাশীনাথের 'পাষণ্ডপীড়ন'-পুস্তকের সহিত 'পাষণ্ডপীড়ন' পত্রিকাটিকে জড়াইয়া ফেলিয়াছেন। কাশীনাথের গ্রন্থ রামমোহন রায়ের গ্রন্থের প্রতিবাদ বটে, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের পত্রিকা কদাপি ব্রাহ্মদের প্রতিবাদস্বরূপ প্রকাশিত হয় নাই।

পৃ. ১৭৫। প্রাপ্ত বয়সে রাজার উপরে রাজা, বিরহিণীর দশদশা ও আরও কয়েকটি কবিতা ছাড়া অতঃপরে [১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে] বঙ্কিম আর কবিতা লিখিয়াছিলেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি।

"রাজার উপর রাজা" 'প্রচারে' এবং "বিরহিণীর দশদশা" বঙ্কিমের মৃত্যুর পর 'পঞ্চপুষ্পে' প্রকাশিত হয়, কিন্তু ১২৭৯ হইতে ১২৮৫ সালের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' ও 'ভ্রমরে' যে সকল কবিতা লিখিয়াছিলেন, জীবনচরিত-লেখক মহাশয় সেগুলি এই হিসাব হইতে বাদ দিলেন কেন?

পৃ. ১৭৭। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে হেলহেড সাহেব N. B. Halhed নামক জনৈক সিভিলিয়ান বাঙ্গলা ভাষায় একখানি ব্যাকরণ রচনা করেন। চার্লস উইলকিন্স নামক জনৈক ইংরাজ কাঠে একপ্রস্থ বাঙ্গলা অক্ষর ক্ষোদিত করেন। ইহাতেই তাঁহার বন্ধু হেলহেডের ব্যাকরণ মুদিত হয়।

"মুদিত হয়"ই ঠিক, লজ্জায় মুদিত হয়! পোড়া কপাল আর কি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই গবেষকপ্রবর আজ পর্য্যন্ত হ্যালহেডের ব্যাকরণটি যে ইংরেজীতে লিখিত, সে খবরও রাখেন না! এদিকে তো গিরি লঙ্ঘন করিবার বাসনা আছে! অথচ এই সহজলভ্য বইটি চোখে দেখিবার কষ্টও স্বীকার করেন নাই! ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরিতে মাসের পর মাস কি ছাই কাজ করিয়াছেন তবে! সেখানে এ বই আছে, এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে আছে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-লাইব্রেরিতে আছে এবং কলিকাতার অন্যত্র বহু স্থানে আছে। অন্য সব বিষয়ে

দাশগুপ্ত মহাশয় যেরূপ পরস্মৈপদী এক্ষেত্রেও সেরূপ না হইলে দেখিতে পাইতেন, ইহা ইংরেজীতে লেখা বাংলা ব্যাকরণ এবং ইহাতে ব্যবহৃত বাংলা হরপগুলি যে ছেনি দ্বারা ধাতু কাটিয়া প্রস্তুত, তাহাও এই বইয়েরই ভূমিকায় লেখা আছে। বাংলা বই ছাপায় কাঠের কারবার মোটেই কখনও হয় নাই।

পৃ. ১৭৮। ১৮০১ সালে ফর্স্টার (H. P. Forster) সাহেব সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলা ভাষায় অভিধান প্রস্তুত করেন।

ফরস্টারের বাংলা-ইংরেজী অভিধান ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইহা সর্ব্বপ্রথম অভিধান নয়।

পৃ. ১৭৮। শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস যোগ্যতার সহিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, বাঙ্গলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাঙ্গলা অভিধান ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

সজনীকান্ত দাস কখনও পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুজন এরূপ স্বীকার করিতেছেন না। তিনি 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'য় বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান বিষয়ে একটি প্রবন্ধে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এ. আপজন কর্ত্তৃক ক্যালকাটা ক্রনিক্‌ল প্রেস হইতে প্রকাশিত অভিধানকেই ওই সম্মান দেন। ডি-লিট ডক্টর মহোদয়ের যাবতীয় গবেষণা যদি এইজাতীয় হয়, তাহা হইলে তিনি জীবনে ওকালতি না করিয়া ভালই করিয়াছেন। গবেষণা এবং ইন্‌সিওরেন্স জগৎই এতখানি বরদাস্ত করিতে পারে, আদালত পারে না। তা ছাড়া একই পৃষ্ঠার উপরে নীচে দুইখানি স্বতন্ত্র বইকে সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষার অভিধানরূপে বর্ণনা করিতে হইলে এককালে কতখানি আবগারী দ্রব্য উদরস্থ করিতে হয়, হেমেন্দ্রবাবু সে বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিলে ভাল হয়।

আমাদের স্থান অকুলান, কম্বলের লোম কত বাছিব? ১৭৮ হইতে

১৮৫ মাত্র এই আট পৃষ্ঠার মধ্যে শতাধিক ইতিহাসের ভুল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদিগকে "জজ পণ্ডিত" বলিত না; "রাজা কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্" নয়, 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্'; ইহা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ও ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত হয় নাই, ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দেই রচিত ও শ্রীরামপুরে মুদ্রিত হইয়াছিল; 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র তারিখ ১৮১৩ নয়, ১৮৩৩; "রামমোহন রায়ের যুগ (?) ১৭৭৫-১৮৩২" নয়, ১৭৭৪ [২ ?]-১৮৩৩; 'সস্‌পেন [Saucepan ?] ম্যাগাজিন' নয়, 'গস্‌পেল ম্যাগাজিন'; "ব্রাহ্মনিক ম্যাগাজিন" নয়, 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন'; 'বেতালপঞ্চবিংশতি'র প্রকাশকাল ১৮৪৬ নয়, ১৮৪৭; অক্ষয় দত্তের বইয়ের নাম "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ নির্ণয়" নয়, 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার'; ইহার দুই ভাগ ১৮৫১-২ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয়, ১৮৫৩ অব্দে নয়; 'বাসুদেব চরিত' ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাহির হয় নাই, কখনই বাহির হয় নাই, ইহাই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্ব্বপ্রথম রচনা, পাণ্ডুলিপি আকারেই ছিল, ইহার অংশবিশেষ পরে তাঁহার জীবনীতে উদ্ধৃত হইয়াছিল; রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ প্রকাশিকা" নয়, 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ'; 'মাসিক পত্রিকা' ১৮৫৭।৫৮ সালে প্রকাশিত হয় নাই, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়; গুপ্তকবি ১৮৫৮ সালে পরলোকগমন করেন নাই, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়;—"গত চারি বৎসরে আমাকে প্রায় ১২।১৪ বৎসরের পরিশ্রম করিতে হইয়াছে"র ইহাই যদি নমুনা হয়, তাহা হইলে দাশগুপ্ত মহাশয় সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত না করিয়া গায়ে ফুঁ দিয়া এই বইখানি রচনা করিলে বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পঘটিত জীবনী কত অধিক সুখপাঠ্য হইত! আমরা হেমেন্দ্রবাবুদের কাছে সুখপাঠ্য জীবনীই চাই, ইতিহাস চাই না। আশা করি, পরবর্ত্তী খণ্ডগুলি রচনা করিবার সময় তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের এই কথাগুলি স্মরণ রাখিবেন।

অভয়ঙ্কর

বাঁশী ফেলে দাও, বিষাণ বাজাও বীর,
গগনে গগনে উতল হ'ল সমীর
সিন্ধু উঠেছে দুলিয়া
ঝড়ের দাপটে তরঙ্গ উঠে ফুলিয়া
নাচে প্রলয়ঙ্কর
মেঘের মাথায় রক্ত-কেতন তুলিয়া
আসে অভয়ঙ্কর।

বাঁশী ফেলে দাও, বিষাণ বাজাও বীর,
বক্ষে বক্ষে অধীর হ'ল রুধির
দেউল গিয়াছে ভাঙিয়া
প'ড়ে আছে শুধু ভক্ত-শোণিতে রাঙিয়া
ধূলা-শিলা-কঙ্কর
ভ্রূকুটি-ভয়াল নয়নবহ্নি হানিয়া
এল অভয়ঙ্কর।

বাঁশী ফেলে দাও, বিষাণ বাজাও বীর,
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু ডাকে গভীর,
মরণানন্দে মাতিয়া
গণনাথ নাচে তা-থৈ তাথিয়া তাথিয়া,

মত্ত দিগম্বর
শঙ্কাহরণ চরণ ধূলায় পাতিয়া
এল অভয়ঙ্কর।

বাঁশী ফেলে দাও, বিষাণ বাজাও বীর,
খসিয়া পড়ুক ভয়-বিশীর্ণ চীর
ভয় নাই—বল হাঁকিয়া,
এসেছে করাল, সবারে ফিরিছে ডাকিয়া
ভৈরব শঙ্কর
জীবন-দেবতা শ্মশান-বিভূতি মাখিয়া,
জয় অভয়ঙ্কর।

"চন্দ্রহাস"

আমি

ষ্টেশন হয়ে প'ড়ে আছি, তোমরা হচ্ছ প্যাসেঞ্জার,
কেউ বা দিচ্ছ লম্বা পাড়ি মেলে কিংবা এক্সপ্রেসে;
লোকাল ট্রেনে কেউ কেউ বা আসছ যাচ্ছ বারংবার—
দেখা দিয়ে কচিৎ কেউ বা যাও চ'লে কোন্ দূর দেশে।
মুখ হয়তো চিনি নেকো পায়ের শব্দ পাই সবার,
চলন দেখে বলতে পারি আসছ কে কোন্ উদ্দেশে,
জুতোয় কারো বাঁধা যে নাল, কারো জুতোয় ক্ষয় রবার—
ভালবেসে কেউ বা আস, কেউ বা আস ভয় বেসে।
কত দিকের কত যাত্রী আসে এবং যায় চ'লে,
কত গোপন কানাকানি এই আমাকেই শুনতে হয়,
বন্ধু ভাবে কোন্ মুসাফির মনই আমার দেয় ব'লে—
জানি তবু প'ড়েই থাকি করি নে আর শত্রুভয়।
আমি ষ্টেশন, নাই অধিকার দলাদলি কোন্দলে,
সবাই এস, সবাই ব'সো, যেও যখন হয় সময়।

সংবাদ-সাহিত্য

যাঁহাদের মৃত্যুতে বিভিন্ন শ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত বিবেচনা করে অথবা আত্মীয়-বিয়োগের দুঃখ অনুভব করে, তাঁহারাই মনুষ্য-সমাজে অসাধারণ। এই অসাধারণত্বে রবীন্দ্রনাথ আধুনিককালের বাংলা দেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে আপামরসাধারণ সমগ্র বাঙালী-জাতি বেদনাবোধ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সহিত অসাধারণত্বের ব্যবধান অধিক হইলেও হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ঠিক পরবর্ত্তী স্থান দুইটি অধিকার করিয়া ছিলেন। এক হিসাবে হীরেন্দ্রনাথের স্থান প্রফুল্লচন্দ্রেরও উর্দ্ধে ছিল। তিনি স্বদেশপরায়ণ কর্ম্মবহুল জীবন যাপন করিয়াও রসিক-সমাজের একজন ছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মজীবন, কর্ম্মজীবন ও সাহিত্যজীবন তাঁহাকে বহু বিভিন্ন সমাজের প্রিয় ও আত্মীয় করিয়াছিল এবং কোনও ক্ষেত্রেই তিনি নিম্নশ্রেণীর সাধক ছিলেন না, এমন কি, বাংলা দেশের রাষ্ট্রজীবনেও একদিন তিনি প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। এই যুগের স্মৃতি জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ ও যাদবপুর-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগের মধ্য দিয়া জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অব্যাহত ছিল। বাংলা দেশে থিওজফিক্যাল সোসাইটির তিনি প্রধান ছিলেন এবং এই ধর্ম্মজীবনের প্রভাব তাঁহার সাহিত্যজীবনকেও প্রভাবান্বিত করিয়াছিল; তাঁহার 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রেমধর্ম্ম' পর্য্যন্ত বহু গ্রন্থই ইহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। কর্ম্মজীবনে তিনি কলিকাতার ব্যবহারজীবী ও অ্যাটর্নী সম্প্রদায়ের দীর্ঘকাল নেতৃত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে এই সকল সম্প্রদায়ের অসংখ্য লোক নেতা-বিয়োগের দুঃখ বোধ করিয়াছেন।

আমাদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক তাঁহার সাহিত্যজীবন লইয়া; সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহার তুল্য পণ্ডিত ব্যক্তি ইদানীং আর কেহ ছিলেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে তিনি পারঙ্গম ছিলেন; ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে বেদ ও উপনিষদাদিতে

এতখানি জ্ঞান কদাচিৎ পরিলক্ষিত হয়। অধিকন্তু তিনি রসিক ছিলেন। শেষজীবনে বঙ্কিম-সাহিত্য লইয়া তিনি যে পরিমাণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যৌবনে নবীনচন্দ্রের কাব্যগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া তিনি নবীনচন্দ্রের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার মেঘদূতের কাব্যানুবাদ তাঁহার কবি-মনের পরিচয় দেয়।

তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় কীর্ত্তি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ; এই প্রতিষ্ঠানের জন্মকাল হইতে তাঁহার মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত ইহার একরূপ অভিভাবকরূপেই তিনি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া বাংলা দেশে ও বৃহত্তর বঙ্গে বাংলা সাহিত্যের প্রচারে ও বিস্তারে তিনি কি পরিমাণ পরিশ্রম ও চিন্তা করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইতিহাস এখনও লিখিত হইতে বাকি আছে। হীরেন্দ্রনাথের সাহিত্য-নিষ্ঠা এবং বাংলা সাহিত্য বিষয়ে অকৃত্রিম উৎসাহ শেষ দিন পর্য্যন্ত বজায় ছিল। তাঁহার বিয়োগে বাংলা সাহিত্য অপরিসীম ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

রবীন্দ্রনাথ গিয়াছেন, হীরেন্দ্রনাথ গেলেন, বাকি রহিলেন বাংলার প্রফুল্লচন্দ্র; এই চন্দ্র অস্তমিত হইলে উনবিংশ শতাব্দীর সহিত বাংলা দেশের প্রত্যক্ষ যোগ ছিন্ন হইবে। সেই দুর্দ্দিন বিলম্বে আসুক।

—

দুইটি সরকারী প্রচার-পত্র হাতে আসিয়াছে—"Three Voices Speak of Britain" এবং "Slavery"। এগুলিতে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় Winston Churchill, পার্লিয়ামেণ্টে ব্রিটিশ লেবার পার্টির লীডার মাননীয় Clement R. Atlee, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক J. B. Priestley এবং আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ Dorothy Thompson প্রভৃতির বাণী উদ্ধৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে, যান্ত্রিক শক্তি পৃথিবীতে আপাতত প্রভুত্ব বিস্তার করিলেও আত্মিক শক্তির নিকট তাহা একদিন পরাভূত হইবেই। এই সকল মহাবাণী সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে সত্য, ইহা জানিয়া আমরা সেগুলি নিম্নে সঙ্কলন করিয়া

দিলাম। এগুলিকে একটা দেশকালবিবর্জ্জিত রূপ দিবার জন্য, স্থানে স্থানে বর্জ্জন করিতে হইয়াছে। আশা করি, এই সকল মহাবাণী শ্রবণ করিয়া আমাদের দেশের লোকেরাও এই দুর্দ্দিনে আত্মিক বলে বলীয়ান হইবে।

"The lesson to be derived from present experiences is never to give in. Never, never, never. Not in any event, great or small, large or paltry, never, never yield, except to conviction and good sense."—Churchill

"Never yield to force, never yield to the growing, and apparently overwhelming, might of the enemy. These are great days—the greatest days our history has seen. We must thank God for allowing each of us, according to our stations, to play a part in making these days so memorable in the history of our race."—Churchill

"...Such an old empire that she had known power for centuries, great power...Her position had deteriorated steadily and, with the leading characteristic of decadence, her leaders and probably the people themselves did not know it....Her Government... bargained for petty ends....People were losing pride in work, and an indolent, not creative, leisure seemed a universal desideratum. Youth was not looking for honour, glory, keenness, fame or even what all healthy youth seeks—experience and adventure. No, they were looking for safe berths and old-age pensions....

...was like a beautiful museum and summer resort with slums on the outskirts in which people with the greatest tradition... were living on and using up with terrible rapidity the inherited capital of their ancestors....

But out of the wounds of...despair, there rose over-night in the twinkling of an eye another...of the people themselves, with all they remembered of greatness, all they saw of present reality.... A great wave of life passed through and people knew what to do, and did it....They organized...Not Government, they themselves...

...Do not think people have not screamed and wept as they saw their husbands buried in the rubble or their children die, but people would not let them have hysterics. A rough "Shut up!

Don't start this—we are all in the same boat" was enough.... They are happy. Yes, that is true, for what makes happiness? It is to know that you are not alone. It is to realize to the fullest the grandeur of your inheritance. It is to know that if you die, you die for a purpose."—Dorothy Thompson

"...a gigantic brigand state, whose staple industry was aggression....The people they controlled were almost ideal people for this particular purpose. They were, for the most part, naturally obedient and docile, only too anxious to receive orders. ...Moreover, their national traditions were militarist, so that the idea of spending their time and energy creating instruments of destruction wasn't repugnant to them, but instantly aroused their pride and loyalty....

We were, it appeared, a decadent lot, well past our prime, no longer capable of making the terrible effort necessary to challenge successfully....

And we have challenged it, and we are beginning to beat it."—J. B. Priestley

"Wherever the totalitarian regime is introduced, the first victim is liberty: liberty of speech, liberty of conscience and liberty of free association....In the new world and new social order which will emerge when this tyranny is overpast, we must attain a new unity of spirit and purpose."—C. R. Atlee

—

আশ্বিনের 'প্রবাসী'র প্রথম তিন পৃষ্ঠায় যেরূপ রবীন্দ্র-কাতরতা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে মনে হইতেছে যে, অতঃপর তাঁহারা রবীন্দ্রনাথের বাজার-হিসাবগুলি লইয়াই টানাটানি করিবেন। তিনি প্রত্যহ কি দিয়া খাইতেন, বাঙালী পাঠকের পক্ষে তাহাও সংবাদ তো! আমরা ভাবিতেছি, পূর্ব্বাহ্নেই বনমালী ও মহাদেবের শরণাগত হইব। 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' বাহির হওয়াতে এই দুর্দ্দশা হয় নাই তো?

—

'বিশ্বভারতী পত্রিকা' বলিতে মনে পড়িল। দেখিতেছি, আমরা প্রায় ঋষিত্বে উপনীত হইয়াছি। গত সংখ্যায় শান্তিনিকেতনে বৌদ্ধপ্রভাব সম্বন্ধে ইঙ্গিত

করিয়াছিলাম—আশ্বিনের পত্রিকাতেই দেখিতেছি আচার্য্য বুদ্ধদেবের বাণী—"স্বাজাতিকতা, দেশপ্রেম, বিশ্বমানবিকতা" এবং সে কি বিশ্ববিমোহন বাণী! এই বাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে, আমরা যে বাঙালীজাতি, শুদ্ধ এই বোধ হইতে লজ্জায় ঘামিয়া উঠিব। বর্ত্তমান ভারতের দেশাত্মবোধের মূর্ত্তবাণী বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্" মন্ত্রকে এমনভাবে জুতাইতে স্বদেশী যুগের গোরা-পল্টনেও পারে নাই। বুদ্ধদেব বসু লিখিতেছেন—

"'আমার মার মতো মা আর নেই, তিনিই বিশ্বের চরমতম মা'—একথা যদি কেউ মুখে বলে কিংবা এই মর্ম্মে কাব্যরচনা করে, সভ্যসমাজের চোখে সে-ব্যক্তি হবে অতীব হাস্যকর, কিন্তু নিজের দেশ সম্বন্ধে অনুরূপ ভাববিলাসিতা লোকে যে শুধু ক্ষমা করে তা নয়, তার মোহে অন্ধ হয়ে হত্যার পথে ধ্বংসের পথে দলে দলে ধাবিত হয় এ তো আজ চোখের উপরেই দেখা যাচ্ছে।...দেশমাতৃকাকে যখন রক্তপায়িকা নরমুণ্ডলুব্ধা 'দেবী' রূপে কল্পনা করা হয় তখনও তার প্রতিবাদে খুব বেশি কণ্ঠস্বর শোনা যায় না। নৈতিক বিচারের কথা ছেড়েই দিলুম—কিন্তু নিছক মূঢ়তা সংঘবদ্ধ মানুষ যে কতখানি সহ্য করতে পারে—শুধু তা-ই নয়, সেই মূঢ়তার দাসত্ব ক'রে নিজের সর্ব্বনাশ ঘনায়—তা ভাবলে আজকের দিনেও অবাক না-হ'য়ে উপায় থাকে না।"

"রবীন্দ্রনাথের বাণী মিথ্যা হবার নয়" এই শান্তিমন্ত্র পাঠ করিয়া বসু মহাশয় প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছেন; কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথকেই সেদিন-প্রকাশিত 'চিঠিপত্র দ্বিতীয় খণ্ডে' পুত্র রথীন্দ্রনাথের নিকট বলিতে শুনিতেছি—

"বাংলাদেশের চিত্ত সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে প্রসারিত হোক্, বাংলাদেশের বাণী সর্ব্বজাতি সর্ব্বমানবের বাণী হোক্। আমাদের বন্দেমাতরং মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র নয়—এ হচ্ছে বিশ্বমাতার বন্দনা—সেই বন্দনার গান আজ যদি আমরা প্রথম উচ্চারণ করি তবে আগামী ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধ্বনিত হয়ে উঠবে।"

ইহা কি স্বাজাতিকতা নয়? হায় রবীন্দ্রনাথ, আজ বিশ্বমানবিকতায় তুমি বুদ্ধদেব বসুর নিকট হার মানিলে!

—

আশ্বিনের 'প্রবাসী'র "বিবিধ প্রসঙ্গে" শ্রাবণের 'বিশ্বভারতী পত্রিকা'র সম্পাদক প্রমথ চৌধুরী লিখিত "ভূমিকা" হইতে নিম্নলিখিত অংশটি আলোচিত হইয়াছে—

"বীরবল বহুকাল পূর্বে লিখেছিলেন যে, আমাদের বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ।...রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যার মন্দিরে সুন্দরের চর্চা যথেষ্ট স্থান লাভ করেছে।"

এই আলোচনার পরে নববিধান সমাজের কোনও প্রবীণ কবি 'নববিদ্যাসুন্দর' কাব্য রচনা করিলে, ষোলকলা পূর্ণ হইত। আদি, সাধারণ ও নববিধানের মিলিবার এমন সুযোগ আর মিলিবে না। ভারতচন্দ্রের জয় হউক!

—

আশ্বিনের 'ভারতবর্ষ' খুলিয়া প্রথমেই চোখে পড়িল "শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ"। লেখকের নামটা দেখিয়া একটু চমকাইতে হইল বইকি!—সুধাংশুকুমার হালদার আই-সি-এস। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া দেখিলাম, কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করিতে পারিলাম না—হালদার মহাশয় কখনও জেলে গিয়াছিলেন কি না। জেলে না বসিয়া কোনও ব্যক্তি গীতা-ভাগবত সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎও আলোচনা করিয়াছেন, এমন সংবাদ আমাদের জানা নাই। তা ছাড়া সুধাংশুবাবু বাংলা দেশের আই-সি-এস দৈত্যকুলে এই প্রথম প্রহ্লাদরূপে দেখা দিলেন। আর কোনও আই-সি-এস তো গীতা-ভাগবত পর্য্যন্ত পৌছান নাই; অরবিন্দ ঘোষ পৌছিয়াছেন বটে, কিন্তু ওদিকে তিনি আবার আই-সি-এসের শেষ ধাপ পর্য্যন্ত পৌছিতে পারেন নাই। মোটের উপর তাজ্জব বনিতে হইল।

—

কবি সামসুদ্দীন হায়দার লিখিয়াছেন—

"এই নখের খরমুখে
তোমার বিভোল মূক শাড়ী
—যতো সখের যবনিকা—
গেলো দীঘল টানে ছিঁড়ে ছরকুটে।...
তোমার শামুক নিরুপায়
কেন খুবলে দিলাম আমি!

আমাদের গত ভাদ্র সংখ্যা বাংলা গবর্মেণ্ট কর্তৃক গত ২রা সেপ্টেম্বরের 'ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী বাজেয়াপ্ত হওয়াতে অনেককে আমরা কাগজ দিতে পারি নাই। গ্রাহকেরাও অনেকে কাগজ পান নাই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন। মফস্বলেও বহু ষ্টল হইতে পুলিস ভাদ্র সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি' লইয়া গিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে কোনও প্রতিবিধান করিতে আমরা অসমর্থ।

ধারা নামুক চোখে হেন—
আমি ডুবলে-যে গো বাঁচি নতুন ক'রে!
আমার নগ্ন অজগর
কোন্ বিজন হরিণীরে
যাচে মগ্ন হ'য়ে আজো
আলো সৃজন কর—বাঁচাও আঁখির তটে!"

কবি হায়দারের এই শামুক-খোবলানো কাব্যের ব্যাখ্যা সমালোচক টিপু-সুলতানই করিতে পারিবেন; অজগর-দৃষ্টে আমরা ভয় পাইয়া গিয়াছি!

—

"যৌবনবতীর কাহিনী" শুনিবেন? রিজিয়ার কাহিনী? "শুন শুন তাতারনন্দিনী" রিজিয়া নয়, যৌবনবতী, লাবণ্যবতী, "আর সে-সংগে অশেষ মূল্যে মূল্যবতী" রিজিয়া। শুনুন। একদিন—

"রিজিয়া নিজের ঘরে বসে-বসে পা দোলাচ্চে আপন মনেই। কোনো একটা বিষয় ভাবতে-ভাবতে সে অকারণেই কোলের ওপর বাঁ-হাত দিয়ে সাড়ির আলগা অংশ রগড়াচ্ছিলো। ধীরে-ধীরে কখন যে হাঁটু পর্যন্ত লাল সায়ার সাথে-সাথে সাড়িখানা উঠে এসেচে, তা সে মোটেই লক্ষ্য করে নি। চোখ পড়তেই সে অত্যন্ত চমকে উঠ্‌লো, তাড়াতাড়ি নামাতে যেয়ে পায়ের দিকে চোখ পড়তেই আবার চমকে পড়লো, এবং পরক্ষণেই দরজার দিকে চেয়ে উঠে দাঁড়ালো। কাঁপা পায়ে দ্রুত হাতে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে রিজিয়া দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলো মুখ চোখ বুক-পীঠ ভরে। একটা অনাস্বাদিত সামগ্রীর আবিষ্কারের নেশায় রিজিয়া তখন কামাতুরা। অসহ্য শিহরণ-ধারা তাকে পুড়িয়ে অঙার করে ফেলতে চাচ্ছিলো। নেশাতুরার মতো দুর্বল পায়ে স্তিমিত ইন্দ্রিয় নিয়ে বিছনেয় গিয়ে পা তুলে সে বসলো। পরিশেষে আবার পায়ে থেকে সাড়ি তুলে সে তার পা দুটো পরীক্ষা করতে লাগলো। দু-হাতে স্থানে-স্থানে টিপে-টিপে দেখতে লাগলো।"

পাঠক নিশ্চয় নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া একটা কিছু কেলেঙ্কারির প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমরাও করিয়াছিলাম। কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি জানেন? কি দেখিয়া রিজিয়া কামাতুরা—অসহ্য শিহরণ-ধারায় দগ্ধ হইয়া অঙার? শুনুন—

"মিহি সোনালি রোমে সমস্ত পা-টা একটা অপূর্ব রূপ-শ্রী ধারণ করেচে, মাংসালো পায়ে রঙ ধরেচে কাচা হোলুদের!"

বুঝুন, আধুনিক সাহিত্যের perversity কোথায় গিয়া পৌঁছিয়াছে! রোমেই যদি এই, বার্লিনে না জানি কি হইবে? হয়তো রিজিয়া আর বাঁচিবে না।

রিজিয়া নাম হইতেই বুঝিতেছেন, ইহা পাকিস্থানী সাহিত্য। জিন্না সাহেব

যদি ইহাদের লইয়া পাকিস্থানের মধ্যেও একটা আলাদা পাকিস্থান গড়িয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহার মাতৃভূমি হিন্দুস্থানের উপকারই করিবেন।

—

মন্মথনাথ রায়ের "রুদ্ররাজ" ('ভারতবর্ষ', আশ্বিন ১৩৪৯) বেশ গুরুগুরু নিনাদেই আরম্ভ হইয়াছিল; "ব্যভিচার, মহামারী, বিদূষক, দাবানল, স্কন্ধকাটা, ছিন্নমস্তা" ইত্যাদির মধ্য দিয়া অন্তমিল ডবল ওয়েলার ঘোড়ার মত বেশ কদমে কদমেই চলিতেছিল, হঠাৎ শেষ দুই পংক্তিতে কবি যে কেন নেতাইয়া পড়িলেন বুঝা গেল না। বাঙালী বলিয়াই কি? অন্তমিলও সম্ভবত সম্পাদকীয় দৌরাত্ম্যে ওই দুই পংক্তিতে কেৎরাইয়া গিয়াছে—

"এ নহে নূতন এই সনাতন বিশ্বের ইতিহাস—
জীবন-মরণ যুগল-মিলন একই ঘরে সহকারে।"

সম্পাদকীয় বিভাগে "সহবাসে" কাহার আপত্তি হইল বুঝিতে পারিতেছি না।

—

কাহারই বা দোষ দিব? 'প্রবাসী'ও এবার "পুস্তক-পরিচয়" বিভাগে (আশ্বিন, পৃ. ৬৩১) "যৌন-অনুরাগিণী" হইয়া উঠিয়া যুগধর্ম পালন করিয়াছেন!

—

"প্রিন্সিপাল মুকুল দে" আশ্বিনের 'ভারতবর্ষে' শ্রীঅরবিন্দকে এই সার্টিফিকেট দিয়াছেন—

"এত লোকের ছবি আমি এঁকেছি, কিন্তু আমার জীবনে আমি এমন ভাল সীটিং দিতে কাকেও দেখিনি। পুরো এক ঘণ্টা আমি এঁকেছিলুম, তার মধ্যে একবার একটুও নড়েন নি, বা আমি একবারও তাঁর চোখের পলক পড়তে দেখিনি।"

এতদিনে শ্রীঅরবিন্দের যোগে বিশ্বাস হইতেছে। কিন্তু ইহার চাইতেও অলৌকিক কাণ্ডের কথা লিখিয়াছেন নূর উদ্দীন মাহমুদ। তিনি লিখিয়াছেন—

"সুপ্ত হলো শূন্য মনে ঘরের মহিষী,
বদ্ধ বায়ু ঊর্ধ্বে ওঠে, নৃত্যময়ী তিসি।"

"নৃত্যময়ী তিসি" সত্যই অভাবনীয়।

—

কয়েকটি চিঠিপত্র পাইয়াছি। তাহা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি। ঢাকা হইতে ডক্টর শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন—

"আপনি সাহিত্যিক সংবাদের ভাণ্ডারী। দুই একটা খবর আশা করি দিতে পারিবেন।" 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' নামক একখানা "রহোল্লাস" দৈবাৎ হাতে পাইয়া পড়িয়া ফেলিলাম। লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি কি সেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁহার প্রথম রচনা "দিবারাত্রির কাব্য" 'বঙ্গশ্রী'তে আপনি সাদরে প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং আমরা পাঠক সাধারণ পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া মনে করিয়াছিলাম,—শরৎ চাটুজ্জের পরে এইবার একটি বৃহৎ প্রতিভার উদয়ের অরুণরাগ লক্ষিত হইল? ইনি কি সেই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁহার 'পুতুল নাচের ইতিকথা' 'দিবারাত্রির কাব্য' দ্বারা জনিত প্রত্যাশাকে ম্লান করে নাই, বর্দ্ধিততর করিয়াছিল? শরৎ চট্টোপাধ্যায় যেমন নকল একজন দাঁড়াইয়া ছিলেন 'দিবারাত্রির কাব্য' বা 'পুতুল নাচের ইতিকথা'র সম্ভাবনা-সমৃদ্ধ ঔপন্যাসিক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইনিও তেমনি একজন নকল নহেন তো? যদি তিনের গ্রন্থকার একই হন, তবে আপনার নিকট কিঞ্চিৎ সংবাদপ্রার্থী। তিনি কি বাতশ্লেষ্মাবিকারযুক্ত সান্নিপাতিক জ্বরে ভুগিয়া উঠিয়া মস্তিষ্ক সুস্থ না হইতেই পেটের দায়ে এই পুস্তকখানি লিখিয়া প্রকাশকের কিঞ্চিৎ অর্থাপহরণ করিয়াছেন?"

এই অভিযোগের উত্তর দিবার একমাত্র অধিকারী মাণিকবাবু স্বয়ং, আমরা শুধু এইমাত্র বলিতে পারি যে, 'দিবারাত্রির কাব্য' ও 'অমৃতস্য পুত্রাঃ'র লেখক একই ব্যক্তি।

'বাঙলায় দেশী-বিদেশী—বঙ্গ-সংস্কৃতির লেন-দেন' নামক একটি পুস্তিকা সম্প্রতি আমাদের হাতে আসিয়াছে—গ্রন্থকার স্বয়ং অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার। পুস্তিকাটি পড়িয়া বিনয়বাবু সম্বন্ধে মনে মনে শঙ্কিত হইতেছিলাম, এমন সময় ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের আর একখানি পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—

"এই সব রাবিশ ছাপিয়া বাহির করার অর্থ কি? বিনয়বাবুর কি মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে? এই প্রমাণপ্রয়োগহীন অসম্ভব মতবাদ ও উচ্ছ্বাস তিনি নৈশার ঝোঁকে উচ্চারণ করিবেন, আর ঐতিহাসিকগণ প্রমাণ খুঁজিয়া বাহির করিবেন, এই দুরাশা কেন? তিনি মনে করিতেছেন, তিনি আমাদের ঋষিগণের মত মন্ত্রদ্রষ্টা; আসলে ইহা অর্দ্ধশিক্ষিত, প্রমাণ-অনুসন্ধান-বিমুখ অলস আত্মাভিমানীর দারুণ মোহপ্রসূত মূল্যমাত্রহীন স্বকপোলকল্পিত উদ্ভট আবোলতাবোল মাত্র। বিনয়বাবু কেন এমন করিয়া লোক হাসাইতেছেন এবং বাঙ্গালী গবেষকগণকে জগতের সামনে উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিতেছেন?"

উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া পুস্তিকাখানি পুনরায় পড়িলাম। ভট্টশালী মহাশয় মিছা রাগ করেন নাই।

কলিকাতা ল্যান্সডাউন রোড হইতে শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবী লিখিয়াছেন—

"পাঠিকা হিসাবে আপনাদের সংবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধে আমার একটা suggestion আছে।

আপনাদের সমালোচনা চমৎকার হয়। যেগুলো আমাদের পড়া, হয়তো নিজেরা যে মতে বলাবলি করছি, হঠাৎ ছাপার অক্ষরে আপনাদের কাগজে সেই মতটি দেখে মন খুসী হয়ে ওঠে। আর একটা উপকার হয় যেগুলো পড়ি নি তার নমুনা দেখে, আর সেগুলো পড়ে অর্থ ও সময় নষ্ট করতে হয় না। সাবধান হওয়া যায় আগে থেকে। কিন্তু এতগুলো কাগজ বই ঘেঁটে আপনারা প্রশংসা করবার মত যদি কিছু পান তবে সেটুকুর উল্লেখ বড় বেশি করেন না তো। আমার suggestion এই যে, ভাল কিছুর উল্লেখ পেলে পাঠকপাঠিকার সুযোগ হয় সেগুলো সংগ্রহ ক'রে পড়বার।"

এই ইঙ্গিত অনুযায়ী কাজ করিতে আমরা চেষ্টা করিব।

কলিকাতা রসা রোড হইতে শ্রীযুক্ত জিতেন সেন লিখিয়াছেন—

"আপনারা বর্ত্তমান সাহিত্যে জাল-জুয়াচুরি আবিষ্কার করিতেছেন বলিয়া আপনাদের নিকট একটি বিষয় জানানো প্রয়োজন মনে করিলাম। বিষয়টি

আরও শোচনীয়, কারণ এটা ঘটেছে শিশু-সাহিত্যে। দেব-সাহিত্য-কুটীর কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'রঙীন-আকাশ' (২য় সং, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯) নামে গল্প-সঞ্চয়নে শ্রীনিখিলেশ সেনের মৌলিক গল্পরূপে প্রকাশিত "জমিদার বাড়ির দলিল" সুবিখ্যাত মার্কিন লেখক Edgar Allen Poe লিখিত "Purloined Letter" গল্পটির বিকৃত নকল। চরিত্র ও স্থানের নাম বদলাইয়া তিনি বেশ বাহাদুরি দেখাইয়াছেন।"

• • •

মাকাইবাড়ি টি এষ্টেট, কার্সিয়াং হইতে শ্রীযুক্ত পি. ব্যানার্জ্জি লিখিয়াছেন—

"'শনিবারের চিঠি'র ভাদ্র সংখ্যায় আপনাদের "সংবাদ-সাহিত্য" বিভাগে শ্রীযুক্ত যামিনীমোহন কর মহাশয় সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। কারণ ওসকল গল্প লিখিবার সমস্ত ব্যবস্থা কর মহাশয় মনে মনে (অনেক ক্ষেত্রে পূর্ব্বজন্মেও) স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ "Great minds think alike" এই নিয়মে তাঁহার লেখা ছাপা হইবার পূর্ব্বেই অন্যে সেইগুলি নিজেদের নামে প্রকাশ করিয়া ফেলিতেছে। এই দেখুন না কেন, এই শ্রাবণের 'বসুমতী'তে তাঁহার লেখা "ভুলের প্রায়শ্চিত্ত" গল্পটি মঁপাশা কর মহাশয়ের জন্মের বহু পূর্ব্বেই বেমালুম চুরি করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা কর মহাশয়ের উপর অকারণ উত্তেজিত হইয়া মুশকিলে পড়িবেন না।"

অনুরোধ শিরোধার্য্য।

• • •

বরাহনগর, কাশীনাথ দত্ত রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'অদৃশ্য সঙ্কেত' হইতে দুইটি রত্ন উদ্ধার করিয়া পাঠাইয়াছেন। ওই পুস্তকের ৮৬ পৃষ্ঠায় নন্দগোপালবাবু লিখিয়াছেন—

"পূর্ব্ব দিকটা তখন সূর্য্যোদয়ের অবিশ্রান্ত ঘর্ষণে চাপ চাপ রক্তবমি করছে।"

নন্দগোপালবাবু সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক নন। তাই এই অপূর্ব্ব রিয়ালিষ্টিক বর্ণনায় একটু বিজ্ঞানের ভুল আছে। ঘর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই বমি হয় না, কিছু

কাল পরে হয়। কিন্তু পত্রপ্রেরক এটিকে অসঙ্গতির পর্য্যায়ে ফেলিয়া অন্যায় করিয়াছেন।

পৃ. ১০২। "আর ভালবাসারই মূল্য কি? ওটা একটা মানুষের ছেঁকে আনা জিনিস বই তো নয়...আসলে দেহটাই সব; নির্লজ্জ দৈহিকতাটা মানুষের সৌন্দর্য্যবোধকে আঘাত করে, তাই মানুষ ওর ওপর একটা প্রেমের প্রলেপ লাগিয়েছে মাত্র...কিন্তু যত পবিত্র, শুভ্র সুন্দর করেই ওটাকে দেখাতে চান না কেন, ও আঁসটে গন্ধ কি চাপা পড়ে কোন দিন?"

নন্দগোপালবাবুর দুর্ভাগ্য, তিনি বোধ হয় বাল্যকালে মায়ের ভালবাসা পান নাই।

—

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার সঙ্কলিত এবং সম্প্রতি প্রকাশিত 'কাব্য-মঞ্জুষা'* গ্রন্থখানি নানা দিক দিয়া উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। সাধারণত ইহা স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সঙ্কলিত হইলেও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ঠিক এই ধরনের সঙ্কলন ইতিপূর্ব্বে আর একটিও বাহির হয় নাই। একজন প্রথম শ্রেণীর কবির মন এই সঙ্কলনের পশ্চাতে কাজ করিয়াছে বলিয়া এই গ্রন্থে আমরা বাংলা কাব্য-সাহিত্যধারার ক্রমবিকাশের একটা সুষ্ঠু পরিচয় পাই। কিন্তু এই পুস্তকের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে ইহার "উন্মোচনী" অংশ। ইহাতে কবিতার কথা, বাংলা কবিতার ছন্দ ও কবিতা-পাঠ বিষয়ে যে আলোচনা করা হইয়াছে, বাংলা দেশে আজ পর্য্যন্ত সে ভাবে আলোচনা কেহ করেন নাই। প্রত্যেকটি কবিতার টীকা ও কবির পরিচয় অংশেও বহু নূতনত্ব সম্পাদিত হইয়াছে। প্যালগ্রেভ সাহেব যে পরিশ্রম স্বীকার ও বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের বিখ্যাত কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ও অনুরূপ শ্রম ও সাহিত্যবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া এই বাংলা 'কাব্য-মঞ্জুষা'টি খাড়া করিয়াছেন। বাংলা দেশের ভাবী-

* কাব্য-মঞ্জুষা—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার, ঢাকা লাইব্রেরি, ঢাকা। মূল্য দেড় টাকা।

কালের বালক-বালিকাদের কাছে শুধু এই কাজের জন্যই তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। "মুখবন্ধে" তিনি বলিয়াছেন—

"আমি কেবল ছাত্রগণের পরীক্ষার উপযোগী কবিতাই সংকলন করি নাই; আমার উদ্দেশ্য—তাহারা, কবিতা কি বস্তু, তাহাও যেন বুঝিবার সুযোগ পায়। এজন্য আমি, এই ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে, যতদূর সম্ভব, নানা প্রকারের কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি। আরও একটি কথা এই যে, আমি কবিতা-নির্ব্বাচন করিয়াছি—কবি-নির্ব্বাচন করি নাই; কোন্ কবিকে বাদ দেওয়া হইল, সে ভাবনা না করিয়া, কয়টি উপযুক্ত কবিতার স্থান করা যাইতে পারে, সেই চিন্তাই করিয়াছি।...আমার সব চেয়ে ভাবনার বিষয় হইয়াছে—কবিতার সমুচিত পঠন-পাঠন। আমি জানি, কেবল ভাল কবিতা চয়ন করিলেই হইবে না, সেগুলিকে ভাল করিয়া পড়াইতে হইবে। এই শিক্ষা—যে কারণেই হোক—শিক্ষার্থীদের যে প্রায়ই হয় না, সে বিষয়ে আমার সাক্ষ্য আশা করি কেহ অগ্রাহ্য করিবেন না।...আমি এই পুস্তকে যতদূর সম্ভব শিক্ষকের কাজ করিয়াছি। বরং ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, সেই পাঠন-রীতিকেই মুখ্য করিয়া আমি এই পুস্তক রচনা করিয়াছি—ইহা কেবল একখানি সংকলন-গ্রন্থই নয়।"

এই কাব্যসংগ্রহখানি হাতে পাইয়া আমরা এই দুঃখই বোধ করিলাম যে, আমাদের বাল্যে ও কৈশোরে এই জাতীয় পুস্তক আমরা পাই নাই।

—

ডক্টর শ্রীসুশীলকুমার দের *Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal** সম্প্রতি-প্রকাশিত আর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থ অধ্যাপক মহাশয়ের দীর্ঘকালের সাধনার ফল। আজ পর্য্যন্ত বাংলা দেশে চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই সাম্প্রদায়িক অন্ধভক্তিপ্রসূত; ঠিক বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে বৈষ্ণব-ভক্তিধর্ম্মের (বাংলার) আলোচনা বিশেষ হয় নাই; ডক্টর দের গ্রন্থ পাঠ করিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন যে, তিনি এই আলোচনা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকের

* General Printers and Publishers Ltd, Calcutta, Price Rs 10/-

দৃষ্টিতে করিয়া যথেষ্ট সৎসাহের পরিচয় দিয়াছেন; অনেক মিথ্যা ও মোহ ইহাতে ভঙ্গ করা হইয়াছে।

গ্রন্থের সাতটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে; দ্বিতীয় অধ্যায়ে চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়, তৃতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী, চতুর্থ অধ্যায়ে রসশাস্ত্র আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চম অধ্যায়ে বৈষ্ণব দর্শন ও বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশদ বিবৃতি ও আলোচনা; ষষ্ঠ অধ্যায়ে বৈষ্ণব আচার ও বৈষ্ণবের ক্রিয়াকলাপাদি এবং শেষ অধ্যায়ে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বিষয়ে যে সকল সাহিত্য-গ্রন্থ আছে তাহার আলোচনা করা হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়েই সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক বিচারের দ্বারা তথ্য ও তত্ত্বকে তৌল করিয়া অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার নিজস্ব বিশিষ্ট মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণব-ধর্ম্মানুরাগীরা নানা কারণে এই গ্রন্থকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিবেন না, কিন্তু তাহা হইলেও ইহার ঐতিহাসিক মূল্য কিছুমাত্র কমিবে না।

—

১৯৪২-৪৩ খ্রীষ্টাব্দের *Nalanda Year Book** আমাদের হস্তগত হইয়াছে—এটি Special War Edition। এই জাতীয় যতগুলি ইয়ার-বুক আমাদের চোখে পড়িয়াছে, এটি নিঃসংশয়ে তাহাদের মধ্যে সুলিখিত ও নির্ভুল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারাপদ দাশগুপ্ত এই বাৎসরিক বহিটিকে সকলের অবশ্য-ব্যবহার্য্য করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। গ্রন্থের ছাপাই বাঁধাই ও আয়তন বিবেচনা করিলে ইহার তিন টাকা মূল্য সস্তাই হইয়াছে বলিতে হইবে। বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে ইহাতে যে কয়টি অধ্যায় যোজিত হইয়াছে, তথ্যের দিক দিয়া সেগুলি প্রায় সম্পূর্ণ। সকলকেই আমরা এই গ্রন্থের এক-একখণ্ড সংগ্রহ করিতে বলি।

—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত "সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা" যে উত্তরোত্তর জনপ্রিয় হইয়া

* Nalanda Press, Calcutta, Price Rs 3/-

উঠিতেছে, তাহার প্রমাণ অত্যল্পকালের মধ্যে ইহার ১নং 'কালীপ্রসন্ন সিংহ', ৩নং 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার', ৪নং 'ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়', ৫নং 'রামনারায়ণ তর্করত্ন', ১০নং 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, ও ১৬নং 'রামমোহন রায়ে'র দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইয়াছে। ৬নং 'রামরাম বসু'রও দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। ইতিমধ্যে ১৭নং 'গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার—রাধামোহন সেন—ব্রজমোহন মজুমদার—নীলরত্ন হালদার' বাজারে বাহির হইয়াছে। এই বিষয়ে বাঙালী পাঠকেরা যে উৎসাহ দেখাইতেছেন, তাহাতে আশা হয় উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার গৌরবময় ইতিহাস সঠিক জানিবার জন্য বাঙালীর আগ্রহ বাড়িতেছে। ইহা আশার কথা।

—

এই সংখ্যাতে আমাদের চতুর্দ্দশ বর্ষ সম্পূর্ণ হইল। যাঁহারা এতকাল সুখে দুঃখে 'শনিবারের চিঠি'র সহিত বার্ষিক চার টাকার বন্ধনে বাঁধা আছেন, আশা করি, এই দুর্দ্দিনে তাঁহারা সে বন্ধন ছিন্ন করিবেন না। তবে সব ছিঁড়িয়া গেলে সে স্বতন্ত্র কথা।

———

আগামী ২০এ আশ্বিন নাগাদ
কার্ত্তিক-সংখ্যা 'শনিবারের চিঠি'ও
বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হইবে।
মূল্য আট আনা। সডাক নয় আনা।

পুস্তক-পরিচয়

চিঠিপত্র, ১ম ও ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী, কলিকাতা। প্রতি খণ্ড মূল্য ১৲।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে অসংখ্য প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় চিঠি লিখিয়াছেন। বস্তুত, লিপি-শিল্পী হিসাবে পৃথিবীর যাবতীয় মৃত ও জীবিত সাহিত্যিকগণের মধ্যে তিনিই প্রধান। সামান্য চিঠিকে এত অপূর্ব্ব সাহিত্য-রূপ আর কেহ দিতে পারেন নাই। কবিতা পড়িয়া আমরা কবি রবীন্দ্রনাথের একটা পরিচয় পাইতে পারি, কিন্তু "কাব্য প'ড়ে যেমন ভাব কবি তেমন" নন—এরূপ একটা সন্দেহ তিনি নিজেই আমাদের মনের মধ্যে জাগাইয়া দিয়াছেন। সুতরাং আমরা তাঁহাকে অন্যত্র আবিষ্কার করিবার জন্য প্রাণপণ করি। কিন্তু তিনি নিজে এমন দুর্ভেদ্য পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে তাঁহার দেহ ও মন-গত পরিচয়কে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন যে, মাথা ঠুকিয়া রক্তারক্তি হইয়া গেলেও তাঁহার আসল স্বরূপ আমাদের নাগালের মধ্যে আসে না। এই বিষম দুর্ভেদ্যতার মধ্যে এই 'চিঠিপত্র'গুলি অনেকখানি আশ্বাস বহন করিয়া লইয়া আসে। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ও বহুধাবিস্তৃত জীবনীর উপকরণ হিসাবে এই বই দুইখানি অত্যন্ত মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইবে। প্রচলিত জীবনীগুলিতে আমরা তাঁহার দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি না, স্বরচিত 'জীবন-স্মৃতি'তেও তিনি কোন পরিচয়ই দেন নাই। 'চিঠিপত্রে'র প্রথম খণ্ডে তাঁহার সহধর্ম্মিণী মৃণালিনী দেবীকে যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলেন এবং কবি-কর্ত্তৃক এতদিন সযত্নে যেগুলি রক্ষিত হইয়াছিল, তাহাই স্থান পাইয়াছে। অর্থাৎ এই চিঠি কয়খানিই তাঁহার দাম্পত্য-জীবন সম্বন্ধে একমাত্র উপকরণ। দ্বিতীয় খণ্ডে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখিত অনেকগুলি চিঠি আছে। পুত্রের নিকট লেখা পিতার এই চিঠিগুলির মধ্য দিয়া মানুষ রবীন্দ্রনাথের এমন একটি ঘনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম পরিচয় পাওয়া যায়, যাহা তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টির কোথাও মিলিবে না। বিশ্বভারতী খণ্ডে খণ্ডে সজ্জিত করিয়া রবীন্দ্রনাথের অগণিত পত্র-প্রকাশ যেদিন সম্পূর্ণ করিবেন, সেদিন সেগুলি যে শুধু তাঁহার জীবনী-রচনার প্রধান উপকরণ হইয়া উঠিবে তাহা নয়, এই 'চিঠিপত্র'গুলিই হইবে তাঁহার সবচেয়ে বড় জীবনী।

স্বপন-পসারি (২য় সং)—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার। পরাগ পাবলিশার্স, কলিকাতা। মূল্য ২॥০।

কাব্য-সাহিত্যে মোহিতলালের 'স্বপন-পসারি'র পুনঃপ্রকাশ বিশেষ আনন্দের সংবাদ। 'স্বপন-পসারি'র কবি বাংলা দেশে একটি নূতন 'স্কুল' সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আধুনিক কবি-সম্প্রদায়ের উপর রবীন্দ্র-পরবর্ত্তী যে দুই-একজন সার্থকব্রত কবির প্রভাব অবশ্য-স্বীকার্য্য, মোহিতলাল তাঁহাদের অন্যতম। বাংলা কবিতায় তিনি যে আরবী-ফার্সী

শব্দের বহুলপ্রয়োগের প্রচলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় পরবর্ত্তী [illegible] কাব্যে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া মোহিতলালের পূর্ব্বে বাংলার হিন্দু-মুসলমান কোন কবিই ভারতের মুসলমান যুগকে কাব্যে এতটা প্রাধান্য দিতে অগ্রসর হন নাই। ভাবের দিক দিয়া রবীন্দ্রনাথের আত্মাপ্রধান প্রেমকাব্যে মোহিতলাল দেহাত্মবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। 'স্বপন-পসারি' প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল একুশ বৎসর পূর্ব্বে। তারপর 'বিস্মরণী', 'স্মরগরল' ও 'হেমন্ত-গোধূলি'তে কবি অনেক পথ অতিক্রম করিয়াছেন। যৌবন-বৈশাখের উজ্জ্বল দীপ্তি 'হেমন্ত-গোধূলি'তে স্নিগ্ধতা অর্জ্জন করিয়াছে। 'স্বপন-পসারি'র ছন্দের চটুলতা ও ভাষার উচ্ছলতা 'বিস্মরণী'তেই সংযত-গাম্ভীর্য্যে উদাত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার পর 'স্মরগরল' ও 'হেমন্ত-গোধূলি'তে দেহাত্মবাদের কবি কাব্য-দেহের প্রসাধন-কলায় সংযম ও শুচিতার চরমে পৌঁছিয়াছেন। কিন্তু কাব্যবিচারে 'স্বপন-পসারি' মোহিতলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য।

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য

রবীন্দ্র-কাব্যে ত্রয়ী পরিকল্পনা—শ্রীসরসীলাল সরকার। প্রাপ্তিস্থান : বিশ্বভারতী, কলিকাতা। মূল্য ১৲।

রবীন্দ্রনাথের কবিতার এক একটি বৈশিষ্ট্য এক এক ব্যক্তির নিকট প্রতিভাত হইয়াছে। কেহ কবির ভাষা, কেহ ভাব, কেহ ছন্দ, কেহ বা তাঁহার কাব্যের অপর কোন লক্ষণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সরসীবাবুর নিকট রবীন্দ্র-কবিতার একটি বিশেষ ধারা ধরা পড়িয়াছে। তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে কবির বহু লেখায় প্রথমে তাল, পরে গান ও তাহার পর গতির ইঙ্গিত ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পাইয়াছে। ইহাকেই গ্রন্থকার ত্রয়ী পরিকল্পনা বলিয়াছেন।

ছোট ছোট ঢেউ ওঠে আর পড়ে,
রবির কিরণ ঝিকিমিকি করে,
আকাশেতে পাখি, চলে যায় ডাকি
বায়ু বহে যায় ধীরে।

এই কবিতায় ঢেউয়ের ওঠা পড়ায় তাল, পাখীর ডাকে গান ও বায়ু বহিয়া যাওয়ার প্রসঙ্গে গতির আভাস পাওয়া যাইতেছে। বহু কবিতা উদ্ধার করিয়া গ্রন্থকার নিজ পর্যবেক্ষণের যাথার্থ্য প্রমাণ করিয়াছেন।

অনেক খ্যাতনামা গ্রন্থকারের লেখায় রবীন্দ্র-কাব্যের ত্রয়ী পরিকল্পনার অনুরূপ আবর্ত্তনশীল বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী দেখা যায় কিন্তু এ পর্যন্ত কেহ তাহার গূঢ়ার্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নাই। সরসীবাবু এ বিষয়ে অগ্রগামী। তিনি মনোবিদ্যার সাহায্যে রবীন্দ্র-কাব্যের এই বৈশিষ্ট্যের মূল উৎস নির্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে কবির 'অবচেতন' মন হইতেই ত্রয়ী পরিকল্পনার উৎপত্তি। "পর পর তাল, গান ও গতির

A. B. T. A.
MADHYAMIK TEST PAPERS
MADE EASY SERIES
In Collaboration with Teachers' Association
By EXPERIENCED PROFESSORS

English (2nd Language) *4. History
Bengali (1st Language) *5. Physical Science
I & II Papers *6. Life Science
Mathematics (Comp.) *7. Geography

*With Questions & Answers,

এণ্ড্রিউ বিশ্বাসের অভিজ্ঞ শিক্ষয়িত্রীদের দ্বারা
লিখিত প্রশ্নোত্তর সাহায্য-পুস্তক
[বিষয়ানুযায়ী সমস্ত প্রশ্ন এবং বিভিন্ন পরীক্ষাগারের
প্রশ্ন ও উত্তর এবং বহু সমাধান সমেত]
শ্রীহেমন্ত ভূষণ দাস প্রণীত
জ্যামিতিসহ
★ লেকেণ্ডারী ম্যাথেমেটিক্স
[সরলীকৃত]
★ জীবিজ্ঞান পরিচয়
For Classes IX & X
Pramabes Jana & Amitava Mitra
★ SECONDARY ELECTIVE MATH.
For Classes IX & X
* OBJECTIVE & SHORT ANSWER TYPE QUES. IN
SECONDARY MATH. (IX & X) [Eng. & Beng.]
পাটীগণিত * বীজগণিত * জ্যামিতি * পরিমিতি

ক্যালকাটা বুক হাউস
৯/১, বঙ্কিম চাটার্জ্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩